

শারদীয় ১৪৩০

মেঘ





K's

Books & Magazines





K's

Books & Magazines



দেশ

শারদীয় ১৪৩০

সূচিপত্র



সম্পাদকীয়

দুর্গাপূজোর ঐতিহ্যেও সেই বহুত্ববাদের প্রতিষ্ঠা • ৩১



গল্প

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
সীতাহার • ৩২



গল্প

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঁকাদার পথ • ৩৬

সিজার বাগচী
নাগরদোলা • ৪১

সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়
মৃগয়া • ৪৫



গল্প

সৌভিক গুহসরকার

রেলতুচ্কা • ৫০

অংশু পাণিগ্রাহী

পাথরের মানুষ • ৫৫

শমীক ঘোষ

দুশমন • ৬০

অভিষেক ভট্টাচার্য

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্র • ৬৫

সূচিপত্র



কবিতা গুচ্ছ

জয় গোস্বামী
সঙ্কীৰ্তন • ৭০



কবিতা

জয় গোস্বামী
প্রার্থনা • ৭৮

সুবোধ সরকার
সা • ৭৯

সূচিপত্র



কবিতা

সুধীর দত্ত

ভাগ্যদোষে কবি আমি • ৮০

অনিতা অগ্নিহোত্রী

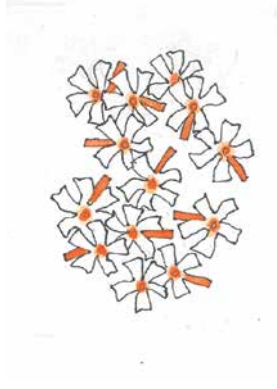
ভুলব না • ৮০



কবিতা

শ্যামলকান্তি দাশ
খুনির শ্যামল রক্ত • ৮১

গৌতম ঘোষদত্তিদার
শবযাত্রা • ৮১



কবিতা

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়
কচি কবিটিকে বলছি • ৮২

যশোধরা রায়চৌধুরী
ষোলো লেন হাইওয়ের কবিতা • ৮২



কবিতা

শ্বেতা চক্রবর্তী
খেজুর • ৮৩

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
ভোঁতা • ৮৩

সূচিপত্র

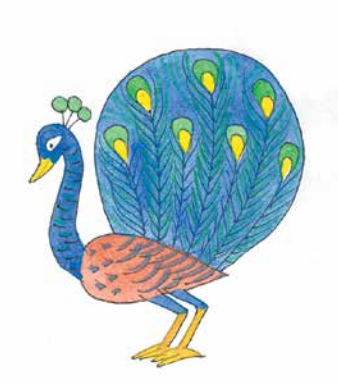


কবিতা

সুমন গুণ
শরণার্থী • ৮৪

সেবন্তী ঘোষ
হৃদয় হরণ • ৮৪

সূচিপত্র



কবিতা

বিকাশ নায়ক

রাধাজ্যোৎসাহত • ৮৫

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

হে অবগাহন • ৮৫



কবিতা

দ্বিজেন আচার্য
নীল খাম • ৮৬

নিবেদিতা আচার্য
একলব্য ও বালিকা • ৮৬

গোলাম রসুল
সেই অতুলনীয় সময়ে • ৮৭

তীর্থঙ্কর দশ পুরকায়স্থ
মনে রেখো • ৮৭



কবিতা

চিরপ্রশান্ত বাগচী
মুগ্ধতার দৃশ্যকাব্য • ৮৮

সোমব্রত সরকার
মানচিত্র • ৮৮



কবিতা

গৌতমকুমার ভাদুড়ি
প্রবাসে দৈবের বশে • ৮৯

মণিদিপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া
গহিন মাছের দেশে • ৮৯

সূচিপত্র



কবিতা

অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গরল • ৯০

অর্পিতা কুণ্ডু

তীর্ণ • ৯০



কবিতা

যশোবন্ত বসু
স্বলন • ৯১

মেঘ বসু
পর্যটক • ৯১

সূচিপত্র



কবিতা

ঋত্বিক ত্রিপাঠী
মৃত্তিকাজন্ম • ৯১

অগ্নি রায়
পর্যটন কথা • ৯২



কবিতা

অদিতি বসুরায়
সমর্পণ উঠে যাওয়ার পর • ৯২

শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী
বীক্ষণ • ৯৩

সূচিপত্র



কবিতা

দেবশিস তেওয়ারী
গৌরবগাথা • ৯৩

তৈমুর খান
মানববাগান • ৯৪

সূচিপত্র



কবিতা

কালোবরণ পাড়ই
হাঁটতে হাঁটতে • ৯৪

মানসকুমার চিনি
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শ করে • ৯৫

সূচিপত্র



কবিতা

কিঙ্কি চট্টোপাধ্যায়
তিনি আসছেন • ৯৫

হিন্দোল ভট্টাচার্য
নয়নপথগামী • ৯৬



কবিতা

ঈশিতা ভাদুড়ি
আদিওস • ৯৬

পাপড়ি গঙ্গোপাধ্যায়
পাতাবাহার • ৯৭

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস
নিরুদ্দেশের খোঁজে • ৯৭

সূচিপত্র



কবিতা

গৌতম মুখোপাধ্যায়

দধীচির হাড় • ৯৮

শিবশিস মুখোপাধ্যায়

এক ব্যর্থ নাট্যকারের জবানবন্দি • ৯৮

সূচিপত্র



কবিতা

পায়েল সেনগুপ্ত

আন্ডারগ্রাউন্ড • ৯৯

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

আহত অক্ষরসমূহ • ৯৯



উপন্যাস

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
টুপি • ১০০

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী
নীল রোলার, লাল রোলার • ১২৬

প্রচৈত গুপ্ত
শরীরের ভিতর শরীর • ১৬৬

সুবর্ণ বসু
রেশমকীট • ২০৪

কৌশিক সেন
ক্লান্তি আমার • ২৪৬

সূচিপত্র



প্রবন্ধ

নিখিল সুর

স্বাধীনতা, দেশভাগ ও বঙ্গনারী • ২৭৭

ভ্রমণ

অসীম পাল

ধবংসনগরের উপাখ্যান • ২৮২

বহুবর্ণচিত্র

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় • ১২৫

সুচিত্রা মিত্র • ২৭৬



প্রচ্ছদ

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

অলঙ্করণ

সুব্রত চৌধুরী • অমিতাভ চন্দ্র
পিয়ালী বালা • কুনাল বর্মণ
সৌমেন দাস • বৈশালী সরকার
প্রসেনজিৎ নাথ • মহেশ্বর মণ্ডল
রৌদ্র মিত্র • তিতাস পাণ্ডা



সম্পাদক সুমন সেনগুপ্ত

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল
সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ সি পি-৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক
সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

Edited by Suman Sengupta and printed and published
by Pradipta Biswas on behalf of
ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V
Salt Lake City, Kolkata 700091

RNI Regd No. 2537/57

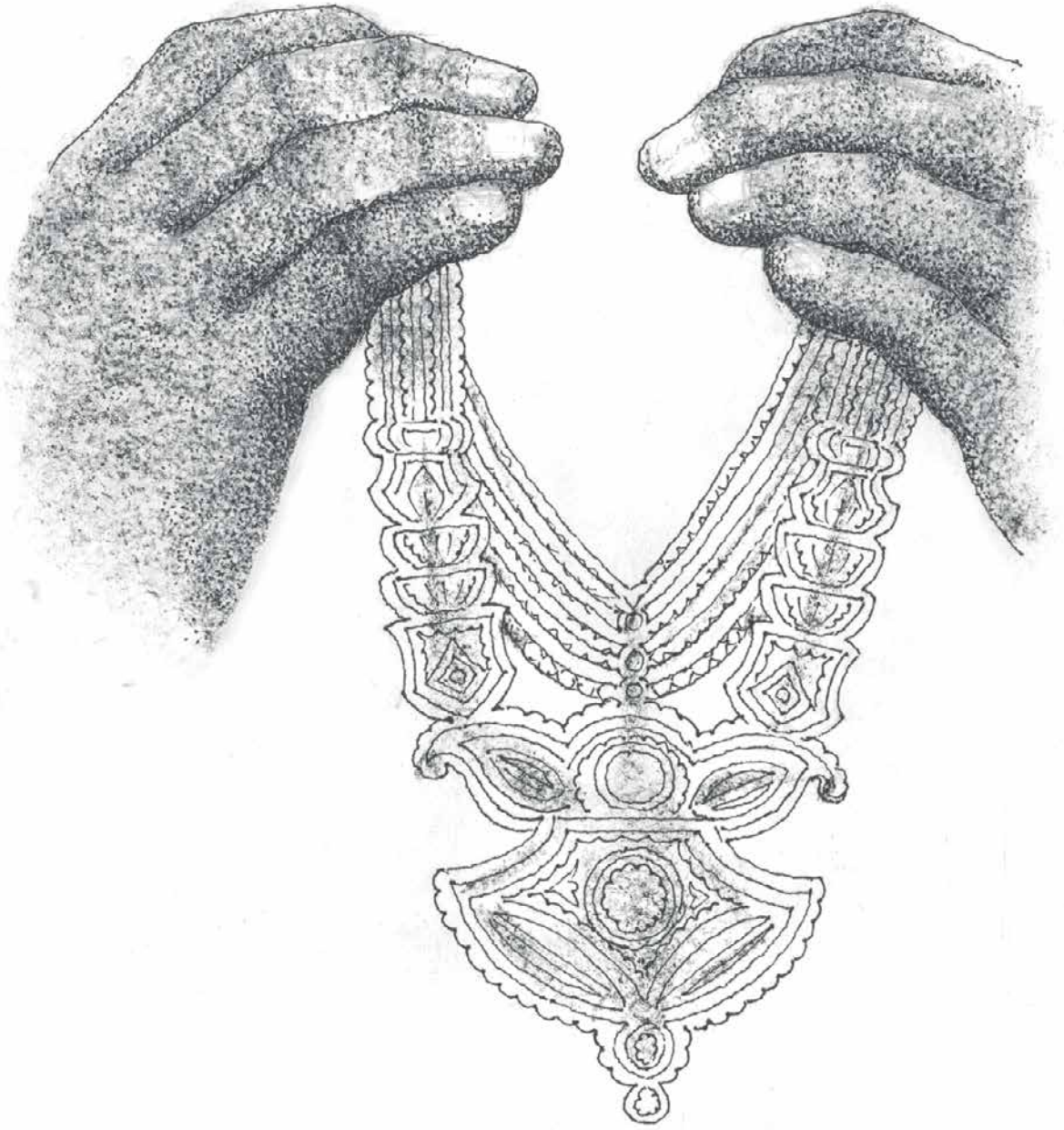
এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত
কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। প্রকাশিত কোনও লেখা বা ছবি, সম্পূর্ণ
বা আংশিকভাবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা নিয়মবিরুদ্ধ।



দুর্গাপূজার ঐতিহ্যেও সেই বহুত্ববাদের প্রতিষ্ঠা

গর্ভধারিণী এবং জন্মভূমির সঙ্গে, জন্মাবধি এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আমাদের। সে সম্পর্কের কাঁটাছেঁড়া করা সহজ নয়। স্নেহ বিহীন করুণা ছলছল জননী শিরদেবে দণ্ডায়মানা, তাঁর অপত্যস্নেহ ভাসিয়ে নিয়ে যায় যে-সুদূরে, তার কোনও বিকল্প এ জীবনে পাওয়া দুষ্কর। জন্মভূমিও তাই। তাঁর ছায়াসুনিবিড় শান্তির আশ্রয়ে আমাদের শৈশব যৌবন এবং বার্ধক্যের দিনাতিপাত। তিনি হয়তো আমাদের গর্ভে ধারণ করেননি, কিন্তু ধারণ করেছেন আমাদের সমগ্র সত্তাকে— সেজন্যে জন্মদাত্রী এবং এই ধাত্রীভূমির প্রতি সমান আমাদের নাড়ির স্পন্দন। এই দুই জননীকে পরমারাধ্যা করে তোলার শিক্ষা পেয়ে এসেছি আমরা সকলে, শৈশবের প্রথম লগ্ন থেকে। সে শিক্ষা জীবনের। যে-জীবনের শিক্ষা আমাদের স্বাবলম্বী করে তোলে, ভাল-মন্দ তফাত করতে শেখায়। নিঃস্বার্থপরতার এক নামই যে ঈশ্বর বা ভগবান, সে শিক্ষা এই জীবনেরই। যা কিছু মহৎ যা কিছু নির্মল যা কিছু সত্য, সব এই জীবনদেবতাকে আমরা অর্ঘ্য দিয়ে থাকি। আদর্শ জীবন এই শিক্ষা এবং সংস্কৃতির কথা বলে। মহাজনেরা সে মার্গের অনুসারী। মৃন্ময়ী মাতৃমূর্তির মধ্যে তাঁর অমোঘ চিহ্নযী সত্তাকে তাই এত সহজে সন্ধান করে ফিরি আমরা। তাঁকে ঘিরে আমাদের উন্মাদনা, উৎসবের চির আয়োজন। রাজসূয় যজ্ঞের সঙ্গে তাই এর তুলনা। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এতে যোগদান যে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী বহুত্ববাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে এ উৎসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেরও যোগ্য সঙ্গত সম্পাদন করে।

নির্ধনের ধনপ্রাপ্তি অপুত্রকের পুত্রপ্রাপ্তি যশঃপ্রার্থীর যশোলাভ— মায়ের কাছে প্রার্থনার সুরে কোথাও যেন এক আবদার! আর মা-ও সন্তানের এই অর্থীভাবকে শূন্য হাতে ফেরান না। উপচে দিয়ে যান কৈলাসে ফিরে যাওয়ার আগে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মা যে এত দিয়ে যান, তার কতটুকু আমরা মাকে দিতে পারি? অথবা আদৌ পারি কি? আমরা জোর গলায় বলব অবশ্যই, এই যে এত ধুমধাম শোভাযাত্রা উপচার-সহযোগে তাঁর আরাধনা— যথেষ্ট নয় কি? হ্যাঁ, যথেষ্ট। আড়ম্বরে জাঁকজমকে আমরা এগিয়েই চলেছি দিনদিন কিন্তু আমাদের মনের কোনায় যে-অন্ধকার, তা কি দূর হতে পারছে? তা হলে সম্বৎসরের মাতৃপূজার সঙ্গে সেই মায়াদের প্রতি আমরা এত নির্মম হই কী করে? কী করে তাঁদের গঞ্জনা লাঞ্ছনা তাঁদের প্রতি অনাচার অবিচার শোষণ অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করি! হারিয়ে ফেলি সব প্রতিবাদী সত্তা! জননী জঠরে আমাদের প্রায় দশ মাসের অবস্থানকাল— সেই জঠরের অবমাননাও আমাদের উদ্বেলিত করে না, আমাদের ক্রোধ ক্ষোভ উগরে দেয় না। আমরা বিনাশকাল নিয়ে আসতে পারি না তাদের, যাদের দ্বারা মায়ের প্রতি এই নিপীড়ন চলছে। হাতে না-পারি, কলমে পারি সম্ভবত। তাই প্রতি বছরের মতো এ বছরও সাহিত্য অর্ঘ্যের মধ্য দিয়ে মায়ের প্রতি একদিকে অপার ভালবাসা এবং অন্যদিকে তাঁকে নির্যাতিতা হতে দেখে অন্তরের শোকসন্তাপ ক্ষোভ ক্রোধ এবং সেই সব অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। বর্তমান শারদীয় সংখ্যাও তেমনই এক মিশ্র আয়োজনে পরিপূর্ণ।



সীতাহার

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ফাঁকা চেয়ারে
শকুন্তলা একা বসে রয়েছেন।
ব্যাঙ্ক ম্যানেজার শুভঙ্কর সান্যাল

এখানেই অপেক্ষা করতে বলেছেন। ভদ্রলোক
আজ ভয়ানক ব্যস্ত। দু'দণ্ড নিজের চেয়ারে
বসার অবকাশ পাচ্ছেন না। অনবরত ঘরে-

বাইরে করছেন। শকুন্তলাকে অন্য দিন আসতে
বলেছিলেন। কিন্তু ভদ্রমহিলা তাঁর প্রয়োজনটা
এমনই জরুরি বলেছেন, তার ওপর তিনি বরিষ্ঠ

নাগরিক। ব্যাকের পরিষেবা নীতি অনুযায়ী যে-কাজটা আজকেই মিটিয়ে ফেলা যায়, তার জন্য বার বার আসতে বলা যায় না। কিন্তু ভদ্রমহিলা এমন একটা দিন এসেছেন... কাল থেকে ব্যাকের অডিট আরম্ভ হবে। ছোট ব্রাঞ্চ। ব্রাঞ্চ লোক কম। কিন্তু কাজের কমতি নেই। রিজিওনাল অফিস লোক বাড়ছে না।

চেম্বারটা ছোট। শুভঙ্কর সান্যাল খুব একটা গোছানো নন। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত কাগজ। কয়েক চুমুক খাওয়া চায়ের মাগ। পেনগুলো খাপ খোলা অবস্থায় ছড়িয়ে রয়েছে। একদিকে দেওয়াল জোড়া কাচ। শকুন্তলা সন্তপণে কাচের দেওয়ালটা দিয়ে বাইরে তাকালেন। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। কেউ এ দিকে তাকিয়ে নেই। একটু যেন নিশ্চিন্ত হয়ে কোলের ওপর দু'হাত বেড় দিয়ে ধরা হাত-ব্যাগটার চেনটা সাবধানে খুললেন। বড় হাতওয়ালা ব্যাগটার মধ্যে খয়েরি রঙের পাতলা কাপড়ের আর-একটা থলি। মুখটায় গিট বাঁধা আছে। গিটটা খুলতে দেখা গেল লাল ভেলভেটের একটা বাস্ক। বাস্কটা পুরনো হলেও মজবুত। এই ব্যাকের লকারেই ছিল। একটু আগে বের করেছেন। লকারবন্দি হয়ে থাকার জন্যই হয়তো ভেলভেটটা নষ্ট হয়নি। থলির মধ্যেই ভেলভেটের বাস্কটার মুখটা অল্প ফাঁক করলেন শকুন্তলা। ভেতরে ঝলমল করছে সীতাহারটা। ভেলভেটের বাস্কটা খুললেই প্রাচীন একটা গন্ধ নাকে এসে ঠেকে। কত স্মৃতি। এই দৃশ্য, গন্ধ, স্মৃতিতে চোখটা ঈষৎ ভিজে, সব কিছু আবছা হয়ে গেল শকুন্তলার। সকাল থেকে এই নিয়ে তৃতীয় বার।

পিয়ালির ব্যাপারটা চোখে পড়ল। তবে সরাসরি নয়। সিসিটিভির মনিটরে। পিয়ালির ডেস্কে দুটো মনিটর। একটা, ব্যাকের সব কাজকর্ম করার জন্য। অন্যটা, সিসিটিভির। সিসিটিভিতে নজরদারি করা পিয়ালির কাজ নয়। পিয়ালি এই ব্রাঞ্চ আসার আগে থেকেই এই মনিটরটা বসানো আছে। তখন যিনি বসতেন, তিনি হয়তো দেখতেন। এখন এটা পিয়ালির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। তবে মনিটরটা রয়ে গিয়েছে। আলগোছে মাঝে মাঝে মনিটরটায় চোখ পড়ে যায় পিয়ালির।

শুভঙ্কর সান্যাল পিয়ালির চেয়ারে বসে রয়েছেন। কাল থেকে অডিট। পিয়ালি কয়েকটা সমস্যা বের করেছে। সেগুলোর সমাধান খুঁজতে পিয়ালির মনিটরের খোলা এক্সেল ফাইলটার ওপর গভীর মনোযোগ দিয়ে ডুবে রয়েছেন শুভঙ্কর। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে সিসিটিভি মনিটরে পিয়ালির হাঠ চোখে পড়ল ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের চেম্বারে বসে থাকা শকুন্তলাকে। খেয়াল করেছে, ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ ধরে বসে রয়েছেন। একটু রহস্যজনক ভাবে ভদ্রমহিলা কাচের দেওয়াল দিয়ে বাইরেটা একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে

মাথা নিচু করে কোলের ব্যাগটা খুলে কিছু দেখছেন, আবার কিছুক্ষণ পরে বন্ধ করছেন। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের টেবিলের ওপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি আছে। তা ছাড়াও আরও টুকটাকি নানা জিনিস। এটা কি শুভঙ্কর সান্যাল খেয়াল করেছেন?

“সার!”

“হুম!” শুভঙ্কর মুখ না তুলেই উত্তর দিলেন।

পিয়ালি শুভঙ্করের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বলল, “আপনার চেম্বারে একজন ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন।”

“জানি। বসতে বলেছি। উফ, আজকেই ওঁর কাজটা করা চাই। একটা কাজ করো তো! একবার যাও। একটা ফর্ম ফিল আপ করতে দিয়েছি। দ্যাখো তো করেছেন কি না।”

“কিসের ফর্ম সার?”

“গোল্ড লোনের।”

পিয়ালি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের চেম্বারে এল। শকুন্তলাকে দেখে মৃদু হেসে বলল, “ম্যাম, আপনার ফর্মটা ফিল আপ করা হয়ে গিয়েছে?”

শকুন্তলা মৃদু মাথা নেড়ে বললেন, “শুভঙ্করবাবু যে-জায়গাগুলোতে পেনসিল দিয়ে টিক দিয়ে দিয়েছেন, সব ভরে দিয়েছি। শুধু দুটো জায়গা...”

শকুন্তলা ফর্মটা তুলে পিয়ালির হাতে দিলেন। ফর্মটায় চোখ বুলিয়ে পিয়ালি দেখল, শুভঙ্কর সান্যাল স্বভাব মতো ফর্মের অনেক জায়গাই নিজের হাতে ভর্তি করে দিয়েছেন। দুটো টিক দেওয়া জায়গা শুধু বাকি রয়েছে। ফর্মে লেখা নামধামের সঙ্গে জন্মতারিখ দেখে হিসেব করে বুঝল, ভদ্রমহিলার বয়স বাহান্ডর। স্বামী মারা গিয়েছেন।

“কোনও সমস্যা ম্যাম?”

শকুন্তলা ফর্মটা পিয়ালির হাত থেকে ফেরত নিয়ে ইতস্তত গলায় বললেন, “এই দুটো জায়গা... ইএমআই-এর ক্লজ আর পারপাস অফ লোন...”

“ইএমআই-এর ক্লজ সম্বন্ধে আপনাকে সার কিছু বুঝিয়েছেন?”

“খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। হয়, শুধু মাসে মাসে সুদটা দিয়ে যেতে হবে। না হয়, মূলধন আর সুদ মিলিয়ে ইএমআই। দুটো ক্ষেত্রেই কত দিনের জন্য মাসে মাসে কত ইএমআই দিতে হবে, সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেটা আমি পারব, সেই সিদ্ধান্তটা আমাকেই নিতে হবে। সেটা আমি নিয়ে ফেলেছি।”

পিয়ালি মৃদু হেসে বলল, “তা হলে সেটা লিখে দিন ম্যাম। আর কী অসুবিধে হচ্ছে বলুন?”

“ওই পারপাস অফ লোন।”

“বেশ, মানে কী উদ্দেশ্যে আপনি লোনটা নিচ্ছেন, সেটা লিখে দিন।”

“সেটাই তো,” খানিক আনমনা গলায় শকুন্তলা বললেন, “আসল উদ্দেশ্যটা আমি তো কাউকে জানতে দিতে চাই না। শুভঙ্করবাবুও জিজ্ঞেস করেছিলেন। বলতে পারিনি।”

পিয়ালি একটু চুপ করে গেল। এক-এক জন কাস্টমারের এক-এক রকম চরিত্র। বিশেষ করে বয়স্কদের। কমবয়সীদের সেই তুলনায় সামলানো অনেক সহজ। যা লিখলে অনায়াসে কাষসিদ্ধি হবে, তার ইঙ্গিত দিলেই চটপট তা লিখে দেয়। ব্যাপারটা আর-একটু বোঝা দরকার।

“জল খাবেন ম্যাম?”

শকুন্তলা ব্যাগের এক দিকের পকেটে গাঁজা জলের বোতলটা দেখিয়ে বললেন, “আছে। আমার ওষুধ খাওয়া হয়নি। ভাত খেয়ে খেতে হয়। সেই সকালে এসেছি। দুপুর গড়াতে চলল। একটু যদি তাড়াতাড়ি হয় দেখুন। আর-একটা সাদা কাগজ হবে?”

“নিশ্চয়ই ম্যাম।”

একটা সাদা কাগজ দিয়ে পিয়ালি নিজের জায়গায় ফিরে এল। শুভঙ্কর তখনও পিয়ালির মনিটরে এক্সেল শিটে চোখ লাগিয়ে বসে রয়েছেন।

“সার।”

“খুব খারাপ অবস্থা পিয়ালি। বেশ কয়েকটা লোন রিকভারির নোটিস পাঠানো হয়নি। চারটে কার লোনের ইনশিয়ারেন্স রিনিউয়ালের কোনও ইনফরমেশন নেই। অনেক ফলোআপ কমিউনিকেশন মিসিং। অডিটর তো ধরে ধরে গোল দেবো।”

এ সবই পিয়ালির জন্য। এক্সেল শিটটা নিজেই তৈরি করেছে। সব ত্রুটি যে নিজের জন্য হয়েছে তা নয়। এখন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে বসে খারাপ অডিট রিপোর্ট পাওয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে উপায় বের করতে হবে। তবে এই মুহূর্তে পিয়ালির মুখে কোনও কথা জোগাচ্ছে না। শুভঙ্কর সান্যাল একটু অগোছালো হলেও ঠান্ডা মাথার মানুষ। সহকর্মীদের দুর্বলতা ঢেকে, যথাসম্ভব পাশে থাকার চেষ্টা করেন। অনেক কাজই নিজের হাতে করেন।

পিয়ালির চোখটা আবার সিসিটিভি মনিটরের দিকে পড়ল। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের চেম্বারে ওই ভদ্রমহিলা সেই একই ভাবে কাচের দেওয়ালের বাইরেটা পরখ করে মাথা নিচু করে ব্যাগটা খুলে কী যেন করছেন। পিয়ালির একটু অস্বস্তি হল।

“সার, আপনার ঘরে ওই কাস্টমার, শকুন্তলা রায়...”

শুভঙ্কর পিয়ালিকে শেষ করতে না দিয়ে বললেন, “ফর্মটা ঠিকঠাক ফিল আপ করে দিয়েছেন?”

“বললেন ইএমআই অপশনটা মনস্থির করে ফেলেছেন। কিন্তু ওই পারপাস অফ

লোনটা লেখেননি। কী বলতে চাইলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।”

“আরে, সেটাই তো! আসল কারণটা তো আমাকেও বলেননি। সাজেস্ট করলাম, ছোটখাটো ব্যবসা, বাড়ি মেরামত, আপৎকালীন চিকিৎসা— কিছু একটা লিখে দিন। কিন্তু উনি রাজি নন।”

“সেই জন্যই কি বসে রয়েছেন?”

“না, গোস্ত লোনের জন্য ভ্যালুয়ারকে ডেকেছি। ওর আসতে একটু সময় লাগবে বলেছে।”

“উনি লাঞ্ছন করে ওষুধ খাওয়ার কথা বলছিলেন।”

“বলেছিলাম, নিতান্ত আজকেই যখন চাইছেন, দুপুরের দিকে আসুন। উনি রাজি নন। একেবারে কাজ মিটিয়ে যাবেন বলেছেন।”

“আপনার চেম্বারেই বসে থাকবেন?”

“থাকুন না। অসুবিধা কী? আসলে লকার থেকে বের করে ব্যাগে গয়নাটা রেখেছেন বলে বাইরে বসতে আনকমফটেরল ফিল করছেন। যাই হোক, ভ্যালুয়ার আসা পর্যন্ত সময় তো দিতেই হবে। ভেবেছিলাম, ফর্মটা যদি ফিল আপ করে রাখতেন, কাজটা এগিয়ে থাকত। তুমি একটু খেয়াল রেখো তো। আজকে যা অবস্থা!”

পিয়ালি কিছুক্ষণ কাজ করে আবার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের চেম্বারে গেল। এবার একটু খুঁটিয়ে দেখল শকুন্তলাকে। মুখটা কীরকম শুকনো, বিষণ্ণ। একটু মায়া হল পিয়ালির।

“ম্যাম, ভ্যালুয়ার এসে পড়বে। তার পর আমরা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেব। আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে বললেন। একটু কফি স্যান্ডউইচ আনিয়ে দিই ম্যাম?”

শকুন্তলা আপত্তি করলেন না। শুধু ব্যাগটা খুলে ছোট একটা বটুয়া খুলে একশো টাকার একটা নোট বের করে পিয়ালির দিকে এগিয়ে ধরলেন। পিয়ালি আপত্তি করে উঠল, “না, না ম্যাম। এইটুকু আমরা ব্যাঙ্ক থেকে আনিয়ে দিচ্ছি।”

পিয়ালি দরজা খুলে বেয়ারাকে ডাকল, “তপনদা!”

শকুন্তলা ঈষৎ লজ্জা পেয়ে কৈফিয়ত দেওয়ার গলায় বললেন, “অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে শুগার আছে তো। সময়ে খাবার আর ওষুধ না খেলে শুগার ফল করে যায়। আমি একটা বিস্কুটের কৌটো সব সময় সঙ্গে রাখি। আজ গয়নার বাক্সটা ব্যাগে রাখতে হবে বলে বিস্কুটের কৌটোটা বের করে রেখে দিয়ে এসেছি। আচ্ছা, আমার স্যান্ডউইচ নিরামিষ কিন্তু। আর কফিটা চিনি ছাড়া যদি সম্ভব হয়।”

“নিশ্চয়ই ম্যাম।”

পিয়ালি আবার নিজের ডেস্কে ফিরে এল। শুভঙ্কর সান্যাল অন্য ডেস্কে গিয়ে অন্য

সমস্যার সমাধান করছেন। সে দিকে যেতেই উনি পিয়ালিকে বললেন, “আমি তোমার এক্সেল শিটে রিমার্কস কলামে অ্যাকশনেবল কমেণ্টসগুলো লিখে দিয়েছি। আজ একটু রাত পর্যন্ত থেকে মিটিয়ে যোগো। সবাইকেই আজ একটু বেশিক্ষণ থাকতে হবে অবশ্য।”

“ঠিক আছে স্যার।”

নতুন কিছু নয়। কম লোক আর বেশি কাজের চাপের জন্য মাঝে মাঝেই নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় থাকতে হয়।

“স্যার, ওই আপনার চেম্বারের ভদ্রমহিলার জন্য তপনদাকে স্যান্ডউইচ আনতে দিয়েছি।”

“ভাল করেছ। দাঁড়াও দেখি।”

শুভঙ্করের কাজের চাপে মাথা থেকে বেরিয়েই গিয়েছিল। পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে ভ্যালুয়ারকে ফোন করলেন, “কত দূর... আরে, এই তো বললেন মশাই এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে চলে আসবেন। এখন বলছেন তিনটে বেজে যাবে! বোঝার চেষ্টা করুন, একজন সিনিয়র সিটিজেন ভদ্রমহিলা সেই সকাল থেকে বসে রয়েছেন!”

ফোনটা ছেড়ে বিরক্ত গলায় শুভঙ্কর বললেন, “এদের কথা কখনও দাম নেই। আর সব দায় বর্তাবে ব্রাঞ্চের ওপর। পিয়ালি, তুমি একটু বোঝাও কাস্টমারকে।”

পিয়ালি ফিরে এল ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের ঘরে। ব্রাঞ্চের বাইরেই ফুটপাথে স্যান্ডউইচ-এর দোকান। বললেই সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে দেয়। তপন ইতিমধ্যেই স্যান্ডউইচ আর ব্রাঞ্চের কফি ভেঙিৎ মেশিন থেকে কফি দিয়ে গিয়েছে। তবে শকুন্তলা এখনও ওগুলো স্পর্শ করেননি। ফর্মটা খুলে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন।

“এ কী, আপনি খাননি! ওষুধ খেতে হবে তো। খেয়ে নিন ম্যামডাম।”

আলতো করে ফর্মটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে শকুন্তলা বললেন, “লোনটা অনুমোদন হয়ে টাকাটা আজ আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে তো?”

পিয়ালির জানা নেই, ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে ভদ্রমহিলার কী কথা হয়েছে। তবে ঠুকে একটু স্বস্তি দিতে চেয়ারটা টেনে নিয়ে পাশে বসে পিয়ালি বলল, “স্যার যেমন বলেছেন, তেমন হয়ে যাবে। আপনি খেয়ে ধীরেসুস্থে ফর্মটা ফিল আপ করে রাখুন।”

“আপনি খাবেন না?”

“ও আমাদের অভ্যেস আছে। আচ্ছা, আমি বরং আপনার সঙ্গে বসে একটা কফি খেয়ে যাই।”

কাচের দেওয়ালটা দিয়ে হাতের ইশারায় তপনকে ডেকে একটা কফি দিতে বলল পিয়ালি। শকুন্তলা কাগজের প্লেটটা তুলে ছোট কামড়ে স্যান্ডউইচ খেতে থাকলেন। তপন কফি দিয়ে যাওয়ার পর চুমুক দিয়ে পিয়ালি বলল, “আপনি ওষুধ খেয়ে ফর্ম ফিল

আপের কাজটা শেষ করে রাখবেন ম্যাম। কাজটা এগিয়ে থাকবে।”

শকুন্তলা কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন।

“সত্যি কথাটা কেমন করে যে লিখি!”

“আপনাকে কোনও সাহায্য করতে পারি কি?”

“শুভঙ্করবাবু বলেছেন। কারণ লেখা একটা ফর্মালিটি। কয়েকটা উদাহরণও দিয়েছেন। কিন্তু কী জানো মা, প্রতিটি উদাহরণই কোনও না-কোনও সময়ে সত্যি ছিল। আমার সুযোগ এসেছিল, সুযোগটা...” বলতে বলতে কাশতে আরম্ভ করলেন শকুন্তলা।

পিয়ালি ব্যস্ত হয়ে উঠল। দোষটা ওরই।

খেতে খেতে কথা বলানো উচিত হয়নি। শকুন্তলার ব্যাগের পকেট থেকে জলের বোতলটা বের করতে যেতে, কাশতে কাশতেই ব্যাগটা যেন একটু আঁকড়ে ধরলেন। পিয়ালি অবশ্য সেটা খেয়াল করল না। জলের বোতলের ছিপি খুলে বোতলটা এগিয়ে ধরল। খানিকটা জল খেয়ে ধাতস্থ হলেন শকুন্তলা। পিয়ালি গুঁর পিঠে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিল।

স্যান্ডউইচের বাকিটা আর খেলেন না শকুন্তলা। ওষুধ খেয়ে কফির কাগজের কাপে চুমুক দিলেন। আজ ব্রাঞ্চ সবাই ভয়ানক ব্যস্ত। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বলেছেন বলেই এ ভাবে একজন কাস্টমারের কাছে বসে থাকা যায় না। কিন্তু শকুন্তলার ওপর পিয়ালির কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে ওই পিঠে হাতের স্পর্শের পর। আর তা ছাড়া কিছুটা কৌতূহলও।

কত কাস্টমার দেখেছে, যাদের এক দণ্ড ধৈর্য নেই। কোনও কাজে সামান্য দেরি বা গাফিলতি হলে চৈটিয়ে ব্রাঞ্চ মাথায় করে ব্যাক্সের গুটির তুষ্টি করে। সেখানে উনি কিছু না খেয়ে এতক্ষণ একটাও অভিযোগ না করে চুপ করে ধৈর্য ধরে বসে রয়েছেন কখন ঈঙ্গিত কাজটা মেটে।

গলাটা অল্প খাঁকরে পরিষ্কার করে পিয়ালি বলল, “ম্যাম, যদিও ব্যাপারটা খুব ব্যক্তিগত, তবুও আপনাকে যদি সাহায্য করতে পারি... বুঝতে পারছি সোনা বন্ধক রেখে টাকাটা আপনার খুবই জরুরি প্রয়োজন বলে, আপনি সকাল থেকে এ ভাবে বসে রয়েছেন। আসলে কী বলুন তো, এক-এক ব্যাক্সের এক-এক নিয়ম। কোনও কোনও ব্যাক্সের ফর্মে হয়তো কারণটা লিখতেই হয় না। কিন্তু আমাদের লিখতে হয়। ফর্ম ঠিকঠাক ফিল আপ করা না থাকলে অডিটর এনসি দেয়। ম্যাম, স্যার যেমন বলেছেন, সেটুকু লিখলেই যদি সব সমস্যা মিটে যায়, সেটা লিখতে কি খুব অসুবিধে?”

“অসুবিধে, অসুবিধে... পারছি না যে গো কিছুতেই। যেটা এককালে সত্যি হতে পারত,

সেটা আজ ডাহা মিথ্যে। আর যেটা সত্যি, সেটা আমি লিখতে চাই না।”

পিয়ালি কী বলবে বুঝতে পারছে না। না, এবার সত্যিই ডেস্কে ফেরা উচিত। চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল পিয়ালি, এমন সময় শকুন্তলা কাচের দেওয়ালটা দিয়ে বাইরে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে কোলের ওপর রাখা ব্যাগটার চেনটা খুললেন। তার পর খয়েরি রঙের থলির গিঁটটা খুলে ভেলভেটের বাস্কাট বের করে টেবিলের ওপর রেখে বাস্কার মুখটা অল্প ফাঁক করে লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বললেন, “দ্যাখো।”

ততক্ষণে পিয়ালির চোখে পড়ে গিয়েছে সীতাহারটা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেক ভরি ওজন। নকশাটাও পুরনো আমলের।

“অভিশাপ, বুঝলে অভিশাপ!”

“কেন এ কথা বলছেন?” বিস্ময়ে পিয়ালির গলা থেকে বেরিয়ে এল প্রশ্নটা।

“এই হার কার ছিল জানো? আমার শাশুড়ির শাশুড়ির। তিন পুরুষের পুরনো। জানি না কোন চোখের জলের যৌতুকে পেয়েছিলেন। কেউ কোনও দিন জমিদার ছিলেন বলে তো শুনিনি,” একটু দম নিয়ে শকুন্তলা বলতে থাকলেন, “আমার তো এই হার পাওয়ারই কথা ছিল না। কথা ছিল ননদ পাবে। কিন্তু শাশুড়ি আমাকেই দিয়ে গেলেন অশান্তিটা। কী, না বংশে থাকবে। তা বংশ আর আমি বাড়াতে পারলাম কই? মধ্যস্থান থেকে অশান্তিটা রয়ে গেল। সামান্য এই একটা সীতাহারের জন্য চিরকালের মতো আমার শাশুড়ি আর ননদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গেল। আমার স্বামীর সঙ্গেও। সীতাহারটা আর আমি পরলাম কোথায়? তোমাদের লকারেই তো পড়ে রইল।”

জলের বোতল থেকে জল খেয়ে একটু দম নিলেন শকুন্তলা। তার পর অল্প ধরা গলায় বলতে লাগলেন, “আমার স্বামী ছোটখাটো একটা ব্যবসা করতেন। ব্যবসায় টাকার প্রয়োজনে কতবার সোনা বন্ধক দিতে হয়েছে। হাত, গলা খালি করে সব গয়না দিয়েছি। কিন্তু কোনও দিন এই সীতাহারটা দিতে পারিনি। উনি ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে ঠিক আমার সব

বন্ধক দেওয়া গয়না ছাড়িয়ে এনেছেন। তবে কথা শোনাতেও ছাড়েননি। আমার গয়নার সঙ্গে সীতাহারটাও বন্ধক দিলে ধারে আরও বেশি মূলধন পতেন। আরও লাভ করতে পারতেন।”

“হয়তো উনি ঠিকই বলতেন।”

“জানি। কিন্তু বড্ড ভয় হত। যদি উনি ছাড়িয়ে আনতে না পারেন! অশান্তিও একরকম মায়া। হয়তো এককালে অন্যায় করেছি। তাই ব্যবসার প্রয়োজনে টাকা দরকার, এই মিথ্যে কথাটা লিখতে বড্ড বুকে লাগছে।”

“বেশ। তা হলে অন্য কিছু?”

“বাড়ি মেরামতির জন্যও লিখতে পারব না। আমাদের বাড়িটা পুরনো। ছাদ দিয়ে জল পড়ে। শেষের দিকে উনি বলেছিলেন, ‘কী হবে তোমার ওই সীতাহার দিয়ে? বিক্রি করে ওই টাকায় বাড়িটা মেরামত করে নাও। বুড়োবুড়ি যে-ক’দিন বেঁচে থাকব, একটু ঠিকঠাক করে থাকতে পারব,’” একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শকুন্তলা বললেন, “পারিনি।”

পিয়ালি যেন ক্রমশ শকুন্তলার কথার ঘোরে পড়ে যাচ্ছে।

“তা হলে আসল কারণটা ম্যাম?”

একটু চুপ করে থেকে শকুন্তলা বললেন, “এত কথা যখন তোমাকে বলেই ফেললাম, সত্যি প্রয়োজনটা বলি। আমার ননদ খুব অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। ছেলে বিদেশে থাকে, টাকা পাঠাবে বলেছিল। কিন্তু যা হয়... এই কারণটা আমি লিখতে পারব না,” চুপ করে গেলেন শকুন্তলা।

পিয়ালির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, “আপনার বিরাট মন। কিন্তু আপনি তো বিক্রি করে দিতে পারতেন। ইএমআই দেবেন? প্রত্যেক মাসে অনেকগুলো টাকা।”

“শুভঙ্করবাবু হিসেব বুঝিয়ে দিয়েছেন। সুদটা শুধু দিয়ে যাব যত দিন বেঁচে থাকব। জানি, আমার সামান্য আয়ে অসুবিধে হবে। কিন্তু উপায় কী? বংশের গয়না আর আমার গ্লানির সুদ। অপরাধবোধের সুদ। ওই যে তোমার কাছে যে সাদা কাগজটা চাইলাম, ওতে লিখে রাখলাম, রন্টু... মানে আমার

ননদের ছেলে...ওকে নমিনি করেছি... ও ছাড়িয়ে নেবে...ফর্মের সঙ্গে আমার ইচ্ছেপত্রটা রেখে দিয়ো।”

শুভঙ্কর সামান্য ব্যস্ত হয়ে ঢুকলেন ভ্যালুয়ারকে নিয়ে। শকুন্তলা থেমে গেলেন।

“স্যরি ম্যাডাম। অনেকক্ষণ আপনাকে অপেক্ষা করতে হল,” শুভঙ্কর গয়না ওজনের যন্ত্রটা আলমারি থেকে বের করে টেবিলের ওপর রেখে সকেটে প্লাগ গোঁজার পর ভ্যালুয়ার খাতা বের করে বলল, “কই দেখি ম্যাডাম, আপনার সোনাটা।”

শকুন্তলা কাচের দেওয়ালের বাইরেটা পরখ করে মাথা নিচু করে ব্যাগটা খুলে খয়েরি থলিটার গিঁট খুলতে থাকলেন। শুভঙ্কর পিয়ালিকে বললেন, “ঠিক আছে। তুমি যাও।”

পিয়ালি নিজের ডেস্কে ফিরে এসে কম্পিউটারে লগ-ইন করে এক্সেল শিটটা খুলল। কাল অডিট। প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে। টানা কাজ করলেও শেষ করতে কত রাত হবে জানে না। তবুও কিছুতেই যেন মন বসাতে পারছে না। চোখটা চলে যাচ্ছে সিসিটিভি মনিটরের একটা খোপে।

শুভঙ্কর হারটা নিয়ে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ঢুকিয়ে সিল করছেন। সামান্য একটু জায়গা বদল করে সীতাহারটা এই ব্রাঞ্চেই যেমন ছিল, তেমনই থাকবে। শকুন্তলা খালি ভেলভেটের বাস্কাটা একবার খুলে লম্বা একটা শ্বাস নিলেন। তার পর বাস্কাটা খয়েরি থলিটার মধ্যে ঢুকিয়ে গিঁট বেঁধে বড় হাতব্যাগটার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন। শুভঙ্কর এবার ফর্মের পাতাগুলো উল্টিয়ে দেখতে দেখতে শকুন্তলাকে কিছু প্রশ্ন করছেন আর লিখছেন। শেষ পর্যন্ত ধার নেওয়ার কারণটা বোধহয় লিখলেন।

ইচ্ছে করলেই একটু পরেই এই ফর্মটা দেখে নিতে পারে পিয়ালি। কিন্তু পিয়ালি ঠিক করল, ওই লেখাটা কোনও দিন দেখবে না। আসল মানবিকতার কারণ কয়েকটা শব্দ লেখা যায় না যে!

অঙ্কন: সূত্র চৌধুরী





বাঁকাদার পথ

ত ম ল ব ন্দ্যো পা ধ্য য়

আমি সবার্থ হালদার একা মানুষ।
অনেক ভেবেচিন্তেই বিয়েথা
করিনি কারণ, কোনও মেয়েকে
নিজের জীবনে এনে সুখে রাখতে পারব
এমন আত্মবিশ্বাস আমার ছিল না। জীবনে

উন্নতি বিশেষ করতে পারিনি, কিন্তু তার মানে
উন্নতি যে করতে চাইনি তা নয়। একসময়
টাকা কমিয়েছি দু'হাতে, অবশ্য তাতে
আমার তেমন কৃতিত্ব ছিল না। বাবা যাওয়ার
আগে তাঁর দুই পুরুষের হাতে-গরম ব্যবসাটি

লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন আমার নামে। কিন্তু
কপালের এমনই ফের যে, আমার আয়ুনাট্যের
চতুর্থ অঙ্কে এসে টাউনের মাঝখানের অমন
রমরমিয়ে চলা আমাদের 'হালদার মিউজিক
স্টোরস'-এর আক্ষরিক অর্থেই মাছি তাড়ানোর

দশা উপস্থিত হল।

অবশ্য একে কপালের ফের না বলে সময়ের ফের বলাই ঠিক হবে। দু'হাজার সালের পর থেকেই গান-বাজনা শোনার দুনিয়ায় বড়সড় হাওয়া বদল শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাজারে কমপ্যাক্ট-ডিস্ক বা সিডি নামক রূপোলি চাকতির মতো একরকম বস্তু আসার পর অডিয়ো ক্যাসেট প্লেয়ার আর ক্যাসেটের চাহিদা হু হু করে কমছিল বটে, তাই বলে দু'হাজার পাঁচ-ছয় নাগাদ প্লাস্টিকের ফিতের ওইসব ক্যাসেট যে একেবারে উঠে যাবে কে ভেবেছিল। তবে সিডি, ডিভিডির ব্যবসাও করেছে চুটিয়ে, এই দোকান থেকেই সিডি ডিভিডি প্লেয়ারও বেচেছি দিনে অন্তত দশটা করে। কিন্তু আর পাঁচটা বছর যেতে না-যেতেই সেসবের চাহিদাও গেল উবে কারণ, তার আগেই মার্কেটে এসে গিয়েছে জলের দরে ফলের রস, এমপিথ্রি নামক তাদের আরেক পক্ষের ভাই। মাত্র বিশ-তিরিশ টাকায় পর পর অটেল অঙ্কনতি গান শুনতে পারলে কে আর অতগুলো টাকা খরচ করে মিউজিক অ্যালবাম কিনতে চায়। ক্রমশ সেই চাকতির যুগ গিয়ে এল চিপের জমানা, তারপর মোবাইল ফোনের ইউটিউব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গানের ভান্ডারি হয়ে ওঠায় গাঁটের কড়ি খরচা করে গানবাজনা শোনার দিন ফুরল আর তার সঙ্গে লাটে উঠল আমার ব্যবসা।

ব্যবসা লাটে উঠলেও আমি দমলাম না। পিতৃপুরুষের হাতে গড়া দোকান বেচে দেওয়া বা তাতে বিকল্প লাভজনক ব্যবসা চালু করার বান্দা আমি নই। বরং অদৃষ্টের প্রতি রাগে অভিমানে জেদ করে রোজ নিয়ম করে দোকান খুলতে লাগলাম আর মহাকালের করাল ঞ্চকুটিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অধুনা বাতিল হয়ে যাওয়া আমার সখের টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেট ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে প্রিয় সব গান বাজাতে লাগলাম। কখনও কখনও বা সে আমলের টেলিফোনে কোম্পানির গ্রামোফোনে কালো কালো ফ্লয়িং-ডিস্কের মতো লং-প্লেয়িং রেকর্ড। লাভের জন্যে একসময় অনেক খেটেছি, সঞ্চয় যেটুকু আছে একটা মানুষের পক্ষে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে তেমন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, তাই বাকি জীবনটা লোকসানের খাতায় কাটিয়ে দিলে কী এমন ক্ষতি হবে। তা ছাড়া দিন দিন এই টাউনের বাতাস যেভাবে লঘু চটুল খেলো হচ্ছে, তাতে রোজ রোজ নিয়ম করে স্বর্ণযুগের সেই সব সোনালি সুরের রেণু ভাসিয়ে দিতে থাকাকে নেহাতই অকাজ বলে দাগিয়ে দেওয়া যায় না বোধহয়।

দোকান খুলে একা একাই যে বসে থাকি তা নয়, আমাদের বহুকালের পুরনো কর্মচারী বঙ্কিম পাল মানে বাঁকাদা তো আছেই। সে ভেতরের শোকসন্তুলিত আগাপাশতলা ঝাড়পোঁছ করে টিপটপ রাখে আগের মতোই।

আমার কালেকশনের প্রত্যেকটা ক্যাসেট সিডি ডিভিডি এলপি ইপি রেকর্ডের ওপর ন্যাকড়া বোলায়। এমনকি ড্যাম্প ধরে যাওয়া ক্যাসেটগুলোকে পর্যন্ত আগের মতো সচল অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যায় আর চাপা অস্পষ্ট স্বরে কী যে এক ধরনের গানের মতো গায় সে ওই জানে। একেবারেই যেগুলো পুনরুদ্ধারের আওতার বাইরে, সেগুলোর ফিতের ওপর আলতো করে আঙুল বুলাতে থাকে আর চালিয়ে যেতে থাকে অস্ফুট দুর্বোধ্য সেই অদ্ভুত গুনগুন। “ও কী গান গাইছ, ও বাঁকাদা” জিজ্ঞেস করলে বলে, “ও কিছু না, ও আমার ভগমানের গান।”

কেনাকাটির লোক আর আসে না তো কী হয়েছে, আমার বেশ কিছু গান-খ্যাপা বন্ধু আছে, আছে কিছু গান-অন্তপ্রাণ পুরনো খন্দেরও। তারা নিয়মিত সময় করে এসে বসতে লাগল আমার পাশের তোয়ালে পাটা চেয়ারগুলোয় আর আমি তাদের অনুরোধ ধরে ধরে গান শোনাতে লাগলাম। বাইরে কাঠফাটা রোদ, যানজট চিল্লামিল্লিতে ভরা টাউনের ব্যস্ততম রাস্তা, তার ধারে হয়েও বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন আমার দোকানটা দেখতে দেখতে হয়ে উঠতে লাগল গানপিপাসুদের কাছে শান্ত সুশীতল এক জলস্রৎ যেন বা হরিয়ে যাওয়া সব গানের ফসিলের ছোটখাট এক প্রত্নসংগ্রহশালা।

প্রথমদিকে দশ বারো এমনকি পনেরোজন পর্যন্তও এসেছে, কিন্তু ধীরে ধীরে নিয়ম করে গান শুনতে আসার লোক কমতে-কমতে পাঁচ-ছয়ে ঠেকল। আস্তে আস্তে গানের চয়েস ওরা আমার হাতে ছেড়ে দিতে আরম্ভ করলে আমি আমার ইচ্ছে মতো যে সব গান বাজাতে শুরু করলাম সেগুলোর বেশির ভাগই বড্ড মন খারাপ করা। যেমন ধরা যাক ইলা বসুর ‘গান ফুরলো জলসাঘরের’, ধনঞ্জয়ের ‘চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়’, হেমন্তের ‘মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে’।

আমাদের সবারই বয়স বাড়ছে আর কে না জানে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিষন্নতা বাড়ে। মাস তিনেক এইভাবে এক জায়গায় অলসভাবে বসে একের পর এক ওই জাতীয় বিষাদাচ্ছন্ন সব গান শুনে যেতে যেতে বৃকের ভেতরটা কেমন ভারী ভারী লাগতে লাগল, অসহ্য একধরনের দম আটকে আলা ভাব! কিছুতেই উৎসাহ পাই না, ভাল লাগছে না কিছুই, জিভে স্বাদ পাচ্ছি না, আদ্রির নরম পাঞ্জাবি পরেও গা কুটকুট করছে। শুলে ঘুম আসে না, কারণ অকারণে কান্না পায়, বেশির ভাগ রাত জেগে কাটাই, মনোবল তলানিতে এসে ঠেকেছে।

অন্যদের শরীর মনের খবর জানি না, কিন্তু আমার যে রকম বিধ্বস্ত লাগছিল তাতে কাউকে কিছু না জানিয়ে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে আর থাকতে পারলাম না। একগাদা

প্যাথোলজিকাল টেস্ট করালেন ডাক্তার চক্রবর্তী, রিপোর্ট দেখে যা বললেন তাতে ভয় পাওয়ার সঙ্গত কারণ ছিল। প্রেশার সুগার ইউরিক অ্যাসিড কোলস্টেরল সবই হাই, অবিলম্বে গাদাশুচ্ছের সব ওষুধ শুরু করতে হবে। তদুপরি ডাক্তারবাবু জানালেন আমি নাকি গভীর বিষাদ রোগে আক্রান্ত হয়েছি। এই রকম ডিপ্রেসন কাটিয়ে উঠতে শুধু ওষুধই যথেষ্ট নয়, হাটহাটি ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ সাইকেল চালানো মুক্ত জায়গায় ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি করতে হবে নিয়মিত, না হলে কপালে দুঃখ আছে।

ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারলাম না বেশিদিন, দোকানে নিত্যদিন আসা বন্ধদের জানালাম বিপদের কথা। সব শুনে ওরা তাকাল থমথমে মুখে, নিচু স্বরে জানাল তাদের অবস্থাও তথৈবচ। ওরা পাঁচজন মানে অরবিন্দ পোদ্দার, শেখর দে, সেলিম মল্লিক, কানাই কুণ্ডু আর রতন নাথ যখন নিজেদের সমস্যার ঝাঁপি খুলে বসল তখন মনে হল আমার সমস্যাগুলো ওদের তুলনায় শিশু। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কানাই সে অর্থে সবচেয়ে বিত্বহীন আর কর্মঠ, সাইকেল চালিয়ে তবলার টিউশন করে বেড়াতে কিছুদিন আগে পর্যন্তও। ডাক্তার আমাকে সাইকেল চালানোর উপদেশ দিয়েছেন শুনে সে চেয়ারের হাতল চাপড়ে বলে উঠল, “সে তো আমি কবে থেকেই বলে আসছি, চল এবার সবাই মিলে বেরিয়ে পড়া যাক।”

“বেরিয়ে পড়া যাক বলতে! কোথায়?” অরবিন্দ বলে।

“কোথাও না, আবার ধরে রাখ সব জায়গায়।”

“মানে, হৈয়ালি ছাড়, পরিষ্কার করে বল।”

“এর মধ্যে অস্পষ্ট কী আছে, বলছিলাম বিকেলের দিকগুলো তো আমরা সবাই মোটের ওপর ফাঁকি। চল, সপ্তাহে তিনদিন করে অন্তত আমরা পাঁচজন পাঁচটা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। যে-দিকে মন চায় এক একদিন এক একটা রাস্তা ধরে টাউনের বাইরে বেরিয়ে পড়ি, পনেরো বিশ কিলোমিটার করে সাইকেল চালিয়ে ফিরে আসি। সাইক্লিং-এর চেয়ে ভাল কমপ্লিট এক্সারসাইজ খুব কম আছে দুনিয়ায়।”

“গুড আইডিয়া, সাইকেল চালানোও হবে গ্রামের দিকগুলোয় ঢুকে পড়লে প্রকৃতিও দেখা হবে।” আমাদের কবি বন্ধু সেলিম বলে।

“কিন্তু আমরা কি পারব? এই বয়সে সাইকেল চলে পনেরো বিশ কিলোমিটার কি মুখের কথা। শরীর আর বয়স দুই-ই পারমিট করবে কি?” রতন বলে।

“ধুর, বিশ কিলোমিটার সাইকেল টুর আবার কোনও ব্যাপার হল! বয়স হলেই বুড়ো হতে হবে কে মাথার দিবা দিয়েছে, আর শরীরের নাম হল মহাশয়, যা সযাবি তাই

করছে এই পারের কাছে। অনেকটা যেন একটা ফানেলের মতো যাকে ঘিরে জল ঘুরছে চারদিক থেকে আর গর্তটা কখনও এগোচ্ছে তো কখনও পিছোচ্ছে। ফেনা উঠছে ঘূর্ণিটাকে ঘিরে, খেলায় মেতেছে যেন গর্তটাকে নিয়ে।

আমার গলার স্বরে ঘোর ভাঙল বাঁকাদার। আড় করে একবার তাকিয়ে আবার চোখ ফেরাল ঘূর্ণিটার দিকে। “কী হল, কী দেখছ এত মন দিয়ে?” আমি বলি। শুনে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না যেন। শেখর ওর পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে একই প্রশ্ন আবার করলে সামান্য ঘাড় বেঁকাল, আলতো করে উচ্চারণ করল “নাই”।

“কী বলছ, নাই বলতে?” বকের মতো সামনে গলা বাড়ায় শেখর।

“মা গঙ্গার নাই।”

“কী, মা গঙ্গার নাই বলতে, নাই বলতে কী নাভি?” আমিও বসে পড়ি পাশে।

“হু হু।” সম্মতিতে মাথা নাড়ে বাঁকাদা।

আমরা একে অপরের দিকে চোখ চাওয়াচাওয়ি করছি। লোকটা বিভিড়িয়ে ওঠে, “মায়ের নাভি। তার নীচে বাপ অজয় এসে মিলচে, আর আমরা সবাই হলাম উদের বাচ্চাকাচ্চা, নাড়ি হেঁড়া ছেলেপুলের দল।”

শুনে আমরা তিনজন তো থা! বাপের বাপ, মুখ দিয়ে কথা বেরচ্ছে না আমার, এক পা এক পা করে পিছতে শুরু করেছে। সেলিম বলে, “থাক, ওকে ডিস্টার্ব না করাই ভাল। যা দেখছে দেখুক, প্রাণ ভরে দেখুক, দেখা হয়ে গেলে ফিরে আসবে।”

ঘন্টাখানেক পেরিয়ে গেছে, পিঠের ওপর চড়চড় করছে রোদ, খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, কিন্তু লোকটা যে ফিরল না! আমি নিজে গোলাম ডাকতে তবু সে আসবে না। কাছের একটা পাইস-হোটেলে খাওয়াদাওয়ার পর আবারও গোলাম ওকে খেতে ডাকতে কিন্তু সে লোক তো আর কিছুতেই উঠবে না। এবার আমাদের ফিরতে হবে শুনে কাঁচুমাচু মুখে বলল, “এবেলাটা থাকি, বিকেলে ঠিক উটে চলে যাব। আপনারা এগোন দাদাভাইরা, আমি আসচি পেছ-পেছ। জাইগাটা আমার এমুন সোন্দর লেগিছে সারা বেলাটা না কাটাতি পারলি মনে কষ্ট থেকি যাবি। রাতের আগে ঠিক পৌঁচে যাব।”

“পাগল নাকি! তোমাকে এখানে একলা রেখে আমরা চলে যাব তাই হয় নাকি, খাওনিদাওনি।” আমি রাগ দেখিয়ে বলি।

“ও আমার দু-একদিন না খেলিও চলে, বিশ্বাস করেন হালদারদা আমারে কিছুটা হবে না, ঠিক সুমায় ফিরে যাব টাউনে। কাল সকালে আপনার বাড়ি থেকে চাবি নিই দোকান খোলব।”

আমি রাজি না হওয়ায় এমন বেয়াড়া বাচ্চাদের মতো পীড়াপীড়ি শুরু করল যে, ওকে সঙ্গে না নিয়েই ফিরতে হল আমাদের।

মুখে তেমন কিছু না বললেও বিরক্ত হয়েছিলাম বিলক্ষণ, রাতে টেনশনও হচ্ছিল তবে লোকটা কথার খেলাপ করেনি, পরের দিন সকাল ন’টার মধ্যে আমার বাড়িতে এসে চাবি নিয়ে দশটার মধ্যে দোকান খুলে বসেছে।

মাঝে একটা দিনের বিরতি, তারপর আমরা এদিন যাচ্ছি হাঁসখালির রাস্তায়। বেরনোর আগে বাঁকাদাকে স্পষ্টাস্পষ্ট বলে দিলাম আজ যেন আগের দিনের মতো বেগড়বাই না দেখি, সবাই একসঙ্গে যাব একসঙ্গে ফিরব, অবাধ্য হলে কিন্তু আর নিয়ে যাব না। ঘাড়ের দু’পাশে মাথা দুলিয়ে ও জানাল সে সব শর্তে রাজি। আমরা দুপুর দুপুর রওনা দিলাম হাঁসখালির রাস্তা দিয়ে বেড়াবেড়িয়া, চন্দনপুকুর, হরপুকুর হয়ে চাপড়ি গাঁয়ের বিলমাঠের দিকে ঢুকে পড়লাম। বিলমাঠের চষা খেতের মধ্যে দিয়ে সাইকেল হাঁটিয়ে এগোচ্ছি হরিহরনগর গ্রামের দিকে। সেখান থেকে শিমুলিয়া, কুলগাছি পেরিয়ে ডানহাতে যাব চিত্রশালীর পথে। অন্যদিন বাঁকাদা পিছন পিছন আসে কিন্তু আজ ও আমাদের সবার সামনে। কারণ আমরা ছবি, ভিডিও তোলা ইত্যাদি করতে গিয়ে বার বার পিছিয়ে পড়ছি আর ও যাচ্ছে এগিয়ে।

ইতিমধ্যে অরবিন্দ আমাদের গ্রাম বেড়াতে বেরোনোর এইসব ছবি ভিডিও লেখালেখি দিয়ে ‘পথিক ও পথ’ বলে একটা গ্রুপ খুলে ফেলেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অল্পদিনের মধ্যে সেটা জনপ্রিয়তা পেয়ে যাওয়ায় তাতে নতুন নতুন পোস্টের চাহিদা বাড়ছে আর আমরা মোবাইল ক্যামেরায় ছবি নিয়ে যাচ্ছি তো নিয়েই যাচ্ছি। চারদিকে সবুজের এত রকম শোভা দেখতে দেখতে পাগল পাগল অবস্থা আমাদের, কবি সেলিম তো উদাত্ত গলায় আবৃত্তি করতে শুরু করছে, “এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ। চিত্রশালী হয়ে আমরা এগোচ্ছি তেঘড়িয়া গ্রামের সমাসীতলার দিকে, হঠাৎ খোয়াল হল বাঁকাদা আমাদের মধ্যে নেই। বেশ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক খুঁজে যখন পাওয়া গেল না তখন আমিই বারণ করলাম আর খোঁজাখুঁজি করতে, এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট না করে বরং এগোনো যাক আমাদের গম্ভাব বুড়া-বটতলার দিকে।

সেখানে খানিকক্ষণ বসে, ছবিটবি তুলে উঠতে যাচ্ছি দেখি অদূরে দাঁড়িয়ে বাঁকাদা। “কী ব্যাপার, কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিলে?” কানাই বলে। কাঁচুমাচু মুখে তাকায় বাঁকাদা, “হাওয়া হইনি, আপনারা ছবি তোলাছিলেন, তাই আপনাদের আগেই ইখানে এয়ে পড়িছিলাম। এই তো কাছেই একখান পুকুর আছে, তার ওপর হেলা এক কাঁটালগাছ, সেখানে একটা মাছরাঙা ছোঁ মেরে মেরে মাছ ধরচিল, তাই দেখছিলাম।”

“সে কী, আমাদের জানালে না, মাছরাঙা

দারুণ রঙিন পাখি, দারুণ ছবি আসে। ইস! দারুণ চাম্প মিস হয়ে গেল, মাছ ধরাটা ভিডিও করে রাখতে পারলাম না। কত লাইক পাওয়া যেত!” অরবিন্দ বলে।

মুখ চেপে হাসে বাঁকাদা, “সেই জমিই তো বলিনি, জানি তো জানালেই আপনারা এসি ছবি তোলাতেন, আর তায়লেই তো সব এঁটু হই যেত।”

“কী এঁটো হয়ে যেত?”

“হু হু, গাছপালা পাকি জল মাছ সবসবু দুই হই যেত। নিজের চক্ষে দেখা আর ওসব যন্তর দিই দেখা কি এক হতি পারে। ছবি তোলালেই তো সে জিনিস তো আর আপনার একক্রে নিজির থাকল না, দশজনি দেখলি তো জিনিসডা এঁটু হই গেল কিনা বলেন?”

শুনে বড় চোখ করে অরবিন্দ তাকায় আমার দিকে, কথাটা শুনে কানাই সেলিম শেখরেরও চোখ বড় বড়। বাঁকাদা বলে, “কিছু মনি করবেন না দাদাভাইরা, ছোট মুকে বড় কথা, তবু বলি বেড়াতে এলি আপনারদের উই মুবাইল যন্তরগুলো না আনাই ভাল, উগুলার জন্মই আপনারা দেকচেন কম ফটোক তোলাচেন বেশি।”

চকিত রাগ চলকে ওঠে, বিরক্ত চোখে তাকাই বাঁকাদার দিকে, “বাপ রে তোমার দেখছি অনেক উন্নতি হয়েছে, বেড়াতে এসে আমাদের কী করতে হবে সে কি তুমি বলে দেবে?”

জিভ কেটে দু-হাতে কানের লতি ছোঁয় বাঁকা, “আস্পদা ক্ষেমা করেন হালদারদা। আমি পাগলা খ্যাপা লোক, কী বলতি কী বলি, আমার কতা কিছুটা মনে নিবেন না দাদারা। আসলে আপনারা যখন ফটোকের পর ফটোক তুলি যাচ্ছেন, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেঁপিয়ে উঠছি, তাই পেলিয়ে বেড়াচ্ছি ইদিক উদিক।”

“সে তুমি হাঁপিয়ে উঠলে আমরা আর কী করতে পারি বলে! তোমাকে তো বেঁধে রাখিনি, তুমি তোমার মতো ঘোরো, আমরা ঘুরছি আমাদের মতো।”

“বলচেন?” আশ্বস্ত চোখমুখে যেন আলো জ্বলে ওঠে বাঁকাদার।

তারপর থেকে এতদিন ধরে যতগুলো গ্রামে গিয়েছি, জায়গায় পৌঁছানোর পর থেকে বাঁকাদা দল-ছাড়া হয়ে এদিক সেদিক উধাও হয়ে যেতে শুরু করেছে যদিও প্রাণ চায়। আর এদিকে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আমাদের কাজে। “পথিক ও পথ” পাবলিক গ্রুপটা নিয়ে আমাদের কার্যকলাপ নতুন একটা নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। অঘোষিত একধরনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছি, সোশ্যাল-মিডিয়ায় আমাদের মতো প্রকৃতি দেখতে বেরনো যতগুলো গ্রুপ আছে তাদের সঙ্গে। জেদ মাথায় চেপে উঠতে শুরু করেছে। আরও অনেক বেশি লাইক, শেয়ার,

রিচ বাড়াতে হবে, বাকিদের হারিয়ে আমাদের জিততে হবে, সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে হবে জনপ্রিয়তায়।

ওদিকে বাঁকাদার যেন দিন দিন বয়স কমছে। মহাফুঁর্তিতে ধুলো-কাদা জলা-জঙ্গল ডিঙিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে যাচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে থামছে। ছুটে বেড়াচ্ছে ছাগলের বাচ্চা পেছনে, বটের ঝুরি ধরে ঝুলছে, সঙ্গে আনা ছোট-ঝোলা থেকে গামছা বার করে পরে নিয়ে নেমে পড়ছে বিল বা স্নানযোগ্য কোনও জলধারা পেলেই। কিন্তু এদিকে অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। দিন দিন চাপ বাড়ছে, টেকনোলজির ব্যবহারে অদক্ষ হওয়ায় আমাদের গ্রুপের পোস্টের বৈচিত্র্য কমছে, কিছুতেই নাম-করা গ্রুপগুলোর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছি না।

বাগাঁচড়া বলে একটা গ্রামে এসে মোবাইল হাতে হেঁটে যাচ্ছিলাম আমি সেলিম আর শেখর, কাছেই একটা বড়সড় পদ্মপুকুর আছে শুনেছি। বাঁকড়া একটা ডুমুর গাছের কাছে আচমকা একটা ব্যাপার চোখ টানতেই দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। একটা আশশ্যাওড়া ঝোপের আড়াল থেকে দেখি, দেখি বাঁকাদা মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে আর তার সামনে এগোচ্ছে একটা লালের ওপর কালো ছোপ ছোপ ডানাওয়ালা এক ধরনের পোকা। চিত্রল পোকাটা যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছে, আর তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বাঁকাদা। ঠিকরে বেরনো চোখে কী এক আশ্চর্য অপত্য বিস্ময়!

লোকটার মুখের এই দুর্মূল্য হাসিটা দেখে ঈর্ষায় নীল হয়ে উঠলাম আমি। হায়, আমিও যদি ওভাবে হাসতে পারতাম! কতকাল যে তেমন বিশুদ্ধ আনন্দ তৈরি হয়নি ভেতরে! প্রথম প্রথম আমাদের সাইকেল টুরে বেরিয়ে

যখন মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম সলজ্জ অনুঢ়া অন্তঃপুরবাসিনী নারীর মতো প্রকৃতির সামনে, অনেকটা অমনই আনন্দ হত হয়তো। সেটা যত দিন যাচ্ছে কমতে কমতে তলানিতে এসে ঠেকেছে। সত্যিই কি ছবি তোলা, লাইভ করা, পোস্টে ক'টা লাইক পড়ল, কী ধরনের কমেন্ট আসছে এসব মন দিতে গিয়ে আমাদের আর একেবারেই দেখা হয়ে উঠছে না নিসর্গজ কিছুই!

শেখর ঝোপের এদিক থেকে লুকিয়ে ছবি তুলতে যাচ্ছিল পোকাটার ওপর উপড় হয়ে থাকা বাঁকাদার, আমি ওর উদ্যত মোবাইল ক্যামেরার সামনে হাত বাড়িয়ে বাধা দিলাম। দরকার নেই, এই দৃশ্যটা ছবিতে ধরে রাখার পক্ষে বড্ড বেশিই অকৃত্রিম! সেলিম বলল, “আমারও একই মত, টেকনোলজির যুগ ভাই, আজ আমরা এইসব সোশ্যাল-মিডিয়ায় ছবি ভিডিও আপলোড, লাইভ-ফাইভ নিয়ে নাচনাচি করছি, কালকে অচল মনে হলে আমরাই ছুঁড়ে ফেলে দেব, যেভাবে একদিন অচল হয়ে গিয়েছিল সর্বার্থর দোকানের সব রেকর্ড ক্যাসেট সিডি ডিভিডি। কিন্তু প্রকৃতি কোনওদিনও অচল হবে না, অচল হবে না বাঁকাদা।”

পোকাটাকে চলে যেতে দিয়ে বাঁকাদা ঘাসের ওপর থেবড়ে বসেছিল দাঁত মেলে, ঠোঁটে যে-হাসিটার অবশেষ এখনও লেগে রয়েছে তা নিশ্চিত কোনও অন্য ভুবনের আলো। আমরা তিনজন পাশে গিয়ে বসলাম ওর। পিঠে হাত রেখে বলি, “কিছু মনে করোনি তো বাঁকাদা, সেদিন তোমার সঙ্গে রেগে কথাটা বলেছিলাম...”

“কবে, কোতায় রেগে কথা বললেন, আমার সঙ্গে, কই আমার তো কিছু মনে পড়চে না!”

“মনে না পড়ই ভাল। যাই হোক, তুমি

ঠিকই বলেছিলে, মোবাইলে ছবি তুলতে গিয়ে আমাদের দেখা বন্ধ হতে বসেছিল, তাই ঠিক করেছি এখন থেকে আর মোবাইল নয় এবার দুচোখ মেলে শুধুই দেখা।”

মণি জোড়া চকচকিয়ে ওঠে বাঁকাদার, শিশুর মতো হাততালি দিয়ে ওঠে মাটি থেকে প্রায় কিছুটা যেন লাফিয়ে ওঠে, “তায়লে চলেন, এবার আমার রাস্তা ধরেন।”

“সেই জন্যেই তো তোমার কাছে এসেছি। এবার থেকে তুমি হলে মাস্টার আর আমরা তোমার সাগরেদা।” সেলিম বলে ওঠে।

“কী যে বলেন, আমি মাস্টার! আমি আকাট মুখ্য আর আপনারা কত ইস্কুল কালেজে পাস দিওয়া কত নিকাপড়া জানা লোক, অমন বলবেন না দাদাভাইরা ভগমান রাগ করবেন।”

“রাগ করবেন না, কারণ ভগবান জানেন আমরা ইস্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পাশ করা হলেও জল মাটি আকাশ আলোর এই পাঠশালায় ডাঁহা ফেল করে গেছি। তাই আমাদের আবার প্রথম থেকে তোমার কাছে অ আ ক খ শিখতে বেরোতে হবে।”

“কী যে বলেন দাদাভাইরা, আপনাদের মতুন বড়নোকদের কতাবান্ত্র মাজেমাছে আমি কিছুতেই বুজতে পারি না।”

“বোঝার তো দরকার নেই, দু-চোখ মেলে দেখতে জানলেই হল।”

“আচ্ছা আপনারা যা বলেন তাই সই।” লুঙ্গির পেছনে ভাঁজে ভাঁজে লেগে থাকা মরা ঘাস, শুকনো পাতা ঝেড়ে সঙ্কুচিত পা ফেলে সামনে এগোতে শুরু করে বাঁকাদা। বিকেলের আলোয় সবে মাত্র লাগতে শুরু করেছে গাঢ় বেগুনি রঙ। আমরা ওকে অনুসরণ করি।

অঙ্কন: সৌমেন দাস





নাগরদোলা

সি জা র বা গ চী

বৃষ্টি এল আচমকা। অনন্যা তখন তৈরি।
বেরোবে। এমন সময় দমকা হাওয়া।
পিছু পিছু তুমুল বৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যে
চারপাশ সাদা। ও একবার ঘড়ি দেখল। পাঁচটা
কুড়ি। ছ'টা থেকে ক্লাস। আজ প্রথমদিন। শুধু
ক্লাস নয়, ক্লাসের পর যেতে হবে ইন্দিরার
বাড়ি। সেখানে রাতের খাওয়া। অসময়ের বৃষ্টি
সব ভড়ুল করে দিতে পারে।

কী করবে বুঝতে পারল না অনন্যা।
একবার ভাবল, সোমনাথকে ফোন করে
বলবে। তারপর ভাবল, আরও কিছুক্ষণ দেখা
যাক। বৈষ্ণবঘাটা থেকে যাদবপুর এমন কিছু
দূরে নয়। হয়তো ওখানেও বৃষ্টি হচ্ছে।

বাইরের ঘরের সোফায় ধপ করে ও বসে

পড়ল।

প্রথমে মাথায় এল ইন্দিরার কথা। সেই
কলেজ জীবনের বন্ধু। প্রদীপ্তকে ভাল চেনে।
কলেজের পর ও আর প্রদীপ্ত যখন চুটিয়ে
প্রেম করছে, ইন্দিরার তখন বিয়ে হয়ে গেল।
ওর স্বামী তাপসদা চাকরি করে সেলসে। কী
যেন এক কোম্পানিতে ছিল। সেই চাকরির
জন্য তাপসদাকে নানা জায়গায় থাকতে হত।
বার-তিনেক কোম্পানি বদলেছে তাপসদা।
ঘোরাঘুরি কমে। ওরা যখন শিলিগুড়িতে,
তখন টিনটিন জন্মাল। ছেলের অল্পপ্রাশন
হয়েছিল ঘটা করে। সেখানে শেষ দেখা ইন্দিরার
আর অনন্যার।

এখন রুবির মোড়ে ফ্ল্যাট কিনে ওরা

পাকাপাকি থিতু হয়েছে। ছেলেকে ভর্তি
করেছে বাইপাসের ধারের নাম করা স্কুলে।
তবে তাপসদা নিয়মিত থাকতে পারবে না।
ওর চাকরির এখনকার এলাকা হল বর্ধমান
শহর এবং আশপাশের অঞ্চল। থাকবে ইন্দিরার
আর টিনটিন। তাপসদা যাওয়া-আসা করবে।
এক জায়গায় থাকা তাপসদা-ইন্দিরার কপালে
নেই। ছেলে যতদিন ছোট ছিল, ততদিন তবু
থাকা যেত। এখন ছেলের পড়াশোনার জন্য
দু'জনকে এই বিচ্ছেদ মেনে নিতে হচ্ছে।

কাছাকাছি কোথাও জোরে বাজ পড়ল।
ঠিক তখনই অনন্যার মোবাইল বেজে উঠল।
সোমনাথের ফোন।

ফোন ধরে অনন্যা বলল, “বৃষ্টিতে আটকে

গিয়েছি।”

“এখানেও প্রবল জোরে হচ্ছে। থামলে এসো। এত ব্যস্তিতে ছেলেমেয়েরা আসতে পারবে না।”

“তা হলে কি যাব?”

“নিশ্চয়ই। বৃষ্টি কমলে ওরা পিলপিল করে এসে হাজির হবে।”

ফোন ছাড়ল অনন্যা। ঝাঁকের মাথায় সোমনাথের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে বটে। কিন্তু কতদিন এই কাজ করতে পারবে? প্রদীপ্তর উপরে রাগ হল। প্রদীপ্ত চাপাচাপি না করলে ও কিছুতেই সোমনাথের প্রস্তাবে সায় দিত না। নিজে এখন মুর্শিদাবাদে বসে মজা করছে। এদিকে অনন্যাকে ছুটির দিন সব কাজ ফেলে ছুটতে হবে যাদবপুর।

অনন্যা চাকরি করে এক পাবলিক রিলেশনস এজেন্সিতে। কোম্পানিটা মাঝারি ধরনের। সপ্তাহে ছ’দিন কাজের চাপ। রবিবার ছুটি। তবু এক-একদিন বেরোতে হয়। মুর্শিদাবাদ থেকে প্রদীপ্ত এসে হাজির হয় মাসে একবার। বাকি সময় ও একা। আগে মা বিয়ের জন্য জোরাজুরি করতেন। দাদা-বৌদির কোমলগরের বাড়িতে গেলে অনেক কথা বলতেন। বছরখানেক ধরে কিছু বলেন না। বোধ হয় হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বুঝেছেন, ও আর প্রদীপ্ত কোনওদিন বিয়ে করবে না।

ছুটির দিন প্রদীপ্তর সঙ্গে অনেকক্ষণ ফোনে আড্ডা দেয় অনন্যা। লেখালিখি করে। বইপত্র পড়ে। ঘরদোর গোছায়। প্রদীপ্ত এলে অবশ্য অন্য কথা। খুব কাজ না থাকলে ছুটি নিয়ে নেয় অনন্যা। তখন নাটক দেখা, যাদবপুর কফি হাউসে আড্ডা, কাছেপিঠে কোথাও ঘুরতে যাওয়া— এই সব হয়।

মাসখানেক আগে তেমনই এক আড্ডায় সোমনাথ প্রস্তাবটা দিল।

সেদিন কথা হচ্ছিল রবিবার নিয়ে। কার রবিবার কেমন কাটে। অনন্যা বলে ফেলেছিল, “ধূর, রবিবারের চেয়ে কাজের দিনই ভাল। রবিবার একা একা থাকতে হয়। প্রদীপ্ত তো আসে মাসে একবার।”

“দুটো রবিবার আমাকে দাও না।” পাশ থেকে বলে উঠেছিল সোমনাথ।

অনন্যা ফিক করে হেসে বলেছিল, “প্রেম করবে?”

“সেই কপাল কি আর করেছে! মাঝখানে প্রদীপ্ত হাইফেন আছে। আমি বলছিলাম, আমার স্কুলের জন্য।”

“ছাত্র পড়াবে?” জোরে হেসে ফেলেছিল অনন্যা, “কোনওদিন টিউশনই করিনি। এই বড়ো বয়সে তোমার কোচিং সেন্টারে পড়াতে যাবে? কী ক্লাস করাবে? কবিতার?”

“আরে নাহ,” সোমনাথ ঘাড় নেড়েছিল, “আমরা কয়েকজন মিলে আন্ডার প্রিন্সিপলেজড বাচ্চাদের নিয়ে একটা স্কুল করি। কারও বাবা হয়তো ভ্যান চালায়। কারও মা

পরের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করে। এমনও পরিবার আছে, যার মূল পেশা হল চোলাই মদ বিক্রি। সেই বাচ্চাদের বেশির ভাগ স্কুল ড্রপ আউট। কিংবা মিড-ডে মিল খেতে যায়। তাদের পড়াই। বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক। স্কুলের পড়া নয়। বেসিক এডুকেশন। রবিবার আর বুধবার ক্লাস। আমাদের একজন বাংলার দিদিমণির প্রয়োজন। তুমি করলে ভাল হয়।”

সোমনাথের প্রস্তাব শুনে স্রেফ হাঁ হয়ে গিয়েছিল অনন্যা। প্রথমত, সোমনাথকে চিরকালই খ্যাপা, উদনচণ্ডী হিসেবে ও চেনে। প্রদীপ্তর কাছে শুনেছে, সোমনাথের বাবা-ঠাকুরদার বিরাট সম্পত্তি। ওর চাকরি কিংবা অন্য রোজগার না করলেও চলে। শুধু কবিতা লিখে দিন কাটায়। সেই মানুষ যে এমন কাজ করে চলেছে, অনন্যার ধারণা ছিল না।

ও পাশে বসে একটা পত্রিকার পাটা ওল্টাচ্ছিল অগ্নিভদা। প্রবীণ মানুষ। সদ্য রিটায়ার করেছেন। তিনিও বলে উঠেছিলেন, “যেতে পারো অনন্যা। আমি থাকি সেই বেহালায়। শরীরও আজকাল ভাল যাচ্ছে না। না হলে আমিও যেতাম।”

“কিন্তু... আমি কোনওদিন পড়াইনি...”

“সে তো এক সময় কবিতাও লিখতে না। তাতে কি এখন লেখা আটকাচ্ছে? এটা সোশ্যাল কমিউমেন্ট,” সোমনাথ যুক্তি দিয়েছিল।

শেষ কথাগুলোয় এমন কিছু ছিল যে অনন্যা প্রতিরোধ করতে পারল না। প্রদীপ্তও পাশ থেকে বলেছিল, “যা না। শুধু সোমনাথ নয়, বাচ্চাগুলোরও ভাল হবে। একেবারে যদি না পারিস তখন আর যাবি না।”

রাজি হয়েছিল অনন্যা। সেই ক্লাস নিতে যাওয়ার আজ প্রথম দিন। আজ বিকেলেই তুমুল বৃষ্টি। আকাশের দিকে তাকাল অনন্যা। একবার ঠিক করল জামাকাপড় পালটে ফেলবে। পরের দিকে বৃষ্টি ধরলে ইন্দিরার ফ্ল্যাটে যাওয়া যাবে। সোমনাথের স্কুলে যাওয়া আজ অসম্ভব।

কিন্তু বৃষ্টি যেমন ছুট করে এসেছিল, তেমন ছুট করেই থেমে গেল। অনন্যা ফ্ল্যাটের জানলা থেকে বাইরে হাত বাড়িয়ে দেখল, ঝিরঝির করে পড়ছে। অনায়াসে বেরিয়ে পড়া যায়। ছাত্র মাথায় ও বেরিয়ে পড়ল।

গলি থেকে কয়েক পা গেলে গড়িয়াহাট রোড। সেখানে অটো পেয়ে গেল। যাদবপুর এইট বি বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছোতে লাগল মিনিট পনেরো। সোমনাথ আগেই ঠিকানা বলে দিয়েছিল। ল্যান্ডমার্ক, রামঠাকুরের আশ্রম। স্কুলে পৌঁছোতে ওর বেশি সময় লাগল না।

নামেই স্কুল। আসলে বুরবুরে চারতলা বাড়ির নীচের তলার ফ্ল্যাট। বসার ব্যবস্থাও মাটিতে। সেখানে গোটা তিরিশ ছেলেমেয়ে বসে। সবার হাতে সস্তা দামের কেক। খাচ্ছে। অনন্যাকে দেখে সোমনাথ হইহই করে এগিয়ে

এল। বলল, “চা খাবে?”

ঘাড় কাত করল অনন্যা। ছোট কাগজের কাপে লেবু চা এল। সঙ্গে বিস্কুট। অনন্যা অল্প চুমুক দিয়ে চা শেষ করল। ততক্ষণে চারপাশ জরিপ করে নিল। ঘরটায় বিশেষ কিছু নেই। প্রায় ফাঁকা। তবে বেশ পরিষ্কার। মাটিতে শতরঞ্চি পাতা। ছেলেমেয়েদের চেহারা দেখলে মায়ী হয়। বোঝা যায়, বেশ গরিব পরিবারের।

সোমনাথ বলল, “তোমার কথা ওদের আগেই বলেছি। এসো, পরিচয় করিয়ে দিই।”

এগিয়ে গেল অনন্যা। বসল শতরঞ্চিতে।

সোমনাথ বক্তৃতার ঢঙে বলল, “তোদের তো বলেছি নতুন দিদিমণির কথা। আজ এত বাড়-বৃষ্টির মধ্যেও সেই দিদিমণি এসেছেন। তিনি তোদের বাংলা পড়ানেন। অন্য যে দিদিমণি আছেন, চন্দ্রাণী, তিনি পড়ানেন ইংরেজি।”

ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে পড়ল অনন্যা। প্রথমে ওদের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করল। তারপর ওদের একটা লেখা লিখতে দিল। ‘বৃষ্টির দিন’। বলল, “কুড়ি মিনিট সময় দিচ্ছি। যা পারবে লিখে দেখাও।”

ছেলেমেয়েরা পরস্পরের দিকে তাকাল।

খাতা খুলে মাথা নিচু করে লিখতে বসল। মিনিট দশেক পর অনন্যা খেয়াল করল, কেউ কিছু লিখছে না। বড় জোর এক লাইন কিংবা দু’ লাইন। সেই লেখাও হিজিবিজি।

অবাক হয়ে ও প্রশ্ন করল, “কোনও অসুবিধে হচ্ছে?”

সবাই নিরুত্তর।

পাশে বসা একটা মেয়ের খাতা টেনে নিল অনন্যা। দেখল সেখানে কেবল লেখা, ‘বিশটি আঁমাড় ভাল লেগে...’

অনন্যা জানতে চাইল, “আর লেখোনি কেন?”

মেয়েটা চুপ।

অনন্যা ফের প্রশ্ন করল, “কোন ক্লাসে পড়ো?”

“ক্লাস সেভেন।”

“স্কুলে বাংলা পড়ো না।”

ঘাড় কাত করল মেয়েটা। পড়ে।

“তোমার বাবা-মা কী করেন?”

“বাবা টোটো চালায়। মা বাড়ি বাড়ি কাজ করে,” নিচু স্বরে জবাব দিল মেয়েটা।

“কারও কাছে বাংলা পড়ো?”

এবারও অল্প ঘাড় নাড়ল মেয়েটা।

“কার কাছে?” অনন্যার জেদ চেপে গেল।

“আমার বাড়ির কাছে... প্রীতমস্যার...”

স্তুভিত হয়ে বসে থাকল অনন্যা। বাকি খাতাগুলো টেনে নিল। দেখল, সব খাতার দশা এক। কেউ লিখেছে, ‘একোল থেকে ফেড়ার শময়।’

কেউ বা, ‘সকালে ওঠি মা বাড়ি জল।’

সাদা পাতায় লেখা অক্ষরগুলোর দিকে

তাকিয়ে শিউরে উঠল অনন্যা। সোমনাথ বাইরে কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলছিল। সেদিকে চেয়ে ও চূপ করে বসে থাকল। একবার তাকাল ছেলেমেয়েগুলোর দিকে। ছেলেমেয়েগুলোর চোখে অসহায়তা। অপরাধবোধ। অনন্যার খুব খারাপ লাগল। একটু ধাতস্থ হয়ে ও নানা প্রশ্ন করতে থাকল। জানতে পারল, স্কুলে পড়ার পাশাপাশি সবাই দু’-তিনজন করে শিক্ষকের কাছে টিউশন পড়ছে। এবং স্কুলে মোটামুটি নম্বর পেয়ে পাশও করে যাচ্ছে।

অনন্যা এবার ওদের একজনের স্কুলের বই টেনে নিল। সেখান থেকে একটা গল্প পড়ে শোনাতে লাগল। হাসির গল্প। অল্পক্ষণের মধ্যে ছেলেমেয়েরা মজে গেল। ওদের ব্যবহারও সহজ হল। এভাবে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে ও উঠে পড়ল। ছেলেমেয়েদের চেহারা তখন স্বস্তি।

অনন্যা পড়ানো শেষ করতেই আর একটা ছেলে এগিয়ে এল। বলল, “আমার নাম অচিন্ত্য। সোমনাথদার সঙ্গে আমরা কয়েকজনও আছি। আপনি এসেছেন জেনে ভাল লাগল। এই সব কাজে সবাইকে পাওয়া যায় না।”

অনন্যা হাসল। শুধু বলল, “সোমনাথ কোথায়?”

“পাশের ঘরে। আপনি চা খাবেন?”

“নাহ। আর খাব না। শুধু সোমনাথের সঙ্গে কথা বলব।”

অচিন্ত্য ঘাড় নাড়ল। ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে বলল, “তোরা যাস না। কয়েকটা কথা বলার আছে।”

অনন্যা এল পাশের ঘরে। এই ঘরে তিন-চারটে চেয়ার আর একটা টেবিল রয়েছে। টেবিলের সামনের চেয়ারে সোমনাথ বসে। কিছু লিখছে।

অনন্যাকে দেখে মিটিমিটি হেসে বলল, “এসো কবি, এসো। কেমন হল প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা?”

কিছুক্ষণ কোনও উত্তর দিতে পারল না ও। শেষে বলল, “ভয়ঙ্কর।”

সোমনাথ হেসে বলল, “এরাই তোমার কবিতার আগামীদিনের পাঠক।”

অনন্যা আর থাকতে পারল না। যে কথাগুলো ওখানে বলতে পারেনি সেটা এবার বেরিয়ে এল। ও বলল, “এসব কী সোমনাথ?”

“বললাম তো, এরাই তোমার কবিতার পাঠক হতে চলেছে।”

“ছেলেমেয়েগুলো সবাই বাংলা মিডিয়ামে পড়ছে। অথচ সামান্য একটা বাক্য বাংলায় লিখতে পারছে না!”

“শুধু যাদবপুরে কয়েকজনকে দেখলে। সারা বাংলায় এমন বাচ্চা হাজার হাজার। হয়তো কয়েক লক্ষ,” সোমনাথ বলল, “এখন এদের নিয়ে কাজ করছি।”

“এই অবস্থা কেন?”

“ওদের কেউ লেখাপড়া শেখাচ্ছে না।

স্কুলে যায় মিড-ডে মিলের জন্য। আর প্রাইভেট টিউশন? সেখানে তো পোয়া বারো পরিস্থিতি। প্রথমত, পাশ ফেল প্রায় উঠে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই সব বাচ্চার বাবা-মায়েরা তেমন লেখাপড়া জানে না। প্রাইভেট টিউটররা তার পুরো ফায়দা তুলছে। যেহেতু ফেল করার প্রশ্ন ওঠে না, তাই না শেখালেও চলছে। যখন রোগ ধরা পড়ে, এই ধরো মাধ্যমিক কিংবা আরও পরে, তখন ক্লাস ফাইভ-সিক্সের শিক্ষককে কে ধরবে?”

“বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তো ছিনিমিনি চলছে! যে-ভাষায় দু’ বেলো কথা বলছে, সেই ভাষা যদি না জানতে পারে, তা হলে বাকি বিষয়গুলোর কী হবে?”

“সেই ক্লাসগুলো আরও ভয়ঙ্কর।

কোনওদিন দেখলে টের পাবে। তবে বেশিদিন এখানে শেখাতে পারব না।”

“কেন?”

“বুঝতে পারছ না? এই ক্লাস চালু করার পর প্রাইভেট টিউটরদের বিপদ শুরু হয়েছে। এখন তারা সবাই গিয়ে ওই বাবা-মায়েরদের বোঝাচ্ছে, আমরা ভুল শেখাচ্ছি। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছি। অনেক বাবা-মা ওদের বিশ্বাস করে ছেলেমেয়েদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার উপর পলিটিক্যাল প্রেশার তো আছেই। সেটা ওই সব টিউটরদের জন্য।”

“বলো কী!”

“হ্যাঁ, এই হল পরিস্থিতি।”

“এটা কার ফ্ল্যাট?”

“স্থানীয় এক ভদ্রলোকের। প্রেশারটা এসেছে তাঁর উপরে। ক্লাস বন্ধ করতে হবে।”

“কী করবে?”

“দেখি,” দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোমনাথ বলল, “নতুন জায়গা খুঁজতে হবে। মুশকিল হল, এখানে এক-এক জায়গায় যা ভাড়া, সেটা আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু তো পড়ানো নয়, প্রতিদিন ছেলেমেয়েগুলোর জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়।”

সোমনাথদের স্কুল থেকে বেরিয়ে এল অনন্যা। বৃষ্টি আর হচ্ছে না। ভেজা হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকেই। ছেলেমেয়েগুলোর কথা ভাবতে-ভাবতে ও এসে পৌঁছল যাদবপুর এইট বি বাসস্টপে। তখন খেয়াল হল, ইন্দিরার জন্য কিছু নেওয়া হয়নি। সকাল থেকে এই ক্লাস নিয়ে টেনশন ছিল। ইন্দিরার জন্য যে কিছু নিতে হবে, সেটা মাথায় আসেনি। নেওয়া তো দরকার। অন্তত টিনটিনের জন্য। পাঁচ বছর বাদে দেখা হবে। ছেলেটাকে অন্নপ্রাশনের পর প্রথমবার দেখবে।

এপাশ ওপাশ তাকিয়ে অনন্যা মিষ্টির দোকান থেকে পাঁচশো টাকার মিষ্টি কিনল। কলেজে থাকতে ইন্দিরার মিষ্টি খাওয়ার নেশা। টপাটপ রসগোল্লা মুখে ফেলত। শুধু

মিষ্টি কিনে অনন্যার মন ভরল না। আরও কিছু কিনতে হবে। অন্তত এক বাস্ক চকোলেট। হঠাৎ বইয়ের দোকান ওর চোখে পড়ল। অনন্যা সেখানে গিয়ে ছোটদের কী কী বই আছে জানতে চাইল।

দোকানদার ভদ্রলোক কয়েকটা বই দেখালেন। বেশির ভাগ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়ের বই। এ ছাড়া আছে কয়েকটা ভূতের গল্পের বই। অনন্যা এক কপি টুনটুনির বই কিনল। টাকা মিটিয়ে মোবাইল অ্যাপ থেকে গাড়ি বুক করল।

ইন্দিরার ফ্ল্যাটের সামনে এসে যখন ডোরবেল বাজল, তখন ঘড়িতে আটটা পঁচিশ। দরজা খুলল ইন্দিরাই। কতদিন পর দেখা! ইন্দিরা বলল, “আয়। আমি তো দেরি হচ্ছে দেখে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।”

“যা বৃষ্টি!” ফ্ল্যাটে ঢুকে জুতো ছাড়তে ছাড়তে বলল অনন্যা।

“সে তো বিকেলে।”

“বেরিয়েছিলাম একটা কাজে। সেটা সেরে আসছি।”

ফ্ল্যাটে ঢুকে চারপাশ তাকাল অনন্যা। ভারী সুন্দর করে পুরো ফ্ল্যাট সাজিয়েছে ইন্দিরা। পোড়ামাটির জিনিস দিয়ে। এক পাশে চশমা চোখে টিনটিন বসে। ল্যাপটপের সামনে। ভিড়ায়ো গেম খেলছে।

“তাপসদাকে দেখছি না?” অনন্যা প্রশ্ন করল।

“এসে পড়বে। গিয়েছে কয়েকটা জিনিস কিনতে। কাল সকালে ও আবার বেরিয়ে পড়বে।”

অনন্যা মিষ্টির প্যাকেট এগিয়ে দিল ইন্দিরার দিকে। বলল, “এটা তোর জন্য।”

ইন্দিরা হেসে ফেলল। বলল, “এখন আর আগের মতো মিষ্টি খাই না। ডায়েট করছি। তোর হাতে ওটা কী?”

“বইয়ের প্যাকেট। টিনটিনবাবুর জন্য এনেছি,” অনন্যা প্যাকেট থেকে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বই বের করল। ইন্দিরা বইটা হাতে নিল। বলল, “আনলি ঠিকই। কিন্তু টিনটিন তো বাংলা পড়তে পারে না।”

“কেন?”

“ওর ফার্স্ট ল্যান্ডুয়েজ ইংলিশ। সেকেন্ড ল্যান্ডুয়েজ ফ্রেঞ্চ। পরে অবশ্য থার্ড ল্যান্ডুয়েজ আছে। একটু উঁচু ক্লাসে। তখন ভাবছি হিন্দি নিতে বলব।”

অনন্যা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। পারল না। ওর মনে পড়ল, ইন্দিরা ছিল বাংলা অনার্সের ছাত্রী। শেষে ও বলল, “তুই পড়ে শোনাস।”

“আমি তাই চাই। তাপস বাধা দেয়। বলে, ‘সারাদিন বাড়িতে বাংলা বলে চলেছি। এর পর বাংলা গল্প শোনাতে ছেলে ইংরেজিতে ভাবতে পারবে না।’”

দু’জনে সোফার সামনে এসে পড়ল।
অনন্যা গিয়ে বসল। ইন্দিরা রান্নাঘর থেকে চট
করে শরবত আনতে গেল।

অনন্যা চুপ করে তাকিয়ে থাকল। জানলা
দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। জানলার ধারে
বসে টিনটিন। এক মনে খেলে যাচ্ছে। বাড়িতে
যে একজন এসেছে সে দিকে ফ্রফ্রপ নেই।

ইন্দিরা চলে এল ট্রে হাতে। তাতে
শরবতের গ্লাস। সেটা তুলে নিয়ে অনন্যা চুমুক
দিল। বলল, “আচ্ছিস কেমন?”

“এমনি তো ভালই।”

অনন্যা জানে, ইন্দিরার মা মারা গিয়েছে
তিন বছর আগে। তাই জানতে চাইল, “কাকু
কেমন আছেন?”

“বাবা থাকে দাদার কাছে। আছে ভালই।
সব কিছু দাদাকে লিখে দিল। আমি মেয়ে।
আমি তো আর মুখাণ্ডি করব না। করবে ছেলে।
ছেলেই বাবার সব। মেয়ে ফালতু।” ইন্দিরা
গম্ভীর গলায় বলল। তারপর টিনটিনের দিকে
হাঁক দিল, “টাইম আপ। আর খেলবে না।
ম্যাথস নিয়ে বসবে। এদিকে এসো। একজন
আন্টি এসেছে। এই আন্টি আমার বেস্ট
ফ্রেন্ড।”

টিনটিন একবার শুধু মাথা নাড়ল। তাকাল
না। খেলাও থামাল না।

অনন্যা বলল, “তোর শ্বশুরবাড়ি
বারাসতের দিকে না? তার কী খবর?”

“বারাসতেই,” ইন্দিরা মাথা নাড়ল, “আমি
খবর রাখি না। তাপসও খুব একটা বাবা-
মায়ের ন্যাওটা নয়।”

“কেন?”

“সে অনেক ব্যাপার। ফ্যামিলি পলিটিক্স।
তোর খবর কী? প্রদীপ্ত আর তুই কি সারা
জীবন এভাবে কাটাবি?”

“আপাতত তাই ঠিক করেছি।”

“কীভাবে পারিস বাবা? বিয়ে করতে
কী অসুবিধে? সেই তো বর-বোয়ের মতো

থাকিস।”

“আমাদের নিজস্ব স্পেসের প্রয়োজন।
বিয়ে করলে সেটা থাকবে না।”

“তোদের ঠিক বুঝি না!”

ডোরবেলের শব্দ। ইন্দিরা গিয়ে দরজা
খুলতেই গোল গলা টি-শার্ট আর বারমুডা
পরা তাপসদা ঢুকল। হাতে বাজারের থলে।
অনন্যার দিকে চোখ পড়তে বলল, “হ্যালো
ডায়ার। কেমন আছ?”

“ভাল। আপনি?”

“আমিও ভাল। তোমার বন্ধু কি নতুন
ফ্ল্যাট ঘুরিয়ে দেখিয়েছে?”

“এই তো মেয়েটা এল। শরবতও শেষ
করতে পারেনি,” ইন্দিরা বলল।

তাপসদা দরজা আটকাল। বাজারের থলে
রেখে বলল, “খেতে খেতে দেখবে। এসো।”

অগত্যা অনন্যা উঠে পড়ল। তাপসদা
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব ঘর দেখাল। বাথরুম পর্যন্ত।
জানাল কী কী মেটিরিয়াল দিয়ে কোন কোন
জিনিস তৈরি। কীভাবে সে নিজে ঘুরে ঘুরে
এক-একটা জিনিস জোগাড় করেছে।

শোওয়ার ঘরের লাগোয়া ছোট বারান্দা।
সেখানে দাঁড়িয়ে তাপসদা গর্ব করে বলল,

“সবাই প্রোমোটোরের হাতে সব ছেড়ে দেয়।

আমি সে বান্দা নই। বারাসতের বাড়ির

দোতলা এক সময় নিজে হাতে তুলেছি।

আমাকে ঠাকানো সহজ নয়। কোথায় মোটা
দানার বালি দিতে হয়, কোথায় সরু দানার,
কোন টাইলস কেমন, রান্নাঘরের চিমনি কোন
কোম্পানির ভাল— সব আমার জানা। এই
যে ল্যাম্পশেড দেখছ, সব এজরা স্ট্রিটে গিয়ে
কিনে এনেছি।”

ইন্দিরার বাড়ি থেকে যখন নিজের ফ্ল্যাটে
ফিরল অনন্যা, তখন সাড়ে এগারোটা বাজে।
বাইরে ঝিমঝিমে রাত। প্রচুর খাইয়েছে
ইন্দিরা। সেই সঙ্গে সারাক্ষণ তাপসদা বকবক

করে গিয়েছে। ইন্দিরার সঙ্গে আলাদা করে
কথা বলার সুযোগই হয়নি। টিনটিনও ছাড়া
ছাড়া। কেবল গেমস, নিজের প্রোজেক্ট এই
সব নিয়ে থাকল। ইন্দিরাও কি আগের মতো
আছে? পাঁচ বছরে কেমন বদলে গিয়েছে।

জামাকাপড় পালটে অনন্যা গিয়ে বসল
টেবিলে। দীর্ঘদিনের অভ্যেস রাতের দিকে
লিখতে বস। আজও তাই বসল। কিন্তু সঙ্গে
থেকে যা গেল, তাতে এক লাইনও মাথায়
এল না। অথচ সামনের সপ্তাহের মধ্যে দুটো
কাব্যগ্রন্থের আলোচনা জমা দিতে হবে। চুপ
করে ল্যাপটপের সাদা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে
থাকল অনন্যা। সাদা পর্দায় নানা মুখ। বিকেলে
দেখা ছেলেমেয়েদের মুখ। সোমনাথের মুখ।
ইন্দিরা-টিনটিনের মুখ। বেরোনোর সময় ও
দেখেছে, উপেন্দ্রকিশোরের বই কাচের সেন্টার
টেবিলে নির্জীব ভাবে পড়ে। তিনজনের
একজনও বইটা তুলে দেখেনি।

যে দুটো কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা লিখতে
হবে, দুটোই টেবিলের এক পাশে রাখা। বই
দুটো তুলে অনন্যা নাড়াচাড়া করল। হঠাৎ
ওর মনে হল, আদৌ কি এই সব কাব্যগ্রন্থের
কোনও মূল্য আছে? কী হবে নিজেকে নিঃস্ব
করে রাতের পর রাত জেগে কবিতা কিংবা এই
সব আলোচনা লিখে?

চুপ করে খানিকক্ষণ বসে থাকল অনন্যা।
প্রদীপ্তকে ফোন করতে ইচ্ছে করল। কিন্তু
প্রদীপ্ত এতক্ষণে কাজ নিয়ে বসে গিয়েছে।
ওকে বিরক্ত করার মানে হয় না। দিশেহারা
লাগল অনন্যার। শেষ পর্যন্ত ল্যাপটপ বন্ধ
করে উঠে দাঁড়াল। টেবিল ল্যাম্পের আলো
নিভিয়ে দিল। মোবাইল তুলে সোমনাথকে
মেসেজ করল: ‘আমি ঠিক করেছি, দুটো
রবিবার নয়, মাসের সব রবিবারই তোমার
স্কুলে পড়তে যাব।’

অঙ্কন: কুনাল বর্মণ





মৃগয়া

সা য় ম ব ন্দ্য পা ধ্যা য়

দিন ছাই হয়ে নামে সন্ধে। রৌদ্রকরতপ্ত
এক-একটি দিনের ছাই। অথবা
সমুদ্রের ভিতর থেকে খণ্ড-খণ্ড আঁধার
উঠে আসে, আকাশ ঢেকে দেয়, বাতাসে মিশে
যায়। তারপর আবার, ঝরে-ঝরে পড়ে, ছড়িয়ে
যায় আবহাওয়ায়, প্রাণের জীবনে, মাটিতে।

নক্ষত্ররা আঁধারখণ্ডে গর্ত খুঁড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে
পড়ে, যে-যার মতো। চাঁদ আঁধার ঠেলে-
ঠেলে বেরিয়ে আসে, যখন তার সময় হয়।
এখানে, এই সমুদ্র উপকূলে এসে থেকে, প্রতি
সাক্ষ্যলগ্নে তাতে নেন-এর মনে হয় এমনই সব
কথা। সে এখানে ঠিক তিনদিন আগে এসেছে

একটা কাজে, তার এ-যাবৎ জীবনের সবচেয়ে
গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাতে নেন ওর প্রকৃত নাম
নয়, ওর পরিচিত এক মিশরীয়র নাম।
মিশরীয়টি মৃত। জীবিত তার নাম, তাতে নেন।
সন্ধে ছ'টা বেজে কিছু এগিয়েছে সময়।
সমুদ্র-নগরের একমাত্র পানশালার বাইরে

দাঁড়িয়ে আছে তাতেনেন। অদূরেই সমুদ্র। চেউয়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। প্রায়-নিভৃত সমুদ্র-নগর মাঝে-মাঝে যেন সমবেত ভাবে চুপ করে যাচ্ছে সে-আওয়াজ শুনতে, সে-আওয়াজ কানে নিয়ে আত্মস্থ করতে, শরীরের ভিতর চারিয়ে দিতে নিঃশ্বাসের মতো।

তাতেনেন পানশালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। লোকজন দেখে, তাদের রকমসকম দেখে। এ-অঞ্চলে সে প্রথম এল। অচেনা স্থানে নিজেকে সংলগ্ন করে নিতে সময় লাগে, কিন্তু যে-কাজ তাকে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য সময় নেই বেশি। নির্দেশ আছে, যত দ্রুত করা যায় করতে। তিনদিন চলে গিয়েছে, হয়নি এখনও। তাগাদা আসছে প্রতিনিয়ত এখন, প্রতিনিধি মারফত। যতটা গুরুত্বপূর্ণ সে-কাজ, ততটাই গোপন।

যেদিন থেকে সে এখানে এসেছে, প্রতিদিন একই সময়ে তাতেনেন উপস্থিত হয়েছে এ-পানশালায়। তার কাজের কেন্দ্রবিন্দু, লক্ষ্য পানশালাটি। উপনিবেশিক সময়ের পানশালা, দেড়শো বছর পেরিয়েছে বয়স। সাইনবোর্ডে সাদা আর লাল আলোয় দপদপ করে জ্বলছে পানশালার নাম, ‘কুসুমাকুরা’, পাশে ছোট অক্ষরে রং দিয়ে লেখা, ‘ইএসটিডি, ১৮২৪’।

ভিতরে এতক্ষণে নিশ্চয়ই গান শুরু হয়েছে, লাইভ মিউজিক। বাইরে, প্রবেশদ্বারের পাশে বিজ্ঞাপিতই আছে—‘লাইভ মিউজিক, এভরিডে সিঙ্গ পিএম অনওয়ার্ডস’। আগের কয়েকদিন, ছ’টার পর ঢুকে, তাতেনেন দেখেছিল শো শুরু হয়ে গিয়েছে। লোকজনও আছে বেশ, সঙ্গে এগোনোর সঙ্গে-সঙ্গে সমাবেশ বাড়ছে। হাতে গ্লাস বা বোতল নিয়ে, যে-যার মতো জায়গা খুঁজে বসে আছে। ধূমপান করছে কেউ। আর প্রত্যেকেই তাকিয়ে আছে যিনি গান করছেন, তাঁর দিকে। শ্রোতারা প্রত্যেকেই কেমন অভিব্যক্তিহীন, তাদের যেন রোজ আসতে বাধ্য করে কেউ তাই তারা আসছে, না-হলে আসত না। বাধ্যতা থেকে অভ্যেসে পরিণত হয়েছে পানশালায় আসা, হাতে মদের গ্লাস বা বোতল নিয়ে ধূমপান করা, গান শোনা। এক-একটি গান শেষ হলে, তারা যন্ত্রের মতো হাততালি দিচ্ছে। এও এক অভ্যেস, ভাল লাগল বা লাগল না, তাতে কিছু যায় আসে না আর। গায়কও তেমনই যন্ত্রের মতো গেয়ে যাচ্ছেন, তাঁর মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। তিনি এখানে পারফর্ম করতে পেরে বা শ্রোতাদের স্বীকৃতিতে খুশি হচ্ছেন, না তাঁকে জীবিকার স্বার্থে বাধ্য হয়ে প্রতিদিন গেয়ে যেতে হচ্ছে, গেয়ে যেতে হয় বলে দায়সারা ভাবে তা করছেন, এসবের কিছুই তাঁকে দেখে বোঝা

যাচ্ছে না। চালিত যেন তিনি।

একদিকে ভাল, তাতেনেন ভাবে। এতে প্রফেশনালিজম বজায় রাখা যায়। যেমন সে নিজেও রাখছে। এখানে যে-কাজের জন্য সে এসেছে, তা অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে সম্পাদন করতে হবে। কাজ করতে গিয়ে বা তার আগে-পরে, নিজের শরীরী ভাষায় কোনওরকম উত্তেজনা প্রদর্শন করলে চলবে না, পরিবর্তন আনলে চলবে না। সেও চালিত।

তাতেনেন ঢুকল কুসুমাকুরায়। নাকে এল যে-কোনও পানশালার পরিচিত গন্ধ। মানুষের নিঃশ্বাস, শরীরী উৎসারণ, মদ, তামাকপোড়া—এই সমস্ত উপকরণ দিয়ে তৈরি সে-গন্ধ। তাতেনেন জানে, এ-গন্ধের স্বতন্ত্র এক আবেশ আছে, এক আবেদন আছে।

কুসুমাকুরায় তিনদিন এসে তাতেনেন লক্ষ্য করেছিল—লক্ষ্য করা, লক্ষ্য রাখা তার অন্যতম কাজ, প্রধানতম শর্ত—যারা আসছে, তারা সকলেই একে অপরকে চেনে। ছোট এলাকা, সমুদ্র-নগর, অধিবাসী হাতেগোনা। এটাই স্বাভাবিক। পর্যটকদের কতজনই বা পানশালায় রোজ আসবে। তাতেনেন-এর কাজের সুবিধেই এতে, কম লোকজনের মধ্যে থেকে তার নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করতে সুবিধে হবে। তবে, প্রবেশমাত্রই আজ একটা পরিবর্তন দেখছে সে। গায়ক পাণ্টেছে। বিগত তিনদিন ছিলেন একজন পুরুষ—মধ্যবয়সি, সাহেবি পোশাক, মাথায় টুপি, চুলগুলো লম্বা-লম্বা, ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে, হাতে গিটার। আজ একজন নারী—যুবতী, চুল তুলে বাঁধা, পরনে স্লিভলেস কালো ড্রেস, হাটু পর্যন্ত। যুবতীর উন্মুক্ত বাহু আর পা মুহূর্তে চোখ টেনে নিল তাতেনেন-এর।

পুরুষ গায়ক ছিলেন একক। এই যুবতী একা নন, তাঁর সঙ্গত আছে, একজন অল্পবয়সি পুরুষ ভায়োলিনিস্ট। গান চলছে। যুবতীর কণ্ঠে ভগ্নতার, নিঃসঙ্গতার আবরণ। গানের শব্দগুলির একখণ্ড এল তাতেনেন-এর কানে—

Run, run my little one
Run out to sea
Run, run my little one
What do you seek?

বার কাউন্টারের লোকটির সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল তাতেনেন-এর। লোকটির নাম লুই। তাতেনেনকে দেখে লুই জিজ্ঞেস করল আগের দিনের মতোই ড্রিংক দেবে কিনা। তাতেনেন সম্মতি জানাল। তারপর, লুইয়ের একটু কাছ ঘেঁষে, যুবতী গায়িকার দিকে চোখের ইশারা করল, “কে?”

লুই ড্রিংক বানাতে-বানাতেই হেসে উত্তর দিল, “কোস্টা রিকা, রক সিঙ্গার। ভাল কাজ করছে অন্য জায়গায়। এখানে আজ এসেছে, আগামী তিন মাসের কনট্রাক্টে।”

“আর যিনি গাইছিলেন এই ক’দিন?”—প্রশ্নটা করেই তাতেনেন বুঝতে পারল, পুরুষ গায়কের নাম সে জিজ্ঞেস করেনি তিনদিনে। প্রয়োজন বোধ হয়নি। পুরুষ বলেই হয়তো।

“কে ডি সুজা। গতকালই গুঁর শেষদিন ছিল এখানে, উনি আবার অন্য কোথাও অন্য কোনওখানে যাবেন, বলে যাননি।”

“ও। আচ্ছা,” তাতেনেন শোনে, আর কোনও প্রশ্ন করে না।

ড্রিংক এসে গিয়েছে। দাঁহিকিরি—হোয়াইট রাম, লেবুর রস দিয়ে তৈরি। চুমুক দিল তাতেনেন। বসল না কোথাও সে, বার কাউন্টার থেকে একটু সরে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

কোস্টা রিকা গাইছে—

If you were his eyes
If you were his dreams
The whole of the sky could not
contain you

তাতেনেন দেখছে কোস্টা রিকার বাহু, বাহুমূল। বাহুমূল থেকে নীচের উন্মুক্ত অংশে স্তনের আভাস পর্যন্ত তার শরীর টেনে নিচ্ছে তাতেনেন-এর দৃষ্টি। কোস্টা রিকার পায়ের আকার, গঠনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে তাতেনেন।

ঠোঁটে তখন গ্লাসের কানা স্থির হয়ে স্থাপিত, পরের চুমুক নেওয়া হয়নি। তাতেনেন তাকিয়ে কোস্টা রিকার দিকে, তার শরীরের দিকে। চোখ সরাতে পারছে না সে। আর ঠিক তখনই, তখনই, তাতেনেন-এর দৃষ্টির পরিধিতে চলে এলেন তিনিও—এতদিন যাঁর নাগাল পেতে, সন্ধান করতে-করতে এই সমুদ্র-নগরে আসা, চূড়ান্ত সাবধানতা অবলম্বন করে যাঁকে সন্তপণে হত্যা করার নির্দেশ নিয়ে তাতেনেন এসেছে এখানে, সেই চারচেভা তারই সামনে, অল্প কিছু দূরে বসে আছেন!

প্রখর গেরিলা যোদ্ধা ‘চারচেভা’। চারচেভা তার ছদ্মনাম হলেও গণপরিচায়ক নাম, এ-নামেই তাঁকে চেনে জনসাধারণ। এবং রাষ্ট্র তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে বিগত আট মাস। একদিন যখন গোপন সূত্রে খবর এসেছে চারচেভা ছদ্মবেশে আছেন এই সমুদ্র-নগরে, তখন পাঠানো হয়েছে তাতেনেন-এর মতো অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, দক্ষ হত্যাকারীকে। চারচেভা রাষ্ট্রতন্ত্র উপড়ে ফেলার ডাক দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে মেরে ফেলাই শ্রেয়। মেরে ফেলতেই হবে। রাষ্ট্রদ্রোহীকে কোনও রাষ্ট্র বেশিদিন প্রশ্রয়

দেয় না, ব্যতিক্রম হওয়া যেন লজ্জাজনক।

তাতেনেন-এর চোখ কোস্টা রিকার শরীর থেকে সরে গিয়েছে। তার ঠোঁটে ঈষৎ হাসির অনুপ্রবেশ। সে এখন দেখছে চারচেভাকে, দুর্দান্ত ছদ্মবেশ নিলেও ঘড়িটা বদলাতে ভুলেছেন তিনি। দু'হাত মাথার পিছনে করে বসেছেন তিনি। এই তো, ভালমতোই দেখা যাচ্ছে তাঁর ডান হাতে ঘড়ি পরা। ডান হাতেই চারচেভা ঘড়ি পরেন। মিলে যাচ্ছে সমস্ত তথ্যের সঙ্গে, তাতেনেন ঘড়ির যে-ছবি দেখেছিল তার সঙ্গেও। আর হ্যাঁ, চারচেভার ডান কনুইতে একটা বড় কাটা দাগ আছে, ছুরি ঢুকে গিয়েছিল বহু আগের একটা এনকাউন্টারে। সে-দাগও স্পষ্ট দৃশ্যমান।

তাতেনেন-এর চোখ গ্রাস করে নিচ্ছে চারচেভার উপস্থিতি, স্মৃতিতে স্থাপন করে নিচ্ছে। তার কানে আসছে ভায়োলিনের বয়ে চলা, কোস্টা রিকার কণ্ঠস্বর—

So run, run, run out to sea
Run my little one
Breathe a hymn for him
For thee.

তাতেনেন একটু এগোয়, চারচেভার দিকে।

দুই

তার প্রতি নির্দেশ ছিল চারচেভাকে দেখলেই মেরে ফেলার, যেভাবে হোক, যেখানে হোক। এই তার গোপন কাজ, তার এ-যাবৎ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাতেনেন দেখল, সে-আজ্ঞা পালন করতে গেলেও তাকে আর-একটু কাছে যেতে হবে চারচেভার। না-হলে, নিরীহ কেউ আহত হতে পারে, মরতে পারে। কোল্যাটরাল ড্যামেজ কাম্য নয় এ ক্ষেত্রে। তাতেনেন তাই এগোল, যতটা কাছে যাওয়া যায়।

চারচেভা বসেছিলেন কোস্টা রিকার দিকে মুখ করে। যে-গান গাইছিল এতক্ষণ কোস্টা রিকা, সেটি সবে শেষ হয়েছে। পরবর্তী গানে যাওয়ার উদ্যোগ হচ্ছে। স্বল্প বিরতি। গুঞ্জন, শ্রোতাদের কথার, বাক্যের।

তাতেনেন দেখছে, চারচেভার মুখে কোনও চিন্তা নেই। তিনি নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছেন এখানে, এই কুসুমাকুরায়। তাতেনেন-এর জানতে ইচ্ছে করছে, চারচেভা কি জানেন না তাঁকে খুঁজছে তাঁরই রাষ্ট্র, লোক লাগিয়েছে তাঁর সন্ধান? আর এখন, তাঁর পিছনেই দাঁড়িয়ে তাঁর আততায়ী, তাঁর মৃত্যুলাগ্ন উপস্থিত, এসবের কিছুই কি আন্দাজ করতে, বুঝতে পারছেন না? তাতেনেন ভাবে, হয়তো না, কিছুই জানেন না। বুঝতেও পারছেন না তাই চারচেভা। কেউই পারে না হয়তো

বুঝতে, জানতে, তাকে খতম করতে কে বা কারা উদ্যত হয়েছে, কোন শক্তি ঘনীভূত হচ্ছে। তাতেনেন-এর পিছনেও কি কেউ দাঁড়িয়ে আছে বা থাকবে কয়েকদিন পর?

এসব ভেবে মনকে দ্বিধাগ্রস্ত করার অবসর নেই। তাতেনেন যা করতে এসেছে, তা তাকে করতে হবে। হবেই। বিগত তিনদিন সে চারচেভার খোঁজে কুসুমাকুরায় উপস্থিত থেকেছে, যে-সময় থাকার কথা সে-সময়ই। তার কাছে যখন যেমন খবর আসছিল, সে তেমনই করেছে। চারচেভা সমুদ্র-নগরেই আছেন কয়েকমাস ধরে, গাঢ় ছদ্মবেশে। তবে শীঘ্রই অন্যত্র সরবেন, সম্ভবত সীমানা পেরিয়ে প্রতিবেশী দেশে। কুসুমাকুরায় তিনি আসবেন। আসেনও, সন্দের দিকে, গানবাজনা শুরু হলে। খবর সব এমনই ছিল। সেই অনুযায়ীই কাজ করেছে তাতেনেন। তার তরফে কোনও গাফিলতি নেই। থাকবেও না।

ভীষণ কাছাকাছি এসে পড়েছে সে চারচেভার, ঠিক তাঁর পিছনেই। সে এখন দেখতে পাচ্ছে, চারচেভাকে, সেই বিখ্যাত গেরিলা যোদ্ধাকে, যাঁকে নিয়ে নাকানিচোবানি খেয়েছে রাষ্ট্র। চারচেভা যতটা ক্ষমতালী, ততটাই ধুরন্ধর যোদ্ধা, নেতা। এদেশের প্রথম গেরিলা যোদ্ধা। তাঁর অনুগামী অসংখ্য। এবং তারা সকলে মন্ত্রবৎ শোনে তাঁর কথা। তাই তাঁর নাগাল পাওয়া, সন্ধান পাওয়া উত্তরোত্তর কঠিন হয়েছে। কেউই যেন তাঁর সম্পর্কে সঠিক খবরাখবর দিতে চায় না, বা ইচ্ছে করে ভ্রান্ত সংবাদ আর নির্দেশিকা দেয়। সকলেই যেন তাঁর লোক হয়ে গিয়েছে। তৈরি হয়ে গিয়েছে এক ব্যবস্থা, তাঁকে সুরক্ষিত রাখার। এরকম এক বলয় ভেদ করে তাঁর কাছে পৌঁছোনো মানে এক মিরাকল। তাতেনেন আপাতত সে-মিরাকলই করেছে, বলয় ভেদ হয়েছে। চারচেভা এখন তার পরিধির মধ্যে, আক্ষরিক অর্থে হাতের নাগালে। সুপ্রাচীন এক পদ্ধতির হাত ধরে তাতেনেন এই অবিস্বাস্য কাণ্ড ঘটিয়েছে— বিশ্বাসঘাতকতা। বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিতে সে বাধ্য করেছে চারচেভারই এক বিশ্বস্তজনকে। তাকে এমন প্রলোভিত করেছে ক্ষমতা আর অর্থ দিয়ে যে, ব্যক্তিটি সংযত রাখতে পারেনি নিজেকে, উগরে দিয়েছে সঠিক তথ্য, সঠিক সংবাদ— চারচেভার পানশালায় আসার কথা, আসার নির্দিষ্ট সময়। সে-সূত্র ধরেই এখন, এ-মুহুর্তে কুসুমাকুরায় চারচেভার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তাতেনেন।

চারচেভার পরনে সূতির ঢলঢলে সাদা রঙের ট্রাউজার্স, গায়ে একটা চামড়ার কালো জ্যাকেট, ভিতরে সাদা শার্ট। মাথায় টুপি, বেরে ধরনের। দাড়ি রেখেছেন তিনি অনেকটা। চোখে দিয়েছেন মোটা ফ্রেমের চশমা। তাতেনেন-এর কাছে খবর ছিল ‘গাঢ় ছদ্মবেশ’ নিয়েছেন চারচেভা, কিন্তু সে-

ছদ্মবেশ ঠিক কেমন হতে পারে, সে-ধারণা ছিল না কারও। তাতেনেন একটা ধারণা তৈরি করেছিল— চারচেভার প্রাপ্ত বিভিন্ন আলোকচিত্রের উপর নানা কন্সিনেশনে ছদ্মবেশ ঐকে নিয়ে। তার একটা কন্সিনেশন অনেকটা এমনই ছিল। তবে, চারচেভা এত ধুরন্ধর, প্রখর হয়েও ঘড়িটা এভাবে রেখে দিলেন কী করে বা কেন, এটাই আশ্চর্য লাগল তাতেনেন-এর। ভুল সকলেরই হয়, সকলের। সাবধানতা অবলম্বনেরও একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। এ হয়তো তাই-ই।

তাতেনেন ডান হাত ঢোকায় তার কোটের ভিতর-পকেটে, স্পর্শ করে সেখানে রাখা ওয়েবলি.৪৫। তারপর ডাকে, আলতো স্বরে, ‘মি. চারচেভা—’

যে-মুহুর্তে তাতেনেন ডাকল চারচেভাকে, তাতেনেনকে পিছন থেকে স্পর্শ করল কেউ, হাত রাখল তার পিঠে।

তিন

চকিতে, তাতেনেন পিছন ফিরল, চারচেভার দিক থেকে মুখ সরিয়ে। দেখল, কেউ নেই।

তা হলে কে স্পর্শ করল? কেউ করেনি, হয়তো সে নিজেই অনুভব করেছে স্পর্শ, অবদমিত কোনও আশঙ্কা থেকে। হয়তো বাতাস, বাতাস এরকম স্পর্শ করে থাকে মাঝে-মাঝে, তার উপস্থিতি জানান দিতে। অথবা সতর্ক করতে। যা হোক না কেন, তাতেনেন তীব্র বিরক্ত হল, তার হাতে সময় নেই এখন ভাবার এতকিছু। চারচেভার দিকে তাকাল সে ঝটিতি। কিন্তু না, চারচেভা আর সেখানে নেই! তিনি যে তাতেনেন-এর ডাকে কোনও উত্তর দেননি, ফিরে তাকাননি, তা যতটা নিশ্চিত, ঠিক ততটাই নিশ্চিত যে, সে-ডাক শুনেই চারচেভা দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গিয়েছেন কুসুমাকুরা থেকে, ওই বাঁ দিকের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে, তাতেনেন-এর পিছনে তাকানোর ক্ষণিক অবসরে।

তাতেনেন প্রায়-দৌড়ে চলে যায় ওই দরজার কাছে। না, চারচেভা নেই। এদিকটায় কোনও লোকও নেই, দরজার সামনের করিডরটাও ফাঁকা। তাতেনেন করিডরের পথটা নেয়। পথটা সোজা এসে বেরিয়েছে রাস্তায়, পানশালার পিছন দিকে। তাতেনেন জোরে হাঁটছে। চারচেভাকে সে ধরবেই আজ।

সামনে আগাছা ভর্তি একটা জায়গা, জলাভূমির মতো। বাঁ দিকে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে, সরাসরি সমুদ্রের ধারে চলে যায় সেটা। চারচেভা নিশ্চয়ই ও-পথেই গিয়েছেন। হাতের ঘড়ি দেখল তাতেনেন, আটটা পঁয়ত্রিশ। বাঁ দিকের রাস্তা ধরল সে।

অন্ধকার। নীচে এবড়ো-খেবড়ো মাটি।

পাকা রাস্তা নয়। রাস্তা গিয়ে সমুদ্রের তীরের যে-অংশে খুলেছে, সে-অংশ নির্জনতম, কেউ যায় না ওদিকটায়। চারচেভা ওদিকটায় গেলেন কেন, ঠাঁর লোক আছে ওদিকে গুঁকে রক্ষা করার, না ওখান থেকেই উনি পালাবেন কোথাও, সেরকম ব্যবস্থা আছে—এসব ভাবতে-ভাবতে এগোচ্ছে সে, কিছুটা হাঁটছে, কিছুটা ছুটছে। অন্ধকারেও আবছা আলো থাকে, কোথা থেকে যে আসে সে-আলো জানা নেই, অথচ তা থাকেই। তেমন আলোর আঙুল ধরেই এগোচ্ছে তাতেনেন, হত্যা করতে এগোচ্ছে।

হঠাৎ, ডান পাশ থেকে সজোরে ধাক্কা। তাতেনেন ছিটকে পড়ে গেল। কিন্তু আলগা হল না, মুহূর্তে সামলে নিল। এরকম অতর্কিত আঘাত-অভিঘাতের সমস্ত অভ্যাস, অভিজ্ঞতা তার আছে, অনুশীলন তার আছে। তৎক্ষণাৎ তার হাত চলে গেল ওয়েবলি, ৪৫-এ, সেটি বের করে নিয়ে এসে সামনে যাঁকে দেখছে, তাঁর দিকে তাক করে, একটুও অপেক্ষা না-করে, শুট করে দিল—চারচেভা ছিলেন সামনে।

অ্যামবুশ করে চারচেভা সম্ভবত অনুমান করতে পারেননি এরকম প্রতিক্রিয়া হবে। গুলি তাঁর বাঁ হাতে লেগেছে। তিনি পিছনে সরে যান, ডান হাত দিয়ে বের করে আনতে চেষ্টা করেন তাঁর কোমরে গোঁজা পিস্তল। পারেন না, কারণ, তাতেনেন উঠে পড়ে আরও দুটো গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হয় চারচেভার ডান হাত, ডান পা।

চারচেভা বসে পড়েন, তাতেনেন-এর দিকে তাকিয়ে। তাঁর কিছু করার নেই, তাও চেষ্টা চালান পিস্তল বের করে আনার।

“কী ভেবেছিলেন আপনি, ঠেলে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলবেন আমায়?”—দৃশ্য কণ্ঠস্বর তাতেনেন-এর এখন।

“না! না। মারব না, আপনাকে ধরব,” কণ্ঠস্বরে কোনও দুর্বলতা নেই চারচেভারও। “তারপর নিজের লোকদের কাছে নিয়ে যাবেন, এই তো?”

“তাই তা হলে।”

“তা হলে নয়, তা-ই।”

কিছুক্ষণ চুপ উভয়েই। চারচেভা দু’হাত দিয়ে তাঁর দুই হাত ধরে বসে আছেন, যন্ত্রণা হচ্ছে প্রগাঢ় অবশ্যই, কিন্তু প্রকাশ করছেন না কিছু।

“আপনি এতটা চাপ নিজ নিলেন কেন? আপনার সহযোদ্ধারা, রক্ষীরা কোথায়?”

“বিশ্বাসঘাতকতা আর গুপ্তঘাতকদের মুখোমুখি একা হওয়াই ভাল। কোনও সহযাত্রীর প্রয়োজন নেই সেখানে।”

“আপনার উদ্ভক্ত টান পড়ে না কিছুতেই দেখছি!”

“ওটা উপলব্ধি, উদ্ভক্ত নয়। তবে ও তফাত আপনি বা আপনারা বুঝবেন না।”

ভাল লাগছে না তাতেনেন-এর এ কথাগুলি শুনতে, একজন মানুষকে কোণঠাসা করেও এত কথা শুনতে সে রাজি নয়। সে বলল, “ছেড়ে দিন ওসব কথা। আপনাকে মারতে হবে, তেমনটাই নির্দেশ আছে আমার।”

“বেশ তো, মারুন! তিনটে তো চালিয়ে দিয়েছেন।”

“এবার বাকিটা।”

“আমার একটা অনুরোধ আছে যদিও।”

“অনুরোধ? কী?”—অসহ্য লাগে তাতেনেন-এর। মনে হয়, এ কি সময় বাড়াচ্ছে যাতে অন্য কেউ এসে পড়ে?

“আমার চোখে চোখ রেখে মারবেন আপনি আমায়। গুলি চালাবেন।”

অস্বস্তি বোধ করে তাতেনেন এ ধরনের অনুরোধে। চারচেভার চোখ অসম্ভব আকর্ষক, স্বপ্নস্পষ্ট, মায়ালিগু। সেদিকে তাকিয়ে তাঁকে মারা, গুলি চালানো কঠিন। তবে, তাদের কাজে কঠিন বলে কিছু হতে পারে না। উত্তর দেয়, “আমি প্রস্তুত। তাই হবে।”

“চালান তা হলে, প্রস্তুত আমিও।”

তাতেনেন অপেক্ষা করে না। একটা প্রবাহে এসে গিয়েছে সে। এখন নিজে থামার বা সে-প্রবাহ থামানোর কোনও মানে হয় না আবেগের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বা সময়ের প্রতিধ্বনি শুনে।

তাতেনেন তাক করে বন্দুক। চোখ রাখে গেরিলাস চোখে। তারপর, ট্রিগারে চাপ দেয়।

গুলি লাগল চারচেভার গলার কাছে, তিনি পড়ে গেলেন সঙ্গে-সঙ্গে। তাতেনেন এগিয়ে গেল তাঁর দিকে, চারচেভা তার দিকে তাকিয়ে, প্রাণ আছে।

তাতেনেন আবার গুলি করল, বাঁ পাশের কপালে। আর সেই মুহূর্তে তাতেনেন অবাক বিস্ময়ে দেখল, চারচেভার দুই চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে এল, তারপর পাখির মতো কীরকম উড়ান নিল, ডানা বিস্তার করে।

চার

চারচেভার দেহ ওখানেই রেখে, দৌড়োতে-দৌড়োতে তাতেনেন চলে আসে কুসুমাকুরার দিকে। এখনই জানাতে হবে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের, রাষ্ট্রকে। সে পেরেছে, তাকে প্রদত্ত কাজ সে করতে পেরেছে, অসম্ভব একটি কাজ সে করতে পেরেছে! তাকে পুরস্কৃত করা হবে। পদ পাবে, অর্থ পাবে, ক্ষমতা পাবে সে।

পানশালায় তখন পড়ন্তবেলা। গান শেষ হয়ে গিয়েছে। যারা আছে, তারা সুরায় নিমগ্ন। সুরার বিন্দু বান্ধব হয়ে এখন শুনছে তাদের এক-একজনের কথা।

বার কাউন্টারের লুইকে বলে,

ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে পানশালায় ফোন ব্যবহার করে তাতেনেন, বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার সময় নেই। ফোনে তার উপরের কর্তৃপক্ষকে জানায়, “তাতেনেন হিয়ার। হি ইজ ডাউন। আমি কুসুমাকুরায়। মেক ইট ফাস্ট।”

রাতেই চলে এল রাষ্ট্রের লোকজন। হল যাবতীয় ব্যবস্থা। সদস্তে, সদলবলে চারচেভার দেহ নিয়ে প্রায় মিছিল করে, লোক দেখিয়ে, লোক জাগিয়ে, নিয়ে যাওয়া হল সমুদ্র-নগরের মধ্য দিয়ে। সেফ হাউসে পৌঁছে সাড়ম্বরে নেওয়া হল ছবি। তাতেনেন এসবের মধ্যে থাকতে চায়নি। তাকে একপ্রকার জোর করেই আনা হয়েছিল। দেহটি দেখিয়ে সে চলে গিয়েছিল, মিছিলেও ছিল না। রাষ্ট্রের গুপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে তাকে যেন কেউ চিনে না-ফেলে, সতর্কতা সে-সবেরই। কিন্তু সেফ হাউসে তাকে যেতেই হল, প্রোটোকল। ছবিও তুলতে হল। এ-ছবিই যাবে শাসকের কাছে। পুরস্কৃত হবে সে, পাবে অর্থ, ক্ষমতা।

ছবি তোলায় সময় তাতেনেন আর তাকাতে পারছিল না চারচেভার দেহের দিকে। কোটর শূন্য, চামড়া-মাংস থাকলেও কঙ্কালের মাথার মতো দেখাচ্ছিল চারচেভার মাথাটা। সকলেই বিস্মিত হচ্ছিল, চোখ কোথায় গেল। অনেকেই মত, গুলির ক্লোজ ইমপ্যাক্টে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে গিয়েছে। ওখানে শক্তিশালী টর্চের আলো জ্বেলে খোঁজার চেষ্টাও হয়েছিল। পাওয়া যায়নি। জায়গাটি ঘিরে রাখা হয়েছে, গ্রহরীও আছে। কাল সকালে আবার সন্ধান করা হবে।

তাতেনেন ওদের কাউকেই বলতে পারেনি যে, চারচেভার চোখ বেরিয়ে কোথাও পড়ে যায়নি, চোখ দুটো উড়ে চলে গিয়েছিল। তাতেনেন স্পষ্ট দেখেছে, চোখদুটো উড়ে গেল তার সামনে দিয়ে।

পাঁচ

তাতেনেন শুয়ে ছিল, সমুদ্র-নগরে তার বাসস্থানে। ধুমধাম মিটে গিয়েছে, তার কাজ ফুরিয়েছে এখানে। চারচেভার দেহও রাজধানীতে চলে গিয়েছে, তাতেনেন তারপরই ফিরে যেতে পারত। কথা তেমনই ছিল। কিন্তু যায়নি। আরও কয়েকদিন থাকতে চেয়েছে সে এখানে। ভাল লেগে গিয়েছে এ সমুদ্র-নগর তার। তবে, বেশিদিন থাকতে পারবে না। নানা কারণে পারবে না। বড়জোর আরও তিন-চারদিন।

বেলা হয়েছে অনেক। ব্রেকফাস্ট করে আবার সে শুয়ে ছিল। রাস্তার জীবনরব আসছে থেকে-থেকে। একই সঙ্গে একই সময়ে কত মানুষ একে অপরের কাজ

ছয়

সম্পর্কে কোনও কিছু না-জেনে রাস্তায় বেরোয়, রাস্তায় থাকে— ভেবে হঠাৎ অবাক লাগে তাতেনেন-এর।

পর্দা টানা আছে। পর্দার শরীরে ধাক্কা খেয়ে রোদের ছায়া এসে পড়েছে ঘরে। প্রতিবিশ্বিত হয়েছ রোদের আলো ঘরের দেওয়ালে। কেমন যেন নিরাপদ মনে হচ্ছে তাতেনেন-এর নিজেকে এখন। আরও-একটু শুয়ে থেকে উঠবে সে, মান করে খাবে তারপর।

চোখদুটো বন্ধ করে তাতেনেন।

কিছুক্ষণ এমনভাবে শুয়ে ছিল সে, ঘুম আধা এলিয়ে ছিল তার চোখে। হঠাৎ, পায়ে কীসের স্পর্শ অনুভূত হল। চোখ খুলতেই সে দেখতে পেল, চারচেভার চোখদুটো তার মুখের উপর ঝুলন্ত, তাকিয়ে তার দিকে, যেন লক্ষ রাখছে কিছু করার আগে। সেই দৃষ্টি, সেই ক্ষুরধার, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অথচ স্বপ্নস্পৃষ্ট।

চিৎকার করতে গিয়েও সামলে নেয় নিজেকে তাতেনেন। সে উঠতেও পারে না। চিত হয়ে সে শুয়ে, ওই চোখদুটো তখনও দেখছে তাকে। তাতেনেন হাত বাড়ায় চোখগুলির দিকে, সরিয়ে দিতে যায় হাত দিয়ে, পারে না। চোখদুটো একটু উপরে উঠে যায়। যেন ক্রীড়ারত তার সঙ্গে। তাতেনেন এক ঝটকায় উঠে পড়ে। উঠেই দেখে, চোখদুটো উধাও হয়ে গিয়েছে। সে কি তা হলে বিশ্বমের শিকার হল? হতে পারে, মানসিক চাপের প্রকাশ হয়তো। হতা করা়র অভিঘাত। এবং যা অস্বীকার করা যায় না তা হল, চারচেভার চোখের স্মৃতি তার মস্তিষ্কে গ্রথিত হয়ে গিয়েছে। তারও প্রকাশ হতে পারে। হতেই পারে। কিন্তু না, সে যে দেখেছিল চোখদুটো উড়ে গেল। সন্ধান করেও পাওয়া যায়নি চোখগুলো।

যা হোক, দেখা যাবে এখন।

আর শোয় না তাতেনেন।

সন্দের পরে সে বেরিয়েছিল।

কুসুমাকুরায় সে আর ঢোকেনি সেদিনের পর। বাইরে থেকেই দেখেছে। আশপাশে সে যেত, সমুদ্রতটে যেত। ফিরে আসত। আজও সেরকম ঘোরাঘুরি করল। বাড়ি প্রবেশের ঠিক মুখটায় এসে সে বুঝতে পারল, কেউ নজর রাখছে তার উপর। চারদিকে দেখল সে, কেউ তো নেই সেরকম। তারপর, হঠাৎ সামনে তাকাতেই সে দেখতে পেল, চারচেভার চোখদুটো!

তাতেনেন একটু হলেও ভয় পেল এখন। বারবার দৃষ্টিবিভ্রম হবে না। একটু এগোল সে। চোখদুটোও রইল তার দিকে চেয়ে। তাতেনেন বুঝতে পারল, সে যা দেখছে, তা সত্যি। বুঝতে পারল, চারচেভার চোখ তাকে ধাওয়া করছে এখন। কাউন্টার চেজ।

সে দৌড়ে ঢুকে পড়ল বাড়িতে।

চোখদুটো তাকে ছাড়ে না। তাকে তাড়া করছে সর্বত্র, এমনকি সে যখন স্নান করছে, বা মলত্যাগ করছে, তখনও। যেখানে-সেখানে, যখন-তখন তারা হাজির হয়ে যাচ্ছে তার সামনে। চোখদুটো কিন্তু কিছুই করছে না, কেবল অপলক তাকিয়ে আছে তার দিকে। তারা যেন কিছু আদায় করে নিতে চায় তাতেনেন-এর কাছ থেকে, কোনও কিছু প্রত্যাশা করছে তারা। কী? স্বীকারোক্তি কোনও? তাতেনেন জানে না, ভাবতেও চায় না। সে পালাতে চায় এখন। তাতেনেন অনুভব করছে, অসহায়ভাবে অনুভব করতে পারছে যে, সে ট্র্যাপড হয়ে গিয়েছে গেরিলা যোদ্ধার দৃষ্টিতে। সমুদ্র-নগর থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আজ রাতেই সে সমুদ্র-নগর ছাড়ছে। গোছগাছ, ব্যবস্থা সব হয়ে গিয়েছে। বেরোবে সে এখন। ট্রেন ধরবে, একটু গভীর রাতের। তবে সময় হয়ে গিয়েছে। সে অতি সন্তুষ্ট হয়ে চলাফেরা করছে, খালি মনে হচ্ছে, চোখদুটো এসে গিয়েছে নিশ্চয়ই কোথাও। এখনও দেখিনি যদিও। দেখতে না-পেয়েই একটু স্বস্তিতে সে এগোল দরজার কাছে।

দরজা খুলতেই সে দেখতে পেল, চোখদুটো! তাদের দৃষ্টিতে এখন ক্রোধ, কাঠিন্য। তাতেনেনকে তা ভয় পাইয়ে দিচ্ছে ভীষণ। সে কোনওমতে নিজের ব্যাগ নিয়ে দৌড় দিল। দরজা খোলাই রইল পিছনে।

এবং দৌড়োতে-দৌড়োতেই সে দেখতে পাচ্ছে, চোখদুটোও যেন দৌড়োচ্ছে তার সঙ্গে। তারা আজ যেন ক্ষিপ্ত। তাদের এড়িয়ে কোথাও যাওয়া হবে না আজ তাতেনেন-এর। কিন্তু তাকে যে যেতেই হবে। পালাতেই হবে।

অনেকক্ষণ দৌড়ে তাতেনেন বোঝে যে, সে সম্পূর্ণ উন্টোদিকে চলে এসেছে, সমুদ্রতটের নির্জনতম স্থানটিতে। এ কী ভ্রান্তি তার! তার তো এদিকে আসার কোনও কথাই ছিল না, তার মাথা কি খারাপ হয়ে যাচ্ছে? না কি কেউ তাকে নিয়ে এল, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে, তার গতিপথ পরিচালনা করে? চোখদুটো এখনও আছে তার সামনে, কখনও পিছনে। কখনও ডানদিকে, কখনও বাঁ দিকে। আড়াল হতে দেবে না তাকে কোনওমতে তারা। তারাই নিয়ে এল কি তাকে এ ভ্রান্তপথে? তারাই বোধ হয় নিয়ে এল।

সামনে সমুদ্র। কৃষ্ণবর্ণ অবগুষ্ঠনে সমুদ্র। ডেউয়ের শব্দ, বিরামহীন। তাতেনেন চলে এসেছে সমুদ্রের মুখোমুখি, ডেউ এসে লাগছে তার পায়ে। লাগছে সাদা ফেনা। আর বালি। তাতেনেন ব্যাগটা হাত থেকে ফেলে দেয় বালিতে। সে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছে। ঘামছে দরদর করে।

চোখদুটো ক্ষমাহীন, নির্নিমেষ তাকিয়ে তার দিকে।

“কী চাও! কী চাও!”— চৈচিয়ে উঠল তাতেনেন, আর থাকতে না-পেরে।

চোখেরা দেখছে তাকে।

প্রবল উত্তেজিত তাতেনেন। তার মাথার দু’ধারের শিরা ফুলে উঠছে, তার চোখ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে জল, রক্ত। কিন্তু পারছে না, হচ্ছে না কোনওটাই।

“বলো বলো!”

চোখেরা দেখছে তাকে।

“চুপ থেকো না! বলো!” চিৎকার করছে তাতেনেন।

চোখেরা দেখছে তাকে। একইরকম ভাবে, একই স্থানে স্থিত থেকে।

তাতেনেন একটু চুপ করে যায়। তাকায় চোখদেবের দিকে।

তার এতক্ষণের চিৎকার যেন সমুদ্র অপহৃদ করছে, তাই আরও জোরে, সশব্দে, ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে তটে।

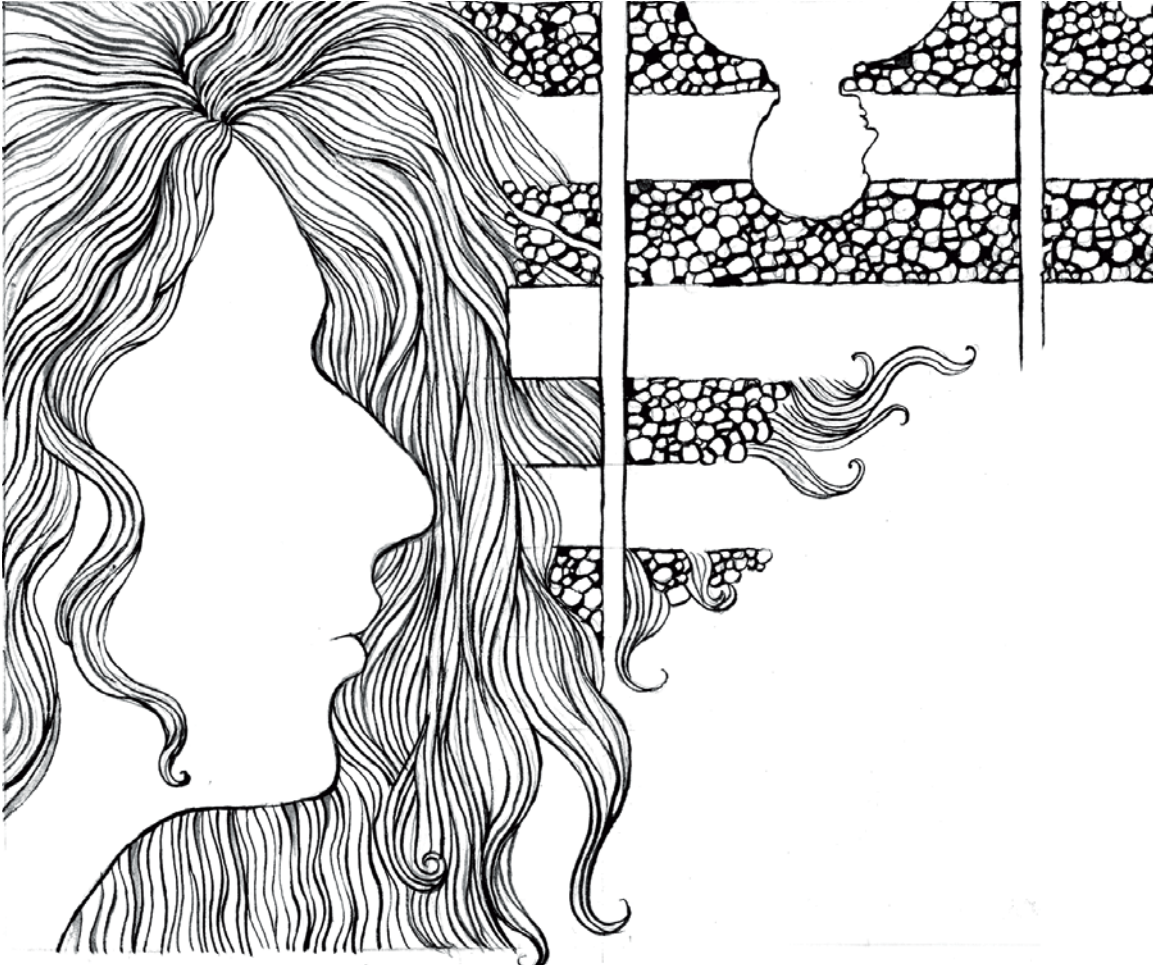
তাতেনেন এবার মূদু হাসে। সে যেন ধরে ফেলেছে চোখদেবের ভাষা। চোখেরা কী চায়, এ-প্রশ্নের উত্তরও সে যেন পেয়ে গিয়েছে।

বসে পড়ে সে। কোটের পকেট থেকে বের করে আনে ওয়েবলি.৪৫। গুলি ভরা আছে। সে একবার তাকায় বন্দুকটার দিকে। তারপরই তাকায় চোখদুটোর দিকে। কয়েক মুহূর্তে চোখদুটো এগিয়ে এসেছে অনেকটা, যেন কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতে উদ্যত তারা তাতেনেনকে এখন।

ডেউ এসে লাগছে তাতেনেন-এর শরীরে। দূরে, অনেক দূরে, কোনও এক জলযানের আলো দেখা যাচ্ছে, দেশ পেরোচ্ছে বা দেশে প্রবেশ করছে হয়তো। হয়তো প্রহরা দিচ্ছে। হয়তো তা জলযানেরই নয়, অন্য কোনও আলো। অন্যকিছুর। আকাশ পরিষ্কার, নক্ষত্ররা যে-যার জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একদিকে আছে চাঁদও, আঁধার ঠেলে-ঠেলে সে বেরিয়ে এসেছে নিয়মমতো। তাতেনেন-এর সামনে আছে চোখেরা, গেরিলা যোদ্ধা চারচেভার দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া, পাখি হয়ে উড়ান নেওয়া দুই চোখ। কাছাকাছি এসেছে তারা আরও। এবং সেই চোখেরা দেখছে, ক্রোধ সরিয়ে, কাঠিন্য সরিয়ে এখন প্রশান্ত হয়ে তারা দেখছে, নিজের কপালের ডানদিকে বন্দুক ঠেকাল তাতেনেন, তার হাত স্বল্প কাঁপছে, সেই কম্পন সে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করছে, আর এই তো, তাদের দিকে তাকিয়ে, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাতেনেন, আর তার আঙুল ট্রিগার স্পর্শ করল।

ব্যবহৃত গান: প্যাটি স্মিথ রচিত

অঙ্কন: রৌদ্র মিত্র



রেলতুফা

সৌ ভিক গু হ স র কার

ফা স্তুন মাসের এক শান্ত
রবিবারে মগরাহাটের আকাশ
কাজলকালো।

নারকোল হেলছে সুপুরির গায়ে, সুপুরি
হেলছে দুপুরের গায়ে।

এমনই মেঘময় দুপুরে ব্লু-টুথ স্পিকারে
কিশোর কুমারের বাংলা গান চালিয়ে
নাপিতকে দিয়ে গা ম্যাসাজ করাচ্ছিল
সৌম্যদীপ পাভুই।

এ পৃথিবীতে ম্যাসাজ একটি আশ্চর্য
আনন্দময় জিনিস।

এতে শরীরের গ্রন্থিগুলো সজাগ ও মুচমুচে
হয়ে ওঠে। মনটা বাতাস-লাগা পাতার মতো
ঝরঝর ঝিরঝির করে।

চন্দন-পাউডারের মিঠে ঘ্রাণে অবগাহন

করে হৃদয় শান্ত কচ্ছপের মতো নীরব হয়ে
যায়।

ঠিক এই ম্যাসাজ করানোর সময়
সৌম্যদীপের মাথায় নানারকমের ‘আইডিয়া’
চলে আসে; তার বৃহৎ ব্যবসার ভবিষ্যতের
নকশাগুলো চোখে ভেসে ওঠে।

তাই সৌম্যদীপ প্রতি হপ্তায় নিয়মিত এই
ম্যাসাজ করায়।

শুধু শরীরের আরাম নয়, ম্যাসাজ তাকে
নতুন ভাবনা দেয়। সৌম্যদীপ তো আর
বেহিসেবি লোক নয়!

“স্যার—”

“উ?”

“আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে

এসেছে”—সৌম্যদীপের সেক্রেটারি ঘরের
পর্দা সরিয়ে সারসের মতো উঁকি দিয়ে
মালিককে জানাল।

উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল সৌম্যদীপ।

নাপিত পটরপটর করে হাত দিয়ে কাটারি
চালাচ্ছিল তার পিঠে।

“এইসময়ে আবার কে এল?”

“আজ্ঞে, বাপি নস্কর”—

নামটি শুনে চোখ খুলে গেল
সৌম্যদীপের।

জ্ঞ-কৃষ্ণিত হল। বাপি এসেছে? হঠাৎ?
সে তো ছিল বিদেশে। মগরাহাটে ফিরল
কবে? বাপির ফিরে আসার কোনও খবর তো
সৌম্যদীপ পায়নি!

ম্যাসাজ নিতে নিতেই সে সেক্রেটারিকে

বলল— “বসতে বলো”...

ইশারায় নাপিতকে ম্যাসাজ বন্ধ করতে বলে তার হাতে দু’শো টাকা ধরিয়ে দিল সৌম্যদীপ।

নাপিত বেরনোর আগে জিজ্ঞেস করল, ‘তাহলে সামনের রোববার আবার আসি?’

সৌম্যদীপ মাথা নাড়ল। অর্থাৎ এসো।

নাপিত বেরিয়ে যেতে একটা সিগারেট ধরিয়ে চূপ করে ভাবতে লাগল সৌম্যদীপ।

বাপি নস্কর। এই নামটির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে তার বাল্যদিনের কতরকমের খেলা, কতধরনের দৌরাড্য। একই ইঙ্কলে পাশাপাশি বসে কেটে গেছে তাদের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কত আনন্দমুখর কাল।

বাপি বরাবরই সাহসী, আর সৌম্যদীপ সাবধানী। বাপি সবসময় দলনেতা, আর সৌম্যদীপ অনুসরণকারী। আর সেই সতেরো-আঠারো বছর বয়সে বাপি যা করতে পারত, মগরাহাটে আর কেউ কোনওদিন তা করতে পারেনি।

কারওর ওই দম ছিল না। সৌম্যদীপের নিজেও ছিল না।

বাপি ‘রেলতুকা’ করতে পারত।

সে এক ভয়ঙ্কর জিনিস।

মগরাহাট স্টেশন ছাড়িয়ে বারুইপুরের দিকে যে-লাইন চলে গেছে, তার দু’ধারে খেত খামার। সেই লাইনে দলবল নিয়ে চলে আসত বাপি। বিকাশ আর আবদুলকে বলত— “নজর রাখ লাইনে। গাড়ি এলে বলবি!” এই বলে সে কোমরে গামছা বেঁধে লাইনের ধারের তেঁতুলগাছের তলায় বসে বিড়ি টানত।

হঠাৎ আব্দুল চোঁচিয়ে উঠত— “হুই যে আসে গো”—

বাপি বিড়ি ফেলে বাঘের মতো ছুটে যেত লাইনের দিকে। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ত লাইনের ওপর। বন্ধুর দল দমবন্ধ করে দেখত— ট্রেন যাচ্ছে বামবাক্ষ করে মা-কালীর মতো, তার নীচে মহেশ্বরের মতো শুয়ে আছে বাপি।

ট্রেন চলে গেলে তারা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেত লাইনের দিকে। বেঁচে আছে তো? বাপিটা বেঁচে আছে তো?

হ্যাঁ। আছে। রেললাইন থেকে বীরের ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়াইত বাপি। যেন মৃত্যু থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে কোনও অসামান্য দেবতা। যে ভয় বোঝে না, মৃত্যু বোঝে না।

তার বন্ধুরা তাকে কাঁধে তুলে লাফাত।

সে হিরো। গুরু। রেলতুকার রাজা।

যদিও সম্পূর্ণ বে-আইনি কাজ এটা এবং ধরা পড়লে রেলের আইন অনুসারে জেল পর্যন্ত হতে পারত, তবু বাপি বুদ্ধি করে সময় বুঝে এই রেলতুকা করত। আইনের চোখের আড়ালে। মাঝেমাঝে তার রেলতুকা দেখার জন্যে দশ-বারো জনের ভিড় জমত। এ যেন এক রুদ্ধশ্বাস সার্কাসের মঞ্চ। সৌম্যদীপ,

আব্দুল, শামিম, বিকাশ, পিন্টুরা দর্শকদের কাছ থেকে কুড়ি টাকা করে আদায় করত। এতে কোনও কোনও দিন তিনশো টাকা পর্যন্ত উঠত। ওই টাকায় চলত তাদের ফিস্টি। ‘প্রিন্স বিরিয়ানি শপ’ থেকে এক থালা করে গরম গরম চিকেন বিরিয়ানি। সে কী উল্লাস! কী উত্তেজনা!

আর বাপির মুখে সে এক রাজ্যজয়ের হাসি!

সেই এককালের প্রাণের বন্ধু বাপি এসেছে এতদিন পর সৌম্যদীপের বাড়িতে।

কিন্তু কেন এল? তার তো আসার কথা নয়।

দুই

সৌম্যদীপ এখন ব্যবসায়ী। বয়স চল্লিশ।

বাপের গয়নার ব্যবসাটা বাড়িয়ে নিয়ে সে এখন ধনবান লোক। সৌম্যদীপের দুই মেয়ে। বড় গৃহবধূ। তিনটে গাড়ি আর দুটো বাড়ি রয়েছে। ইদানিং সে বাইকের একটা শো-রুম খুলছে মগরাহাট অঞ্চলে।

স্কুলের বন্ধু বাপিকে আজ পনেরো বছর পরে দেখে সৌম্যদীপ অবাক হল।

বাপি বেশ মোটা হয়ে গেছে। খানিক ভুঁড়ি হয়েছে তার।

বাপির ভেতর সেই ঝরঝরে যুবকটি আর নেই।

সমস্ত চেহারায়া ক্লান্তির ছাপ।

যেন তাকে একটা শান্ত খাট, বালিশ, চাদর আর একফালি নীরবতা দিলেই সে ঘুমিয়ে পড়বে।

সৌম্যদীপ তার সফলতার ভার গলায় চাপিয়ে গলাটিকে ভারী করে তুলে বলল—

“কী রে, তুই? কী খবর? বিদেশে ছিলি না?”

বাপি গত পনেরো বছরের ফিরিস্তি দিল সৌম্যদীপকে। পঁচিশ বছর বয়সে সে প্রথমে সোনার কাজ করতে গিয়েছিল কেরলে।

সেখান থেকে আমদান্য। সেইখান থেকে দুবাই। দুবাইতে কনস্ট্রাকশনের কাজ করতে সে চলে যায় আবু ধাবি। সেখানে একটি পাঁচতারা হোটেল চাকরি করাকালীন ভারতীয় মুদ্রায় বেশ ভাল টাকা রোজগার করে। এরপর আরও বেশি রোজগারের টানে দু’একজন বন্ধুর কথায় সে মিশরের কায়রো শহরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। কায়রোতে হোটেল কাজ করে সে টাকা জমিয়ে ছিল কয়েক হাজার ডলার। কিন্তু সেখানকার একটি ক্যাসিনোতে টাকা ঢেলে সে প্রায় নিঃশ্ব হয়ে ফিরেছে। বিপুল অঙ্কের জ্যাকপট জিততে চেয়ে তার সর্বশ্ব গেছে। এর ধাক্কায় তার একটা বড় হার্ট অ্যাটাকও হয়ে গেছে। শরীর ভেঙে

গেছে। অবশিষ্ট কিছু টাকা নিয়ে, কোনওমতে বেঁচে, সে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে।

পৃথিবী ঘুরে ভিখির হয়ে ঘরে ফিরেছে সে।

এতদিন ধরে ব্যবসা করে আজকাল মানুষের চাহিদা সহজেই বুঝতে পারে সৌম্যদীপ।

সোজা ধারালো উচ্চারণে সে বাপিকে বলল, ‘তার মানে এখন তোর হালুয়া টাইট! তাই তো!’

বাপির মুখে স্নান হাসি।

“তাই ভাবছি, বাপি নস্কর হঠাৎ আমার কাছে কেন এল! আমাকে তো দেখতে সে আসবে না। নির্যাত টাকার জন্যে এসেছে। তা, কত লাগবে তোর?”

বন্ধুর গলার স্বরের তীক্ষ্ণতায় স্নান হয়ে যায় এককালের দাপুটে জাঁহাজ বাপি। সে মাথা নিচু করে। সে জানে সৌম্যদীপ যে-কথাটা বলেছে, সেটা মোক্ষম। যদি আজ তার হাতে টাকা থাকত, তাহলে সে সৌম্যদীপের ধারে-কাছেও যেত না!

“তিন লাখ ধার লাগবে ভাই! আমি এক বছরে শোধ করে দেব—” বাপির গলায় ভিক্ষার সুর।

“তিন লাখ! সে তো অনেক টাকা! কিসের জন্য?”

“মায়ের চিকিৎসা রয়েছে, আর তা ছাড়া মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করব”—

“মেয়ে? তোর মেয়ে রয়েছে? কী নাম?”

“অন্নপূর্ণা—”

“বাহ! সুন্দর নাম। আমার আবার দুটো মেয়ে— পিন্ধি আর সামান্ধা—”

“কত বয়স?”

“পিন্ধির এখন এগারো, সামান্ধার সাত। ওদের আমরা কালিম্পিং-এর কনভেন্ট স্কুলে দিয়েছি। তা সরকারি স্কুলে তো এত টাকা লাগে না...”

“সরকারি নয়। ইংরিজি মিডিয়ামে দেব—”

“ইংরিজি মিডিয়ামে দিবি? এ অঞ্চলে তো ইংরিজি মাধ্যম স্কুল তেমন নেই”—

“এখানে নয়, নিউ গড়িয়ার দিকে। আমরা এখানে থাকি না—”

“তাই ভাবছি যে তুই এ চত্বরে ফিরেছিস, কিন্তু আমি খবর পাইনি কেন? কতদিন হল নিউ গড়িয়ায়?”

“মাস ছয়েক— আমাদের এখানকার পুরনো ভাড়া বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছি—”

“তোর মায়ের কী হয়েছে?”

“কিডনির সমস্যা দেখা দিয়েছে—”

সৌম্যদীপ বুঝতে পারছিল যে, অনেক কথার মধ্যে একটি কথা সে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারছে না।

সেটি হল মারিয়ার কথা—যে তার কাছে

ধরা না দিয়ে অপদার্থ বাপিকে বিয়ে করেছিল।
ক্রিস্টান বাড়ির মেয়ে মারিয়া একসময়ে
ছিল ও-তল্লাটের স্বপ্ন।

কাঁচা সোনার মতো রং। হাসলে গালে
টোল পড়ত। চুল তো নয়, যেন ঝরনা।

তার বাবা মাইকেল গোমস রেলের চাকরি
করত। গ্রুপ ডি স্টাফ।

মারিয়ার শরীরের জন্য পাগল ছিল
সৌম্যদীপ। সে কি মারিয়াকে বিয়ে করতে
চেয়েছিল? না, বিয়ে নয়। সে চেয়েছিল
মারিয়ার শরীরের নরম আঙুনে নিজের
যৌবনের ময়ূরপালক ঝলসে নিতে।

কিন্তু মারিয়া? সে মজেছিল বাপিতে। ওর
দাপটে ব্যক্তিত্বে। কিন্তু ওই দাপট ছাড়া আর
কী ছিল বাপির? শৈশব থেকেই সে পিতৃহীন।
ওর মা কাজ করত একটি শাড়ির দোকানে।
কত টাকা রোজগার হত তাতে? তাও মারিয়া
বাপির কাছেই গেল!

সৌম্যদীপ জানে, মারিয়া বুঝেছিল তার
দুর্বলতার কথা। একদিন ধানপোঁতার দিকে
তারা দু'জনে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল।
দু'ধারে সবুজ ক্ষেত।

আর সেই সময়ে নামল তুমুল বৃষ্টি। সে
ভিজল। মারিয়া ভিজল।

মারিয়ার সাদা টিশার্ট তার গায়ের সঙ্গে
লেপটে গেল।

অন্তর্বাসের চেহারা স্পষ্ট হল। তার
শরীরের গহন বাঁকগুলো তুলিতে আঁকা
জলরঙের রেখার মতো ফুটে উঠল।

মারিয়ার এতে জ্বলন্ত নেই। সে হাসছে।
কেন? এই হাসি কিসের সঙ্কেত?

বৃষ্টিভেজা গন্ধরাজের পাপড়ির মতো
মারিয়ার সাদা শরীরকে আশ্বাদন করার জন্যে
সৌম্যদীপ পাগল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কিছুদিন পরেই সে খবর পেল
বাপিকে বিয়ে করছে মারিয়া।

কয়েক রাত সে ঘুমোতে পারেনি।

বাপির বিয়ের দিন অসুস্থতার অজুহাতে
যায়নি সৌম্যদীপ। বিয়ের পর আর তাদের
দেখা হয়নি, কারণ বাপি মারিয়াকে নিয়ে
চলে যায় কেরলে। তারা পনেরো বছর আর
ফেরেনি।

এর মধ্যে সৌম্যদীপের জীবন ঘুরে গেছে।
তার বাবার ব্যবসা তার হাতে ফুলে-ফেঁপে
উঠেছে। সে সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার জীবন কানায় কানায়
পূর্ণ। কিন্তু আজ এতদিন পর বাপিকে দেখে
মারিয়ার জন্য তার বুকের ভেতরের ক্ষতটা
দগদগিয়ে উঠল।

তার নিজেকে হঠাৎ সেই তেইশ-চব্বিশ
বছরের যুবক বলে মনে হল, যে হেরে
গিয়েছিল।

সারাজীবনের অত প্রাপ্তির ভেতরেও তার

নিজেকে শূন্য মনে হল, ফাঁকা মনে হল; তার
শীত-শীত করতে লাগল।

ক্লান্ত পরাজিত বাপিকে দেখে তার মনে
হল— এ জিতেছে, আমি পারিনি। এ মারিয়ার
শরীর পেয়েছে, আমি পাইনি। সৌম্যদীপের
রক্ত ছলাৎ করে উঠল।

ঠোঁটের কোনোয় পরিশীলিত হাসি এনে
সে বলল— “তিন লাখ দিতে পারি, শোধ
করতেও হবে না। শুধু একটাই শর্ত—”

“কী শর্ত?”

“যদি তুই আবার একবার রেলতুচ্ছা করিস
আমার সামনে!”

বিদ্যুৎগতিতে বাপি তাকাল সৌম্যদীপের
দিকে। বাইরে ঝঝঝিয়ে নামল বৃষ্টি।

তিন

“অসম্ভব, এ হতেই পারে না—” চৈঁচিয়ে
উঠল মারিয়া— “ওকে আমি হাড়ে হাড়ে
চিনি, ও তোমায় মারতে চায়। ও কি জানে না
যে, তোমার শরীর আর আগের মতো নেই!
এ অবস্থায় রেলতুচ্ছা করলে তুমি শেষ হয়ে
যাবে!”

“শেষ তো কায়রোতেই হয়েছি, নতুন করে
আর কী হবে? আমি সৌম্যকে বলেছি যে,
সামনের রোববার রেলতুচ্ছা করব!”

নিউ গড়িয়া স্টেশনের কাছে একটা
দু'কামরার ভাড়া বাড়িতে এখন বাপি-মারিয়ার
সংসার। সঙ্গে ছোট্ট মেয়ে অন্নপূর্ণা আর বাপির
মা।

বাপির উত্তরে মারিয়া তিরিক্ষি হয়ে বলল,
“মেয়েকে নিয়ে অতিরিক্ত আদিক্যেতা আমার
একদম পছন্দ হচ্ছে না। দিলেই হত কোনও
সরকারি স্কুলে। তা-না খালি বড়-স্কুল বড়-স্কুল
করে মাথা খারাপ করছ!”

বাপি মারিয়াকে নরম করে বলল— “কী
হয়েছে! এত রাগছ কেন?”

মারিয়া চোখ জলে ভরে এল—

“একবারও ভেবেছ, তুমি না থাকলে আমাদের
কী হবে? রেলতুচ্ছা তুমি করতে পারবে না,
ব্যস!”

বাপি মাথা নাড়ল। সেটা হ্যাঁ কি না, বোঝা
গেল না।

বিকলে নিউ গড়িয়া স্টেশনে বসে বাপি
ভাবতে লাগল, আর কে কে টাকা দিতে পারে?

মারিয়া ছোট্ট একটা মেয়েদের বিউটি
পার্লারে কাজ করে। ওখান থেকে কিছুই
আসবে না। সে নিজেও একটা রিটেল স্টোরে
মাস তিনেক হল ঢুকেছে। সেখানে এখনই
তাকে টাকা ধার দেবে না। এতবছর দেশের
বাইরে থাকাতে এখানে তার তেমন কোনও
চেনা-শোনাও তৈরি হয়নি।

বাপি জানে যে, তার কিছু করার নেই।

তার রক্তে এমন কিছু রয়েছে যা তাকে ঝুঁকি
নেওয়ার দিকে ঠেলে দেয়।

সেই রক্ত বারণ শোনে না, হিসেব মানে
না, শুধু ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। এই রক্তই
তাকে রেলতুচ্ছার বাদশা করেছিল একদিন।
মগরাহাট থেকে কেরল দুবাই আবু ধাবি ও
কায়রোর পথে ঠেলে দিয়েছিল একদিন।
এটাকেই কি সাহস বলে, অথবা দুঃসাহস? সে
জানে সৌম্যদীপকে সে যখন বলেছে যে সে
রেলতুচ্ছা করবে, তখন সে করবেই। অথচ এক
লহমায় তার চোখের সামনে যখন অন্নপূর্ণার
ছবি ভেসে ওঠে, তখন এক অদ্ভুত ভয় তাকে
গ্রাস করে।

মৃত্যুকে সে ভয় পায় না, কিন্তু মৃত্যু হলে
সে তার সাধের ছোট্ট মেয়েটাকে যে দেখতে
পাবে না— একমাত্র এই চিন্তাই তাকে ভীত
করে! ছোট্ট অন্নপূর্ণাকে না দেখতে পেলে তার
মরেও তো শান্তি নেই।

চার

বিউটি পার্লারে কাজ করতে করতে
মারিয়া বারবার ভাবতে থাকে। সৌম্যদীপের
মূল উদ্দেশ্য তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার।
বাপিকে সরিয়ে তাকে পাওয়া। এ কথা কি
বাপি বুঝতে পারছে না? নাকি বুঝেও বুঝতে
চাইছে না?

সৌম্যদীপের কথা ভাবতে ভাবতে তার
প্রতি একটা আশ্চর্য অনুভূতি কাজ করতে
লাগল মারিয়ার।

সে সৌম্যদীপকে ঘৃণাও করছিল,
আবার তার এটা ভেবেও ভাল লাগছিল যে,
সৌম্যদীপ এখনও তাকে চায়।

বহুকাল মারিয়া নিজের শরীরের দিকে
তাকায়নি।

এমনকী তার যে একটা টলোমলো শরীর
ছিল— সে শরীরের বাঁকে নৃত্য ছিল, মেঘ
ছিল, পিপাসার গান ছিল— সে সব কথা তার
মনেই ছিল না।

গত একবছর ধরে কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে
দিয়ে গিয়েছে তারা।

সে শুধু জেনেছে, তার একটা শরীর
রয়েছে যা দিয়ে সে তার মেয়ের জন্য,
পরিবারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে
পারে। এই শরীর এতদিন পরে কেউ চাইছে—
একথা ভেবে রক্তের গোপনে এক অদ্ভুত
পুলক অনুভব করল মারিয়া।

সে বাড়ি ফিরে স্নানের ঘরে নিজেকে
অনাবৃত করে আয়নায় দেখল।

তার মুখে ফুটে উঠল হাসির রেখা।

এখনও আছে। তার টলোমলো শরীর
প্রাত্যহিকতার ছাইয়ের নীচে চাপা আঙুনের
মতো ঝলমলিয়ে জ্বলছে। সৌম্যদীপ এখনও
এটার জন্য পাগল! কী আশ্চর্য! সে কি একবার

সৌম্যদীপের সঙ্গে দেখা করবে? তাতে কাজ হবে?

পাঁচ

দুপুরবেলা।

সৌম্যদীপ কাজ করছিল তার অফিসের ঠান্ডা ঘরে বসে। সঙ্গে দু'জন জুনিয়র কর্মচারী। রিসেপশন থেকে ফোন এল। সৌম্যদীপ শান্তভাবে শুনল।

জুনিয়র কর্মচারীদের দ্রুত বাইরে পাঠিয়ে দিল। রিসেপশনে ফোন করে বলল, ‘আসতে বলো!’

মারিয়া ঢুকল। ফিকে সবুজ শাড়ি।

সৌম্যদীপের বুকের ভেতরে কী যেন সব উল্টোপাল্টা হতে শুরু করল। সে ভেতরে ভেতরে ঘামছে। এই ঘাম তার অনেকদিন পরে হচ্ছে। সেই পনেরো বছর আগে এমন হত।

শাড়ি পরে মারিয়াকে সে দেখেনি। এই প্রথম দেখছে।

সৌম্যদীপ মারিয়ার সর্বাঙ্গ চোখ দিয়ে লেহন করছে। একটু পুথুলা হয়েছে মারিয়া। কোমরের কাছে একটু চর্বি জমেছে। তাতে আরও যেন ঢলোঢলো হয়েছে সে। ভরা মধ্যযৌবনের শরীর মারিয়ার।

সৌম্যদীপের শিরায় শিরায় পলাশ আর বসন্তের চিৎকার।

তবু, নিজেকে সংযত রেখে, গাঙ্গীর্ষ এনে সৌম্যদীপ বলল, “এসো!”

মারিয়া এসে বসল। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

ওই তো মারিয়ার গালের ওই টোল!

এখনও আগের মতো রয়েছে!

মারিয়া সুঘ্রাণ ছড়িয়ে বলল, “কেমন আছ?”

সৌম্যদীপের মাথায় আগুন জ্বলে গেল! কেমন আছ? ন্যাকামি! এককালে যন্ত্রণার ভেতর ঠেলে দিয়েছিল যে, সে আজ এসে জিজ্ঞেস করছে, কেমন আছ?

সৌম্যদীপ বলল, “কী রকম দেখছ? অস্তুত তিন লাখ টাকার জন্যে ভিক্ষে করতে হচ্ছে না—”

সপাং করে কথাটা পড়ল মারিয়ার গায়ে। তার গলায় ক্রুশ চিহ্নের লকেটটা নড়ে গেল। সে চোখ নিচু করল।

সৌম্যদীপ বুঝল— কাজ হয়েছে।

বহুদিনের জমিয়ে রাখা রাগ আজ পাহাড় ফেটে বেরোতে চাইছে।

“তুমি কেমন আছ?” জিজ্ঞেস করল সৌম্যদীপ।

“সবই তো বাপি তোমায় বলেছে—”

“তা বলেছে, তবু তোমার মুখে শুনতে চাই—”

“যার সব গেছে, সে আর কী বলবে?”

“কী জানো মারিয়া, বেপরোয়া জীবন

বেশদিন চলে না। জীবনে চাই হিসেব। মেপে মেপে চলতে হয়। জীবনটা হল একটা অঙ্ক—”

মারিয়া জানে এখন প্রচুর নীতিকথা শুনতে হবে তাকে।

জীবনে যারা হঠাৎ পিছিয়ে পড়ে আর্থিকভাবে, তাদের অনেক উপদেশ শুনতে হয়।

“এমন গাড়িতে চড়তে হবে, যার ব্রেক রয়েছে— না হলে অ্যাকসিডেন্ট অবধারিত— কে আটকাবে, আঁ?” সৌম্যদীপের মুখে হাসির রেখা। মারিয়া এতদিন পরে এসেছে। একটু রগড়াবে না?

মারিয়া মাথা নিচু করে। চুলের ক্লিপ ঠিক করে।

কোমর থেকে সরে যাওয়া শাড়ি টেনে কোমর ঢাকে।

সৌম্যদীপের চোখ এড়ায় না।

মারিয়ার পেটের সাদা মাংস। নেশার মতো টানে।

“তা কী ধান্দায় আমার কাছে?” সৌম্যদীপ পায়ের তলায় মারিয়াকে পিষে ফেলতে চায়।

“ধান্দা—” চোখ জ্বলে ওঠে মারিয়ার।

“হ্যাঁ। ধান্দা নয় তো কী, পিরিত?” জোরে হেসে ওঠে সৌম্যদীপ, “মতলবখানা কী! বাপি এসেছিল তিন লাখের জন্য— সেও তো মতলব—”

মারিয়ার শরীর রাগে রিনরিন করতে থাকে।

সে বোঝে সৌম্যদীপ প্রতিশোধ নেবে। অপমান করবে।

একথাও তার কাছে পরিস্কার যে, সৌম্যদীপের চোখ তার শরীরের সর্বত্র পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মারিয়া মরিয়া হয়ে তবু বলে, “এই বয়সে রেলতুচ্কা করলে তো লোকটা মরে যাবে—”

“এইবার বুঝছি, আগমনের কারণ! স্বামী মরবে, সেই ভয়ে! আরে মরলে মরবে—যায় তো যাবে তোর তো যাবে, মোর তো যাবে না—” নিজের রসিকতায় মজা পেয়ে হাউ হাউ করে হেসে উঠল সে।

মারিয়া কঁকড়ে বসে আছে। কী বলবে সে জানে না।

“কিছু পেতে গেলে, কিছু তো দিতেই হয় মারিয়া! এ তো আমার নিয়ম নয়, পৃথিবীর নিয়ম!”

সৌম্যদীপ ধারালো চোখে তাকাল।

মারিয়ার শরীরে ঘাম। তার বুক কাঁপছে।

সৌম্যদীপ খাবে তাকে। থাবা শানাচ্ছে।

মগরাহাট ক্রমশ জঙ্গল হচ্ছে।

মারিয়া হরিণী।

“সামনের রোববার দেখা হচ্ছে—”

সৌম্যদীপ হাসল।

মারিয়া কোনওমতে ফিরে এল স্টেশনে।

সে যে সৌম্যদীপের কাছে এসেছে, বাপি

একথা জানে না।

ছয়

রোববার। বিকেল।

মগরাহাট স্টেশন ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে।

রেললাইনের দু'দিকে শাকসবজির

খেত। সবুজের বুক বকের ডানা।

ছাতারের দল বাঁশের বনে খেলায় ডুবে আছে। হাঁস ডুবে আছে পুকুরে। মাছরাঙা ডুবে আছে আকাশের রূপে।

এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে সৌম্যদীপ, তার সেক্রেটারি ও চারজন কর্মচারী। ওদিকে বাপি আর মারিয়া।

মারিয়া আজ গোলাপি শাড়ি পরেছে। সৌম্যদীপ তাকাল। রোদ্দুরে মারিয়ার কোমরে ঘামের বিন্দু। সে আজকে সেজেছে কেন? বাপির জন্য শেষবার?

সৌম্যদীপের বুকের ভেতর ঘোড়দৌড় চলছে।

ট্রেন লাইনের ওপর বাপি—নিচু হয়ে রেলট্র্যাক থেকে প্যাকেট, প্লাস্টিক সরাসে।

তকতকে করে নিচ্ছে ট্র্যাক।

তার চোয়াল শক্ত। চোখ ধারালো।

কোমরে গামছা। হাতে বিড়ি।

সৌম্যদীপ মনে মনে হাসল। বাপি তার পুরনো ফর্মে ফিরতে চাইছে। পারবে না। সে মোটা হয়ে গেছে, তার অভ্যেস চলে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, তার একটা বড় হাট অ্যাটাক হয়ে গেছে— হৃদযন্ত্র দুর্বল। এই চাপ নিতে পারবে নাকি আর? অসম্ভব!

সেক্রেটারি ও কর্মচারীরা নিজেদের মধ্যে নিচুস্বরে কী সব বলছে।

হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠল

সৌম্যদীপের— “আসছে?”

বাপির দিকে তাকাল সৌম্যদীপ।

চোখাচোখি হল। বাপি মাথা নাড়ল। শুয়ে পড়ল ট্র্যাকে!

দূর থেকে ট্রেনের শব্দ। লাইন কাঁপছে।

সৌম্যদীপ তাকিয়ে আছে। মারিয়া

পাথর। উন্মত্ত দানবের মতো গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে মালগাড়ি।

তলায় বাপি নস্কর। এই তার অন্তিম শয়ন। এই তার মৃত্যুশয্যা।

মালগাড়ি এল দূরন্ত গতিতে। চলে গেল।

সৌম্যদীপ আর মারিয়া ছুটে গেল ট্র্যাকে।

উপড় হয়ে শুয়ে আছে বাপি। নিঃসাড়।

“বাপি! বাপি!” সৌম্যদীপ চুঁচিয়ে উঠল।

কোনও সাড়া নেই। তবে কি... মারিয়ার দিকে তাকাল সৌম্যদীপ।

মারিয়ার চোখ জ্বলছে। সে দ্রুত বাপিকে চিৎ করে শুনিয়ে বোতল থেকে ছড়ছড় করে

জল ঢালতে লাগল তার মাথায়। পাগলের মতো বাপির মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল—“ওঠো, বাপি ওঠো! কিছু হয়নি!” সৌম্যদীপ তাকিয়েছিল মারিয়ার দিকে। তার গা-জ্বালা করছিল। ন্যাকামি যত! সে বুঝতে পারছিল, বাপি আর নেই। তার হাসতে ইচ্ছে করছিল। আরে বাবা, অন্ধ রয়েছে তো! বাপির হৃদযন্ত্র বিকল হয়েছে। সোজা কথায় যাকে বলে হার্ট ফেল। বাপি মৃত! কত জল আর ঢালবে মারিয়া? একটা গোটা নদী বাপির মাথায় ঢাললেও সে আর উঠবে না!

চোখ খুলে তাকাল বাপি।
কনুইয়ে ভর দিয়ে শরীরটাকে হেলিয়ে হড়হড় করে বমি করল।
মারিয়ার হাত থেকে বোতল নিয়ে মুখ ধুয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।
বাপির জামা ঘামে-জলে ভিজে সপসপ করছে। সে ঈষৎ কাঁপছে।
বেঁচে আছে! লোকটা বেঁচে আছে কী করে? বাপির মুখ লালচে।
সে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে সৌম্যদীপের দিকে হাত বাড়াল—“টাকাটা!”
হতভঙ্গ সৌম্যদীপ ইশারা করল।
সেক্রেটারি বাপিকে বলল, “টাকাটা কাল অফিস থেকে নিয়ে যাবেন!”

রেললাইনের ধার ঘেঁষে মারিয়ার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছিল বাপি।
মারিয়ার জামরুলের মতো সাদা পিঠে বাপির খয়েরি ধুলোটে হাত।
লাইনের ধারে পুটুস আকন্দ দাদমর্দনের ঝোপে সাদা প্রজাপতির ওড়াউড়ি।

সাত

অন্ধ মিলছে না। কিছুতেই মিলছে না।
এতদিন পর একবারে নিখুঁত রেলতুচ্কা করতে কী করে পারল বাপি?
তার তো মরার কথা, তবু মরল না!

সৌম্যদীপ গাড়িতে করে ফিরছিল। তার গরম লাগছিল।
ড্রাইভারকে বলল, “এসি বাড়ান!”
“স্যার, ফুল করা আছে—”
সৌম্যদীপ ভেবেই চলেছে। অন্ধ ঠিক কোথায় ভুল হল!
সে লোক পাঠিয়ে নিউ গড়িয়ায় বাপির ভাড়া বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করেছিল।
বাপি কোন রিটেল স্টোরে কাজ করে, মারিয়া কোন বিউটি পার্লারে কাজ করে—
তার কাছে সব খবর ছিল।
অথচ সৌম্যদীপ এ খবরটা পায়নি যে, গত তিনদিন ধরে বাপি নস্কর প্রতাহ একবার করে বারুইপুর লাইনে রেলতুচ্কা করেছে।

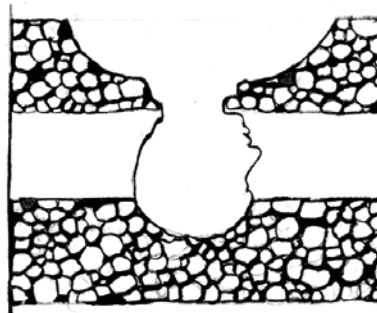
মারিয়ার সাহায্যে।

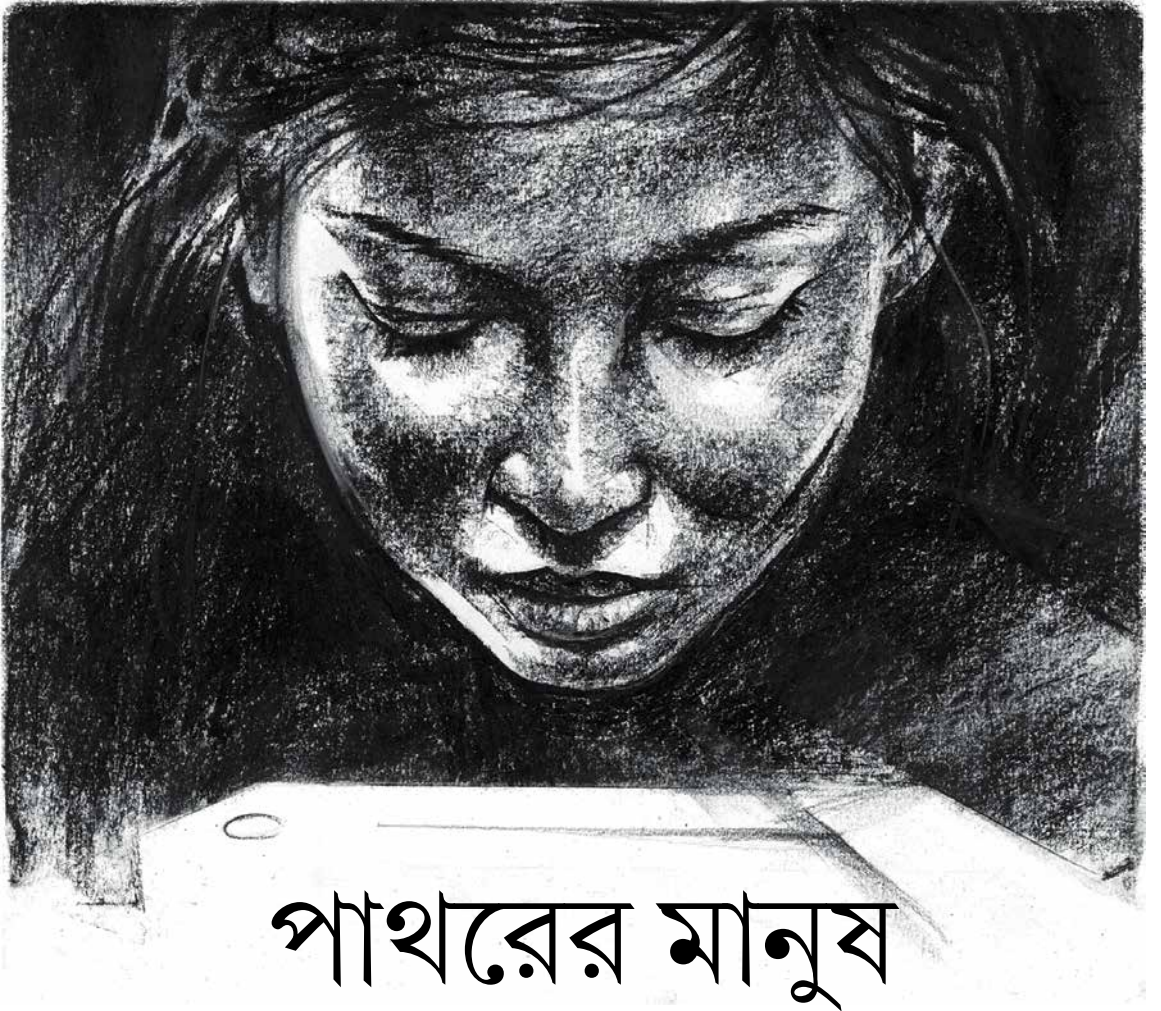
তারা একসঙ্গে প্রস্তুতি নিয়েছে। একসঙ্গে পরামর্শ করেছে। একসঙ্গে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েছে।

একটু তলিয়ে লক্ষ করলে সৌম্যদীপ দেখতে পেত এক নীরব তফাত— আগের মতো বাপি চিৎ হয়ে শোয়নি, সে এবার উপুড় হয়ে শুয়েছিল। সৌম্যদীপ জানল না যে, এই পদক্ষেপ বাপি ও মারিয়ার বিনিময় রাত্রির যৌথ পরিকল্পনার ফসল। সে বুঝল না যে, আজ শুধু তার ছেলেবেলার বন্ধু বাপি নয়, একটা গোটা পরিবারের সঙ্কল্প শুয়েছিল ওই রেললাইনে।

বিস্তীর্ণ সবজি খেতের মধ্যে দিয়ে পথ চলে গেছে টাউনে। দক্ষিণের বাতাসে দুলছে পাতার সাম্রাজ্য। সন্ধে নেমেছে পৃথিবীর জানালায়। এমন তমিষায় এই বিশ্বসংসারে কত কিছুই না ঢাকা পড়ে যায়। ঘোর অন্ধকারের আড়ালে কত কী যে লুকিয়ে থাকে, তা চতুরতম মানুষও ধারণা করতে পারে না। যেভাবে সৌম্যদীপ কখনও ধারণা করতে পারবে না যে, মারিয়াকে সেদিন গভীর অপমান করে সে এক প্রতিশোধকামী ক্রুদ্ধ হস্তিনীর জন্ম দিয়েছিল!

অঙ্কন: প্রসেনজিৎ নাথ





পাথরের মানুষ

অংশু পাণিগ্রাহী

বিনয়কাকার লম্বা ফর্দ মিলিয়ে মালপত্র মাগছি, বিশ্রী শব্দ করে বাসটা এসে থামল দোকানের সামনে।

ঝেঁপে বৃষ্টি হচ্ছিল। বাস থেকে নেমে মাথা বাঁচাতে দোকানে এসে উঠল মধুবনি। বাহারি খোঁপা, চোখে গাঢ় কাজল, পারফিউমের গন্ধ বেরোচ্ছে ভুরভুর করে। এথনিক প্রিন্টের শাড়িটার আঁচল দিয়ে মাথা মুছে বলল, “কী রে, কেমন আছিস?”

মধুবনির বাড়ি আমাদের দুটো পাড়া পরেই। স্কুলের পরে কলেজেও সে আমার সহপাঠী ছিল। তবে এখন আর সেভাবে কথাবার্তা হয় না।

বলি, “ওই আর কী, আছি। তোর কেমন কাটছে?”

“চমৎকার।”

“হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।”

“বিউটিফুল দেখাচ্ছে। তাই না? স্কুলে সবাই বলছিল,” মধুবনির কণ্ঠে গর্ব।

“স্কুল,” ডালের গামলাটা কোনওরকমে সামলে বলি, “পার্টাইম? টিচার? কবে থেকে?”

“উহু, বৃষ্টি হয়েও গরমটা কমছে না,” আঁচল দিয়ে বাতাস করতে-করতে সে বলে, “যাহ! ক্লার্কের চাকরি তো! পার্মানেন্ট। আজই জয়েনিং ছিল। জানতিনা বুঝি?”

ক্লার্কশিপের পরীক্ষা আমিও দিয়েছিলাম। অর্ধেক প্রশ্নে দাঁত ফোটাতে পারিনি।

মধুবনিও তেমন কিছু বিদূষী নয়। মাথায়-মাথায় ইতিহাসে অনার্স টিকিয়েছে। আমার রেজাল্ট সামান্য উন্নততর। অবশ্য ইতিহাসের বাইরে অন্যান্য বিষয়ের হালত দু’জনেরই সমান খারাপ। আমি অঙ্ক পারি না তো সে ইংরেজিতে গোড়ুস। দিনভর বাড়ির ছাদে

নাচতে দেখা যায়। অন্তত আমি যতবার ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে গেছি, চোখে পড়েছে। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, শীত... কোনও বাধাকেই তোয়াক্কা না-করে সে নেচে চলে। নাচ বলতে যেমন-তেমন করে কোমর দোলানো। মোবাইলে রেকর্ড করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে। একবার তো বৃষ্টিতে নাচতে গিয়ে পা পিছলে কোমর ভেঙে ফেলেছিল।

এ হেন মধুবনি পরীক্ষায় পাশ করে, ইন্টারভিউ টপকে চাকরিও পেয়ে গেল?

অবিশ্বাসের ভাবটা বোধ হয় আমার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল। সেটা লক্ষ করেই মধুবনির ঠোঁট অবজ্ঞায় বেঁকে গেল। বলল, “তুইও ক্লার্কশিপের পরীক্ষা দিয়েছিলি না?... যাক। শুনছি, সামনে মাস্টারির পরীক্ষা হবে। ওতে কিন্তু অঙ্ক থাকবে না, শুধুই নিজের সাবজেক্ট। পরীক্ষা দিবি তো, নাকি... বিয়ে-

টিয়ে করে নিবি?”

“ঠিক নেই।”

“তোকে নিয়ে কত আশা ছিল আমাদের! মাস্টার্স করবি, নেট-সেট, পিএইচডি... বাট কোথায় কী, পাতি বিএড করে দোকানদারি করছিস। খারাপ লাগছে রে!”

বৃষ্টিটা ধরেছে। হাত নেড়ে টা-টা করে গর্বিত রাজহংসীর মতো বেরিয়ে গেল মধুবনি।

নিজের দিকে তাকালাম। মাথা থেকে ঘাম ঝরছে টপটপ করে। সালোয়ার-কামিজ হলুদ-লঙ্কায় মাখামাখি। প্লাস্টিকের ছোট ফ্যানে গরম কাটছে না। মধুবনি বিদ্রূপ করে শেষ কথাগুলো বলে গেল। আমি যোগ্য জবাব দিতে পারলাম না। মালপত্রের এই ঠাসাঠাসি, ভ্যাপসা গুমোট আবহের মধ্যে বসে চিনি-ময়দা মাপতে-মাপতে কী জবাবই বা দেওয়া যেত!

বিরক্তটা বাড়ছিল চড়চড় করে। সেই সঙ্গে অসহায়তা। ইচ্ছে করছিল, কাচের বয়ামগুলো তুলে একটা করে আছড়ে ভাঙি সামনের শানবাঁধানো চাতালে। বনবান শব্দে যদি স্বস্তি হয়।

“টুকু জলদি কর রে মাইরি! বেসন দিচু তো? বৃষ্টি হইলেই তোর কাকির পিঁয়াজি লাগে। বেসন লি নাই গেলে আমাকে ভাজকি খাই পেকিবে...”

বিনয়কাকার কথায় সম্বিং ফেরে। সংযত করি নিজেকে। ভাত-ঘুম না-দিলে বাবার নাকি মাথা ধরে। কাজেই বিকেলের এই সময়টা আমাকেই দোকানে বসতে হবে। মধুবনি ফিরবে স্কুল থেকে, ডাঁট দেখাবে, ভেবেই চিড়বিড়িয়ে উঠছে শরীর।

নাহ, চাকরি-বাকরি একটা পেতেই হচ্ছে। তা হলেই জোঁকের মুখে নুন পড়বে।

দোকানের পরে টিউশন।

আজও দেবার্য আমার বুকের দিকে তাকাচ্ছিল। অন্যান্য দিনের থেকে একটু বেশিই।

মাসখানেক ধরে এই চলছে। প্যাঁচার মতো গোল-গোল চোখে হাঁ করে দিদিমণির বুক দেখে দেবার্য। ইচ্ছে করে, উত্তম-মধ্যম দিয়ে অসভ্যতা চিরতরে ঘুচিয়ে দিই। অভিভাবকের তরফে সেই ছাড়ও দেওয়া আছে। প্রথম দিনই ওর মা বলেছিলেন, “দ্যাখো বাপু, আমরা ওরকম নই যে, টিচার বাচ্চাকে পানিশ করল, অমনই থানায় দৌড়লাম। আমার ছেলেকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। তোমার ছাগল, এখন তুমি মার্টিন দোপেঁয়াজি করবে নাকি বিরিয়ানি, সে তোমার ব্যাপার।”

অভিভাবকেরা অবশ্য এ ধরনের ফাঁদ পেতেই থাকেন। মহাপুরুষের প্রাইভেট টিউটরদের থেকে ঢের শুনেনি। তা ছাড়া বিএডে শিখছি, শিক্ষক হবেন ধৈর্যশীল। শিশুকে শারীরিক নির্যাতন তো দূরস্থান,

বকাবকিও নিষিদ্ধ। বইয়ের ভাষায়, বিপথগামী শিশুকে উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করে সঠিক পথে ফেরানো শিক্ষকের কর্তব্য।

“তোমার কি চোখের কেনও সমস্যা হচ্ছে, দেবার্য? তোমার তো আমার মুখের দিকে তাকানোর কথা। চোখের মণি এদিক-ওদিক ঘুরছে কেন?” ওড়না দিয়ে গলা অবধি ঢেকে বললাম।

“সরি দিদি...” দেবার্য বইয়ের দিকে তাকায়।

ক্লাস এইট চলছে ওর। শূঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হওয়ার বয়স। মনে কৌতুহলের অন্ত নেই। কিন্তু তাই বলে আমিই কেন?

বিএডের জ্ঞান ফলিয়ে বলি, “দ্যাখো, কাউকে অসম্মান করতে নেই। বিশেষ করে বয়সে বড় মেয়েদের তো একেবারেই নয়। এই যেমন, মা, কাকিমা, দিদিমণি...”

“কাজের মাসি?”

“অ্যা! হ্যাঁ হ্যাঁ, কাজের মাসিই বা নয় কেন? তাঁকেও সম্মান করা উচিত।”

“আচ্ছা। আমার বাবা করে। একবার মা বাড়িতে ছিল না, বাবা বিছানায় শুইয়ে কাজের মাসির হাত-পা টিপে দিয়েছিল। দরজার কি-হোল দিয়ে আমি দেখেছি...”

খুক-খুক করে কেশে চাপা দিই ওকে। বিপথগামী শিশুর কাউন্সেলিং অন্যদিকে চলে যাচ্ছে।

দেবার্যকে ইতিহাস, ভূগোল আর বাংলা পড়াই। সপ্তাহে তিনদিন। মফসসলে এমনিতেই টিউশনের বেতন কম, তার উপর দেবার্যর বাবা দীর্ঘদিন মাইনে দেন না। লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়ার উপায় নেই। আমার সঙ্গে সময় মেলে না। ফোন করলেও তোলেন না। অনেকবার ভেবেছি, আর পড়াতে আসব না, মাইনে হয় না ঠিক করে। সেক্ষেত্রে আবার পুরো টাকাটাই মার যাওয়ার আশঙ্কা।

দেবার্য মাঝে-মাঝে চুরি করে আমার বুকের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে। এমনিতেই মধুবনির জন্য মেজাজ খটে ছিল, এখন মাথাটা আরও তেতে যায়। শিক্ষাতত্ত্ব মূলতুবি রেখে দেবার্যকে চাবকানোর জন্য নিশপিশ করতে থাকে হাত।

রাতে খেতে বসে মা শুরু করল, “তোমার মাসির ননদের হাতে একটা ভাল ছেলে আছে। কথা বলি?”

ফি হণ্ডায় এক-একজন আত্মীয়ের নাম করে মা বিয়ের কথা তোলে। গুরুত্ব না-দিয়ে আমি মাছের কাঁটা বাছতে থাকি।

“কী রে?” মা আবার তাগাদা দেয়।

“ভাল ছেলে কীভাবে বোঝা গেল? মাসির নন্দ কি ছেলের কানকো তুলে, টিপে-টুপে দেখেছে?”

“ধুর! ছেলে কি মাছ? তোর যেমন কথা। ও

সব বোঝা যায়। চুল পাকলে তুইও বুঝবি।” “মাথা খারাপ করিয়ো না। আগে চাকরি, তার পর বিয়ে।”

মা তেরিয়া হয়ে বলে, “বছরপাঁচেক ধরে এই কথা শুনে আসছি। চাকরি আর কবে পাবি? ঘরে বসে-বসে ধুমসি হচ্ছিস খালি।”

“চাকরি পাওয়া অত সোজা নয়। এখন চাকরির জন্য লাখ-লাখ টাকা দিতে হয়। আমাদের অত টাকা কোথায়?”

এ বার বাবা মুখ খুলেছে।

“তুমি এ সব জানলে কোথেকে?”

বাবার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাই।

“এই তো সন্ধ্যাবেলা দোকানে আলোচনা হচ্ছিল। প্রশান্তর মেয়েটা নাকি ঘুষ দিয়ে কেরানির চাকরি পেয়েছে! দালাল আছে আমাদের এলাকাতেই।”

প্রশান্তর মেয়ে মানে তো মধুবনি! গলায় কাঁটা আটকায় আমরা।

রাতে বিছানায় আছড়ি-পিছাড়ি করতে থাকি। লোকজন কি হিংসে করে মধুবনির নামে মিথ্যা রটাচ্ছে? স্থায়ী চাকুরেদের প্রতি মানুষের একটা সহজাত ঈর্ষা আছে। এলাকার কেউ চাকরি পেলে অনেকেই চোখ টাটাবে, এ আর আশ্চর্য কী! অবশ্য মধুবনির দুর্নীতির মাধ্যমে চাকরি পাওয়ার কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে আমার। আশ্চর্য এক প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে শরীরের প্রতিটি স্নায়ু-শিরাতে। মধুবনির ওই দস্ত আসলে অসার। শূন্যগর্ভ কলসির গর্জন। তবে এই কানামুঘোয় যদি ছিটেফোঁটাও সত্যি থাকে, তা হলে নতুন একটা সম্ভাবনার দরজাও কি খুলে যাচ্ছে না? বাকি রাত আর দু’চোখের পাতা এক হয় না আমার।

আমার শিক্ষকতার চাকরি পাওয়া কতটা জরুরি?

মধুবনির সঙ্গে স্কুলের সময় থেকেই চাপা খিটিমিটি। মগজে দু’জনেরই শুকনো গোবর। তবে সে ডাকসাইটে সুন্দরী আর আমি কেলেকুলো। শরীর একটু ভারীর দিকে, মুখের কোনও ছিরিছাঁদ নেই। ফলে, অন্তত সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে সে আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। এখন তো চাকরিও করছে। আমি চাকরি পেলে মধুবনির রোয়াব খানিকটা কমবে। মুখে বামা ঘষে দেওয়া যাবে।

চাকরি যেভাবেই পাই, তাতে কী? লোকজন সন্দেহ করবে বড়জোর, ফিসফাস করবে। গায়ে না-মাখলেই হল।

হাতখরচ চালানোর জন্য বাধ্য হয়ে টিউশন পড়াতে হয়। চাকরি পেলে সেটা বন্ধ করা যাবে। বিয়ে নিয়ে মায়েয় ঘ্যানঘ্যান থামবে। আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হলে, বিয়ে করব কিনা, সে সিদ্ধান্ত নিজের। সবচেয়ে বড় হল সামাজিক সম্মান। মাস্টার হওয়ার ঘ্যামই আলাদা।

এ বার আমার যা বুদ্ধিবৃত্তি আর পড়াশোনার অবস্থা, যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইতে নামার ফল নিশ্চিত পরাজয়। এ আমার চেয়ে ভাল কে জানে?

এমনিতে আমি সততার পরাকাষ্ঠা বা আদর্শবাদী নই। তবু পেরেকে জামা আটকানোর মতো কিছুতে যেন টেনে রাখছিল, সহসা এগোতে দিচ্ছিল না। পেরোতে হচ্ছিল চিন্তাভাবনার অনেক ঘাট। কোনও ধরনের পিছুডাকে পাত্তা না-দিয়ে চেষ্টা করছিলাম পাথরের মানুষ হওয়ার।

দিনসাতেক পর হাজির হলাম দেবাশিসের বাড়িতে। দেবাশিস বাড়ির সামনের জমা জল বেরনোর নালা কাটছিল। আমাকে দেখে বলল, “কত রাজা-মহারাজা এল গেল, রাস্তাঘাটের উন্নতি হল না। দাদু ইংরেজ আমলে পান সাফ করত, বাবা করেছে আগের জমানায়, আর এখন আমি করছি।”

“তোর নাকি উপরমহলে খুব যোগাযোগ! তাদের ধরলে রাস্তা পাকা হবে না?” বললাম আমি।

“কী চাই?” চোখ সরু করে দেবাশিস।

“চাকরি।”

কোদাল রেখে এদিক-ওদিক তাকাল সে। বলল, “আস্তে, আস্তে। এ সব কথা গলা তুলে বলতে আছে? কে কোথায় শুনে ফেলো!”

আমাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসায় দেবাশিস।

বলি, “তুই নাকি চাকরির বড় চাই! ঘরদোরের এই দশা কেন? টাকা-পয়সা মাটিতে পুঁতে রাখিস নাকি?”

“লোকে অনেক কথা বলে। সব কথায় কান দিতে নেই,” গামছা দিয়ে মাথার ঘাম মুছে বলে সে।

“শুনলাম, মধুবনীর চাকরি তুই করিয়েছিস।”

“কীটাণুকীট, দাসানুদাস আমি। এইট-পাশ নগণ্য মনিষ্য। আমার কী-ই বা ক্ষমতা!”

“ছেঁদো কথা রাখ। মাস্টারির চাকরি পাইয়ে দিতে পারিস?”

“কার জন্য? তোমার?” দেবাশিসের গলা আরও এক পর্দা নিচু।

ইতিবাচক মাথা নাড়ি।

“তোমার আবার চাকরির দরকার! চালু মুদির দোকান। ভাসাভাসি কারবার। চাকরিতে ক’পয়সা? এই আমাদের মতো দরিদ্র প্রাণীর বরং একটা চাকরি-বাকরি জুটলে মন্দ হত না।”

“তুই তো পঞ্চায়েত অফিসে কাজ করিস।”

“ধুর, ওটা আবার চাকরি! অ্যাড হকের কাজ। যে-কোনওদিন ফুটস...”

“আসল কথায় আয়। রোট চার্ট বের কর। কেমন কী দর ধরেছিস দেখি?”

আমি অধৈর্য হয়ে উঠি।

“ও, সব খবর নিয়েই এসেছ!”

চোখে চশমা এঁটে একটা কাগজ হাতে নিয়ে দেবাশিস পড়তে শুরু করে।

হায়েস্ট রেটে পরীক্ষা ছাড়াই চাকরি, পরীক্ষা প্লাস সাদা খাতায় রেস্ট্র একটু কম খসবে। মেরিট লিস্টে নাম থাকবে, আর সর্বনিম্ন দরে সাদা খাতা। সেক্ষেত্রে লিস্টে নাম থাকবে না, প্যানেলের বছরখানেক পরে জয়েনিং।

শেষের প্যাকেজটাই পছন্দ হয়। বলি, “রোটটা বড্ড বেশি।”

“না দিদি, সরি! পার্মানেন্ট চাকরি। এর কমে হয়? দ্যাখো, তোমরা পড়াশোনায় ভাল। টিচিং-লাইনে তোমাদেরই আসা দরকার। শিক্ষক হল জাতির মেরুদণ্ড। তোমার জায়গায় যদি অযোগ্য লোকজন ঢুকে পড়ে, তারা কি পড়াতে পারবে? বাচ্চাদের ভুল শেখাবে তো! বিরাট ক্ষতি, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পঙ্গু হয়ে যাবে। একটা জাতিকে ধ্বংস করতে চাইলে, তার শিক্ষাব্যবস্থা নষ্ট করে দাও, কোন একটা দেশের সংবিধানে লেখা আছে না? তাই টাকা পাচ্ছি বলে কি যাকে-তাকে ঢুকিয়ে দেব? শুধু তোমার জন্য রোট খানিকটা কমিয়ে বলেছি। বলো এ বার...”

আহা রে, ছেলের ভারী হিতাকাঙ্ক্ষা, নৈতিকতা আর মূল্যবোধ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি আমি।

দুই

বাবা আজকাল কম কথা বলে। কেউ কিছু জানতে চাইলে, তবেই উত্তর দেয়। রাতটা বাড়িতে থাকে, আর দুপুরে খাওয়ার সময়। বাকি দিন কাটে আমাদের মুদির দোকানের বেঞ্চে বসে শূন্য চোখে চেয়ে বিক্রিবাটা দেখে। দোকানটা অবশ্য আমাদের নেই এখন। বেচে দেওয়া হয়েছে।

দোকান বিক্রির প্রসঙ্গ যখন বাড়িতে তুলি, বাবা-মা একসঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছিল। দোকানটা চলে গেলে আমার চাকরিপ্রাপ্তির আগে অবধি সংসারের গতি কী হবে? বিকল্প কোনও আয়ের উৎস নেই আমাদের। জমি-জমাও নেই।

আমার সন্তায় যে পাথরের পোঁচ পড়তে শুরু করেছে, এই প্রথম রৈ পেয়েছিলাম। রুক্ষ গলায় বলেছিলাম, “যে-কোনওভাবে রোজগার করলেই হয়। বেশি তো নয়, বছরদুয়েক। বাবা না-হয় ঘুগনি-ঝালমুড়ি বেচবে। ঘুগনিওলাদের কি মান-সম্মান থাকে না? চাল-তেল-আলু বিক্রিই বা কী এমন উঁচু জাতের পেশা!”

বাবা আমতা-আমতা করছিল, “তা নয়। আসলে, চালু দোকান ছেড়ে দেব? দোকান বিক্রির টাকাও তো রাখা যাবে না। দেবাশিসকে দিতে হবে। নতুন ব্যবসার ক্যাপিটাল কোথায়

পাব?”

“ঘুগনি ব্যবসার মূলধন?” অটুহাস্য করেছিলাম।

মা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল, “দোকানটাকে তোর বাবা ভালবাসে। অনেক কষ্ট করে টাকা জমিয়ে গড়ে তুলেছে। তোর বাবার স্বপ্নও আছে, ব্যবসাটা বাড়ানো, একটু বেশি মালপত্র রাখা। বলতে নেই, বিক্রিবাটা তো খুব একটা খারাপ হচ্ছে না...”

এ সব আবেগের কথায় টসকালে চলবে না। মাকে থামিয়ে বলেছিলাম, “ছ্যাং! লোকে নোবেল পুরস্কার, এভারেস্টে ওঠা, নিদেনপক্ষে স্কুলমাস্টারির স্বপ্ন দেখে। এ একেবারে মুদির দোকানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা! জন্মে শূনি... আচ্ছা, তুমি বাবার স্বপ্ন নিয়ে চিন্তিত, আর আমার ইচ্ছের কোনও দাম নেই? তুমি কি চাও, গৃহবধু হয়ে তোমার মতোই বাকি জীবনটা নষ্ট করে দিই?”

শেষ পর্যন্ত আমার জেদের কাছে বাবা-মা নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষক-নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় বসেছিলাম। সেই নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার পর বছরখানেক কেটে গেছে। দেবাশিসের আশ্বাস অনুযায়ী, এ বার আমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে। যে-কোনওদিনই প্রাপ্তিসংবাদ আসবে।

মা পাঁচ-বাড়ি বাসন মাজতে শুরু করেছিল। ওতেই কোনওরকমে চলে যাচ্ছে। আমার রোজগার শূন্য। টিউশনির মাইনের কথা দেবার্ঘ্যর মায়ের কাছে তুললেই ইনিয়ে-বিনিয়ে মহিলা বলতেন, “ব্যবসায় মন্দা চলছে, আর কয়েকটা দিন সময় দাও। তোমার দাদা ওরকম নন, টাকা মারবেন না। খুব উদ্যমী জানো তো! প্রায়ই বলেন, গরিব হয়ে জন্মানো অপরাধ নয়, গরিব হয়ে মরাটাই অপরাধ।”

আমি বলতাম, “এটা দাদা বলেন? এ বোধ হয় বিল গেটস-এর কথা।”

“বললেই হল? বিল গেটস আবার কে? আসলে তোমার দাদা তো খুব ফেসবুক করেন, কখনও হয়তো ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন, আর ওই বিল গেটস ঝেঁপে দিয়ে নিজের নামে চালাচ্ছে,” মহিলা গর্জে উঠতেন।

আজেবাজে কথার মাঝে আমার পাওনার আলাচনা ধামাচাপা পড়ে যেত।

দিনকয়েক আগে মহিলা ফোন করে বললেন, “ছেলে একেবারে বখে গেছে। তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবেই অন্য টিচার দেখছেন তোমার দাদা। তোমার আর আসার দরকার নেই।”

আমাকে কথা বলার সুযোগ না-দিয়েই কট করে ফোন কেটে দিয়েছিলেন মহিলা।

হাজার দশেক টাকা পাওনা ছিল। সে কথা বলার সুযোগই পেলাম না। বাড়ি গিয়ে হল্লা পাকিয়ে টাকা আদায় করার ইচ্ছেও হয়নি। দেওয়ার মন থাকলে এমনিই দিত।

সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকি আর সম্ভাব্য চাকরির কথা ভাবি। উদ্বেগও কম হয় না। নিয়োগপত্র হাতে না-পাওয়া অবধি স্বস্তি নেই। টিভির খবরে দেখছি চাকরির নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ। দুটো গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত শুরু করেছে। দু’-একজন করে চাইও নাকি ধরা পড়ছে।

প্রথমবার এই খবর জেনে বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। দৌড়েছিলাম দেবাশিসের কাছে।

দেবাশিস বলেছিল, “তুমি এত টেনশন কোরো না তো! আমার লাইন সরাসরি টপমোস্ট লেভেলে। ওই অবধি গোয়েন্দারা পৌঁছেবে না। দু’-একটা চুনোপুঁটি ধরেই মামলা গুটিয়ে নেবে। আরে, ছাপ মারা নিয়োগপত্র পেয়েছে সবাই, চাকরি চলে যাবে নাকি? এতই সহজ?”

“আমি তো এখনও নিয়োগ পাইনি?” কাতর হয়ে বলেছিলাম।

“তোমার লেটার তৈরি হয়ে গেছে। আমি খবর পেয়েছি।

হুপ্তাখানেক বড়জোর। একবার জয়েন করে যাও, কার সাধ্য বরখাস্ত করে! পার্মানেন্ট চাকরি... হুঁ হুঁ বাবা!”

দেবাশিসের উপর আস্থা রাখা ছাড়া উপায় কী? ও-ই আমার অক্ষের যষ্টি, উত্তাল সমুদ্রের নাবিক। ওর ভরসাতেই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। এখন মরণ-বাঁচন ওর হাতে। আশায়-আশঙ্কায় দিন গোনা ছাড়া আমার করণীয় কিছুই নেই।

মা মাঝেমধ্যে বলে, “তোর চাকরি কবে হবে?”

“আমি কী জানি! দেবাশিস তো বুলিয়ে রেখেছে,” বিরস গলায় বলি।

“ও। শুধু বসে আছিস কেন? কাজকর্ম দু’-একটা করতে পারিস।”

“টিউশন পাচ্ছি না।”

“অন্য কাজ করা। এখন তো লোকজন কত উপায়ে রোজগার করে! তুই কেন পারবি না?”

এর আর উত্তর কী দেব?

মা আবার বলে, “মিশ্রদের নতুন বৌয়ের রোজগার জানিস? মাসিক পঞ্চাশ হাজার টাকা।”

“কলেজের প্রোফেসর?”

“দূর! বাড়িতে বসে রোজগার করে। একটা হাত-কাটা মশারি-নাইটি পরে শুয়ে থাকে। কখনও মাথার চুল বাঁধে, কখনও খোলে, বড় বড় হাই তোলে। হাত দুটোকে... এই এ রকম মাথার উপর তুলে পিঠ টান করে... কী যেন বলে...”

“আড়মোড়া ভাঙে,” আমি পাদপুরণ করি।

“হ্যাঁ হ্যাঁ,” মা ধরে নেয়, “ওই করে। ঘরের এককোণে ফোনের ক্যামেরা খোলা থাকে। ফোনের ভিতর থেকে কারা যেন সব দেখে! তাদের লক্ষ করে মেয়েটা বলে, ‘আজ আমার শরীর ভাল নেই ফ্র্যাং। কোন-কোন জায়গায় ব্যথা, দেখতে চাও?’... এতেই কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা রোজগার হয়! কে দেয় রে এত টাকা?”

“জানি না।”

“ইয়ে, পালদের বড় ছেলে বিদেশে থাকে। কতবেল না কী যেন নাম দেশটার... আরে, সেই যে, যেখানে খুব তেলের ব্যবসা। বস্তায় ভরে টাকা পাঠায় বাড়িতে।”

অনেকদিন পর মায়ের মুখের দিকে তাকাই। চোখের চতুর্দিকে কালো বৃত্ত, ভাঙাচোরা মুখে বলিরেখার মানচিত্র, রংগের পাশের চুলে রূপোলি ছোপ। সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে সংগ্রামের দগদগে চিহ্ন। বয়সটা একধাক্কায় অনেক বেড়ে গেছে। মায়ের চোখে কাতর আকৃতি, যেন বলতে চাইছে, লোকের বাড়ি-বাড়ি বাসন মাজতে আর ভাল লাগছে না। তুই মেয়ে, যে করেছে হোক, ঘরে দুটো পয়সা এনে দে। শুয়ে-বসে সময় কাটাস না এ ভাবে।

মুখ ঘুরিয়ে নিই। ক্ষণিকের দুর্বলতাটা কাটিয়ে আবার পাথরের মানুষ হয়ে যাই। এমনিতেই উৎকণ্ঠায় কাটছে প্রতিটা মুহূর্ত, তার উপর মায়ের প্যানরপ্যানর! ঝাঁকিয়ে উঠি, “কী বলতে চাও? হাটের মাঝে ন্যাংটো হয়ে শুয়ে থাকব? নাকি... বিদেশ গিয়ে বেশ্যাগিরি করব?”

মা দু’কানে হাত চাপা দিয়ে কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচে।

বাবার কথাবার্তাও কমছে দিন-দিন। একটা কথা পাঁচবার জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়। এক বার তো রাতে বাড়িই ফিরল না। মায়ের সঙ্গে খুঁজতে বেরিয়ে দেখি, বন্ধ দোকানের চাতালে শুয়ে আছে। পাশে দুটো কুকুর। কোনওমতে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে আসি।

কী যে আছে ওই শটারের পিছনে, খোপটার মধ্যে! আরশোলাদের ওড়াউড়ি, মরা ইঁদুরের গন্ধ, বস্তার গাদাগাদি, লক্ষা-হলুদ-মশলার কড়া বাঁধা... জীর্ণ কোটিরটার মায়া কেন ত্যাগ করতে পারছে না বাবা?

আমার এসব ভাবা চলবে না। ভাবলে অনুশোচনা বাড়বে। পাথর হয়ে থাকতে হবে আমাকে। বাবার মানসিক পীড়া, মায়ের আক্ষেপ ও অসহায়তা আমাকে যেন স্পর্শ না করে। চাকরি পেলে প্রথম মাসের বেতন দিয়ে কী করব, দালালির টাকাটা তুলতে কত মাস লাগবে... শুয়ে-শুয়ে বুনতে থাকি স্বপ্নের গালিচা। বিপর্যয়ের এত কাছাকাছি যে দাঁড়িয়ে আছি, তখনও জানি না।

শিক্ষক-নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় পেয়েছিলাম ৩০। কাট-অফ এসেছিল ৩৫। অর্থাৎ, আর পাঁচটা নম্বর পেলেই ইন্টারভিউর টেবিলে পৌঁছতে পারতাম।

দেবাশিস বলেছিল পুরো খাতাটা ফাঁকা ছেড়ে দিতে। একমাত্র যদি কোনও প্রশ্নের উত্তর নিয়ে চরম আত্মবিশ্বাসী হই, সেটা করে আসতে পারি। এ ভাবেই ত্রিশটা প্রশ্ন করে ফেলেছিলাম। সাতটা উত্তর নিয়ে দোলাচলে ছিলাম। বাড়ি এসে বই মিলিয়ে দেখি, সন্দেহ থাকলেও, যে-অপশনগুলো সম্ভাব্য উত্তর বলে ভেবেছিলাম, সেগুলোই ঠিক। আন্দাজমতো তির ছুড়ে এলেই চলত। স্কোর হতে পারত ৩৭।

এখন বসে আছি দেবাশিসের বাড়িতে। বিপদটা ঘটেই গেছে। গতকাল সন্ধ্যায় জেনেছি সেই চূড়ান্ত আশাভঙ্গের খবর। সহস্রাধিক ক্লার্কের চাকরি বাতিল করেছে কোর্ট। শোনা যাচ্ছে, শুধু ক্লার্ক নয়, স্কুলের পিয়ন, এমনকি শিক্ষকদেরও চাকরি যাবে ধাপে-ধাপে। মর্মার্থ একটাই, আমার ভবিষ্যৎ আপাতত বিশ বাঁও জলে।

রাতভর ছটফট করে, ভোরের আলো ফুটেই চলে এসেছি। কিন্তু সবই অর্থহীন। দেবাশিস ভেগেছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে আমার যাবতীয় আশা আর সম্ভাবনা। জুয়া খেলে রাতারাতি সফল হতে চেয়েছিলাম, দান উল্টে গেছে। একেবারে কপর্দকশূন্য দশা। নিঃস্ব। এখন বাপ-মায়ের সামনে দাঁড়াই কোন মুখে? নিছক দোকান তো নয়, শেষ সম্বলটুকু পণ রেখেছিলাম। নিজের দক্ষতার উপর বিশ্বাস থাকলে হয়তো আজ এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতাম না... শুধুই আফসোস!

দেবাশিসের বাবা-মা কান্নাকাটি করে চলেছেন। বারবার বলছেন, “বিশ্বাস কর মাইব, আমানে কিছু জানিনি। তোর মত আরও লোকবান আইসেটে। কিন্তু দ্যাবা যে কাই গোলা! রাতে খাবার পর শুইতে গোলা, সকাল উঠি দেখি, বিছনা বেবাক ফাঁকা। ফোন বি লি যায়নি সাথে।”

একে-একে আমার মতো প্রতারিত চাকরিপ্রার্থীরা আসছে

দেবাশিসের খোঁজে। সবাই আমাকে চিনে ফেলবে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে। এখানে আর একমুহূর্তও নয়। মুখে ওড়না চাপা দিয়ে দৌড়তে শুরু করি।

মধুবনির বাড়ির কাছে এসে দেখি লোকের জটলা। বাঁভেৎস কাণ্ড।

মধুবনির শরীরটা খেঁতলে পড়ে আছে রাস্তায়। কালো পিচ ভেসে যাচ্ছে রক্তের স্রোতে। তারই ভিতরে অবিরত তৈরি হচ্ছে বুদ্ধদে, ফেটেও যাচ্ছে। বাতিলের তালিকায় নিশ্চয়ই ওর নাম ছিল। প্রিয় নাচের স্টেজ থেকে বাঁপিয়েই জ্বালা জ্বড়িয়েছে।

ফের একবার আমাকে টেক্সা দিল মধুবনি। নিজে তো সহজেই মুক্তি পেয়ে গেল, আমার কী হবে? আমি যে ওর মতো সাহসী নই।

গাছপালা-বাড়িঘর-আকাশ... ঘুরছে বৃত্তাকারে, তালগোল পাকাচ্ছে... পায়ের তলা থেকে পিছলে-পিছলে সরে যাচ্ছে রাস্তাঘাটা। বিস্তীর্ণভাবে গুলিয়ে গেছে সমস্ত পৃথিবী। আমার ভিতরের পাথরের মানুষটাকে খুব দরকার এখন। উদ্ভ্রান্তের মতো হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজতে থাকি...

তিন

বাবার ডায়াবিটিসটা বেড়েছে। রাতে দু'বার পেছাপ করতে বাইরে বেরোয়। আজও উঠেছে।

আমলকী গাছটার পাশে বসে জলবিয়োগ করছিল, নিকষ কালো এক ছায়ামূর্তি হাওয়ার মতো সরসর করে বাবার পিছনে এসে দাঁড়াল। বাবা বোধ হয় মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনে ফিরতে চাইছিল, সঙ্গে-সঙ্গেই ভেঁতা একটা অস্ত্র নেমে এল মাথা লক্ষ্য করে। একবার অক্ষুটে 'আঁক' করে বাবা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

আততায়ীকে পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে। বাড়ির দিকে এগোচ্ছে মানুষটা। বাবা-মায়ের ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। নিপুণ কায়দায় আওয়াজ না-করেই খুলে ফেলল দরজা। বিড়াল-পায়ে পৌঁছে গেল মায়ের কাছে। এ বার হাতে তুলেছে বাবার বালিশটা...

কোথা থেকে একটা টর্চের আলো এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। আততায়ীর পা থেকে শুরু করে শরীর বেয়ে মুখের দিকে উঠছে আলো। রিফ্লেক্সে চোখ বুজে ফেলেছে আততায়ী। অবশ্য এখন আর চেনার অসুবিধে নেই...

কেলেকুলো মেয়ে, শরীর একটু ভারীর দিকে, মুখের কোনও ছিরিছাঁদ নেই...

লাফিয়ে উঠে বসি বিছানায়।

খারাপ স্বপ্ন, খুব খারাপ! আজকাল প্রায় রোজই স্বপ্নটা দেখি। ঘুম ভেঙে বসে থাকি হটুতে মুখ গুঁজে।

পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে মায়ের কাশির শব্দ। পা টিপে-টিপে গিয়ে ঢুকি সেই ঘরে।

অল্ল নাক ডাকছে মায়ের। সন্তর্পণে গিয়ে দাঁড়াই পায়ের কাছে। ঘুমন্ত মায়ের যন্ত্রণাক্রান্ত মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে গিয়ে এই প্রথম বুকুর ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। কোথা থেকে ঝাঁপিয়ে আসে রাজ্যের ক্লান্তি। বাঁধ ভেঙে উপচে পড়ে, আমাকে ডুবিয়ে মারে।

দেবশিশুর অন্তর্ধানের দু'দিন পরে বাবার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল দোকানের সামনেই। রাতে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। মা টের পায়নি। আমরা সকালে গিয়ে দেখি, হাঁ করে পড়ে আছে সিমেন্টের চাতালে। মুখে মাছি ঢুকে যাচ্ছে। খোলা চোখ নিবদ্ধ দোকানের সাইনবোর্ডে। নিথর দেহ আগলে বসে আছে কুকুরদুটো, মাঝে-মাঝে চেটে দিচ্ছে বাবার গাল। দৃশ্য দেখে হড়হড় করে বমি করে

ফেলেছিল মা।

হু-হু উত্তরে হাওয়ার একটা দমক এসে ঢুকছে ঘরের মধ্যে। কেঁপে উঠি হি-হি করে। খেয়াল হয়, আদুড় গায়েই চলে এসেছি। হাত-পা বুকুর কাছে জড়ো করে গুটিসুটি হয়ে বসি খাটের এক কোণে। বাবার ছবিতে টাঙানো শুকনো গাঁদার মালাটা দুলতে থাকে পেডুলামের মতো। আমার গলার কাছটায় কী যেন দলা পাকায়। খোলা জানালা দিয়ে চেয়ে থাকি অন্ধকার মাঠের দিকে। অকূল দরিয়ার মতো বয়ে চলেছে আরও একটা দুর্বিষহ রাত।

হঠাৎই হাওয়ার ঝাপটায় বাবার ছবি থেকে মালাটা খসে পড়ে। ঝুরঝুর করে ভাঙতে থাকে তিলে-তিলে গড়ে তোলা আমার পাথুরে সন্তাটা। আত্মসম্বরণ করতে পারি না আর। গলা চিরে বেরিয়ে আসে বেলাগাম কান্না। মা ঘুম ভেঙে তাকায় ফ্যালফ্যালে দৃষ্টিতে।

মেয়ের মতো দেখতে কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত কার চোখের জলে পায়ের পাতা ভিজ়ে যাচ্ছে?

ও কে?

অঙ্কন: মহেশ্বর মণ্ডল





দুশমন

শ মী ক ঘো ষ

এখানে দিগন্ত নেই। আকাশ আর মাটির মাঝে মাথা তুলেছে কতগুলো পাহাড়। রক্ষ, প্রাণহীন। মাথায় সাদা বরফের মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে চারদিকে। আকাশ ঘন নীল। দু'চারটে সাদা মেঘ থমকে আছে এখানে ওখানে। ঠিক যেন কলকাতার শরতের আকাশ।

ঠান্ডা। খুব ঠান্ডা। কনকনে হাওয়া ডাউন

জ্যাকেট ভেদ করে ঢুকে পড়ছে শরীরের ভেতর। কাঁপিয়ে দিচ্ছে হাড় অবধি। জমে যাচ্ছে হাত। ষোল হাজার ফুট ওপরের হালকা বাতাসে নড়তে চড়তেও কষ্ট হচ্ছে।

খাওয়া হয়নি প্রায় আঠারো ঘণ্টা। গা গুলোচ্ছে সুভদ্র। আসলে নীচে থেকে ওঠার সময় খাবার নেয়ইনি সে। পনেরো কেজি। মেরে কেটে পনেরো কেজি। তার বেশি নিয়ে

ওঠা যাবে না পাহাড়ের অত ওপরে। প্রায় সমুদ্র ডিগ্রির ঢাল বেয়ে। খাবার নেয়নি সুভদ্র। বুলেট আর গ্রেনেড নিয়েছিল যতটা সম্ভব। হাতে ধরা অ্যাসল্ট রাইফেলটা বাঁ-হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে জ্যাকেটের পকেটটা হাতড়ায় সুভদ্র। বেশ খানিকক্ষণ পরে বেরিয়ে আসে চুয়িং গামের প্যাকেটটা। খুলতে যায় সুভদ্র।

“লিজিয়ো” পাশ থেকে একটা শব্দরপারা

এগিয়ে দেয় ব্রিজলাল। আটা আর চিনি দিয়ে তৈরি শক্ত নিমকি। হাতে নিয়ে কামড় বসায় সুভদ্র। কড়া মিষ্টিতে আরও গা গুলিয়ে ওঠে তার। খুব জল তেঁপা পায়। সাধারণত এমন উচ্চতায় জল খেতে হয় বারেকারে। কিন্তু অত নীচে থেকে খাড়া পাহাড় বেয়ে জল আনা যাবে না। কম্যান্ডিং অফিসার কর্নেল সোধি তাই বলে দিয়েছিলেন স্পষ্ট। “ওয়ান লিটার ইচ। নাথিং ক্যান বি ডান অ্যাবাউট ইট।” কিন্তু জনপ্রতি এক লিটারই বা কোথায়? সেপাই মনোজ বিস্তের কাছে শুধুমাত্র একটা বোতল রয়েছে। তারও অর্ধেকটা খালি। অল্প একটু জল মুখে নিয়ে জিভ দিয়ে কুলকুচির মতো নাড়িয়ে গিলে নেয় সুভদ্র।

বনির মুখটা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল সুভদ্রর। পাঁচ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে মেয়েটার। স্কুলে ভর্তি হয়েছে সদ্য। সুভদ্র ফোন করলে ছাড়তেই চায় না। বলে, “বাবা, জুন কামস টু স্কুল উইথ হার ফাদার। আদিত্য কামস উইথ হিজ ফাদার। তুমি কবে আমাকে স্কুলে ছাড়তে যাবে বাবা?” সুভদ্র হাসে। “এইবার ছুটি পেলেই নিয়ে যাব তোমাকে। রাজা।”

“প্রমিস?” নিম্পাপ গলায় উত্তর দিয়েছিল বনি।

“প্রমিস!” বলেছিল সুভদ্র। বনির সঙ্গে আর কি দেখা হবে? কথাটা ভাবতেই গলার কাছে কী একটা আটকে গিয়েছিল। তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়েছিল সুভদ্র। প্রফেশনাল সোলজার সে। আর্মির মেজর। ওয়ার সিচুয়েশনে এই সব কথা ভাবে কী করে?

ব্রিজলালের দিকে তাকায় সুভদ্র। বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর বয়স হবে লোকটার। কিংবা আর-একটু বেশি। সেই কবে সেপাই হয়ে জয়েন করেছিল সেনায়। নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে গত বিশ বছরে সুবেদার হয়েছে। আর ক’দিন পরেই রিটায়ারমেন্ট। রিটায়ারমেন্টের কথা ব্রিজলালই বলেছিল তাকে। ক’দিন আগে ত্রিফিং-এর পর তাঁবুতে বসে। “লড়কি বাড়ি হো রহি হায়। বারা ক্লাস কি এগজাম মে বৈঠেগি ইস সাল। পড়াই মে বহত মন হায় উসকি। ইঞ্জিনিয়ার বননা চাহতি হায়। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়নে মে কিতনা খরচ হোগা মেজর সাব?”

সুভদ্রর মতো ব্রিজলালও কি ভাবছে মেয়ের কথা? বনির স্কুলে এখন সামার ভেকেশন। ঠিক ছিল এ-বছর ওদের নিয়ে শিমলায় বেড়াতে যাবে সুভদ্র। ফ্লাইট লেট করেছিল। বনিকে নিয়ে ঐশীর আসতে আসতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। এয়ারপোর্ট থেকে ওদের নিয়ে সোজা কোয়ার্টারে চলে গিয়েছিল সুভদ্র।

“শেষ অবধি কি যাওয়া হবে আমাদের?” জিজ্ঞাসা করেছিল ঐশী।

“জানি না। ছুটি ক্যাম্পেল হবে মনে হচ্ছে।”

গভীর গলায় উত্তর দিয়েছিল সুভদ্র। ক’দিন আগেই দূশমন অ্যামবুশ করেছে সেনাবাহিনীর একটা প্যাট্রলকে। মারা গিয়েছে প্যাট্রলের সবাই। জানা গিয়েছে শীতের বরফ-ঢাকা সীমান্ত পেরিয়ে পাহাড়ের ওপর বাঙ্কার বানিয়েছে হানাদার দূশমনরা। ওখান থেকে ফায়ারিং করে নীচের হাইওয়েটাকে অকেজো করে দিয়েছে তারা। মিডিয়ায় জোর খবর যুদ্ধ বাধবে।

সন্ধেবেলা একসঙ্গে চা খেতে বসেছিল ওরা। বাবাকে জড়িয়ে ধরে কখন যে ঘুমে ঢলে পড়েছিল বনি। ওকে কোলে নিয়েই ফোনটা তুলেছিল সুভদ্র। কথাগুলো শুনতে-শুনতে শক্ত হয়ে গিয়েছিল তার চোয়াল। ফোনটা রেখে শান্ত চোখে সে তাকিয়েছিল ঐশীর দিকে। “আমার ডিপ্লয়মেন্টের অর্ডার এসেছে।”

মুহূর্তে কালো হয়ে গিয়েছিল ঐশীর মুখটা। তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়েছিল সে। বনিকে সুভদ্রর কোল থেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল। সুভদ্র দেয়নি। “থাক একটু।” সারারাত সুভদ্রর বুকের ওপর শুয়ে ছিল ছোট্ট বনি। ঘুম জড়ানো গলায় বলে উঠেছিল, “বাবা প্রমিস?” বনির পিঠে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল সুভদ্র। ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল ওকে। শেষ রাতে, সে টের পেয়েছিল কপালের ওপর গরম হাতটা। চোখ খুলে দেখেছিল ঐশী। তাকিয়ে আছে তার দিকে। ঐশীকে বুকের ওপর টেনে নিয়েছিল সুভদ্র। খুব গরম চোখের জল ভিজিয়ে দিয়েছিল সুভদ্রর বুক।

আসার সময় ঐশী আর বনি দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। বনি হাত নাড়ছিল তাকে। জিপের জানলা দিয়ে হাত নেড়েছিল সুভদ্রও। আর একবারও পিছনে ফিরে তাকায়নি।

বারো ঘণ্টা। প্রায় বারো ঘণ্টা পাহাড়ের এই খাঁজটায়, পাথরগুলোর আড়ালে বসে আছে তারা চারজন। সুভদ্র, ব্রিজলাল, মনোজ বিস্ত আর রেডিও অপারেটর বলওয়ান। ওদের পায়ের কাছ থেকে সোজা নেমে গিয়েছে পাহাড়টা। প্রায় পঞ্চাশ ডিগ্রি খাড়া হয়ে। ওখান দিয়ে নামা অসম্ভব। তাহলেই দেখতে পেয়ে যাবে ওপরে বাঙ্কারে বসা দূশমন। রাইফেলের নাদগলে পেয়ে মুহূর্তে গুলিবিদ্ধ করবে তাদের।

দূশমনের বাঙ্কারটা এখন থেকে মেরে কেটে চারশো মিটার। মাঝে ন্যাড়া পাহাড়। আলগা পাথর। মাঝেমাঝে অল্প বরফের দাগ। ওখানেই পড়ে আছে সুভদ্রর জুনিয়ার, তার ডেল্টা কোম্পানির সেকেন্ড ইন কমান্ড, টু-আই-সি, লেফটেন্যান্ট বিকাশ অরোরা। উপুড় হয়ে। নিম্পন্দ। মেশিন গানের বুলেটে ঝাঁঝরা ওর শরীরের সব রক্ত শুষে নিয়েছে রুদ্ধ ন্যাড়া পাহাড়টা।

পাঁচটা হেভি মেশিন গান বসানো আছে

বাঙ্কারের গায়ে। মাঝেমাঝেই একসঙ্গে ফায়ার করছে। এক-একটা থেকে সেকেন্ডে প্রায় সাতশো-সাতশো গুলি বৃষ্টির ফোঁটার মতো ছুটে আসছে সুভদ্রদের দিকে। বিধছে পাহাড়ের গায়ে। প্রচণ্ড অভিঘাতে রুদ্ধ পাহাড়ের গা থেকে ছটকে ছটকে যাচ্ছে পাথর।

মেশিনগানগুলোর ফায়ারিং বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ। পাহাড় জুড়ে নেমে আসে আশ্চর্য নীরবতা। নীল আকাশ, পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ, দূরে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়াগুলো, অনেক নীচে সবুজ উপত্যকাটা পৃথিবীকে আরও মনোরম করে তোলে। দূর থেকে কনকনে ঠাণ্ডা একটা বাতাস ধাক্কা মারে সুভদ্রদের। “জনাব! জনাব!” দূরে দূশমনদের বাঙ্কারটা থেকে কে ডাকে ওদের। পাথরের ওপর মাথা তুলে দেখতে যায় সেপাই মনোজ। ব্রিজলাল এক টানে বসিয়ে দেয় তাকে।

“জনাব! আইয়ে জনাব। কবসে ছুপকে বৈঠে হায় চুহাকে কে তরা। আইয়ে লেকে যাইয়ে আপনা অফসর কো। কেয়া জনাব ডর গয়ে হায়?”

“মেরে দেব! মেরে দেব শালাদের।” সেলফ লোডিং অ্যাসল্ট রাইফেলের ট্রিগার চেপে উঠে বসতে চায় ব্রিজলাল। ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় পাথরের আড়ালের বাইরে। ব্রিজলালের কনুইটা ধরে ফেলে সুভদ্র। “বৈঠ যাইয়ে সুবেদার সাব।” কড়া গলায় হুকুম করে সে।

ব্রিজলালের চোখ দুটো ভাঁটার মতো লাল। এত শীতেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কনুইটা ঝাঁকিয়ে সে হাতটা ছাড়াতে যায়। আবার গর্জে ওঠে সুভদ্র। “বৈঠিয়ে। ইটস অ্যান অর্ডার।”

মেজরের কথা ফেলতে পারে না ব্রিজলাল। চুপ করে বসে পড়ে আবার। দুটো পায়ের ফাঁকে গুজে নেয় অ্যাসল্ট রাইফেলটা। ঠাণ্ডা গলায় বলে, “এমনিতেও তো মরেই যাব মেজরসাব।” ব্রিজলালের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সুভদ্র। একটা গ্রেনেড তুলে নেয় হাতে। পিনটা খুলতে খুলতে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ। ছুড়ে দেয় খুব জোরে। অনেকটা দূরে গিয়ে ফাটে গ্রেনেডটা। কেঁপে ওঠে পাহাড়টা। আবার একসঙ্গে গুলির ছররা ছড়াতে শুরু করে মেশিনগানগুলো।

রেডিও অপারেটর বলওয়ান এগিয়ে আসে কাছে। এগিয়ে দেয় রিসিভারটা। “কর্নেল সাব।”

ওপার থেকে শোনা যায় কর্নেলের গলা।

“কী স্টেটাস?”

“স্টন্ট করছে। খেপিয়ে বার করতে চাইছে আমাদের।” কাটাকাটা গলায় উত্তর দেয় সুভদ্র।

“হঠকারী কিছু কোরো না।

রিইনফোর্সমেন্ট পাঠাচ্ছি আমি। আই ওয়াট

ইউ পিপল ব্যাক। আবার আর্টিলারি সাপোর্ট দিচ্ছি।”

রিইনফোর্সমেন্ট! নীচের দিকে তাকায় সুভদ্র। খাড়া পাহাড়ের ঢাল একে বঁকে নেমে গিয়েছে। ওই পথে উঠতে তাদের লেগেছিল পাক্কা ন’ঘণ্টা। রাতের ঘন অন্ধকারে পাহাড়ে বেয়ে উঠে এসেছিল তারা। তাও সবাই পারেনি। তার সঙ্গে আসা একশো জনের বেশিরভাগই গুলি লেগে পড়ে আছে পাহাড়ের আঁকবাকি। এখন তো দিনের বেলা। বকবকে আলোয় দেখা যাচ্ছে দূর অবধি। ওই পথে উঠতে গেলে সহজেই দূশমনের নিশানা হতে হবে। রিইনফোর্সমেন্ট এলেও পৌঁছোতে পৌঁছোতে সেই ভোর রাত। ততক্ষণ কি টিকে থাকতে পারবে তারা? মাত্র চারশো মিটারের তফাত। দূশমন চাইলেই চলে আসতে পারে এই অবধি। আসেনি শুধু কামানের ভয়ে। মাঝে মাঝেই সুভদ্রের রেডিও শোনে কামান দেগে শেলিং করেছে আর্টিলারি। কিন্তু রাতে কামানের আলোর ঝলকানি দেখে সহজেই তাদের পজিশন জেনে যায় দূশমন। পাল্টা কামান নাগে সেই আলো লক্ষ করে। যদি আজ রাতে তেমন কিছু হয়ে যায়?

ছ’দিন আগে সুভদ্রকে ডেকেছিলেন কর্নেল সোধি। তারুতে ঢুকে স্যালাউ ঠুকেছিল সে। কর্নেল বসতে বলেছিলেন তাকে। “পয়েন্ট ৪৩৪০। ষোলো হাজার ফিট উচ্চতায়। পাহাড়ের ওপর। ওখানেই ঘাঁটি গেড়েছে দূশমন। তাদের সরানোর দায়িত্ব পড়েছে আমাদের ওপর। চারটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে গোটা ব্যাটেলিয়নটাকে। আলফা, বিটা, চার্লি আর ডেল্টা কোম্পানি।” সামনে রাখা ম্যাপটায় টোকা দিয়েছিলেন কর্নেল সোধি। “তুমি ডেল্টা কোম্পানিকে লিড করবে সুভদ্র। পয়েন্ট ৪৩৪০ অ্যাটাক করবে।” পাহাড়টার থেকে আটশো মিটার দূরে বসানো হয়েছিল আর্টিলারি ফায়ারবেস। ওখান থেকেই ক্রমাগত কামান ছুড়বে আর্টিলারি। ব্যতিব্যস্ত, নাজেহাল করে রাখবে দূশমনকে। রাতের অন্ধকারে পাহাড় বেয়ে চূপচাপ উঠে যাবে সুভদ্ররা। বাস্কারের ঠিক তিনশো মিটার দূরে এসে পৌঁছোলে বন্ধ হবে শেলিং। সূর্য ওঠবার আগেই দূশমনের বাস্কারটা কব্জা করবে সুভদ্রের বাহিনী।

পরশুদিন রাতে গোটা ব্যাটেলিয়নকে ভোজ খাইয়েছিলেন কর্নেল সোধি। সেনাদের ভাষায় বড়াখানা। খানাপিনা, গানে, গল্পে মেতে উঠেছিল সবাই। উৎসবমুখর জয়গাটা থেকে সরে এসেছিল সুভদ্র। চূপ করে দাঁড়িয়ে ছিল অন্ধকারে। দূর থেকে ভেসে আসছিল কামানের আওয়াজ। আর্টিলারির শেলিংয়ে মাঝেই মাঝেই ঝলসে উঠছিল পাহাড়ের মাথার কাছটা।

কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল

বিকাশ। বলেছিল, “ভাববেন না স্যার। ওর থেকেও বেশি বাজি আমরা ফাটা বোঝানো।” চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠেছিল বিকাশের।

বহুর তেইশের ছটফটে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল সুভদ্র। পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিল, “উই মাস্ট।”

কখন এক সময় চলে এসেছিল ক্যাম্পে। রাইটিং প্যাডটা নিয়ে লিখতে বসে গিয়েছিল—

“প্রিয় বনি,

তোকে দেওয়া প্রমিসটা আমি রাখতে পারিনি। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি চলে যাওয়ার পর যতদিন তুই স্কুলে গেছিস, প্রতিদিন আমি তোরে পেছন পেছন যেতাম। গেটের সামনে পৌঁছে তোরে পিঠে ব্যাগটা আর হাতে ওয়াটার বটল দিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকতাম যতক্ষণ তোকে দেখা যায়। তুই আমাকে দেখতে পাসনি। হয়তো কোনওদিন পাবিও না। কিন্তু অমনভাবেই তোরে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকব আমি। হয়তো তোরে সামনে আসব না কোনওদিন। কিন্তু জানবি আমি আছি। থাকব চিরকাল...”

চিঠিটা লিখতে-লিখতে চোখ দু’টো জ্বালা করে উঠেছিল সুভদ্র। খামে ভরে ফেলেছিল চিঠিটা। ওপরে লিখেছিল, মিস বনি মিত্র। কী ভেবে, নীচে ব্র্যাকেটে লিখেছিল, “দশ বছরের জন্মদিনের পর খুলিস।”

দুপুরে ক্যাম্পের স্যাটেলাইট ফোন থেকে সে কল করেছিল ঐশীকে। বলেছিল, “আমি মিশনে যাচ্ছি।” গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল ঐশী। থম মেরে গিয়েছিল। গলার সুরে কৃত্রিম অভিমানে এনে সুভদ্র বলেছিল, “তবে অ্যাকশন নয়। কী কাজ দিয়েছে জানো? পাহাড়ের ওপর থেকে দূশমনের ফেলে যাওয়া সব ল্যান্ডমাইন সরানোর... ভাবো! আমার ওপর বসদের ভরসা নেই বোধহয়।”

ঐশী স্বাভাবিক হয়েছিল একটু। “ওরকম করে ভাবছ কেন? হয়তো তোমাকে আরও পরে ব্যবহার করবে।”

মাঝখান থেকে ফোনটা টেনে নিয়েছিল বনি। “বাবা! আই ফিল বোরড। তুমি কবে আসবে?”

সুভদ্র জোর করে হেসেছিল। “এই তো আর ক’টা দিন। তারপরেই এসে যাব!” তার বুকের মধ্যে কেমন মোচড় দিয়ে উঠেছিল। তারপর সে ফোন করেছিল মা’কে। একই মিথ্যের পুনরাবৃত্তি করেছিল আবার। “তুই আবার মিথ্যে বলছিস?” হঠাৎ বলে উঠেছিল মা। সুভদ্র কঁপে গিয়েছিল। গলাটা শান্ত করে বলেছিল, “একবার বলেছিলাম বলে, সব সময় মিথ্যে বলব মা?”

“আমি তো তোরা মা!” মায়ের গলাটা ধরে গিয়েছিল। কথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল সুভদ্র। ফোন কেটে গিয়েছিল এক সময়।

দুম, দুম, দুম, দুম। বাস্কারের সামনের ঢালু

চত্বরটায় এসে পড়ে কামানের গোলাগুলো। ফাটে সশব্দে। দূরমুশ করে দেয় ছোট-ছোট পাথরগুলোকে। অভিঘাতে কঁপে কঁপে ওঠে পুরো পাহাড়টা। ধুলো আর ছোট ছোট পাথরের টুকরো ধসের মতো গড়িয়ে নামে সুভদ্রদের পাশ দিয়ে।

ওদের কভার দিতে শেলিং শুরু করেছে ফায়ারবেস। দু’হাতে কান চেপে ধরে সুভদ্র। প্রচণ্ড ধুলোতে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

অনেকদিন আগে, তখন সে সদ্য লেফটেন্যান্ট থেকে ক্যাপ্টেন হয়েছে। বর্ডার এরিয়ায় পোস্টিং পেয়েছে। একদিন পেট্রলে বেরিয়েছে তারা। সীমান্তের ধার ঘেঁষে ছোট পাহাড়ি নদী। তার পাশ দিয়ে ওক আর পাইনের জঙ্গলের পাশ দিয়ে ছোট ঘাসজমি। মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে তার ভেতর থেকে। জলের শব্দ। পাথর ডাক। এটা যে বর্ডার সে কথা যেন ভুলেই গিয়েছিল সুভদ্র। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল চারপাশ।

সুভদ্রের একটু আগে হেঁটে যাচ্ছিল অমিত সাংগবান। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। হাওয়া কাটতে কাটতে কী একটা এগিয়ে আসছিল পাহাড়ের ওপর থেকে। “ভাগো!” বলে হঠাৎ মাটিতে লাফ দিয়েছিল অমিত। সুভদ্র রিঅ্যাক্ট করতেও ভুলে গিয়েছিল। অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কে যেন ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল তাকে। সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেকটা দূরে। খুব কাছে এসে ফেটেছিল শেলটা। তারপর আরও অনেকগুলো। ভূমিকম্পের মতো থরথর করে কঁপে উঠছিল চারপাশ। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে লাফিয়ে আকাশ ঝুঁয়ে দিচ্ছিল মাটি। আদিম সরীসৃপের মতো বুক হেঁটে সুভদ্র চলে গিয়েছিল জঙ্গলের ভেতর। দুটো কান হাত দিয়ে চেপে বসে ছিল অনেকক্ষণ।

শেলিং থেমে গিয়েছিল এক সময়। একে একে বেরিয়ে এসেছিল তারা। নদীর ধারের ঘাসজমিটা ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে। তার জায়গায় এবড়ো খেবড়ো পোড়া একটু জমি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে টুকরো টুকরো মানব শরীর। সুভদ্র কঁদে ফেলেছিল। হঠাৎ কারা চিৎকার করে উঠেছিল দূরে নদীর ধার থেকে। সুভদ্র ছুটে গিয়েছিল। নদীর ধারে তিনটে পাথর। ওর ইউনিটের কোনও একজন শেলিং থেকে বাঁচতে কভার নিয়েছিল তার মধ্যে। আর ওখানেই পড়েছিল একটা শেল। পাথরগুলো ফেটে গিয়েছে। ছড়িয়ে গিয়েছে। আর মাঝের মানুষটার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। পাথরের গায়ে লেগে আছে রক্ত আর মাংসপিণ্ড। শুধু হাঁটু থেকে বুট অবধি একটা অক্ষত পা পড়েছিল পাথরের ভেতরে। কে যেন বলেছিল, “অমিত! অমিত সাংগবান!”

ভাবতে-ভাবতে বনির মুখটা মনে পড়ে সুভদ্র। বনি কি আর দেখতে পাবে তাকে?

নাকি ব্যাটেলিয়ন থেকে একটা ফোন যাবে ঐশীর কাছে? পতাকায় মোড়া একটা কফিনের ভেতর বাড়ি ফিরবে সুভদ্র।

ভেতরের ঘরে পড়ার টেবিলে বসে ছিল মা। গালে হাত দিয়ে, চুপ করে। বাবার ছবিটা রাখা ছিল সামনে। শেষ বিকেলের তেরটা একটা রোদ মায়ের ফর্সা গালের ওপর পড়ছিল।

চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মাকে দেখেছিল সুভদ্র। মিলিটারি অ্যাকাডেমির চিঠিটা আসার পর থেকে টানা তিনদিন মা আর কথা বলেনি তার সঙ্গে।

“তুমি কি আর আমার সঙ্গে কথা বলবে না মা?”

মুখ ঘুরিয়েছিল মা। “তুই মিথ্যে কথা বললি?”

“সত্যি বললে কি তুমি ইন্টারভিউতে যেতে দিতে মা? আর আমি তো ভুল কিছু করিনি। আর্মিতে যাচ্ছি।”

মা তাকিয়েছিল তার দিকে। “তুই হয়তো ঠিকই করছিস। কিন্তু আমি যে তোরা মা!” কেঁদে ফেলেছিল মা।

“মাই প্রাউড মাদার!” সুভদ্র এগিয়ে গিয়ে দু’হাত দিয়ে মায়ের মুখটা তুলে ধরেছিল।

প্ল্যান অনুযায়ী ঠিক রাত দশটায় ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়েছিল তারা। কর্নেল সোধি বেরিয়ে গিয়েছিলেন আরও আগে। একটু দূরে পাহাড়ের ওপর অবজারভেশন ক্যাম্প থেকে লক্ষ রাখছিলেন তাদের ওপর। পাহাড়ের মাথার দৃশ্যমনের বাস্কারের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত শেলিং করে যাচ্ছিল আর্টিলারি। জ্বলে জ্বলে উঠছিল পাহাড়ের মাথাটা। আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সুভদ্র। আলোহীন আকাশজুড়ে অসংখ্য তারা। দূরে, এক প্রান্তে ঘন হয়ে গিয়েছে তারাগুলো। নক্ষত্রপুঞ্জ। মিল্কি ওয়ে।

নয় হাজার ফুট থেকে উঠতে হবে প্রায় ষোল হাজার ফুট উচ্চতায়। বাতাস ক্রমশ হালকা হয়ে আসছে। কমে আসছে অক্সিজেন। কনকনে ঠান্ডা বাতাস। অন্তত মাইনাস দশ এগারো হবে। খাড়া উঠে যাচ্ছে পাহাড়টা। কোথাও কোথাও প্রায় সন্তর ডিগ্রি। বুরো পাথর হড়কে সরে যাচ্ছে জ্বতোর নীচ থেকে। যত উঠছিল তত হাঁপিয়ে যাচ্ছিল সবাই। দৃশ্যমনের রেঞ্জ এড়িয়ে গাত চার-পাঁচ রাত এই পথেই উঠেছে সাপোর্ট ফোর্স। ব্যাটেলিয়নের রাঁধুনি, দর্জি বাদ ছিল না কেউ। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে গুলি বারুদ অস্ত্র লুকিয়ে রেখে গেছে তারা। সুভদ্রদের জন্য।

পাঁচ মিটার উঠতেও দম আটকে আসছিল। সুভদ্র তাড়া দিচ্ছিল খুব। কিন্তু সে যা ভয় পাচ্ছিল সেটাই হল। উঠতে অনেক দেরি করে ফেলেছিল তারা। প্রায় ভোর হয়ে গিয়েছিল এই অবধি উঠতে। যত উঠছিল তত

এগিয়ে আসছিল মেশিন গানের আওয়াজ।

হঠাৎ আকাশের গায়ে বাজির মতো কতগুলো আলো দেখতে পেয়েছিল ওরা। আলোয় আলো হয়ে উঠেছিল চারদিক। দৃশ্যমন তাদের দেখার জন্য ফ্লোরার জ্বালাচ্ছে।

“কভার!” চিৎকার করেছিল সুভদ্র। পঞ্চাশ ডিগ্রি ঢালু এলাকাটা দিয়ে প্রায় বুকে হেঁটে সে উঠে আসতে চেয়েছিল এই পাথরগুলোর আড়ালে। সুভদ্র পেছনে হাবিলদার সুখবির। “মেজর সাব জলদি কিজিয়ে...” হঠাৎ থেমে যায় সুখবিরের গলা। সুভদ্র পেছনে তাকায়। সুখবিরের ডান চোখের ওপর লাল একটা ফুটো। গলগলিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। মাথাটা দম করে পড়ে পাথরে। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে যায় সুখবিরের নিখর দেহটা। “এনিমি ফায়ার! এনিমি ফায়ার!” পাগলের মতো পাথরগুলোর দিকে এগিয়ে আসে সে।

তার পুরো কোম্পানিটাই ফুরিয়ে যায় দৃশ্যমনের গুলিতে। পাথরের আড়ালে কভার নিতে পারে শুধু ওরা পাঁচজন। সুভদ্র, ব্রিজলাল, মনোজ, বলওয়ান আর বিকাশ। রাগে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল বিকাশ। চিৎকার করছিল খুব জোরে। “মেরে ফেলব। মেরে ফেলব ওদের!” সুভদ্র ঠান্ডা করার চেষ্টা করেছিল বিকাশকে। “নো, নো! বিকাশ!”

বিকাশ শোনেনি। একটা গ্রেনেড ছুড়েছিল। তারপরেই পাগলের মতো গুলি ছুড়তে-ছুড়তে দৌড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বাস্কারের দিকে। পাঁচটা মেশিনগান গুলি ছুড়ছিল যেন উম্মাদের মতো। সুভদ্র চিৎকার করেছিল, “শুট অ্যান্ড স্কুট! বিকাশ!” গুলি ছুড়েই পাশে সরে যাও বিকাশ। একজন ট্রেনড লেফটেন্যান্টকে কেন সামরিক যুদ্ধের প্রাথমিক পাঠ বলেছিল নিজেও বোঝেনি সুভদ্র। সে শুধু দেখেছিল বাঁঝা হতে হতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে বিকাশ। স্লো মোশনের মতো। গুলির ফোয়ারা ছোটোছে দৃশ্যমনের মেশিনগানগুলো।

চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল সে। কখন যেন পাহাড়ের কভার ছেড়ে বিকাশের মতোই বেরিয়ে এসেছিল একটা সূর্য। “হে ভগবান, সুভা হো গয়ি!” মনোজ বলে উঠেছিল! গোটা দিন তারা বসেছিল, এই পাথরের আড়ালে। দৃশ্যমনের মেশিন গান থেকে ছুটে আসছিল বৃষ্টির মতো গুলি।

আকাশের এ মাথা থেকে ও মাথায় হেঁটে গিয়েছিল সূর্য। বরফ নয়, যেন বারুদ রাখা ছিল পাহাড়ের চূড়াগুলোয়। আকাশের ঢাল বেয়ে নামতে-নামতে কখন যেন সূর্য আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল তাদের গায়ে। উজ্জ্বল আগুন রঙের পাহাড়গুলোর উত্তাপে যেন হলদে হয়ে যাচ্ছিল আকাশটাও।

ব্রিজলালকে ঠেলা মারে সুভদ্র। চাপা গলায় বলে, “রেডি হো! বাইয়ে। আন্ধেরা

আ রহি হ্যায়।” পোড় খাওয়া সুবেদারের চোখগুলো জ্বলজ্বল করে ওঠে। পাথরের আড়াল থেকে আশপাশটা জরিপ করে সুভদ্র। ডানদিকে নেমে গিয়েছে সরু পাহাড়ের খাঁজ। তারপর প্রায় নব্বই ডিগ্রি খাড়া হয়ে উঠে গিয়েছে বাস্কারের দিকে। ওই বাস্কারটাকেই নিউট্রালাইজ করতে হবে তাদের। পাহাড়ের খাঁজটা দেখায় ব্রিজলালকে। কর্নেলকে রেডিও করে আবার। “স্যার উই উইল স্টার্ট আফটার দ্য লাস্ট লাইট!”

“ডোন্ট বি আ ফুল মেজর!”

“স্যার! উই ওয়ান্ট টু ডু ইট!”

গুলিবিদ্ধ সৈনিকের মতো দিগন্তের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সূর্যটা। তার রক্ত ভাসিয়ে দেয় আকাশ ও পাহাড়গুলোকে। তারপর এক সময় হারিয়ে যায় সব কিছু। আকাশের দখল নিয়ে নেয় তারাদের অজস্র বন্দুক।

কথামতো থেমে যায় শেলিং।

মেশিনগানগুলো অনর্গল ফায়ার করতে শুরু করে। বাস্কার থেকে দুটো ফ্লোরার ছুটে যায় আকাশে। ফ্লোরারগুলো নিভতেই লাফ দিয়ে ডানদিকে সরু খাঁজটার ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করে সুভদ্র। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় খাঁজটার শেষ প্রান্তে। পাথরের ও পাশ থেকে বেরিয়ে আসবে ব্রিজলাল। কভার নিয়ে গুলি ছুড়বে নাগাড়ে।

বনির মুখটা মনে পড়ে। তার বুকের ওপর শুয়ে ছিল বনি। আঁকড়েছিল সুভদ্রকে। জোরে শ্বাস নেয় সে। খাড়া পাহাড়ের পাথরগুলোর ওপর হাত রেখে উঠতে শুরু করে। গড়িয়ে নামে বাস্কারটার একদম সামনে। বাস্কারের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে মেশিনগানগুলোর নল। আগুনের মতো ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে গুলি। দূরে কভার নিয়ে গুলি ছুড়ছে ব্রিজলালরা। বুকে হেঁটে সামনের মেশিনগানটার তলায় চলে যায় সুভদ্র।

তার মাথা থেকে ফুট দুয়েক উপরে মেশিনগানটার নলটা। গুলি ছুড়তে ছুড়তে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। আবার একটা ফ্লোরার আকাশে ওড়ে। লাল একটা আলো অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সুভদ্র দেখতে পায় মনোজ বিস্তারিত মাথা বেরিয়ে আছে। একটা রকেট বাস্কারের ভেতর থেকে ছুটে যাচ্ছে সেদিকে। রকেটটা শব্দ করে ফাটে। আবার সব অন্ধকার হয়ে যায়।

পাগলের মতো লাফিয়ে ওঠে সুভদ্র। দু’হাত দিয়ে ধরে খুব জোরে মেশিনগানের নলটাকে ঠেলে দেয় বাস্কারের ভেতরে। আগুন গরম হয়ে গিয়েছে নলটা। হাত দুটো জ্বালা করে ওঠে। দেরি করে না সুভদ্র। বাস্কারের ছোট ফাঁক দিয়ে একটা গ্রেনেড গলিয়ে দেয় ভেতরে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে বাস্কারটা। একটা আগুনের গোলা ছিটকে বেরিয়ে যায় সুভদ্রের মাথার ওপর

দিয়ে। দূরে এখনও গুলি ছুড়ছে ব্রিজলাল।
ওদিকের মেশিনগানগুলো থামেনি
এখনও। দূশমনের চিৎকার শোনা যায়। সুভদ্র
ছুটে চলে যায় বাস্কারের পেছনে। একটা
দরজা। সুভদ্র বসে পড়ে তার পাশে। দরজাটা
খুলে যায়। কে যেন বেরিয়ে আসছে। গুলি
ছোড়ে সুভদ্র। লোকটা পড়ে যায় শব্দ করে।
পরপর তিনটে থ্রেনেডের পিন খুলে সুভদ্র
গড়িয়ে দেয় ভেতরে।

বীভৎস একটা বিস্ফোরণ সুভদ্রকে ছুড়ে
দেয় পেছনে। অন্ধকার হয়ে যায় সবকিছু।

দূরে পাহাড়ের গায়ে ঘাঁটি গেড়েছে
রোদ। বিষণ্ণ ভোরের আলো জড়িয়ে ধরছে
পৃথিবীকে। বাস্কারের সামনে, এদিকে ওদিকে
কয়েকজন জওয়ান। ওরা মেজর নাথের
আলফা কোম্পানির। রিইনফোর্সমেন্ট হিসেবে
উঠে এসেছে কাল রাতেই।

একটা স্ট্রচার হাতে, পাহাড়ের ঢাল
বেয়ে, নেমে যাচ্ছে ওদেরই চারজন। স্ট্রচারে
শোয়ানো আছে ক্ষতবিক্ষত মনোজ বিস্তু।

শহিদ হয়েছে সে। দূশমনের রকেট এফোঁড়
ওফোঁড় করে দিয়েছে তাকে।

নামতে নামতে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য
হয়ে যায় স্ট্রচারটা। বাস্কারের দিকে এগিয়ে
আসে সুভদ্র। ছিন্নভিন্ন দূশমনদের লাশগুলো
টেনে বার করছে জওয়ানরা। একটা স্ট্রচার
নিয়ে তার পাশ দিয়ে চলে যায় দু'জন সেপাই।
স্ট্রচারের ওপরে ছিন্নভিন্ন লাশটার দিকে
তাকায় সুভদ্র। শরীরের অর্ধেকটাই উড়ে
গিয়েছে।

বাস্কারটার ভেতর ঢুকে পড়ে সুভদ্র।
হালকা বারুদের গন্ধ এখনও যেন জমে আছে
ভেতরটায়। পাথরের দেওয়ালগুলোর গায়ে
বিস্ফোরণের দাগ। মৃতদেহগুলো পড়ে আছে
এদিক-ওদিক। একটা লাশ স্ট্রচারে শোয়াচ্ছে
দু'জন জওয়ান।

এগোতে গিয়ে কী যেন একটা লাগে তার
পায়ের কাছে। চোখ নামায় সুভদ্র। একটা
হাত। কাঁধ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। পুড়ে
গিয়েছে জায়গায় জায়গায়। হাতের মুঠোর
মধ্যে কী যেন একটা ধরা।

নিচু হয় সুভদ্র। মুঠোর ভেতর থেকে বার
করে আনে জিনিসটা। দোমড়ানো-মোচড়ানো
পাসপোর্ট সাইজের একটা ছবি। এক পাশে
রক্ত লেগে গেছে। ছবিটাকে সোজা করে
সুভদ্র। ফুটফুটে ছোট্ট একটা ছেলে। ভুরু
কুঁচকে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে।

বনির মুখ মনে পড়ে যায় সুভদ্রর। স্কুলের
গেটের ভেতর ঢুকে গিয়েছে বনি। তাকিয়ে
আছে তার দিকে। ডান হাতটা তুলে বনিকে
টাটা করছে সুভদ্র।

ছবিটাকে খামচে ধরে সে। বাস্কারের ফাঁক
দিয়ে একটা হাওয়া এসে ঝাপটা মারে তার
গায়ে। শীত করে ওঠে সুভদ্রর।

ঋণ : গোখা রেজিমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল
বাসুদেব মিত্র, গোখা রেজিমেন্ট এবং রাষ্ট্রীয়
রাইফেলস

অঙ্কন: পিয়ালী বাল্লা





পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্র

অভিষেক ভট্টাচার্য

দু'বছর আগে, ১৭ এপ্রিল ২০২১-এ যাদবপুর ইউনিভার্সিটির বিবেকানন্দ হলে ভাষাবিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর দেবতোষ সান্যাল যে-পেপারটি পড়েছিলেন, এবং সেটিকে কেন্দ্র করে তাঁর সহকর্মী ও সতীর্থদের মধ্যে যে তুমুল গন্ডগোলের সৃষ্টি

হয়েছিল, সে বিষয়ে আমি কিছুই জানতে পারতাম না, যদি না আমাদের চিফ-এডিটর দাশদা বা বিশ্বজিৎ দাশ আমাকে বলতেন।

আমি তখন একটা খবরের কাগজের সাংবাদিক ছিলাম। এখন আর নেই। ছোটখাটো একটা ব্যবসা করি। তখন আমি টুকটাক নানা

ঘটনা কভার করে রিপোর্ট করতাম, তবে আমার প্রধান কাজ ছিল, প্রতি রবিবারের পাতায় আধপাতা জুড়ে একটা করে ফিচার লেখা। ‘কোন দিকে এগোচ্ছে বাংলা সিনেমা’, ‘আপনার সন্তানকে কী খাওয়াবেন, কেন খাওয়াবেন’ ইত্যাদি নানা বিষয়ে এই ফিচার

লিখতাম এবং সেগুলির তথ্য সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলে আমাদের ইন্টারভিউ নিতে হত। এর মধ্যে লেখক, মনোবিদ, ডাক্তার, অভিনেতা, খেলোয়াড়, শিক্ষক সকলেই থাকতেন। ইন্টারভিউ বেশির ভাগ ফোনেই হত, বিশেষত কোভিড শুরু হওয়ার পর থেকে। কিন্তু দাশদা বলেছিলেন, ডক্টর সান্যালের ইন্টারভিউটা সামান্যামনি কথা বলে নিতে।

“কেসটা কী, দাশদা? সামান্য পেপার পড়া নিয়ে গন্ডগালের কী আছে?”

“সেটা আমি ঠিক জানি না, বুঝলে। ডক্টর সান্যালের কলিগরা নাকি বলছে, হয় সান্যাল বুড়ো বয়সে প্রচারের আলায়ে আসার জন্যে জেনবুঝেই আজগুবি এক থিয়োরি তৈরি করেছেন আর নয়তো তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সান্যালের এক স্টুডেন্ট, নীলাদ্রি, আমার অনেক দিনের বন্ধু। যাদবপুরে নীলাদ্রি আমার চেয়ে এক বছরের জুনিয়র ছিল। ও এখন রয়েছে পুনেতে। গতকাল ওর ফোনেই প্রথম ব্যাপারটা শুনলাম। শুনেই মনে হল এটা নিয়ে আমাদের কাগজে হয়তো একটা ফিচার করা যেতে পারে।”

“ডক্টর সান্যালের থিয়োরিটা কী?”

“সেটা নীলাদ্রিও সঠিক জানে না। সে দিন সেমিনারে সে আসতে পারেনি লকডাউনের জন্য। ভাসা-ভাসা যেটুকু শুনেছে তার বেসিসে বলল, সান্যাল নাকি বছর তিনেক আগে, মানে ২০১৭-১৮ নাগাদ কোনও এক অজ্ঞাত কারণে নেপাল, তিব্বত এ সব দিকে গেছিলেন মাস চারেকের জন্য। সেখানকার বহু মঠ-মন্দির থেকে বেশ কিছু পুরনো পুঁথি, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। ফিরে আসার পর থেকে তিনি কেমন যেন পাল্টে গেছিলেন। সারা দিন ঘরে দরজা বন্ধ করে পুঁথিগুলো নিয়ে পড়ে থাকতেন। কাজে আসতেন অনিয়মিত। তিন বছর ধরে এরকম চলতে চলতে হঠাৎই গত মাসে এই সেমিনার। লকডাউনের মধ্যে সেমিনার করতে দিতে প্রথমে ইউনিভার্সিটি-কর্তৃপক্ষ প্রবল আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু সান্যাল অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, ‘ভেরি ভেরি অর্জেন্ট’ ইত্যাদি বলে চিঠি লিখে স্পেশাল পুলিশ-পারমিশন আনিয়ে সেমিনার করেন। আর তার পরেই হয় গোলমাল। সান্যাল নাকি এ সব পুঁথি থেকে যা পেয়েছেন, তার বেসিসে বাংলা ভাষার উৎপত্তি নিয়ে কী সব বিচিত্র, আজব কথাবার্তা বলেছেন সেমিনারে। যা শুনে সান্যালের এক কলিগ নাকি মুখের ওপরেই সান্যালকে পাগল বলে দিয়েছেন। তার পর যা হয় আর কী। কথা-কাটাকাটি, চোঁচামেচি। শেষমেশ সান্যাল পেপার পড়া মাঝপথেই বন্ধ করে দিয়ে সেমিনার থেকে বেরিয়ে চলে আসেন।”

“আপনার বন্ধু ডক্টর সান্যালকে ফোন

করে ঘটনাটা ডিটেলে জিজ্ঞেস করেননি?”

“চেষ্টা করেছিল, পারেনি। সে

দিনের ঘটনার পর থেকে সান্যাল নাকি অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ল্ডের কারও সঙ্গে কথাই বলতে চাইছেন না। নাম শুনলেই কাটিয়ে দিচ্ছেন। আমি নীলাদ্রির কাছ থেকে নান্দার নিয়ে ভদ্রলোককে ফোন করেছিলাম। অনেক অনুরোধের পর উনি কাগজের জন্য আধঘণ্টার একটা ইন্টারভিউ দিতে রাজি হয়েছেন। তবে ফোনে নয়, সামান্যামনি। উনি কার সঙ্গে কথা বলছেন, সেটা নিজের চোখে না দেখে একটি শব্দও বলবেন না। আমি নান্দার দিচ্ছি, তুমি ঠুঁকে আর-একবার ফোন করে টাইমটা জেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। সান্যাল থাকেন দেশপ্রিয় পার্কের কাছে।”

“বেশ। সে না হয় পড়ছি। কিন্তু সান্যাল সম্পর্কে আপনার বন্ধুর কী ধারণা? মানে উনি কেন এরকম আজগুবি থিয়োরি প্রচার করছেন, সে নিয়ে আপনার বন্ধু কিছু বললেন?”

“উহু। ব্যাপারটা তো সে নিজেই পুরো জানে না, কী করে বলবে? তবে সান্যাল প্রচারের আলায়ে আসার জন্যে কিছু করবেন, এটা নীলাদ্রি একেবারেই বিশ্বাস করে না মনে হল। ডক্টর সান্যালকে নীলাদ্রি চেনে প্রায় পনেরো বছর হল। বলল, উনি একেবারেই প্রচারবিমুখ মানুষ। অ্যাকাডেমিক জগতের বাইরে ঠুঁকে তেমন কেউ চেনে না বা উনিও কাউকে চেনেন না। তবে হ্যাঁ, মাথা খারাপ হওয়ার ব্যাপারটা আলাদা। মাথার গন্ডগোল তো রাম, শ্যাম, যদু, মধু, এনিবডির হতে পারে।”

“ওঁর যদি মাথা খারাপ হয়ে থাকে, তবে আমি গিয়ে কী করব? আমি তো মাথার ডাক্তার নই। আমি হয়তো কথা বলে বুঝতেও পারব না মাথা খারাপ কী না। এ সব তো মনোবিদের কাজ।”

“তোমাকে ও সব কিছু বুঝতে হবে না। ওটা আমাদের কনসার্ন নয়। তুমি শুধু সান্যালের কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা ডিটেলে-এ জানবে। ওঁর থিয়োরিটা বোঝার চেষ্টা করবে। যদি দেখি সেটা পুরোপুরি টেকনিকাল বিষয়, যাতে সাধারণ মানুষের কোনও ইন্টারেস্ট থাকবে না, বা একেবারেই পাগলের প্রলাপ টাইপের ছেলেমানুষি কিছু, যা পড়ে সাধারণ লোকও হাসবে, তা হলে ছাপব না। আর সেটা না হলে ওঁর বক্তব্যটুকু সহজ ভাষায় লিখে একটা ফিচার করা যেতেই পারে। ফটোনোটে লিখে দেবে যে, এই বক্তব্যের দায় পুরোপুরিই ডক্টর সান্যালের, কাগজের নয়। যদি ফিচারটা পড়ে ওঁর কোনও কলিগ বা এই লাইনের অন্য কোনও এক্সপার্ট যুক্তি-সহ প্রতিবাদ করে কোনও চিঠি দেয়, তবে সেটাও আমরা ছাপব। এরকম তো

হয়েই থাকে। অসুবিধে কোথায়?”

ঘণ্টাখানেক পরে আমি ডক্টর সান্যালের দেশপ্রিয় পার্কের বাড়িতে মুখে মাস্ক পরে ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসেছিলাম।

“উহু, আপনি একটু ভুল শুনেছেন,”

ডক্টর সান্যাল বলছিলেন, “বাংলা ভাষার উৎপত্তি নিয়ে আমি কোনও কথা বলিনি। আমার থিয়োরি বাংলা বর্ণমালায় বিশেষ একটি অক্ষরকে নিয়ে।”

“ব্যাপারটা যদি একটু খুলে বলেন।”

“বলছি। তার আগে বলুন তো বাংলায় মোট অক্ষর ক’টা?”

এই মরেছে! ইংরেজিতে এ থেকে জেড পর্যন্ত ছাব্বিশটা লেটার আছে জানি, কিন্তু বাংলায় যেন কতগুলো? বাংলা ব্যাকরণ তো সেই ক্লাস থ্রি-ফোরের পরে আর পড়া হয়নি! প্রয়োজনও হয় না।

আমতা-আমতা করছি দেখে ডক্টর সান্যাল অল্প হাসলেন।

“ভুলে গেছেন তো? লজ্জার কিছু নেই, আমি বলে দিচ্ছি, পঞ্চাশটা। এগারোটা স্বরবর্ণ আর উনচল্লিশটা ব্যঞ্জনবর্ণ।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ।”

“আগে কিন্তু স্বরবর্ণের সংখ্যা এগারোটা ছিল না, ছিল ষোলোটা। ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের লেখা বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বইতে ষোলোটা স্বরবর্ণের কথা বলা হয়েছিল। পরবর্তী সাতাত্তর বছর ধরে, অর্থাৎ ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত স্বরবর্ণের সংখ্যা ষোলোটাই ছিল।”

“১৮৫৫ সালে সংখ্যাটা পাল্টে গেল কেন?”

“কারণ, সেই বছর বিদ্যাসাগর

‘বর্ণপরিচয়’ প্রকাশ করলেন।”

কথাটা বলে ডক্টর সান্যাল থেমে চশমার কাচের আড়াল থেকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। যেন আমার প্রতিক্রিয়া দেখছেন। তার পর আবার শুরু করলেন।

“বিদ্যাসাগর স্বরবর্ণের সংখ্যা কমিয়ে আনলেন বারোটি। ব্যঞ্জনবর্ণেও বেশ কিছু বদল করলেন। আগে ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল চৌত্রিশটা। বিদ্যাসাগর তার সঙ্গে আরও ছ’টা বর্ণ যোগ করে ব্যঞ্জনবর্ণের মোট সংখ্যা নিয়ে গেলেন চল্লিশে। কেন এ সব করা হচ্ছে তার কারণও বিশদে লিখলেন বইয়ের ভূমিকায়। যাতে কারও মনে কোনও ধোঁয়াশা না থাকে। আপনি বইপত্রে, ইন্টারনেটে খুঁজলে এই তথ্যগুলো সহজেই পাবেন। কিন্তু যেটা পাবেন না সেটা হল, এই পরিবর্তনগুলো আসলে ছিল সব ধোঁকার টাটি। কারণগুলোও সব ভুলো। বিদ্যাসাগরের আসল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা বর্ণমালা থেকে কেবল একটিমাত্র

স্বরবর্ণকে বাদ দেওয়া। সেটা যাতে আলাদা করে লোকের চোখে না পড়ে যায় সে জন্যেই বাকি পরিবর্তনগুলো করা হয়েছিল।”

“মানে?”

“বাংলা বর্ণমালায় ৯ বলে একটা অক্ষর ছিল, জানেন?”

“হ্যাঁ, জানি তো। ছোটবেলায় পড়েছি— ঋষিমশাই বসেন পূজায় / ৯-কার যেন ডিগবাজি খায়।”

“ঠিক। এই ৯-কে এখন দরকার লাগে না, এই কথা বলে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা অবশ্য করা হয়েছে বিদ্যাসাগরের পরে। বিদ্যাসাগরের আগে দীর্ঘ-৯ বলে একটা বর্ণ ছিল। লেখা হত ৯-এর তলায় আর একটা ছোট ৯ বসিয়ে। এই দীর্ঘ-৯ বর্ণটিকে বাংলা বর্ণমালা থেকে বাদ দেবেন বলেই বিদ্যাসাগরের এত আয়োজন। তাঁর বর্ণপরিচয় লেখার মূল কারণও এটাই। ও সব শিক্ষার বিস্তার-টিস্তার ইত্যাদি ন্যারেটিভগুলো তৈরি করা হয়েছে সুপরিষ্কার ভাবে। আসল সত্যিটা লুকিয়ে রাখার জন্য। বুঝতেই পারছেন, গোটা ব্যাপারটার পিছনে বিদ্যাসাগর একা নন, আরও অনেক লোকজন ছিল। এখনও আছে। তা না হলে এত বড় একটা মিথ্যাকে এত বছর ধরে এ ভাবে সত্যি বলে চালানো যায় না। অবশ্য কাজটা করা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্যই।”

ডক্টর সান্যাল আবার থামলেন। চেয়ে রইলেন আমার দিকে। বোধহয় আমি মনে মনে তাঁকে কত বড় পাগল বলে ভাবছি, সেটাই তিনি বুঝতে চান।

“এই বর্ণটিকে বাদ দিয়ে বিদ্যাসাগরের লাভ?”

ডক্টর সান্যাল কথা বললেন বেশ কিছুক্ষণ পরে। তবে যেটা বললেন সেটাকে আমার প্রশ্নের উত্তর বলা চলে কি না আমি জানি না।

“আপনি বরিশাল কামান গর্জনের নাম শুনেছেন?”

“না।”

“বরিশাল কামান বা বরিশাল গানস পৃথিবীর বহু অমীমাংসিত রহস্যের মধ্যে একটি। ঊনবিংশ শতক ও তার আগে থেকে পূর্ববঙ্গের বরিশাল ও তার আশপাশের এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মেঘহীন, পরিষ্কার আকাশে মাঝে মাঝেই কামান গর্জনের মতো বিকট এক শব্দ শোনা যেত। বহু লোক এই শব্দ শুনেছে, কিন্তু কোথা থেকে শব্দটা আসত, তা আজও কেউ সঠিক ভাবে বলতে পারেনি। বরিশালের তখনকার নাম ছিল বাকেরগঞ্জ। তৎকালীন এক ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট, হেনরি বেভারিজ, তাঁর লেখা বই ‘দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ বাকেরগঞ্জ’-এ প্রথম এই শব্দের কথা উল্লেখ করেন। ‘বরিশাল গানস’ নামটিও তাঁরই দেওয়া। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির

বিবরণ ঘাঁটলে দেখতে পাবেন, বাংলাদেশের খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালি, নারায়ণগঞ্জ, হরিশপুর প্রভৃতি নানা স্থান থেকে বরিশাল গানস শোনা যেত। শব্দটা হঠাৎ হঠাৎ ভেসে আসত সমুদ্রের দিক থেকে। বাংলাদেশের কবি সুফিয়া কামালও তাঁর আত্মজীবনীতে এই শব্দের কথা লিখে গেছেন। ১৯৫০ সালের পর এই শব্দ আর শোনা যায়নি।”

আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি। ডক্টর সান্যাল কী বলতে চাইছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।

“এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কী সম্পর্ক?”

“তখনকার ব্রিটিশ সরকার এই শব্দের কারণ খুঁজতে বহু অনুসন্ধান করেছিল বলে জানা যায়। প্রথমদিকে নাকি তারা ভেবেছিল ওগুলো পটুগিজ জলদস্যুদের কামান দাগার শব্দ। বঙ্গোপসাগরের বুকে বহু ব্রিটিশ জাহাজ সে সময়ে দিনের পর দিন ধরে জলদস্যুদের ঘাঁটি খুঁজে বেড়িয়েছে বলে, নথিপত্রে উল্লেখ আছে। আসলে পুরোটাই ছিল লোকদেখানো ভাঁওতাবাজি। ব্রিটিশ সরকার খুব ভাল করেই জানত ওগুলো কিসের শব্দ। বিদ্যাসাগরও জানতেন।”

ডক্টর সান্যাল আবার থামলেন। আমার হতভম্ব অবস্থাটা উপভোগ করছেন তিনি।

“বিদ্যাসাগরের জীবনী যদি খুব ভাল করে খুঁটিয়ে স্টাডি করেন, সাল-তারিখগুলো যদি ভাল করে লক্ষ করেন, তা হলে দেখবেন, ১৮৫৩ সালের শেষ থেকে ১৮৫৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাস ছ’-সাতের কোনও এন্ট্রি কোথাও পাওয়া যায় না। ওই সময়টাতে তিনি কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন তার কোনও রেকর্ড কোথাও নেই। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লেখা কোনও বই পড়লে অবশ্য এই ব্যাপারটা ধরতে পারবেন না। পুরনো চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটতে হবে, সরকারি কাগজপত্র, ডকুমেন্টস এ সব দেখতে হবে। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন তেত্রিশ-চৌত্রিশের মতো। এর বছরখানেক পরেই তিনি প্রকাশ করেন ‘বর্ণপরিচয়’-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।”

“বিদ্যাসাগর কোথায় ছিলেন ওই সময়টায়?”

“নিশ্চিত ভাবে বলতে পারব না কোনও প্রমাণ না থাকায়। তবে আমার বিশ্বাস, বিদ্যাসাগর ছিলেন ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বেশ কয়েকশো কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত একটি জনহীন দ্বীপে। কলকাতা থেকে ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ ব্যবস্থায় একটি গোপন জাহাজে করে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অবশ্য তিনি একা ছিলেন না, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার এবং তৎকালীন ভারতের বেশ কিছু নামী ব্যক্তিত্বও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। ফেব্রার সময়ে সকলে শপথ নিয়ে ফিরেছিলেন যে, এই

অভিযান বা এর সঙ্গে জড়িত কোনওরকম কথা কেউ কোনও দিন বাইরে প্রকাশ করবেন না।”

“কেন?”

“কারণ, সেই দ্বীপে ব্রিটিশ সরকার অতি গোপনে একটি এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছিল, যার কথা তাদের পক্ষে কোনও ভাবেই প্রচারিত হতে দেওয়া সম্ভব ছিল না।”

“কী এক্সপেরিমেন্ট?”

“পৃথিবীর বহু ধর্মেই পৃথিবীর শেষদিন বা সৃষ্টির শেষদিন বলে একটা কনসেপ্ট আছে, জানেন বোধহয়। আব্রাহামিক রিলিজিয়নে একে বলেছে কেয়ামত বা জাজমেন্ট ডে, হিন্দুধর্মে বলেছে মহাপ্রলয়। এর পরে আবার নতুন করে সৃষ্টি সংঘটিত হয়। ব্রিটিশরা এই মহাপ্রলয় কী ভাবে ঘটে বা ঘটানো যায় তার খোঁজ পেয়েছিল। ব্রিটিশ স্কলাররা ভারতবর্ষে আসার পরে ভারতবর্ষের নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি আরও অনেক বিষয়ের মতো ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলো নিয়েও গভীর ভাবে স্টাডি করতে থাকে। আর এই করতে গিয়েই তারা এক আশ্চর্য ব্যাপারের খোঁজ পায়। পুরনো পুঁথিপত্রগুলো তাদের অনেক সাহায্য করেছিল, যেমন আমাকে করেছে। তারা দেখতে পায়, ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত বাংলা নামক ভাষাটির একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বাংলা ভাষায় এমন একটি শব্দ রয়েছে, যেটি উচ্চারণ করলে কেয়ামত সংঘটিত হয়।”

“তার মানে?”

“মানেটা আমিও সঠিক ভাবে জানি না। কারণ, গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এ বিষয়ে কেউই স্পষ্ট করে কিছু লিখে যায়নি। যা সূত্র পেয়েছি সবই ভাসা-ভাসা। পুরনো পুঁথিপত্রও নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই। অবশ্য সেখানে নির্দিষ্ট কিছু না থাকারটাই স্বাভাবিক। কারণ, বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি, সেই বস্তুটির তখনও জন্ম হয়নি, আর বিজ্ঞান না জানলে এর রহস্যভেদ করা সম্ভব নয়। তবে প্রাচীন ভারতীয়রা কারণটা না বুঝলেও ব্যাপারটা ঠিকই লক্ষ করেছিল, আর পুঁথিপত্রে তার ইঙ্গিতও দিয়ে গেছিল। তবে সেখানেও গোপনীয়তার কারণে প্রায় সবই হেঁয়ালিতে লেখা। অনেকটা চর্যাপদের মতো। একই কথার দু’রকম অর্থ করা যায়— একটা বাহ্যিক অর্থ আর একটা ভেতরের গূঢ় অর্থ। আমাকে অনেক কষ্ট করে, নানা বইয়ের সাহায্য নিয়ে, একটু একটু করে আসল মানেটা উদ্ধার করতে হয়েছে। তাও যোলো আনা সফল হয়েছি বলব না, তবে মোটামুটি ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি।”

“কিন্তু ডক্টর সান্যাল, আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করলে কেয়ামত সংঘটিত হবে মানে? কী আছে সেই শব্দ? কোন শব্দ সেটা?”

“আমরা কী ভাবে কথা বলি নিশ্চয়ই জানেন। আমরা যখন মুখ দিয়ে কোনও কথা উচ্চারণ করি, তখন তার প্রতিটি অক্ষরের ধ্বনির আলাদা-আলাদা কম্পন পরপর বাতাসে তৈরি হয়। আমি বিজ্ঞানের স্টুডেন্ট নই, তবে পুথিপত্র পড়ে যেটুকু বুঝেছি, তার ভিত্তিতে মনে হয়েছে ব্রিটিশরা বাংলা ভাষায় একটি বিশেষ শব্দ বা ওয়ার্ডের খোঁজ পেয়েছিল, যার অক্ষরগুলি পরপর উচ্চারণ করলে বাতাসে যে কম্পন ওঠে, তাতে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। কোনও এক বিচিত্র প্রক্রিয়ায় সেই কম্পন মুহূর্তে কোটি-কোটি গুণ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে বাতাসে যে প্রবল চাপ ওঠে, তার ধাক্কা গিয়ে লাগে আশপাশের সব কিছুতে। বাড়িঘর, গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষজন সব মুহূর্তে সেই চাপে কাগজের মতো চ্যাপটা হয়ে যায়। আরও বিচিত্র ব্যাপার হল, এই কম্পন এবং চাপ নাকি ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। কোথায় গিয়ে থামে তা কেউ জানে না। সম্ভবত গোটা পৃথিবীটাকে চিড়েচ্যাপটা করে দেওয়ার পর।”

“কিন্তু সামান্য একটা শব্দ উচ্চারণ করলে...”

“আমি তো আপনাকে বললামই গোটা ব্যাপারটার সঠিক ব্যাখ্যা আমিও জানি না। যেটুকু বুঝেছি সেটুকুই বললাম। অবশ্য শব্দ না বলে একে অক্ষরের সমষ্টি বা বিন্যাস বলাই ভাল। কারণ, এটা কোনও প্রচলিত অর্থবহ শব্দ নয়। তা যদি হত তবে ব্রিটিশরা আসার ঢের আগেই কেউ না কেউ কখনও না কখনও সেই শব্দটি উচ্চারণ করে ফেলত। এককথায় বলতে গেলে, ব্রিটিশরা বাংলা ভাষায় এমন কয়েকটি অক্ষরের সন্ধান পেয়েছিল, যেগুলোকে একটা বিশেষ অর্ডার বা ক্রমানুসারে পরপর উচ্চারণ করলে মহাপ্রলয় ঘটে।”

“আর এর মধ্যে একটি অক্ষর ওই দীর্ঘ-ঈ?”

“কারেন্ট। শুধু একটি অক্ষর নয়, প্রথম অক্ষর।”

“আর সে জন্যই বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয় লিখে, বাংলা ভাষা থেকে ওই অক্ষরটিকে বাদ দিয়েছিলেন?”

“ইয়েস। ব্রিটিশরা অবশ্য বর্ণপরিচয় লেখার অনেক আগেই অক্ষরগুলোর সন্ধান পেয়েছিল। পাওয়ার পরে ব্রিটিশ সরকার অতি গোপনে উচ্চপদস্থ ও বিশ্বস্ত কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে একটি সিক্রেট সোসাইটি গঠন করে। এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল এই বিশেষ অক্ষরগুলো এই বিশেষ অর্ডারে যেন কোনও ভাবেই পৃথিবীতে কেউ কোনও দিন অ্যাক্সিডেন্টালি উচ্চারণ না করে ফেলে সেটা সুনিশ্চিত করা। যদিও তার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, এই বিশেষ অক্ষরগুলোর মোট সংখ্যা আট। বাংলা বর্ণমালার পঞ্চাশটি

অক্ষরের মধ্যে বিশেষ আটটি অক্ষর একটা বিশেষ অর্ডারে পরপর অ্যাক্সিডেন্টালি উচ্চারণ করার প্রোবাবিলিটি প্রায় শূন্যই বলা যায়। তবুও সাবধানের মার নেই। যাই হোক, যে পদ্ধতিতে এই সিক্রেট সোসাইটি তার কার্যসিদ্ধি করেছিল, তাকে জিনিয়াস বললে কম বলা হয়। তারা প্রথমে এই বিশেষ অর্ডারের প্রথম অক্ষর, অর্থাৎ দীর্ঘ-ঈ দিয়ে বাংলায় যত শব্দ ছিল তার বিলোপ ঘটায়। একদিনে অবশ্যই নয়, বহু বছর ধরে, একটু-একটু করে। সম্ভবত সন্তর-আশি কি একশো বছর ধরে, অতি ধীরে-ধীরে, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তারা এই কাজটি করেছিল। প্রচলিত শব্দগুলোর বদলে তার বিকল্প সমার্থক শব্দ খুঁজে বের করে বা উদ্ভাবন করে সেগুলোকে ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে প্রমোট করেছিল নানা অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় পদ্ধতিতে। লোকজনের মধ্যে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিয়েছিল নতুন শব্দগুলো। এই কাজে ক্ষেত্রবিশেষে তারা নানারকম আলাদা-আলাদা স্ট্র্যাটেজি কাজে লাগিয়েছিল। সরকার পিছনে থাকায় তাদের কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে গেছিল, সন্দেহ নেই। কোথাও হয়তো তারা আগেকার প্রচলিত কোনও শব্দের যা অর্থ, তার বদলে একই অর্থের নতুন কোনও শব্দের নামওয়াল কোনও জিনিস বা ব্যক্তিকে আমদানি করল। যেমন ধরুন, কথার কথা বলছি, বীরভূমের কোনও এক অঞ্চলে হয়তো কোনও একটা প্রচলিত শব্দে দীর্ঘ-ঈ ছিল। শব্দটার মানে হয়তো অত্যাচারী। এরা সেই অঞ্চলে কোনও এক প্রবল অত্যাচারী, জাঁদরেল ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার বা ম্যাজিস্ট্রেটকে বসিয়ে দিল। ধরা যাক, তাঁর নাম টার্নার। সেই অফিসার বা ম্যাজিস্ট্রেট শুরু করলেন সেই এলাকার মানুষের ওপর বীভৎস অত্যাচার। এর ফলে কী হবে? ধীরে ধীরে ওই এলাকার মানুষের কাছে টার্নার শব্দটাই অত্যাচারীর সমার্থক শব্দ হয়ে যাবে। পঞ্চাশ বছর পরে দেখা যাবে দীর্ঘ-ঈ থাকা মূল শব্দটি মানুষের মন থেকে, স্মৃতি থেকে মুছে গেছে, বদলে চালু হয়ে গেছে টার্নার শব্দটি। এই টার্নার অবশ্য ভুল উচ্চারণের জন্য মানুষের মুখে মুখে পাল্টে অন্য কিছুও হয়ে যেতে পারে, তাতে অসুবিধে নেই। মোদ্দা কথা, আগেকার প্রচলিত শব্দটি লুপ্ত হয়ে যাবে। আবার ধরুন, হয়তো বর্ধমানের কোনও জায়গায় খরগোশের স্থানীয় নামে দীর্ঘ-ঈ ছিল। এরা সেই এলাকায় শিকার করে করে খরগোশকে বাড়েবংশে লোপ পাইয়ে দিল। জন্তুটা থাকলে তবে না তার নামটা থাকবে! একশো বছর পরে দেখা গেল, খরগোশ বলে যে কোনও জন্তু হয়, তাই-ই সেখানকার মানুষজন ভুলে গেছে। এই ভাবে নানারকম কায়দায় তারা শ'খানেক বছর ধরে বাংলার যাবতীয় গ্রামগঞ্জ, খেতখামার,

মাঠঘাট, খালবিল থেকে, অর্থাৎ বাংলা ভাষা থেকে দীর্ঘ-ঈ থাকা সমস্ত শব্দকে পুরোপুরি অবলুপ্ত করে দিল। তার পরে বাকি কাজটা তো সোজা। ভাষা ও সাহিত্যে এক্সপার্ট এমন একটা কাউকে জোগাড় করো আর তাকে দিয়ে দীর্ঘ-ঈ বাদ দিয়ে একটা নতুন বাংলা প্রাইমার লিখিয়ে নাও। বিদ্যাসাগর ছাড়া এ কাজের জন্য বেশি উপযুক্ত আর কে হবে? তবে বিদ্যাসাগর বাংলা বর্ণমালায় লুকিয়ে থাকা মহাপ্রলয় ঘটানোর অক্ষরের সমষ্টির কথা জানলেও ব্রিটিশদের বাংলা থেকে দীর্ঘ-ঈ-কারওয়াল শব্দ বিলোপ করার ব্যাপারটা জানতেন বলে মনে হয় না। জানলে বোধহয় এই কাজে রাজি হতেন না। তিনি শুধু জানতেন দীর্ঘ-ঈ দিয়ে বাংলায় কোনও শব্দ নেই। বর্ণপরিচয়ের ভূমিকায় তিনি লিখছেন, “বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বহুকালাবধি বর্ণমালা যোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ঈ-কার ও দীর্ঘ ঙ্গ-কারের প্রয়োজন নাই; এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।”

ডক্টর সান্যাল থামলেন। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি।

অনেকক্ষণ পরে ডক্টর সান্যাল একটু শুকনো হাসলেন।

“কী বুঝলেন?”

আমার গলা শুকিয়ে গেছিল। টোঁক গিলে তবে আমি আবার কথা বলতে পারলাম।

“ব্রিটিশরা শুধুমাত্র এই অক্ষরগুলোর মধ্যে প্রথম অক্ষরটাই বাছল কেন? যে-কোনও একটা অক্ষর বাছলেই তো হত।”

“না, তা হত না। এই অক্ষরগুলোর এমনই বৈশিষ্ট্য যে, আপনি যদি আটটা অক্ষরের সব ক’টা না বলে প্রথম দুটো কি তিনটেও বলেন, তা হলেও এর কিছুটা ক্রিয়া হয়। যত বেশি অক্ষর বলবেন ততই বেশি ক্রিয়া হবে। কিন্তু প্রথম অক্ষরটা বাদ দিয়ে দিলে আর ভয় নেই। বাকি অক্ষরগুলো যতবারই বলুন না কেন, কিছু হবে না। ব্রিটিশরা এই ব্যাপারটা বুঝতেই দিনের পর দিন ধরে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরের ওই নির্জন দ্বীপে। একেবারে নিশ্চিত হয়ে তবেই তারা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তাঁকে বিশেষ জাহাজে করে গোপনে নিয়ে গিয়েছিল সেই দ্বীপে। নিজের চোখে দেখিয়েছিল এই অক্ষরগুলোর মারণ-ক্ষমতা। স্বচক্ষে সব দেখে বিদ্যাসাগর রাজি হন বাংলা ভাষার ওপর নতুন বই লিখতে।”

“এক্সপেরিমেন্টটা কী ধরনের ছিল?”

“ওরা ওই আটটা অক্ষরের প্রথম কয়েকটা সাবধানে, নানারকম ভঙ্গিতে, অল্প-অল্প করে বলে দেখত তার কী প্রতিক্রিয়া হয়। তার ফলে বাতাসের যে প্রবল চাপ তৈরি হত, তারই



আওয়াজ সুদূর বাংলাদেশ থেকে ওরকম কামান গর্জনের মতো শোনাতে।”

“কিন্তু আপনি যে বললেন ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই আওয়াজ শোনা গেছে?”

“হ্যাঁ, ব্রিটিশরা ১৮৫৫-এর পরেও ওদের এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে গেছিল। ওরা ঠিক করেছিল, বাংলা ভাষা থেকে হুস-৯ বর্ণটাও সরিয়ে দেবে, একস্ট্রা সেফটি মেজার হিসেবে। ওরা ‘৪৭-এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়ে বঙ্গোপসাগরের ওই দ্বীপ থেকে ওদের কাজের সব চিহ্ন মুছে দিয়ে যায়। সেই জন্যই মোটামুটি ওই সময়ের পর থেকে বরিশাল গানস আর কেউ শোনেনি। তবে ওই সিক্রেট সোসাইটি এখনও আছে। তারা গোপনে, অতীব সন্তর্পণে আজও কাজ করে যাচ্ছে। এবং সফলও হয়েছে। হুস-৯ এখন আর বাংলা বর্ণমালায় নেই।”

“কিন্তু ডক্টর সান্যাল, ৯ বর্ণটা সরিয়ে দিয়ে সত্যিই কি লাভ আছে কিছূ? ৯-এর উচ্চারণ তো ল-এ হুস-ই দিয়েই পাওয়া যায়।”

“না, ৯ আর ল-এ হুস-ই-এর উচ্চারণের একটা সূক্ষ্ম তফাত আছে। আমি ল-এ হুস-ই দিয়ে অক্ষরগুলো পরপর উচ্চারণ করে দেখছি, কিছূই হয়নি।”

“তার মানে আপনি জানেন কোন আটটা এই বিশেষ অক্ষর? অর্ডারটাও জানেন?”

ডক্টর সান্যাল চুপ করে চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

“অক্ষরগুলো কী কী, ডক্টর সান্যাল?” কোনও উত্তর নেই।

এই ইন্টারভিউয়ের ঠিক পনেরো দিন পরে আমি চাকরি ছেড়ে দিই। দাশদা বহুবার কারণটা জানতে চেয়েছিলেন, আমি উত্তর দিইনি। ডক্টর সান্যালের থিয়োরি নিয়ে ফিচার করার ব্যাপারে শুধু জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, ডক্টর সান্যাল আবোল-তাবোল বকছেন। ওনার থিয়োরি ছাপার যোগ্য নয়।

আমার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আসল কারণটা ছিল মানসিক চাপ। যে-ঘটনাটা আমি ঘটিয়েছিলাম, তার পরে আর আমার পক্ষে সাংবাদিকতার চাকরি করা সম্ভব হয়নি। আমাদেরই অফিসে তিনদিন ধরে ক্রমাগত একের পর এক লোকের মৃত্যুসংবাদ আর ঘরবাড়ি, গাছপালা ভেঙে পড়ার খবর আসছিল। এমনকি, আমার নিজের এক আত্মীয়ও সে দিন দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায়।

বহুবার বহু পীড়াপীড়ি করায় ডক্টর সান্যাল আটটা অক্ষরের মধ্যে প্রথম তিনটে, অর্থাৎ দীর্ঘ-৯ এবং আরও দুটো অক্ষর আমাকে বলেছিলেন। তবে তার সঙ্গে সেগুলো উচ্চারণ করার একটা বিশেষ টেকনিক

শিখিয়ে দেন, যাতে বাতাসের ওপর এর এফেক্টটা একেবারে আশপাশের বাতাসে না হয়ে অনেক দূরে কোনও জনহীন স্থানে হয় এবং ফলে ক্ষয়ক্ষতি না হয়। এটা তিনি পুঁথি থেকেই পেয়েছিলেন। আমি সেই টেকনিকে ডক্টর সান্যালের সামনেই বসে সেদিন অক্ষর তিনটে পরপর উচ্চারণ করি। তার ফলাফল যে এরকম হবে, সেটা ডক্টর সান্যাল নিজেও ভাবতে পারেননি। ক’দিন পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই অক্ষরগুলোর মারণ-ক্ষমতা কতখানি সে ব্যাপারে তাঁর ধারণা কতটা সীমাবদ্ধ।

ইন্টারভিউয়ের দু’দিন পরে, ১৬মে ২০২১ তারিখে ভারতের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বুকে একটি বিশেষ অঞ্চলে একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। খুব দ্রুত সেই নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের দিকে ছুটে আসে। ২০ মে ২০২১ ঘূর্ণিঝড়টি পশ্চিমবঙ্গে ল্যান্ডফল করে এবং প্রায় তিনঘণ্টা ধরে ঘটায় দেড়শো কিলোমিটার বেগে প্রবল বাতাস কলকাতার বুকে এক ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা চালায়। টিভি, খবরের কাগজ জানিয়েছিল, ঘূর্ণিঝড়টির নাম আমফান।

অঙ্কন: তিতাস পণ্ডা

সঙ্কীৰ্তন

জয় গো স্বামী

আনন্দ-আহার

শূদ্র, নমশূদ্র, মুচি, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, চণ্ডাল, চামার

সকলেই, দ্যাখো দ্যাখো, কলাপাতা পেতে
বসেছে প্রাঙ্গণে—
কোনও ভেদাভেদ নেই আর।

রাত্রিবেলা চোখ বন্ধ করতেই এই দৃশ্য জেগে উঠল মনে

সকলের আনন্দ-আহার
সর্বহারা এ-দেশের দিকে-দিকে সকলের আনন্দ-আহার!

এর বেশি কী আছে চাওয়ার?

দেখেছি জাগ্রতস্বপ্নে সকলকেই কলার পাতায়
খিচুড়ি পরিবেশন করছেন নিজে শ্রীশ্রীগৌরানন্দ আমার...

শ্রমকণ্ঠ

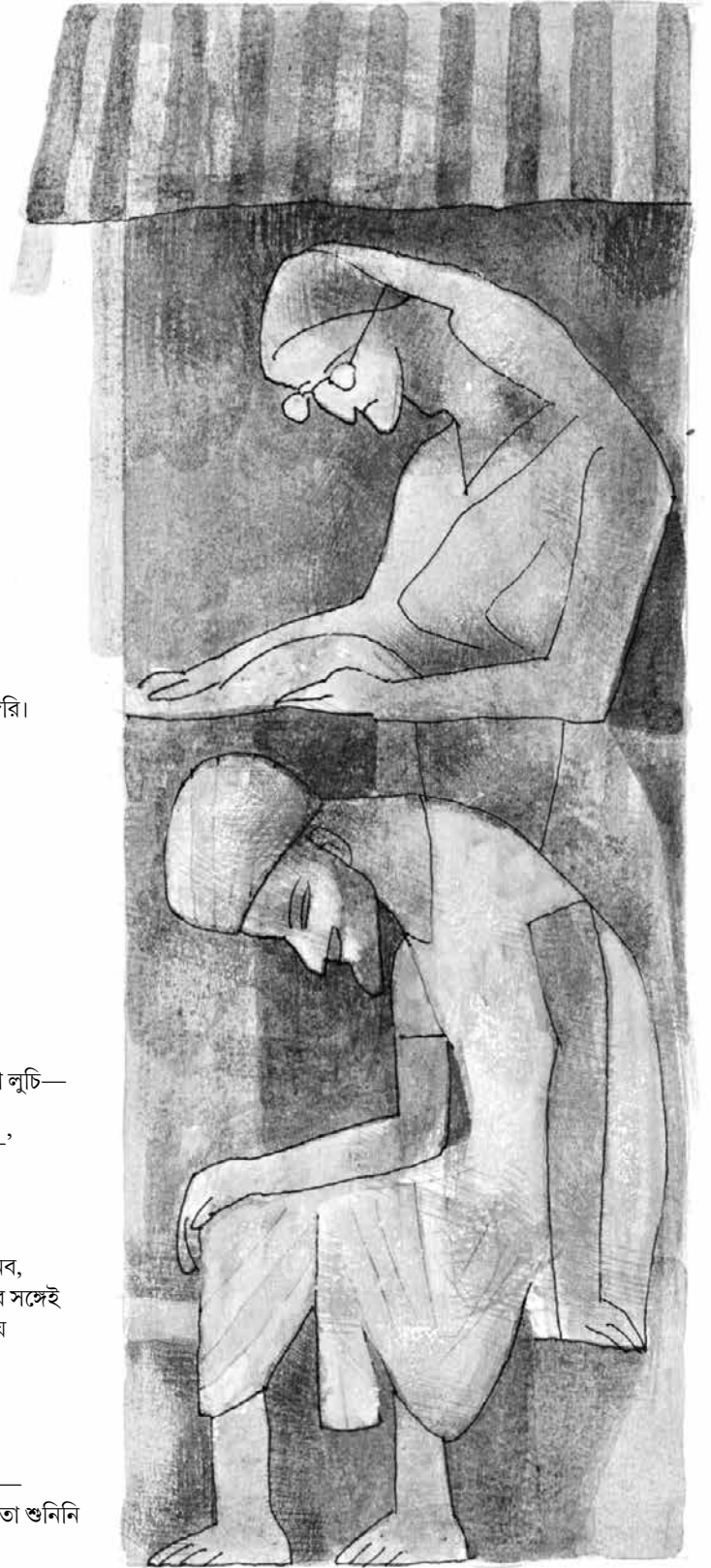
হাতে টানা রিকশায় দু'জন
সওয়ারি বসেছে।
যে-লোকটি রিকশা টানছে এই দাবদাহের ভিতর
তার কানে গিয়ে যদি দিয়ে আসা যায় নামগান
ওই শ্রমকণ্ঠ তবে কিছুমাত্র লাঘব হবে কি?

এ-জিজ্ঞাসা মনে আসা মাত্র আমি দেখি
চামড়া-পোড়া গ্রীষ্ম-কলকাতায়
যারা টিউকল পুঁতছে, যারা ঠেলছে ঠেলাগাড়ি
যারা বস্তা ওঠাচ্ছে মাথায়
সবার ছায়ার পাশে-পাশে
শ্রীচৈতন্যদেব এসে দাঁড়িয়ে পড়ছেন
যাতে তারা কাজ করবার শক্তি পায়
প্রত্যেক নিঃশ্বাসে।



মোহনভোগ

সে-বছর এসে গেছে রাসযাত্রা। আর মাত্র তিন হপ্তা দেরি।
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বলে দিয়েছেন—
যে সব রাস্তায় যাবে শোভাযাত্রা, সেসব অঞ্চলে
খোয়া ফেলে, পিচ ঢেলে, স্টিম রোলার দিয়ে
রাস্তার সারাই হবে।
তাই হচ্ছে আজ।
কর্মরত একজন শ্রমিক
ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল পাশের রোয়াকে।
তার শরীর ভাল নয়, ফুসফুসের রোগ—
বাড়িতে অভাব বলে কাজে আসতে হয়।
রোয়াকের পরে দরজা। সেই দরজা খুলে
বেরোলেন একজন ঠাকুমা।
তাঁর হাতে একটি থালা। থালায় মোহনভোগ, চারখানা লুচি—
অন্য হাতে একগ্লাস জল।
'নাও বাছা, খেয়ে নাও। আগে কলে হাত ধুয়ে এসো—'
শ্রমিকটি অবাক! কিন্তু সত্যি খিদে পেয়ে গেছে তার,
ঠাকুমা দাঁড়িয়ে তাকে খাওয়ালেন— খাওয়ার পরেই
সে যখন থালা ধুয়ে দিতে চাইল, ঠাকুমা বললেন:
'তুমি খেলে— এ আমার ভাগ্য— থালা আমি ধুয়ে নেব,
তুমি তো রাসের জন্য কাজ করছ বাবা, ওই যে তোমার সঙ্গেই
অন্যরাও উদযাস্ত খাটছে, পায়ে চট জড়িয়ে, বারি দিয়ে
পিচ ঢালছে রাস্তার ওপর
ওদের সবাইকে ডেকে খাওয়াব যে
আমার সে-সামর্থ্য নেই, তাই
তুমি ছাড়া আর কাউকে ডাকতেও পারিনি
তোমাকেও কি ডাকলাম? নিজে এসে বসেছ রোয়াকে—
তোমাদের বাপ-মা-রা কাকে যে কী নামে ডাকে আমি তা শুনিনি
কিন্তু আমি তোমাদের সকলকেই
নদিয়ার 'গোরা' নামে চিনি!



অবতার

খ্রিস্টদেব চলেছেন ভারী ক্রুশকাঠ কাঁধে নিয়ে

গলগথা পাহাড়ে পৌঁছোনোর
পথে কত চড়াই-উতরাই।
হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন শ্রীশ্রীখ্রিস্টদেব—
গ্রহরী-চাবুক নামছে পিঠে।

বহুকষ্টে, থমকে-থমকে, উঠে
চলছেন আবার...

দু'পাশে লুকিয়ে আছে কাতরক্রন্দন, ভক্তদের।

খ্রিস্টদেব একথা জানেন
দেহটিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে ঠিকই—
কিন্তু দেরি নেই তাঁর পুনরুত্থানের।

সেইসঙ্গে একথাও জানেন, আজ নয়
কয়েক শতাব্দী পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে
নবদ্বীপে শান্তিপুরে পল্লিতে-পল্লিতে
সঙ্কীর্ণনরত চৈতন্যের!

কুঞ্জবাটিকা

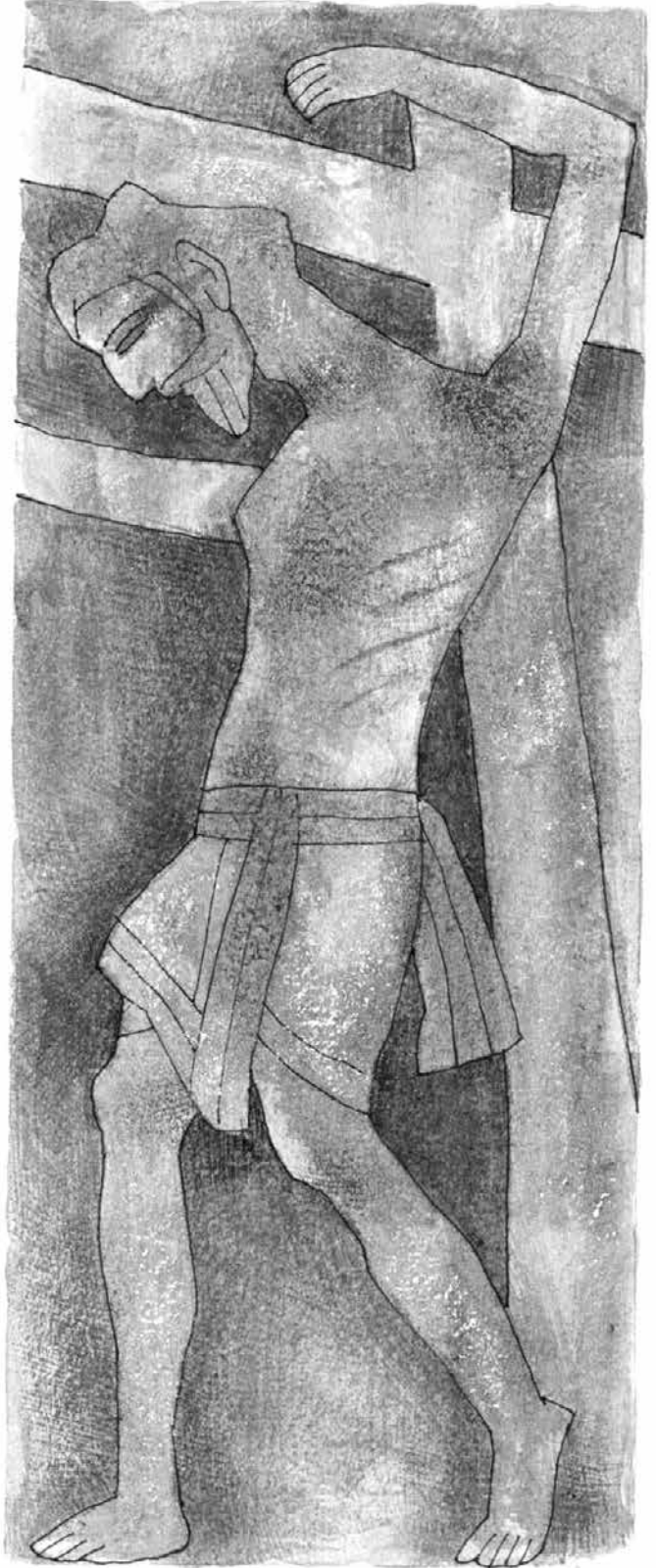
প্রভুপাদ নিত্যানন্দ
খড়দহে কিছুদিন বাস করেছেন, শোনা যায়।
সমাধি কোথায় তাঁর? ঠিক জানা নেই
তিনিও কি বিলীন হয়েছিলেন, গুরু শ্রীশ্রীচৈতন্যের মতো?

তবে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের সমাধিবেদিতে দু'টি
তুলসীমঞ্চের অবস্থান দেখতে পাও

তুমি খড়দহে যাও সেইসব তুলসীমঞ্চকে
মনে-মনে হরিনাম দিতে।

রেলস্টেশনে যে-বালক ট্রেনের জানলায় হাত পাতে
‘বাপ-মা কোথায় তোরা?’ বললে কোনও উত্তর করে না—
মাথাটা নামিয়ে রাখে— এরপর যেদিন যেদিন
খড়দহ যাবে তুমি, ওই বালকটিকে
স্টেশনের বাইরে ডেকে এনে
রাস্তার হোটেল থেকে ঘুগনি-পাউরুটি খাইয়ে দিয়ো

তাহলেই খড়দহের শ্যামের মন্দির আর কুঞ্জবাটিকার দু'টি
তুলসীমঞ্চকে
গলা ছেড়ে হরিনাম ঢেলে দেওয়া হবে!



মহাতীর্থ

[‘মন তড়পত হরি দর্শন কো আজ’

গায়ক: মহম্মদ রফি। সুরকার: নৌশাদ। ছবি: বৈজু বাওরা।]

সল্টলেকে, সি. এ. মার্কেটের
প্রত্যেক দোকানে
দুই ভাই ভিক্ষে করছে, দু’জন বালক
মিষ্টির দোকান থেকে ফলের দোকান
মুদিখানা, মামণি ভান্ডার
সব জায়গায় যাচ্ছে, তাদের গলায়
রফি সাহেবের গান, কেউ কিছু দিচ্ছে, কেউ বলছে: ‘ভাগ ভাগ’
আমার এই পাঁপীচক্ষু কেন ওই দু’ভাইকে এখন
মনে করছে নিত্যানন্দ আর হরিদাস
চৈতন্য আদেশে যাঁরা দুয়ারে-দুয়ারে গিয়ে
আচণ্ডালে হাতে ধরে পায়ে ধরে কৃষ্ণনাম
ভিক্ষা চাইছেন?
রফিসাহেবের গানে ‘হরি’ শব্দ আছে,
আছে ‘হরি দর্শন’ ভাষা
নৌশাদ রেকর্ডিং-এর আগে
সকল যন্ত্রীকে আর গায়ককেও জানিয়েছিলেন
সকালে স্নান করে শুদ্ধবস্ত্র পরে স্টুডিয়োতে এসে
একথা তো মিথ্যা নয়, নৌশাদ আলিও জানতেন
‘হরি’ শব্দ উচ্চারণকালে সব গায়ন পবিত্র রূপ পায়—
সল্টলেকে, সি. এ. মার্কেটের পাশে আজ
দুই ভাই, ভিক্ষা-অস্ত্রে, একজন দয়ালু দোকানদার পেয়ে
দোকানেরই সামনে বসে দু’টি শালপাতায়
কচুরি ও ডাল নিয়ে খায়।
দোকানি জানে না, আজ নিত্যানন্দ আর হরিদাস
অথবা শ্রীকৃষ্ণ বলরাম
তার দেওয়া খাবারটি নিতেই
সি. এ. মার্কেটের অখ্যাত দোকান
মালিকের অজান্তেই এক মহাতীর্থ হয়ে যায়...



আঁচল

শান্তিপুরে রাস। এই ইংরেজির দু'হাজার তেইশ সালেও
বড় গোস্বামীর বংশ, ছোট গোস্বামীর বংশ,

পাগলা গোসাঁই বংশ—সব
নিজ নিজ শোভাযাত্রা নিয়ে পরিক্রমা করছেন
নগরের পথে-পথে। এক শোভাযাত্রাদল থেকে
অন্য শোভাযাত্রাদলে ফর্সা মতো একজন যুবা
দু'হাত আকাশে তুলে, খালি গায়ে,

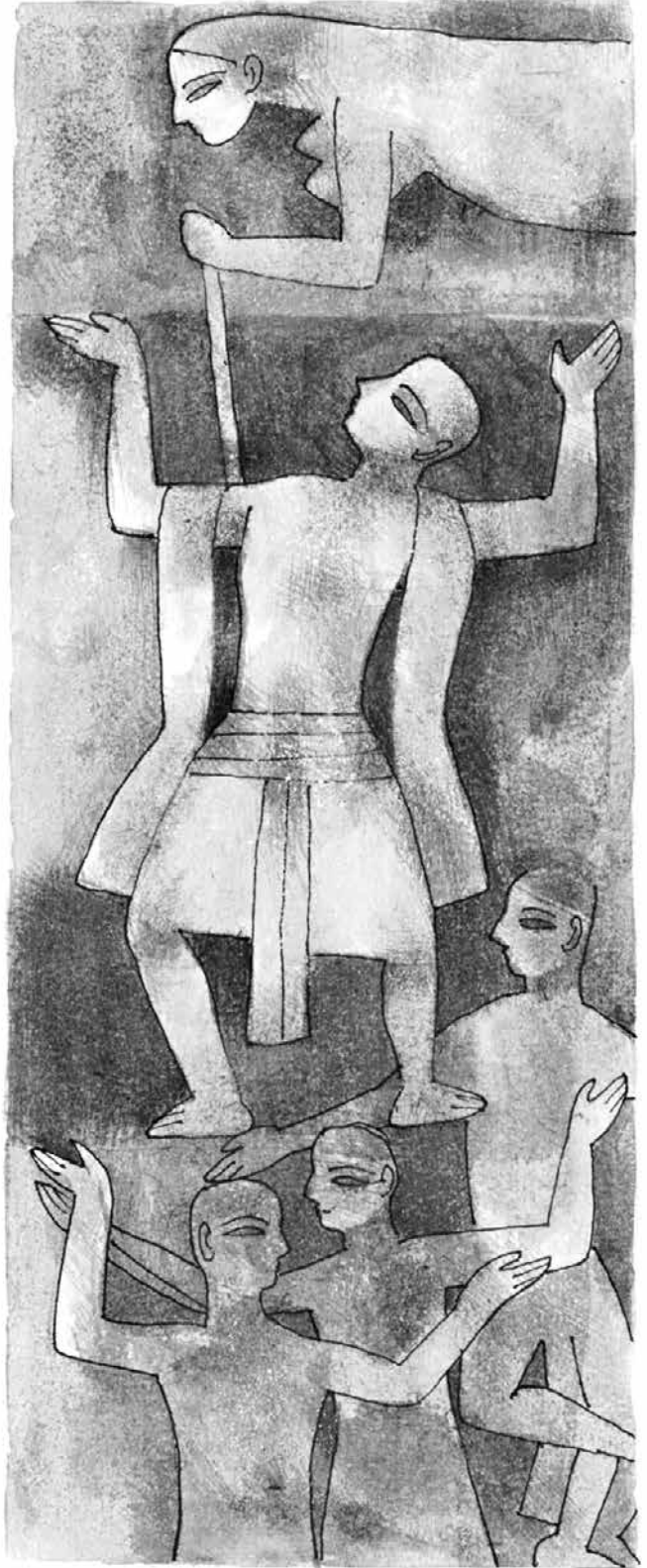
নেচে নেচে ভিড় থেকে ভিড়ে
একবার দেখা দিচ্ছে, একবার হারিয়ে যাচ্ছে—
মাথাটি কামানো তার, কপালে তিলক...
আমরা কেউ কিন্তু তাকে সেইভাবে লক্ষ করছি না।
হঠাৎ রাস্তার পাশ থেকে
এক বৃদ্ধা ছুটে এসে ঢুকে পড়েছেন
ওই শোভাযাত্রাদলে, সন্তানকে জড়িয়ে বলছেন:
'তুই নিমাই না?
আর আমায় ফাঁকি দিতে পারবি না, আর পারবি না...'
আমরা কখনও কোনও দিন
বুঝতেই পারলাম না ছেলেকে কোথায়

খুঁজে পান শচীমাতা—
সেই কোন মধ্যযুগ থেকে সব রাসশোভাযাত্রা পথে-পথে
এখনও তো শচীমার বিধবা আঁচলখানি পাতা!

কন্ডাক্টর

নামসঙ্কীর্তন দলে একজন চলেছে, খর্বকায়, টাকমাথা—
গলায় চাদর নেই তার—
বদলে রয়েছে
বাসের কন্ডাক্টররা যেরকম ব্যাগ নেয়
সেই রকম ব্যাগ।

সে আমার ভাই
জন্মেছে অদ্বৈত বংশে, তাই
বাসের টিকিট দিতে গিয়ে
যে কাগজ টুকরো দিচ্ছে প্যাসেঞ্জারকে, ঠিক তার ওপরে
জপ করবার মন্ত্র লেখা দশাক্ষরে।



একটি স্বপ্নকল্প দৃশ্য

আমবাগানের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ বসে রয়েছেন।
অদ্বৈত আচার্য পাশে। সঙ্গে নিত্যানন্দ ও শ্রীবাস।

গ্রীষ্মের দুপুর।

আমবাগানে বসে তিনি অকস্মাৎ দেখতে পেলেন কিছু দূরে
এক জ্যোতির্ময় তমালগাছ।

সেই গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে
শ্যামলকিশোর—হাতে বাঁশি।

ছুটলেন গৌরাঙ্গদেব সে-গাছের দিকে আর তমালবৃক্ষটি
তত সরে যেতে লাগল পিছনে-পিছনে আরও পিছনে-পিছনে

এক সময় সমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে
সে-গাছ, যার নীচে শ্যাম মুরলী বাজান

শান্তিপুুর থেকে সোজা ছুটতে-ছুটতে
পুরীর সমুদ্রতীর ভেদ করে চলে গিয়েছেন
শ্রীগৌরাঙ্গদেব...

আজ সমুদ্রের সবচেয়ে তলায়
শ্যামকিশোরের সঙ্গে তাঁকে
সাঁতার খেলায় দেখা যায়...

মন্ত্ৰ

চৈতন্য কাটোয়া থেকে নবদ্বীপে ফিরলেন না আর

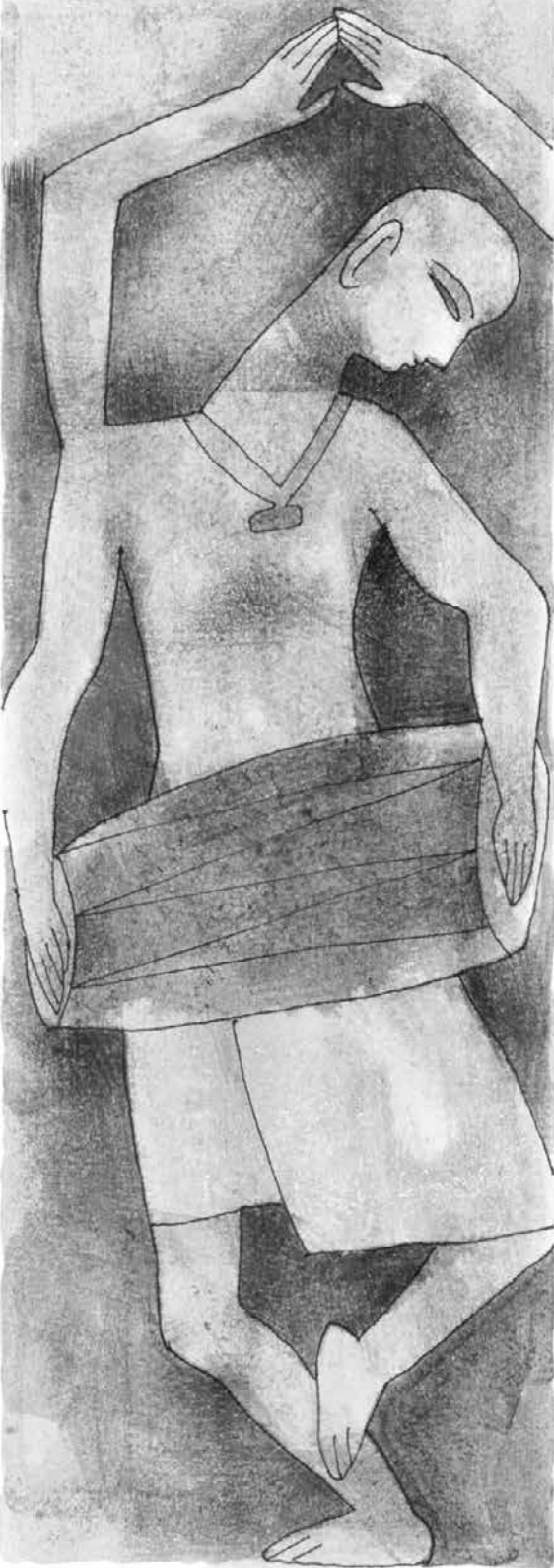
নবদ্বীপে ফিরলেন না আর।

ফিরলেন না আর।

সেই না-ফেরার না-ফেরার না-ফেরার
হাহাকার
এতদিন বাতাসে বাতাস হয়ে থেকে
কখন যে গৃহে-গৃহে, মন্দিরে-মন্দিরে
অমৃত-মন্ত্ৰটি হল পূজা-অর্চনার!

পাঁচ-পাঁচ শতাব্দী পেরিয়ে
দু'একজন পথচারী শুধু শুনতে পায়
তার সেই না-ফেরাটি নামগান হয়ে
আজও করে গঙ্গা পারাপার...





এক-ডুব

কোন কাজে ব্যস্ত আছ? আজ তুমি কার সামনে
নামগান করো

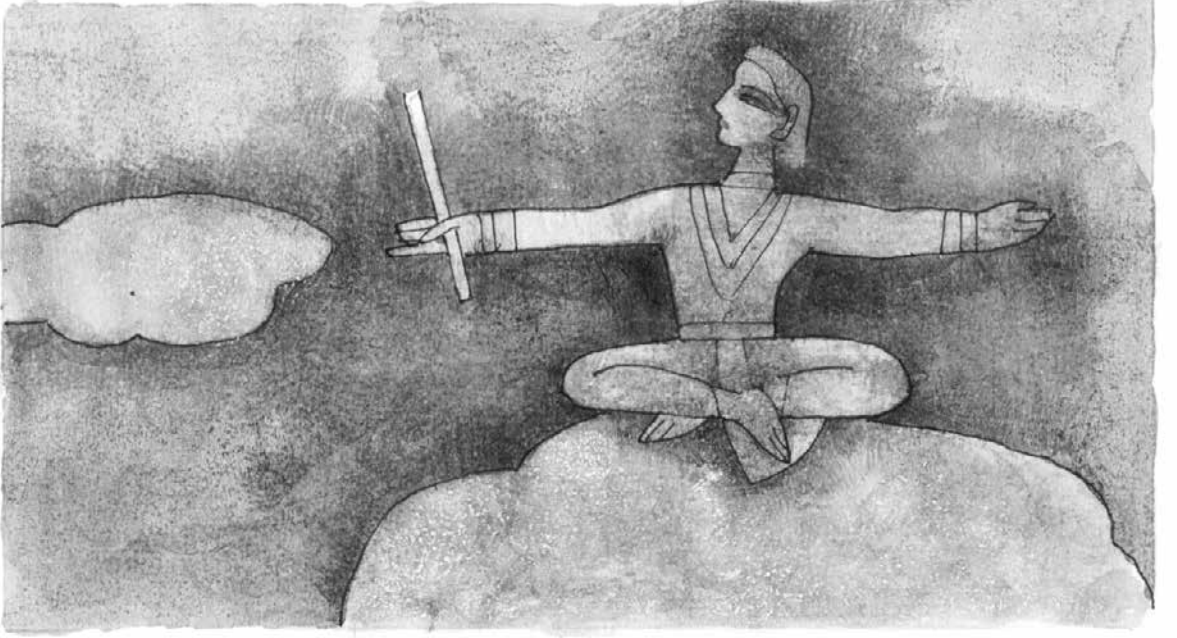
নিমাই সন্ন্যাসী?
স্বয়ং কৃষ্ণের সামনে?
মাধাইয়ের ঘাট
যে-ঘাটকে 'পাপহরণ ঘাট' বলে জানে এই জনপদবাসী
সেই ঘাটে জলে নামলে, এক-ডুব দিলেই
বোঝা যায় এখনও সে 'জল' বলে চলে হরিনাম—
এ-ঘাটের সব স্রোত গঙ্গা-মাকে শচীমা করেই
আজও ঠিক পৌঁছে যাচ্ছে সেই সমুদ্রেই
যার কূলে যুগ-যুগ ধরে
দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীশ্রীজগন্নাথধাম

কীর্তন-অঙ্গন

শ্রীবাসের আঙিনায় খোল-করতাল সহযোগে
যে-তুমি কীর্তনানন্দে বিভোর, বিভোর—
তাকে তো মানসচক্ষে দেখতে পাই রাত্রিজাগরণে...

আমি তো শ্রীবাস নই, নই তো যবন হরিদাস
সে-ভাগ্য আমার নয়—তা সত্ত্বেও ওই আঙিনায়
পাঁচশত বৎসর পূর্বে বাজিয়েছি করতাল, খোল—

এই জন্মে জীবনধারণ করলাম বহুদিন
এবার আমার এই আয়ুষ্কাল সমাপন করে
তোমার চিরদিনের কীর্তন-অঙ্গনে
একবার বসতে দাও—খোল যদি বাজাতে না পারি
তোমার সেবায় আমি খঞ্জনি বাজাব
বসে এককোণে।



মহাসাগর

পনেরোশো তেত্রিশেই
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অপ্রকট হন।

জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ লিখেছেন—
বিমানবিহারী মজুমদার
দিয়েছেন নির্দিষ্ট তারিখ।

তবে কি চৈতন্য আর রইলেন না কোথাও?

উনিশশো নয় সালে একটি গান লিখে একজন
বাঁধলেন বেহাগে।
দ্যাখো, সেই গানে দ্যাখো কী রয়েছে: 'নিখিলের পানে
উথলি উঠিবে
উতলা চেতনাসিন্ধু!'

চেতনা-মহাসাগর—নিখিল, সমগ্র সৃষ্টি, পুরো ইউনিভার্সের দিকেই
গরম দুধ ওথলানোর মতো
ফুলে উঠছে, ফুলে উঠছে...
পৌঁছোবে কোথায়?

তা আমি জানি না। জানি, সবাই যা জানে, সেটুকুই—
'উতলা' শব্দের শেষ অক্ষরের স্বর
তারসপ্তকের শুদ্ধ গান্ধারকে বিদ্ধ করে যায়।
শ্রীচৈতন্য অপ্রকট হয়েছেন, ঠিকই—
তবে চেতনার মহাসমুদ্রের জলস্তম্ভ আজও ফুলে ওঠে
'গীতবিতান'-এর পূজা-পর্যায়ের সাতষষ্ঠি পৃষ্ঠায়...

দৃষ্টি

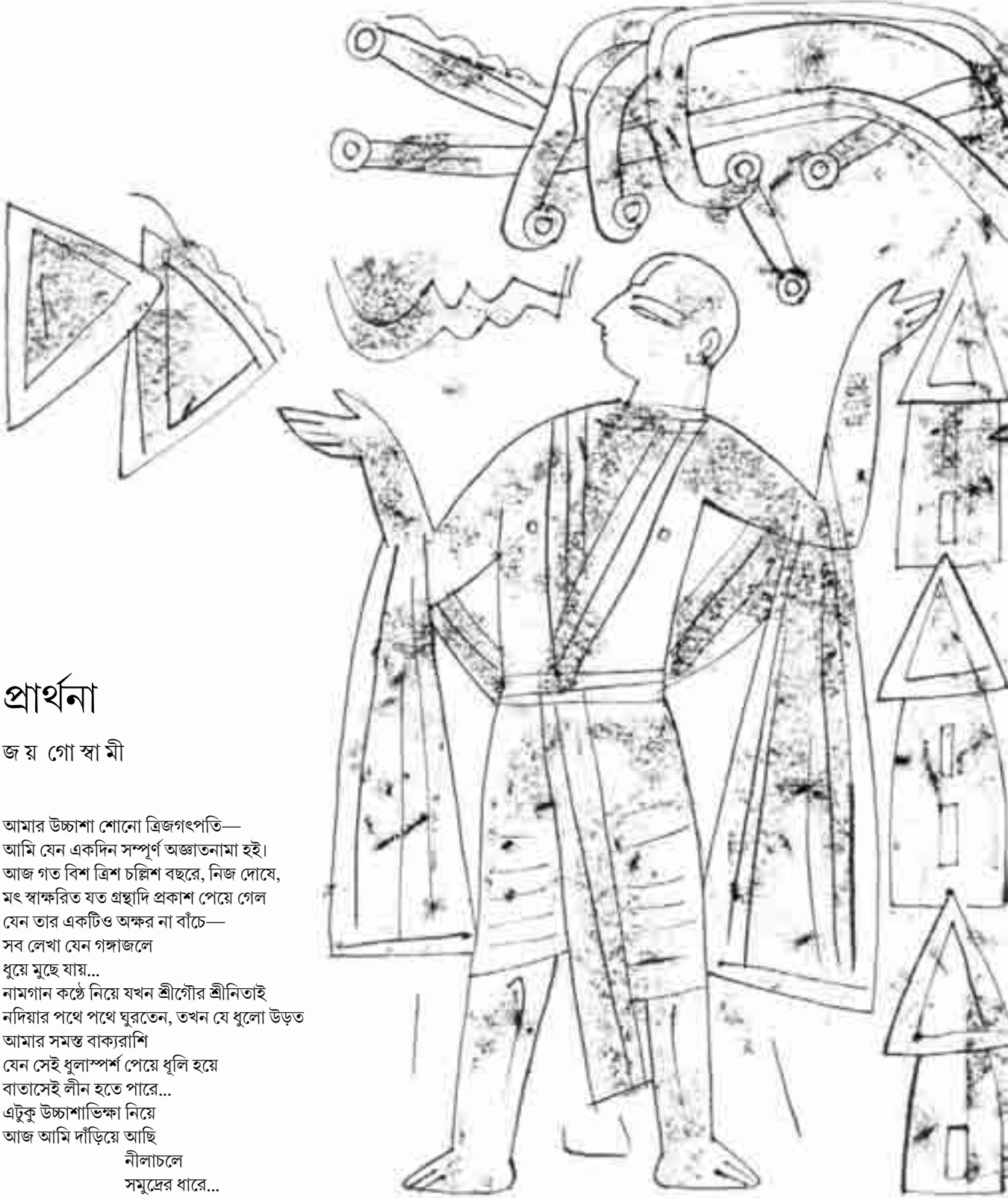
খ্রিস্টাব্দ পনেরোশো দশ।
নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলেন কাটোয়ায়।

খ্রিস্টাব্দ ষোলোশো দশ।
ইতালির পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে
অধ্যাপনারত
গ্যালিলেও জানালেন: সূর্য কেন্দ্রে আছে—
বাকি সব গ্রহ ওই সূর্যকে ঘিরেই পাক খায়...

হে চৈতন্যদেব, আমি জানি তো জীবৎকালে সে-দৃষ্টি পাব না!
এও জানি, আয়ু তো ফুরিয়ে এল প্রায়—
অন্তত মৃত্যুর পরে, যেন সেই জ্ঞানচক্ষু পাই
যে-চোখ দেখাবে
আমিও নক্ষত্রবস্ত্র, ঘুরে যাচ্ছি এ-মহামণ্ডলে—
আর কৃষ্ণ, বাঁশি হাতে, শূন্যে ভাসমান রয়েছেন
ঠিক কেন্দ্রস্থলে...

ঋণ: কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবনদাস, কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী,
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, রমাকান্ত চক্রবর্তী, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

অঙ্কন: সুব্রত চৌধুরী



প্রার্থনা

জয় গো স্বামী

আমার উচ্চাশা শোনো ত্রিজগৎপতি—
 আমি যেন একদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতনামা হই।
 আজ গত বিশ ত্রিশ চল্লিশ বছরে, নিজ দোষে,
 মৎ স্বাক্ষরিত যত গ্রন্থাদি প্রকাশ পেয়ে গেল
 যেন তার একটিও অক্ষর না বাঁচে—
 সব লেখা যেন গঙ্গাজলে
 ধুয়ে মুছে যায়...
 নামগান কণ্ঠে নিয়ে যখন শ্রীগৌর শ্রীনিতাই
 নদিয়ার পথে পথে ঘুরতেন, তখন যে ধুলো উড়ত
 আমার সমস্ত বাক্যরাশি
 যেন সেই ধূলাস্পর্শ পেয়ে ধূলি হয়ে
 বাতাসেই লীন হতে পারে...
 এটুকু উচ্চাশাভিক্ষা নিয়ে
 আজ আমি দাঁড়িয়ে আছি
 নীলাচলে
 সমুদ্রের ধারে...



সা

সু বো ধ স র কা র

চোখের জলের মতো নিখুঁত ও সুন্দর
একটা কবিতা লিখতে পারব যেদিন
সেদিন আমি তোমাকে চুম্বন করার রাজ-অধিকার পাব।
কবিতা লেখা বড় কঠিন, হে সুন্দরী
পঁয়তাল্লিশ বছর কবিতা লেখার পর আজ মনে হয়
আমি যে গন্ধটা পেয়েছিলাম
সেটা কার গন্ধ কোন হরিণের গন্ধ কোন বাড়ি থেকে এসেছিল জানা যাবে না।

মানুষের মতো দেখতে একটা পাথর
দু'হাজার বছর ধরে সান্টা মনিকা বিচে গান গাইছে, তার সুর থেকে
ছড়িয়ে পড়ছে বেহাগ, মল্লার, শিবরঞ্জনী
কাল রাতে আমি ভারত মহাসাগরের তীরে তোমাকে ধরে হাঁটছিলাম।
তোমাকে না ধরে আমি আর হাঁটতে পারি না
পাথরটা বলল, দাঁড়াও
দু'হাজার বছর ধরে আমি মানুষের চোখের জল অনুবাদ করে চলেছি
আশাবরি দিয়ে, কলাবতী দিয়ে
দরবারি কানাড়া দিয়ে
তবু আমি আজও আমার গলায় সেই 'সা' লাগাতে পারলাম না।

সেই রাতে একটা সমুদ্রবড় বয়ে গেল আমাদের ওপর দিয়ে
ভোরবেলা পাথরটা আমাদের গা থেকে বালি সরিয়ে বলল
তোমরা কতটা ভালবাস এ ওকে?
এত টা? এত টা? এত টা?
কিন্তু আমি জানি ভালবাসাতেও একটা 'সা' লাগাতে হয়।

মানুষ এত হাজার বছর ধরে ভালবাসল
তবু একটা 'সা' লাগাতে পারছে না?

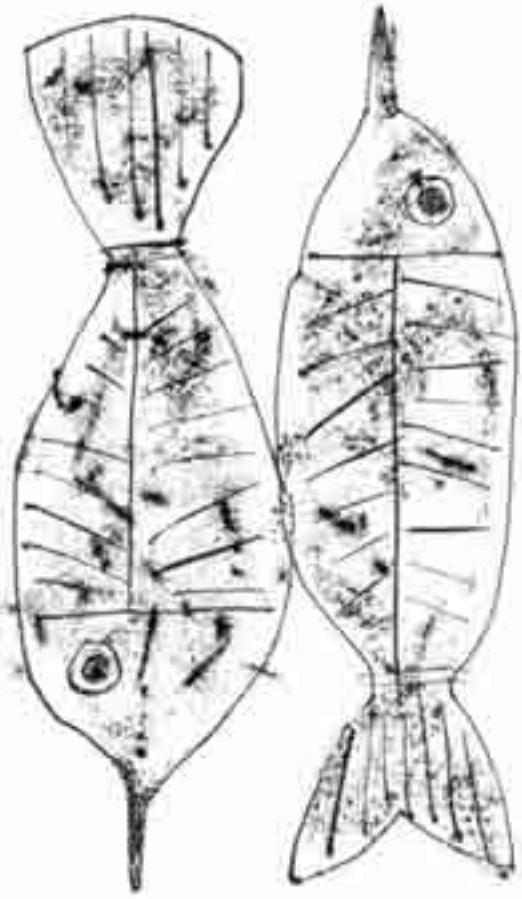
ভাগ্যদোষে কবি আমি

সুধীর দত্ত

মাত্রা মেপে ধুরন্ধর কবিগণ যেরকম চতুর্দশপদী লিখতেন,
লিখতেন পয়ার ও ছড়া, অনধিক বিশ পঙক্তি—
ঢেকুর ও টকজল সহ, হয়তো-বা বাড়তি কিছু,
উগরবার বড় সাধ হয় ;
হে অমল পৃষ্ঠা আপনি প্রগল্ভকে ক্ষমা করবেন।
ভাগ্যদোষে কবি আমি, নিতান্ত বাচাল,
ডঙ্কা ও লেহন তরে এ-যাবৎ নাড়া-বাঁধা হল না যদিপি,
মধুমান সূর্য দিল তিলক-সিন্দুর।
তবুও একটি খেদ, সাঁই
যখন স্তব্ধতা নামে, মধ্যে স্পন্দ, নাহি দিবা, অন্ধকারও,
কেন তার ধাতুপাঠ, শব্দও গমন শিখল না।
অপর আর এক খেদ: মা দিল না জিবে মধু, পিতা ধী, যখন কোনওদিকে
বান্ধব-নগর নেই, মিডিয়া-মথিত
দাপুটে মিডিয়োট্রিটি
অক্ষর শাসন করবে, লেখা আছে ভবিষ্য-পুরাণে !

তুমি কি বৃশ্চিক? বিষ
চারাও শরীর জুড়ে, অস্থিরতা, রোতঃ?
অক্ষশৌণ্ডের মতো জাদু জানো? ইশারায়
শব্দ নড়ে, গুরু চড়ে চণ্ডালের ঘাড়ে।
এবং শব্দরা চক্ষু পায়।
লোকে বলে অন্ধ টাইরেসিয়াস
পতঙ্গের ভাষা বোঝে, কবিতার ভূত-ভব্য, পতনের হাঁকডাক,
পিচ্ছিল সব ক'টি বাঁক।
এবং সতর্ক করে
যখন ভাঙেনি ঘুম পাখিদের
কবিতা গড়িয়ে যাচ্ছে
কবিতা গড়িয়ে যাচ্ছে

সীমান্তের শেষ ট্রেন, লুপ লাইন, হুইসল বাজিয়ে



ভুলব না

অনি তা অগ্নি হো ত্রী

তোমার নজর পড়লে বর্ষার ঘাস পুড়ে ছাই হয়ে যায়,
বিশুদ্ধ রোষ কীভাবে লাশ তুলে আনে কবর থেকে,
তাও জানা।
আমাদের গ্রামের এই বাজপড়া গাছগুলি
পোড়া বাড়ির কঙ্কাল আর
বিষাক্ত পুকুরে ভাসন্ত মাছেরা
তোমার হিমশীতল সুরক্ষা না পেয়ে
সাদা কালো ছবি হয়ে গেছে।
আমি মরতে চাই না হে শাসক, শহিদ হব না কোনওমতে।
যা বলিনি তা বলানোর ষড়যন্ত্রে
সলিটারি সেলের ধোঁয়ার ভিতর এক যুগ
আমার শরীর থেকে যদি খসে পড়ে মাংস আর হাড়
বেঁচে থাকব ভুলিনি আমি কিছু ভুলব না
এই কথা দুনিয়াকে বলার জন্য রয়ে যাব
ভয়ের একেবারে শেষ সীমায় যেখানে
ভয়শূন্যতার অলৌকিক ফ্লুরোসেন্ট বিভা
তার গর্ভে।



খুনির শ্যামল রক্ত

শ্যামল কান্তি দাশ

খুনির শ্যামল রক্ত সারা দেহে প্রবাহিত,
তবু খুন কাউকে করিনি।
অপবাদ ছড়িয়েছে এত বেশি,
নৃশংসতা পৌঁছে গেছে এত দূর,
অপমানে অসম্মানে দেহ মন কালি হয়ে গেছে।
বন্ধুরা বদলে গেছে, অনেকেই কম-বেশি শত্রু আজ,
শত্রুরা বন্ধু সেজে মাখামাখি করে।

আমি খুনি! আমি কি সত্যিই খুনি?
যতক্ষণ বাড়ি থাকি আনন্দের ধারা গাই মিশ্র মালকোশে।
রাস্তায় প্রাণের ভয়, ঠ্যাং ভেঙে কেউ হয়তো নদীতে ভাসিয়ে দেবে,
গর্দানে চাপাতি চালিয়ে দেবে কেউ কেউ,
ঘুরে দাঁড়াবার জন্য একফোঁটা সময় দেবে না,
বিস্ফোরণে ঝাঁঝরা করে দেবে।
বঁকে হাঁটি, কান খাড়া করে হাঁটি,
চোখ কুঁচকে বৃত্তাকারে হাঁটি।
যত বেশি নির্জনতা, রাস্তা তত সুদূরপ্রসারী, ষড়যন্ত্রে ভরা।

আমার কঠিন মুখ জাস্তব, ভয়াল
ভীত ব্রহ্ম পাড়াপ্রতিবেশী,
আমার যে-কোনও হাসি ঘুটঘুটে, নিকষ,
চোখ যেন আকাশের নীলে আঁকা, বাঁকাবক্র হাতের গঠন।

আমি কি সত্যিই খুনি?
খুনি ছাড়া আর কোনও বিশেষণ আমাকে মানায়!

শবযাত্রা

গৌতম ঘোষ দস্তিদার

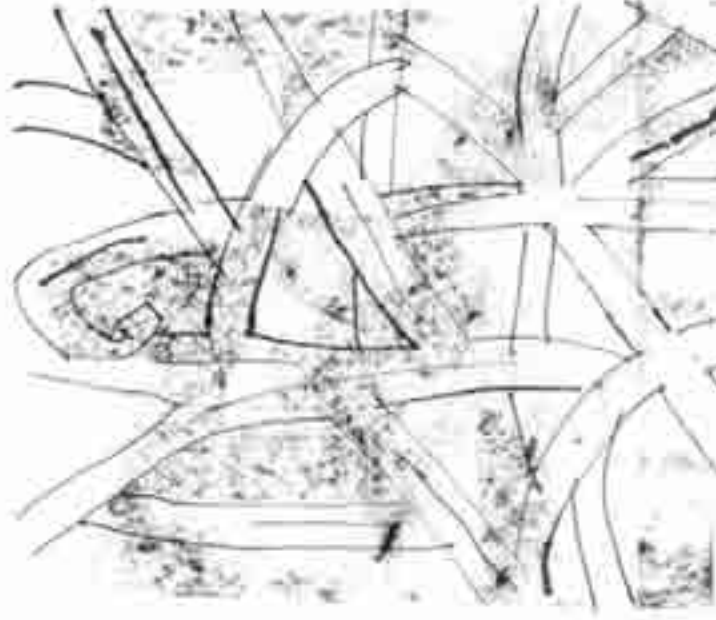
পত্রিকা-দফতরে আসতেন সুজাতা— গহন, আকুল, সহজ, নিমগ্ন।
আসতেন গৌরবের কাছে, দু'জনে নানা-কথা হত লেখালিখি নিয়ে।
চারপাশের অনেকেই তখন তাঁর নাম শুনেছেন—বিশিষ্ট মনোবিদ,
আমাকে একবার সুবিধামতো দেখে দেবেন, গৌরবকে বলেছেন।
আমার মোটেই তেমন আগ্রহ ছিল না, তাই যাইনিও তাঁর কাছে।
আমি জানি, এই আমার প্রবণতা— কাতর, জটিল, আচ্ছন্ন, নিথর।
ভাবিনি, সুজাতার মহিমায় আমিও শেষে নিথর-বিধুর হয়ে যাব।
অথচ, আমি অবশেষে জড়িয়ে গেলাম গৌরবের জটিলতর ফাঁদে,
গৌরব আমাদের গতজন্মের বন্ধু, তাঁকে চিনেছি দশদিক থেকে।
পলকে বন্ধুদের স্তব্ধ ও স্রিয়মাণ করার প্রতিভা তাঁর নিবিড়-আয়ত্ত,
আমরা সচরাচর তাঁর মতামতের প্রত্যুত্তর করিনি, নীরবই থেকেছি।
সকলে চিরদিন প্রকাশ্যে বিষয়টিকে কথার-কথা বলে গণ্য করেছি,
আমিও জানি, সুজাতা এখনও গৌরবের জন্মদিনে পায়ের বানান,
গৌরব বলতেন, সেই মেয়েটি, রোগা ও ফর্সা, আসেন প্রায়শই,
আজ তাঁর ছায়া গৌরবের লেখায়, উদ্ভিগ্ন, ব্যাকুল, অস্থির, বিপন্ন।
তাহলে নারী কি চিরকাল আমাকে পদ দিয়ে যাবে, প্রেরণাবিহীন,
ঘণ্টি বাজলেই দরজা খুলে দেবে, ঠিক আগের মতোই স্বাভাবিক,
এমনই আশা করব আজও, প্রকাশ্যে জানাব, আমি কী নির্বিকার,
প্রেক্ষিতে বাজিয়ে দেব করুণ মুহূর্ত, চোখ জ্বালা করবে পাঠকের,
তারপর আমি কি মৃত্যুমহিমা ভুলে যোগ দেব নিজেই শবযাত্রায়!



কচি কবিটিকে বলছি

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

যখন সাতহাত মাটি খুঁড়লে, পয়সা তো দূর কথা, একফোঁটা জল ওঠে না,
চোয়াল শক্ত হচ্ছে মানুষের, কেননা
বেডরুমেও গোলাবারুদ পৌঁছে গেছে,
যখন হাসিফোটা সকালের গায়ে, আজকের
খবরকাগজ কান্না বুলিয়ে দেবে,
তখন চোখ খুলে,
আমি দেখি গাছভর্তি কিশলয়!
নতুন ফুলের গন্ধ!
রাস্তা চকচক করছে, জরি পরেছে।
মুকুটে মনখারাপ, শরীরে ভাসিয়ে সংশয়,
কারা খুব নাচছে আর গান গাইছে,
পথ দিয়ে আসতে আসতে আমাকে ডাকল
তারপর!
কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি, এতটা কি পারি...
কিন্তু মন বলে, এভাবেই আলো আসে
অনেকদিনের পর পর।



ষোলো লেন হাইওয়ের কবিতা

যশোধরা রায় চৌধুরী

কে যেন বলেছে ঘুমঘোরে
কবিতা তো হাইওয়েপ্রবণ।
কবিতাই এগজিট। বাতাস।
বাঁদিকে ডানদিকে পলায়ন।

আগুপিছু উচ্চাচ গ্রাফে
গন্ধ ভাসে খেতপোড়া ধোঁয়ার।
ঘূর্ণিমতো, চিল কাক শকুন
ওই দ্যাখো জঞ্জালপাহাড়।

বাঁয়ে ডাইনে টয়োটা ইনোভা।
পটপরগঞ্জের থেকে দূরে,
ব্যাঙ্কোয়েট মহল, এসি হল।
জিম ও পার্লার খিচরিপুরে।

মধ্যখানে ষোলো লেন দ্রুত
মধ্যখানে তীর উদ্বর্তন
অবাঞ্ছিত সম্পর্কের সুতো
ছিঁড়েখুঁড়ে বুলেটরমণ।

“সুখদা ভিলেজ”। ইন্ডিয়েরা
টলে ওঠে। তবে কবিতাই
ধিকিধিকি সস্ত্রাসের বিষ
ছাড়ে সরু, সবুজ ধারায়?





ভোঁতা

বি না য় ক ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

অনেকদিন ধার করেননি কারও থেকে।
কখনও ফেরত দেবে না জেনেও, অনেকদিন ধার দেননি কাউকে...
অনেকদিন, মাঠের ধার থেকে ভাসিয়ে দেননি বল,
যাতে হেড করে যে কেউ আক্রমণকে উল্লাসে বদলে দিতে পারে।

অনেকদিন জানলার ধারের সিটে বসে ভিক্টোরিয়া দেখেননি
পাহাড়ের ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে
একটা খাদের সামনে দাঁড়িয়ে যাননি
সমুদ্রের ধার থেকে বিনুক কুড়িয়ে তার ভিতরের মুক্তো খোঁজেননি অনেকদিন।

অনেকদিন লেখার সময়ে পৃষ্ঠায় ধারের জায়গাটা ছেড়ে রাখেননি।
উন্মূর্ষের ধারে ঘুমিয়ে পড়েননি পথ-কুকুরের মতো
যেখানে বিরুদ্ধে কথা বললে ছিঁড়ে নেয় জিভ
আর চুপ করে থাকলেও নগ্ন করে ঘোরায় সারা গ্রাম
যেখানে ধর্ষণের পর ধর্ষিতাকেই মুছে ফেলতে হয়
যাবতীয় চিহ্ন

আর জ্বালিয়ে দিতে হয় একটা ধূপ
সেখানে অনেকদিন আপনি ধারালো কোনও বক্তব্য রাখেননি।
কেন?

পেটের ভিতর ধারালো একটা কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে
ক্রমাগত ঠেলা মারতে মারতে ওরা জিজ্ঞেস করছিল, করেই যাচ্ছিল...
আমি উত্তর দিতে পারিনি।

খেজুর

শ্বে তা চ ক্র ব তী

রূপসাগরের তীরে একখানা মানুষের মতো গাছে
তুমি ও তোমার খোকারা খুকুরা
আহ্লাদে ফলে আছে,
প্রথমে তাদের রঙের নামটি গেরুয়া,
তারপর ঘন কমলার পরে খয়েরি,
আশ্বেষে শেষে মেরুনবর্ণ তবুও!

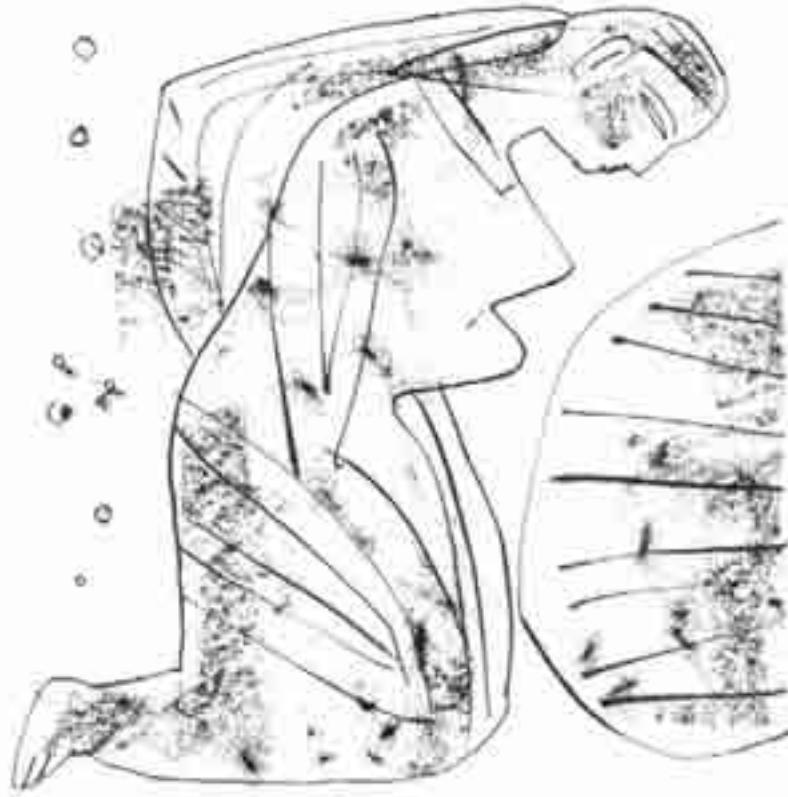
রঙের নিশান শেষ হবার পরও
আরও উদ্যত পাতার দেমাকে তুমি আর
আমি অস্থিরবাক পথিকা।

টুপটাপ করে, মুখ উঁচু রেখে
ফেলছি তোমাকে, খোকা ও খুকুকে তোমার,
দু'গালের ফাঁকে মুখবিবরের আলসে
গলে গলে যায় মিষ্টিস্বাদের খেজুরি।

রানি বলব না নোনা জল বলব?
নাকি সাগরের তীরের মৎস্যকন্যা?
ফেলে গেছে তার মালার গুটি ও গণনা!

রুদ্রাক্ষের স্বেদ শেষ হলে এভাবেই
পড়েছিল শুধু নারী-লহরির শ্যামলবর্ণা খেজুরা।





হৃদয় হরণ

সে বস্তী ঘোষ

১
হৃদয় নিয়ে এত যে গোলযোগ
সে কি আর তুমি জানতে না?
দশপ্রহরণধারিণী দাঁড়ালে এমন
যেন অসুর নিধন ছাড়া ঘন রোমাঞ্চে
কাতর হওনি একবারটিও!

২
ওকে বলতে দাও
বলবে, চাই না কিছুই
স্বীকার করবে ভুল?
সে তো হ্যাপা আরওই
হাত-পা ছুঁবে
ছোট খোকার মতো বলবে, যাও
আর ভালবাসি না তোমায়—
চলে গেলে আরও ক্রোধ!
যেন সকালের কথাগুলো তোমাকে নয়,
বলেছিল কাক ও চড়াইকে!

৩
সব দিয়েথুয়ে ছাদে যায়
উড্ডীন ঘুড়ির পাশে দিগন্তের পাখি
যেন চাঁদোয়ার মতো উপুড় নীলিমা,
শাড়ি তুলতে গিয়ে অন্য ছাদে তবু
অতি যুবকের দিকে চোখ চলে যায়

শরণার্থী

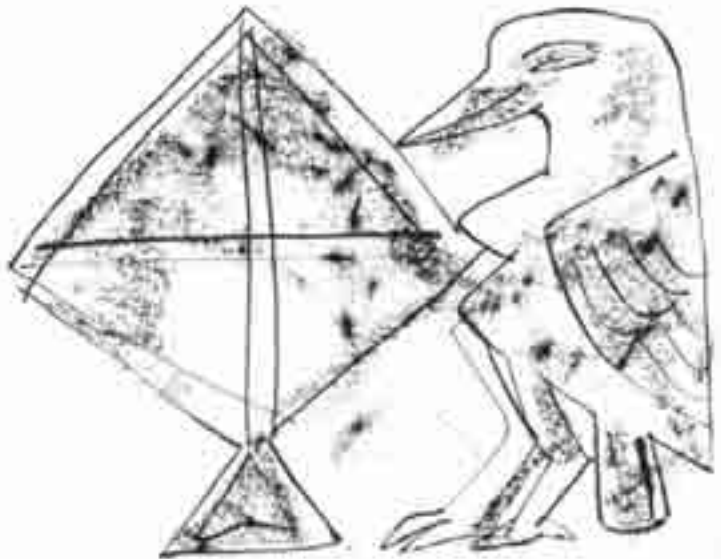
সুমন গুণ

তোমরা কবিতা পড়ো ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে,
একদিকে কবিতা, অন্যদিকে
চেনাজানা ঘটনাকে রেখে
হিসেব করে দ্যাখো ঠিক মিলে গেল কি না। তারপর
শলা করো; ঘটনার আসক্তি, শ্লেষ্মার
পরত চড়িয়ে দাও, খুটে খুটে বের করে আনো
প্রতিটি বাঁকের ক্ষুধা, অন্ত্যমিল, সমাজমাধ্যম।

অথচ যে-কবিতাটি পড়া হল, তার
ভেতরে দুর্ভাগ্য গতি, অনাচার, শবানুগমন।
মহলে মহলে সন্ধ্যা, পাঠান্তর, গোধূলিকালীন
পরিবেশ দুরগামী পরমার্থ পায়।

এই তথ্যে ক্ষত আছে। বিবর্তন আছে।
মধ্যপদলোপী কিছু উচ্চাশাও আছে।

তুমি যে সরল, শাস্ত, সমাপ্তিসুলভ সমাধানে
নিয়ে গেলে লেখাটিকে, আসলে সে তার
অনেক দূরের এক বিপদসঙ্কুল নগরের
আনন্দিত, আহত শ্রমণ।





রাধাজ্যোৎসাহত

বি কা শ না য ক

রাধাজ্যোৎসাহ, এসো ফের যমুনা দোলাও ওই জলে
কত যে বাঁশির পথে ভেসে চলে গেছে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণমন্দাস
ওকে ধরো, বুকে ওর গান লেগে আছে বেহুলার

প্রেমিকারা চিরকাল ভাসিয়ে গিয়েছে দীপাধার
কী পায় চোখের জল? সে শুধু ছড়িয়ে দিতে শিখেছে বিশ্বাস
এইবার, রাধাজ্যোৎসাহ, এসে পড়বে সেই অন্ধকার

যার গর্ভগৃহে গুম হয়ে বসে রয়েছে বিষাদ
তাকে কি কখনও তুমি দেবতা করেছ, বলো?
কখনও দিয়েছ তাকে দ্বিতীয়ার চাঁদ?

এবার বোলাও হাত গাঙুরের জলে
যমুনা দেখুক আজও কত কত মন লেখে ঢেউয়ের প্রবাদ

মায়াবিনী ঢেউ ওঠে যদি আজ আকাশের রাতে
মোহনীয়া চন্দ্রকোষ কী আবেশে ছুঁতে চায় কোমল নিষাদ

সরোদে সেতারে নয়, নয় হরিপ্রসাদীয়া বাঁশি
কী যেন আকুল ঢেউ জড়িয়ে গিয়েছে ওতপ্রোত

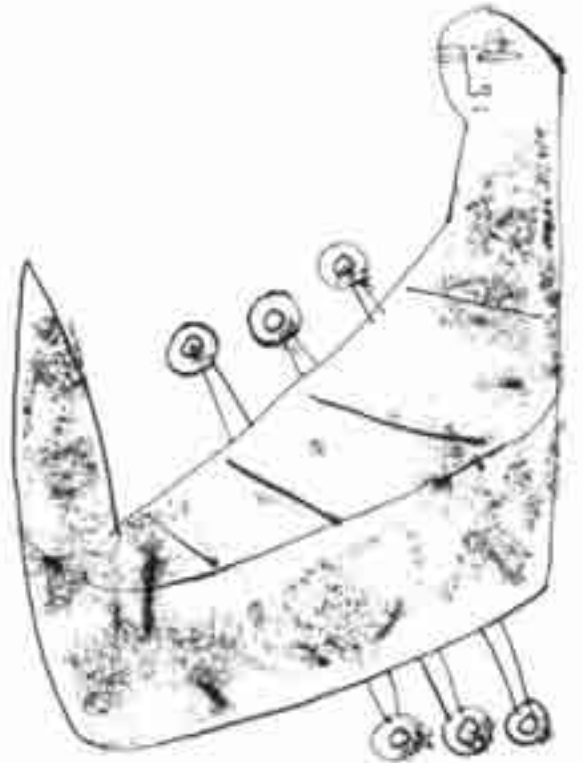
জীবনও মনের মতো ছড়িয়ে রয়েছে পাশাপাশি
খুঁজে যেতে যেতে সে যে মরিয়া-বিস্মৃত

ও আর কিছই নয়, ও যমুনা, তুমিও যে রাধাজ্যোৎসাহত

হে অবগাহন

নি র্মা ল্য মু খো পা ধ্যা য়

কবিতা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে বহুদিন হল।
মঞ্চ, উল্লাস আর সাফল্যের সিঁড়ি ভেঙে
একলা আঁধার গৃহে গুম হয়ে আছি।
যেন মানুষ নই, শুধু ছায়া, ছায়ার অশ্রু নেই,
পাথরের চোখ, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে আমার।
কোনওক্রমে হাঁটু গেড়ে বাইরে এলাম।
বাড়ির কাছেই নদী, বাবার পানসি নিয়ে
ভেসে পড়ি জলে— বেদনার পারাবার কত দূর?
আসে না উত্তর! রাত হয়, পারের গাছেরা জাগে,
তাদের লতায়-পাতায় বসে অতীত-পুরুষ,
আমি কি ওদিকেই যাব, আমারও নাভিটি গলে
গাছ হবে, শিকড় চারিয়ে যাবে জলে?
ভাবি, আর ভাবতে-ভাবতে ডাকে অন্ধকার,
মেঘ ডাকে, বেদের সূক্তের মতো মেঘ
তবু কি হবে! দুই হাতে ভয় চেপে ধরি,
ওগো পানসি, এই অলৌকিক মধ্যরাত
কী শীতল! কোথাও শব্দ নেই, দুঃখ নেই
জীবনের পারে অবিরল যেন এক শূন্য দেবতা,
আজ ধীর, নেমে গেল মহাকায় জলের ভিতর...



নীল খাম

দ্বি জেন আ চা র্য

‘আমি ভালবেসে এই বুঝেছি সুখের সার সে চোখের জলে রে।
তুমি হাস আমি কাঁদি বাঁশী বাজুক কদমতলে রে॥’

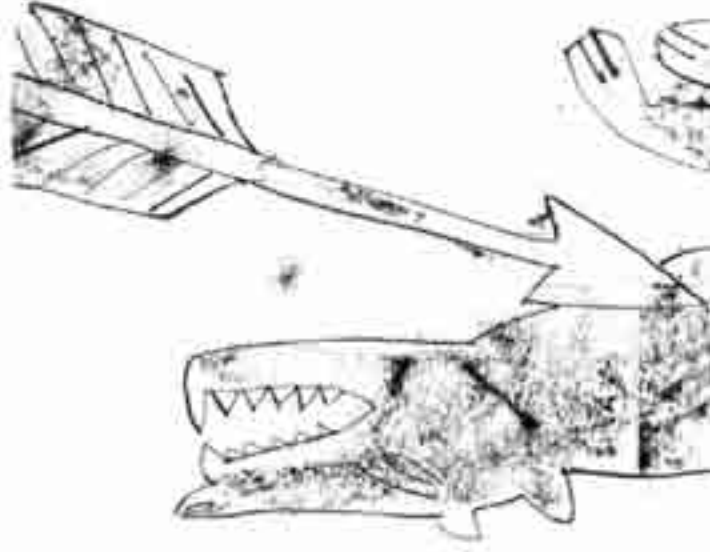
তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মাধবীলতার চিঠি। দৃষ্টিহীন। পড়তে পারি না। অনুভবে টের পাই
প্রতিটি শব্দের মর্মবেদনা। বিষাদ বিহ্বল হয়ে খুঁজি ঘাত-প্রতিঘাত।
বাপের মতো অভিমান ব্যথাতুর করেছে হৃদয়। হৃদয় গহিনে নিঃস্ব পাখি।
আমারই মতন বড় একা। গান ভুলে গেছে। ছিন্ন ডানা। বিধবস্ত হৃদয়।
অবারিত অশ্রু তার চোখে...

কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। প্রিয়পরিজন। মধ্যরাতে জেগে দেখি চাঁদের
তির্যক আলো, সুতীক্ষ্ণ বল্লমের মতো বিধে আছে বুকের গভীরে। ক্রমশ
এগিয়ে আসছে ঘরের দেওয়াল, প্লাবনের জল বেড়েই চলেছে...
কুয়াশাপীড়িত রাত। রাতের আখ্যান লিখে গেছে নিষ্ঠুর নিয়তি।
পাখি জানে সেইসব প্রাচীন কাহিনি। অবারিত অশ্রু তার চোখে...

প্রিয়জন চলে গেছে। কারও দোষ নেই। দোষ দেব কাকে? যে আপন—
আপন হল না, তার জন্য কেন প্রণিপাত? শুধু মাধবীলতা—
অন্তর্ঘাতে হারিয়েছি তাকে। তার কথা খুঁউব মনে পড়ে।
অন্তরালে বেজে ওঠে অলীক নুপুর। নিশিডাকে অবিরল...
বিশেষ সক্ষম বলে, তার কাছে পৌঁছাতে পারি না।

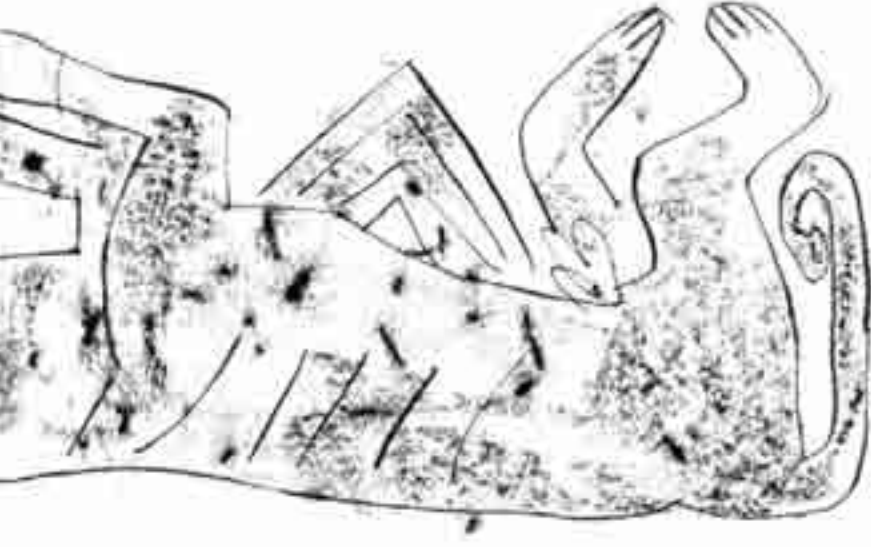
অন্ধকারে অবলুপ্ত। ক্রমশ এগিয়ে আসছে ঘরের দেওয়াল।
প্লাবনের জল বেড়েই চলেছে। অন্তিম প্রহর। বুকের নিভুতে রাখি
মাধবীলতার চিঠি। অশ্রুজলে সিক্ত— দীর্ঘ পদাবলি। অনুভবে
টের পাই, প্রতিটি শব্দের মর্মবেদনা...



একলব্য ও বালিকা

নি বে দি তা আ চা র্য

উড়ন্ত তির এসে বন্ধ করে কুকুরটির ডাক।
শুকনো পাতার ওপর জলধারার আওয়াজ।
শীর্ণস্রোতে বিকেলের স্নান সেরে ফিরে যাচ্ছেন হস্তিকুলপতি।
দূরে রান্ধসপাড়ায় ভীষণ নৃত্যগীত।
একদল কিশোর অস্ত্রশিক্ষার্থী গাছের ফাঁকে
খুঁজে চলেছে তিরের উৎস।
অগ্রে আচার্যদেব, পাশে বাকরুদ্ধ কুকুর।
বনে বনে আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাত,
বনে বনে ক্লাস্তিহীন হাওয়ার বাঁশরি।
জঙ্গলের গভীরে নীলকান্ত বালক, মাটির মূর্তিতে নতজানু।
বালক গাছের পাতার ওপর মানুষের পায়ের শব্দ শোনে,
দক্ষিণহস্তের বুড়ো আঙুল তুলে, সে মৃদুস্বরে বলে,
দ্যাখো, অনেক উঁচুতে এক খল স্বভাব পাখি উড়ছে,
প্রিয় অঙ্গ, এই দেহ থেকে তোমার বিচ্ছেদ সঙ্কেত।
এক্ষণে, সকল যন্ত্রণা আমাকে দাও,
জেনো, এই কুশাসন, বাঁশের তির, তালপাতার তুণীর আর ওই
পীতবর্ণ মশাল মনে রাখবে আমাদের সাধন। প্রিয় অঙ্গ
একদিন যুগান্তের পারে, ভূসোমাখা হারিকেনের আলোয়
তোমার রক্তমাখা ছবির দিকে স্থির তাকিয়ে থাকবে,
কপালে, ভেজা ঠান্ডা রুমাল রাখা, এক জ্বরতপ্ত মেয়ে।



মনে রেখো

তীর্থঙ্কর দাশপুর কায়স্থ

এক অন্ধকার থেকে অন্য অন্ধকারে যাওয়ার সময়
দেখা হয়েছিল মনে পড়ে,
অন্ধকার ছাড়া কোনও কথা বলতে পারিনি,
অন্ধকার ছাড়া কোনও লিপি জানা নেই, যাকে
আঙুলের চোখ দিয়ে পড়ে নেওয়া যায়,
আর কোনও পরিভাষা আমাদের দু'চোখে ছিল না।

অন্ধকার থেকে, মনে পড়ে, কীভাবে দু'জন
ব্রহ্মপশুর মতো স্পষ্ট দিবালোকে সঁধিয়ে গিয়েছি,
মন্ত্রগুপ্তির মতো বহন করেছি পরিচয়,
যা আদতে উৎকোচের বিনিময়ে কেনা।

অন্ধকার থেকে অন্ধকারে যাওয়ার সময়
আলো এসে পথ রোধ করে;
মনে রেখো আমাদের ক্রমাগত বলে যেতে হবে
আমরা কেউ পরস্পরকে আদৌ চিনি না।

সেই অতুলনীয় সময়ে

গোলাম রসুল

সবাই যখন শিখতে শুরু করে
আমি তখন থেকে ভুলতে শিখছি
সেই অতুলনীয় সময়ে আমি শহরে এসেছি
বহুতলের ওপর থেকে সাপ ফণা তুলে হিসহিস করছে
রাস্তায় পথচারীরা চলেছে কবরখানার দিকে
গোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে ফুল বিক্রেতারা ভিজছে
আর আমি দেখছিলাম অক্ষরেখায় একটি অনির্দিষ্ট যুগ
চাঁদ সূর্যের শঙ্কর আলোয় বঁকে যাচ্ছিল আকাশের খুঁটি
এ এক আবেগঘন আলো
আর মনে পড়ল ছোটবেলায় আমার মায়ের কবর থেকে যে আলো বেরিয়ে এসে আমার মুখকে ফুটিয়ে তুলেছিল



সকলে পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে হাঁটছে
যেন কোনও ভাবে শরীরটাকে ছুড়ে দিচ্ছে ক্রন্দনরত জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বিশাল জাহাজে
আর জাহাজটা ছেড়ে দিচ্ছে নিরুদ্দেশের লক্ষ্যে

এই বিমূর্ত শহরের সকলের নৌপথে যাত্রা করার তাগিদ
সমুদ্রের মতো অবিশ্বাসী এই শহর
বিসর্পিল জলের মুখ অনেক দূরে নিয়ে যায়
তৈরি করে এক বিস্ময়কর পরিস্থিতি
কেউ কেউ আমার মতো জলের নীল রেখার ওপর দিয়ে
ভেসে যাচ্ছিল
আর যারা প্রতিদিনের মতো এদিকে আসছিল তারা একদল অধিক রাত্রির কবর খোঁড়ার লোক

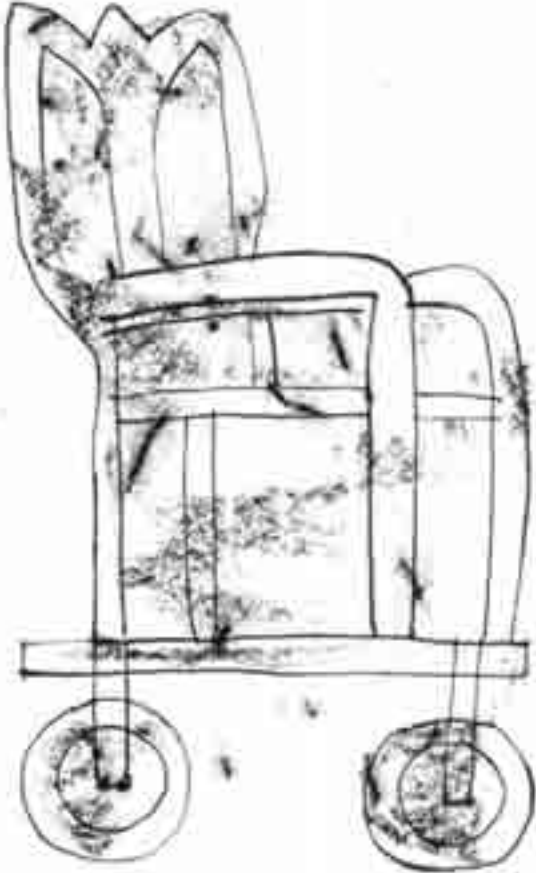
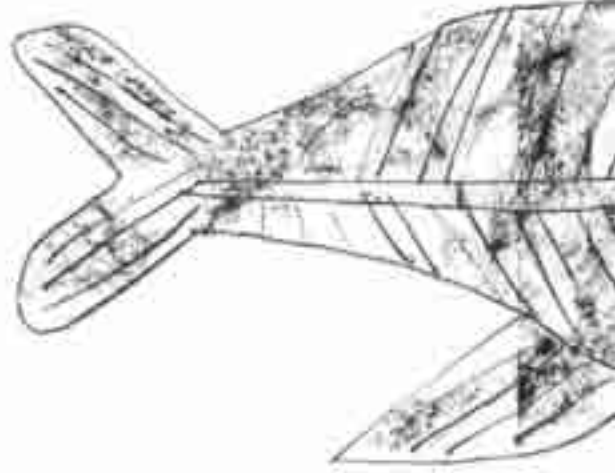
এটা সঠিক একটি মুহূর্ত
চূড়ান্ত অস্থির পালের দড়িতে বাঁধা গভীর অতলস্পর্শী
আর সব কিছু নিয়ে আমি ডুবে যাচ্ছি একা

মুক্ততার দৃশ্যকাব্য

চিরপ্রশান্তবাগচী

হে ঈশ্বর—এ কথা বলতে চাইনি, তবু আমি হে ঈশ্বর বলেই এক-ফোঁটা অশ্রু চাই।

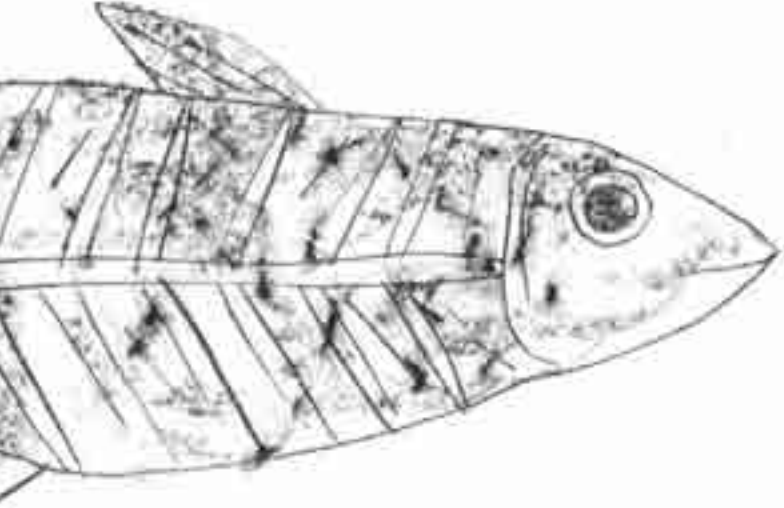
পৃথিবীতে মানুষ মৃত্যু কামনা করে; অশ্রুর অধিক।
তবু যেন, এ এক মহার্ঘ অপার্থিব প্রার্থনা;
যেখানে ইম্পাতেরও অধিক এক দুঃখের পাহাড় ভেঙে চূর্ণ হতে পারে।
এ যেন সেই মহাবৈশ্বিক দীর্ঘ একটা রেস্ট ইন পিস।
খাদ্যপানীয় রমণসুখ অর্থ আবাস কিছু না;
শুধু সমস্ত সত্তাকে পেষণ করে যা বেরিয়ে আসতে পারে;
রক্তরস না; যা এমন এক চাবিকাঠি—
শূন্যের নানা প্রাপ্ত থেকে নিয়ে আসতে পারে বৃষ্টিভেজা গাছেদের নিঃশ্বাস, কণ্ঠস্বর।
অথবা বিস্ফোরণের পর জঙ্গলের নিম্প্রভ একটি চিহ্ন...।
এইসব নিঃশব্দ উচ্চারণের ভিতর আমি সেই বঙ্গজ এলিয়টকে খুঁজি;
গোর্কির স্মৃতিকথার মগ্ন পাঠক।
যিনি টলস্টয় ও গোর্কির মহত্ব প্রসঙ্গ তুলে নাটকীয় এক দৃশ্য উত্থাপন করেন।
যেখানে টলস্টয় ক্রাইমিয়ার সমুদ্রতীরে এক গিরিগটিকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করছেন—
সে কি জীবনে সুখী? তিনি নন।



মানচিত্র

সোমব্রতসরকার

অস্থিরতা দূর-কাজলে চোখের তারায় আটকে গেছে
গরম হচ্ছে দুর্বলতা। তপ্ত হাওয়ার দরজা খোলা ভাবতে পারো।
পালিশ তোলা কাঁঠাল কাঠের লেখার টেবিল, হাতল দেওয়া
বসার চেয়ার সবই এখন রথের গতি—এগিয়ে চলে
রশির টানে। হাত পড়েছে জগন্নাথে, তোমার আমার
উষ দেয়াল, অগ্নিবৃত্ত। এখন সবই ঘুরতে থাকে
হাওয়ায় হাওয়ায়। তুমি তোমার জেদকে খালি ভাল রেখো
আমার অহং মায়ের বাড়ি বাগবাজারে গিয়ে খানিক
একটু যেন শীতল হল! পড়বে নাকি কথামৃত, খণ্ড খণ্ড
শ্রীম-র লেখা? তাঁর অহং-এ দক্ষিণেশ্বর—বামন ঠাকুর
মুখে মুখে কত কিছু শিখিয়ে গেল। জ্ঞানের আলোয় বোধের পাখি
আকাশমাটি। বাংলা ভাষায় মনস্তত্ত্ব এর চে ভাল কোথায় পাবে?
দেয়াল ভাঙে, প্রেমকাহিনি—শংসাপত্র, প্রতিশ্রুতি। ঘুরবে চলো
বাউলভূমি। কৃষ্ণচূড়া ফুটে আছে গাছে গাছে। গীতগোবিন্দের
পাতাগুলো বর্ষাকালে কেমন ভিজে? চোখের কাজল ধুয়ে গেছে
আত্মঘাতী প্রবেশপথে। আজগবাহক হলেই যদি, গহন রঙের
আবছা দিশা শেকড়সুন্দ তুলে ফ্যালো। চলো আবার আমরা দু'জন
নতুন করে বেরিয়ে পড়ি, মাধুকরী পথে পথে। জেদ আর অহং
ডুবে গেছে অজয় নদের মানচিত্রে। এবার কেমন বর্ষা হবে?
অত ভেবে করবে কী! আসল কথা—এমন মানব জনম আর কি হবে?



প্রবাসে দৈবের বশে

গৌ ত ম কু মা র ভা দু ড়ি

মালিকের নির্দেশে বেসিনের ওপর যে ছেলোট
সেঁটে দিচ্ছে দু'দিনের ছুটির ঘোষণা, সে কি জানে—
নবিশের আঁকা ওই দেবীমুখ, কাশফুল, ওই বর্ণমালা
কোন বার্তা পৌছে দেয় প্রবাসী হৃদয়ে?

মহামায়া বাঙালি হোটেল
কে যে কবে তৈরি করে দিয়েছিল সাইনবোর্ডখানা!
সেই থেকে দু'বেলা ভাতের খোঁজে ভিড় জমে
ভ্রমণে বা অসুখের নিরাময়ে আসা যত লোকেদের।
পরপর দু'দিনের ছুটি সে হোটেল, কর্তা তাই সবিনয়ে বলে
দুটো দিন কষ্ট করে চালাবার কথা। প্রবাসী রাঁধুনি আমি
আমার কষ্ট কি শুধু অভ্যাসের থেকে সরে থাকা?
কাঁচা হাতে আঁকা ওই দেবীমুখ, তুলির আঁচড়ে ফোটা ওই কাশবন
যতই সামান্য হোক শিল্পীকুশলতা, তুচ্ছ নোটসখানি—
হোটেল দু'দিন বন্ধ— এরও অতিরিক্ত কত কথা রেখেছে লুকিয়ে
সে কেবল জানে এই মন। তাই, নীল পর্দাখানা
সামান্য সরেছে যেই উত্তরের কোণে, হাতছানি দেখি যেন কার!
আমারই চোখের জলে ধুয়ে রাতজাগা শিউলিরা ঝরে পড়ে মাটির উঠোনে।

‘হোটেল সাফাই হবে দুইদিন।
দশমীর তিথি গত হলে ফের শুরু বাঙালি খাবার’
হোটেল-মালিক কিংবা কর্মচারী সকলের কাছে
এটুকুই নোটসের সার। শুধু প্রবাসী রাঁধুনি আমি, আমি জানি—
বেসিনের গায়ে সাঁটা ওই মুখখানি, নীল আকাশ, ওই কাশফুল
ওরই মধ্যে ধরা আছে শারদীয় সমস্ত আমার।

গহিন মাছের দেশে

ম গি দী পা বি শ্বা স কী র্ত নি য়া

১
ঘুণাঙ্করেও বলিনি নৈশভোজের পর
গানবাজনা ভরা নীল লণ্ঠন ডুবে যাবে অতর্কিতে
তাবৎ কবি ও মাতাল দেখবে পানপাত্র অন্ধকার
কালো কাচের কফিনে রাখা মাছের কঙ্কাল

২
লম্বা সরু দাঁতে ফুটো করি জলের ঘোর
অসহ্য লাগে এই মাতলামো নীলাভ কাচের বন
গহিন মাছের দেশে উড়ন্ত বিলাপ
বুক চাপড়ে সেয়ানা মাতাল সব উড়ছে কেমন

৩
নুন তো গলে যায় ব্যঞ্জন ঘাম ও অশ্রুতে
মৃত স্তন বয়ে বেড়ায় প্রতিটি পুরুষ যেমন
ডানা বয়ে নিচ্ছে কাঁধের উঁচু হাড়ে
ঘুম হাতড়ে খুঁজছে নিরুপায় মধু ও লবণ

৪
বাটিভর্তি সাদা দুধরুটি চেপে রাখি আকাশের ধারে
পাতলা চামড়ার ডানা মেলে ধরি ঘুমের গোপনে
সহ্য হয় না বলে যড় করি
উন্মাদ স্বপ্নে ঐক্যেবঁকে ভেসে উঠি সাপের চলনে

৫
সরু দাঁতে ফুটো করি রাত রক্ত ওঠে মুখে রাক্ষসী বেলায়
খাই আর কালচে আলোর নোনা রসে গাল ভরে যায়
অন্ধকার খুলে ঘোর ডাকিনী বিদ্যায় উঁকি দিই স্বপ্নে ওদের
ডাকি, আয়...





গরল

অ নি র্ বা ণ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

আমাকে যারা হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে তাদের সবাইকে আমি নিঃশর্ত মুক্তি দিলাম আজ। সতেজ কশেরুকায় তৈরি ধনুক ও তেজি অশ্ব-চর্ম ছিলায় ব্রহ্ম-শর যোজনা হয়েছিল যখন, আমি গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন সে সময়— দেখতে পাইনি বিষ নখ আর মস্তিষ্কে ফুটতে থাকা ঘৃণার গরল। প্রাণভ্রমরের ডানার ঝাপট, আর্ত চিৎকার আমি শুনতেও পাইনি। তবে ঘুম-স্বপ্নের মধ্যেই দেখেছি এক সৌম্য ঋষি অগ্নিবলয় বুকে নিয়ে হেঁটে চলেছেন বিক্ষ্য পর্বতের শির-প্রান্তে; বাতাপি সংহার শেষে, নিচ্ছেন এক বীভৎস উদ্গার। উনি তাকালেন সময়ের স্থির চোখের দিকে, বললেন হে মানুষ! দেহজ অশ্রু সংবরণ করো— ঈষৎ মৃদু হেসে এক আচমনে শুষে নিলেন সারা পৃথিবীর ব্যাধি, ক্রেদ...

তৎক্ষণাৎ, মুহূর্তরা আজন্ম তন্দ্রাচ্ছন্ন হল।

ঘুম ভাঙল, হঠাৎ কান্নার শব্দে দেখি অনন্য অবয়ব;
এখন কৃতজ্ঞলি তুমি, একেবারে নতজানু... দেহ থেকে একে একে খুলে
রেখেছ সকল তীক্ষ্ণ জিঘাংসার ছাল।
হয়তো ভুল ভেঙেছে তোমার এত দিনে— তবে আমাকে হত্যা করতে
পারোনি তুমি এবারেও!
বিহ্বল ঘূর্ণিতে অজান্তেই বারবার খুন করেছে সহস্র নিজেকে...

এবার ফিরে যেতে হবে... এ একান্তই শরীর মোক্ষণের ক্ষণ;
এই প্রথমবার তুমি অন্তর থেকে ভিত।
অসহায় ভাবে নিজের হাতেই উপড়ে ফেলছ সমস্ত বিষদাঁত একে
একে; ফেলে দিচ্ছ সকল অস্ত্র, বর্ম, ঢাল। অশ্রুসিক্ত হয়ে এবার হয়তো
লিখে নেবে নিজেরই হত্যা পরোয়ানা; পরম স্বেচ্ছায়... শেষবার।

তীর্ণ

অ পি তা কু গু

ভাঙা ধনুকের মতো বহন করেছে এই মেরুদণ্ড, আমি।
কত সাপ পেঁচিয়ে উঠেছে চারিধারে, কত গুল্ম
চাপা দিয়ে লুকিয়েছে শিস, ও বংশীধারী,
তুমি এসে তারই মাঝে বাঁশরি বাজালে...
আমার পোশাক চির ছিন্ন, আমার মালিন্য-কূপ গেল খুলে!
নগ্ন আমি, তীব্র আমি, তূর্য আমি
এই খুললাম আমার বাসনা, এই ফেললাম আমার রজস
এই বিতরণ করলাম আমার প্রতাপ... ইহজন্মের কোনও শোক
তোমাকে পাবে না, কেশাগ্র স্পর্শ করবে না কোনও মায়া
আগুনের কোনও শিখা, কখনও কোথাও পোড়াবে না তোমার আয়ু

শুধু গাছের সবুজে, দ্যাখো, নীল ছায়ে
অপসৃত হল ওই গুহার দরজা,
শোনো, বৃন্তগুলি খুলে রেখে এসেছি নিলাজ স্তন থেকে—
বাক-সিংহীর ঘন ঘাড়ের পেশিতে মারো টান

টান-টান, শব্দবাণে জঙ্গম হয়েছে, ধেয়ে
ত্রিলোক-সন্তোষ সূত্রে ছুটে আসছে মেরুদণ্ডখানি!





স্থলন

য শো ব স্ত ব সু

স্থলন শব্দটি তুমি এত সুন্দর করে উচ্চারণ করো অপরাধপ্রবণ হওয়া ছাড়া আমার আর কোনও উপায় থাকে না।

এসো অর্গলবিনাশী হাওয়া,
আশরীর বপন করি অরণ্যভ্রাণ...

ছাই হয়ে যাবার আগে অন্তত
এই সত্য জেনে যাব,
আমাদের আগুনও ছিল।

পর্যটক

মে ঘ ব সু

চায়ের পাতার দাগ লেগে আছে চোঁটে,
চিরচেনা চিকন হাসিতে!

আর, দেখি... নেশাতুর লেখা
মায়াবী সন্ধ্যায়, অচানক পাহাড়ি পথের বাঁকে, থেমে গিয়ে দেখে নেয়
গ্রীষ্মের নতুন পর্যটক।

হাসি দিয়ে পুরনো সেতুর
ক্রমে বেড়ে যাওয়া...

ফটল সারায়!

মৃত্তিকাজন্ম

ঋ ত্বিক ত্রি পা ঠী

সাধ্যসাধন সেরে কখনও-বা আমিও দেখি নিজেকে
খুঁজি সংজ্ঞা, পুনরুদ্ধার করি ইতিহাস, দেশবাড়ি
কোথাও উন্মত্ত স্বর্ণরেণু, কোথাও গোপন আকাশের বলিরেখা

রেখার সমার্থক পুস্তানি পেরিয়ে সূচিপত্র, পাতায় পাতা
বিস্মৃত তরঙ্গের হাওয়ায় ভেসে ওঠে হলুদ পোস্টকার্ড...

হলুদ মানে স্মৃতিস্কৃত সুর ও ভাষ্য। মৃত্তিকাজন্ম।
ঠিকানাহীন পিছুটান। জেগে আছে লিখিত প্রতিধ্বনি

ধ্বনি আত্মনিষ্ঠ, আকাশে কালো মেঘ, অক্ষর পরম্পরা
বৃষ্টি নামে সমতলে, পাহাড়ে, আলোছায়ার ডালপালায়,
পুরাতনী গানের ভেতর, বিজ্ঞাপনের অন্তরালে, এই মর্তে

মর্তের আমি দেখি সময়সারণি। বাচ্য, ব্যঞ্জনা পেরিয়ে
পথ গেছে ছায়াবধির অরণ্যে। সেখানে কেউ কাউকে বলছে—
সুন্দরের অন্য নাম অকস্মাৎ, নামহীন অন্তর্লৌক— স্বদেশ।



পর্যটন কথা

অগ্নি রায়

এক
রাত শেষ পাহাড়ের শুরু
মাঝে যদি কিছু খুঁজে পাওয়া যায়,
আমাদের ঘর ছিল এখন সেথায়
পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াও হে
গুলি খাওয়া বাঘের মতন
সেজে, শৌখিন বিরহ আমার

দুই
পাকদণ্ডী বরাবর হেডলাইট জ্বলে
নেমে যাচ্ছে গান গাওয়া জিপ,
কথা ও কেছা সব পিছনেই ফেলে
গভীর নিশুতি যেন আলোর দোসর
দু'পাশে শান্ত বনস্পতি, অবৈধ পাইন
ওরা জানে সব সাক্ষ্য অলক্ষ্যগোচর

তিন
পাহাড়ের না-দেখা বাঁকের আদল
বসেছেন দেবতা তাঁর নামাক্তিত পাথরে,
ঠোঁটের আধারে মৃদু জ্বলে থাকে আয়ু
আমাদের মনে পড়ে গন্ধের স্মৃতি
মায়াবী তামাক পোড়ে রেশমবাহন
তুমি জানো বিপদের এই রীতিনীতি

সমর্পণ উঠে যাওয়ার পর

অদিতি বসু রায়

এই পথ-ও পথ থেকে যে স্বর্গসিঁড়ি পেয়ে যাও
তার ধাপে ধাপে অন্ধকার ও পতনের গল্প—

আমিও উঠে যেতে ভালবাসি বলে
তুমি বাঁশি বাজানো বন্ধ করেছ অনেকদিন।
দীর্ঘকাল তোমার হেমবর্ণের গ্রীবা, আদরবিহীন
অস্পৃশ্য পরে আছে— উৎসবের কাঠামোয় তাই ধুলোর
আস্তানা। পাপ থেকে উঠে গেছে সমর্পণের গান—

এ পাড়ার আলো নিবে আছে— ফুলের ঘুমের মধ্যে
আমাদের অ-সুখ সেরে যাবে— জানিয়েছে বন্ধুরা।
আমি চিলেকোঠার পাশে আগুন জ্বালাতে বসেছি—

সিঁড়ি সব জানে, যে-কোনও মুহূর্তে জাহাজ ছাড়বে আজ।





গৌরবগাথা

দে বা শি স তে ও য়া রী

তিতুমীর নয়, তীরে ভেসে যায় ভেলা
বাঁশের কেলা পড়ে থাকে অগভীর
হাওয়ায় হাওয়ায় সমুদ্রপার খেলা
জমিয়ে দেখছে কেলায় তিতুমীর

তিতুমীর নয়, নামটা নিসার আলি
ছন্দে ছন্দে দোলা লাগে, জাগে ঢেউ
কালিমালিঙ্গ করেছে কোন কালী
মহীয়ান তিনি কাদেন, দেখেনি কেউ

কালীপ্রসন্ন কালীপ্রসাদের নামে
বেড়া বেঁধে দিল মা কালীর দু'টি হাত
ডাইনে পলল, ছিন্নমস্তা বামে
কোনওক্রমে কাটে রামপ্রসাদের রাত

কোনওক্রমে পাই বংশীবদন কেলা
কোনওক্রমে কাটে অধোবদনের শির
আমি তটিনীকে ভালবাসি, তার জেলা
তোমাকে বানায় অভাবিত তিতুমীর

বীক্ষণ

শু ধ্বে ন্দু চ ক্র ব তী

লেন্সের ওই পিঠে এককেন্দ্রক কোষ হয়ে জেগে আছে বসত।
ঘরের ভিতর তানবিকারের মতো চেনা ঘোরানো সিঁড়ি
কপাটসন্ধিতে নির্দেশক ব্যথায় ফিরে ফিরে আসে আকাশবাণীর চেনা সুর
বৃক্ষপিণ্ডে বয়ে চলে বৃষ্টির উপচে ওঠা জল।
এই জালিকাগঠনের ভিতর আটকে পড়ে আছে জলবাটিতে রাখা একজোড়া মায়ালু বাঁধানো দাঁত
অণুবীক্ষণের কাচের ভিতর দিয়ে সেইসব লক্ষ্মীর জোড়া পা আজ উপবিল্লিকল্প মনে হয়।
কখনও এলিয়ে পড়া মাধবীলতার ভারে নুয়ে পড়ে সাড়ে তেত্রিশ আরপিএমের বেলাফন্টে, আমির খান...
তার কোষপ্লাজমের ভিতর একসঙ্গে টেলিভিস্তায় বসে দেখা দেবী চৌধুরাণী, মায়াকানন।
জালিকার ভিতর আটকে আছে বন্ধ লেটার বাস্ক
না-পড়া চিঠির অক্ষরগুলি চেয়ে আছে ক্ষারধর্মী শ্বেতিকা কোষ হয়ে। যেন কোষপ্লাজমের মোটাসোটা দুই
সহোদরের ছটোপুটিতে বসন্তের রঞ্জক লেগেছে।

এই জালিকা বারবার সংক্রামক মনে হয়
এই মানচিত্রের ভিতরে চেতনার বেলজিয়ান কাচ...
তার আনাচেকানাচে মাংসাভক্ষীতির মতোই লেগে থাকা কলোনিপাড়ার পেটকাটি চাঁদিয়াল
ফেলে আসা বাবার ভিটেবাড়ি

বহুতল আড়াই ছটাকে
জীবগুবল্ল খোপঘর।



মানববাগান

তৈমুর খান

অন্ধকারে জ্যোৎস্না এসেছে
গলায় দুলাছে কলঙ্কের হার
ভেজা চুশনের অনেক কাহিনি
কাহিনিদের পরকীয় সংসার।

খোলস মোচন করে কেউ কেউ নবীন নবীনা
কামনা কামিনী হয়ে কেউ নাচে, কেউ বাজায় বীণা।
এত উচ্ছল রাত! রহস্য চাউর হয় দ্বীপে
কোন ঢেউয়ে কার তরী ভাসে, প্রেম যায় কাহার সমীপে!

দিনান্তে বিষাদ ধুয়ে সূর্য ফিরে গেলে
একে একে হারানো সকাল সবাই যায় ভুলে।
পরামর্শরা সব ইশারা গুঞ্জে
চেয়ে আছে বন্ধ দরজা আর জানালার পানে।
চলভাষে ভেসে উঠবে কাহিনির গান
গানে গানে ছয়লাপ মানববাগান।

রাত্রি শুধু ডেকে যায়: চিত্ত আয়! চিত্ত আয়!
চিত্ত কার নাম?
চিত্ত সবাই আমরা, নিভতে বড় করি যাকে
শাস্ত্রে বলে কাম।

দুয়ার খোলা থাকে— যদিও বন্ধ মনে হয়
যদিও নাচে না সাপ, তবু ওরা ডুগডুগি বাজায়।



হাঁটতে হাঁটতে

কা লো ব র ণ পা ড় ই

হাঁটতে হাঁটতে দু'কিমি রথতলা, না-আসার একবছর
চেনা অচেনা মিশ্রণ নবীনের উদ্যমের সাড়া
ফ্ল্যাটবাড়ি বুলবারান্দা ও জানলা মুখ বাড়ানো মুক্তি সম্বল
পরিবর্তনের পরিবর্তন আগ্রহে জাগ্রত পাড়া
উচাটন বাজার আগুন, প্রতিবাদ হওয়া দরকার
পিছনে পড়ে মসজিদ লাইব্রেরি
লোকনাথ শনি মন্দির, হাঁটার সম্মুখ বৈভব
রোববার আঁকার ক্লাস শিল্পীর দেখা পাওয়া চাপ
কুংফু ক্যারাটে কৃষ্ণমন্দির প্রাঙ্গণ, সমস্তর উচ্চরব শক্তির বোধন
খুঁজতে হয় না, বাঁপিয়ে পড়ছে বদল এবং বদল
হাজার টাকা মনে লাগে, বারোশো টাকা সয়ে যায়
জেগে আছে পুনর্নির্মাণ, জেগে আছে অতিবাদ
অস্থায়ী খতিয়ানে স্থায়ী শান্তভাব অতিদূর
ফুলপাতায়ুক্ত গাছের বাহির, শখের পালিত টিয়ার
লোহাবোনা খাঁচা
বিপরীত অভ্যাসই জাগরণ, বিপরীত অভ্যাসেই অভিচারের উদ্বোধন
রথতলায় দাঁড়িয়ে থাকে রথ, টানা হওয়ার উপলক্ষ
সাতদিনের ব্যবধানে মেলা উপহার বছরে একবার
শুদ্ধিপত্র দেখা যায় চূড়ামণি অণুসূর্য রঙিন পতাকা।





তিনি আসছেন

কি ক্বি চ টো পা ধ্যা য়

অগ্নিতে রেখেছি মন যখন তখন
খুলে ফেলি অমূল্য রত্নসাজ মণি ও মাণিক্য
খুলে ফেলি কোমল মন ও স্বপ্নরাজি
আদর আশীর্বাদ ও গ্রহণ-বর্জন।
নির্লিপ্ত নিরাসক্ত অগ্নিশিখা যেন এক।
প্রত্যয়ে স্থির ও অচঞ্চল।
যত্নে সাজানো সমিধ, শক্তিপুষ্প ও প্রতিজ্ঞাসমূহ।
হাজার বছরের সংস্কার ভেঙে অমরাবতীর পথে...
অসামান্য হয়ে ওঠা এক নারী।
জিতে নেওয়া অশ্বগুলি হেঁচা রবে মাতায় ভুবন।
নীলাভ আকাশ থেকে প্রথম সূর্যের আলো
এসে পড়ে মুখে। কাস্তিময় মনের শুশ্রূষা দেয়।
আত্মস্থ শক্তির মালা পরে যুদ্ধে নামে
মেধা ও মনন আর দ্বিধাহীন শ্লোক।
সংস্কারের যত কু, ঝাঁট দিয়ে সাজানো উঠোন। তিনি আসছেন। আসছেন তিনি।
অবশ্যজ্ঞাবী অপ্রতিহত অযুত সৌদামিনীর মতো।
এ তো মিথ্যে নয়, হৃদয় পেতে বসে আছি অনন্তে।
লোকস্থিতি মিথ্যে করে তিনি আসছেন।

একমুঠো শরতের শিউলি তার প্রমাণ।

ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শ করে

মা ন স কু মা র চি নি

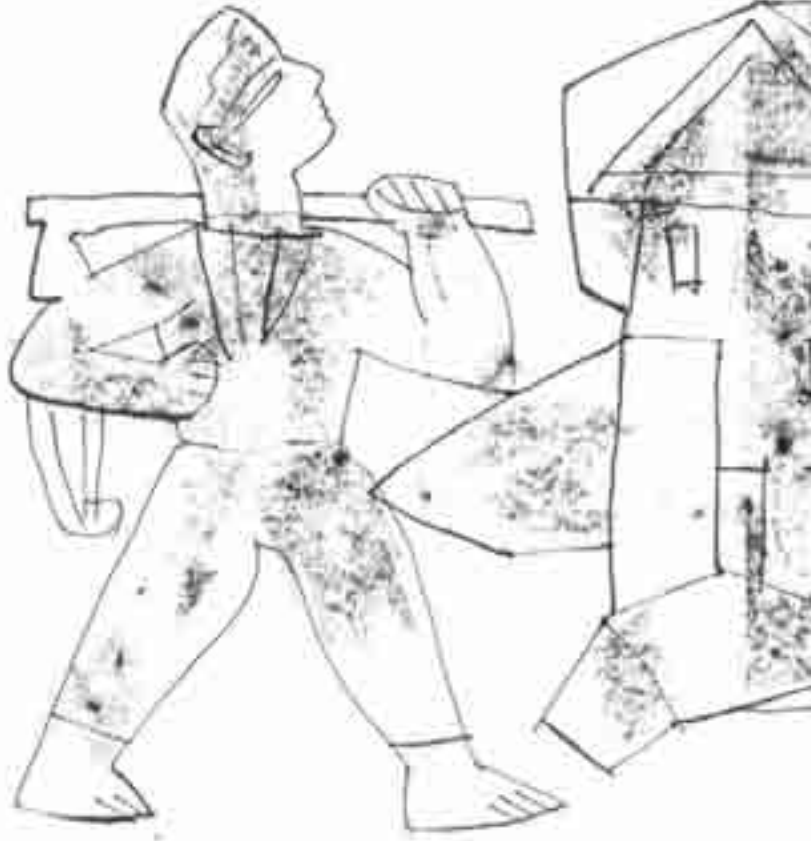
আগুনের শিখায় শিকড় অগ্নিদগ্ধ
স্পর্শবোধ বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে
ত্রিনয়ন মাথায় ঘোরে পরমায়ু
ক্লাস্ত জ্যোৎস্না জিরায়ের ঘাড়ে ছায়া ফেলে
ঘাই মারে পক্ষিজন্মের দিকে...
যে-অগ্নি ছুঁয়েছে কবিতার শেষ অক্ষর
সেই কাগজ ফুঁড়ে জন্ম নিল অমরত্ব
শুধু শরীর ধারণের পর বিরামহীন
জেগে থাকে পুনর্জন্মের আয়োজন।



নয়নপথগামী

হি ন্দো ল ভ টা চা র্য

যে-ভাষার কাছে যেতে হবে বলে নিয়েছি কুঠার
তার কাছে মুখ তুলে ভিক্ষা চায় কঠিন দেবতা।
একবার সত্য কোনও কথা বলো,
একবার শোনাও তবে শ্বাপদসঙ্কুল পথে উল্টোদিকে হাওয়া
এখন বাজারদর ওঠানামা করে
নখদন্তহীন কোনও জনস্থানে বিক্ষোভ হয়।
মানুষ ফিসফিস করে বলে, কোনও মানুষের কাছে
এখন সদরদরজা খোলা নেই, বাঁকাভর্তি শুকনো পাতা নিয়ে
হাসির ভিতরে শুধু ছলাৎছল অশ্রু ভেসে আসে।
যে-ভাষার কাছে যেতে হবে বলে নিয়েছি কুঠার
তার কাছে যাওয়া মানে ভাঙা রাস্তা, পরিত্যক্ত বাড়ি
একটি গোপন মুখ তাকিয়ে রয়েছে যেন মুখঝামটা দেবে।
এত ফুল কেন ছিল তবে এই পুজোর ভিতরে?
অপূর্ব মাটির ঘর ভেঙে দিয়ে দেবতার অভিষেক হয়,
তোমার চোখের কোণে ঘনঘন মেঘ করে আসে।
পায়ের তলায় যার মাটি সরে গেছে তাকে ঈশ্বরের কুঞ্জবন নয়
যদি পারো দাও কিছু ঝিকিঝিকি পুড়ে যাওয়া পুঁথি।
যে ভাষা প্রদীপ, তার শিখা নিবে গেলে তবু
আলো আজও অনন্তলাঙল।
হে পুরুষোত্তম, তুমি ত্রিনয়নে জাগো।



আদিওস

ঈ শি তা ভা দু ড়ী

সাইরেনের শেষ শব্দ বেজে উঠবে যখন,
কেউ কি কানের কাছে মুখ এনে বলবে একবার
‘আউফ ভিডারজেন’?
ঝরা পাতার দিকে তাকিয়ে?

কেউ কি কপাল থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিয়ে
বলে উঠবে ‘আদিওস’?
ফিসফিস করে একবার?

কেউ কি দাঁড়াবে এসে নিবস্ত আগুন থেকে
দু’মুঠো ভস্ম কুড়িয়ে নিতে?
দু’চোখে প্লাবন নিয়ে?

কেউ কি?

[আউফ ভিডারজেন— গুডবাই-এর জার্মান শব্দ
আদিওস— গুডবাই-এর স্প্যানিশ শব্দ]



নিরুদ্দেশের খোঁজে

মণি দীপা নন্দী বিশ্বাস

সূর্য রচনা করিনি আমি আকাশ ভালবাসি
নিতান্ত মাটি ধুলো প্রাণ আর সন্ততির হাসি
এ সব নিয়ে অতি সাধারণ দিন যাপনের গান
হলদে ফুলে পুজোর কবি কালচে হারমোনিয়াম
সানাই বাজে পুরবী ধুনে বেলা যে শেষ হয়
সাঁঝের শঙ্খ বেজে ওঠে চিলের ডানায় ক্ষয়

দিনের বোঝা নামিয়ে সেও রাতের পথ খোঁজে
অন্ধকারে হা হা রবে স্তব্ধ চোখ বোজে
মানুষ খোঁজে জীবন যত অমানুষের ভিড়ে
যন্ত্র-আলোয় চোখের তারায় সূরের প্রলাপ মিড়ে
যায় না পাওয়া এ সন্ধানে একটি মানুষ মুখ
এগিয়ে চলা পথ দেখানোর শত প্রদীপ সুখ

নদী আছে তেমন গভীর সমুদ্র তার চেয়ে
ডুব দিয়ে ওই বন্যা পেরোয় শোণিতার্দ্র নিয়ে
মিলতে পারি মায়ের ডাকে রক্ত মুহুর্তে দাও
অদ্ভুত এক স্বপ্ন বিভোর সূর্য তুমিই হও
হাত বাড়ানো বাড়িয়ে থাকো মোছো ঈর্ষা রেখা
আনন্দে সে প্রাণ জেগেছে ওই যে আলোয় লেখা

পাতাবাহার

পা পড়ি গঙ্গো পাধ্যায়

এক
যেমনভাবে শীতের নীচে লুকিয়ে থাকে বসন্ত,
তেমন ভাবেই তার আসার ইঙ্গিতে
কঁপে ওঠে অনুভূতিমালা।
সূর্যাস্তের লাল এগিয়ে যায় পুনরুদয়ের লালিমায়
চুম্বন হবে কি না সে সংবাদ না জেনেই
বিহ্বল পদযুগল চুম্বক টানে এগিয়ে যায় পাতাবাহারের দিকে।

দুই
রাগ-রাগিণীর প্রলেপ নিয়ে
অনুরাগী সুর
সেতার ছেড়ে বয়ে চলে শ্রোতার শ্রবণে।

তিন
বেহাল বসন্ত বয়সের হিসেব মানে না।

চার
কলহ আর কান্না
মিলেমিশে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়
রোদ্দুর-বারিষের জাফরিতে।





দধীচির হাড়

গৌ ত ম মু খো পা ধ্যা য়

আমি দধীচির পদতলে বসে
অক্রোধ ও আত্মবলিদান শিখতে গিয়ে
মধ্যবিত্ত দুই চোখে সর্ষেফুল দেখলাম।

ঋষির পদযুগল ঠান্ডা কিন্তু হঠাৎই
উষ্ণ রক্তস্রোতে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল শিরা উপশিরা
তিনি চকিত চাহনিত আকাশ নক্ষত্র ও আমাকে
একবার দেখে আবার হারিয়ে গেলেন ধ্যানে
ঝড় এল, মেঘও গর্জন করে বৃষ্টিকে দেখাল পথ।

দধীচি ভিজছেন আর আমিও তাঁর গা-যেঁষে
যতটা পারি উজ্জীবিত করে তুলি স্নায়ুমাণ্ডল।
ইন্দ্র দাঁড়িয়ে দূরে কোন এক অদ্ভুত প্রার্থনায়
মুখ তাঁর নিচু।
দধীচি হাসলেন আর হাসতে হাসতে
নিজের পাঁজরার বজ্র-হাড় টেনে ছিঁড়ে বের করে
ইন্দ্রকে দিলেন। আমার গায়ে ছিটকে এল
দধীচির রক্ত। এই গা-কাঁটা দেওয়া দানের পর
ঋষি লুটিয়ে পড়লেন।

আমার মধ্যবিত্ত বৃকের পাঁজরা কেঁপে উঠল ভয়ে
মনে হল, এই ঘর, প্রায়াক্ষ স্ত্রী, বেকার পুত্র, স্বামী পরিত্যক্তা কন্যাকে ছেড়ে
আমি কোথাও যেতে পারব না।

এক ব্যর্থ নাট্যকারের জবানবন্দি

শি বা শি স মু খো পা ধ্যা য়

তোমার জন্য কিনে আনলাম দিঘার থেকে কাজু,
পুরীর থেকে নাটক লেখার বালি,
বালির বৃকে তুমি যখন ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ো
পাতায় পাতায় হল ভরা হাততালি।

তোমার বলা কথায় তখন মণিমুক্তো ঝিলিক দিল
পেরিয়ে গেল চার দেওয়ালের সীমা,
দৃশ্য থেকে দৃশ্য গড়ায় সকাল থেকে গভীর রাতে
আকাশ জুড়ে অথৈ পূর্ণিমা!

তখন তোমার ভরা জোয়ার চাঁদের টানে ফুলে উঠল
হাওয়ায় তখন প্রবল আঁচড়, যাতে,
নাট্যকারও জ্বালাপোড়ায় চরিত্রদের বুঝতে পারে
জ্যোৎস্না-ভাঙা আলোকসম্পাতে।

অন্ধকারে আলো পড়ল, সাগর তখন ছিন্নভিন্ন
বৃকে তখন পাঁজর ভাঙে হাওয়া,
ভালবাসার নিয়তি যে কী নিদারুণ বুঝতে পেরে
থামিয়ে দিলে তুমিও গান গাওয়া।

জীবন এত বিরাট, এত গভীর, তাকে লেখা যায় না,
লেখার খাতা বন্ধ করি ভয়ে,
তুমি যদি আবার কোথাও মরা নাটক বাঁচিয়ে তোলো
রক্তমাংসে, তোমার অভিনয়ে।

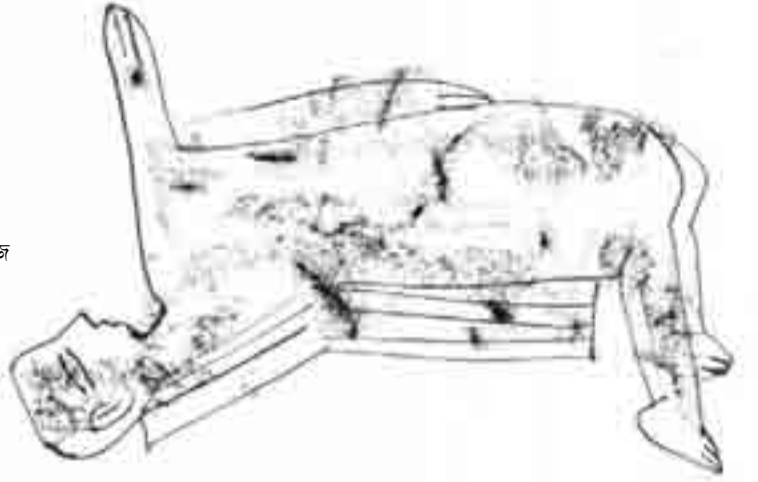


আন্ডারগ্রাউন্ড

পায়েল সেন গুপ্ত

রোজই পরস্পরের মৃত্যু নিয়ে খেলা করতে করতে
কখন পাতাল-প্রবেশ ঘটে গেল বুঝিনি।
এখানে থকথকে কাদা, ঘূমের অতলে অ্যালার্ম বাজে
দূরে কোথাও বোমা পড়ছে মনে হয়
ছাদ থেকে একে একে নেমে আসছে শরীর
তাদের আত্মা তখন অনেকদূরে দোল খাচ্ছে
হয়তো কোনও নদীর ধারে, বাসরসজ্জায়...
তারপরেও আলো খুঁজতে থাকি
তোমার মুখ দেখতে পাইনি অনেকদিন হল
অন্ধকারে টের পাই আঁকড়ে ধরেছ প্রাণ
মৃত্যু নিয়ে বারবার খেলা করেছি প্রতিদিন
শরীর থেকে শরীরের সব বিকিয়ে দিতে দিতে
দেখি ঘর ভরে আছে শিউলিফুলে।
আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে বাঁচতে চেষ্টা করি
এখানে একটাই বুলেট, একটাই প্রাণ, একটাই মৃত্যু

বলো শেষ মুহুর্তে তুমি কি বাঁচিয়ে নেবে না আমায়?



আহত অক্ষরসমূহ

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সাদা বইয়ের নীচে লাল বই
লাল বইয়ের নীচে ধুলোবই
শিরদাঁড়া-ভাঙা বইয়ের নীচে
গুঁড়ো হয়ে যাওয়া অক্ষর—
এইভাবে দিনের পর দিন
জমতে থাকে অজুহাত
জমতে থাকে ভাঙা হারমনিয়ামের গান

সন্ধের বৃষ্টি খুন করে সব সম্ভাবনা
বন্ধু, খানিকক্ষণের পাতাল-প্রবেশ ছাড়া
গতি নেই আমাদের
আর গতি, গতি ভুলিয়ে দেয়
এক-একটি মৃত স্বপ্নের সজল হাসি,
বিস্মৃতি বিস্মৃতি...

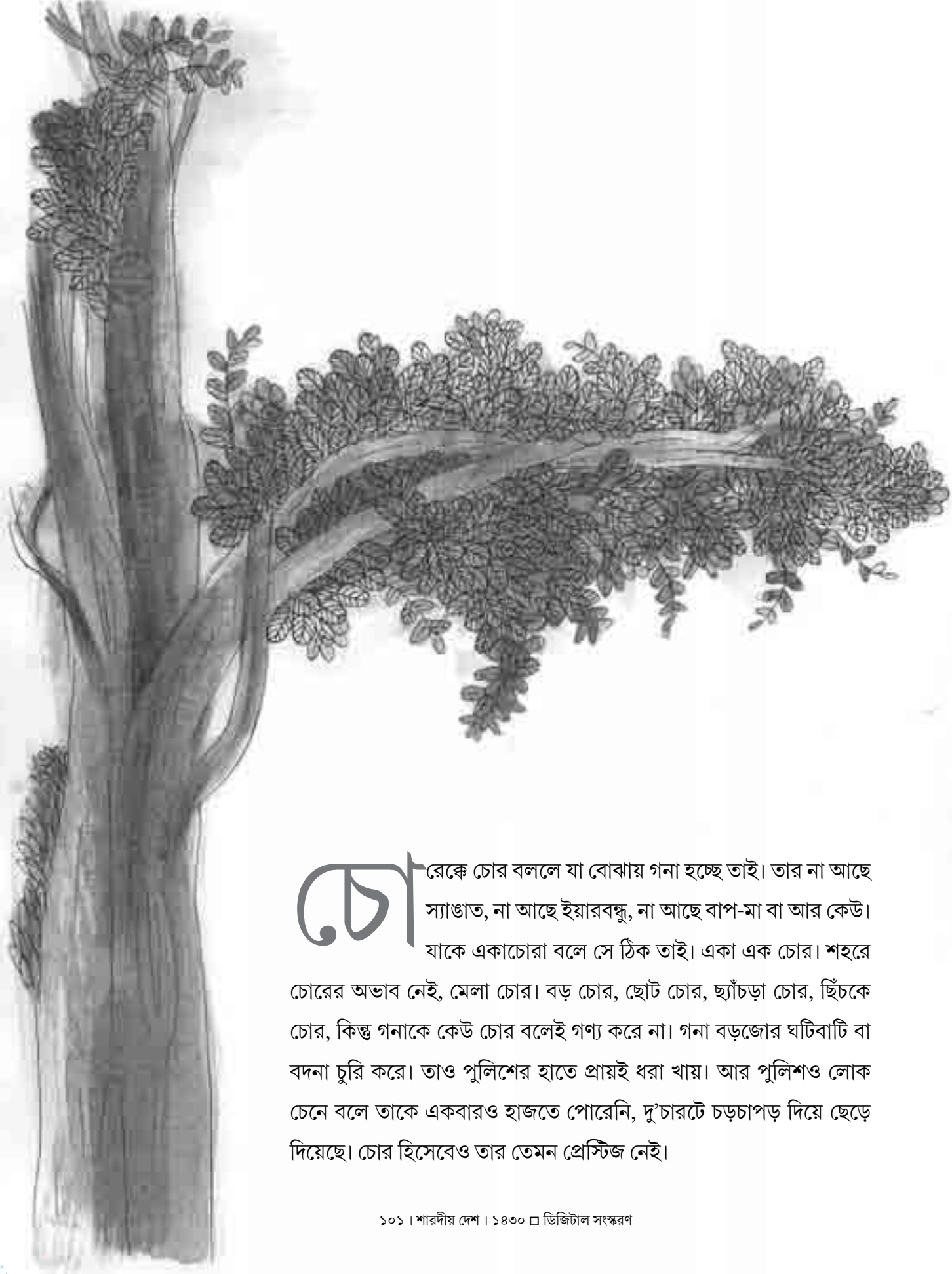
বলেননি প্রয়াত লেখক? লিখে যাননি কি?

শাস্ত হও, হাঁটো ধীর পায়ে
যে-পথের শেষে তুমি বেঁচে উঠতে পারো
হাস কিংবা গাছ অথবা
একটি সাদা বই হয়ে,

তোমার পিঠের নীচে লাল বই,
লাল বইয়ের নীচে মননের ধুলো,
তারও নীচে
তোমার শিরদাঁড়া,
আহত অক্ষরসমূহ

অঙ্কন: সুব্রত চৌধুরী





চোৱেকে চোৱ বললে যা বোঝায় গনা হচ্ছে তাই। তার না আছে
স্যাঙাত, না আছে ইয়াবন্ধু, না আছে বাপ-মা বা আর কেউ।
যাকে একাচোৱা বলে সে ঠিক তাই। একা এক চোৱ। শহরে
চোৱের অভাব নেই, মেলা চোৱ। বড় চোৱ, ছোট চোৱ, ছ্যাঁচড়া চোৱ, ছিঁচকে
চোৱ, কিন্তু গনাকে কেউ চোৱ বলেই গণ্য করে না। গনা বড়জোৱ ঘটিবাটি বা
বদনা চুৰি কৰে। তাও পুলিষেৰ হাতে প্ৰায়ই ধৰা খায়। আৰ পুলিষও লোক
চেনে বলে তাকে একবাৰও হাজতে পোৱেনি, দু'চাৰটে চড়াপড় দিয়ে ছেড়ে
দিয়েছে। চোৱ হিসেবেও তার তেমন প্ৰেস্টিজ নেই।

তা বলে গনা যে খুব খারাপ আছে, তাও নয়। আসলে তার একটা মাসি আছে, তিন কুলে ওই একটা মাসিই তার সম্বল। আর মাসির অবস্থা তেমন খারাপও নয়। তার মেসো বিজয় মল্লিক মস্ত মহাজন। ঢাকার লেখাজোখা নেই, কিন্তু মুশকিল হল, মেসো গনাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। দেখলেই কুকুর বেড়ালের মতো দূরদূর করে তাড়া করেন। তবে মাসির একটু মায়াদয়া আছে তার প্রতি। শত হলেও নিজের বোনপো বলে কথা! নিতান্তই মাথা নেই বলে ছেলেটার লেখাপড়া হল না। তা বলে তো আর না খেতে পেয়ে মরতে দেওয়া যায় না! মেসো দুপুরবেলায় বাড়িতে থাকেন না, ওই সময়ে গনা গিয়ে পাছদুয়ার দিয়ে মাসির বাড়িতে ঢোকে, পিছনের বারান্দায় বসে পেট পুরে ডাল ভাত, মাছ, তরকারি সাঁটিয়ে আসে। দু'দশটাকা হাতখরচাও দেয় মাসি, আর তাতে গনার একরকম চলে যায়।

মাসির দুটো ছেলে, বাবলু আর গাবলু। দু'জনেই ভাল স্কুলে পড়ে, ফটাফট ইংরেজিতে কথা কইতে পারে, পরীক্ষায় ফার্স্ট সেকেন্ড হয়। তারা দু'জন কিন্তু গনাকে অপছন্দ করে না। বাবলু তো তাকে বলে, “গনাদা, ভাল চোর যদি হতে চাও তা হলে তোমাকে মাস্টারমাইন্ড হতে হবে। ছোটখাটো চোর হয়ে লাভ কী! দাঁড়াও, তোমাকে গুগল সার্চ করে দেখিয়ে দিচ্ছি হাউ টু বি এ গুড থিফ।” এই বলে মাঝেমধ্যে তাকে মোবাইল খেঁটে গুগল থেকে পড়ে শোনায়ে। গনা খুব মন দিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টাও করে। কিন্তু সবটা তার মাথায় ঢোকে না।

আর গাবলু বলে, “দূরদূর। চোরটোর খুব ছোটখাটো জিনিস, হতে হলে ডন হয়ে যাও। এটা ডনদেরই যুগ। ডনকে সবাই খাতির করে।” শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে গনা। অত বড় কিছু হওয়ার মতো এলেমই তার নেই।

যতীন ঘোষ হাই স্কুলে অঙ্কের জাঁদরেল মাস্টার। খুব নামডাক। যতীনবাবু সোনার ডিবে থেকে নসি নেন বলে শোনা ছিল গনার। কথাটা কয়েছিল বটে ভোলা অধিকারী। হেঁড়ে গলায় কেমন গেয়ে মাথুকরী করে বেড়ায়। তা সেদিন যতীনবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল, অনেকক্ষণ গলাবাজি করেও জুটেছিল আধ কৌটো মোটা, পোকায় ধরা চালা। তাই রাগ করে বেশ হৈকে পাঁচজনকে শুনিয়েই বলেছিল, “অমন কিপ্পস লোক হয় না বাপু, কিন্তু বারফটাই আছে খুব। সোনার ডিবেয় নসি নেয়!” সেইটে শুনে ফেলেছিল গনা। যতীনবাবু ভাবে ভোলা মানুষ, সারা দিন অঙ্কের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকেন। দিনরাত্তির কোথা দিয়ে চলে যায় টেরই পান না। এমন মানুষের নস্যির ডিবে চুরি করা তো জলের মতো সোজা কাজ। কেন যে এই সোজা কাজটা এতদিন কেউ করেনি, সেটাই ভেবে কুল পায় না গনা। তা ছুটির দিনে যতীনবাবু দুপুরবেলা খাওয়ার পর তার জানালার ধারের চেয়ারটায় বসে একটু বিমোহন, সামনেই টেবিলের ওপর নস্যির ডিবেটা হেলাফেলায় রাখা থাকে। জানালা দিয়ে হাত বাড়ালেই একেবারে নাগালের মধ্যে। কয়েকদিন তক্কেতক্কে থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করল গনা। রোববার দিন দুপুরবেলা বোপ বুঝে কোপ মারতে জায়গামতো হাজির হয়ে দেখল, যতীনবাবুর মাথাটা ডান দিকে কাত হয়ে আছে, নাকও যেন ঘুরঘুর করে ডাকছে বলে মনে হল। এত সোজা কাজ যে, গনার হাসিই পাচ্ছিল। সে নির্ভয়ে, বীরের মতোই তার সরু হাতখানা থ্রিলের ফাঁকে বাড়িয়ে দিয়ে একবারেই ডিবেটা মুঠোয় পেয়ে গেল। প্রায় অটুহাসি হাসতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু মুশকিল হল, তুমি যাও বলে কপাল যায় সঙ্গে। হাতটা টেনে নিতে যাবে, হঠাৎ খপ করে তার কজ্জিটা চেপে ধরে ফেললেন যতীনবাবু। আর সেই হাতের খপ্পর থেকে হাত ছাড়ানোর মতো জোরবল যে তার নেই, এটাও সে হাড়েহাড়ে টের পেল।

যতীনবাবু তাঁর একখানা চোখ আধখানা খুলে তাকে একটু নিরীক্ষণ করলেন, তারপর একটু আদুরে গলাতেই বললেন, “তুই কে রে!”

গনা কাঁচুমাচু হয়ে বলে, “আজ্ঞে আমি হলুম গনা।”

“তুই কি চোর নাকি!”

“আজ্ঞে, অনেকটা ওরকমই।”

“তা কেন চোর তুই! নস্যির ডিবে কি একটা চুরি করার জিনিস হল

বাপু!”

ডান হাতখানা গ্রেফতার হয়ে আছে, তাই অগত্যা বাঁ হাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে গনা বলে, “আজ্ঞে ভুল হয়ে গেছে।”

যতীনবাবু সখেদে বললেন, “এ যে বড় ঘেমার কথা রে! যে-চোর নস্যির ডিবে চুরি করে, লোকসমাজে কি তার মুখ দেখানো উচিত!”

গনা যতীনবাবুর সঙ্গে একমত হয়ে বলল, “আজ্ঞে তা বটে। আর চুরি করব না মশাই!”

যতীনবাবু অবাক হয়ে বলেন, “চুরি করবি না! চুরি করবি না কেন? দেশের আগাপাশতলা যদি চোর হয় তা হলে তুই আর চোর হয়ে কী এমন দোষ করলি! তবে বিদ্যোটা মন দিয়ে শিখবি তো। আর নজরটাও তো একটু উচু হওয়া দরকার! নস্যির ডিবে মতো এলেবেলে জিনিস চুরি করলে যে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ। যে-বস্তুর রিসেল ভালু নেই সেই জিনিস চুরি করে কোন আহান্মক! তুই কি নসি নিস?”

“আজ্ঞে না। শুনেছি নসি নিলে হাঁচি হয়।”

“তা হলে চুরি করছিলি কেন?”

“আজ্ঞে, কানাঘুষো শুনেছি, ওটা নাকি সোনার ডিবে।”

যতীনবাবু সখেদে বলেন, “ছ্যা ছ্যা, সোনা আর পেতলের তফাত বুঝিস না, তুই তো নিজের নাম ভোবালি!”

আত্মগ্লানিতে গনার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। ধরা গলায় বলল, “ওই জন্যই তো আমার কিছু হল না মশাই।”

যতীনবাবু তার হাতটা মায়াজুরে ছেড়ে দিয়ে বললেন, “আহা, অত ভেঙে পড়ছিস কেন? বলি লেখাপড়া কিছু শিখেছিস? ছয়ের ঘরের নামটা বল তো!”

“আজ্ঞে, ছয়েক ছয়, ছয় দুগুনে বারো, তিন ছয়ে আঠেরো, চার ছয়ে চব্বিশ...”

“ওরেবাস রে! তোর তো পেটে বিদ্যো আছে দেখছি! আয় তো, ঘরে আয়, তাকে একটু বাজিয়ে দেখি।”

তা বাজিয়ে দেখলেনও বটে যতীনবাবু। কোথায় থাকিস, কী করিস, পেট চলে কী করে, বাড়িতে কে কে আছে, এই সব। গনার লুকাছাপা কিছু নেই, সব গড়গড় করে বলে দিল। খুব মন দিয়ে শুনলেন যতীনবাবু। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “ওই মাসির আদরেই তোর কিছু হচ্ছে না, বুঝলি! মাসি পেট পুরে খাওয়ায় বলেই তোর খিদে হচ্ছে না। আর খিদে না হলে কি চোরের মাথা খেলে! নাকি হাত পা সচল হয়! খিদে চাড়ি মারলে দেখবি, অনায়াসে বড় বড় চুরি করে ফেলতে পারবি। তখন আর নস্যির ডিবে কিংবা ঘটবার্টির দিকে নজরও পড়বে না।”

কথাগুলো ন্যায্য বলেই মনে হল গনার। জ্ঞানী মানুষের সঙ্গ করলে কত কী শেখা যায়! তাই সে পরদিন থেকে মাসির বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিল। খিদেটাকে চাগিয়ে তোলা দরকার। খিদেটা বেশ জম্পেশ হয়ে উঠলে মাথার বোঁদা ভাবটা মরে গিয়ে বুদ্ধি ঠেলে উঠবে। তখন আর তাকে পায় কে?

তা খিদেটাও হল বটে। দু'দিন দাঁতে দাঁত চেপে উপোস থেকে তিন দিনের দিন দেখল, পেটের মধ্যে যেন বাঘের হাঁচড় পাঁচড়। মাথা বিমবিম। হাত পায়ে খিল ধরার মতো ভাব। বুদ্ধির বিকিমিকির দেখা নেই। উল্টে মাথাটা যেন আরও ভোম্বল হয়ে গেছে। বিকেলের দিকে আর পেরে উঠল না গনা। ঘর থেকে বেরিয়ে শহরের উত্তর দিকটার জঙ্গলে জায়গাটায় গিয়ে ঢুকল। এখানে কয়েকটা পেয়ারাগাছ আছে। বুনা কুল আর বন করমচার গাছেরও সন্ধান জানা আছে তার। শীতকালে খুব ফলন হয়। ইচ্ছেমতো বন করমচা আর বুনা কুল খেয়ে আগে পেটের হাঁচড় পাঁচড় সামাল দিল সে। তারপর কয়েকটা ডাঁসা পেয়ারা নিয়ে বসল বিশ্বাসদের ভাঙা ভুতুড়ে বাড়িটার চাতালের একধারে। দিবি নিরিবিলা জায়গা। এখানে বসে নিজের ভবিতব্য নিয়ে ভাববার খুব সুবিধে। তা ভাবছিলও সে। একমনে পেয়ারা খেতে খেতে ভবিষ্যতের কর্মসূচি ঠিক করার চেষ্টা করছিল। এমন সময়ে অবাক হয়ে দেখল, বিশ্বাসদের পোড়ো বাড়ির ভিতর থেকে একজন গোলগাল চেহারার মাঝবয়সি লোক বেরিয়ে এল, গায়ে ফড়িয়া, পরনে হেঁটো ধুতি, মাথাজোড়া গোলাপি

রঙের ঢাক, ভুঁড়ো গোঁফ। হাতে একটা পেতলের ঘটি। ঘটি থেকে জল ঢেলে একমুঠো পা ধুতে লাগল। গনাকে তেমন গ্রাহ্যই করল না।

গনা বেশির ভাগ লোককেই সমীহ করে, আগ বাড়িয়ে কারও সঙ্গে কথাটথা কহিতে যায় না। সে মুখ্যসুখ্য বোকাসোকা লোক, তার কোন কথায় কে ভুল ধরে তার তো ঠিক নেই। তবে আজ লোকটাকে দেখে সে এত অবাক হল যে, কথা না কয়ে পারল না। আগে গলা খাঁকারি দিয়ে নিজেকে জানান দিয়ে নিল, তারপর যথাসাধ্য মোলায়েম গলায় বলল, “আজ্ঞে, আপনি কি এখানে নতুন এসেছেন?”

লোকটা তার দিকে তাকিয়ে চোখে চেয়ে বলে, “নতুন এসেছি মানে! আমি হলুম বিকু বিশ্বাস, আর এ হল আমার সাত পুরুষের ভিটে। নতুন আসতে যাব কেন হে!”

“আজ্ঞে, আগে কখনও দেখিনি তো! আর এ তো ভূতুড়ে বাড়ি, এখানে তো কারও থাকার কথা নয়!”

লোকটা ভারী অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, “তা হলে আমি আছি কী করে?”

“আজ্ঞে, সেইটেই তো জানতে চাইছি মশাই। বাড়ির তো একটাও কড়ি বরগা বা ছাদ আস্ত নেই, ঘরগুলোয় জঙ্গল গজিয়ে গেছে, তার মধ্যে বিছুটিপাতাও আছে, সাপখোপ আর পোকামাকড়ের আড্ডা। ভূতও আছে বলে শুনেছি।”

লোকটা তেরিয়া হয়ে বলে, “শুনলেই হল! আমি তো বাপু দিবি হাত পা ছড়িয়ে আরামে এখানে এতকাল ধরে বসবাস করছি। আমার তো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না বাপু!”

“তাই তো দেখছি মশাই! আপনি ধন্য মানুষ।”

“আরে বাপু, সব কিছুই সঙ্গের মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়, নইলে দুনিয়ায় কি টিকে থাকার উপায় আছে?”

গনা একমত হয়ে বলে, “তা অবিশ্যি ঠিক। তা হলে কি এখন থেকে এখানেই থাকা হবে?”

“থাকা হবে মানে! আমি তো বহুকাল ধরেই এখানে আছি। তা তুমি এত খতেন নিচ্ছ কেন হে বাপু? মতলব কী তোমার?”

“আজ্ঞে মতলব কিছু খারাপ নয়। এলাকার পাঁচজনের খবরাখবর নেওয়াটা কি খারাপ কিছু?”

“আমি গায়েপড়া লোক বিশেষ পছন্দ করি না। আজকাল যা চোরছাঁচড়ের উপদ্রব! কাউকে বিশ্বাস নেই।”

গনা কোঁত করে মুখের পেয়ারার ছিবড়েটা গিলে ফেলে বলে, “তা অবিশ্যি ঠিক। তবে কিনা সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, এই বাড়িতে তো চোরের অনুব্রাটা। নিতান্ত নিরলজ্জ, হাড়হাভাতে দুকান কাটা, নিচু নজরের চোরও এই পোড়োবাড়ির ত্রিসীমানায় পা দেবে না।”

লোকটা তেরিয়া হয়ে বলে, “বললেই হল! কেন হে, আজকালকার চোরদের কি পাখা গজিয়েছে নাকি যে বিশ্বাসবাড়িতে পা দেবে না! বলি বিশ্বাসেরা কমতি যায় কিসে? পোড়োবাড়ি তো কী হয়েছে! মরা হাতি লাখ টাকা।”

গনা অবাক হয়ে বলে, “তবে কি মশাই, এই বাড়িতে গুপ্তধন টন আছে!”

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলে, “থাকলেই বা, তোমার সেই খবরে কী দরকার?”

“না, এই সাপখোপ, বিছুটিপাতা, ভূতপ্রেতের মধ্যে তো আর কেউ সাধ করে থাকে না! নিশ্চয়ই গভীর কোনও কারণ আছে।”

লোকটা এবার একটু নরম হয়ে বলে, “আরে না না, গুপ্তধন টন কিছু নেই বাপু, এদিকে নজর দিয়ে কোনও লাভ হবে না।”

এবার গনা নিশ্চিত মনে পেয়ারায় আর একটা কামড় বসিয়ে বলে, “তা বললে হবে কেন মশাই! গুহা কারণ না থাকলে কেউ কি এই বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে থাকে! আমি কেমন যেন গুপ্তধনের গন্ধ পাচ্ছি।”

লোকটা এবার কাহিল গলায় বলে, “ওরে বাপু, গুপ্তধন টন নয়, আমার আর যাওয়ার জায়গা নেই বলে এখানে এতকাল মাটি কামড়ে পড়ে আছি।”

“তা কতদিন হল বলুন তো!”

লোকটা মন দিয়ে কড়ি গুনতে লাগল। তারপর বিড়বিড় করে কী সব হিসেব নিকেশ সেরে নিয়ে বলল, “এই একশো সাতান্ন বছর পাঁচ মাস তেরো দিন।”

গনা চোখ বড় বড় করে বলে, “একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে যে মশাই! একটু কমসম করলে হয় না!”

লোকটা বেজার মুখে বলে, “কম করার উপায় নেই হে, এ একেবারে অঙ্কের হিসেব।”

“তা হলে কি বলতে চান আপনি মনিষ্য নন!”

“কেন আমাকে দেখে তোমার মনিষ্য বলে মনে হচ্ছে না নাকি!”

“তাও হচ্ছে বটে। কিন্তু বড্ড ধন্দে ফেলে দিয়েছেন। দেড়শো বছর ধরে মানুষের বেঁচে থাকাটা তো কাজের কথা নয় কিনা। সবাই যদি অবিবেচকের মতো দেড়শো-দুশো বছর বাঁচতে শুরু করে তা হলে চারদিকে যে বুড়োবুড়িদের গাদি লেগে যাবে, মশাই!”

বিকু বিশ্বাস একটা আপসরফায় আসার মতো ভালমানুষি গলায় বলল, “রোসো বাপু, তুমি কথাটা ঠিক বুঝতে পারছ না। নিয়মমতো মানুষকে যে মরতে হয় সে কি আমি জানি না নাকি! তা সেই হকের মরা আমি তো কবেই মরেছি। শরীর-টরীরও নেই বাপু।”

গনা চোখ বড় বড় করে বলে, “তা হলে কি আপনি সত্যিই ভূত নাকি মশাই? তা হলে তো বড় ভয়ের কথা হল!”

বিকু বিশ্বাস একটু নিরাশ গলায় বলে, “তা তো হলই, কিন্তু তোমার মধ্যে তো ভয় পাওয়ার কোনও লক্ষণই দেখছি না হে! কী দিনকালই যে পড়েছে! চোখের সামনে ভূত দেখেও একটা লোক নির্বিকার মুখে নিরলজ্জের মতো পেয়ারা খেয়ে যাচ্ছে!”

গনা একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলে, “ভয় যে হচ্ছে না তা কিন্তু নয় মশাই। আসলে হয়েছে কী, দু’দিন ধরে উপোস থাকায় আমার ভয়টা ঠিক যেন ঠেলে উঠতে পারছে না! ভয়ভয় ভাবটা হচ্ছে বটে, কিন্তু তেমন যেন জম্পেশ হয়ে উঠছে না! বুঝতে পারছি, ভয় পাওয়াটা উচিত, কিন্তু পেটে খিদে থাকলে সব কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে যায়।”

বিকু বিশ্বাস বিরক্ত হয়ে বলে, “থাক, তোমাকে আর ধ্যাস্টামো করতে হবে না বাপু।”

গনা বলে, “যদি কিছু মনে না করেন তা হলে একটা কথা কই, আপনার এই দৃশ্যমান হয়ে ঘুরে বেড়ানোটা কি ঠিক হচ্ছে মশাই! আপনি মরেছেন, শ্রাদ্ধশাস্তিও নিশ্চয়ই হয়ে গেছে! তারপরও আপনার এইভাবে প্রকট হয়ে থাকাটা কি ঠিক?”

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “তা তো ঠিক কথাই বাপু। এ হল ওই কিছুত আর বিটকেল লটকার কাজ। এতকাল দিবি বায়ুভূত হয়ে ছিলুম, কেউ আমাকে দেখতেও পেত না। হঠাৎ কোথা থেকে যে ওই জানুবানটা এসে হাজির হল কে জানে। ফস করে গায়ে একটা স্প্রে-র মতো কী যেন ছিটিয়ে দিল। সেই থেকে আমি প্রকট হয়েছি, লোকে আমাকে দেখতে পাচ্ছে। এই তো সেদিন, জটেশ্বরের মা কাঠকুটো কুড়োতে এসে আমাকে দেখতে পেয়ে ‘ভূত, ভূত’ করে চৈঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে ছুটে পালিয়ে গেল। কী মুশকিল বলো তো! এই তো তুমিও আমাকে দিবি দেখতে পাচ্ছ, কথাটথাও কইছ, কিন্তু তাতে আমার যে ঝামেলা বাড়ল তা আর কে বুঝছে বলো! ফলিত হয়ে থাকার ফলে এখন রাজ্যের লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।”

পেয়ারার শেষ টুকরোটা মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে গনা বলে, “তা এই লটকাটা কে মশাই?”

বিকু বিশ্বাস অত্যন্ত বিরক্তির গলায় বলে, “তার কথা আর কোয়ো না। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তা কে জানে। ওই কুসুমপুরের জলার ওদিকটায় কোথায় যেন ঘাপটি মেরে আছে। কী সব যন্ত্রপাতি দিয়ে দিনরাত খুঁটখাট করে। সে নাকি এই পৃথিবীর মনিষ্য নয়। গ্রহাস্তরের জীব। কে জানে বাপু কী! তবে লোক মোটেই সুবিধের নয়। আমার কী সর্বনাশটাই করল বলো তো!”

“তাতে কি আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছে মশাই?”

“অসুবিধে হবে না। এই যে লোকে দেখতে পাচ্ছে, সন্দেহ করছে,

এসব কি আর ভাল? তার ওপরে আগে আমাকে সাপে কামড়াত না, বিছে ছল দিত না, মশামাছি গায়ে বসত না। আজকাল আমাকে সাপে কামড়ায়, বিছে ছল দেয়, মশামাছি গায়ে বসতে চায়।”

“আপনার কি লাগে?”

ঝিকু বিশ্বেস আবাব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “তা লাগে না বটে। কিন্তু এরাও যে আমাকে দেখতে পাচ্ছে এটাই চিন্তার কারণ। তবে লটকা বলেছে যে, মাসখানেক বাদে গা থেকে স্প্রেটা উবে গেলে নাকি আবাব আমি গায়েব হয়ে যাব। তা হলে বাঁচি বাবা!”

গনা মাথা নেড়ে বলে, “আজ্ঞে, কথটা ঠিকই। গায়েব হয়ে থাকতে পারলে বিস্তর সুবিধে। নিশ্চিন্ত মনে কাজকর্ম করা যায়।”

ঝিকু বিশ্বেস গন্তীর মুখ করে একটা ‘হুঁ’ দিয়ে তার ঘটিখানা হাতে নিয়ে বাড়ির ভিতরে সঁধিয়ে গেল।

গনা এলিয়েনদের কথা খুব জানে। বাবলুর কাছে গল্প শুনেছে। তারা নাকি রকেটে চেপে অন্য সব গ্রহ থেকে আসে। তাদের মেলা ক্ষমতা। হয়কে নয় করতে পারে, নয়কে হয়। তেমনই একজন এলিয়েন যদি কুসুমপুরের জলায় এসে ঘাপটি মেরে থেকে থাকে, তবে তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! একবার গিয়ে ধরে পড়লে তার ভাগ্যই হয়তো বদলে যাবে। হয়তো তাকে দেখেই এলিয়েনটা বলে উঠবে, ‘এই তো! তোমাকেই তো আমি খুঁজছিলুম! এতদিন কোথায় ছিলে বলো তো! এসো তোমার একটা হিল্লো করে দিই!’— এই বলে হয়তো ক্ষুদ্রাইভার দিয়ে তার মাথার খুলিটা খুলে খানিকটা একস্থা ঘিলু ঢুকিয়ে দিল। আর গনা রাতারাতি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বসল। কিংবা হয়তো ফস করে এমন একটা ইনজেকশন দিয়ে দিল যাতে গনা দেখ না দেখ হয়ে উঠল শিবু প্রতিহারের মতো ধুরন্ধর চোর। কিংবা হাবু বেরাগীর মতো দুর্ধর্ষ ডাকাত! কিংবা এমনও হতে পারে যে, তাকে পছন্দ হয়ে যাওয়ায় নিজেদের গ্রহেই নিয়ে গেল। সেখানে গেলে কি আর গনা এই গনা থাকবে! চুরি চোটামি করে এরকম নিচ্ছন জীবন কাটাবে আর! নতুন দুনিয়ায় গিয়ে পড়লে হয়তো দেখবে, সেখানে দোবেলা পোলাও বিরিয়ানির আয়োজন, দালানকোঠায় নরম গদির বিছানায় ঘুম, নিত্য নতুন জামা, নিত্য নতুন জুতো, চোখে কালো চশমা পরে ভাঁটে ঘুরেঘুরে বেড়ানো। এমনও হতে পারে, এলিয়েনরা তাকে নিজেদের গ্রহে নিয়ে গেল না, কিন্তু হয়তো একটা পরশপাথর কিংবা জিনভরা পিদিম দিয়ে গেল! সে শুনেছে এলিয়েনদের অসাধ্য কিছু নেই। যাই হোক, কিছু একটা হলেই হল, এরকম লাঞ্ছনার জীবন তো আর কাটাতে হবে না!

এইসব ভেবে তার মাথাটা বেশ গরম হয়ে রইল। রাতে ভাল ঘুমই হল না। পরদিন আর উপোসের রাস্তায় গেল না গনা। মাসির বাড়িতে পেট পুরে খেয়ে সে একটু সাজগোজ করল। অবশ্য সাজগোজ করার মতো তার বিশেষ পোশাকটোশাক নেই। তবে একটা কালো প্যান্ট আছে তার, প্রায় নতুনই বলা যায়, গতবার পুজোয় মাসি দিয়েছিল, প্রাণে ধরে এতকাল বিশেষ পরেনি, আজ সেটা পরল। সবুজ জামাটা পরশুদিনই কেচেছে, আজ সেইটা গায়ে দিল। আর এলিয়েনবাবুকে ইশ্রেঙ্গ করার জন্য লাল মাফলারটাও গলায় জড়িয়ে নিল। মনে হল সাজগোজটা বেশ ভালই হয়েছে, এলিয়েনবাবু খুব একটা অপছন্দ করবেন না তাকে। তারপর ভরদুপুরে কুসুমপুরের জলার রাস্তা ধরল সে। জায়গাটা তার অচেনা নয়। অনেকবার জলা থেকে মাখনা আর পদ্মফুলের বাঁজ তুলতে এসেছে। মহাজনরা ভাল দামে কিনে নেয়। কখনও চুনো মাছ ধরতে কি শাপলা তুলতেও আসতে হয়েছে। পেটের দায়ে কত কী করতে হয় মানুষকে!

জায়গাটা শহর থেকে বেশ অনেকটাই দূর। পৌঁছোতে একটু বেলা হয়ে গেল। জলাটা পেছায়, শীতকাল বলে জল অনেকটাই কমে গেছে। জলার মাঝখানটায় লম্বামতো মস্ত একটা চর জেগে উঠেছে। তাতে বিস্তর আগাছার জঙ্গল। একধারে বাঁশঝাড় আর বনভূমি। গনা জলার ধারে দাঁড়িয়ে একটু ইতিউতি দেখছিল। সব কাজই হিসেবনিকেশ করে করতে হয়। এই জলার ভিতরেই কি লটকাবাবু থাকেন? নাকি ওই জঙ্গলের মধ্যে? কেমন মানুষ তিনি? গনাকে কি গোরাহি করবেন? কিছুই

আন্দাজ করতে পারছিল না সে। তবে দাঁড়িয়ে থেকে তো লাভ নেই। সে প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটুজলে নেমে পড়ল। তারপর জল পেরিয়ে নয়া চরটার বুকসমান আগাছার জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। তারপর মৃদুস্বরে “লটকাবাবু কি বাড়িতে আছেন? লটকাবাবুকে কি এখানে পাওয়া যাবে?” বলতে বলতে এগোতে লাগল। চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর। আগাছার জঙ্গলের ভিতর হাঁটা ভারী শক্ত। সরুসরু বেতের মতো গাছপালা ছিপটির মতো গায়ে লাগে, কাটায় হাত-পা ছড়ে যায়, পিঁপড়ে আর নানা পোকামাকড়ের কামড় তো আছেই। কিন্তু উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে এসব তুচ্ছ অসুবিধেকে গ্রাহ্যই করছিল না সে। ভয়ভয় করছে, বুকের ভিতর গুড়গুড় করছে, তেঁদা পাচ্ছে। বিস্তর শামুক, দু’তিনটে কচ্ছপ আর কয়েকটা ধূত শেয়াল ছাড়া আর কারও দেখা পেল না সে। তবে চিন্তা নেই। সে ফের জল পেরিয়ে কুসুমপুরের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

কুসুমপুরের জঙ্গলে আগে বাঘের আস্তানা ছিল। এখন বাঘের কথা শোনা যায় না। তবে বনবেড়াল, ভাম, বাঘডাশা, দু’চারটে হায়না, শেয়াল বা সাপখোপ আছে বটে। তাদের তেমন গ্রাহ্য না করলেও চলে। খুব সাবধানে চারদিকে নজর রাখতে রাখতে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটা ধরল গনা।

“লটকাবাবু, একবারটি কি আপনার দেখা পাওয়া যাবে?”

“লটকাবাবু কি এখন বাড়িতে আছেন?”

“লটকাবাবু কি এখন দুপুরে চাট্টি খেয়ে একটু ভাতঘুম ঘুমোচ্ছেন?”

“আজ্ঞে, আমি হলুম গে গনা, একবার কি একটু পায়ের ধুলো পাওয়া যাবে?”

“লটকাবাবু, দয়া করে কুপিত হবেন না, একটু দর্শন দিলে বড় ভাল হয়।”

এই করতে করতে জঙ্গলের মধ্যে বিস্তর ঘুরপাক খেল গনা। কোথাও লটকাবাবুর কোনও চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না। একটু কাশির শব্দ, একটু গলা খাঁকারি কিংবা একটু টেকুর তোলার শব্দ, কি চটিজুতোর আওয়াজ কিছু একটা তো শোনা যাবে! ভারী লাতন হয়ে পড়ল গনা। তা হলে কি লটকাবাবু নেই! নিজের গ্রহে ফিরে গেলেন কি! নাকি কোনও বিষয়কর্মে বেরিয়েছেন, সময়মতো ফিরবেন! যদি থেকেই থাকেন তা হলে তাঁর রকেট বা মহাকাশযানটাই বা কোথায় গেল?

ঘুরতে ঘুরতে হয়রান হয়ে গনা একটু জিরোনোর জন্য একটা মস্ত বটগাছের তলায় বসল। জঙ্গল ভারী ভাল জায়গা, নিরিবিলিতে বসে চিন্তাভাবনা করা যায়। আর এখন চিন্তাভাবনা করাটো তার খুব দরকার। লটকাবাবুকে না পাওয়া গেলে তার পুনর্মুখিক হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। ঝিকু বিশ্বাস তাকে ধোঁকা দেয়নি তো! ভূতপ্রেতকে বিশ্বাসই বা কী! এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে দুটো চোখ নিজের অজান্তেই লেগে এল তার। বেলা পড়ে আসছে, অন্ধকার হওয়ার আগেই ফেরা দরকার, এসব জানা সত্ত্বেও হয়রান শরীরে ঘুমটাকে অটিকাতে পারল না গনা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা স্বপ্নও দেখে ফেলল সে। দেখল, একটা বাড়িতে সে চুরি করতে গেছে। গিয়ে দেখে গেরস্ত ভদ্রলোক গিলে করা পাঞ্জাবি আর কোঁটানো ধুতি পরে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ভারী বিগলিত মুখ। তাকে দেখেই হাতজোড় করে বললেন, কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! এতদিনে আমার বাড়িটা আপনার চোখে পড়ল! আসুন আসুন, এই নিন আলমারির চাবি, হচ্ছেমতো চুরি করুন তো মশাই, প্রাণভরে দেখি। ওং কতকাল আপনার পথ চেয়ে বসে আছি, এই এতদিনে বুঝি আপনার সময় হল! ওমনি উল্টোদিকের বাড়ি থেকে আর একজন হাঁকে বলে উঠলেন, না না হরেন, এটা তো ঠিক হচ্ছে না হে! আমি বয়সে তোমার চেয়ে সিনিয়র, উনি আমার বাড়ি ছেড়ে তোমার বাড়িতে আগে যাবেন কেন? আমিও যে চাবির গোছা হাতে নিয়ে ওঁর পথ চেয়েই এতদিন বসে আছি! আর এ কথা কে না জানে যে, আমার বাড়িতে তোমার বাড়ির চেয়ে অনেক বেশি সোনাদানা আছে। উনি আমার বাড়িটা আগে সেরে নিন তারপর না-হয় তোমার বাড়িতেও একবার টু মারবেন! তখন প্রথম গেরস্ত আত্নাদ করে উঠলেন, না না বিজয়বাবু, তা হয় না। আমার স্ত্রী যে উনি আসবেন বলে নলেন গুড়ের পায়ের অবধি রান্না করে রেখেছেন! এমন সময়ে পাশের বাড়ি থেকে আরও একজন লোক ব্যস্তমস্ত হয়ে

বেরিয়ে এসে বললেন, আরে রাখো তোমার পায়ের, আমার বউ তো গুঁর জন্য পোলাও আর পাঁটার মাংস সেই সন্ধেবেলায় রন্ধেবেড়ে বসে আছেন, সঙ্গে আশি ভরি গননার পোঁটলা আর নতুন নোটো এক লাখ কড়কড়ে ঢাকা! আমার ছেলেমেয়েরা তো গুঁর চুরি করা দেখবে বলে রাত জেগে বসে আছে! এইভাবে তিনজনের একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠতে না-উঠতেই অন্য সব বাড়ির দরজা খুলে আরও সব গেরস্ত বেরিয়ে আসতে লাগলেন, ইনি বলেন ‘আমার বাড়ি আগে’, উনি বলেন ‘আমার বাড়ি আগে’। ফলে একটা বিশাল হাঙ্গামা চিল্লা আর গোলমাল পাকিয়ে উঠল। হাতাহাতি লাগার জোঁগাড়া! গনা ভারী ফাঁপরে পড়ে গেল। ঠিক এই সময়ে পেটে একটা খোঁচা খেয়ে ঘুমটা না ভেঙে গেলে গনার ভারী মুশকিল ছিল।

সোজা হয়ে বসে গনা দেখল, চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, তার ওপর ঘন কুয়াশা আর বেজায় শীত। আজকের পেরাসনিটা বৃথাই গেল ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল গনা। এমন সময়ে দেখতে পেল সামনের অন্ধকারে বাতাসের ভেতর একটা সাদা টুপি ভেসে আছে। খুব ঠাণ্ডা করে দেখল গনা। আশ্চর্যের বিষয়, টুপির নীচে কোনও মাথা বা মুখ দেখা যাচ্ছে না! অথচ নিয়মমতো টুপির নীচে একটা মাথা বা মুখ থাকার কথা। তবে কি গনা ভুলভাল দেখছে? তার ঘুম কি এখনও ভাল করে ভাঙেনি!

একটু ভড়কে গিয়ে গনা কাঁপা গলায় বলে, “আজ্ঞে, আপনার আগাপাশতলা কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি না। অন্তত চরণ দু’খানার দেখা পেলেও হত, একটু পায়ের ধুলা নিতুম আর কী।”

টুপি কোনও জবাব দিল না। যেমন ভেসে ছিল তেমনই ভেসে রইল। গনা সিঁটিয়ে বসে রইল, নড়াচড়া করারও সাহস হল না। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল, টুপির নীচে মুখ নেই বটে, তবে যেন দুটো অদৃশ্য চোখ তাকে কয়ে মাপজোখ করছে। তারপর হঠাৎ টুপিটা আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেল। কেউ বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে যেমনটা হয়। যেখানে থামল সেটা বেশ অনেকটাই ওপরে। একজন প্রমাণ সাইজের মানুষের মাথা যেখানে থাকা উচিত তারও প্রায় দেড় হাত ওপরে। এলিয়েনবাবু ইচ্ছাধারী মানুষই হবেন বোধহয়, যখন-তখন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন। আর এলিয়েনবাবু যে বেজায় লম্বা তা বুঝতে গনার বেশি মাথা ঘামাতে হল না। এত লম্বা লোক কখনও দেখেনি গনা। তার ওপর যদি সেই অনুপাতে চওড়াও হয়ে থাকেন, তা হলে বলতে হবে এলিয়েনবাবু বেশ দশাসই মানুষ। শ্রদ্ধায় চোখে প্রায় জল এসে গেল গনার, এরকম লম্বাচওড়া না হলে কি এলিয়েনবাবুদের মানায়? এঁরা দশাসই হবেন না তো কি তার মতো মর্কট হবেন?

সে গদগদ হয়ে হাতজোড় করে বলে, “এই পোড়া চক্ষু একবার কি দর্শন পাব না? শ্রীচরণে কিছু কথাও নিবেদন করার ছিল কিনা!”

কোনও জবাব এল না। তবে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হঠাৎ একটা উত্তুরে বাতাস হুহু করে বয়ে গেল। সেই বাতাসটাই যেন গনার কানে-কানে বলে গেল, বাড়ি যাও— বাড়ি যাও—

টুপিটা কখন যে গায়েব হয়ে গেল তা ঠিক ঠাণ্ডা করতে পারল না গনা। এই ছিল, এই নেই!

দুই

তিনতলার জানালার পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল ইগল। রাত এখন নিশুত। আজ রাতেই এই পাগলাগারদ থেকে তাকে পালাতে হবে। এই নরকে আর নয়। সে বহুবীর এদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, সে পাগল নয়, স্মৃতিভ্রষ্ট মাত্র। কিন্তু সেই কথা কেউ কানেই তোলেনি। তাকে নাকি তারই বাড়ির লোক পাগল বলে এখানে ভর্তি করে দিয়ে গেছে। কে তার বাড়ির লোক তা জানে না ইগল। মা বাবা ভাই বোন কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর মুখ তার মনে পড়ে না। কোথায় বাড়ি তাও তার মনে নেই। গত দু’বছরে কেউ তাকে এই পাগলা গারদে দেখতে আসেনি বা খোঁজও নেয়নি। এখানে চিকিৎসার নামে যা হয় তা সহ্য হয় না ইগলের। কখনও

ইলেকট্রিক শক, কখনও ঘুমের ওষুধ, কখনও মারধর। খাওয়াদাওয়া খুব খারাপ। তার প্রায় রোজই মনে হয় এত সব পাগলের সঙ্গে থাকতে থাকতে সেও একদিন ঠিক পাগল হয়ে যাবে।

তার ওপর আছে খুব ঠান্ডা মাথার এক শয়তান। তার নাম হারু কুণ্ডু, ওয়ার্ডেন। সর্বদা হাসিমুখ, চিংকার চোঁচামেচি করে না, হাতে একটা দু’আড়াই ফুট লম্বা রবারের হোস নিয়ে ঘুরে বেড়ায় শুধু। কেউ সামান্য একটু বেয়াদবি করলেই হোসটা দিয়ে এমন নৃশংস ভাবে পেটায় যে, চোখে দেখা যায় না। তা ছাড়া সে রুটিন করেও পেটায়। সপ্তাহের এক-একদিন কয়েকজনের পালা পড়ে। তাদের কমনরুমে নিয়ে গিয়ে পেটানো হয়। হারুর বন্ধমূল ধারণা মারের ওপর ওষুধ নেই। পাগলকে মারলে তো আর পাগল ভাল হয়ে যাবে না, বরং চোঁচাবে, আত্নাদ করবে। কিন্তু ওটাই হারুর আনন্দ। সে নিজেও হারুর হাতে বিস্তর হোসের বাড়ি খেয়েছে। সেটা এত জোরে লাগে যে, চোখ অন্ধকার হয়ে আসে। যেখানে লাগে সেখানটা জ্বালা করে লাল হয়ে যায়, তারপর কালশিটে পড়ে। এই গারদের প্রত্যেকটা পাগলের গায়ে অজস্র কালশিটে।

তার ঘরের একজন রুমমেট, অর্থাৎ পাগল মহেন্দ্র এখন ঘুমোচ্ছে। ও এমনিতে ঘুমোয় না, ওকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়। ইনজেকশন না দিলে সারা রাত আকাশ বাতাসের সঙ্গে কথা কয়ে যায়, যার কোনও মাথামুড় নেই। ইগলকেও আগে ইনজেকশন দেওয়া হত, আজকাল হয় না, তার স্বাভাবিক ঘুম হয় বলে।

জানালাটায় গ্লিল আছে। দু’মাস আগে কিছু মিস্তিরি এসেছিল মেরামতির কাজ করতে। তখনই ইগল ওই মিস্তিরিদের যন্ত্রপাতি থেকে একটা স্ক্রু ড্রাইভার সরিয়ে ফেলেছিল। তাতে মিস্তিরিরা হইচই করেছিল বটে, কিন্তু তাকে সন্দেহ করা হয়নি। কারণ সে এইসব পাগলের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত আর বাধ্য। সে স্ক্রু ড্রাইভারটা সুপারের অফিসঘরে যে-বইয়ের আলমারিটা আছে তার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। সে জানে, এই গারদে বইয়ের আলমারিটা কখনও কেউ খোলে না। বইয়ের আলমারি রাখার নিয়ম আছে বলে ওটা রাখা আছে, কিন্তু কন্সিনকালেও কেউ কোনও বইটাই পড়ে না। তাই স্ক্রু ড্রাইভারটাও নিরাপদে ছিল, কেউ খুঁজে পায়নি। অসীম ধৈর্যে সে গত একমাস ধরে গভীর রাতে গ্লিলের স্ক্রু একটা একটা করে খুলেছে। আজ শেষ স্ক্রুটা একটু আগেই খুলে ফেলেছে সে। এখন গ্লিলটা সহজেই আলগা করা যাবে। তবে তারপরও বিপদ আছে। জানালা দিয়ে বেরিয়ে প্রথমে এই পুরনো বুরবুরে বাড়ির নীচের কার্নিসে নামতে হবে। কার্নিস যদি তার ভার নিতে না পারে তবে হুড়মুড় করে নীচে পড়বে সে, আর তাতে শুধু চোটই হবে না, ধরাও পড়ে যাবে। কার্নিশে নামবার পরও বিপদ বড় কম নেই। কাছাকাছি যে-আমগাছটা আছে তার একটা বাড়িয়ে দেওয়া ডাল ধরে বুল খেয়ে তারপর ওই গাছ বেয়েই নামতে হবে। আর পথ নেই। একতলায় এখানকার কাজের লোক আর ওয়ার্ডেনরা থাকে, তারা অনেক রাত অবধি জেগে তাসটাস খেলে। দোতলায় অন্য সব পাগলদের ঘর। কাজেই পালাতে হলে তিনতলাই সবচেয়ে ভাল।

গাছের ডালটা নিয়েই ভাবছিল ইগল। ওটাই তার লাইফলাইন। কিন্তু গাছের ডালটা নাগালের মধ্যে নয়। কার্নিস থেকে লাফ মেরে ডালটা ধরতে হবে। ফস্কালে সমুহ বিপদ। তবে গত দু’মাস ধরে অনেক ক্যালকুলেশন করে রেখেছে সে। সে বেশ লম্বা, আর তার স্বাস্থ্যও মোটামুটি ভাল। তবে এখানকার যাচ্ছেতাই খাবার খেয়েথেকে তার শরীরে ততটা শক্তি নেই আর। কিন্তু পালাতে হলে এটুকু ঝুঁকি না নিলেও নয়।

মহেন্দ্রর নাক ডাকছে। ও জেগে গেলেও বিপদ নেই। পরিস্থিতি অনুধাবন করতে মহেন্দ্রর অনেকটা সময় লাগে। বাইরে অবশ্য দু’জন পাহারাদার আছে। তবে পাগলা গারদ তো আর জেলখানা নয়, তাই পাহারার তেমন কড়াকড়ি না থাকারই কথা। তবু সাবধানের মার নেই। ধরা পড়লে কপালে দুঃখ আছে।

গ্লিলটা খুব সাবধানে আলগা করল সে। তারপর সেটা নামিয়ে ঘরের দেয়ালের সঙ্গে ঠেসান দিয়ে রেখে দিল আস্তে করে। জানালা উপকানোর

আগে সে একবার পিছন ফিরে তার দু'বছরের আন্তানার দিকে তাকাল। এই গারদের সুপার একজন বয়স্ক মহিলা, ইন্দুমতী সেন। তিনি এখানে থাকেন না, বাড়ি থেকে আসা-যাওয়া করেন। একমাত্র তাঁকে দেখলেই একটু মায়ের মতো লাগে ইগলের। ইন্দুমতী কাউকে কখনও একটা কড়া কথাও বলেন না। সকলের সঙ্গেই ভারী ভাল ব্যবহার। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে নিজের খরচে খাবার এনে সবাইকে খাওয়ান। এই গারদে তাঁকে যেন মানায় না। এখান থেকে পালিয়ে গেলে ইগলের একমাত্র গুঁর কথাই মনে পড়বে। ইন্দুমতী সেনই একমাত্র মানুষ যিনি ইগলকে একাধিকবার বলেছেন, তুমি যে কেন এখানে আছ তা বুঝি না। তুমি তো বাবা পাগল-টাগল নও। দিব্যি ভালমানুষ! কিন্তু এখানে সরকারি নিয়মকানুন এত কড়া যে, ছাড়তেও পারছি না। ইন্দুমতীই তাকে খাতা খুলে দেখিয়েছেন, তাকে এখানে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন চতুর্ভুজ রায় নামে একজন, সম্পর্কে বড় ভাই। কিন্তু চতুর্ভুজ রায় নামে কাউকে মনে পড়েনি ইগলের। বাহিরগঞ্জ বলে একটা জায়গার ঠিকানাও দিয়ে গেছে চতুর্ভুজ রায়। এরকম কোনও জায়গার কথা ইগলের অবশ্য মনেও পড়েনি।

আর দেরি করাটা ঠিক হবে না। ইগল জানালার চৌখুপিতে উঠে সাবধানে শরীরটা নীচে নামিয়ে দিল। কিন্তু বুল খেয়েও নীচের কার্নিসটা পায়ের নাগালে পেল না। অগত্যা লাফ দিয়ে কার্নিসটায় পড়ল সে। কপাল ভাল, কার্নিসটা পুরনো হলেও তার ভার সামলে নিল। এই শীতেও তার পরনে ফতুয়া, একটা সস্তা পুলওভার আর পায়জামা, যেটা এই পাগলা গারদের পেটেন্ট পোশাক। পায়ের জুতো নেই। এরা একজোড়া হাওয়াই চটি দিয়েছে বটে, কিন্তু সেটা পালানোর পক্ষে উপযুক্ত জিনিস নয়। তার চেয়ে খালি পা ভাল। কার্নিসে দাঁড়িয়ে সে আমগাছটার বাড়ানো ডালটাকে লক্ষ করল। অন্তত তিন-চার ফুট দূরে। তবে অসাধ্য নয়। লাফটার ওপর সব নির্ভর করছে। ফস্ফালে তিনতলা থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙবে। ধরাও পড়তে হবে। একটা সুবিধে হল, ডালটা একটু নিচুতে। নাগাল পাওয়া খুব শক্ত নয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বুক ভরে বারকয়েক বড় বড় শ্বাসে দম নিল সে, তারপর একটু কোলকুঁজে হয়ে লাফটা মারল। ডান হাতটা ফস্ফে গেল বটে, কিন্তু বাঁ হাতে ডালটা ধরে ফেলতে পারল সে। তবে ঝাঁকুনির চোটে হাতখানা ছিঁড়ে যাওয়ার জোগাড়। পট করে ডান হাতেও ডালটা সাপটে ধরে বুল খেয়ে রইল খানিক। ডালপালায় একটু হুড়মুড় শব্দ হয়েছে, কেউ টের পেল না তো! একটু চুপ করে বুলে রইল সে। তারপর বুল খেয়ে খেয়ে এগিয়ে গিয়ে মূল কাণ্ডের কাছে পৌঁছে ফের একটু জিরেন নিতে হল তাকে। আসল বাধাটা টপকানো গেছে। সম্ভবত একটা কাকের বাসায় হাত পড়ে গেছে, তাই একটা কাক তারস্বরে চৈঁচাচ্ছিল। একটু অপেক্ষা করে ধীরেসুস্থে নেমে এল ইগল। শিশিরে ভেজা ঘাসে পা দিয়ে শীত করে উঠল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে একটা মুক্তির আনন্দও হচ্ছিল। একটুখানি ঘাসজমি পেরিয়ে সে ঘের পাঁচিলটার সামনে পৌঁছে গেল।

পাঁচিলটা ছয় বা সাড়ে ছয় ফুট উঁচু, ডিঙনো একেবারেই শক্ত নয়। কিন্তু ইগল লক্ষ করেছে পিছনের পাড়ায় রাতে নাইটগার্ড পাহারা দেয়। রাত দশটার পর এই রাস্তায় নাইটগার্ডদের হুইসল-এর শব্দ শুনেছে এবং টর্চের আলো দেখেছে সে। তারা যদি এই রাত দুটোর সময় তাকে দেওয়াল ডিঙোতে দেখে তা হলে চোর বলে পাকড়াও করবে। তার ওপর আবার তার গায়ে পাগলাগারদের মার্কামারা পোশাক। সুতরাং দেওয়াল ডিঙোনোর আগে হাতের ভর দিয়ে উঠে মুখ বাড়িয়ে ও পৃথিবীর রাস্তাটা দেখে নিল সে। না, কেউ নেই। একটু আগেই একজন গার্ড হুইসল বাজিয়ে ডান থেকে বাঁ দিকে গেছে। সুতরাং সে হাতের ভর দিয়ে দিব্যি দেওয়ালে উঠে পড়ল এবং অনায়াসে লাফিয়ে মুক্ত পৃথিবীতে পা রাখল। রাস্তার ধারে গাছপালা আছে, সুতরাং আড়ালের অভাব নেই। লোক দেখলেই গা ঢাকা দেওয়া যাবে।

এই শহরটা তার চেনা নয়। গত দু'বছরে তাদের গারদ থেকে বেরোতে দেওয়া হয়নি। সকাল-বিকলে কম্পাউন্ডের মধ্যেই একটু হাঁটাচলা ছাড়া আর কোনও স্বাধীনতা ছিল না। তাই অচেনা রাস্তায় কোথায় যাবে তা

ভাবছিল সে। এই শহরে কি রেলস্টেশন আছে? তা হলে রেলস্টেশনে গিয়ে বসে থাকা যায়। ট্রেন এলে উঠেও পড়তে পারে। তার যখন কোনও গন্তব্য নেই তখন যেখানে খুশি গেলেই হয়, শুধু ওই পাগলাগারদটা থেকে যতদূরে যাওয়া যায় ততই তার পক্ষে ভাল। কিন্তু স্টেশন কোন দিকে তা তার জানা নেই। সুতরাং সে হারা উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগল।

খানিকক্ষণ হেঁটে তার মনে হল, শুধুমুদু শরীরকে হয়রান করছে সে। সকাল না হলে জায়গাটার আন্দাজ পাওয়া যাবে না। তাই এখন তার কোথাও বসে একটু অপেক্ষা করা উচিত। সে যে পালিয়েছে সেটা পাগলাগারদের লোকেরা সকালের আগে টের পাবে না। সুতরাং ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।

একটু হেঁটে যাওয়ার পর বাঁ দিকে একটা স্কুলবাড়ি দেখতে পেল সে। স্কুলবাড়িতে অবশ্য দারোয়ান থাকবে। ঢোকা যাবে না। তবে বন্ধ ফটকের বাইরের দিকটায় দু'দিকে দুটো রক আছে। ইগল আর ভাবনাচিন্তা না করে সোজা গিয়ে একটা রকে শুয়ে পড়ল। গাছ বেয়ে, লাফকাঁপ দিয়ে এবং পালানোর উত্তেজনায় তার এখন শরীর এলিয়ে আসছে। একটু জিরানো দরকার। রকের ওপর শুয়ে হাতে মাথা রেখে শরীরটা ছেড়ে দিতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সবে সকাল হয়েছে। রাঙা রোদ পড়েছে তার গায়ে। রাস্তায় লোকজন দেখা যাচ্ছে দু'চারজন। ইগলের ভয় হচ্ছে তার পোশাকটা নিয়ে। এটা যে পাগলাগারদের পোশাক সেটা লোকে বুঝতে পারলে বিপদে পড়তে হবে। তার ওপর তার চুল আর দাড়ি দুটোই বড় হয়েছে, অনেকদিন নখ কাটা হয়নি। ফলে তার চেহারাটা বোধহয় এখন বেশ সন্দেহজনক! প্রকাশ্য দিবালোকে গা ঢাকা দেওয়াও তো কঠিন! তার ওপর এখন তার খিদে পাচ্ছে, তেষ্টা পাচ্ছে। তার পকেটে পয়সা নেই, আর এটা অচেনা শহর। তবে হঠাৎ তার মনে পড়ল, সব শহরেই মন্দির-টম্দির থাকে। আর মন্দির মোটামুটি নিরাপদ জায়গা, সেখানে প্রসাদ-টসাদ পাওয়া যেতে পারে, আর তেষ্টার জলও।

একটা লোক ঝুড়িতে কয়েকটা লাউ নিয়ে বোধহয় বিক্রি করতেই যাচ্ছিল, ইগল উঠে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, “আচ্ছা, এখানে মন্দির কোথায় আছে জানেন?”

লোকটা বিরক্ত মুখে বলে, “এখানে তো মেলাই মন্দির বাপু! তা তুমি কোন মন্দির খুঁজছ?”

“আজ্ঞে, কালীমন্দির নেই?”

“তা থাকবে না কেন? এই নাক বরাবর সোজা গিয়ে তেমাথার মোড় থেকে ডাইনের রাস্তা ধরলে কালীমন্দির পেয়ে যাবে। তবে এত সকালে তো খোলে না বাপু!”

একটু দমে গিয়ে ইগল বলে, “আসলে আমার মনটা খুব খারাপ। যে-কোনও মন্দিরে গিয়ে একটু বসলে হয়তো একটু শান্তি পাবা।”

কে জানে কেন, তার এই কথাটা লোকটার মনে ধরল। একটু নরম হয়ে বলে, “তাই বলা। তা মনের ভালমন্দ তো সকলেরই আছে! তা হলে বাপু, সোজা যাও, গিয়ে থানা পেরিয়ে কয়েক কদম গেলেই বাঁদিকে সিদ্দিনাথের মন্দির পাবে। বড় ভাল জায়গা। সকালে আরতি হয়। মন ঠান্ডা হবে।”

লোকটা তার লাউ নিয়ে চলে যাওয়ার পর ইগল ধীরেসুস্থে রওনা হল। থানা পেরিয়ে একটু এগোতেই বাগানে ঘেরা চমৎকার পাখরের মন্দিরটা দেখতে পেল সে। ফটক খুলে ভিতরে ঢুকে মনটা সত্যিই ঠান্ডা হয়ে গেল। ভিতরের পরিসরটা নানা গাছগাছালিতে ছাওয়া। মন্দিরের সামনে মস্ত বাঁধানো চাতাল। ফুল আর ধূপধূনোর গন্ধে চারদিক ম'ম' করছে। ভিতরে ঘণ্টাধ্বনিও শুনতে পেল সে। তার মানে আরতি হচ্ছে। একজন বয়স্ক লোক লম্বা পাইপ দিয়ে বাগানের গাছগাছালিতে জল দিচ্ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করতেই মন্দিরের চাতালের পাশে জলের কল দেখিয়ে দিল। সম্ভবত ভক্তরা মন্দিরে ঢোকানোর আগে এখানে হাত-পা ধুয়ে নেয়। শীতকালে কলের জল কনকনে ঠান্ডা, তবু ইগল যৌতযৌত করে পেট পুরে জল খেল। জলে খিদেতেষ্টা দুটোই জন্ম হয়, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য।

ইগল জানে না সে নাস্তিক না আস্তিক। মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে সে খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল, মস্ত সিংহাসনের ওপর পেতলের একটি বড় শিবের মূর্তি। আসনপিঁড়ি হয়ে বসা, মাথায় জটা, গলায় সাপ। প্রণাম করা উচিত কি না সে বুঝতে পারছিল না। সে কি ভগবান মানে? একটু দোনোমানো করে অবশেষে সে হাতজোড় করে একটা দায়সারা প্রণাম করেই ফেলল। গরদ বা শুদ্ধবস্ত্র পরা বয়স্ক এক পুরুতমশাই আরতি করছিলেন। দরজার বাইরে বসে সেটা একটু দেখল সে। তার জামাকাপড় নোংরা এবং বাসি, গায়েও যথেষ্ট ময়লা জমে আছে। কতকাল ভাল করে স্নান করা হয়নি! এই অবস্থায় বোধহয় মন্দির-টন্দিরে ঢুকতে নেই! তাই সে আবার নেমে এসে বাঁধানো চাতালটার একধারে চুপ করে বসে রইল। গায়ে রোদের আরামদায়ক ওম লাগছিল।

তার সামনে কোনও গন্তব্য নেই, পকেটে পয়সা নেই, মাথায় কোনও স্মৃতি নেই, তার ওপর সে একজন পলাতক। তাই এরপর কী করবে তা বুঝতে পারছিল না ইগল। লম্বা হাতটা বাড়িয়ে একটা ঘাসের ডগা তুলে এনে আপনমনে চিবোতে লাগল সে।

একটু বাদে পুরুতমশাই নেমে এলেন। ইগল উঠে দাঁড়িয়ে একটা নমস্কার করে বলল, “ঠাকুরমশাই, আমার বড় খিদে পেয়েছে। একটু প্রসাদ কি পাওয়া যাবে?”

মধ্যবয়স্ক, ফর্সা এবং ভালমানুষের মতো দেখতে পুরুতমশাই তার দিকে বিম্মিত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, “তোমার এমন অবস্থা কেন বাবা? তোমাকে দেখে তো ভাল ঘরের ছেলে বলে মনে হয়!”

ইগল কী বলবে তা ভেবে না পেয়ে বলল, “আমি একটু বিপদে পড়েছি কিনা!”

“বুঝতে পেরেছি বাবা। বোসো, আমি তোমার জন্য প্রসাদ নিয়ে আসছি।”

পুরুতমশাই আবার ওপরে উঠে গেলেন, একটু বাদে দুটো শালপাতার বড় ঠোঙা নিয়ে নেমে এলেন। একটা ঠোঙায় গোটা চারেক সন্দেশ, দুটো কদমা, দুটো লাড্ডু, কয়েকটা বাতাসা আর এক খাবলা মিহিদানা। আর একটা ঠোঙায় কলা, কমলালেবু, শসা, কয়েকটা আঙুর আর মুসুম্বি লেবুর টুকরো। এত ভাল আর এত বেশি পরিমাণের খাদ্যবস্তু বহুকাল দেখেনি ইগল। কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল আসার জোগাড়।

পুরুতমশাই সম্মেহে বললেন, “তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি যে, তোমার খুব খিদে পেয়েছে। খাও বাবা, নিশ্চিন্তে বসে খাও। এখানে একটু বিশ্রামও নিতে পারো।”

ইগল বহুকাল পরে পেট ভরে খেল। এত স্বাদের খাবার বহুকাল খায়নি সে। কোনওকালে খেয়েছে কি না তাও মনে পড়ে না।

চাতালের মিঠে রোদে বসে সিঁড়ির নীচের পিলারটায় হেলান দিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ আবার একটু লেগে এসেছিল। হঠাৎ কে যেন তাকে একটা নাড়া দিয়ে ধমকে উঠল, “এই! তুমি কে বলো তো! এখানে বসে আছ কেন?”

ইগল চোখ চেয়ে দেখল, তার সামনে চার-পাঁচটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। হাবভাব একটু মারমুখো। গুন্ডা মস্তানও হতে পারে। সে একটু ভয় খেয়ে বলল, “ঠাকুরমশাই আমাকে বসতে বলে গিয়েছেন, তাই একটু বসে আছি।”

“ঠাকুরমশাই কি তোমাকে চেনেন? তুমি তার কে হও?”

ইগল মাথা নেড়ে বলল, “আমি ঠাকুরমশাইয়ের কেউ হই না। একটু জিরোতে এসেছিলাম।”

কালো এবং যগু চোহারার একটা ছেলে একটু এগিয়ে এসে গম্ভীর গলায় বলে, “তোমাকে তো এই টাউনে আগে কখনও দেখিনি! কোথা থেকে উদয় হলে বাপ? চোহারা দেখে তো স্মাগলার বা অ্যান্টিসোশাল মনে হচ্ছে!”

ইগল প্রমাদ গুনল। তার পোশাক বা চোহারার যা শ্রী হয়েছে, তাতে লোকের এরকম সন্দেহ হতেই পারে। সে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, “আমি ওসব নই। বিশ্বাস করুন।”

আর একজন চোয়াড়ে চোহারার ছোকরা বলে উঠল, “দু’ঘা দিলেই

পেট থেকে আসল কথা বেরোবে। মনে হচ্ছে জেল থেকে পালিয়ে এসেছে!”

ইগল বুঝল, তার বলার মতো কথা কিছুই নেই। কী বললে ভাল হয় তা সে বুঝে উঠতে পারছে না। সে হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে খুব নরম গলায় বলল, “আপনারা তা হলে আমাকে মারুন।”

এই কথায় ছেলেগুলো একটু থমকে গেল। নিজেদের মধ্যে নিচুস্বরে কী একটু বলাবলি করে নিল। তারপর ওদের মধ্যে বয়সে বড় ছেলেটি বলল, “সেই ভাল, একে ক্লাবঘরে নিয়ে চল। তখন বোঝা যাবে।”

প্রকাশ্যে না মেরে হয়তো ক্লাবঘরে নিয়ে মারবে, এরকমই মনে হল ইগলের। মারধরকে তার বিশেষ ভয় নেই। মারধর তাকে প্রায় রোজই সহ্য করতে হয়। ভয় হল, এরা না আবার তাকে পাগলাগারদে ফেরত নিয়ে যায়!

ক্লাবঘরটা আসলে একটা জিমনাসিয়াম। মন্দির থেকে একটু দূরে। মিনিট তিনেকের হাঁটাপথ। ছেলেগুলো একরকম ঘেরাও করে তাকে নিয়ে গিয়ে তাদের ক্লাবঘরের একটা বেঞ্চে বসাল। ইগল ক্লাবঘরটা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল। আশ্চর্য এই যে, জিমনাসিয়ামের যন্ত্রপাতিগুলো তার ভারী চেনা। ছাদের সিলিং থেকে রিং বুলে আছে, একদিকে প্যারালাল বার, আর এক পাশে প্লাস্টিক শিটের ওপর বারবেল সাজিয়ে রাখা, কজির ব্যায়ামের জন্য একসারসাইজার, ঘুষি মারার জন্য পাশিৎ ব্যাগ সবই তার ভীষণ পরিচিত।

ছেলেগুলো কোথা থেকে একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সি স্বাস্থ্যবান লোককে ডেকে নিয়ে এল। তার যেমন দশাসই চেহারা তেমনি চোমরানো মোচ। তাকে বিশুদা বলে ডাকছিল সবাই। সেই কালো ছেলেটা বলল, “দেখুন তো বিশুদা, এই ছেলেটাই নাকি!”

বিশু নামক লোকটি তাকে আপদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, “না, এ নয়। একে কোথায় পেলি তোরা?”

“সিদ্ধিনাথ মন্দিরে বসে ছিল।”

বিশু তার দিকে চেয়ে বলল, “তোমার নাম কী হে?”

“ইগল রায়।”

“ইগল! বলো কী হে! ছদ্মনাম ধরেছ নাকি?”

সবাই অল্পবিস্তর হাসছে তার ইগল নাম শুনে।

ইগল মাথা নেড়ে বলে, “আমি তো আমার নাম ইগল বলেই জানি। ছদ্মনাম হবে কেন?”

“তোমাকে তো এই শহরের ছেলে বলে মনে হচ্ছে না! কোথায় বাড়ি?”

ইগল তার ডান হাতের তর্জনী নিজের মাথায় ঠেকিয়ে বলল, “জানি না। মেমরি লস।”

লোকটা খুব অবাক হয়ে বলে, “মেমরি লস! ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি! মেমরি লস বললেই কি ছাড়া পাবে ভেবেছ! ওসব চালাকি আমার জানা আছে।”

ইগল খুব হতাশ গলায় বলে, “আমার সত্যিই কিছু মনে পড়ছে না। মা বাবা বাড়িঘর কিছু না। এমন কি ইগল নামটাও আমার আসল নাম কিনা তাও বলতে পারব না।”

“তা হলে এই শহরে কী করে এসে জুটলে চাঁদু?”

সে যে পাগলাগারদে ছিল সেই কথাটা এদের বলা যাবে না। তাই সে অল্পনবদনে একটা মিথ্যে কথা বলল, “আমি কোথা থেকে যেন ট্রেনে চেপে চলে এসেছি। কী করব, কোথায় যাব তা জানি না।”

“কোথা থেকে এসেছ তা মনে নেই?”

মাথা নেড়ে ইগল বলে, “না, মনে পড়ছে না।”

বিশু আচমকা ডান হাতে তার বাঁ গালে ঠাসিয়ে একটা চড় কষাল, যাতে শব্দটা হল বজ্রপাতের মতো। তারপর বলল, “এবার মনে পড়ছে?”

পৃথিবীতে হারু কুণ্ডুর মতো অনেক লোক আছে যারা মারধরে খুব বিশ্বাসী। হঠাৎ চড়টা খেয়ে ইগল প্রায় পড়েই যাচ্ছিল বেঞ্চ থেকে। কিন্তু সামলে নিল। লোকটার গায়ে জোর আছে। সম্ভবত ব্যায়ামবীর। তার গালটা চড়ের দাপটে জ্বালা করছে। সে খুব নরম গলাতেই বলল, “সত্যিই



বলছি, আমার কিছু মনে পড়ছে না। আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে আরও মারতে পারেন।”

লোকটা হাঁ করে অবাক হয়ে তার দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, “জোশ আছে দেখছি! আমার চড় খেয়েও বসে থাকতে পারা তো কম কথা নয়! গালে একবার হাতও বোলালে না দেখছি! তার মানে তুমি গভীরতর জলের মাছ!”

ইগল এবার তার চারপাশে তাকিয়ে দেখল, ছেলেগুলো তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে, এদের হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই। অসহায় মুখে সে শুধু বলে, “আমি ওরকম নই।”

বিশু এবার অন্যদের দিকে চেয়ে বলল, “একে প্যারালাল বারের সঙ্গে ভাল করে বেঁধে রাখ। আমি থানায় খবর দিচ্ছি। শহরে চুরি ছিনতাই ডাকাতি ভীষণ বেড়েছে। এই ছোকরাকে আমার সুবিধের লোক বলে মনে হচ্ছে না। জঙ্গি বা ফেরারি আসামীও হতে পারে। পুলিশের হাতেই দেওয়া ভাল। তোরা কী বলিস?”

সবাই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, “সেটাই ভাল হবে বিশুদা।”

শুধু একটা পুঁচকে রোগা আর ফর্সামতো ছেলে বলে উঠল, “একে দেখে কিন্তু আমার খুব খারাপ লোক বলে মনে হচ্ছে না বিশুদা। টেম্পোরারি ডিমেনশিয়া হতেও পারে।”

বিশু ছেলেটার দিকে চেয়ে বলে, “তোরা বাবা ডাক্তার বলে খুব পণ্ডিত হয়ে গেছিস নাকি! গতকাল আমার বোনের ব্যাগ ছিনতাই হয়েছে কাছারির মোড়ে! তিনদিন আগে অনিমেষ পালের বাড়িতে দিনেদুপুরে ডাকাতি হয়ে গেছে। থানা থেকে বলেছে, এরা সব বাইরে থেকে আসা লোক, শহরের চেনা ক্রিমিনাল নয়। এখন অচেনা লোক মানেই সন্দেহজনক।”

ছেলেটা চুপ করে গেল।

মুশাকিলে পড়ল ইগল। পুলিশের হাতে পড়লেও আবার সেই লক আপে আটকে থাকা। আর পুলিশের কাছে পাগলাগারদ থেকেও নিশ্চয়ই তার নিরুদ্দেশের ডায়েরি করবে। আবার ধরা পড়তে হবে তাকে। এত কষ্ট করে পালালোর কোনও মানেই থাকবে না! সে টালুমালা করে চারদিকে তাকিয়ে একটা পস্থা খুঁজছিল। কিন্তু তার মাথায় কোনও বুদ্ধিই আসছে না।

একটা ছেলে একটা নাইলনের দড়ির বাউল নিয়ে ক্লাবঘরে ঢুকল। প্রমাদ গুনল ইগল। এবার তাকে বাঁধা হবে। তারপর পুলিশ আসবে। তারপর লক আপ। তারপর পাগলাগারদের লোকেরা আসবে। তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে ফের। অতল হতাশায় ইগল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সেই পুঁচকে ছেলেটা হঠাৎ গভীর গলায় বলল, “বিশুদা! একটা খবর আছে।”

“কী খবর?”

“আমি এই ভদ্রলোকের ছবি তুলে একটু আগে ফেসবুকে দিয়েছিলাম, যদি কেউ চিনতে পারে। এই দেখো, একজন জানিয়েছে, সে ঐকে চেনে। এর নাম বুলু মজুমদার।”

“আর কী লিখেছে?”

“আর কিছু নয়, ওটুকুই। তবে দাঁড়াও, এরপর ডিটেলস আসতে পারে।”

বিশু তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী হে, তোমার নাম কি বুলু মজুমদার?”

ইগল মাথা নেড়ে বলে, “আমি জানি না।”

পুঁচকে ছেলেটা তার মোবাইলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। তাকে ঘিরে ধরে অন্য ছেলেগুলোও মোবাইলের কमेंট দেখছে মন দিয়ে। পুঁচকেটা এবার বলল, “এই তো! আরও একজন লিখেছে, জনকপুরের বুলু মজুমদারের সঙ্গে এর চেহারার আশ্চর্যরকম মিল আছে। বুলু মজুমদার দুর্দান্ত জিমন্যাস্ট ছিল। তবে বেশ কিছুদিন আগে বুলু মজুমদার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার আর কোনও খবর নেই। লোকে বলে বুলু মজুমদার মারা গেছে।”

বিশ্ব অবাক হয়ে বলে, “জিম্নাস্ট! বলিস কী! ওহে বাপু, তুমি কি জিম্নাস্টিকস কিছু জানো?”

ইগল তার চারদিকে আরও একবার চেয়ে দেখল, তারপর বলল, “না, আমার কিছু মনে পড়ছে না। তবে এই জিনিসগুলো আমি চিনি। এই বারবেল, প্যারালাল বার, রিং, পোমেন্ট হর্স, ডাম্বেল—”

পূচকে ছেলেটা তার মোবাইলের দিকেই চেয়ে আছে একদৃষ্টে। এবার বলল, “দাঁড়াও বিশ্বদা, আরও খবর আছে।”

“কী খবর বলবি তো!”

সমর ঘোষ নামে একজন লিখেছে, “ইনি সম্ভবত ব্লু মজুমদার, বুলু নয়। একসময়ে ন্যাশনাল লেভেলের অ্যাথলিট ছিলেন। মেনলি জিম্নাস্ট। একসময়ে ভাল স্প্রিন্টার ছিলেন, ফুটবলও খেলতেন। অনেকদিন ঐর কোনও খোঁজ নেই। রটনা আছে যে, ঐকে গুম করে খুন করা হয়েছে।”

এসব শুনে বিশ্ব বেশ দমে গেল। একটু থতমত খেয়ে বলল, “তাই তো! এত জনে যখন চিনতে পারছে তখন নিশ্চয়ই ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। কী হে বাপু ইগল, এখন কি কিছু মনে পড়ছে?”

ইগল উদাস গলায় বলে, “না, আমার কিছু মনে নেই।”

“কিছু মনে কোরো না, না জেনে-বুঝে তোমাকে একটা থাপ্পড় দিয়ে ফেলেছি। আই অ্যাম রিয়েলি সিরি ফর দ্যাট। এই বিস্টু, আর কোনও কমেণ্ট এল?”

“কমেণ্ট তো অনেক আসছে। বেশির ভাগই বোগাস বলে মনে হচ্ছে। এক ভদ্রমহিলা লিখেছেন, এ তো আমার ছেলে সৃজিত গুহ, সাত বছর আগে এলাহাবাদের কুস্তমলায় গিয়ে আর ফেরেনি। আর একজন লিখেছেন, এই খুনিটার নাম মানব জহুরি, আটটা মার্ভার কেস বুলছে এর নামে। এখনও পর্যন্ত মোট চারজন ঐকে বুলু বা ব্লু মজুমদার বলে আইডেন্টিফাই করেছেন। এখন দেখো কী করবে।”

বিশ্ব বলে, “তোর বাবাকে একবার দেখাবি নাকি? এর সত্যিকারের ডিমনেশিয়া হয়েছে কি না!”

“আমার বাবা সাইকোয়ালিস্ট বা নিউরোলজিস্ট নন, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট। এই কেসে বাবা কী করবে?”

সেই মারকুটো কালো ষণ্ডা চেহারার ছেলেটা বলল, “বিশ্বদা, আমাদের এখন উচিত হবে ভদ্রলোককে হেল্প করা। দেখছ তো, ঐর পায়ে এই শীতেও জুতো নেই, গায়ের পোশাক ভীষণ ময়লা, চুলটুলও মনে হয় কাটা দরকার। চাঁদা তুলে করা যায় না?”

বিশ্ব চিন্তিতভাবে বলে, “তা করা যাবে না কেন? আমাদের ক্লাবে তো আর ফান্ডের অভাব নেই! আমার নতুন কেনা একটা পুলওভার দিয়ে দেবখন, আর নতুন কেনা শার্টও আছে। জয়ন্ত, তুই তো বেশ লম্বা, তোর প্যান্টের সাইজ এর হয়ে যাবে না?”

“মনে তো হয়। আমি একটা জিন্স দিতে পারি। আর পায়জামাও, বাড়িতে পরার জন্য।”

বিস্টু এবার একটু উত্তেজিত হয়ে বলে, “বিশ্বদা, এই দেখো জনকপুর থেকে পরিমল সাধুখাঁ নামে একজন ঐর একটা ছবি পাঠিয়েছেন, কয়েকবছর আগেকার। ইনিও বলছেন, এই ছবিটা ব্লু মজুমদারের, আর এর সঙ্গে বেশ মিল আছে।”

“দেখি! দেখি!” বলে সবাই হামলে পড়ল বিস্টুর মোবাইলের ওপর। ছবির মুখে ডাড়ি বা গোঁফ নেই, চুলও ক্রু কাটা। তবু একটু ভাল করে দেখলেই বোঝা যায় লোকটা ইগলই।

ইগল নিম্পৃহ ভাবে বসে ছিল, ছবি দেখার আগ্রহ তার হয়নি। তার কপালে কী আছে তা বুঝতে পারছিল না সে। ছবির মুখের সঙ্গে তার মুখশ্রী না মিললে তাকে এরা হয়তো ফের ঝামেলায় ফেলে দেবে! তাই মুখে নৈরাশ্য মেখে বসে ছিল। একটু উৎকণ্ঠা নিয়ে।

বিশ্ব ফের এসে তার মুখোমুখি লোহার চেয়ারটায় বসে বলে, “বাপু হে, তুমি একজন ভাল জিম্নাস্ট, একজন অ্যাথলিট, এত লোক তোমাকে চিনতে পারছে, আর তুমিই তোমাকে চিনতে পারছ না!”

ইগল অসহায় গলায় বলে, “আমি আসলে কে তা কিন্তু আমি

এখনও জানি না।”

“ইগল নামটা তুমি কোথায় পেলে?”

ঠোট উল্টে ইগল বলে, “কে জানে! খাতায় তো ওই নামই ছিল।”

“খাতা! কোন খাতার কথা বলছ?”

ইগল বুঝল, সে ভুল করে পাগলাগারদের খাতার কথা বলে ফেলেছে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, “আমি একটা অনাথ আশ্রমে কিছুদিন ছিলাম। সেখানকার খাতায় আমার ওই নাম ছিল।”

বিশ্ব তার দিকে চেয়ে বলল, “তোমার অবস্থা দেখে আমাদের মনে হয়েছে তোমাকে টেম্পোরারি একটা শেলটার দেওয়া দরকার। তুমি এই ক্লাবঘরে থাকতে পারো। তোমার কাছে বোধহয় পয়সাকড়ি নেই!”

“আজ্ঞে না।”

“ঠিক আছে। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ক্লাবঘরে থাকতে পারবে তো!”

ইগলের চোখে জল আসছিল, বলল, “আপনারা বড্ড ভাল লোক। এই ক্লাবঘর তো আমার কাছে রাজপ্রাসাদ। খুব থাকতে পারব।”

পরবর্তী দু’ঘণ্টার মধ্যে যা ঘটল তা ইগলের কাছে রূপকথার মতো। প্রথমেই এল একটা নেয়ারের খাটিয়া, শতরঞ্চি, চাদর, বালিশ আর একটা ভাল কম্বল। তার পিছুপিছু এল জামা প্যান্ট, পায়জামা, পুলওভার, একটা গামছা, সাবান, এক জোড়া নতুন হাওয়াই চটি। সেইসঙ্গে এল একজন নাপিত। বাইরের রোদে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে তাকে বসিয়ে নাপিত লোকটি বলল, “স্যার, আপনার মাথায় তো জটা হতে শুরু করেছে! আর থিকথিক করছে উকুন। যদি অনুমতি দেন তবে ন্যাড়া করে দিই! নইলে উকুন আপনাকে খুবলে খাবে।”

আইডিয়াটা খারাপ লাগল না ইগলের। মাথা ন্যাড়া করলে তাকে চট করে কেউ চিনতে পারবে না। পাগলা গারদের লোকেরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই হন্য হয়ে তাকে খুঁজতে মাঠে নেমে পড়েছে। সে বলল, “তাই দিন।”

মাথা ন্যাড়া করা হল, দাড়িগোঁফ চেঁছে ফেলা হল, নেলকাটার দিয়ে বড় বড় নখ কেটে ফেলা হল। নাপিতের হাতআয়নায় নিজেকে চিনতেই পারছিল না ইগল। হারু কুণ্ডু বা তার দলবলও চট করে চিনতে পারবে বলে মনে হয় না।

ক্লাবঘরের বাথরুমে ঢুকে আজ ইচ্ছেমতো সাবান দিয়ে স্নান করল সে। জলটা বেজায় ঠান্ডা। স্নান করতে কাঁপুনি উঠে গেল বটে, কিন্তু স্নানের পর অনেকদিন বাদে নিজেকে ভদ্রলোকের মতো মনে হচ্ছিল তার। ময়লা জামাকাপড় বদলে কাচা জামা আর পায়জামা পরল সে, হোক তা সেকেণ্ডহ্যান্ড। বিস্টু তার বাড়ি থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে ভাত নিয়ে এসেছিল। দু’বছর বাদে এত সুস্বাদ তরকারি দিয়ে সফ্র চালের ভাত তার পেটে গেল। আর এসব তার স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

খাওয়ার সময় বিস্টু বলল, “সকালে আপনাকে ভ্যাগাবন্ডের মতো লাগছিল। এখন আপনাকে বেশ হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছে। চেনাই যাচ্ছে না!”

ইগল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সে দেখতে কেমন তা সে ভুলেই গেছে।

সন্ধ্যাবেলা যখন ক্লাবঘরে কয়েকজন ব্যায়াম করতে এল তখন তার নেয়ারের খাটে বসে জুলজুল করে দেখছিল ইগল। রিং-এ উঠে একজন গ্রেট সার্কেল করছিল। একজন প্যারালাল বারে উঠে বুল খেয়ে রিভার্স করছে। জয়ন্ত নামে ছেলেটা তার দিকে চেয়ে বলল, “একটু চেষ্টা করে দেখবেন নাকি?”

ইগল ভয় খেয়ে বলল, “আমি কি পারব?”

“দেখুন না একটু চেষ্টা করে।”

ইগলের আবছা মনে পড়ছিল, কোনওকালে সে এইসব যন্ত্রপাতি নিয়ে কসরত করেছে। কিন্তু কোথায় এবং কবে তা বুঝতে পারছিল না। ভয় এবং দ্বিধা নিয়েই সে উঠে পড়ল। একটা লাফ দিয়ে উঠে রিংটা ধরে বুলে থাকল কিছুক্ষণ। কসরত করার উপযুক্ত পোশাক তার পরনে নেই। তবু একটা বুল খেয়ে সে গ্রেট সার্কেল করতে চেষ্টা করল। প্রথম দু’বার হল না। তার পরের বার দিবি পেয়ে গেল। তবে হাঁফ ধরে যাচ্ছে, হাত

ভেরে আসছে।

সবাই হাঁ করে দেখছিল তাকে, অবাক দৃষ্টি। জয়ন্ত বলে উঠল, “আরে! আপনি তো একজন এক্সপার্ট!”

আর একজন ছমছমে চেহারার ছেলে বলল, “আপনার প্র্যাকটিস নেই বটে, কিন্তু আপনি তো ভালই জানেন!”

এরপর একটু প্যারালাল বারেও উঠতে হল তাকে। হাঁফ ধরে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু সামান্য কিছুক্ষণ সে সবাইকে প্রায় চুপ করিয়ে রাখল তার অনায়াস দক্ষতায়।

প্রচুর প্রশংসা আর পিঠ চাপড়ানো জুটল তার। বহুদিন পর মনটা একটু ফুরফুরে লাগছে ইগলের। নিজের একটা আইডেন্টিটি অন্তত ধরা পড়ছে তার কাছে। এইভাবেই যদি বাকি আইডেন্টিটিও ধরা দেয়! তা কী হবে?

রাতে যখন ক্লাবঘরে একা হল ইগল তখন সারা দিনের হ্যাপায় বড় ক্লান্ত লাগছিল তার। পরিশ্রম আর টেনশন তাকে কাহিল করে ফেলেছে। রাত্রিবেলা একজন লোক এসে রুটি আর আলুর তরকারি দিয়ে গেল। বলল, “বিশুবাবু পাঠিয়েছে।” এত সুস্বাদু রুটি আর আলুর তরকারি বহুকাল খায়নি সে। পেট ভরে খেয়ে সে দশটা না বাজতেই শুয়ে পড়ল। ঘুমও এসে গেল তৎক্ষণাৎ।

ঘুমটা আচমকা ভাঙল মধ্যরাতে। দরজায় কে বা কারা যেন জোরে জোরে ধমধম করে চাপড় মারছে। চমকে উঠে বসল ইগল। বুকটা ধড়ধড় করছিল তার। শঙ্কিত গলায় সে বলল, “কে?”

ভারী এবং গম্ভীর একটা গলায় কে যেন বলল, “দরজা খোলো। আমরা পুলিশ।”

পুলিশ শুনে ভারী দমে গেল ইগল। সর্বনাশ! তা হলে তো পাগলাগারদ থেকেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে! এরা কি তাকে ফের ওখানে ফেরত নিয়ে যাবে? ভয়ে আর সাড়া দিল না সে। চুপ করে বসে রইল। সে যতদূর জানে, এই ক্লাবঘরের একটাই দরজা। বেরোনোর আর কি কোনও রাস্তা আছে? মনে পড়ল না। অন্ধকারে চুপ করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইল সে। ওদিকে দরজায় ধাক্কা জোরালো হচ্ছে। ওই একই গলায় কে যেন হুমকি দিয়ে বলছে, “ভাল চাও তো দরজা খোলো, নইলে আমরা দরজা ভেঙে ফেলব কিন্তু!”

হঠাৎ ইগলের একটা মরিয়া ভাব এল। এত কষ্টে পাওয়া স্বাধীনতা কি এত সহজে বিসর্জন দিতে হবে? পুলিশ তো কী হয়েছে, পুলিশের কাছেই বা সে ধরা দেবে কেন? ফের ওই পাগলাগারদে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই নেই, মরে গেলেও না।

তার শিয়রের দিকটায় ক্লাবঘরের এক কোণে ক্রিকেটের সরঞ্জাম আছে, দেখেছিল সে। আগে সে পুলওভারটা পরে নিল। পালাতে হলে এটা দরকার হবে। তারপর অন্ধকারে উঠে গিয়ে সে ঘরের কোনাটায় হাতড়ে হাতড়ে ক্রিকেটের সরঞ্জামের মধ্যে একটা ভারী ব্যাট পেয়ে গেল। আপাতত এতেই তার কাজ হয়ে যাবে। ব্যাটটা হাতে নিয়ে সে ফের বিছানায় এসে প্রস্তুত হয়ে বসে রইল। বাইরে নিচু গলায় কারা যেন শলাপরামর্শ করছে। করুক। দরজা ভাঙলে সে ছেড়ে কথা কইবে না। এখন সে মরিয়া।

বাইরে একটু চুপচাপ, তারপর হঠাৎ দমাস করে কে যেন কাঠের দরজাটায় একটা লাথি মারল। ক্লাবঘরের দরজা খুব একটা মজবুত হওয়ার কথা নয়। এক লাথিতেই কেমন যেন কাঠ ফাটার মতো শব্দ হল। পরের লাথিটাতেই দরজাটা ভেঙে পড়ে যাবে। ইগল নিঃশব্দে উঠে গিয়ে দরজার একপাশটিতে দাঁড়াল, হাতে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরা ভারী ক্রিকেট ব্যাটটা। হিসেব করে মারতে হবে। সে তো মানুষ খুন করতে চায় না! ভারী ব্যাটের ঘা বেকায়দায় লেগে গেলে মানুষ মরেও যেতে পারে।

তৃতীয় লাথিটায় দরজাটার ছিটকিনি আর খিল দুটোই উড়ে গিয়ে একটা পাল্লা কেতরে ঝুলে পড়ল, আর একটা দরজা ঠাস করে ভিতরের দেওয়ালে গিয়ে লাগল। তারপর একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল ঘরের ভিতরে।

কয়েক সেকেন্ড পরে ওভারকোট পরা একজন লম্বাচওড়া লোক

একটু কোলকুঁজো হয়ে ভিতরে ঢুকে এল। তার এক হাতে টর্চ, আর অন্য হাতে একটা ডান্ডা গোছের জিনিস। ইগল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করল না, ব্যাটটা তুলে বিদ্যুৎগতিতে বসিয়ে দিল লোকটার ডান হাঁটুতে। শব্দটা হল জবরদস্ত। মালাইচাকি ভেঙে যাওয়ার কথা! সেই জোরালো মারে লোকটা আঁক করে একটা আত্নানাদ ছেড়ে দু’হাতে হাঁটুটা জড়িয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। হাত থেকে একটা লোহার রড খসে পড়ে গেল মেঝেতে ঝনঝন শব্দে। সেইসঙ্গে টর্চটাও। দ্বিতীয় লোকটা বোধহয় ব্যাপারটায় হকচকিয়ে গিয়ে “কী হল, কী হল” বলে ভিতরে ঢুকতেই তার বাঁ কাঁধে ব্যাটটা সজোরে বসিয়ে দিল ইগল। শরীরের যে কোনও অঙ্গে জোরালো চোট হলে সমস্ত শরীরই অকেজো হয়ে যায়, উল্টে কিছু করা যায় না। দ্বিতীয় লোকটা জখম কাঁধটা অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরে ‘বাপ রে’ বলে বসে পড়ল। এরও এক হাতে লোহার রড ছিল, সেটাও খসে পড়ে গেল মেঝেয়। সাবধানের মার নেই, তাই ইগল অন্ধকারেই যতদূর সম্ভব লক্ষ্য স্থির করে লোকটার ডান কাঁধেও একটা মোক্ষম ঘা বসিয়ে দিল। আত্মরক্ষার জন্য এটুকু তাকে করতেই হত। বাইরের রাস্তায় আরও একজন আছে, বুঝতে পারছিল ইগল। সেই লোকটা চোঁচিয়ে বলল, “কী হল তোদের? ঠুকে দে ব্যাটাকো! শেষ করে দে!” তাকে আর ভিতরে ঢুকতে দিল না ইগল। এক লাফে বাইরে বেরিয়ে লোকটার মুখোমুখি হয়েই সে ব্যাটটা আড়াআড়িভাবে চালিয়ে দিল, যেখানে লাগে লাগুক। লোকটা তাকে দেখেই একটা কিছু অস্ত্র তুলেছিল মারবে বলে। রাস্তার ক্ষীণ আলোয় মনে হল, হাঁসুয়া। কিন্তু তার আগেই ইগলের মারে লোকটার হাত থেকে হাঁসুয়া জাতীয় অস্ত্রটা খসে ছিটকে এল ইগলের পায়ের কাছে। তারপর ইগল আর সামলাতে পারল না নিজেকে। গুলিটার শরীরের দু’পাশে এলোপাখাড়ি কয়েকটা ঘা বসিয়ে দিল সে। হতভম্ব লোকটা কিছু বুঝবার আগেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর ‘বাপ রে মা রে’ বলে চিৎকার করতে লাগল। এরা পুলিশ কি না বুঝতে পারল না ইগল। কারও পরনে পুলিশের পোশাক নেই, এবং পুলিশ লোহার রড বা হাঁসুয়া নিয়ে বেড়ায় না বলেই জানে সে।

ইগল যথেষ্ট ভয় পেয়েছে। মারপিট করা তার কাজ নয়। এরা কেনই-বা তার ওপর চড়াও হল, তাও বুঝতে পারছে না সে। অন্ধকারে যেটুকু দেখেছে তাতে এদের পাগলাগারদের লোক বলে মনে হয় না। পুলিশের লোকও নয়। তবে এরা কারা? যেই হোক, এরা যে ভাল লোক নয় তা বোঝাই যাচ্ছে। আরও ভয়ের কথা হল, এদের দলবল থাকতেই পারে, হয়তো আছেও। খবর পেয়ে তারা এসে জুটলে বিপদ।

সে আর দাঁড়াল না। দ্রুত হাঁটা দিল। সামনের গলিটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে অনেকটা হাঁটল ইগল। রাস্তাঘাট নিবুঝ। ঘন কুয়াশা, বেজায় শীত এবং অন্ধকার। কোথায় যাচ্ছে তা বুঝতে পারছে না সে। শহরটা চেনে না ইগল। তবে ক্লাবঘরটা থেকে যতদূরে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। অনেকটা হাঁটার পর সে ডানধারে কিছু আলো দেখতে পেল, আর সামান্য সেই আলোয় একটা লোহার বেড়া আর প্ল্যাটফর্ম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। রেলস্টেশন! এই ভাল হল। প্রথম যে-ট্রেন আসবে তাতেই চেপে বসবে সে। যেখানে হোক চলে যাবে। এই শহরে আর নয়।

স্টেশনে জনমনিষ্য নেই। প্ল্যাটফর্ম হাঁহাঁ করছে ফাঁকা। ইগল নির্জন প্ল্যাটফর্মের একটা শিশিরে ভেজা, ঠান্ডা, কেঠো বেঞ্চে বসে দম নিতে লাগল। রপর এত উত্তেজক ঘটনায় সে বেশ হকচকিয়ে গেছে। ছুঁ উত্তুরে হাওয়ায় ঠকঠক করে কাঁপছিল সে। খানিকটা শীতে, খানিকটা ভয়ে। তার মাথা ভাল কাজ করছে না, কোনও বুদ্ধি আসছে না। শুধু পালিয়ে যাওয়া ছাড়া যেন তার আর কোনও কাজ নেই! কিন্তু আর কত পালাবে সে?

অনেকক্ষণ বসে থেকেও কোনও ট্রেন আসার লক্ষণ দেখল না ইগল। আজ রাতে হয়তো ট্রেন নেই। এটা হয়তো খুব ছোট আর এলেবেলে একটা স্টেশন! তবু তার অপেক্ষা করা ছাড়া উপায়ই-বা কী!

বসে বসে একটু ঢুলুনি এসে গিয়েছিল তার। কাল রাত থেকে ঘুম হয়নি। তার ওপর এত ছজ্জাত। ঢুলুনি আসার আর দোষ কী! কতক্ষণ কেটেছে কে জানে, হঠাৎ বেঙ্কের হাতলে রাখা বাঁ হাতটা হড়কে যাওয়ায়

চমকে উঠে তার চটকাটা ভেঙে গেল। ফের সোজা হয়ে বসল সে। তারপর হঠাৎ ভারী অবাক হয়ে দেখল, সামনে হাত কয়েক তফাতে আবছা অন্ধকারে, কুয়াশার মধ্যে একটা সাদা রঙের টুপি শূন্যে ভেসে আছে। এ টুপি চেনে সে। ফেডোরা। প্রথমটায় তার ভয় হল, ওই গুন্ডাগুলোর কেউ নাকি! তাকে তাকে এতদূর এসেছে! কিন্তু প্ল্যাটফর্মের মৃদু আলোয় ঠাহর করে দেখল, টুপির নীচে কোনও লোক দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা টুপিই ভেসে আছে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুযায়ী এরকম হওয়ার কথা নয়। তাই ভারী অবাক হয়ে চেয়ে ছিল সে। টুপিটা স্থির হয়ে আরও কিছুক্ষণ ভেসে রইল। তারপর নিঃশব্দে হঠাৎ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ঘটনাকার মাথামুড়ু কিছু বুঝতে পারল না ইগল। হয়তো ঘুমের ঘোর এখনও ঠিকমতো কাটেনি বলেই ভুলভাল দেখছে, এই ভেবে ইগল ফের চোখ বুজে ফেলল। হঠাৎ খুব কাছে, তার ডান পাশ থেকে কে যেন চাপা মোলায়েম গলায় বলে উঠল, “স্যার, কিছু দেখলেন?”

চমকে উঠে ইগল দেখে, বেষ্টে তার পাশেই একজন ছোটখাটো চেহারার লোক বসে আছে, গায়ে ফুলহাতা সোয়েটার, মাথায় বাঁদুরে টুপি, গলায় একটা মাফলার। লোকটা কোথা থেকে হঠাৎ উদয় হল কে জানে! সে সন্দিহান গলায় জিজ্ঞাস করল, “আপনি কে?”

“আমি! আমি হলুম গনা। কিছু কি দেখতে পেলেন স্যার?”

ইগল আমতা আমতা করে বলল, “হ্যাঁ, কী যেন একটা দেখলাম! মনে হল, একটা টুপি। তবে আমার মনে হচ্ছে আমি ভুল দেখেছি। হ্যালুসিনেশন।”

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়া দিয়ে বলে, “না স্যার। দু’জন কি একসঙ্গে ভুল দেখতে পারে? সেই কুসুমপুরের জলা থেকে ওই টুপির পিছনে ছুটতে ছুটতে এই এতদূর এসেছি!”

ইগল কিছু বুঝতে পারছে না। লোকটার দিকে বুরবকের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, “টুপির পিছনে ছুটছেন কেন?”

“ছুটনা না! বলেন কী স্যার? ওটা কি এলেবেলে টুপি ভাবলেন নাকি! এই গনা দাস আজগুবি জিনিসের পিছনে ছোটো না। চোর হতে পারি, কিন্তু বোকা নই।”

ইগল অবাক হয়ে বলে, “আপনি কি চোর নাকি?”

গনা একটু চূপ করে থেকে যেন কিছু ভাবল, তারপর একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, “পেটে বিদ্যে নেই যে চাকরিবাকরি করব, মাথায় তেমন বুদ্ধি নেই যে ব্যবসা বাণিজ্য করে দু’পয়সা কামাব, গতরে খেটে যে খাব তা লোকে তো কাজকর্মই দিতে চায় না মশাই! চুরি কি আর সাথে করতে হয় স্যার!”

ইগল সমব্যথীর মতো বলল, “তাও তো বটে!”

“তবে আর বেশিদিন নয়। ওই টুপির কল্যাণে এবার হিল্লো একটা হয়ে যাবে বলেই মনে হয়। তখন এই গনা দাসকে আর পায় কে!”

ইগল ভারী অবাক হয়ে বলে, “টুপির কল্যাণে! কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না তো!”

গনা গলাটা আর একটু নামিয়ে বলে, “যার তার টুপি নয় স্যার, ও হল এলিয়েন সাহেবের টুপি।”

“এলিয়েনসাহেব! সেটা আবার কে বলুন তো!”

গনা কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে বলে, “অত ভেঙে বলা যাবে না মশাই! তবে ওঁরা সব বহির্বিশ্বের লোক। হয়কে নয় করতে পারেন, নয়কে হয়। বুঝলেন কিছু?”

“না তো!”

“বুঝবেনও না। চলি স্যার।”

এই বলে গনা উঠে রওনা দিয়েও হঠাৎ আবার ফিরে এসে সন্দিহান গলায় বলল, “আচ্ছা, আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে কেন বলুন তো!”

ইগল সতর্ক হয়ে গিয়ে বলল, “না না, আমাকে আপনার চেনার কথা নয়। আমি এদিককার লোক নই।”

গনা একদৃষ্টে তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে একটা ঝোড়ো শ্বাস ফেলে বলে, “কপালের দোষে আমি একজন পাকা চোর হয়ে উঠতে পারিনি বটে, কিন্তু একজন ভাল চোর হওয়ার মতো অনেক গুণ আমার

ভিতরে ছিল মশাই। তার মধ্যে একটা হল চোখ। আমি একবার যা দেখি তা সহজে ভুলি না। আপনি ন্যাড়া হয়েছেন, গোঁফদাড়ি চোঁছে ফেলেছেন বলেই কি আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন? আপনি হলেন সরকারি পাগলাগারদের উনিশ নম্বর পেশেন্ট ইগল রায়। ঠিক কি না!”

ইগল ভয় খেয়ে খানিকটা কঁকড়ে গিয়ে মিনমিন করে বলে, “আপনার কোথাও বোধহয় ভুল হচ্ছে গনাবাবু! আমি ইগল-টিগল নই। আমার নাম বুলু মজুমদার।”

“বিপদে পড়লে নামধাম ভাঁড়াতে হয়, এটাই তো দুনিয়ার নিয়ম! তবে পেটের দায়ে ওই পাগলাগারদে আমি বেশ কিছুদিন ঝাড়পোঁছের কাজ করেছি কিনা! সব জানি। তখনই শুনেছিলাম, আপনি নাকি ভাল ঘরের ছেলে, কিন্তু নিজের নামঠিকানা সব ভুলে মেরে দিয়ে বসে আছেন।”

ইগল ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে গনার দিকে জুলজুল করে চেয়ে ছিল।

গনা দুঃখের গলায় বলে, “আর কিছুদিন টিকে থাকতে পারলে ইন্দুমতী ঠাকরুন এতদিনে আমাকে পাগলাগারদের বাজার সরকার করে দিতেন। আর বাজার সরকারের যে দোহান্তা রোজগার এ কথা কে না জানে! কিন্তু কপালটাই খারাপ মশাই, একটা পাঁউরুটি চুরির দায়ে হারু কুণ্ডু কী মারটাই না মারল আমাকে! তারপর ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিল। আপনিই বলুন, কাজটা কি ঠিক করেছিল হারু কুণ্ডু?”

ইগল সমব্যথীর মতো বলল, “না না, এটা হারু কুণ্ডু মোটেই ঠিক কাজ করেনি গনাবাবু।”

“তা হলেই বলুন। একতলা থেকে তিনতলা অবধি ঝাড়পোঁছ করতে একটা লোকের যে-মেহনতটা হয় তাতে তো খিদেতেষ্টাও পায়, নাকি! তাই হাতছিপ্পু করে ওই পাঁউরুটি আর রাজুর গুড়ের কৌটো থেকে একডেলা গুড় নিয়ে গিয়ে ছাদে বসে টাউটাউ করে মেরে দিয়েছিলাম বটে। এমন কী অন্যায হয়েছিল বলুন তো! কিন্তু তার বাবদে ওরকম উত্তমকুস্তম মারতে হয়? ক্ষমাঘোষা বলেও তো একটা কথা আছে না কি! এদেশেই কি গান্ধীবাবা জন্মাননি? অহিংসা অহিংসা করে এত যে গলা শুকোলেন, তাতে কোনও লাভ হল মশাই?”

“তা তো বটেই।”

“তা পাগলাগারদ থেকে আপনার কি ছুটি হয়ে গেছে নাকি ইগলবাবু? বাড়ি যাচ্ছেন বুঝি?”

“হ্যাঁ, অনেকটা ওরকমই।”

“কিন্তু রান্তিরে তো ট্রেন নেই স্যার। পরের আপ গাড়ি ঢিকিয়ে-ঢিকিয়ে আসতে সেই কাল দুপুরবেলা। তাও যদি টাইমে আসে। আর ডাউন গাড়ি তো আরও দেরিতে। ততক্ষণ খোলা প্ল্যাটফর্মে বসে থাকবেন নাকি? ন্যাড়া মাথায় তো ঠান্ডা লেগে যাবে মশাই!”

কাঁচুমাচু মুখ করে ইগল বলে, “কী আর করা যাবে বলুন! কপালে একটু কষ্ট আছে বুঝতে পারছি।”

গনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁদুরে টুপির ওপর দিয়েই একটু মাথা চুলকানোর চেষ্টা করল। তারপর বলল, “আপনি তো আমাকে বেজায় বেকায়দায় ফেলে দিলেন মশাই! আপনি পুরনো চেনা লোক, এই উদ্যম প্ল্যাটফর্মে আপনাকে এরকম অবস্থায় ফেলে যাই-ই বা কী করে! শুনলে লোকে বলবেই-বা কী! চোর বটি, কিন্তু অমানুষ তো নই! এই কাছেই রথতলায় আমার একখানা বাবাকেলে টিনের ঘর আছে। ব্যবস্থা তেমন ভাল নয় বটে, তবে মাথা গৌজা যায় আর কী!”

প্রস্তাবটা মোটেই খারাপ শোনাল না ইগলের কাছে। এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় তার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। উত্তুরে হাওয়াটা যেন চামড়া কেটে বসে যাচ্ছে। অবশ্য মুখে ভদ্রতা করে বলল, “আরে না না, আমার জন্য আপনি কেন কষ্ট করবেন গনাবাবু! আমি কোনওরকমে এখানে বসে কাটিয়ে দিতে পারব।”

গনা এক গাল হেসে বলে, “আমার আর কষ্ট কী? রাতবিরেতে কি আমার আরাম করে লেপমুড়ি দিয়ে শোয়ার জো আছে মশাই! আমার যে রাতবিরেতেই কাজ। নাইট ডিউটি না করলে কি আর পেট চলবে স্যার? আপনি চলুন তো। এই ঠান্ডায় নিউমোনিয়া হয়ে আপনি টেঁসে গেলে যে

আমার মহাপাতক হয়ে যাবে!”

অগত্যা ইগল উঠে পড়ল।

গনার ঠেক খুব একটা খারাপ নয়। টিনের ঘর, দরজা জানালা আছে, ইটে বাঁধানো পাকা মেঝে। ঘরে একখানা চৌকিতে বিছানা পাতা, হোক তা শতরশ্মি আর চাদরের। আর একখানা সস্তা তুলোর কব্বলও রয়েছে বটে। খোলা প্ল্যাটফর্মের তুলনায় স্বর্গ।

গনা ভারী আপ্যায়ন করে বলে, “আপনি টেনে ঘুম দিন, আমি ততক্ষণে একটা রোঁদ দিয়ে আসি। লাহাবাবুদের বাড়িতে মেয়ের বিয়ের জোগাড়যন্ত্র চলছে, দেখি যদি কিছু সুবিধে হয়।”

গনা ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে বেরিয়ে যাওয়ার পর ইগল দরজাটায় খিল দিয়ে টেনে ঘুম দিল।

সকালবেলা দরজায় ধাক্কার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ইগলের। একটু সময় লাগল সে কোথায় আছে তা বুঝতে। বুঝে খুব একটা খুশি হল না সে। খুশি হওয়ার কথাও নয়। গনা নামে একজন চোরের ডেরায় সে গন্ত হয়েছিল। কাল রাতের কাণ্ডকারখানা মনে পড়ায় সচকিত হল ইগল। পুলিশ নয় তো! নাকি গনাবাবুই ফিরে এলেন?

সে সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল, “কে?”

একটা কচি গলার জবাব পাওয়া গেল, “ও গনাদা, দরজা খোলো। আমি বাবলু।”

বাবলু কে তা বোঝা গেল না, তবে বাচ্চা ছেলে যখন, তখন ভয় নেই। সে উঠে গিয়ে দরজার বাটাম খুলে দিয়ে দেখতে পেল দু’টি দশ-বারো বছরের ফুটফুটে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পরনে সাদা ফুলপ্যান্ট, সাদা শার্ট আর নীল রঙের সোয়েটার, পায়ে কেডস। তাকে দেখে দু’জনেই অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

ইগল একটা হাই তুলে বলে, “তোমরা কাকে খুঁজছ?”

“এটা তো গনাদার ঘর। কিন্তু আপনি কে?”

“আমি গুঁর একজন বন্ধু বলতে পারো। গনাদা তোমাদের কে হয়?”

বড় ছেলেটি বলল, “গনাদা আমাদের মাসতুতো দাদা। আমি বাবলু আর এ হল আমার ছোট ভাই গাবলু।”

শুনে একটু হাঁ হল ইগল। এই দু’টি তো রীতিমতো ভাল ঘরের ছেলে! গনার মাসতুতো ভাই হওয়ার তো কথা নয় এদের! বিস্ময়টা চাপা দিয়ে সে ভালমানুষের মতো বলল, “ওহ, কিন্তু গনাবাবু তো এখন বাড়িতে নেই। উনি কাল রাতে একটু কাজে বেরিয়ে গেছেন। কখন ফিরবেন তা বলে যাননি।”

দুই ভাই একটু মুখ তাকাতাকি করে নিল, তারপর বাবলু বলল, “সে আমরা বুঝতে পারছি। গনাদা তো একদম এক্সপার্ট নয়, নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছে। তবে চিন্তা নেই, একটু পরেই পুলিশ গনাদাকে ছেড়েও দেবে।”

“তাই বুঝি?”

বাবলু একটু দুঃখের গলায় বলে, “গনাদা কিছু পারেন না। গুগল খুলে কত শেখানোর চেষ্টা করেছি, হাউটু বি এ গুড থিফ, কিন্তু গনাদার মাথাতে কিছুই ঢোকে না যে!”

ইগল একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে, “ভাল চোর কী করে হওয়া যায় বলো তো!”

বাবলু বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলে, “সে অনেক কথা! ভাল চোরের বেশি লোভ করতে নেই। যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু নিতে হয়। ভাল চোর কখনও আগে থেকে রিসার্চ না করে কাজ করবে না। যখন কাজ করবে তখন করবে নিখুঁতভাবে। সেই সবচেয়ে ভাল চোর, যে প্রয়োজন মিটে গেলে চুরি করা জিনিস বা টাকা আবার আসল মালিককে ফিরিয়ে দেয়। আরও অনেক কথা বলা আছে গুগলে।”

“বাঃ, গুগলে এসবও লেখে বুঝি?”

“আচ্ছা, আপনি গনাদার কেমন বন্ধু? আমরা তো গনাদার কোনও বন্ধুর কথা কখনও শুনিনি! আমরা তো জানতাম গনাদার কোনও বন্ধু নেই।”

ইগল বলে, “গনাবাবুর সঙ্গে আমার গতকাল রাতেই আলাপ

হয়েছে। তখন থেকেই বন্ধু। উনি খুব ভাল লোক তো, তাই আমাকে গুঁর ঘরে থাকতে দিয়েছেন।”

“কেন, আপনার কি থাকার জায়গা নেই?”

ইগল মাথা নেড়ে বলে, “নাঃ, আমার থাকার কোনও জায়গা নেই।”

“তা হলে আপনি কি এখন থেকে এখানেই থাকবেন?”

“না বাবলু, আমি একটু বিপদে পড়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছি। একটা ব্যবস্থা হলেই চলে যাব।”

“কোথায় যাবেন?”

“ঠিক জানি না। আমার বাড়ি কোথায় তা আমার মনে পড়ছে না।”

“কেন মনে পড়ছে না?”

ইগল তার মাথাটা দেখিয়ে বলল, “আমার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। আমি সব অতীত ভুলে গেছি।”

বাবলু উত্তেজিত হয়ে বলে, “হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে তো অ্যামেনেশিয়া বলে! অ্যামেনেশিয়া নিয়ে অনেক সিনেমাও হয়েছে। আপনার কী করে হল?”

“তাও তো জানি না।”

“আপনার নিজের নাম মনে আছে?”

“আমার একটা নাম হচ্ছে ইগল রায়, কিন্তু সেটা আমার আসল নাম কি না তা বলতে পারব না।”

“তা হলে এখন আপনার কী হবে?”

“তাই তো ভাবছি, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।”

গাবলু ছলছলে চোখে বলে, “আপনার কি মা-বাবাকেও মনে নেই?”

ইগল মাথা নেড়ে বলে, “না, কিছু মনে নেই গাবলু।”

“তা হলে আপনি আমাদের বাড়িতে থাকবেন চলুন। আমি মাকে রাজি করিয়ে আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব।”

ইগল একটু মিষ্টি হাসি হেসে বলে, “তুমি ভারী ভাল ছেলে তো, তাই আমার ওপর মায়া হয়েছে। কিন্তু তোমাদের বাড়িতে যাওয়া আমার ঠিক হবে না।”

“কেন ঠিক হবে না?”

“আমি ভাল লোক না খারাপ লোক তা তো জানি না। আগে নিজের আইডেন্টিটি খুঁজে পাই, তা না হলে তোমাদের বাড়িতে গেলে পাঁচটা কথা উঠবে। কিন্তু তোমাদের দুই ভাইকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কী স্মার্ট তোমরা! আমার মতো বোকা নও।”

বাবলু বলে, “আপনাকে তো একটুও বোকা বলে মনে হচ্ছে না!”

ঠোট উল্টে ইগল বলে, “কী জানি! আমি বোকা না চালাক তাও তো জানি না!”

“দেখবেন একদিন একটা অ্যাকসিডেন্ট হবে, মাথায় চোট লাগবে, আর আপনার সব মনে পড়ে যাবে। সিনেমায় তো তাই হয়।”

ইগল একটু ম্লান হাসি হাসল, “মনে পড়লেই ভাল। তা তোমরা এত সকালে কোথায় যাচ্ছে? ক্রিকেট খেলতে?”

“হ্যাঁ তো! আজ কুমোরপাড়ার সঙ্গে আমাদের টি টুয়েন্টি ম্যাচ। আর গনাদা আমাদের আম্পায়ার। তাই গনাদাকে ডাকতে এসেছিলাম।”

অবাক হয়ে ইগল বলে, “গনাবাবু আম্পায়ারিংও জানেন নাকি!”

“গনাদা অনেক কিছু জানে। আম্পায়ারিং জানে, হোমিওপ্যাথি জানে, ইলেকট্রিকের ফিউজ সারিতে পারে, হাওয়াই চপ্পলের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেলে নতুন স্ট্র্যাপ লাগিয়ে দিতে পারে, মায়ের চশমার ডাঁটি ভেঙে গিয়েছিল, গনাদাই তো জুড়ে দিল!”

“বাঃ, গনাবাবুর তো অনেক গুণ।”

“আপনি কখনও ক্রিকেট খেলেছেন?”

“খেলেছি হয়তো, এখন মনে নেই। সব ধু ধু।”

বাবলু করুণ মুখ করে বলে, “আসলে আমাদের একজন আম্পায়ার খুব দরকার। বড়রা কেউ আম্পায়ার না হলে ছোটরা মানতে চায় না, খুব বাগড়া লেগে যায়। আপনি আম্পায়ার হবেন?”

ইগল এই প্রস্তাবে খতমত খেয়ে গেল। সে কি কখনও ক্রিকেট খেলেছে? ক্রিকেটের কিছু কি সে জানে? কাল রাতে সে ক্রিকেট ব্যাটকে অন্য একটা কাজে লাগিয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা তো আর ক্রিকেট খেলা

নয়! সে কাঁচুমাচু হয়ে বলে, “কিন্তু যদি ভুলভাল করে ফেলি?”

“সে সব ম্যানেজ করা যাবে, আপনি বেশ লম্বাচওড়া আছেন, কেউ ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই করতে সাহস পাবে না।”

গাবলু বলে উঠল, “আর স্যার, আজ ভাল টিফিনও আছে কিন্তু। মাখন পাঁউরুটি, ডিমসেদ্ধ, কলা, কমলালেবু, ভেজিটবল চপ আর দুটো করে সন্দেশ।”

ইগল চোখ বড় বড় করে বলে, “বাপ রে! তা হলে তো যেতেই হয়!”

তার আম্পায়ারের পোশাক নেই, গায়ে ঢলঢলে একটা নীল পুলওভার, পরনে লম্বায় খাটো জিন্স, পায়ে হাওয়াই চপ্পল এবং ন্যাড়া মাথা। তবে বাবলু কোথা থেকে একটা সাদা টুপি জোগাড় করে এনেছে। সেইটে মাথায় দিয়ে যখন ইগল স্টাম্পের পিছনে দাঁড়াল তখনই ক্রিকেট খেলাটাও যেন একটু একটু মনে পড়ে যেতে লাগল তার। ওই তো স্লিপ, কভার, মিড উইকেট, লং অন, লং অফ, পয়েন্ট, লং লেগ! ছয় বলে ওভার হয়। নিয়মকানুনগুলোও ধীরে ধীরে মনে পড়ে যাচ্ছে তার। সবুজ মাঠ, আর মাঠভরা আল্লাদী রোদ। মনটা ভারী চনমনে হয়ে উঠল ইগলের। রক্তে অ্যাড্রেনালিন ছুটছে। খেলা হচ্ছে টেনিস বলে। ব্যাটে বল লাগার পং শব্দটাও যে কী ভাল লাগল তার কানে, আর ঘাসের ওপর দিয়ে সাদা বলটার পড়ি কি মরি দৌড়ের দৃশ্যও তো দেখার মতো!

কুমোরপাড়ার ওপেনিং ব্যাটসম্যান সমীর ক্রস ব্যাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ইগল আম্পায়ারিং ভুলে তার কাছে গিয়ে সোজা ব্যাট কী করে ধরতে হয় তা সবুজে শিখিয়ে দিল। তীর্থঙ্কর বারবার মারতে গিয়ে ফসকাচ্ছে, ইগল এগিয়ে এসে বলল, “ইয়ংম্যান, ড্রাইভ মারতে হলে পিছনের পায়ে ভর দিতে হবে যে! আর শরীরটা হেলিয়ে দিতে হবে পিছনের দিকে। এসো দেখিয়ে দিচ্ছি!” বলে নিজেই একটা ড্রাইভ মেরে দেখাল। সর্বজিৎ পরপর ওয়াইড বল দিচ্ছিল, তার কাছে গিয়ে বলল, “বেশি জোরে বল করতে যোয়ো না, মাথা ঠান্ডা রেখে স্টাম্পের ওপর বল রাখো।” নিজেই একটা ইয়র্কার বল করে দেখিয়ে দিল। আর এইসব করতে করতেই ইগল বুঝতে পারছিল, বাচ্চারা তাকে ভারী পছন্দ করে ফেলছে। কেউ আউট হলেই সে ‘সরি’ বলে দুঃখ প্রকাশ করে, কেউ একটা চার বা ছয় মারলে চোঁচিয়ে ওঠে ‘সাবাস!’

আস্তে আস্তে কখন নিজের অজান্তে বাচ্চাদের এই ক্রিকেট ম্যাচটা তাকে এমন সম্মোহিত করে ফেলল যে, তার চারদিকের বাস্তবতা লুপ্ত হয়ে গেল, সে কী অবস্থায় আছে তাও তার মনে রইল না।

চটকা ভাঙল, যখন মাঠের বাইরে থেকে হঠাৎ হেঁড়ে গলায় কে একজন চোঁচিয়ে উঠল, “এই বীরু, তোদের আম্পায়ারটা কে রে? এ তো চেনা মুখ নয়! কোথা থেকে ধরে এনেছিস?”

বীরু নামের ছেলেটা মিড উইকেটে ফিল্ডিং করছিল, চোঁচিয়ে বলল, “উনি ইগলদা, বাবলুর দাদা।”

ইগল ততস্থ হয়ে দেখল, মাঠের বাইরে বেশ কিছু লোকজন খেলা দেখতে জড়ো হয়ে গেছে। দেখে একটু দুশ্চিন্তা হল তার। লোকজনের মধ্যে কেউ আবার তাকে চিনে ফেলবে না তো!

টিফিনটাইমে বাচ্চাদের সঙ্গে মাঠের রোদে বসে সবে পাঁউরুটিতে কামড় বসিয়েছে ইগল, ঠিক সেইসময়ে মাঠের বাইরে একটা সোরগোল উঠল, “ওই তো! ওই তো বসেবসে পাঁউরুটি খাচ্ছে! ধর ধর—”

ইগল চকিতে দেখতে পেল, কয়েকটা যণ্ডামার্কী লোক ছুটে এদিকেই আসছে, সবার আগে হারু কুণ্ডু। হাতের পাঁউরুটিটা ফেলে ইগল পট করে উঠেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। কোথায় উড়ে গেল তার হাওয়াই চটি, কোথায় ভেসে গেল তার টুপি! আঁদাড়পাদাড় ভেঙে প্রাণপণে দৌড়েতে লাগল সে।

তিন

ক্লাস নাইনে বাংলায় রচনা এসেছিল ‘তোমার জীবনের লক্ষ্য’।

তাইতে নন্দলাল লিখেছিল, আমার জীবনের লক্ষ্য হইল একজন ভাল গুন্ডা হওয়া। গুন্ডাকে সকলেই ভয় পায় এবং সমীহ করে। তাহাদের গায়ে অনেক জোর থাকে, এবং তাহারা কাহাকেও ভয় পায় না। সকলেই তাহাদের পূজার চাঁদা দেয়, কেহ বেয়াদবি করিতে সাহস পায় না। পাঁচু মোদকের দোকানে শিঙাড়া ও জিলাপি খাইলে তাহাদের দাম দিতে হয় না। আমাদের পাড়ার হাবু গুন্ডার অনেক মাসল আছে, তাহার চুলও খুব লম্বা, হাতে লোহার বালা। আমারও ওইরূপ হওয়ার ইচ্ছা। বেশি লেখাপড়া শিখিলে গুন্ডা হওয়া যায় না, তাই আমারও বেশি লেখাপড়া করার ইচ্ছা নাই। ইত্যাদি। এই রচনা পড়ে বাংলার মাস্টারমশাই রমেশবাবু তার কান মলে দিয়েছিলেন, আর বাড়িতেও সকলের কাছে হেনস্থা হতে হয়েছিল।

তা বলে জীবনের লক্ষ্য থেকে নন্দলাল বিচ্যুত হয়নি। গুন্ডা হওয়ার কেতাই আলাদা। গুন্ডা মানেই শিহরন, উত্তেজনা, গ্ল্যামার, খাতির। তাই হাপসুছপুস ব্যায়াম করে সে তাগড়াই চেহারা বানিয়েছে। কুংফু কারাটেরও তালিম নিয়েছে। লম্বা চুল রেখেছে, হাতে লোহার বালাও হয়েছে তার। চলনবলন যতদূর সম্ভব গুন্ডার মতোই করে তোলার চেষ্টাতেও কসুর করেনি সে।

কিন্তু তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে কি না তা বলা যায় না। কারণ, গুন্ডা হওয়ার সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তার বাবার তাড়নায় তাকে বি এ আর এম এ-ও পাশ করতে হল। আর লেখাপড়ার চাপে গুন্ডা হওয়ার তেমন ফুরসতটাই পাওয়া গেল না। তারপরও ঝামেলা কি কম? গুন্ডাগিরিতে তো আর মাসমাইনে পাওয়া যায় না, তাই নানা জায়গায় চাকরির জন্য দরখাস্ত আর সি ভি পাঠাতে হচ্ছিল। আর পাঠাতে পাঠাতে হঠাৎ অবাক কাণ্ড! একদিন দেখল যে সে পুলিশের চাকরিতে বহাল হয়ে গেছে! কী আশ্চর্য! যা হতে চেয়েছিল, হল তার একদম উল্টো! গুন্ডার বদলে পুলিশ!

তবে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, পুলিশও আসলে বকলমে উর্দিধারী গুন্ডাই, তা হলে বলতে হবে, নন্দলালের অভীষ্ট একরকমভাবে সিদ্ধই হয়েছে। এখন তাকে সবাই ভয় পায় এবং যথেষ্ট সমীহ করে। এখন ইচ্ছে করলে সে যে কোনও মিষ্টির দোকানে বসে বিনা পয়সায় শিঙাড়া আর জিলাপিও খেতে পারে বটে।

আজ সকাল থেকে একটা লোকের পিছনে হা-হয়রান হতে হচ্ছে থানার ওসি নন্দলাল চক্রবর্তীকে। লোকটা হল ইগল রায় নামে একজন পাগল। তার আবার দুটো আইডেন্টিটি। পাগলাগারদের খাতায় তার নাম ইগল রায়, আবার কারও কারও মতে সে একজন প্রাক্তন জিমিন্যাস্ট বুলু মজুমদার। তাকে আবার নিছক পাগলও বলা যাচ্ছে না। পাগলাগারদের ইন্চার্জ ইন্দুমতী মিত্রের মতে ইগল রায় পাগল নন, স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষ। আবার একই রাতে লোকটা দু’বার মিসিং হয়েছে। একবার পাগলাগারদ থেকে। আর একবার বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব থেকে। পাগলাগারদ থেকে সে পালিয়েছে টারজানের কায়দায়, তিনতলার জানালার গ্রিল খুলে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে আমগাছের ডাল ধরে এবং দেওয়াল উপরে। আর ক্লাব থেকে তার নিপাত্তা হওয়াটা অন্যরকম, কেউ বা কারা লাথি মেরে দরজা ভেঙে ঢুকেছে, কারণ দরজায় বেশ কয়েকটা জোরালো জুতোর ছাপ রয়েছে। ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে লোহার রড, একটা হাসুয়া, একটা ক্রিকেট ব্যাট, মেঝেয় রক্তের দাগ। ভায়োলেন্সের স্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং ধরেই নেওয়া যায় যে, ইগল রায়কে মারধর করে অপহরণ করা হয়েছে। অন্তত ক্লাবের ছেলেদের তাই ধারণা। তাই চোখের সামনে একটা ভারচুয়াল জিগস পাজল নিয়ে বসে নন্দলাল মাথা খাটানোর চেষ্টা করছিল। আর এ কথা কে না জানে যে, শরীরের কসরতের চেয়ে মাথার কসরত অনেক বেশি কঠিন! দারোগার কাজে তাই সুখ পায় না নন্দলাল।

শহরের তালেবর গুন্ডাদের একটা লিস্ট থানায় আছে বটে, কিন্তু মুশকিল হল যত দিন যাচ্ছে তত নতুন নতুন মস্তানের আবির্ভাব ঘটছে। বেকার বাড়লে গুন্ডাও বাড়ে, সকলের হিসেব রাখা সহজ নয়। লিস্টটা সুতরাং আপডেট করা দরকার। সাতজন বাছা বাছা গুন্ডাকে লক আপে

পোরা হয়েছে। তারা অবশ্য শপথ খেয়ে বলেছে, অপহরণটা তারা করেনি। বেলা বাড়লে আরও কয়েকজনকে ধরে আনা হবে। কেউই সহজে স্বীকার করবে না। সুতরাং থার্ড ডিগ্রি লাগাতে হবে। তাতেও কাজ না হলে অগাধ জল।

খড়কের মাথায় তুলোর টিপলি পরিয়ে তার ডান কানের খোল পরিস্কার করে দিচ্ছিল গনা। ডান কানের পর বাঁ কান ধরবে। দুটো কান হয়ে গেলে মাথা চুলকে দেবে। এইসব কাজ গনা ভালই পারে। শুধু চুরিটাই যা পেরে ওঠে না। শেষরাতে লাহাবাবুদের বাড়ির একতলার দক্ষিণের ঘরের জানালার পাশে খোলার চেষ্টা করছিল বলে লাহাবাবুদের দারোয়ান মিশিরলাল তাকে ধরে গোয়ালঘরে বেঁধে রেখেছিল। আজ সকালে থানায় এনে জমা করে গেছে।

তবে থানা জায়গাটা মোটেই খারাপ লাগে না গনার। অনেকটা নিজের বাড়িঘরের মতোই। সবাই ভারী চেনাজানা, আপনজন বললেই হয়। মাঝে মাঝে চড়-থাপ্পড়ও জোটে বটে, তবে সেসব গায়ে মাখলে কি চলে! মা-বাপও কি ছেলেপুলেদের চড়টা থাপ্পড়টা দেয় না? আর বড়বাবু তো সাক্ষাৎ বড় ভাইয়ের মতো। গনা তাই খুব যত্ন করে বড়বাবুর কানের খোল বের করার চেষ্টা করছিল। তা বলে তার চোখ কান যে সজাগ নেই তা নয়। ঘটনার গতিপ্রকৃতি সবই সে মনেমনে টুকে নিচ্ছিল। একসময়ে সাহস করে গলাটা একটু নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, “বড়বাবু, একটা কথা কব?”

“কী কথা?”

“বলছিলুম কী, যে লোকটা অপহরণ হয়েছে তাকে উদ্ধার করে এনে দিলে সরকার কি পুরস্কার টুরস্কার কিছু দেবে বলে মনে হয়?”

চোখ না খুলেই নন্দলাল বলে, “কেন রে, পুরস্কার দিলে তোর তাতে সুবিধে কী?”

“আজ্ঞে সুবিধে তেমন নেই বটে, তবে পুরস্কার টুরস্কার হলে একটু খুঁজেটুজে দেখতাম আর কী!”

“তার চেয়ে বরং চুরিটা ভাল করে শেখ, কাজে দেবে। রোজ রোজ ধরা পড়ে থানায় জমা হচ্ছিস, তোর লজ্জাশরম নেই!”

“আজ্ঞে আজ কিন্তু আমাকে বুটমুট ধরে আনল মিশিরলাল। চুরিখারি কিছুই করিনি মশাই, একটু হাঁটাচাঁটা করতে বেরিয়েছিলাম। অনেকটা হাঁটাচাঁটা হওয়ায় সবে একটু হাঁফ ছাড়তে দাঁড়িয়েছি, একটা দেওয়ালে একটু ঠেসও দিয়ে ফেলেছিলাম। খেয়াল করিনি যে, সেটা লাহাবাবুদের বাড়ির দেওয়াল। কারও দেওয়ালে ঠেস দেওয়াটা তো আর কোনও বেআইনি কাজ নয়! কিন্তু কে শোনে কার কথা! হঠাৎ পিছন থেকে এসে জাম্বুবানটা সাপটে ধরে ফেলল।”

“মাঝরাতে হাঁটাচাঁটা করতে বেরিয়েছিলিস কেন? ভাল লোকদের তো মাঝরাতে ঘুমোনার কথা!”

“তা বটে, তবে কাল রাতে আমার ভায়রাভাই এসেছে কিনা, তাই বিছানাটা তাকে ছেড়ে দিয়ে আমি সময় কাটাতে একটু বেরিয়েছিলাম আর কি। শত হলেও কুটুম মানুষ, খাতিরই আলাদা।”

“ভায়রাভাই! তুই আবার বিয়ে করলি কবে?”

জিভ কেটে গনা বলে, “আজ্ঞে কী যে বলেন বড়বাবু! আমারই আধপেটা জোটে না তার আবার বিয়ে!”

অবাক হয়ে নন্দলাল বলে, “বিয়ে না করলে তোর ভায়রাভাই হয় কী করে?”

গনা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, “ভায়রাভাই হতে হলে কি বিয়ে করতে হয় নাকি বড়বাবু? এটা তো জানা ছিল না!”

বিরক্ত হয়ে নন্দলাল বলে, “তোর দোষ কী জানিস, মিথ্যে কথাটাও গুছিয়ে বলতে শিখলি না!”

গনা ভালমানুষের মতো বলল, “আজ্ঞে আমার তিন কুলে কেউ নেই কিনা, তাই সম্পর্কগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। ইনি আসলে আমার দূরসম্পর্কের জামাইদাদা। মুখ ফস্কে ভায়রাভাই বলে ফেলেছি।”

“হলেই ভাল। জামাইদাদা যেন আবার ফস করে পিসেমশাই না হয়ে যায়, দেখিস বাপু!”

লজ্জা পেয়ে গনা জিভ কেটে বলে, “আজ্ঞে আর ভুল হওয়ার জো নেই, ইনি নির্যাস আমার জামাইদাদাই বটে।”

“তা তোর জামাইদাদাও কি তোর মতোই হাড়হাভাতে নাকি?”

“না না স্যার, কী যে বলেন! জামাইদাদার বিরাট অবস্থা! দু’হাতের আঙুলে আটখানা আংটি, গলায় সোনার চেন, সুটেড বুটেড মানুষ, পুরুষ্টু মানিব্যাগ।”

“বলিস কী! তা তোর জামাইদাদার কিসের কারবার, স্মাগলার না কালোবাজারি?”

“না না, বড়বাবু, সেসব নয়। বেশ ফাঁদালো ব্যবসা।”

“তোর জামাইদাদা কি পাঞ্জি লোক নয় বলছিস? তবে শোন, পাঞ্জি লোকদের আমি পছন্দই করি। দুনিয়াটা তো পাঞ্জি লোকরাই চালাচ্ছে কিনা। আমি যে পুলিশের কাজে হাত পাকালুম তাও তো পাঞ্জি লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করেই। পাঞ্জি লোকেরা আছে বলেই মাসের শেষে আমরা বেতন পাই। বুঝলি? মন দিয়ে বরং একজন পাঞ্জি লোক হওয়ার চেষ্টা কর দিকি!”

“যে আজ্ঞে বড়বাবু!”

সেপাই রামপদ ঠাণ্ডা সুস্থির মানুষ। ঘরে ঢুকে সেলাম করে দাঁড়াল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, “বড়বাবু, একটা কথা ছিল।”

“বলে ফ্যালা!”

“যে লোকটার অপহরণ হয়েছে সেই ইগল রায়কে নাকি একটু আগে খাসনবিশদের মাঠে বাচ্চাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে দেখা গেছে!”

নন্দলাল অত্যন্ত অবাক হয়ে বলে, “সে কী! অপহরণ হওয়ার পর তার তো ক্রিকেট খেলার কথা নয়! তাকে তো আমরা এখনও রেসকিউই করিনি! তা হলে সে ক্রিকেট খেলছে কী করে? তার তো এখন কোনও অন্ধ কুঁরিতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকার কথা!”

“কলিকালে কত কী হয় বড়বাবু! বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা জলে ভাসি যায়!”

“এখনও মুক্তিপণ চাওয়া হল না, কোনও থ্রেট কল এল না, তার আগেই লোকটা ক্রিকেট খেলতে নেমে গেল!”

এসব শুনে গনা শশব্যস্ত বলে উঠল, “বড়বাবু, আমি তা হলে এখন আসি গিয়ে! বাড়িতে মস্ত কুটুম এসেছে, একটু বাজারহাট না করলেই যে নয়!”

নন্দলাল হাত নেড়ে বলে, “যা যা, বিদেয় হ, আমাকে এখনই বেরোতে হবে।”

থানা থেকে বেরিয়ে পাইপাই করে ছুটে প্রথমে খাসনবিশদের মাঠে গিয়ে হাজির হল গনা। যা দেখল তা আশাপ্রদ নয়। মাঠ ফাঁকা, একটা বুড়ি ছাগলের খুঁটো পুঁতছে।

“বলি ও খুড়িমা, এই মাঠে যারা খেলছিল তারা কোথায় গেল বলো তো!”

“তারা সব বাড়ি চলে গেছে বাছা। কতগুলো মুশকো গুন্ডা এসে এমন তাড়া করল যে, বাছারা পালানোর পথ পায় না।”

“গুন্ডা! গুন্ডা তাড়া করবে কেন?”

“তা কি জানি বাছা। ‘ওই ওই ধর ধর’ বলে কতগুলো লোক এমন মারমুখে হয়ে ধেয়ে এল যে আঁত শুকিয়ে যায়। ওই খোকাাদের দলে একজন ধেড়ে লোকও ছিল।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ধেড়ে লোকটা কোনদিকে গেল বলো তো খুড়িমা!”

“তা কে দেখেছে বাপু! যে যেদিকে পেরেছে দৌড়ে পালিয়েছে। আহা, বাছারা সবে একটু টিফিন করতে বসেছিল, তাড়া খেয়ে সব ফেলে পালাল। পাড়ার কুকুরগুলো এসে এই একটু আগে সব কাড়াকাড়ি করে সাবাড় করেছে।”

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল গনা। দরজা হাঁ হাঁ করছে খোলা। ঘরে হাওয়াবাস বইছে। ঘর ফাঁকা। উঠোন, কুয়োতলা, কুয়োর পাশে কচুবন সব আঁতিপাতি করে দেখল সে। ইগল রায় হাওয়া। ঘরে এসে চৌকির তলা, এমনকি তার পাতলা তেলটিটে তোশকটা অবধি একটু তুলে তলাটাও দেখল। ইগল রায়ের চিহ্নমাত্র নেই। বুকটা ভারী দমে গেল

গনার, একটা দুটো নয়, দশ-দশটি হাজার টাকা! সোজা কথা তো নয়! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সে।

রাতে ঘুম হয়নি, মিশিরলাল তাকে গোয়ালঘরে বেঁধে রেখেছিল বলে সারা রাত মশার কামড় খেতে হয়েছে, তার ওপর দশ হাজার টাকা হাতছাড়া হওয়ার দুঃখ। বসে বসে সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একটু তুলুনি এসে গিয়েছিল তার।

হঠাৎ ঘরে জোরালো শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনে চটকাটা ভাঙল। চেয়ে যা দেখল তাতে অন্তরাশ্রা কঁপে উঠল গনার। পাঁচ-সাতজন দানবাকৃতি লোক কখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে তার দিকে কুটিল ও হিংস্র নয়নে চেয়ে আছে। একটু পিছনে হারু কুণ্ডকেও আধখানা দেখতে পাচ্ছিল গনা। তবে সেই পাগলাগারদের দৌর্দণ্ডপ্রতাপ হারু কুণ্ড নয়, খানিক জড়সড়, ভয় খাওয়া, কাঁচুমাচু আর চূপসে যাওয়া হারু কুণ্ড। চুল ডোঁড়াডোঁড়া, ডান চোখের নীচে কালশিটে, ঠোঁটের কষে একটু রক্তও শুকিয়ে আছে বলে মনে হল যেন! তার মানে ইগল রায় পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে যাওয়ায় হারু কুণ্ডের ওপরেও বেশ ডলাইমলাই হয়েছে! দেখে খুশিই হল গনা। তবে গতিক যে ভাল নয় তা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করার দরকার হল না। ডান দিকের উঠানের দরজাটা খোলা এবং সে হরিণের মতো দৌঁদোঁতে পারে, এই ভরসায় হঠাৎ ঢোঁকি থেকে এক লাফে নেমে সে উঠানে বাঁপ খেয়ে পড়ার একটা চেষ্টা করল বটে, কিন্তু সবার সামনে দাঁড়ানো মিশমিশে কালো আর আড়েদিঘে পাহাড়প্রমাণ হেক্কোটা বিনা আয়াসে একখানা পা বাড়িয়ে তাকে ছোট করে একটা ল্যাং মারল শুধু। গনা ডিগবাজি খেয়ে ঘচাত করে মেঝেতে পড়ে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে রইল। তারপর নিরুপায় হয়ে ভারী গ্যালগ্যালে একটা হাসি হেসে বলল, “আজ্ঞে নমস্কার! নমস্কার! আস্তাজ্ঞে হোক, বস্তাজ্ঞে হোক! কী সৌভাগ্য আমার! কী সৌভাগ্য!”

সামনের সদাঁর গোছের লোকটা স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল, বাঁশফাটা গলায় বলল, “সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য সেটা একটু পরে বুঝতে পারবি। এবার বল, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস লোকটাকে! জ্যান্ত বা মড়া যে কোনও অবস্থাতে লোকটাকে আমাদের চাই!”

ভারী ভালমানুষের মতো মুখ করে গনা বলে, “আজ্ঞে, কার কথা বলছেন বলুন তো কর্তা! আমার তো কারও কথা মনে পড়ছে না!”

“আমরা ভাল লোক নই, বুঝতে পারছিস তো! আর আমাদের মেজাজও ভাল নেই। লোকটা তোর ঘরে রাতে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। সত্যি কিনা!”

গনা খুব ভাবিত মুখে বলে, “আপনারা যাকে খুঁজছেন সেই লোকটাই কি না জানি না, তবে একজন লোক কাল রাতে ঠান্ডায় জবুথবু হয়ে একটু মাথা গোঁজার জায়গা চেয়েছিল বলে থাকতে দিয়েছিলাম বটে। কিন্তু কাউকে বিশ্বাস নেই মশাই। সেই লোক তো দেখছি আমার তোশকের তলায় লুকোনো দশ হাজার টাকার বান্ডিলটা নিয়ে পালিয়ে গেছে! আগে জানলে কি ঘরে ঢোকাতুম?”

গনা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার গালে একটা বাঘা থাবড়া এসে পড়ল। মারধর অনেক খেয়েছে বটে গনা। কিন্তু এই থাবড়াটা খেয়ে বুঝল, ওস্তাদের মার কাকে বলে! ব্রহ্মরজ্জ পর্যন্ত গরম হয়ে চোখে ফুলঝুরি দেখতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ গেল ধকলটা সামলাতে।

লোকটা গভীর গলায় বলে, “ইগল রায়ের বাজারদর জানিস? কোটি কোটি টাকা! তোর ওঁছা ওঁই দশ হাজার টাকা সে পা দিয়েও ছোঁবে না।”

গনা গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, “যে আজ্ঞে। তা হলে বোধহয় তিনি ভাল লোকই হবেন! আমারই ভুল হয়েছিল।”

“সে ভাল লোক না খারাপ লোক তা বুঝে ওঠা তোর কস্মো নয়। এখন বল লোকটা গেল কোথায়?”

“আজ্ঞে কর্তা, আপনারা গণ্যমান্য লোক, আপনাদের কাছে মিছে কথা কয়ে কি নরকবাস করব মশাই? আমি কাল রাতে এক গোয়ালঘরে বাঁধা ছিলাম, তারপর থানায় গন্ত হই। এই একটু আগে ছাড়া পেয়েছি। তাঁর গতিবিধি আমার কিছুই জানা নেই।”

“ওসব বলে লাভ হবে না। কাল রাতে ইগল রায় একবার বরাতজোরে

বেঁচে গেছে, কিন্তু এবার আর বাঁচবে না। তার সঙ্গে কাল রাতে তোর কী কী কথা হয়েছে বল দেখি!”

গনা অবাক হয়ে বলে, “তেনন কিছু কথা হয়নি তো কর্তা! তিনি তো পুরনো কথা সব ভুলে মেরে দিয়ে বসে আছেন! ওরকম লোকের সঙ্গে কি আর কথা কয়ে সুখ আছে কর্তা?”

লোকটা চোখ সরু করে তার দিকে চেয়ে বলে, “আমরা খবর রাখি তুই একসময়ে পাগলাগারদে ঝাড়পোঁছের কাজ করতিস। তখন থেকেই কি তোর সঙ্গে লোকটার সান্টি?”

খতমত খেয়ে গনা বলে, “আজ্ঞে না, সাঁট হবে কেন? সাঁট কিসের আজ্ঞে? আমি সামান্য মনিষি বই তো নয়!”

“সাঁট না থাকলে সে সবাইকে ছেড়ে তোর ঘরে এসে উঠল কেন? আর তুইও তেনন ভালমানুষ নেস যে, এমনি এমনি একটা উটকো লোককে ফস করে নিজের ঘরে থাকতে জায়গা দিলি। আলবাত দু’জনের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত হয়েছে! লোকটা কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে তা তোর জানার কথা।”

গনা কী বলবে তা একটু গুছিয়ে ভেবে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। মিছে কথা কওয়াটা একটা আর্ট, গুছিয়ে এবং ফাঁদিয়ে বলতে না পারলে বিপদআপদ থেকে গা বাঁচানো মুশকিল। একটু নাটক থিয়েটার করার অভ্যাস থাকলে সুবিধে হত। সেই কবে একবার ‘সীতার বনবাস’ পালায় লবকুশের লব হয়েছিল বটে সে, কিন্তু তার মোটে তিনটে ডায়ালগ ছিল, ‘তাই নাকি’, ‘ওরে বাবা’ আর ‘হায় হায়’! ওইটুকু অ্যাঙ্কিং দিয়ে কি আর এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গনা বলে, “একটা কথা কব কর্তা?”

“কী কথা?”

“আমি বলি কী, আপনারা বরং জুত করে এখানেই সঁটে বসে থাকুন। আমি বরং গিয়ে ফটিকের দোকান থেকে আপনাদের জন্য চা আর বিস্কুট নিয়ে আসি। আপনারা আরাম করে চা বিস্কুট খেতে থাকুন, ততক্ষণে মনে হয়, ওঁর যখন যাওয়ার আর জায়গা নেই, তখন ঘুরেফিরে, হা-হয়রান হয়ে উনি এখানেই ফিরে আসবেন। তখন কাঁক করে চেপে ধরলেই হল! হেঁ হেঁ!”

“বাঃ, তোর ওইটুকু মাথায় তো এক জাহাজ বুদ্ধি রে!”

গনা গদগদ হয়ে, হাত কচলে বলে, “না না, এ আর এমন কী!”

“আমার সঙ্গে চালাকি!” বলেই লোকটা পট করে হাত বাড়িয়ে তার বিশাল পাঞ্জায় গনার সরু আর পলকা কণ্ঠটা এমনভাবে চেপে ধরল যে, ঘাড়ের হাড় মট করে প্রতিবাদ জানাল। গলা দিয়ে একটা ‘আঁক’ শব্দ আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল গনার, তারপরই দম আটকে, চোখের ডেলা বেরিয়ে যায় যায় অবস্থা। অস্তিম সময় কি এসে গেল তা হলো! ইস, কত কী বাকি থেকে গেল যে! এ বছর শীতে এখনও পাটিসাপটা আর নলেন গুড়ের পায়ের খাওয়া হল না! ‘শোলে’ সিনেমাটা তিনবার দেখা আছে তার, আর একবার দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, সেটা হল না! মাহেশের রথ দেখবে বলে কতকাল খাপ পেতে আছে সে, সেই মাহেশও গেল! নরেশ ঘোষের মতো একটা গোলাপি সিল্কের পাঞ্জাবির ভারী শখ ছিল, সেটাও হল না। আরও কত কী বাকি থেকে গেল! অস্তিম সময়ে আর লিস্ট বাড়িয়ে লাভ নেই। চোখ অন্ধকার হয়ে আসছিল তার। ওই ঝাপসা চোখের আবছায়াতেও হঠাৎ সে টুপিটা দেখতে পেল। সেই সাদা আর আশ্চর্য এক টুপি দরজার ওপরটায় চালের কাছাকাছি শূন্যে ভেসে আছে। কেন ভেসে আছে কে জানে! তবে টুপিটাকে দেখে খুব ভাল লাগল গনার। মরে যেতে যেন আর কষ্ট নেই!

ঠিক এই সময়ে হুড়মুড় করে একটা লোক ঘরে ঢুকে সর্দারের কানেকানে ফিসফিস করে কী যেন বলল। সদাঁর চমকে উঠে বলে, “তাই নাকি?”

তারপরই দুন্দাড় করে লোকগুলো হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ছাড়া পেয়ে গনা প্রথমে লটকে পড়ে গেল মেঝের ওপর, তারপর হ্যা হ্যা করে দম নিতে লাগল। সঙ্গে প্রচণ্ড কাশি। কিছুক্ষণ ঠান্ডা মেঝেতেই পড়ে রইল সে। তারপর ধীরে ধীরে উঠল। টিনের চালের কাছ



বরাবর, যেখানে টুপিটা ভেসে ছিল সেখানে এখন আর কিছু নেই। তবু ওই শূন্য জায়গাটায় অবাক হয়ে চেয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল গনা।

চার

ছুটতে ছুটতে একটা বড়সড় মাঠ পেরিয়ে এক আঘাটায় পৌঁছে গিয়েছিল ইগল। দমফোট অবস্থা। সামনে আর পথ নেই। ঝোপঝাড়, জঙ্গল, বড় বড় ঘাসপাতা, গাছপালা। কিসে যে পা আটকে ধড়াস করে পড়ে গেল সে, তা কে জানে! আর পড়েই সব অন্ধকার। না অন্ধকারও ঠিক নয়। আসলে পড়ে গিয়েই সে নেই হয়ে গেল। আলো অন্ধকার নেই, ভয়ভর নেই, ব্যথাবেদনা নেই, আমি-তুমি নেই, সব ফক্কা, সব ডিলিটেড।

রোগা, গোল গোল চোখ, চুল দাড়ি গোঁফ ঋ কিছু নেই, ফোকলা একটা লোক তার সামনে খাপ পেতে বসে খুব হাসছিল ফ্যাকফ্যাক করে। সে চোখ খুলতেই বলে উঠল, “ওয়েলকাম টু পরলোক, ওয়েলকাম টু পরলোক!”

পরলোক শুনে একটু অবাক হল ইগল। হ্যাঁ, চারদিকটা যেন ঘনায়মান সন্ধ্যার মতো একটা আবছায়া, কিছুই স্পষ্ট প্রতীয়মান নয়। তারাহীন আকাশ, আর একটা থম ধরা ভাব। যেন অন্তহীন এক গোখুলি। সে হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর লোকটার দিকে চেয়ে বলে, “আমি কি মারা গেছি?”

“যাননি মানে! আপনি হাড্বেড পারসেন্ট মারা গেছেন মশাই! ওই তো

দেখুন না আপনার ডেডবডি পড়ে আছে! ওই যে আগাছার জঙ্গল থেকে আপনার ডান পাটা বেরিয়ে আছে, দেখেছেন?”

ইগল তার ডান পাশে, একটু দূরে আকন্দ, কটিকারি, আর মুথা ঘাসের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে থাকা একটা ডান পা দেখতে পেল বটে, তবে নিজের ডান পা বলে চিনতে পারল না। আসলে তার ডান পা কেমন দেখতে তা সে কোনওদিনই তেমন করে লক্ষ্য করেনি। এখন ডান পায়ের জন্য একটু দুঃখই হল তার। চিন্তিত মুখে সে বলল, “তা হলে এখন কী হবে?”

লোকটা ভারী আল্লাদের সঙ্গে বলল, “আপনার আনন্দ হচ্ছে না?”

“না তো! আনন্দ হওয়ার কথা নাকি?”

“কথা নয়? বলেন কী মশাই! এ সময়ে তো একটা ফিল গুড ভাব হওয়ারই কথা! খুব জোর বাঁচা বেঁচে গেলেন যে! একবার মরলে আর আপনাকে মারে কে? এখন ওই শিবু মণ্ডল, গণেশ হেলা, ট্যারা তপন বা ঢ্যাণ্ডা পটাই আপনার পিছনে যতই তাড়া করুক, কিছুই করতে পারবে না স্যার!”

সে অবাক হয়ে বলে, “এরা কারা বলুন তো!”

“আহা, এরাই তো সারা শহর হন্যে হয়ে খুঁজছে আপনাকে! এদের তাড়া খেয়েই তো আপনি পালিয়ে এলেন! তবে আর চিন্তা নেই। এখন গুলিগোলা, বন্দুকপিঙ্গল, বোমাপটকা, ছুরিছোরা কিছুই করতে পারবে না আপনারা!”

ইগল ঋ কুঁচকে বলল, “ওরা আমাকে খুঁজছে কেন জানেনা!”



“তা খুঁজবে না! আপনার হিষ্টি যে ওরা জানতে পেরে গেছে!”

নিজের মাথাটায় একটু হাত দিয়ে কিছু একটা অনুভব করার চেষ্টা করে ইগল, তারপর চিন্তিতভাবে বলে, “আমার কি কোনও হিষ্টি আছে?”

“তা থাকবে না! সব জ্যান্ত মানুষেরই একটা করে হিষ্টি থাকার কথা। এই যে আমি, পলাশবরণ পালধি, এই আমারও কি হিষ্টি নেই? শামুকখোল গাঁয়ে বাস ছিল, পিতা নিবারণ পালধি, মাতা বাসন্তী পালধি, বি এ পাশ, আদালতের মুহুরি, তিন সন্তানের পিতা, ইত্যাদি ইত্যাদি।”

“কিন্তু আমার হিষ্টি আমার মনে নেই।”

“হিষ্টি দিয়ে আর আপনার দরকারই-বা কী মশাই! ও আপদ গেছে যাক। ও সব ভাবতে গেলে পিছুটান জেগে ওঠে কিনা। হিষ্টি অনেকটা শেয়ালের লেজের মতো। শেয়াল যেমন কাঁকড়া ধরতে জলে লেজ ডুবিয়ে বসে থাকে, তেমনই আমাদের হিষ্টির লেজও ইহলোকে নামানো থাকে, সেই লেজ ধরে কেউ টানাটানি করলে পরলোকে মানুষের ভারী অসোয়াস্তি হয় মশাই!”

“কিন্তু আমি যে আমার হিষ্টিই খুঁজে বেড়াচ্ছি!”

“এই তো মুশকিলে ফেললেন! আমি আবার আপনার ইউটিলিটি এজেন্ট কিনা! দাঁড়ান, দেখছি!”

লোকটা তার জামার বুকপকেট থেকে একটা ছোট ময়লা ডায়েরি বের করে পাতা উল্টে দেখতে দেখতে বলল, “সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, আপনার কোনও জন্মসালের রেকর্ড নেই। নাম ইগল ওরফে বুলু রায় মজুমদার। আনুমানিক বয়স তেইশ বছর, জন্মের কোনও রেকর্ড

নেই, মাতাপিতার পরিচয় জানা যায় না, জনকপুরের জনৈক উদ্ধব রায় মজুমদার এবং মধুবনি রায় মজুমদারের কাছে সন্তানবৎ লালিতপালিত, তাঁদের নিজস্ব সন্তানের নাম চতুর্ভুজ রায় মজুমদার। বছর কয়েক আগে এক আপতনে আপনার স্মৃতি বিলুপ্ত হয়।”

বিস্মিত ইগল ঋকুঁচকে বলে, “আপতনো!”

“আমার ডায়েরিতে সেরকমই টোকা আছে। আর একটা কথাও আপনার জানা দরকার। ইহলোকে আপনি কিন্তু একজন বেশ ধনবান ব্যক্তি, কারণ উদ্ধব রায় তাঁর বিশাল বিষয়সম্পত্তির অর্ধেক আপনার নামে লিখে দিয়ে গেছেন। অবশ্য এখন আর তাতে লাভ নেই। মরে গেলে সবই লবডঙ্কা। ওই হিষ্টির খাতিরে জানিয়ে রাখলাম আর কী!”

“আর কিছু?”

“আহা, বেশি খুঁড়তে গেলে যে, কেঁচোর বদলে সাপ বেরিয়ে পড়বে মশাই! মরার পর আর ইহলোক নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী আপনার? ওই শেয়ালের লেজ ধরে যত টানবেন ততই হাছতাশ।”

“আমি জানতে চাই যে!”

“আপনাকে নিয়ে ভারী মুশকিল দেখছি! তা হলে ঠারেঠোরে একটু আধটু বলছি। আপনাদের বাড়িতে একটা পোষা ময়নাপাখি ছিল। দাঁড়ে বসে কথাটাকা কইত। একদিন কীভাবে যেন শিকল খোলা পেয়ে পালিয়ে যায়। তবে বেশিদূর যেতে পারেনি। শীতকাল বলে দরদালানের জানালাদরজা বন্ধ থাকায় উড়ে যাওয়া হয়নি তার। ধরা পড়ে যায়। পাখির এই বেয়াদবি দেখে রেগে গিয়ে চতুর্ভুজ তার দুটো চোখ কানা

করে দিয়েছিল, যাতে আর কখনও পালাতে না পারে।”

“আর কিছু?”

“আরও চাই? যত জানবেন ততই যে ঝঞ্ঝাট বাড়বে মশাই।”

“শ্লিঞ্জ বলুন।”

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “সুখে থাকতে কেন যে ভূতের কিল খেতে চাইছেন! তা হলে বলি, চতুর্ভুজ ফড়িংয়ের পাখনা ছিঁড়তে খুব ভালবাসত, ভালবাসত গুলতি দিয়ে পাখি মারতে, আর আপনার যখন চার বছর বয়স তখন একবার আপনাকে তিনতলার ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আপনি পড়তে পড়তেও কান্নিস ধরে ঝুল খেয়ে ছিলেন, যা ওইটুকু বাচ্চার পক্ষে অস্বাভাবিক। শুধু অস্বাভাবিকই নয়, প্রায় অলৌকিক। উদ্ধব রায় ওই ঘটনায় চতুর্ভুজকে উত্তমকুস্তম মারধর করেন। আর আপনার ঝুলে থাকার ক্ষমতা দেখে উদ্ধব হয়ে আপনাকে জিমনাস্টিকস শেখাতে জিমে ভর্তি করে দেন।”

“আর কিছু?”

“আরও চাই? আপনার তো খাঁই মিটছে না দেখছি! দিবা টুক করে মারা গিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়েছেন, এখন তো আপনার আনন্দ করার সময়। আনন্দটাকে মাটি করতে চান?”

“আমার কোনও আনন্দ হচ্ছে না। আপনি বলুন।”

“আপনার যখন তিন মাস বয়স তখন কে বা কারা একদিন একটা ধামায় করে আপনাকে উদ্ধব রায়ের সদর দরজায় রেখে দিয়ে যায়। ফুটফুটে বাচ্চাটাকে দেখে উদ্ধব রায় আর মধুবনি রায় আপনাকে ফেলতে পারেননি। চতুর্ভুজের বয়স তখন বারো বছর। তার একচ্ছত্র রাজত্বে আপনি ঢুকে পড়ায় স্বাভাবিক কারণেই সে আপনার ওপর খুশি ছিল না। তার ওপর উদ্ধব আর মধুবনি আপনাকে চোখে হারাতে লাগলেন বলে চতুর্ভুজের সঙ্কট দেখা দেয়। আপনার কি চতুর্ভুজের ওপর রাগ হচ্ছে? হলেও লাভ নেই, আপনি এখন পরলোকে, সব ভালমন্দের উর্ধ্বে।”

“তারপর?”

“এরপরেও শুনতে চান? শুনে লাভ কী? যা ঘটে গেছে তা তো আর ওল্টানো যাবে না! শুধুমুদু মনটা খিঁচড়ে থাকবে।”

“তবু আমি শুনতে চাই।”

“আপনার কি মনে হয় না যে, মেমোরি ডিলিট হয়ে যাওয়ার মধ্যেও একটা পজিটিভ ব্যাপার আছে! ওই যে কবি বলেছিলেন, কে হয় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে! ওসব যত ভুলে থাকা যায় ততই তো ভাল।”

“আপনি বলুন, আমি শুনব।”

“আচ্ছা নাছোড় লোক তো আপনি! তা হলে বলি, চতুর্ভুজকে তেমন দোষ দেওয়া যায় না কিন্তু। আপনি অজ্ঞাতকুলশীল, কুড়িয়ে পাওয়া, বাইরের ছেলে, আপনাকে আশকারা দেওয়াটা চতুর্ভুজের পছন্দ না হওয়ারই কথা। তার ওপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভিতরে এমন কিছু লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করল যা মোটেই স্বাভাবিক নয়। বরং খানিকটা অতিমানবীয়। মেধা, শারীরিক সক্ষমতা, দ্রুতগতি, সহ্যশক্তি সবকিছুই যেন বাড়াবাড়ি রকমের। এটা চতুর্ভুজের নিরাপত্তার পক্ষে অনুকূল ছিল না। শুধু ছাদ থেকে ফেলে দেওয়াই নয়, সে একবার আপনাকে পুকুরে সাঁতার শেখানোর নাম করে ডুবিয়ে মারারও চেষ্টা করেছিল। তখন আপনার আট বছর বয়স। চার মিনিট ডুবে থাকার পরও আপনি যে মরেননি সেটা তো আর চতুর্ভুজের দোষ নয়। বরং দোষটা আপনারই। স্বাভাবিক নিয়মে আপনার তখনই ভদ্রভাবে মরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আপনি অত্যন্ত অনায়াসকর সুবিধাভোগীর মতো বেঁচে ছিলেন। পেটে সামান্য একটু জল ঢোকা আর মূর্ছা যাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছুই হয়নি। সেই ঘটনায় চতুর্ভুজকে ত্যাজ্যপূত্র করতে চেয়েছিলেন উদ্ধব রায়, মধুবনি রায় হাতেপায়ে ধরে সেটা আটকান।”

“আপনি থামছেন কেন? বলুন।”

“দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। আগাগোড়া আমি আপনার রিঅ্যাকশন লক্ষ করছি। এসব কুচুটে কথাবার্তা শুনেও আপনি দিবা নির্বিকার মুখে বসে আছেন দেখতে পাচ্ছি! আপনার গা গরম হয়ে উঠছে না! মাথা দিয়ে

আঙুনের হলকা বেরোচ্ছে না! দাঁত কড়মড় করছে না! অথচ আপনার এখন ওগুলোই হওয়ার কথা! আপনি যে স্বাভাবিক নন সেটা আপনার জানা উচিত। এই আপনাদের মতো লোককেই ইংরিজিতে বলে কুল কাস্টমার। আর তাই আপনার মতো লোকের সঙ্গে বসবাস করা যে কারও পক্ষেই বিপজ্জনক। চতুর্ভুজ রায় যে নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে শুরু করেন তা অকারণ নয়। বুঝতে পারছেন তো!”

“পারছি পলাশবরণবাবু। এবার এগোন।”

“আমার এসব বলার মোটেই ইচ্ছে ছিল না মশাই, আপনার চাপাচাপিতেই বলতে হচ্ছে। ইউটিলিটি এজেন্টদের কাজই হল মক্কেলদের মন রেখে চলা, তাদের আরামদায়ক অবস্থায় রাখা। শত হলেও একটা নতুন জায়গায় এসেছেন, সব কিছু বুঝতে এবং সয়ে নিতে একটু সময় লাগবে কিনা। তাই এই সময়টায় আপনাকে সঙ্গ দেওয়াই আমার কাজ।”

“থ্যাঙ্ক ইউ। তারপর কী হল বলুন।”

“ওঃ, ভবি দেখছি ভোলার নয়! আপনি সবকিছু না শুনেই ছাড়বেন না দেখছি! তা হলে শুনুন। আঠারো-উনিশ বছর বয়সে আপনি ছ’ফুটের ওপর লম্বা, ধকধকে শরীর, চওড়া কাঁধ, ক্ষুরধার মেধাসম্পন্ন একজন সদ্যযুব। চতুর্ভুজ আপনার চেয়ে ছ’ইঞ্চি বেঁটে, গোলগাঙ্গা চেহারা, অতি মধ্যমেধার লোক। পাল্লাটা একপাশে একটু বেশি হেলে পড়েছিল বলে মনে হয় না আপনার? বেচারি চতুর্ভুজ আপনাকে ভয় পেতে শুরু করেছিল। শিশু বা বালক অবস্থায় সে আপনার ওপর যেসব অত্যাচার করেছিল, তার ভয় হল, এবার আপনি তার প্রতিশোধ নেবেন। তার হাতে মাত্র একটাই রঙের টেক্সা, তা হল আপনি অজ্ঞাতকুলশীল, একজন নোবডি, একজন কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। কিন্তু তার তাস মাত্র ওই একটাই। আর আপনার হাতে বিস্তর তাস, অনেক টেক্সা বিবি গোলাম। চতুর্ভুজের জেতার কোনও চান্সই ছিল না। উদ্ধব আর মধুবনিরও বলিহারি, পালিতপুত্রের প্রতি তাঁদের অত প্রগাঢ় অপতান্নেহেরও কোনও মানে হয় না। উদ্ধব রায় এই সময়ে একটি ইঠকানী সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনাদের সম্পর্কটা আরও বিষিয়ে দিলেন। তাঁর যাবতীয় বিষয়সম্পত্তির অর্ধেক তিনি আপনার নামে উইল করেন। তা নিয়ে বাপ আর ছেলের মধ্যে তুমুল বচসা হয়। উদ্ধব বুঝতে পারেননি যে, ওই কাণ্ড করে তিনি আসলে আপনার বিপদই ডেকে আনছিলেন। সেইসময়েই একটি ঘটনা ঘটে। বাড়িতে জিম করার সময় আপনি রিংয়ের দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যান। আপনার মাথায় আর ঘাড়ে বড় রকমের চোট হয়। অনুসন্ধান দেখা যায়, রিংয়ের দড়িদুটো কেউ আগে থেকেই অর্ধেকের ওপর কেটে রেখেছিল।”

“তারপর?”

পলাশবরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “ঘাপলাটা তো ওইখানেই মশাই! পড়ে যাওয়াটা কেউ ভাল চোখে দেখেনি। সন্দেহের অভিমুখ ঘুরে গেল বেচারি চতুর্ভুজের দিকে। এমন কথা অবশ্য বলা যায় না যে, কাণ্ডটা চতুর্ভুজ করেনি। আবার করেছে বলেও প্রমাণ নেই। আপনাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল। দু’দিন পরে আপনার জ্ঞান ফেরে। কিন্তু তখন আপনি সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রষ্ট। কাউকে চিনতে পারেন না, কোনও কথা মনে নেই। ভাবলা, ভ্যাকান্ট লুক, টোটাল ডিমেনশিয়া। ডাক্তার উদ্ধব রায়কে বলে দিয়েছিল, কিছু করার নেই, ভগবানকে ডাকুন। আর ডাক্তার যখন ভগবানকে ডাকতে বলে তখন বুঝতে হবে, কেস হোল্‌লেস।”

“থেকে গেলেন কেন পলাশবরণবাবু? আপনার কি আর কিছু বলার নেই?”

“না মশাই, আর কী থাকবে! আপনার হিস্তি এটুকুই।”

“আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আপনার সব কথা এখনও বলা হয়নি।”

পলাশবরণ একটু খিঁচিয়ে উঠে বলে, “এখানে থাকতে হলে পিছুটান ছেড়ে আসতে হয়। ইহকাল আর পরকালের মধ্যে দড়ি টানাটানি হলে কি ভাল হবে মশাই? দোতানা খুব খারাপ জিনিস। আমি অনেক বলে ফেলেছি। আমার ডায়েরিও শেষ হয়ে এসেছে।”

“আমি দেখতে পাচ্ছি ডায়েরির কয়েকটা পাতা এখনও বাকি আছে। বাকি গল্পটাও বলে ফেলুন।”

“কী মুশকিল! ডায়েরিতে আর যা লেখা আছে তা তো আপনার ফেভারে নাও যেতে পারে স্যার!”

“নাই-বা গেল। এখন আর তাতে কী-ই বা আসে যায়! আপনি বলুন।”

“আপনার মতো নাছোড়বান্দা আমি আর দেখিনি মশাই! আমাকে নাস্তানাবুদ করে মারছেন! যাই হোক, উদ্ধব রায় আর বেশিদিন বাঁচেননি। মধুবনি রায় স্ট্রোকে শয্যাশায়ী। এমত অবস্থায় চতুর্ভুজ আপনাকে পাগলাগারদে ভর্তি করে দেয়। কাজটা সে খুব একটা খারাপও করেনি। ভেবে দেখবেন সে কিন্তু ভাড়াটে খুনি দিয়ে আপনাকে খুন করায়নি, খুব করুণার সঙ্গে আপনার জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিল। আপনার কিন্তু তার প্রশংসাই করা উচিত। তবে হারু কুণ্ডু নামে যে-ওয়ার্ডেন আছে তার সঙ্গে তার একটা বন্দোবস্ত হয়েছিল বটে। যদি দেখা যায় যে কোনও কারণে আপনার স্মৃতি ফিরে আসছে, তা হলে সে যেন সঙ্গে সঙ্গে তা চতুর্ভুজকে জানায়। কারণ, আপনার স্মৃতির প্রত্যাবর্তন তার পক্ষে নিরাপদ নয়।”

“তারপর কী হল?”

“তারপর দু’বছর নিশ্চিন্তে কেটে গেল। আপনি পাগলাগারদে ভোলানাথ হয়ে আছেন, চতুর্ভুজ নিষ্কটক, কোনও অশান্তি ছিল না। তারপরই একটা ছোটখাটো গন্ডগোল করে ফেললেন আপনি। পাগলাগারদের সুপার ইন্সপেক্টর মিত্র আপনার প্রতি অপত্যম্বেহবশত একদিন বাড়ি থেকে ক্ষীরপুলি তৈরি করে এনে আপনাকে ডেকে খাইয়েছিলেন। তখন সেই ক্ষীরপুলি খেতে খেতে আপনি বলে ফেলেছিলেন, আমার মা-ও ঠিক এরকম ক্ষীরপুলি বানাত। তখন ইন্সপেক্টর জানতে চান, আপনার মা আর কী কী বানাতেন। আপনি তখন পাটিসাপটা, গোকুলপিঠে আর আসকে পিঠের নাম করেছিলেন। আপনার দুর্ভাগ্যক্রমে হারু কুণ্ডু এই কথোপকথন শুনতে পায় এবং প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই চতুর্ভুজকে জানায় যে, আপনার স্মৃতি ফিরে আসছে। আর সেই রাতেই আপনি টারজানের কায়দায় পাগলাগারদ থেকে পালান। এইবার কি আমি একটু দম নিতে পারি?”

“পারেন। আপনার আর কিছু বলার নেই তো!”

পলাশবরণ সেই মার্কামারা ফ্যাকফ্যাক করে দস্তহীন হাসিটা হাসল। তারপর বলল, “এবারই তো ম্যাও বেরোবে স্যার! আমাকে দেখতে বোকাবোকা লাগে বটে, তবে আমি তত বোকা নই কিন্তু!”

“আপনাকে আমার বোকা বলে মনে হয়নি তো!”

“মনে না হলেই ভাল। কারণ আমি সত্যিই বোকা নই। আসল কথাটা হল, আপনি একজন ধুরন্ধর বুদ্ধিমান লোক। আমার অনুমান, আপনি টের পেয়েছিলেন যে, চতুর্ভুজের হাত থেকে আপনার পরিত্রাণ নেই। বিশেষ করে উদ্ধব রায় সম্পত্তির অর্ধেক আপনাকে লিখে দেওয়ায় সমুহ বিপদ উপস্থিত। আপনি যতই বুদ্ধিমান বা শক্তিমান হোন না কেন, চোরাগোপ্তা মার ঠেকানো আপনার কর্ম নয়। গুপ্তঘাতকরা আপনাকে নাগালে পারেই। তাই রিং থেকে পড়ে যাওয়ার পরই আপনি সিদ্ধান্ত নেন, স্মৃতিভ্রষ্টের পাঁচ করে গেলে হয়তো পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। আপনার একটি অমিত শক্তিশালী মস্তিষ্ক আছে। আছে নিজের মনের ওপর অসীম নিয়ন্ত্রণ। তাই আপনি নিজের ওপর স্বতঃঅনুজ্ঞা আরোপ করলেন, যাকে আমরা অটো সাজেশন বলি। নিজেকে মোটিভেট করতে লাগলেন স্মৃতিহীন হয়ে যাওয়ার জন্য। এবং তা হয়েও গেলেন। মেমরি ডিস্ক সাদা হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু সব মেমরিই লেটেস্ট মেমরি বা হিমায়িত স্মৃতি হয়ে থেকেও গেল। খুব অতিমানবীয় মানুষ হলে এটা পারা যায়। এমনিতে স্মৃতিহীন, কিন্তু ইচ্ছে করলেই স্মৃতিকে রিকল বা জাগ্রত করতে পারার ক্ষমতা।”

“আমি অতিমানব নই।”

“আপনি সাদামাটা মানুষও তো নন স্যার।”

“তা হলে আমি কে?”

“আপনি দ্বিতীয় তরঙ্গের মানুষ। এই পৃথিবীতেই বাস, কিন্তু ভিন্ন কম্পাঙ্কে। ভিন্ন সিভিলাইজেশনে। ভিন্ন মাত্রায়।”

“আচ্ছা, এখানে কি একটু জল পাওয়া যাবে? আমার খুব তেঁটা পেয়েছে।”

পলাশবরণের চোখ গোল থেকে যেন আরও গোলাকার হয়ে গেল, “কী পেয়েছে বললেন?”

“তেঁটা!”

“তেঁটা! তেঁটা পাবে কেন? তেঁটা পাওয়ার তো কথাই নয়! মরার পর আবার তেঁটা কিসের?”

“আমার যে খিদেও পাচ্ছে! আজ সারা দিন আমার কিছু খাওয়াও হয়নি।”

“আশ্চর্যের বিষয় মশাই! খুবই আশ্চর্যের বিষয়! তা হলে কি আপনি ঠিকমতো মরেননি? এ তো মুশকিল হয়ে গেল স্যার! ঠিকমতো না মরেই আপনার পরলোকে আসাটা মোটেই বিবেচকের মতো কাজ হয়নি! ভাল করে ভেবে বলুন তো, আপনার কি সত্যিই খিদে এবং তেঁটা পেয়েছে, নাকি ওটা খিদে আর তেঁটার স্মৃতি! অনেক সময়ে লৌকিক স্মৃতিও তঞ্চকতা করে কিনা! অনেক সময়ে মনে হয় খিদেতেঁটা পেয়েছে, কিন্তু আসলে হয়তো পায়নি। সদ্য-সদ্য মরেননি তো, প্রথম প্রথম ওরকম ভুলভাল হতেও পারে। শত হলেও অনেকদিনের অভ্যাস কিনা!”

ইগল একটু ভাবল, তারপর বলল, “না পলাশবরণবাবু, আমার সত্যিই খুব খিদে আর তেঁটা পেয়েছে। স্মৃতিটি সত্যি নয়।”

পলাশবরণ মুখে আফসোসের একটু চুকচুক শব্দ করে বলল, “তবে তো খুবই মুশকিলে পড়া গেল দেখছি! গাড়ি আবার গ্যারাজে ঢোকাতে হবে। কী যে করেন আপনারা! মরাটাও ঠিকমতো মরতে পারেন না! পটাঁই যে আপনাকে কুড়ুলের কোপটা মেরেছিল, তাতে তো আপনার মরবারই কথা ছিল মশাই! সুপারম্যানদেরও তো মৃত্যু আছে স্যার। কিন্তু কী আর করা! যদি সত্যিই না মরে থাকেন তা হলে যান হামাগুড়ি দিয়ে আবার খোলসটার মধ্যে ঢুকে পড়ুন গো। যন্ত সব উদ্ভুটে ব্যাপার!”

ইগল বাধ্য ছেলের মতো হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে নিজের শরীরটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

পাঁচ

হগ সাহেবের মাঠে রোজই মোষ চড়াতে আসে গুড্ডু। মোট পাঁচটা মোষ। তারা শান্ত জীব, আপনমনে ঘাসপাতা খায়, ছোটছোট করে না, পালানোর চেষ্টা নেই। গুড্ডুর তাই তেমন পরিশ্রমও নেই। শুধু একটু নজরে রাখা। দুপুর ঢলে যাওয়ার পর গুড্ডু শিমুল গাছটার তলায় ছায়ায় বসে নুনলব্ধা দিয়ে ছাতুমাথা খাচ্ছিল। ঠিক এই সময়ে হঠাৎ দেখতে পেল, একটা লম্বাপানা, ফর্সা চেহারার ন্যাড়ামাথা লোক প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছে। দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই! কাউকে কখনও অত জোরে ছুটেতে দেখেনি গুড্ডু। আর ভয়ের কথা হল, লোকটার মাথা থেকে রক্ত পড়ছিল। সন্দেহ নেই, লোকটাকে কেউ তাড়া করেছে, আর লোকটা পালাচ্ছে। খাওয়া থামিয়ে গুড্ডু হাঁ করে দেখছিল, লোকটা প্রাণভয়ে ছুটেতে ছুটেতে শালবনীর জঙ্গলে ঢুকে গেল। গুড্ডু ভাবল, লোকটাকে যারা তাড়া করেছে তারাও এসে পড়বে নিশ্চয়ই, আর তা হলে বোধহয় লোকটা খুনই হয়ে যাবে। তাই খাওয়া থামিয়ে সতর্ক হয়ে চেয়ে রইল সে। কিন্তু অনেকক্ষণ অবধি কেউ এল না দেখে একটু নিশ্চিন্দ্রি স্বাস ছেড়েছিল গুড্ডু। সে খুব বজরবন্দীর ভক্ত, রোজ হনুমান চালিশা শোনে হনুমান মন্দিরে গিয়ে, সন্ধেবেলায় মনে মনে হনুমানজির কাছে প্রার্থনা করল, লোকটাকে বাঁচিয়ে দিয়ো ঠাকুর।

যখন আলো মরে আসছে, আর সে তার মোষগুলোকে নিয়ে ফিরবে বলে তৈরি হচ্ছে, তখন একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। যশুগুন্ডার মতোই চেহারা, তবে লোকটার ডান চোখের নীচে কালশিটে, ঠোঁট ফুলে রক্তাক্ত হয়ে আছে, মাথার চুলগুলোও কেমন যেন উড়োখুড়ো। মনে হল খুব মারধর খেয়ে এসেছে। লোকটাকে একেবারেই



পছন্দ হল না গুড্ডুর। লোকটা তার কাছে এসে হাঁপধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, “হ্যাঁ রে ছোঁড়া, এখান দিয়ে লম্বাপানা, ফর্সা একজন লোককে যেতে দেখেছিস? ঠিক খবর যদি দিতে পারিস তবে দশটা টাকা দেব।” গুড্ডু অবাক হয়ে বলে, “কই, কাউকে দেখিনি তো! লম্বা লোক বলতে কাশিপতি ঢোল তার ছাগল তিনটেকে খোঁটায় বেঁধে গিয়েছিল। আর হারুর মাকে গোবর কুড়োতে দেখেছি। আর মুকুন্দবাবু সাইকেলের পিছনে আলুর বস্তা চাপিয়ে নিয়ে গেলেন একটু আগে।”

লোকটা হতাশ হয়ে বলে, “না না, এ অন্য লোক। এ আমার ভাই, বাড়িতে বগড়া করে পালিয়ে এসেছে, তাই খুঁজতে এসেছি।”

ভাই শুনে একটু দোটানায় পড়ে গেল গুড্ডু। দোনোমোনো করে বলেই ফেলল, “আপনার ভাই! তা আগে বলবেন তো! যার কথা বললেন সেইরকমই লম্বা আর ফর্সা একটা লোক ওই শালবনির জঙ্গলে ঢুকেছে। সে তো অনেকক্ষণ আগে!”

“ঠিক বলছিস তো!”

“স্বচক্ষে দেখেছি, ভুল হওয়ার নয়।”

কথাটা শুনে কিন্তু লোকটা মোটেই শালবনির জঙ্গলের দিকে গেল না। তাকে দশটা টাকাও দিল না। উর্ধ্বশ্বাসে যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেদিক পানেই ছুটে চলে গেল।

বাঁ-চকচকে মেঘদূত রেসটুরেন্টে বসে চারজন পরোটা আর মাংস খাচ্ছিল। সারা দিন অনেক ধকল গেছে। তাদের এখন আঙুনের মতো খিদে। কাজটা হতে-হতেও হয়নি। রাতে বাঘা যতীন ক্লাবেই লোকটার ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মন্টাই, বীরু আর পবনকে জখম করে লোকটা হিরোর মতো পালিয়ে যায়। আর আজ তাদের চারজনকেও বড় কম চক্কর খাওয়ায়নি। এমনকি পটাইয়ের টাঙির কোপ খেয়েও জখম অবস্থায় পালিয়ে গেছে। কে জানত যে, লোকটা অমন চিতাবাঘের মতো দৌড়তে পারে!

খাওয়া হয়ে গেছে। শিবু মৌরি মুখে দিয়ে চিবাতে চিবাতে বলে, “দু’বার ফস্কেছে, তিনবারের বার কিন্তু ফস্কাতে চলবে না।”

পটাই গম্ভীর মুখে বলে, “দরকার হলে এবারে লাশ নামিয়ে দেব, ভাবিস না।”

তপন খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বলে, “সব দোষ হারুর, লোকটাকে পালাতে দেওয়াটাই ভুল হয়েছে। নজরে রাখার জন্য হারুরকে প্রতিমাসে মজুরি দেওয়া হয়। ও করছিলটা কী?”

গণেশ ঠান্ডা মাথার লোক, বুদ্ধিমানও। বলল, “মাথা গরম করিস না। তাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে পেলেই খুনটুন করে বসবি। সেটা তো কথা নয়। আগে ধরে নিয়ে গিয়ে সেইসাবুদের ব্যাপারটা সেরে নিতে হবে। তারপর কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তুই যে টাঙিটা চালিয়েছিলি পটাই, তাতে কিন্তু লোকটা মরেও যেতে পারত।”

শিবু বলে, “দূর বোকা, মরে গেলে আর সেইসাবুদের দরকার কী? মরা লোক কি আর সম্পত্তির ভাগ চাইতে আসবে?”

গণেশ ঠান্ডা গলাতেই বলে, “চতুর্ভূজবাবু হয়তো খুনের মামলায় ফেঁসে যেতে চান না।”

“কিসের খুনের মামলা! ওসব সেট করা আছে। ভাবছিস কেন? উনি তো বলেই দিয়েছেন, ডেড অর অ্যালাইভ।”

গণেশ বলে, “ওটা কথার কথা। আমরাই বা কেন বাড়তি একটা খুনের মামলায় ফেঁসে যাই! ঘাড়ে তো গোটা কতক মামলা ঝুলছে!”

শিবু একটু তেরছা হাসি হেসে বলে, “তুই কি জিশু খ্রিস্ট না চৈতন্যদেব! আমাদের কপালে শেষ অবধি ফাঁসি বা যাবজ্জীবন তো লেখাই আছে। নয়তো অপোনেন্টের হাতে অপঘাতে মৃত্যু। বুঝেছিস! অত ভাবলে কি আমাদের চলে?”

এমন সময়ে হাঁফাতে হাঁফাতে হারু কুণ্ডু এসে হাজির। শিবুকে একটা সেলাম ঠুকে বলে, “ওস্তাদ, ইগল শালবনির জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে আছে।”

শিবু ক্রুর চোখে বলল, “খবর পাকা তো! না হলে কিন্তু এবার তাকে জ্যাস্ত পুঁতে ফেলব।”

“খবর পাকা। একটা রাখাল ছেলে স্বচক্ষে দেখেছে।”
সবাই হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। বাইরে তাদের ল্যান্ডরোভার অপেক্ষা করছে।

গনার দলবল নেই, বন্ধুবান্ধবও নেই তেমন, সে হল একাবোকা মানুষ। সে নিজেই নিজের নাম দিয়েছে চোরেক্কে চোর। কিন্তু এখন তার দলবল ভারী দরকার, লোকবল না থাকলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না। শত হলেও লোকটা তার চেনা। তেমন খারাপ লোক বলেও মনে হয় না। তাকে গনাবাবু বলে ডেকেছেও। গনা নামটার সঙ্গে যে বাবু কথটা জোড়া যায়, একথাটাই এককাল তার মাথায় আসেনি! ওই একটা লোকই তাকে যা হোক একটা সম্মান তো দিয়েছে। কতগুলো পাগলাটে, খ্যাপা, মারকুটা বদমাইশের হাতে বেঘোরে লোকটাকে মরতে দেওয়া উচিত হবে না। সেটা অধর্ম হয়ে যাবে। সকালে চা-বিস্কুটটাও খাওয়া হয়নি, সে গিয়ে বাঘা যতীন ক্লাবে হাজির হয়ে গেল। সেখানে তখন জরুরি মিটিং বসেছে, ক্লাবে হামলা, ইগল এবং তার অপহরণ নিয়ে। মধ্যমণি শিবু। তাকে ঘিরে মেলা ছেলেছোকরা, সবাই ভারী উত্তেজিত। গনা গিয়ে মাঝখানে হাজির হওয়ায় সবাই বিরক্ত। কিন্তু গনা ঘাবড়াল না, মাথা ঠান্ডা রেখে আদ্যোপান্ত সব খুলে বুঝিয়ে বলল সে। এবং এটাও বুঝিয়ে বলতে পারল যে, তারা তেড়েফুঁড়ে না উঠলে ইগলের বেঁচে থাকার কোনও আশাই নেই। শিবু গরম হয়ে বলল, “মামাবাড়ির আবদার নাকি, আমরা থাকতে ওরকম গুণী একজন মানুষকে মেরে ফেললেই হল! তার ওপর বলু মজুমদার আমাদের অতিথি। আমরা কি মরে গেছি নাকি!”

ঝিন্টু বলে উঠল, “তার ওপর আমাদের ক্লাবে হামলা চালিয়েছে, দরজা ভেঙেছে, জিনিসপত্র তছনছ করেছে, ইগল রায়কে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে! কত বড় সাহস! আজ অবধি বাঘা যতীন ক্লাবের সঙ্গে কেউ পাক্সা নেয়নি।”

ছেলেছোকরাদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়াতে দেরি হল না। সবাই তেড়েফুঁড়ে উঠে পড়ল, “চল তো, মস্তানদের মস্তানিটা একটু দেখে আসি।” হাতে হাতে লাঠি, স্টাম্প আর হকিস্টিক উঠে আসতে লাগল। গতরাতে গুন্ডাদের ফেলে যাওয়া রডটাও তুলে নিল একজন, মাছের তেলেই মাছভাজার কাজ হবে।

ভারী নিশ্চিন্ত হল গনা। এবার খুনিয়ারা সহজে কাজ হাসিল করতে পারবে না।

নন্দলাল থানায় বসে এ এস আই গুরুপদর সঙ্গে কাশীর বেগুনের গল্প করছিল। ভারী নিশ্চিন্ত হাবভাব। যেন শহরে কোনও ঘটনাই ঘটেনি। সেপাইরা অবশ্য শহরে উঠল দিয়ে এসেছে, কোথাও ইগলকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ধরে নেওয়া হয়েছে লোকটা শহরের বাইরে পালিয়ে গেছে। যদি তাই গিয়ে থাকে, তা হলে এক্ষণে এই থানার জুরিসডিকশনের মধ্যে আর নেই। সুতরাং নন্দলালের ওপর দায়ও বর্তায় না। যা শত্রু পরে পরে। কিন্তু পুলিশের জীবনে অখণ্ড শান্তি বলে কিছু নেই, এটা সে বরাবর দেখে আসছে। আজ রাতে ফুলকপি আর কড়াইশুঁটি দিয়ে ভুনি খিচুড়ি খাবে বলে বাড়িতে ফোন করছিল নন্দলাল। সঙ্গে বেগুন আর ইলিশ মাছের ডিম ভাজা। এমন সময়ে রসভঙ্গ করতে থানায় এসে হাজির লম্বা, সুদৃঙ্গে চেহারার পানু ঘোষ। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। শহরের অভিভাবক। স্কুল, কলেজ আর একগাদা প্রতিষ্ঠানের হয় উপদেষ্টা, নয়তো সভাপতি, নয়তো সেক্রেটারি, না হলে চেয়ারম্যান। নজরুল বা রবীন্দ্রজয়ন্তী, নববর্ষ বা দুর্গোৎসব, স্বাধীনতা দিবস বা রক্তদান শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা বন্যাত্রাণ, সর্বত্রই তিনি অবিসংবাদী প্রধান অতিথি বা সভাপতি বা পৃষ্ঠপোষক। গোটা পাঁচেক ক্লাবেরও তিনি প্রধান উপদেষ্টা। ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং শীতল মস্তিষ্কের মানুষ। সঙ্গে জনা পাঁচসাত ছেলেছোকরা। সবাই ভীষণ উত্তেজিত।

নন্দলাল শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল, “আরে আসুন, আসুন! কী সৌভাগ্য!”

পানুবাবু প্রায় হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, “তুমি এখনও নিশ্চিন্তে বসে আছ হো! আর তোমারই নাকের ডগায় একটা নিরপরাধ লোক গুন্ডাদের

হাতে খুন হতে চলেছে! এই অরাজকতা কি লোকে সহ্য করবে ভেবেছ!”
নন্দলাল চমকে উঠে বলে, “কে খুন হচ্ছে! কারা খুন করছে! কার এত সাহস?”

“পুলিশের আশকারা পেয়েই তো গুন্ডা মস্তানদের এত দাপট। আর হবে নাই-বা কেন! ফেসবুকে তুমিই তো লিখেছ তুমি নিজেই নাকি একসময়ে গুন্ডা হতে চেয়েছিলে! সেই তোমার পেয়ারের খুনি গুন্ডারা হনো! হয়ে ইগল রায়কে খুন করতে রওনা হয়েছে। এখনই না আটকালে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে। এক্ষণে হয়ে গেল কি না তাই-বা কে জানে! ইগলকে রক্ষা করতে হলে এখনই তিলার্থ দেরি না করে হগ সাহেবের মাঠে রওনা হও হো!”

“এখনই রওনা হচ্ছি স্যার। ভাববেন না, গুন্ডাদের টিট করতে আমি জানি। আর স্যার, আমি যে গুন্ডা হতে চেয়েছিলাম তা অল্পবয়সের পাগলামি। গুটা ধরবেন না।”

“গুন্ডা হবে নাই-বা কেন! বারণ করছে কে? এখন আমাদের গুন্ডারই তো দরকার, তবে ধর্মগুন্ডা। নোংরা, ইতর, নৃশংস গুন্ডাদের টিট করতে হলে এখন আমাদের পাল্টা ধর্মগুন্ডার বড্ড প্রয়োজন। শাঠে শাঠ্যাং। প্রাণে মারার গুন্ডা নয় হে, প্রাণ বাঁচানোর গুন্ডা। বুঝলে! এখন বেরিয়ে পড়ো, বেরিয়ে পড়ো, একটা প্রাণ রক্ষা করে এসো তো বাপু!”

“এই যে, যাই।”

বাজারের রাস্তায় একটা ঠেলাগাড়ি আড়াআড়িভাবে রেখে পথ আটকে দিয়েছিল বাঘা যতীন ক্লাবের ছেলেরা। সেখানে ল্যান্ডরোভারটা আটকে যেতেই শিবু মণ্ডল বিপদের গন্ধ পেয়ে পিস্তল বের করে ফেলল, “খবরদার! জানে মেরে দেব কিন্তু! কেউ কাছে আসবে না। এই পটাঁই, গাড়ি থেকে নেমে ঠেলাটা সরিয়ে দিয়ে আয় তো!”

কিন্তু চোখের পলকে প্রায় জনা বিশেক ছেলে গাড়িটা ঘিরে ফেলল। শিবু একটু ঘাবড়ে গিয়ে শুন্যে একটা ফায়ার করতেই ধপাধপ চারদিক থেকে মার পড়তে লাগল, বৃষ্টির মতো। ঘটনার আকস্মিকতায় ঘাবড়ে গিয়ে গণেশ, তপন, হারু কুণ্ডু আর পটাঁই গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পালানোর একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল বটে, কিন্তু চারদিক থেকে এমন মার পড়ছিল যে, তারা পেরে উঠল না। রাস্তায় পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল আর কাতর চিৎকার। শিবু এই হেনস্থায় রাগে আগুন হয়ে কয়েকটা খারাপ গালাগাল দিয়ে ফেলায় একটা হকিস্টিকের মার তার মুখের ওপর এসে পড়ল। ঠোঁট ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত। ডান হাতে নিজে মুখ চেপে ধরে বাঁ হাতটা তুলে সারেভারের ইশারা করল সে। বুঝল যে, আজকের দিনটা তাদের নয়।

পুলিশ এসে ঘিরে ফেলল তাদের।

সন্দের মধ্যেই মন্টাই, বীরু আর পবনকেও গ্রেফতার করে আনা হল। তাদের প্রাথমিক জবানবন্দি থেকে পালের গোদা চতুর্ভুজ রায়ের নাম উঠে আসায় জনকপুরে খবর পাঠাল নন্দলাল। একটু বাদেই জানা গেল, চতুর্ভুজও গ্রেফতার হয়ে গেছে।

আগের দিনে যেমন বাঘশিকারিরা মৃত বাঘের সঙ্গে বীরের মতো দাঁড়িয়ে ছবি তুলে রাখত, সেইরকম নন্দলালও কোনও কৃতিত্বের কাজ করলে সেলফি তুলে রাখে। আজ এতগুলো গুন্ডাকে পাকড়াও করে সে অহঙ্কারে মকমক করছে। গুন্ডাগুলোকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে মোবাইলে বেশ কয়েকটা ছবি তুলে রাখল সে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেখাবে।

ছয়

চোখ খুলল ইগল। ইহলোক না পরলোক তা বুঝতে পারল না। সে সত্যিই বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও জানে না সে। চারদিকটা আবছায়া, জোনাকি জ্বলছে, কানে পনপন করছে মশা, পায়ে আর গায়ে বেয়ে বেড়াচ্ছে পিপড়ে আর পোকামাকড়। চারদিকে ঘাসপাতা, কাটারোপ, শিয়রে মস্ত একটা গাছের গুঁড়ি। উপুড় অবস্থা থেকে একটু কষ্ট করে চিত হয়ে শুতে গিয়েই সে দেখতে পেল সাদা কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার চারদিক। জায়গাটা চেনার উপায় নেই। সেই চেষ্টাও

করল না ইগল। উঠে বসবার একটা চেষ্টা করতে গিয়ে টের পেল, তার সর্বাস্থে ব্যথাবেদনার শেষ নেই। তবে এইসব ব্যথাবেদনা তার এখন সয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি ব্যথা মাথার পিছনে ডান দিকে। হাত দিয়ে টের পেল আঠা আঠা, বোধহয় রক্ত জমে আছে। ওখানেই কি কুড়ুলের কোপটা পড়েছিল? হবেও বা।

উঠে বসবার পর সে চারদিকটাকে অনুভব করার চেষ্টা করতে লাগল। ধারেকাছে বোধহয় লোকের বসতি নেই। অনেক গাছপালা। আবছায়া একটা বাড়ির ভগ্নভূপ। কুয়াশা আর ঠান্ডা, ঝিঝি আর শেয়ালের ডাক। আর নিস্তব্ধতা। পেটে খিদে আর কণ্ঠায় তেষ্টা। তবে এইসব নিয়েই বুঝবস হয়ে বসে রইল ইগল, যেন কিছু করার নেই, কোথাও যাওয়ার নেই, এখানেই তার নকটান। ওটা অন্ধকারে কী ভেসে আছে সামনে, একটু উচুতে! সেই টুপিটা না? সাদা ফেডোরা! টুপিটা কি কিছু বলতে চায় তাকে? কোনও সঙ্কেত! হাঁ করে চেয়ে রইল ইগল।

একটা মলিন টর্চের আলো সামনের মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা চাপা কণ্ঠস্বর খুব আকুলতার সঙ্গে কার উদ্দেশ্যে যেন বলছে, “স্যার! স্যার! বৈচেবর্তে আছেন কী? কাছেপিঠে থাকলে একটু সাড়া দেবেন প্লিজ!”

গলাটা চেনা লাগল। ইগল তাই অনুচ্চ স্বরে বলে, “আপনি কি আমাকে খুঁজছেন গনাবাবু!”

গলার স্বরটা আবেগে একটু কঁপে উঠল, “আপনি কি বেঁচে আছেন স্যার! একটু হাতড়ে দেখুন তো, আপনার ঘাড়ের ওপর মুড়ুটা এখনও আছে কি না! পটাই শুভা যে-কুড়ুলের কোপটা বসিয়েছিল বলে শুনেছি, তাতে তো ধড় আর মুড়ু আলাদা হয়ে যাওয়ারই কথা! হাত-পা সব ঠিক জায়গায় আছে তো! শ্বাস পড়ছে কি? বুকে ধুকপুকুনি চলছে, নাকি বন্ধ হয়ে গেছে!”

“গনাবাবু, আমার মনে হচ্ছে আমি এখনও বেঁচেই আছি।”

“তবু সাবধানের মার নেই। আর একবার ভাল করে দেখুন দেখি, বুকের ধুকপুকুনিটা হচ্ছে তো!”

“হচ্ছে।”

“শ্বাসপ্রশ্বাস?”

“চলছে।”

“ওঃ, কী অদ্ভুতভাবে বেঁচে আছেন আপনি! কী সুন্দরভাবে বেঁচে আছেন! কী পাগলের মতো বেঁচে আছেন! কী বোকার মতো বেঁচে আছেন! একেবারে প্রহ্লাদের মতো বেঁচে আছেন! আল্লাদের সঙ্গে বেঁচে আছেন!”

“যে আজে!”

টর্চবাতিটা একটু এগিয়ে এল তার দিকে। তবে বড্ড নিবুনিবু আলো।

“আপনি কোথায় স্যার?”

“এই তো, এখানে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে বেকায়দায় পড়ে আছি। অত কমজোরি আলোয় কি দেখতে পাবেন?”

“আজকাল একটা টর্চবাতির কীরকম দাম হয়েছে তা কি জানেন?”

“না গনাবাবু, টর্চবাতি সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই কম।”

“কম করেও পঞ্চাশ টাকা। তবে ভারী কাজের জিনিস, কী বলেন?”

“তাই তো মনে হয়।”

“টর্চবাতি একটা বেশ বাবুগিরির জিনিসও বটে। বোতাম টিপলেই ফস করে আলোর একেবারে ভাসাভাসি কাণ্ড! হাতে নিলেই গা বেশ গরম হয়, নিজেকে কেঁপেঠিকুর মতো লাগে। তাই অনেকদিন ধরে একটা টর্চের ভারী শখ ছিল মশাই। কিন্তু জোগাড় আর হয় না। আজ ভাবলুম, না, একটা হস্তনৈস্ত করতেই হবে। তেজেনের দোকান থেকে মালটা সরিয়ে ফেলেছিলুম প্রায়, কিন্তু কপাল খারাপ, নোলক পরা একটা খুকি পেনসিল কিনতে এসে ব্যাপারটা দেখে ফেলে এমন চাঁচায় যে, পালিয়ে বাঁচি না। তারপর মনে পড়ল গিরিধারী পৈতৃভী শিয়রে টর্চবাতি নিয়ে ঘুমোয়। তা জানালা দিয়ে লাগি বাড়িয়ে মালটা প্রায় গন্ত করে ফেলেছিলুম আর কী। এমন সময়ে পৈতৃভীর গিন্নি পানের পিক ফেলতে কেন যে ওই জানালাটাই বেছে নিল কে জানে মশাই! আমার সর্বাস্থে সেই পানের

পিক আর দোজার গন্ধ নিয়ে কী ঘিনঘিনে অবস্থা! অবশেষে হাইস্কুলের ভাবেভোলা মাস্টারমশাই ধনেশ খামরু যখন টিউশনি পড়াতে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে তিন বাতির মোড়ে পাকড়াও করে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললাম, টর্চবাতিটা একটু দিন তো মাস্টারমশাই, পায়ে কী একটা কামড়াল একটু দেখি! তা উনি দিলেন। টর্চটা হাতে নিয়েই তৎক্ষণাৎ পাইপাই করে দে ছুট। আর পিছু ফিরে চাইনি। কিন্তু টর্চবাতিটার যে এমন মরণদশা তা কে জানত মশাই! আর এই সবই আপনার জন্য।”

“আমার জন্য! কী আশ্চর্য, আমার জন্য কেন গনাবাবু?”

“টর্চ না হলে এই শালবনীর জঙ্গলে আপনাকে খোঁজা আর খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা যে একই ব্যাপার মশাই!”

“আপনি যে একজন ভাল লোক তা আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।”

“এই আপনিই যা বুঝলেন। এই কথাটা আর কারও মুখ দিয়ে আজ অবধি বেরোল না!”

“আমার মনে হয়, একদিন সবাই ঠিকই বুঝবে যে, আপনি একজন ভাল লোক।”

“স্যার, আমি আপনার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কেন বলুন তো!”

“পাচ্ছেন না?”

“না। আপনার গলার স্বর যেখান থেকে আসছে সেই জায়গায় তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না, মশাই! টর্চের আলো কমজোরি বটে, কিন্তু এই শর্মার চোখের জোর তো কম নয় স্যার। আমি অন্ধকারেও দেখতে পাই।”

“তা হলে বোধহয় আমাকে আর দেখতে পাবেনও না, গনাবাবু! আমার মনে হচ্ছে, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি! না, আমি যাচ্ছি না, আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।”

গনা আত্ননাদ করে ওঠে, “সে কী, আপনি যাচ্ছেন কোথায়? পরলোকেই রওনা দিলেন নাকি?”

“না গনাবাবু, এটা ঠিক পরলোক নয় বটে, তবে মনে হয়, এটা অন্য একটা জগৎ।”

“গ্রহাস্তর নাকি স্যার?”

“না গনাবাবু, গ্রহাস্তর নয়। এই কাছেপিঠেই। তবে এর কম্পাঙ্ক আলাদা, তরঙ্গ আলাদা, সবকিছুই অন্যরকম। এ ভারী সুন্দর জায়গা। এই পৃথিবীর মধ্যেই আর-একটা পৃথিবী, যেমন পৃথিবীর কথা মানুষ কল্পনা করে, সেখানে যেতেও চায়, কিন্তু পেরে ওঠে না। বাতাসের ভিতরেই একটা অদ্ভুত দরজা খুলে গেছে। আমি চলে যাচ্ছি।”

একটু ব্যগ্র হয়ে গনা জিজ্ঞেস করে, “ওখানে আমার একটা ব্যবস্থা হয় না স্যার? এখানে তো তেমন সুবিধে হচ্ছে না কিনা! ওখানে গেলে একটু সুবিধে হত।”

“এই জগতের কম্পাঙ্ক আপনার সহ্য হবে না। আমি আসলে এই জগতেরই লোক। কেউ আমাকে শিশুকালে আপনাদের জগতে ফেলে এসেছিল। বিদায় গনাবাবু। আপনি কিন্তু সতাই ভাল লোক।”

“কিন্তু স্যার, আগামী কাল যে বাধা যতীন ক্লাবে আপনার সংবর্ধনা!”

“তাদের আমার নমস্কার জানিয়ে দেবেন।”

“স্যার! স্যার! আমাকে ফেলে যাবেন না স্যার!”

কেউ আর সাড়া দিল না।

টর্চটা শেষ অবধি নিবেই গেল। গনা কিছুক্ষণ হাঁ করে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। তারপর হতাশ মনে আন্তে আন্তে বাড়ির দিকে রওনা হল।

সাত

লটকা তার গায়ে যে-ওষুধটা স্প্রে করে দিয়েছিল সেটা এখন প্রায় উবে গিয়ে ঝিকু বিশ্বাস আবার অদৃশ্য হয়েছে বটে, তবে মুড়ুটা এখনও বাকি। সে ঘর থেকে বেরোলে এখন তার মুড়ুটাই শুধু বাতাসে ভেসে থাকতে দেখা যায়। এই তো দু’দিন আগে হগ সাহেবের মাঠে ঘাস কাটতে

এসেছিল ছগনলাল। ঝিকু পা ধুতে ঘর থেকে একটু বেরিয়েছিল, বাতাসে কাটা মুভু ভাসতে দেখে ছগনলাল ‘বাপ রে’ বলে দাঁতকপাটি লেগে ধড়াস করে পড়ে মুর্ছা গেল। খুশিই হয়েছিল ঝিকু। ঘটনাটা চাউর হলে আর লোকজন ইদিকপানে আসবে না। ওই মাঠেই মোষ চরাতে আসে গুড্ডু। সোজাসরল ছেলে। একদিন বুনা কুল তুলতে এসে তার ভাসন্ত মুভু দেখে দৌড়ে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনেছিল ভূত দেখাবে বলে। উঁচুতে উঠলে তার মাথা ঘোরে, তবু ঝিকু পালিয়ে গিয়ে নিমগাছটার ডগায় উঠে বসে ছিল। মানুষজনকেই যা একটু ভয় ঝিকুর। কারণ, বিশ্বাসবাড়ির দক্ষিণের ঘরের মেঝের তলায় এক ঘড়া কোম্পানির আমলের খাঁটি সোনার মোহর পোঁতা আছে তার। মোহর তার আর কোনও কাজে লাগবে না বটে, কিন্তু ওই মোহরের কথা ভাবলে গা একটু গরম হয় আর কী। আর ওই মায়াতেই সে এখনও এই সাতপুরুষের ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছে। কাশী বৃন্দাবন কত জায়গাতেই ঘুরে আসতে পারে সে। ইচ্ছেও যে হয় না তা নয়। টিকিট কাটার বালাই নেই, সিট রিজার্ভ করতে হবে না, লটবহর বইতে হবে না, হোটেল বুক করার ঝামেলা নেই, ফুস করে চলে গেলেই হল। কিন্তু যতবার ইচ্ছে হয় ততবার ওই মোহর তার কাছা টেনে ধরে রাখে। ভেবে দেখলে এক ঘড়া কোম্পানির আমলের মোহর তো আর চাট্টিখানি জিনিস নয়, এই চড়া বাজারে লাখো লাখো টাকা দাম। বলতে কী পাড়াপড়শির মধ্যে সেই সবচেয়ে বড়লোক। কাজেই মোহর নিয়ে একটু গুমোরও আছে তার। সেইসঙ্গে ভয়ও আছে। ক’দিন আগে চোর-চোর চেহারার একটা লোক এসে ওই গাছতলাটায় বসে ডাঁসা পেয়ারা খেতে-খেতে খানিক খোশগল্প জুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তার হাবভাব মোটেই পছন্দ হয়নি ঝিকুর। বড্ড ছোঁকছোঁকে স্বভাব। গুপ্তধন আছে কিনা তারও খোঁজখবর করছিল। আর চোখ দু’খানা ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছিল সার্চলাইটের মতো। সেই থেকে ভারী ভয়ে ভয়ে আছে ঝিকু। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় কে জানে বাপু!

গনার দিনকাল মোটেই ভাল যাচ্ছে না। নুন আনতে পাশা ফুরায়, এমন অবস্থা। আর লোকজনও এমন সেয়ানা হয়েছে যে, কহতবা নয়। উজ্জ্বলিত করে আর মোটেই সুবিধে হচ্ছে না তার। এখন টাকাটা সিকিটা রোজগার করতেই জান কবুল করতে হয়। বড়ই দুর্দিন। গ্রহান্তরে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হলে বড্ড ভাল হত। নিদেন ইগলবাবুও যদি সঙ্গে নিয়ে যেতেন তা হলেও না-হয় একটা হিল্লো হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কিছুই হল না। গনার তাই আজকাল ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ে, খালি পেটে উদগার ওঠে, মনটা বড্ড হুঁ হুঁ করে। রাতবিরেতে বেরোয় বটে, কিন্তু তেমন সুযোগ সুবিধে হয়ে উঠছে না।

তা সেদিন যতীনবাবুর বাড়িতে কেত্তন আর মালসাভোগ ছিল। যতীনবাবু তাঁকে একটু স্নেহের চোখেই দেখে থাকেন। সে যে তেমন কোনও কন্মের নয় তার জন্য মাঝে মাঝে দুঃখও প্রকাশ করেন। তা সেদিন ডেকে বললেন, “ওরে, আমার বাড়িতে কেত্তন হবে, তা উঠোনটা একটু বাঁটপাট দিয়ে দিবি বাপু? দশটা টাকা দেব’খন, আর ওইসঙ্গে প্রসাদও পেয়ে যাস।” তা রাজি হয়েছিল গনা। মন দিয়ে উঠোন ব্যাটাল। সন্ধেবেলা বসে মন দিয়ে দিবি কেত্তন শুনল, বেশ ভক্তিভাবও হল শুনে। তারপর খাওয়াদাওয়াও মন্দ হল না। একটু রাতের দিকে একাবোকা বাড়িতে ফিরছিল সে। কদমতলার কাছে নিরিবিলা রাস্তায় হঠাৎ দেখতে পেল কুয়াশায় মাথা ময়লা জ্যোৎস্নায় তার সামনে সেই সাদা টুপিটা ভেসে রয়েছে শূন্যে। দেখে হাঁ করে চেয়ে রইল সে। এ যে এলিয়েন সাহেবের টুপি! একটু গলা খাঁকারি দিয়ে সে গদগদ গলায় বলল, “এলিয়েনসাহেব নাকি? পেলাম হই। তা ভাল আছেন তো! সব কুশল তো! বাড়িতে খোকাখুকিরা সব ভাল আছে তো! আপনার শ্রীচরণদুটি তো দেখতে পাচ্ছি না সাহেব, নইলে একটু চরণধূলি নিতুম। তা আমাকে চিনতে পারছেন তো সাহেব? আমি হলুম গে গনা!”

টুপি অবশ্য কোনও জবাব দিল না। কিন্তু হঠাৎ একটু দুলতে দুলতে চলতে শুরু করল। কিসের ইঙ্গিত কে জানে! যা হয় এসপারওসপার, গনাও সেইসঙ্গে মোহগ্রস্তের মতো টুপিটার পিছুপিছু হাঁটতে লাগল। কী থেকে কী হয় তা তো বলা যায় না!

হাঁটতে হাঁটতে রথতলা, তিনবাতির মোড়, কুমোরপাড়া ছাড়িয়ে বাসস্ট্যান্ড বাঁয়ে রেখে, পিলখানার পথ পেরিয়ে হগ সাহেবের মাঠ। তারপরও মলিন জ্যোৎস্নায় শূন্যে দুলকি চালে টুপিটা চলতেই লাগল, থামবার নাম নেই। ক্রমে হগ সাহেবের বিশাল মাঠও পেরিয়ে গেল তারা। একটু ভয়ভয় করছিল বটে গনার, তবে সে মনেমনে ঠিক করে ফেলল, বাঁচামরা যাই কপালে থাক, শেষ অবধি দেখতেই হবে।

শালবনীর জঙ্গলের কাছ বরাবর এসে টুপিটা হঠাৎ গোঁড়া খেয়ে সেই বিশ্বাসবাড়ির ভয়ভূতপের ভিতরে সঁধিয়ে গেল। একটু দোনোমনো হল বটে গনার, তবে সে দমল না, দুর্গম সেই আগাছা আর ভাঙা ইটপাথরে ভরা বাড়িটার মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে ঢুকে পড়ল। সাপখোপ, বিছে, মশা, পোকামাকড়ের অভাব নেই, কাঁটারোপও বিস্তর। তবে মানুষ এর চেয়েও ঢের ঢের বিপদআপদ পার হয়েছে, এইটেই মস্ত সান্ত্বনা। টুপিটা একটা জায়গায় এসে স্থির হয়ে ভেসে রইল। একটা ছাদহীন ঘর। খুব ঠাণ্ডা করে গনা লক্ষ করল, আবছায়া জ্যোৎস্নায় টুপিটার ছায়া একটা বিশেষ জায়গায় পড়েছে। ঘরের একটা বিশেষ কোণে। কোনও ইশারা বা ইঙ্গিত নয় তো! তা নইলে এলিয়েনসাহেব কেনই-বা তাকে এ-হেন জায়গায় টেনে আনবেন! জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েই টুপিটা ফস করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটা টর্চবাতি থাকলে কতকটা সুবিধে হত। কিন্তু গনার কপালে অত সুখ কি আর বিধাতা লিখেছেন! তবে তার পিতৃদত্ত চোখ দু’খানার নজর ভারী চোখা। সে চারদিকে চেয়ে দেখছিল, কিছু পাওয়া যায় কি না। আঁতীপাঁতি করে আধো অন্ধকারে খুঁজতে যেতেই হঠাৎ শূন্যে একটা কাটা মুভু ফস করে উদয় হয়েই চৌচিয়ে উঠল, “এই, কে রে! কে এই বাড়িতে ঢুকেছিস? কার এত বড় সাহস?”

গলাটা বিলক্ষণ চেনে গনা। ঝিকু বিশ্বাস। সে একগাল হেসে বলল, “ঝিকুবাবু যে! তা ভাল আছেন তো ঝিকুবাবু? তা দেখছি আপনার গায়ের রঙটা প্রায় উঠেই গেছে! শুধু মুভুটাই যা বাকি!”

বিস্ময়ে ঝিকু কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে থেকে বলে উঠল, “ভূই! তোর এত সাহস! এত বৃকের পাটা! খবরদার বলছি, এফুনি এই বাড়ি থেকে বেরো! নইলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।”

গনা অবাক হয়ে বলে, “এত মাথা গরম করছেন কেন বলুন তো ঝিকুবাবু? একটা পোড়ো বাড়িতে ঢুকে কি এমন অপরাধ করলুম মশাই? এ তো সাপখোপ, ইদুরবাদুড়ের বাসা! বলি গুপ্তধনটন কিছু আছে নাকি?”

“কে বলে এখানে গুপ্তধন আছে! কে এসব বাজে কথা রটাচ্ছে! এখানে ওসব কিছু নেই বাপু, মানে-মানে সরে পড়া তো দেখি!”

“কিন্তু আপনার হাবভাব তো আমার ভাল ঠেকছে না মশাই! কিছু যদি নাই থাকবে তা হলে অত উতলা হচ্ছেন কেন বলুন তো!”

ঝিকু চটে গিয়ে বলে, “উতলা হব না! বলে কী হে! মাঝরাত্তে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে বিনা নোটিসে হুট করে ঢুকে পড়লে যে বড়! তুমি যে চোরছাঁচোড় নও তার কী প্রমাণ?”

“আজ্ঞে প্রমাণটমান তো কিছু নেই। কিন্তু মশাই, হঠাৎ চোরছাঁচড়ের কথাই বা উঠছে কেন? আর চোরকে আপনার ভয়েরই-বা কী আছে?”

“ফের মুখেমুখে কথা! আত্মপরাধ তো কম নয়! ওই যে ঘরের ডান কোনায় শাবল দেখছিস, ওই শাবল দিয়ে তোর মাথা ফাটিয়ে দেব কিন্তু! আমি কিন্তু ভীষণ রেগে যাচ্ছি। এটা কিন্তু ট্রেসপাসিং, অধিকারভঙ্গ, ভয়ঙ্কর বেআইনি কাজ!”

গনা একগাল হেসে বলে, “কী ভাগ্যি, শাবলটা দেখিয়ে দিলেন, নইলে তো এই ঝুঁককো অন্ধকারে ঝোপঝাড়ের মধ্যে চোখেই পড়ত না মশাই!”

গনা গিয়ে শাবলটা হাতে তুলে নিল। দিবি জিনিস। বেশ ভারী আর অনেকটা লম্বা। আর শাবলের হাত তার খুবই ভাল।

ঝিকু আত্ননাদ করে উঠল, “এসব হচ্ছেটা কী! অ্যাঁ! এ কি মামদোবাজি নাকি! ইয়ার্কি হচ্ছে? আমি কিন্তু চৌচিয়ে লোক ডাকব বলে দিচ্ছি! তারা এলে কিন্তু হাটুরে মার পড়বে, হাড়গোড় আশ্ত রাখবে না!”

“কেন মশাই, আমি অন্যায়াটা কী করলাম যে মারধরের ভয়

দেখাচ্ছেন! একটা পোড়ো বাড়িতে ঢুকেছি বই তো নয়!”

“কে বলল পোড়োবাড়ি! এটা আমার ভদ্রাসন! দেড়শো বছর ধরে থানা গেড়ে আছি, পোড়োবাড়ি বললেই হল! আমার পারমিশন ছাড়া এ বাড়িতে ঢোকার অধিকার কারও নেই! তোকে জেল খাটাতে পারি তা জানিস?”

“দেখুন মশাই, কাজের সময়টায় চৌচামেচি করে কেন গন্ডগোল পাকাচ্ছেন! রাত হয়েছে, যান শুয়ে পড়ুন গো!”

টুপির ছায়া যেখানটায় পড়েছে সেখানটায় শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়তে শুরু করে দিল গনা। মাটি বেশ নরম, শাবল সহজেই ঢুকে যাচ্ছে মাটিতে। তেমন গা ঘামাতে হচ্ছে না।

“এবার রক্তরক্তিকি কাণ্ড হয়ে যাবে কিন্তু!” এই বলে বিকু হঠাৎ ছুটে এসে গনার ডান হাতে একটা কামড় বসিয়ে দিল।

গনা অবশ্য কামড়টা টেরই পেল না। সম্মেহে বলল, “কামড়ালেন নাকি বিকুবাবু?”

বিকু অবাক হয়ে বলে, “কামড়ালুম তো, কিন্তু তোমার হেলদোল নেই কেন বলো দিকি!”

“আহা আমার হেলদোল নাই-বা হল, আপনার কামড়ানোর ভাগ আপনি কামড়ে যান, কেউ তো বারণ করেনি!”

কামড়ে কাজ হচ্ছে না দেখে এবার বিকু বিশ্বাস গনাকে রদ্দার পর রদ্দা আর ঘুষির পর ঘুষি মারতে মারতে বলতে লাগল, “এবার কেমন লাগে দেখ! এবার বোঝ কত ধানে কত চালা!”

গনা মন দিয়ে শাবল চালাতে চালাতে বলে, “মারধর করে কি কোনও সুখ আছে মশাই? খামোখা সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা! কেন বুটমুট হয়রান হচ্ছেন?”

বিকু এবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, “ওরে, তোর কি দয়ামায়া বলে কিছু নেই! এত পাপ কি তোর ধর্মে সইবে? ওই একঘড়া মোহর গেলে যে আমি বড্ড গরিব হয়ে যাব!”

গনা ভারী অবাক হয়ে বলে, “ও বাবা! একঘড়া মোহর! ও জিনিস কি লুকিয়ে রাখতে আছে? ওই মোহরে কত গরিবের প্রাণ বাঁচবে বলুন তো! দেশেরও কত উন্নতি হবে, সেটাও ভাবুন! আপনার তো আনন্দ হওয়ার কথা মশাই!”

“আমার মোটেই আনন্দ হচ্ছে না রে! আমার যে ভীষণ কান্না পাচ্ছে! তোর দু’টি পায়ে পড়ি, আর খুঁড়িস না। তুই আমার নাতিরও নাতির বয়সি, গুরুজনদের কথা যে শুনতে হয় তা কি তোর বাপ-মা তোকে শেখায়নি?”

হাত চারেক গর্ত হতেই শাবলটা ঠং করে আওয়াজ ছাড়ল। নিচু হয়ে ঘড়ার কানা ধরে হাঁচকা টান মারল গনা। কিন্তু ঘড়াটা অত সহজে উঠল

না। গনা শাবল দিয়ে ঘড়ার চারপাশের মাটি সরাতে লাগল। এই শীতেও তার সর্বাস্থে ঘাম ছুটেছে।

বিকু বিশ্বাস চোঁচিয়ে উঠল, “আমি কিন্তু অভিশাপ দিচ্ছি, ও জিনিস তোর ভোগে লাগবে না, তুই ওলাওঠা হয়ে মরবি, তোর ভেদবমি হবে, নির্বংশ হবি।”

ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়ে অবশেষে সে ঘড়াটাকে হাঁচোড়পাঁচোড় করে টেনে তুলতে পারল। বেজায় ভারী জিনিস। মনে হয়, মোহরে একদম ঠাসা। কপালের ঘাম হাতের কানা দিয়ে চেঁছে সে বসে একটু দম নিল। এই জগদল ভারী জিনিস কাঁধে করে তাকে অতটা পথ পেরোতে হবে। কাজটা সোজা নয়। তবে কিনা, মানুষ এর চেয়েও ঢের শক্ত শক্ত কাজ করেছে। এ আর এমন কী!

বিকু বিশ্বাস ডাকাডাকি করে লোক জড়ো করে ফেলেছে। তবে তারাও বিকুর মতোই হালকাপলকা ধোঁয়াটে মানুষ সব। তাদের ক্ষীণ কলরব শুনতেও পাচ্ছিল গনা। হাতজোড় করে বলল, “বাবাসকল, জননীসকল, অপরাধ নেবেন না। আপনারাই বলুন, বিকুবাবু কি কাজটা ভাল করেছেন? বিবেচনা করে দেখুন, গুপ্তধন হল গে সুপ্তধন! টাকাপয়সা যদি ঘুমিয়েই থাকে, তা হলে তাদের দিয়ে কি কোনও কাজ হয়? ও তো অচল টাকার শামিল। ঠিক বলছি তো, বাবাসকল, জননীসকল? ভুল বলে থাকলে ধরিয়ে দেবেন কিন্তু।”

ক্ষীণ কলরব শোনা গেল, “ঠিক, ঠিক।”

“তবে আর চিন্তা নেই, মাটির নীচেকার দেড়শো বছরের অন্ধকার থেকে এবার মোহরেরা জেগে উঠেছে, তারা বলমল করছে, তারা হাসছে, আনন্দ করছে। সামনে এখন তাদের অনেক কাজ।”

“ঠিক, ঠিক।”

“তা হলে পেন্নাম হই বাবাসকল, জননীসকল। আপনারদের অনুমতি হলে এবার তা হলে আমি রওনা হয়ে পড়ি, অনেকটা পথ যেতে হবে তো!”

“ঠিক, ঠিক।”

জগদল ভারী ঘড়াটা কাঁধে নিয়ে কাঁকাতে কাঁকাতে হগ সাহেবের মাঠটা পার হচ্ছিল গনা। এই বাঘা শীতেও ঘেমে-নেয়ে যাচ্ছে সে। মাঝে মাঝে ঘড়াটা নামিয়ে দম নিতে হচ্ছে। তা হোক, গনার মোটেই খারাপ লাগছে না। এমন বোঝা হলে সে নিতিনি বইতে রাজি আছে।

এবার ঘরদোর পাকা করতে হবে তার, আর জানালা দরজাও মজবুত করা দরকার। দিনকাল ভাল নয়, চারদিকে যা চোরছাঁচড়ের উৎপাত!

অঙ্কন: সুব্রত চৌধুরী

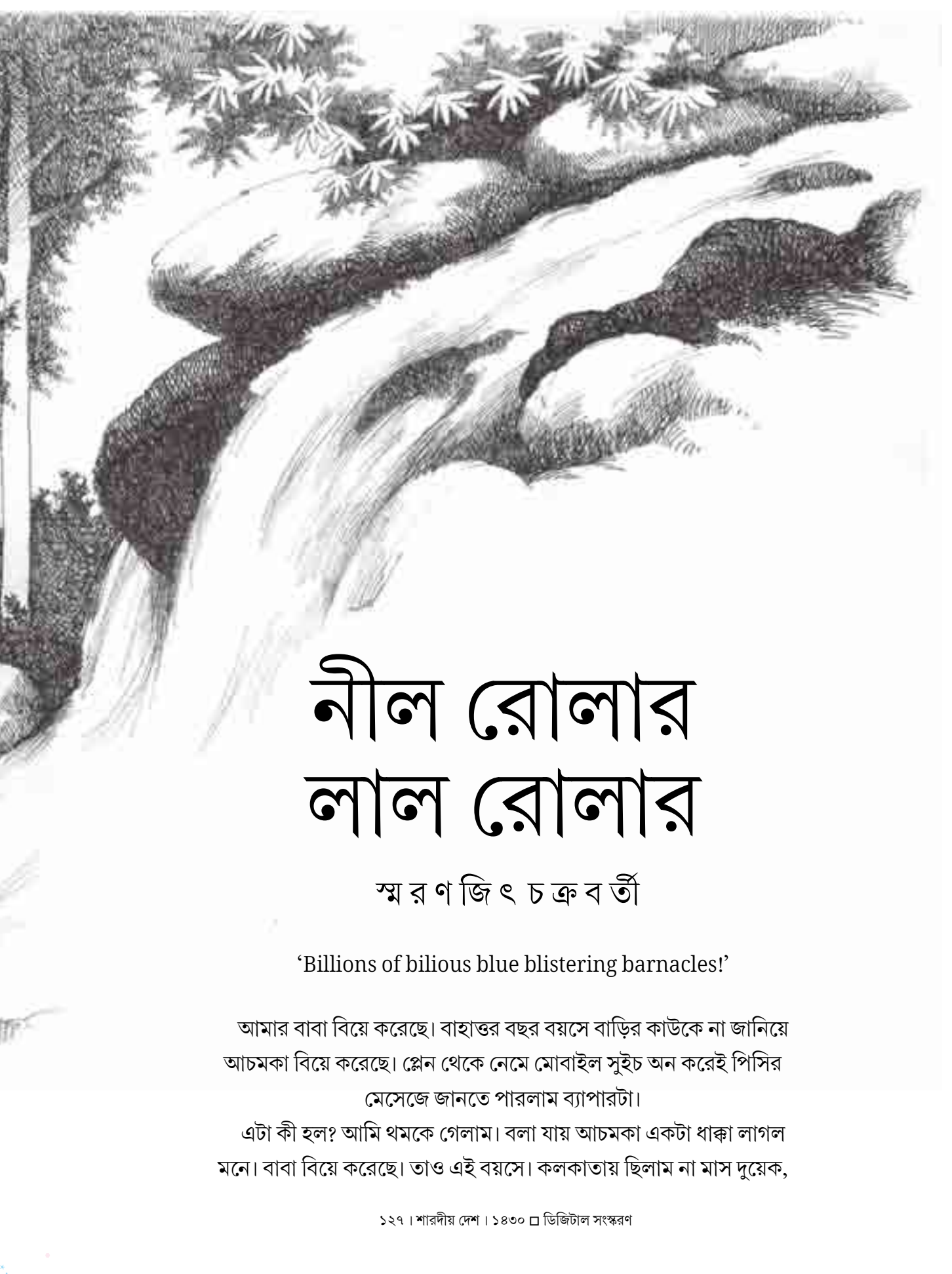




শিল্পী: বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

সৌজন্য: সুশোভন অধিকারী





নীল রোলার লাল রোলার

স্মরণ জিৎ চক্রবর্তী

‘Billions of bilious blue blistering barnacles!’

আমার বাবা বিয়ে করেছে। বাহান্তর বছর বয়সে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে
আচমকা বিয়ে করেছে। প্লেন থেকে নেমে মোবাইল সুইচ অন করেই পিসির
মেসেজে জানতে পারলাম ব্যাপারটা।

এটা কী হল? আমি থমকে গেলাম। বলা যায় আচমকা একটা ধাক্কা লাগল
মনে। বাবা বিয়ে করেছে। তাও এই বয়সে। কলকাতায় ছিলাম না মাস দুয়েক,

তার মধ্যেই এটা কী হল।

হারুদা গাড়ি নিয়ে এসেছে এয়ারপোর্টে। ওই দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। হারুদা বহু পুরনো লোক আমাদের। আমাদের দেখেই সিগারেট ফেলে এগিয়ে এল সুটকেস নেওয়ার জন্য। আমি দিলাম না। নিজের বোঝা নিজেকেই বইতে হয়।

গাড়ির ডিকিতে সুটকেস আর দুটো ব্যাগ ভরে আমি তাকালাম হারুদার দিকে, “হারুদা, এটা কী শুনছি? কবে হল এটা?”

হারুদা গম্ভীর ভাবে আমার সামান্য ধমক দিয়ে বলল, “আগে গাড়িতে ওঠো। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ালে পুলিশে ধরবে। যেতে যেতে বলছি, চলো।”

আমি বাধ্য ছেলের মতো গাড়িতে সামনের সিটে উঠে বসলাম।

এখানে আপনাদের একটা কথা বলে নিই। আমাকে আমাদের বাড়ির সবাই খুব ধমকায়। মানে, ঠিক শুধু বাড়ির নয়, আমাকে একটু চেনাজানার পরেই লোকজন কেন কে জানে ভেবে নেয়, এই মালটাকে ধমকানো যায়। সে আমার সাত বছরের ভাইঝি টুপুন থেকে শুরু করে অফিসে পুরনো পিওন বিনয়কাকু, সবাই আমায় ধমকে-চমকে রাখে। আর সেই ট্র্যাডিশন বজায় রাখতে হারুদাও আমায় হালকা-ভারী ধমকের ওপর রাখে।

গাড়িটা এয়ারপোর্ট চত্বর থেকে বের করে বড় রাস্তায় তুলে হারুদা বলল, “দু’দিন হল এটা হয়েছে। আর শুধু তাই নয় বাড়ি ছেড়ে তোমাদের ওই বাগমারির ফ্ল্যাটেও গিয়ে উঠেছে বড় সাহেব। আলাদা সংসার যাকে বলে।”

“তো আমায় কেউ কিছু বলেনি কেন?” আমি অবাক হলাম।

“সেটা পিসিদি কে জিজ্ঞেস করো। আমি কী জানি। আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে,” হারুদা রাগ করে স্টিয়ারিংয়ে চাপড় মারল। যাঃ শালা, বাবাটা আমার আর লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে বাড়ির ড্রাইভারদাদার।

গাড়িতে ওঠার এই মিনিট পনেরো পরে আমার প্রাথমিক ধাক্কাটা কিন্তু কেটেছে কিছুটা। মনে হচ্ছে, বাবা বিয়ে করেছে তো কী। লোকটার বাহান্তর বছর বয়স তো কী। বয়স তো সংখ্যা মাত্র। এর সঙ্গে মনের কী সম্পর্ক! আমার মা নেই বাইশ বছর। বাবা একা মানুষ। তার যদি এখন মনে হয় কারও সঙ্গে থাকবে, তাহলে অসুবিধে কী। মেসেজটা দেখার পর আমার কেন যে প্রাথমিক একটা ধাক্কা লেগেছিল, সেটা ভেবেই এখন আমি লজ্জা পাচ্ছি। আমার মধ্যে এখনও কি একটা ছোট মনের স্বার্থপর, রিট্রেন্ড লোক বেঁচে আছে?

কিন্তু আমার মনের মধ্যে প্রথম থেকে যে প্রশ্নটা ঘুরছে তা হল, কাকে বিয়ে করল বাবা? পিসি তো সেটা লেখেনি।

এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের বাড়ি খুব কিছু দূরে নয়। মানে সল্টলেক আর কতটা দূর। তাই আর পিসিকে ফোন করিনি। কিন্তু কৌতুহলটা আমার পেটের মধ্যে ডোপ-করা ডলফিনের মতো ঘাই মারছে। কে সেই ভদ্রমহিলা, যে বাবাকে বিয়ে করেছে?

আমি হারুদার দিকে তাকালাম।

হারুদা সঙ্গে সঙ্গে বলল, “কাকে বিয়ে করেছে আমায় জিজ্ঞেস করবে না। আমার কিছু বলা বারণ। বাড়িতে পিসিদি আছে। কাকুদা আছে। তারাই যা বলার বলবে তোমায়। আমার কিছু বলা বারণ।”

আমি অবাক হয়ে গেলাম। হারুদা এক্স মেন-এর সেই চার্লস জেভিয়ার নাকি যে, মনের কথা পড়তে পারে।

আমি হাত বাড়িয়ে এসিটা বন্ধ করে জানলার কাচ নামিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। সবে কালীপূজা শেষ হয়েছে কলকাতায়। এবার দুর্গাপূজা এগিয়ে যাওয়ায় বাকি সব পূজোই এগিয়ে গিয়েছে। ফলে অক্টোবর শেষ হওয়ার আগেই বাঙালির পার্বণ মরসুম শেষ হয়ে গিয়েছে।

রাস্তাঘাট দেখে বুঝতে পারছি, কাল বৃষ্টি হয়েছে বেশ। তাই হয়তো আবহাওয়া ঠান্ডা।

জানলা দিয়ে হাওয়া এসে ঝাপটা মারছে মুখে। এই হাওয়াটা সুন্দর

হতেই পারত, কিন্তু এত পলিউশন যে, আমি আবার কাচ তুলে এসি চালিয়ে দিলাম।

আমি মাস দুয়েক বাইরে ছিলাম। বাইরে মানে দেশের বাইরে। আমার কিছু বন্ধুবান্ধব ইউরোপে থাকে। তাদের কাছেই ঘুরতে গিয়েছিলাম আর কী। সবাই খুব ভাল আছে। সবাই খুব সফল। কিন্তু আমায় সবাই একটাই অনুযোগ করেছে, বা বলা যায় আমার কাছে হতাশা প্রকাশ করেছে এই বলে যে, “রগন, বিয়ে না করে তুই ভাই দারুণ আছিস।”

হ্যাঁ, আমার বয়স চুয়াল্লিশ। আর আমি এখনও অবিবাহিত। বাড়িতে বাবা, পিসি, কাকু থেকে শুরু করে বাড়ির সর্বস্বত্বের কাজের লোকজন সবাই আমায় ‘বিয়ে কর বিয়ে কর’ করে পাগল করে দিয়ে শেষে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। বুঝেছে পাথরে মাথা খুঁড়লে কেবল মাথাটাই ফাটবে। আর কিছু হবে না।

আমাদের পারিবারিক ব্যবসা আছে। বাবা, কাকু আর পিসি তিনজনেই এই ব্যবসায় যুক্ত। আমিও যুক্ত, কিন্তু ওই অন অ্যান্ড অফ টাইপ। আসলে ব্যবসার টুকটাক কাজের পাশাপাশি আমি লেখালিখি করি। দেখুন কবিতা, গল্প, উপন্যাস মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটা বই আছে আমার। ফলে জোর করে মডেস্ট হওয়ার কারণ নেই। লিখতে ভাল লাগে আমার। সঙ্গে টাকাপয়সা পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে একটা ব্যালেন্সে চলে লাইফ।

এর সঙ্গে লিখে কি পরিচিতি পাওয়া যায় না? হ্যাঁ যায়, কিন্তু সেটা নিয়ে আমি অতটা চিন্তিত নই। লিখতে ভাল লাগা আর তার পাশাপাশি রোজগার করাটা আমার কাছে বেশি ইমপোর্ট্যান্ট। কারণ, এই জীবনে একটা সত্যি অন্তত আমি বুঝেছি। এই পৃথিবীতে টাকাপয়সা না থাকলে আপনি স্বাধীন ভাবে, হচ্ছে অনুযায়ী বাঁচতে পারবেন না।

হারুদা জিজ্ঞেস করল, “তোমায় বেশ রোগা লাগছে। তা, ওই দেশে খাওয়াদাওয়া করেনি নাকি?”

আমি হাসলাম। বললাম, “আরে, পাঁচ কেজি কমিয়ে এসেছি। পঁয়ষট্টি থেকে যাটে নেমেছি। কোথায় খুশি হবে। না, এসব বলছ।”

“সেই,” হারুদা মাথা নাড়ল, “যে যা পারো করো। কেউ বিয়ে করো, কেউ প্রেম করো, কেউ খাবার ছেড়ে দাও। আমার কী।”

প্রেম। কে আবার প্রেম করছে?

আমি হারুদাকে জিজ্ঞেস করার আগেই হারুদা বলল, “কে প্রেম করছে আমি বলব না। দু’মাসে অনেক কিছু পাল্টে গিয়েছে। ব্যস, এটাই বলছি।”

আমি হ্যাঁ হয়ে গেলাম। হরনাথ মল্লিক শিওর চার্লস জেভিয়ার। ইয়ে, আপনারা ‘এক্স মেন’ দেখেন তো?

সল্টলেকের রাস্তাঘাট কলকাতার অন্য জায়গার তুলনায় কিছুটা ফাঁকা থাকে। কিছু দূরে দূরে এক-একটা আইল্যান্ড। সেখান থেকে চারটে রাস্তা চারটে দিকে চলে গিয়েছে। নতুন যারা এখানে আসে, অনেকেই দেখেছি রাস্তা গুলিয়ে ফেলে।

আমরা এখানকার বহু দিনের বাসিন্দা। আমরা রাস্তা গুলিয়ে ফেলি না। কিন্তু এখানে এসে ইস্তক যা শুনছি, তাতে মনে হচ্ছে এবার রাস্তা-ই উল্টে আমাদের গুলিয়ে ফেলবে।

এখন সকাল বেশ শান্ত। রাস্তার দু’পাশে অনেক বড় বড় গাছ। তার আলো-ছায়ার আলপনা পেরিয়ে আমরা বাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

আমাদের বাড়িটা বেশ ছড়ানো। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির বড় লোহার গেট দিয়ে ঢুকে একটা সুন্দর লন। তার চারধারে ফুলের বাগান। এই বাগানের মধ্য দিয়েই সিমেন্টের পথ চলে গিয়েছে বাড়ির সামনের গাড়িবারান্দার দিকে। তিনতলা পেলায় বাড়ি। হালকা গোলাপির সঙ্গে নীল রঙের বর্ডার দেওয়া।

বাড়ির পেছনেও একটা বাগান আছে। ভেজিটেবল গার্ডেন। আর তার পাশেই আছে বড় বড় কয়েকটা গাছ। এর সামনে ছোট্ট একটা জলাশয় আছে। রঙিন পাথর দিয়ে ঘেরা।

এই জলাশয়ের এক পাশে আছে একটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট আর অন্যপাশে রয়েছে আউটহাউস। এই বাড়িটাও বেশ বড়। আর এখানেই থাকে মালিদা, হারুদা, লালু-সহ আরও কয়েকজন কাজের লোক। আর এই আউটহাউসের গা ঘেঁষে আছে একটা শেড। তাতে নানা যন্ত্রপাতির সঙ্গে রাখা আছে দুটো রোলার। ম্যানুয়ালি পুলড। একটা নীল রং করা আর অন্যটা লাল।

এই সব কিছুই আমার ঠাকুরদা বানিয়ে গিয়েছিলেন। রোলার দুটোও নাকি গুঁরই কেনা। আমি দেখেছি, বাড়ির সব কিছুর সঙ্গে এই রোলার দুটোরও খুব যত্ন করা হয়।

বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে আমাকে মালপত্র-সহ নামিয়ে দিয়ে আউটহাউসের পেছনে গ্যারাজের দিকে গাড়িটা নিয়ে গেল হারুদা। যাওয়ার আগে বলল, “নাও, যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে দিলাম। যাও।”

আমার ঘরটা তিনতলায়। মালপত্র নামাতেই লালু বেরিয়ে এল। লালু ছোট থেকেই আমাদের বাড়িতে আছে। ক্লাস টুয়েলভ অবধি পড়েছে। এই বাড়ির ম্যানেজার বলা যায় ওকে।

আমি বললাম, “কী রে। সবাই কই?”

লালু ধবধবে ফর্সা। অল্পতেই ওর মুখ লাল হয়ে যায়। আমার কথা শুনেই দেখলাম মুখটা লাল হয়ে গেল ওর। বলল, “তুমি কি হিউয়েন সাং নাকি ফা হিয়েন? সারাক্ষণ টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। এদিকে মুখার্জি ফ্যামিলি তো পুরো ছারখার হয়ে গেলা।”

আমি বললাম, “কী করে হল ব্যাপারটা?”

“আমার বলা বারণ,” লালু ভুরু কঁচকে মাথা নাড়ল, “তুমি আগে ফ্রেশ হয়ে নাও। তারপর পিসির সঙ্গে দেখা করো। পিসি পুজোয় বসেছে।”

আমাদের বাড়ির দোতলায় পুজোর ঘর। সেখানে খুব সকালে স্নান করে পিসি পুজোয় বসে। আর পুজোয় বসা মানে দু’ঘণ্টার জন্য পিসিকে আর পাওয়া যাবে না।

আমি লালুকে মালপত্র আমার ঘরে রেখে দিতে বলে ভাবলাম কাকুর সঙ্গে দেখা করব কি এখন? কিন্তু তার পর মত বদলালাম।

কাকুর বয়স প্রায় ছেষটি। কিন্তু একদম ফিট। এখন সকাল আটটা বাজে। কাকু নিশ্চয়ই মনিংওয়াক সেরে ফিরেছে সবে। একটু রেস্ট করুক। আমি পরে দেখা করব।

জামার বুকোর কাছের একটা বোতাম খুলে কোমরে গোঁজা অংশটা টেনে বের করে আনলাম আমি। অস্বস্তি হচ্ছে। এখন স্নান করতেই হবে। আমার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে খুব খুঁতখুঁতে ব্যাপার আছে। মা বলত এমন করলে কারও সঙ্গে থাকতে পারবি না। আসলে কারও সঙ্গে দেখা হলে, আমার সবার আগে তার হাইজিনের দিকটাতেই চোখ পড়ে। মানে, বিশ্বাস করুন, ইচ্ছে করে করি না। এটা যেন অটো সাজেসশন। তার হাত-পা কেমন, দাঁত কেমন। জামা-কাপড় আর জুতো পরিষ্কার কি না, এ সবই আপনা থেকেই মনের মধ্যে একটা লিস্ট তৈরি করতে থাকে। এ সব যে উচিত নয় আমি জানি। কিন্তু তাও নিজেকে শুধরোতে পারি না। এই বিদ্রূষে ‘আমি’-টাকে নিয়ে আমি নিজে যে কতটা বিব্রত থাকি, তা আপনাদের কী করে বোঝাই!

কাল সারাটা রাত দিল্লির এয়ারপোর্টে কেটেছে। ঘুম হয়নি একটুও। তার ওপর জেটল্যাগ। মনে হচ্ছে কারও কথাই ভাল করে শুনতে পাচ্ছি না। মাথার ভেতরে যেন সেই ছোটবেলার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভির ঝিরঝিরটা হয়ে চলছে সারাক্ষণ। চোখের পাতা দুটো লোহার তৈরি। আর একটা লাটু কেমন যেন পাক খেয়েই চলেছে শরীরে।

আমি তিনতলায় নিজের ঘরে গেলাম। তার পর জামাকাপড় পাল্টে একটা তোয়ালে আর পাজামা পাঞ্জাবি নিয়ে বাথরুম ঢুকলাম। সাংঘাতিক একটা স্নান দরকার আমার।

কিন্তু আগে দাড়ি কামাতে হবে।

শেভ করে কাচের স্নানঘরে ঠাণ্ডা-গরম জল মিশিয়ে শাওয়ার খুলে দাঁড়ালাম আমি। আর জলটা মাথায় পড়ামাত্র মনে হল এখানেই বালিশ বিছানা নিয়ে এসে শুয়ে পড়লে হয়।

কুড়ি মিনিট ধরে স্নান করলাম। তার পর ভাল করে গা মুছে জামাকাপড় পরে বেরিয়ে এলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ালাম সময় নিয়ে।

আয়নার পাশের দেওয়ালে বড় করে বাঁধানো মায়ের ছবি। নীল শাড়ি পরে অমরকন্টক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তোলা মায়ের শেষ ছবি। মা মারা যাওয়ার পরে এটা আমিই বাঁধিয়েছি।

দেখলাম, মা হাসছে। মা সারাক্ষণ হাসত।

আমি হাত বাড়িয়ে আলতো করে ছবির মধ্যে মায়ের গালটা ধরলাম। যেমন সত্যি সত্যি এক সময় ধরতাম। তার পর বললাম, “তোমার বর আবার কী ঝামেলা পাকাল গো? সত্যি আর লোক পাওনি প্রেম করে বিয়ে করার?”

পায়ে নরম হাওয়াই চটি গলিয়ে আমি সিঁড়ির দিকে এগোলাম। একতলায় আমাদের খাওয়ার জায়গা। পিসির আদেশ সেখানে সবাইকে একসঙ্গে বসে খাবার খেতে হবে।

পিসি ভাইবোনদের মধ্যে সবার ছোট। পড়াশোনায় খুবই ভাল। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। চব্বিশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল পিসির। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পিসির স্বামী মারা যান। ঘুমের মধ্যে আচমকা হার্ট অ্যাটাক। বাবা আর কাকু পিসিকে আমাদের বাড়িতেই ফিরিয়ে আনে। আমার মা কাকিমা পিসির আবার বিয়েও দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পিসি রাজি হয়নি।

আমার তখন চোন্দো-পনেরো বছর বয়স। মনে আছে কাকু শুধু বলেছিল, “এখনও তোর মাথার ভূত নামল না? ওকে বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিল। তার পর ও আর আসবে মনে হয়? বাবা বেঁচে নেই। তাও ও আসবে না। নিজের জীবনটা এ ভাবে নষ্ট করিস না তুলি।”

পিসি বলেছিল, “আমি তোমাদের কথা মতো তো বিয়ে করলাম। তাতে কিছু হল? ঠাকুর চায় না আমি অন্য কারও হই। বিয়ে আর আমি করব না।”

সেই থেকে পিসি আমাদের সঙ্গেই থাকে।

আমার সেই টিন-এজে শোনা কথাগুলোর মধ্যে যে চিহ্ন ও সঙ্কেত ছিল, তা সারা জীবন আমায় কৌতুহলী করে রেখেছে। কে ছিল পিসির জীবনে? আর সে কেন চলে গিয়েছিল?

খুব রাগী, সাদা মার্বেলের মতো পিসিকে দেখলে ভীষণ অবাঁক লাগে আমার। এই মানুষটার মধ্যেও প্রেম ছিল। সত্যি প্রেম খুব খতরনাক জিনিস। লোহা, পাথরেও জেদি ফুলের মতো ফুটে ওঠে, বেঁচে থাকে।

আমাদের খাবার ঘরের টেবিলটা একদম গোল। ছোট্ট বলে, কিং আর্থারের টেবিল। চারিদিকে গোল করে দশটা চেয়ার সাজানো।

ছোট্ট মানে কাকুর ছেলে। দেখলাম ছোট্টর সঙ্গে রিতু রয়েছে। রিতু ছোট্টর বউ। ওর ক্লাসমেট ছিল ডাক্তারিতো। আর সঙ্গে আছে টুপুন।

আজ রবিবার বলে টুপুনের স্কুল নেই। আমায় দেখেই টুপুন চেয়ার ঠেলে দৌড়ে এল আমার কাছে। আমি ঝুঁকে পড়ে ওকে ধরলাম আর টুপুন আমার গলা ধরে দোল খেয়ে কোলে উঠে পড়ল।

সামান্য বেসামাল হলাম আমি। জেটল্যাগ বড্ড আপদ।

টুপুন বলল, “রনো, তুমি আমার জন্য কী এনেছ?”

এই জন্য ছোট্টদের ভাল লাগে আমার। আমড়াগাছি করে না। ভ্যানতারা করে না। নিজেকে বিজ্ঞ, দার্শনিক প্রমাণ করতে চায় না। সরাসরি কাজের কথাই আসে। মানে, “আমার মালটা কই।”

বড়রাও কিন্তু আল্টিমেটলি এই প্রশ্নেই আসে। কিন্তু বেকার আটশো পঞ্চাশ পাতা পরে।

আমি টুপুনকে বললাম, “তোমার পুতুল, জামাকাপড়, চকোলেট সব এনেছি। পরে দেব।”

“দূর। চকোলেট নিয়ে আমি কী করব,” টুপুন বিরক্ত হল, “ফরেন থেকে এসে সবাই এই চকোলেট আর চুয়িংগাম দিয়ে সারতে চায়। খালি ফাঁকিবাঁজি।”

সাত বছরের মেয়ের মুখে এ কী কথা ভাই। এ মেয়ে কি বড় হয়ে মাদাম কুরি হবে? অবশ্য এখনকার বাচ্চারা সবাই জন্মের পরেই মাদাম

একুশ।

জানি জানি, লেম জোক। কিন্তু জানবেন, জেটল্যাগে এমন অনেক কিছু হয়। যাঁরা এখনও জেটল্যাগ অনুভব করেননি, তাঁরা এর খানিকটা ধারণা পাবেন কোনও বিকেলে অফিস ছুটির পরে, বনগাঁ লোকালের সাংঘাতিক ভিড়ে ইয়াকবড় একটা সুটকেস নিয়ে উঠলে।

“তোর লজ্জা করে না!”

আচমকা পিছন থেকে পিসির গলাটা এসে চকোলেট বোমার মতো ফাটল আমার মাথার পেছনে।

আমি টুপনকে নামিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িলাম।

দেখলাম পিসি এসে দাঁড়িয়েছে। ফর্সা, বেঁটে মানুষ। এই পঞ্চাশতও অসাধারণ সুন্দরী। কেমন যেন টিউবলাইটের মতো আলো বেরোয় গা থেকে। এখন মনে হল সেই আলোটা যেন সামান্য লাল। আসলে রাগের রং যে লালই হয়।

আমি হাসার মতো মুখের ভঙ্গি করলাম। সত্যি বলতে কী, এই বয়সে এসে আমার খুব যে লজ্জা করে তা নয়। কিন্তু সব সত্যি যে বলতে বা বোঝাতে নেই, সেটা আমি শিখে গিয়েছি।

পিসি এগিয়ে এল আমার দিকে, “তুই বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। আর এ দিকে তোর বাপ কী করেছে শুনেছিস?”

আমি মাথা নাড়লাম, “ওই তুমিই তো মেসেজ করলে। জানলাম। কবে হয়েছে? আর কাকে বিয়ে করেছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।”

পিসি বলল, “বিয়ে করেছে গতকাল বিকেলে। সই করে। ভাব একবার। ক’দিন যাবৎ বাগমারির ফ্ল্যাটে থাকছিল। কিন্তু পেটে পেটে যে এ সব গ্ল্যান করছে, সে আমার কেউ বুঝিনি।”

“তুলি, তুই উত্তেজিত হোস না,” কাকু আর কাকিমা এক সঙ্গে ঘরে ঢুকল।

“কেন হব না?” পিসি ফুঁসে উঠল, “কী স্ক্যান্ডাল বল তো? রনো, এর একটা বিহিত করতে হবে তোকে।”

“আমাকে?” আমি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম, “আমি কী করব? বাবার সঙ্গে এমনিতেই আমার ডিসট্যান্স আছে। সেখানে পূর্ণ বয়স্ক একটা লোক কী করবে তা সেই জানে।”

“বাহাভুরে ধরছে। নাহলে কেউ এমন করে? তুই ভাব। এবার একটা ছেলেপিলে হয়ে গেলে কী হবে?” পিসি যেন আরও লাল হয়ে বসে পড়ল চেয়ারে।

ছেলেপিলে। এই সেরেছে। নিজের বাবার সেক্স লাইফ নিয়ে আমার কি কিছু বলা উচিত? মানে যতই সমাজ উন্নত আর উন্মুক্ত হোক না কেন, একটা তো সীমারেখা আছেই।

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে পিসির দিকে তাকালাম। আর শুধু আমি-ই নই, ঘরের সকলেই তাকিয়ে রইল।

পিসি বলল, “জানিস, কাকে বিয়ে করেছে?”

আমি মাথা নাড়লাম। এটাই তো জানার চেষ্টা করছি। কিন্তু পিসি সবাইকে বলতে বারণ করেছে। কারণ, খবরটা পিসিই ব্রেক করতে চায়।

“টফিকে।”

ট-ফি-পি-সি। আমি হাঁ হয়ে গেলাম। টফিপিসি আমার পিসিরই বান্ধবী। এক সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে। বছর দশেকের ডিভোর্সি। নিঃসন্তান। আমাদের বাড়িতে খুব আসে। তাকে।

আমার মুখ থেকে ফট করে প্রশ্ন বেরিয়ে এল, “বাবাকে দু’একবার রাখিও পরিয়েছে না?”

“আমিও সেটাই জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে যে, টফি তুই এটা কী করলি? রাখি পরিয়েছিলিস না?” পিসি মাথা নাড়ল, “নির্লজ্জটা বলে কী জানিস? বলে ওটা ওরিয়েন্টাল ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড হিসেবে পরিয়েছি। দাদা-ভাই হিসেবে নয়। ভাব, ভাব একবার।”

আমার মাথার মধ্যে সাদা কালো টিভির ঝিরঝিরটা যেন বেড়ে গেল আরও। টফি পিসি। নাকি টফি-মা? ইস, মা। হ্যাট। মাথার মধ্যেটা

কেমন করছে আমার।

পিসি আবার বলল, “এবার বাচ্চা-ফাচ্চা এসে গেলে কী হবে? সেই হিন্দি সিনেমাটার মতো হয়ে যাবে না, বল?”

আমি কিছু বলার আগেই টুপন পা দুলিয়ে হেসে উঠে বলল, “আমি জানি কী করে বাচ্চা হয়।”

আমি চমকে গেলাম। এ সব কী হচ্ছে বাড়িতে? সবাই কি পাগল হয়ে গিয়েছে?

আমি হাতজোড় করে বললাম, “মাদাম বাইশ তুমি থামো।”

“আরে, জানি জানি এটাও... কিন্তু বনগাঁ লোকালের অফিস টাইমের ভিড়। ইয়াকবড় সুটকেস। মনে আছে তো?”

দুই

‘What have you done Captain!’

জানেন, সব সময় জটিল কঠিন জীবনের গল্প লিখতে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে মনে হয় গল্প হোক সহজ-সরল। শেষ শরতের সকালে ফুলগাছের ওপর উড়ে বেড়ানো ফিনফিনে প্রজাপতির মতো। মনে হয় জীবনও তেমনই হোক। আমার নিজের অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি বাড়ানোর ফিকিরে তৈরি হওয়া ঝামেলা-বাঞ্ছাটের চেয়ে সহজ-সরল জীবনই বেশি ভাল লাগে। মনে হয় একদিন তো চলেই যাব এই পৃথিবী থেকে, সেখানে অনর্থক জটিলতা বাড়ানোর মানে কী!

কিন্তু আমার মতো তো আর সারা পৃথিবী ভাববে না। ‘ফাইট অর ফ্লাইট’-এর অপশনে তারা প্রথমটাই বেছে নেবে। ফলে কমপ্লিকেশন হবেই। তাই আমি দেখেছি, জীবন হল পকেটে রাখা ইয়ারফোনের কর্ড। গুছিয়ে রাখলেও, বের করার পরে দেখবেন কেমন করে যেন পের্টিয়ে, গিটু লেগে গিয়েছে।

আমার জীবনের গিটু হল এই বাবা, কাকু, পিসি আর এদের থেকে তৈরি হওয়া ঝামেলা।

এমনিতেই ঘুম হয়নি। তার ওপর জেটল্যাগ। মাথা-ফাথা কাজ করছে না। তার মধ্যে পিসি আর কাকু শুরু করেছিল, আমি যেন গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করি। যেন বোঝাই যে, এই বিয়েটা ঠিক হয়নি। বাবা যেন বিয়ে ভেঙে বেরিয়ে আসে।

আরে, একটা পূর্ণ বৃদ্ধ লোক নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করে নিজের মতো জীবন কাটাতে চাইছে, আমি বেকার সেখানে গিয়ে কাঠি করব কেন? আর বিয়ে কি কাচের বাসন যে, ইচ্ছে করলেই আছাড় মেরে ভাঙা যায়। এখন শুনেছি নিয়মকানুন খুব শক্ত, বেকার অন্যের বিয়ে নিয়ে ঝামেলা করতে গেলে ডান্ডা হয়ে যাবে।

আমি খড়কেতেই ভয় পাই, সেখানে ডান্ডা। ভাবুন। আরে বাবা, একটা লোক সদ্য বিয়ে করেছে। তাকে শান্তিতে থাকতে দাও না। সেখানে আমি দুর্যোধন হয়ে এন্ড্রি নেব কেন? মা আর পৌষালি চলে যাওয়ার পর থেকেই আমার মধ্যে একটা হালকা বৈরাগ্য এসে বাসা বানিয়েছে। সেখান থেকে নড়েচড়ে আবার গৃহী হতে খুব কিছু ইচ্ছে করে না আমার। যা কাজকর্ম করতে হয় তা নিজের স্বাধীন ইচ্ছে মতো বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু লোকজন শুনবেই না। সবাই এমন ডালভাতের মতো মেখে আছে বিষয়-আসয় আর অন্যের জীবনে যে, কাকে কী বলি।

ফলে সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে কিছুটা ঘুমের পরে আমাকে এই দুপুরবেলায় আসতেই হয়েছে বাগমারিতে। বাবার নতুন দাম্পত্য জীবনে। আর এখন বাবার সামনে বসে আমার রীতিমতো লজ্জা করছে। কেন কে জানে। কিন্তু করছে। মনে হচ্ছে আমি যেন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অন্যের বাড়ির পর্দা তুলে দেখছি, তারা বাড়ির মধ্যে কী করছে।

বাগমারির এই ফ্ল্যাটটা ডুপ্লেক্স। বেশ বড়। চারটে বেডরুম। বিশাল বড় ড্রয়িং কাম ডাইনিং। চওড়া বারান্দা। পার্সোনাল ছাদ। বাবা এটা

কিনেছিল এই আশা নিয়ে যে, বিয়ের পর আমি এখানে বউ নিয়ে শিফট করব। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর জীবনে হয় আর-এক।

বাবা আমার সামনেই বসে আছে। লাল টকটকে একটা টি-শার্ট আর কমলা বারমুড়া। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। আর মাথার সাদা চুল কুচকুচে কালো রং করা।

আমার মনে হচ্ছে বাবাকে যেন কোনও বাচ্চা মেয়ে ক্রেয়ন ঘষে ঘষে রং করছে। বাবা তো চুলে কলপ করত না। এমন রংচঙে জামাকাপড়ও পরত না। তা হলে? এ সব কী? বাবাকে আমার নিজের বাবা বলে মনেই হচ্ছে না।

আমি দেখছি, যারাই অনেকটা কমবয়সি মেয়েকে বিয়ে করে, তারা দড়ি-দড়া দিয়ে নিজেদের যৌবনকে বেঁধে রাখতে চায়। সেই কারণেই এমন জামাকাপড়, কলপ ইত্যাদি করে। আমি পৌষালির হাজ্জাবান্ডকেও দেখেছি। সেম কেস। অমিতদা, পৌষালির চেয়ে প্রায় ষোলো বছরের বড়। সেও দেখেছি চুলে গোঁফে বাদামি, বাগেঁন্ডি কলপ লাগিয়ে চামড়ার রংই প্রায় পাল্টে ফেলেছে।

আমি বুঝি না এত ইনসিকিওরিটি কিসের ভাই। রূপ ও যৌবন তো চলে যাবেই। আমার তো মনে হয় কেবল ওল্ড এজ-টাই পার্মানেন্ট। বাকি সবটাই ফ্রিটিং। কিন্তু কাকে কী বলব। মানুষকে বলে কিছু হয় না। বাবাকেও বলে কিছু হবে না।

আমি বাবার দিকে তাকালাম। বাবা মোবাইলে কী একটা দেখছে। আমি এসেছি পাঁচ মিনিট। কিন্তু এখনও একটাও কথা বলেনি।

আমিই অগত্যা প্রশ্ন করলাম, “তোমার শরীর ঠিক আছে?”

বাবা মোবাইল থেকে মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে। বলল, “এত দিনে তোর মনে হল আমি ঠিক আছি কি না? বিদেশে গিয়ে একবারও খবর নিয়েছিস?”

আমি জানি এই ট্রিকটা। বাবা এদিক-ওদিক কিছু করলে এরকম আক্রমণাত্মক মুডে থাকে। এটা ডিফেন্স মেকানিজম। মানে, বাবাকে কেউ কিছু বলার আগেই বাবা আক্রমণ করে মাঠের দখল নিতে চায়।

আমি শান্ত ভাবে বললাম, “প্রথম তিন সপ্তাহ তো ফোন করেছিলাম। তার পর আর করিনি। বাড়িতে সবাই আছে। তাই তেমন কিছু হলে তো জানতেই পারব।”

বাবা তাও বলল, “তোর দায়িত্ব নেই একটা?”

আমি হাসলাম। মানে হাসিটাকে আটকাতে পারলাম না।

বাবা তাতে যেন আরও রেগে গেল। চোঁচিয়ে বলল, “দাঁত দেখাচ্ছিস। আমি কি জোকার? মজা করছি তোর সঙ্গে?”

বাবার গলা এমনতে ভারী। তাই চিৎকারটাও তেমন। দেখলাম, পাশের ঘর থেকে এবার টফিপিসি বেরিয়ে এল। এতক্ষণ আসেনি কিন্তু।

টফিপিসি বাবার কাঁধে হাত রেখে বলল, “প্রেশারের রোগী তুমি, এমন চোঁচাচ্ছ কেন? রনো তো সামান্য একটা কথা জিজ্ঞেস করেছে। এত চটে যাওয়ার কী আছে।”

মানে, টফিপিসি পাশের ঘর থেকে সবটা শুনেছে।

আগুনে জল পড়ল। দেখলাম বাবা নিমেষে শান্ত হয়ে গেল। আমার মনে পড়ল মায়ের কথা। বাবা রেগে গেলে মা শান্ত করতে যেত। তখন বাবা যেন দ্বিগুণ রেগে যেত।

আমি নিজের মাথার ভেতরের ব্ল্যাকবোর্ডে ফুটে ওঠা উদ্ভিদকোষ আর প্রাণিকোষের পার্থক্যটাকে ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করলাম। মায়ের সঙ্গে টফিপিসির এই তুলনা করাটা খুবই বাজে একটা কাজ।

আমি হাসলাম আবার। এটা পরিবেশ সহজ করার জন্য।

টফিপিসি জিজ্ঞেস করল, “তুমি দুপুরে খাবে তো?”

আমি মাথা নাড়লাম, “না না। খেয়ে এসেছি। পিসি কি না খাইয়ে ছাড়বে, বলো?”

টফিপিসি হাসল। একটা অস্বস্তি যে আছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

এর পর আচমকা সবাই চুপ করে গেল। দেওয়াল ঘড়ির টকটকানি

অনেকটা বেয়ারা বাচ্চার কান্নার মতো আছড়ে পড়ল ঘরে।

যে-আমি বাবার সঙ্গে বসে কোনও দিন সিনেমা দেখিনি নায়ক-নায়িকা শেষ দৃশ্যে একে অপরকে জড়িয়ে ধরবে বলে, সে এমন একটা পরিস্থিতিতে বসে আছে। আমি কী করব বুঝতে পারলাম না।

টফিপিসিই প্রথম কথা বলল, “রনো, তুমি রাগ করছ?”

আমি? রাগ? হাসি পেল আমার। আমার শরীরে রাগ বলে ব্যাপারটাই নেই। কিন্তু এখানে হাসা ঠিক নয় বলে আমি স্বাভাবিক গলায় বললাম, “না না, রাগের কী আছে।”

বাবা আক্রমণাত্মক গলায় বলল, “ও রাগ করবে কোন মুখে? ওকে বিয়ে করতে বলছি লাস্ট সতেরো বছর। আমার কথা শুনেছে? তাই আমিই বিয়ে করে নিয়েছি। বেশ করেছে।”

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। বাবা সব কিছুকেই কেমন যেন একটা ঝগড়ার দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। আসলে ওই যে বললাম, এটা বাবার নিজের অপরাধকে মোকাবিলা করার একটা ট্রিক। কাউন্টার-অ্যাটাক।

আমি বললাম, “ঠিক করছে তুমি। টফিপিসি খুবই ভাল মানুষ। আই হোপ তোমরা ভাল থাকবো।”

“আঁ,” বাবা যেন ঘাবড়ে গেল একটু। মানে, ছেলে বলছেটা কী! ঝগড়া করছে না তো।

আমি হেসে বললাম, “তোমরা ঠিক করছ। বয়স হলে মানুষ খুব একা হয়ে যায়। তোমরা দু’জনেই তো একা। তাই যা করছে একদম ঠিক আছে।”

টফিপিসি এবার ধপ করে বসে পড়ল বাবার পাশের সোফায়, তার পর আচমকা দু’হাতের পাতায় মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল শব্দ করে।

আমি ঘাবড়ে গেলাম। এই কেলো করেছে। এতে কান্নাকাটি করার কী হল। আমি তো খারাপ কিছু বলিনি।

বাবাও দেখলাম ঘাবড়ে গিয়েছে। টফিপিসির হাত ধরে একদম ঝুঁকে পড়ে নরম গলায় বাবা বলল, “টফি, এই টফি কী হল? কাঁদছ কেন?”

আমি হাঁ হয়ে গেলাম মনে মনে। কেমন একটা লাগল যেন। আমার মায়ের সঙ্গে বাবার লাভ ম্যারেজ হলেও বাবাকে আমি কোনও দিন ‘লাভার’ মোড-এ দেখিনি। সেখানে আমার সামনে বসে বাবা এমন নরম গলায়, টফিপিসির হাত ধরে কথা বলছে। আপনাদের সত্যি বলছি, নিজের বাবাকে অন্যের প্রেমিক হিসেবে দেখার মধ্যে বেশ একটা অস্বস্তি আছে।

আমি বুঝলাম, প্রেমে পড়লে মানুষের ভেতরের চিরকালীন টিনএজার সত্তাটা বেরিয়ে পড়ে।

টফিপিসি সময় নিয়ে নিজেকে সামলাল। তার পর শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ-নাক মুছে ধরা গলায় বলল, “তুলি আমার ছোটবেলার বান্ধবী। সে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। বলে আমি নাকি গোল্ড ডিগার। তোমার বাবাকে বিয়ে করেছে টাকার লোভে। রবিনকে আমার চিরকাল পছন্দ ছিল। কোনও দিন সাহস করে বলতে পারিনি। রনো, একটা জিনিস জেনো, আমিই তোমার বাবাকে বলেছি বিয়ে করার কথা। রবিন কিন্তু আমায় বলেনি। এমনকি, আমি ওকে বলার পরেও দিন দশেক সময় নিয়েছে ‘হ্যাঁ’ বলতে। জীবন তো একটাই। রবিনকে বিয়ে করলে কার কী ক্ষতি বলে! বয়স হয়ে গিয়েছে বলে আমাদের জীবন কি জীবন নয়? আমাদের কি কাউকে ভাল লাগতে পারে না?”

পয়েন্ট আছে। আমি মাথা নাড়লাম। বুঝলাম, টফিপিসি বিএফএফ হারানোর কষ্টে এমন করে কাঁদছে।

আমি বললাম, “টফিপিসি, তুমি এমন কোরো না। আমি পিসিকে বলব। সব ঠিক হয়ে যাবে।”

“আর না হলেও আমার ঘণ্টা,” বাবা আবার গর্জন করে উঠল।

এ লোকটাকে নিয়ে তো পারা যায় না। সারাক্ষণ এমন রেগে থাকে কেন কে জানে। এ কি রাগটাকেই পার্সোনালিটি ভাবে?

বাবা বলল, “ওদিকে ও নিজে কী করছে জানিস? সে খবর দিয়েছে তোকে?”

আমি অবাক হয়ে গেলাম। পিসি আবার কী করছে!

বাবা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, “জানিস, আমাদের বাড়িতে কে আবার যাতায়াত শুরু করেছে?”

আমি মাথা নাড়লাম।

বাবা আরও চার সেকেন্ড পজ নিয়ে সাসপেন্স ঘনঘোর করার পর বলল, “বাবি।”

বাবিকাকু। সে তো কাকুর পরিচিত। এর্নাকুলাম না কোথায় থাকত। সে আবার এই গল্পে এসে ঢুকল কী করে?

বাবা চোখ ছোট করে বলল, “নিজের বেলায় দোষ নেই, না?”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “বাবিকাকু তো কাকুর পরিচিত। সেখানে... মানে কী ব্যাপার?”

“কাকুর বন্ধু,” বাবা পুরো রাগী কমল মিত্র। বলল, “কিছু না ও সব। তুলির সঙ্গে ওর প্রেম ছিল। আমার বাবা ঘাড় ধরে ব্যাটাকে তাড়িয়েছিল। তুলির বিয়ে দিয়েছিলাম আমরা। তুলি তার পর ফিরে এলে আর বিয়ে করেনি ওই বাবিটার দুঃখে। বুঝেছিস। নিজের ফ্যামিলির হিস্ট্রি-ই জানিস না।”

আমি মনে মনে হাঁ হয়ে গেলাম। ও বাবা, এ সব আবার কী গল্প। আর তা ছাড়া এ সব কি পাঠ্যবইতে পড়িয়েছে নাকি যে জানব?

বাবা বলল, “তুই তুলিকে গিয়ে বলিস, আপনি আচারি ধর্ম-টা যেন ভুলে না যায়। আমি বিয়ে করেছি তাতে কার বাবার কী? আমি টফিকে ভালবাসি। তাই বিয়ে করেছি। বয়স হয়েছে বলে কি আমার লাভ লাইফ, সেক্স লাইফ থাকতে নেই! জানিস তো ছেলেরদের স্পার্ম সারা জীবন জন্মায়।”

আমার মনে হল, ‘ধরণী তুমি দ্বিধা হও।’ নিজের বাবার কাছ থেকে এ সব গল্প আমি শুনতে চাই না। দেখলাম, টফিপিসিও মুখ লাল করে বসে আছে।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, “সব ঠিক হয়ে যাবে। যে-কোনও নতুন কিছু সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে সময় লাগে। যাকগে। আমি খুবই ক্লান্ত। ঘুম পাচ্ছে। বাড়ি যাই। পরে আবার আসব। তোমরাই-বা ওই বাড়িতে এসে থাকছ না কেন?”

বাবা বলল, “ওই বাড়িতে? যেখানে আমার বউকে কেউ মারছে না, সেখানে? কভি নেহি।”

আমার মনের ভেতরের ব্ল্যাকবোর্ডে আবার সেই পার্থক্যের খোপটা ফুটে উঠল। বাবাকে আমি কোনও দিন মায়ের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে দেখিনি। আর সেখানে এখন! এটা কোন বাবা?

আমি আর কথা বাড়লাম না। কেবল ‘আসছি’ বলে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

আসার আগে টফিপিসি বলল, “রনো, একদিন এসে এখানে খেয়ে যাবে। মনে থাকে যেন।”

মনে থাকটাই তো কাল হয়েছে আমার। এই মনের মধ্যে এক গ্যারাজ হাবিজাবি স্মৃতি নিয়ে বসেই তো কেস খেয়েছি।

ফ্ল্যাট থেকে নেমে আমি আমার ছোট গাড়িটা গিয়ে উঠলাম। আমার আবার ঘুম পাচ্ছে। পিসির গুঁতোয় এখানে না-এলে আমি আরও ঘুমোতাম।

কলকাতা এখন পপকর্নের মতো ফুটছে। এত লোকজন এখানে। এত গাড়িঘোড়া। এত হর্ন। বিদেশে দু’মাসে আমি মাত্র দু’বার গাড়িকে হর্ন দিতে শুনেছি। তাও প্যারিসে।

সেখানে এক জন আলজিরিয়ান উবার ড্রাইভার সামনের একটা বেয়ারা মোটরসাইকেল আরোহীকে কাটাতে না পেয়ে দু’বার হর্ন দিয়েছিল। আর তার পর লোকটি আমার কাছে চার-পাঁচবার ক্ষমা চেয়েছিল হর্ন দেওয়ার জন্য। আর এখানে সারাক্ষণ লোকে কারণে-অকারণে হর্ন দিতেই থাকে।

বাগমারি থেকে সন্টলেকে আমাদের বাড়ি বিশেষ দূরে নয়। কিন্তু

এই পথটা যেতেই বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল। আসলে আমি যখনই গাড়ি নিয়ে বেরোই, রাস্তার সমস্ত সিগনাল লাল হয়ে যায়। মানে, কখনও কোনও সিগনাল আমি সবুজ পাই না।

আজও তাই হয়েছে। পথের সব ক’টা সিগনাল লাল। প্রতিটা সিগনালে মিনিটখানেক আটকে গেছি। আমার কপালটা কে লিখেছিল কে জানে! যে-ই লিখে থাকুক, গ্রুফ চেক না করেই ছাপিয়ে দিয়েছে।

লম্বা লম্বা সিগনাল খেয়ে তার চেয়েও লম্বা লম্বা হাই তুলতে তুলতে আমি বাড়ি ফিরলাম। মনমেজাজ ভাল নেই। বাবার রাগ, টফিপিসির কান্না, বাবার প্রেমিক সন্তা— সব মিলিয়ে কেমন যেন জগাখিচুড়ি হয়ে আছে মনটা। যতই আধুনিক হয়েছি বলে শ্লাঘা অনুভব করি না কেন, কিছু কিছু জিনিস মেনে নিতে সত্যি সময় আর উদারতা লাগে।

বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে দেখলাম, মালিদা একটা স্প্রেয়ারের বোতল নিয়ে শিউলি গাছে কী সব স্প্রে করছে। পাশে লালু দাঁড়িয়ে আছে।

শিউলি গাছে ফুলের সময় এখন। সঙ্গে স্ত্রীপোকার সময়ও। বাড়িতে মাঝেমাঝে লোমওলা ওই ডেঞ্জারাস স্ত্রীপোকাগুলো ঢুকে পড়ে। আমরা বড়রা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেও টুপুন তো আর বোঝে না। ওকে নিয়েই তাই ভয়।

মালিদা তাই মাঝেমাঝে কী সব যেন স্প্রে করে।

আমি গাড়িটা গ্যারাজে রেখে বাড়ির দিকে এগোলাম। দেখলাম, হারুদা বড় লাল গাড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমায় দেখেই হারুদা জিজ্ঞেস করল, “বড় সাহেব কেমন আছে গো?”

আমি মাথা নাড়লাম, “টপ ক্লাস।”

“যাক,” হারুদা বলল, “এবার তুমিও একটা বিয়ে করে নাও।”

আমি ভাবলাম বলি, “আগে বাপের বিয়েটা হজম হোক, তার পর ভাবছি, কিন্তু বললাম না। কী হবে? যা হয়ে গেছে, তা তো হয়েই গেছে, সেটা নিয়ে এখন আর এ সব ভেবে লাভ নেই।

আমি শুধু হাসলাম। আর তখনই দেখলাম পিসি বেরিয়ে আসছে। বাইরে যাওয়ার পোশাক।

আমি অবাক হয়ে তাকালাম পিসির দিকে।

পিসি কাছে এসে আমার দিকে তাকিয়ে বেজার মুখে বলল, “দাদার সঙ্গে কথা হল?”

আমি মাথা নাড়লাম। মানে হ্যাঁ।

“বুড়ো বয়সে এই ভীমরতির কারণটা কী বলেছে?”

আমি আবার ভাবলাম বলি যে, ভীমরতির কথা না বললেও হালকা করে রতির কথা বলেছে। কিন্তু এটা বললাম না। শুধু বললাম, “রেগে আছে সবার ওপর। ও আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। টফিপিসি তোমাকে খুব মিস করে। কান্নাকাটি করছিল। প্লাস বাবা আরও একটা কথা বলেছে।”

“টফি কান্নাকাটি করেছে? ন্যাকামো দেখলে গা জ্বলে যায়। আর দাদা কী বলেছে? ও, এরই মধ্যে বলে দিয়েছে তোকে?” পিসি আবার সাদা থেকে লাল রঙের আলো হয়ে উঠছে।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিসির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বাগানের দিকে তাকালাম। শেষ আশ্বিনের হাওয়া বিকেলবেলার শহরের ফাঁকফোকর দিয়ে এসে পড়ছে আমাদের এখানে। আকাশে রোদের রং যেন পাকা কমলালেবুর মতো। গাছে গাছে ফুটে থাকা বাগোনিয়া, ওয়েডেলিয়া, ম্যাডেভিলা নড়ছে হাওয়ায়। গাড়িবারান্দার পাশের ভেলভেট ফুলগুলোও যেন নিঃশব্দ গানের তালে দুলছে।

হঠাৎ মনে পড়ল এই ভেলভেট ফুলগুলোর কী একটা ইংরেজি নাম আছে না? মনে পড়েছে, লাভ-লাইজ-ব্লিডিং।

আমার মনে হল আমাদের সবার মনের মধ্যে এই ফুলটাই যেন নড়ছে। যেন ঝরে পড়ছে লাভ-লাইজ-ব্লিডিং।

আমি কথা ঘোরাতে বললাম, “তুমি কোথায় যাচ্ছে?”

পিসি আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, “হ্যাঁ, বাবি এসেছে এক

মাস আগে। কেরল থেকে ফিরে এসেছে এখানে। তাতে দাদার অসুবিধে কী?”

আমি আবার বললাম, “কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ?”

পিসি অনেক কষ্টে যেন নিজেকে আটকাল। তার পর বলল, “মিস্টার রাও বিপদে পড়েছেন। তাই যাচ্ছি। ফিরে এসে আমি বলছি তোকে সবটা। দাদা নিজে যা খুশি করবে আর অন্যকে কালিমালিগু করবে, সেটা আমি মানব না।”

কালিমালিগু পিসির অভিমান হলেই কঠিন কঠিন বাংলা বলতে শুরু করে। বুঝলাম অবস্থা গুরুতর।

পিসি চোয়াল শক্ত করে বলল, “আগে মিস্টার রাও-এর ব্যাপারটা দেখি, তার পর দাদাকে দেখছি। ডাবল স্ট্যান্ডার্ডস বের করছি, দাঁড়াও।”

পিসি গাড়িতে উঠে দুম করে দরজা বন্ধ করল। সেই শব্দে দূর থেকে মালিন্দা আর লালু ফিরে তাকাল। চারটে প্রজাপতি উড়ে গেল কাছের করবী গাছ থেকে। আমি বুঝলাম, ভাই-বোনের মাঝে পড়ে এই উলুখাগড়ার প্রাণটা এবার নিশ্চিত ভাবে যাবে।

আরও বুঝলাম, বাড়ির মধ্যবয়স্ক অবিবাহিত পুরুষরা হল ঢোলের মতো। যার যেমন হচ্ছে বাজিয়ে যায়।

তিন

‘Do you think this is extraordinary...?’

আজ সকাল সকাল অমিতদার ফোন এল। আমি এমনিতেই আটটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠি, কিন্তু ফোন আসার ফলে সাতটাত্তেই ঘুমটা ভেঙে গেল। ব্যাপারটা হল, রাতে মোবাইল সাইলেন্ট করে ঘুমোই আমি। কিন্তু কাল ফুটবল খেলা দেখার পর অ্যাসসা ঘুম পেয়েছিল যে, ফোনটা সাইলেন্ট করতে ভুলে গিয়েছিল। ব্যাস, সাতসকালে সে চিল্লামিল্লি শুরু করেছে।

অমিতদা লোকটাকে মনে আছে তো? আরে, আমার সেই এক সময়ের প্রেমিকা পৌষালি, ওর হাজ্জবান্দা। সে-ই ফোন করেছিল আজ সকালে।

কী? না পৌষালি আর তামির মধ্যে নাকি সকাল সকাল প্রচণ্ড রাগারাগি হয়েছে। আর তামি তাই আমাদের বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে।

তামি হল পৌষালি আর অমিতদার মেয়ে। ইংলিশ নিয়ে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে মেয়েটা। সরি, এখন তো মনে হয় সেমিস্টার দিয়ে সব বলা হয়। সেই ভাবে বোধহয় থার্ড সেম চলছে ওর।

পৌষালি যেমন জেদি তামিও তেমন-ই জেদি। ফল কি গাছ থেকে খুব দূরে পড়ে বলুন? যাই হোক, মাঝেমাঝেই মায়েতে-মেয়েতে এমন ফটাফটি লাগে। আর সেটা মাত্রাছাড়া হলে তামি ওর স্কুটি নিয়ে সোজা চলে আসে আমার কাছে। বেলেঘাটা টু সল্টলেক এমন কিছু দূরত্ব নয়। তাই সেটা টপকাতে তামির কোনও অসুবিধে হয় না।

কিন্তু সত্যি বলছি এ সব ঝামেলা আমার আর ভাল লাগে না। পৌষালির সঙ্গে এক সময় আমার প্রেম হয়েছিল— সাত মাসের। তার পর পৌষালিই আমায় ঘাড় ধরে ওর জীবন থেকে বের করে দেয়। তখন এই অমিতদার সঙ্গে নাকি ওর বিয়ের কথা চলছিল।

অমিত বসু চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। পৌষালির চেয়ে অনেকটাই বড়। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সিকিওরিটি আর নিজের পায়ে দাঁড়ানো পাত্র হিসেবে খুবই যোগ্য। পৌষালির বাবা-মা তাই যোগ্য ব্যক্তিকে খালি হাতে ফেরাননি। আসলে বাইশ বছর বয়সের ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রপ-আউট, তার পরে ইংরেজি অনার্সের ফাইনাল দেওয়া একটা ছেলেকে ‘কাটো তো বাবা’ বলা অনেক সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। পৌষালিও বুদ্ধিমতী মেয়ে। বেকার বেকার প্রেমের সেন্টু ধরে দোল খায়নি।

কিন্তু আমি হেভি চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। লাইফে পুরো কারেন্ট অফ। সারা পৃথিবী আমার শত্রু। আমার প্রেমিকা অন্যের সঙ্গে সেক্স

করছে। মনে হত বৃকের মধ্যে যেন আরডিএক্স ফাটছে। পাঁজরে বিস্ফোরণের শব্দ। কিন্তু পরে বুঝেছি প্রেমের কষ্টের অধিকাংশটাই জুড়ে আছে যৌন ঈর্ষা। বুঝেছি, আমার মেয়ে হলে আমিও ওরকমটাই করতাম।

আমার বাপের টাকা আছে, কিন্তু সেটা তো আমার যোগ্যতা হওয়ার কথা নয়। আমি বড়জোর চাঁদের মতো ছেলে। মানে বাপ সূর্য, তার আলোয় আলোকিত আমি। তখন আমি ওরকম চাঁদের মতোই ছিলাম।

সেখানে অমিতদা নিজেই সূর্য। ওই বয়সেই বেলেঘাটায় বড় ফ্ল্যাট, দামি সেডান সব করে ফেলেছিল। তাই এই জাগতিক স্বয়ম্বরে সে জিতবে নাকি সেন্টিমেন্টের বড়ি খাওয়া, বোকার হৃদ একটা ছেলে জিতবে?

নিজেকে বোকা বললাম সেলফ পিটি থেকে বা ভিকটিম কার্ড খেলার জন্য নয়। আমিই সত্যি তখন চূড়ান্ত বোকামো করেছিলাম। অনার্সে ভাল নাশ্বার পেয়েও ওই প্রেমিকা ছেড়ে যাওয়ার দুঃখে আমি আর মাস্টার্স করিনি। বরং পড়াশোনা বিসর্জন দিয়ে ভেবেছিলাম আমিও প্রেমের জন্য মহান স্যাক্রিফাইস করলাম। আমি যে কী ভুল করেছি সেটা এখন এই চুয়াল্লিশে এসে বুঝতে পারি।

যাই হোক, আপনাদের সঙ্গে যখন একটু জানাশোনা হয়েছে, তখন আর-একটু খুলে একটা কথা বলতেই পারি।

আজ থেকে বারো বছর আগে এক বিকেলে আচমকা পৌষালি আমায় ফোন করেছিল। তাও বাড়ির ল্যান্ড-লাইনে। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না। অফিসের কাজে গিয়েছিলাম দিল্লিতে। বাবা ধরেছিল বাড়ির ফোনটা। আর বাবা-ই আমার মোবাইল নাশ্বার দিয়েছিল পৌষালিকে।

আসলে আমাদের যখন ব্রেক-আপ হয়, সেটা ছিল ল্যান্ড-লাইনের যুগ। মোবাইল কী বস্তু আমরা জানতাম না। ফলে দশ বছর আগে চলে যাওয়া একটা মেয়ে আমার মোবাইল নাশ্বার জানবে কী করে!

মোবাইল নাশ্বার পেয়ে পৌষালি আমায় ফোন করেছিল। আর সত্যি বলতে কী ভাল লাগা, খারাপ লাগার উর্ধ্ব আমি খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম।

মানে যে-মেয়েটা আমায় বলেছিল, “তুই চলে যা। কোনও দিন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবি না,” সে হঠাৎ আমার নাশ্বার খুঁজে ফোন করল! কেন?

পৌষালি বলেছিল, ও নাকি আমায় ভুলতে পারেনি। অনেক চেষ্টা করেও নাকি মনে মনে সরতে পারেনি আমার থেকে। তাই স্বামী সন্তান সব থাকলেও ও চায়, আমার সঙ্গেও যেন ওর যোগাযোগ থাকে।

এখন এ সব প্রস্তাব হল চোরাবালি। এখানে আপনি পা দিয়েছেন কী ভুবেছেন। আমি একটা তীর কষ্ট নিয়ে বছর পাঁচেক ঘুরলেও, তার পরে কিন্তু আমার সেই ঘোরাটা কেটে গিয়েছিল। ফলে ফোনটা পাওয়ার পর, দুঃখ, আনন্দ, শ্লাঘা বা জিঘাংসা ধরনের কিছু আমার মনে জাগেনি। বরং মনে হয়েছিল, আবার কেন ঝামেলা ভাই।

আসলে আমি সবার থেকে দূরে, আড়ালে নিজের মতো একা-একাই থাকতে চাই। এই পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যাকে দেখলে আমার মনে এখনও উচাটন হবে। মনে হবে আমি এর সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটাতে চাই।

ফলে, মুখে না বললেও পৌষালির সঙ্গে আমি একটা হালকা দূরত্ব রেখে ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে, সেই ‘পুরনো প্রেমিকটি মরিয়াছে’। এই ‘নিউ’ ও ‘অল্টার্ড’ রণন মুখার্জি পৌষালি সেনের জন্য আর হেদিয়ে মরে না।

পরে পৌষালির সূত্রেই আমার আলাপ ও বন্ধুত্ব ধরনের হয়েছে অমিতদার সঙ্গে। আলাপ হয়েছে তামির সঙ্গেও।

অমিতদা খুবই ভাল আর ঝঞ্ঝটমুক্ত মানুষ। নিজের কাজ নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত। তার বাইরে স্কচ, কিশোরকুমার আর মোহনবাগান ছাড়া কিছু বোঝে না। কিন্তু তাই বলে আদ্যন্ত বাঙাল আর ইস্টবেঙ্গল এই আমাকে সেই নিয়ে কিছু বলে না বা দুয়ো দেয় না।

তামি কিন্তু অন্যরকম মেয়ে। খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। কিছুটা ঠোঁট

কাটাও। দারুণ গান করে। সঙ্গে পড়াশোনাতেও খুব ভাল। তবে একটাই সমস্যা— মাথাগরম খুব। তাই মাঝেমাঝেই মায়ের সঙ্গে গোল বাঁধে। আর সেটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেলে আমার কাছে চলে আসে।

আসলে বারো বছর আগের সেই ছোট তামিটা তো আর নেই। তাই কারও ওপর নির্ভর করতে হয় না ওকে।

ঘুম ভাঙার পরে ফ্রেশ হয়ে, দাড়ি কামিয়ে নীচে নামতে নামতে দেখলাম, বাড়ির বাইরে তামি ওর গোলাপি স্কুটিটা স্ট্যান্ড করছে। একটা হাফ প্যান্ট আর টি-শার্ট পরে আছে। চোঁটে বুলছে সিগারেট। মাথার কোঁকড়া চুলগুলো কোনও মতে একটা গাটার দিয়ে বাঁধা।

আমাদের কিং আর্থারের গোল টেবিলে আমি এসে বসতে বসতে তামি ঘরে ঢুকল। দেখলাম, হাতে সিগারেট নেই। মানে বাইরে ফেলে এসেছে।

এই সময়টায় টুপন স্কুলে যায়। ইউনিফর্ম পরে খাওয়ার জায়গায় একটু ঘোরাঘুরি করে। তামি এসেই ওকে কোলে তুলে একটু চটকে দিল। তার পর চেয়ার টেনে বসে পড়ল আমার সামনে।

পিসি সব পূজো সেরে নীচে এসেছে। অফিসে বেরোনোর আগে রান্নাবান্নার ইন্সট্রাকশন দিয়ে যাবে আর কী।

লালুকে কী সব বলতে বলতে আড়চোখে তামিকে দেখল। তার পর কাছে এসে বলল, “এত সকালে! আবার মায়ের সঙ্গে ঝামেলা করেছিস?”

তামি সামনে রাখা ডিম সেদ্ধর বাটি থেকে দুটো ডিম তুলে খোসা ছাড়তে ছাড়তে বলল, “আর বোলো না। বেকার মহিলা। সাতসকালে শুরু করেছে, আমায় নাকি তার সঙ্গে কোন এক রিলেটিভের বিয়েতে যেতে হবে। যত বলছি যাব না, তত জোর করছে। ব্যস, আমিও দিয়েছি ভাল করে। তখন বলে কি না খাওয়াচ্ছে পড়াচ্ছে, তাই ওর কথা শুনতে হবে। মামার বাড়ি। ব্যস, গৃহতাগী।”

আমি হাসলাম। পৌষালি সব সময় নিজের জেদ দেখানোর জন্য সবার ওপর জোর করে। আমি ভাল করে জানি এ সব।

“লালুদা, আমায় একটা কড়া কফি দেবে?” তামি ডিম খেতে খেতে বলল।

পিসি এবার এসে বসল টেবিলে। বলল, “তুই সিগারেটটা ছাড়লি না?”

“কী হবে ছেড়ে?” তামি মাথা ঝাঁকাল। তার পর আমাকে দেখিয়ে বলল, “সব বাদ দিয়ে এই তোমার ভাইপো হয়ে বসে থাকব নাকি?”

আমি হেসে বললাম, “আমায় আবার এর মধ্যে টানছিস কেন? আমি চিরকালই চা সিগারেট কফি মদ, এ সবের থেকে দূরে।”

“এমন করে বলছ যেন এটা খুব গুণের কথা,” তামি বিরক্ত হল, “এই সব নিয়ে কত টাকার ইন্ডাস্ট্রি চলে জানো পৃথিবীতে? কত লোকের রুজি-রোজগার এর ওপর নির্ভর করে জানো? অ্যান্ড রনো, ইউ আর নট কন্ট্রিবিউটিং আ বিট। ইউ আর সো লেম।”

মেয়েটা ফুল ঝগড়ার মোড়ে আছে। আমি হাসলাম।

তামি আবার বলল, “বাই দ্য ওয়ে, এই পৌষালি মহিলাটির প্রেমে তুমি পড়লে কী করে বলো তো! আর তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার দুঃখেই কি তুমি এমন ব্যাচেলর থেকে প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করছ?”

আমি বুঝলাম মেয়েটার একটা কষে ঝগড়া দরকার। না হলে মনের এই অস্থিরতা কাটবে না।

এ সব থেকে কথা ঘোরাতে পিসিকে বললাম, “আমি ক’দিন অফিসে যাব না। জেটল্যাগ ভোগাচ্ছে। তুমি ক’টায় বেরোবে আজ?”

“তুই রেস্ট নো। আর আমি ওয়েট করছি এক জনের জন্য। ও এলে ওকে সেটল করে দিয়ে তবে বেরোব,” বলেই পিসি লালুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী রে, দোতলার গেস্ট রুমটা ঠিক করেছিস তো?”

গেস্ট রুম! কাকে সেটল করাবে পিসি? আমি অবাক হলাম। বাড়িতে কী যে হয়ে চলে, আমি কিছুই জানতে পারি না।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “কে আসবে পিসি?”

পিসি বলল, “মিস্টার রাওয়ের মেয়ে। সে পরে বলব। আগে শোন।

বাড়িতে একটা মেয়ে থাকবে, তুই কিন্তু হাফপ্যান্ট পরে ঘুরবি না।”

“মিস্টার রাও? সে কে?” আমি অবাক হলাম।

পিসি বলল, “আরে, আর সি রাও। আমাদের যে বড় প্রোজেক্টটা চলছে কল্যাণীতে, তার জেনারেল ম্যানেজার। খুব বিপদে পড়েছেন। আমাদের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক। ওর জন্যই আমরা চারটে কাজ পেয়েছি। পর্যটনশি কোটি টাকা মোট। ওঁকে বিপদে হেল্প না করলে হয়?”

মিস্টার রাও। না, আমার সঙ্গে সম্যক আলাপ নেই। কিন্তু কী এমন বিপদ যে, তার মেয়েকে একদম বাড়িতে এনে তুলতে হবে? কিন্তু পিসিকে আমি এ সব জিজ্ঞেস করে আর জটিলতা বাড়ালাম না। সময় মতো নিশ্চয়ই সব জানতে পারব। তবে এই হাফপ্যান্ট পরা যাবে না মানে? নিজের বাড়িতে নিজের মতো থাকতে পারব না? আর হাফপ্যান্ট কী প্রবলেম করল? পিসির মতো কেউ ক্ষমতায় থাকলে তো হাফপ্যান্ট পরে খেলতে হয় এমন সব খেলাই সে ব্যান করে দিত।

“রনো, আমি আসছি,” টুপন ঝাঁপিয়ে এসে আমায় চুমু খেল গালে। তার পর রিতুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

ছোট্ট মেয়ে, এই বয়সে সাতসকালে স্কুলে যেতে হয় এদের। দেখলেই কষ্ট লাগে আমার। জীবনযুদ্ধের জন্য নাকি ছোট থেকেই প্রস্তুত হতে হয় সবাইকে।

আমার এটা ভেবে হাসি পায় যে, এত হাজার হাজার বছর ধরে, এত দিগগজ লোকজন এত কিছু করে শেষমেশ জীবনযাপনকে একটা যুদ্ধে পরিণত করল। বুড়োদা ঠিক বলে, বঁচে থাকারাই যেন একটা স্ক্যাম।

বুড়োদার কথা মনে পড়তেই ভাল লাগল বেশ। সঙ্গে এটাও মনে হল যে, অনেক দিন যাই না লোকটার কাছে।

কলকাতা থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে অশোকনগর নামে একটা ছোট্ট মফসসল শহরে একা থাকে বুড়োদা।

বুড়োদা আগে খুব বড় একটা বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি করত। সারা বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াত। কোম্পানি কেনাবেচা, মার্জার ইত্যাদি কঠিন কঠিন সব কাজ। আমি অত বুঝিও না। তার পর বছর পাঁচেক আগে আচমকা সব ছেড়ে কলকাতার বিশাল চারটে ফ্ল্যাট বেচে দিয়ে মফসসল শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করল।

বেশ অনেকটা জায়গা কিনে একটা ফার্ম হাউস মতো বানিয়েছে বুড়োদা। স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে দুধ, মধু, আচার আর ভুট্টার নানা প্রোডাক্টের কাজ করছে। আশপাশের অনেক গ্রামের মানুষ আসে। তাদের প্রোডাক্ট সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দেয় বুড়োদা। অনেক সাহেব-মেমও আসে বুড়োদার ফার্মে। বুড়োদা ফার্মটার নাম দিয়েছে ‘সিয়েস্তা’।

সত্যি, দ্বিপ্রাহরিক ঘুমের মতো আনন্দ আর কী আছে!

ওখানে যেতে আমার ভাল লাগে খুব। বুড়োদা একা মানুষ। নানা বিষয়ে পড়াশোনা করে। সেই সঙ্গে ইদানীং রান্না করার ভূত চেপেছে মাথায়। কত কী যে রান্না করে। ফলে সব মিলিয়ে খুব মজা হয় ওখানে গেলে।

এরকম মধ্য বয়সে রোরিং প্রফেশন ছেড়ে কেউ যে গ্রামে চলে যেতে পারে, সেটা ভাবলেই অবাক লাগে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, “তুমি হঠাৎ সব ছেড়ে এমন গ্রামে গেলে কেন বুড়োদা?”

বুড়োদা হেসে বলেছিল, “আমি বেশি সেয়ানা তাই। দেখ রনো, আমার অনেক টাকা আছে। কিন্তু শান্তি নেই। সেই শান্তিটা দরকার। ওটাই আসল ভাই। লোকে এটা বুঝেও না বোঝার ভান করে দাসবৃত্তি করে। আমি সেয়ানা তাই বুঝে কেটে পড়েছি। আমাদের সো-কন্ড সিভিলাইজেশন হল একটা বিশাল যন্ত্র। আর তার জ্বালানি হল মানুষ। ফুয়েল অ্যান্ড ফডার। আই রিফিউজ টু বি দ্যাট এনি মোর। তাই হাল্লা রাজার মতো ‘ছুটি, ছুটি’ বলে কেটে পড়েছি।”

আজ টুপনকে দেখে বুঝলাম, আমরা সত্যি সবাই ফুয়েল অ্যান্ড ফডার। টুপনকেও সেটা হওয়ার জন্য ট্রেনিং দেওয়া চলছে।

“তুমি মাঝেমাঝেই এমন হারিয়ে যাও কোথায় বলো তো?” ছোট্ট

একটা কিশমিশের টুকরো আমার দিকে ছুড়ে মারল আমি, “লেখক হয়ে খুব ঘাম না তোমার? ভাসা ভাসা চোখ নিয়ে মাঝেমাঝে এমন আনমনা হয়ে যাওয়াটা একটা কায়দা, না?”

আমি কিশমিশটা টেবিল থেকে তুলে মুখে দিলাম। বললাম, “তামি, তোর একটা হেবি বগড়া দরকার। না হলে তুই শান্ত হবি না। কিন্তু ভাই, আমি পারব না সেটা করতে।”

তামি ভুরু কুঁচকে আমার দিক থেকে এবার ঘুরল পিসির দিকে। বলল, “সে দিন তোমায় দেখলাম রাজারহাটের ওই বড় কফি হাউসটায় একজনের সঙ্গে বসেছিলে। ফর্সা। মাথায় টাক। মোটা গোঁফ। বেশ শার্প দেখতে। কে গো লোকটা?”

আমি দেখলাম এরকম সম্পূর্ণ অন্যদিকের একটা প্রশ্নে পিসি কেমন যেন গোলাপি হয়ে গেল। কেসটা কী? পিসি লাল, মানে রেগে গিয়েছে। নীল, মানে কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু এরকম গোলাপি মানে কী? লজ্জা! পিসি কি লজ্জা পেল?

পিসি হাসল সামান্য। তার পর নিজেকে আশ্রয় ঠিক করতে করতে বলল, “ও এক বন্ধু। কেউ না।”

“কে কেউ না রে?”

কাকু আর কাকিমা দেখলাম একসঙ্গে এসে বসল টেবিলে। এই দু’জনে সারাক্ষণ এক সঙ্গে ঘোরো। এই বয়সেও এমন প্রেম ভাবা যায় না। এমন যমজ স্বামী-স্ত্রী আমি কোথাও দেখিনি।

পিসির উত্তর দেওয়ার ধরন দেখেই তামি বুঝেছে যে, এখানে কোনও গল্প আছে। তাই পিসি এমন দায়সারা উত্তর দিয়ে পাশ কাটাতে চাইছে। তামি কাকু-কাকিমাকে আবার সেই টাকমাথা মোটা গোঁফের লোকটার বর্ণনা দিয়ে বলল, “এই লোকটা কে পিসিদিদা বলছে না।”

কাকু হো হো করে হাসল। তার পর বলল, “আরে, এ তো বাবি। ও তুলি, তুই বাবির সঙ্গে বাইরেও মিট করা শুরু করেছিস?”

“মিট করা মানে?” গোলাপি আবার লাল হতে শুরু করেছে।

“মানে ডেটিং। টাইম স্পেন্ডিং। ওয়া-ইং,” খুব ক্যাঙ্কুয়ালি বলল তামি।

কাম সারছে। ওয়া-ইং। পিসি কি জানে এটার মানে কী? তামি একটা কেলেকারি না বাঁধিয়ে ছাড়বে না।

কিন্তু কথাটা এগোনোর আগেই বাইরে একটা গাড়ির শব্দ পেলাম আমরা। অচেনা শব্দ। মানে পিসি যার কথা বলছিল, সে-ই কি এল?

পিসি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তাড়াতাড়ি টেবিল ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেল মূল দরজার দিকে।

আমাদের এখান থেকে মূল দরজাটা দেখা যায় না। কিন্তু শব্দ তো আর দৃশ্যের মুখাপেক্ষী নয়। তাই গলা শুনেতে পেলাম। এক জন ভদ্রলোক। বাংলাই বলছেন। কিন্তু কথার টান, আ-কারের ব্যবহার আর যুক্তাক্ষরের ব্যবহারে বুঝতে পারলাম, লোকটি দক্ষিণ ভারতীয়। তা হলে কি মিস্টার রাও এলেন?

“আসুন আসুন,” পিসি অতিথিদের এই দিকে টেনে আনল।

আমি দেখলাম এক জন লম্বা ভদ্রলোক। ফর্সা। মাথায় বড় টাক। কাঁচা-পাকা গোঁফ। আর তার পাশে একটি মেয়ে। মানে, ঠিক মেয়ে নয়, ভদ্রমহিলা। চেনা চেনা লাগছে। আরে, এ কে! বিদ্যুৎ চমকে উঠল স্মৃতিতে। আমার বড় চোখ আরও বড় হয়ে উঠল।

আমি চেয়ার থেকে আপনা-আপনি ছিটকে উঠলাম। আমার মনের ভেতরের জেটল্যাগের সাদা-কালো টিভির বিরবিরানি কেমন যেন আরও বেড়ে গেল হঠাৎ। আর আমি নিজের অজান্তেই বলে উঠলাম, “সানিলা, ইউ!”

চার

‘Captain Haddock, did you know this place ever before?’

ছাব্বিশ বছর আগের সেই ঘটনা।

সানিলা আমার চেয়ে দু’বছরের ছোট, তাও আমার ক্লাসেই পড়ত। বেতের বুড়ি লাগানো একটা গোলাপি সাইকেল নিয়ে নির্জন পাহাড়ি রাস্তার চড়াই-উতরাই ভেঙে আসত আমাদের কলেজে।

ওই কলেজটা তখন নতুন তৈরি হয়েছে। আমি যে-সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিলাম, তখনও কলেজ ক্যাম্পাসের কিছু কিছু জায়গায় কাজ চলছে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আমরা ছিলাম এই কলেজের ফোর্থ ব্যাচ। কলকাতা থেকে আমি ওখানে গিয়েছিলাম ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন নিয়ে পড়ার জন্য।

রিপ্লুর, কর্নটকের একটি নির্জন শহরতলি। তিন দিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। তার মধ্য দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে বয়ে গিয়েছে গোয়া থেকে বন্দ্র পর্যন্ত। আশপাশে প্রচুর কলা বাগান, নারকেল বাগান আর আখের বাগান। দেখতাম, হাইওয়ে দিয়ে ট্রাক্টর-কার্ট টেনে নিয়ে যাচ্ছে কলার কাঁদি, নারকেলের ছোবড়া আর আখ।

কলেজ থেকে কাছের শহরটা ছিল হুঁকিলোমিটার দূরে। সেখানে যেতে হলে আমরা ওই ট্রাক্টর-কার্টে উঠেই যেতাম। ছাত্র প্রতি দুটাকা করে নিত।

মনে আছে, ওই কার্টে করে হুঁকিলোমিটার যাওয়ার পথে কত যে কলা, আখ খেতাম তা গুনে শেষ করা যাবে না।

আমাদের কলেজের পাশেই ছিল খাবারের মেন্স আর সিনিয়র বয়েজ হস্টেল। এর সামনে বিশাল বড় এক মাঠ। যেন তেপান্তর। আর সেই তেপান্তরের অন্য দিকে হলদে রঙের আর-এক হস্টেল বাড়ি। এটা আমাদের মানে ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টদের জন্য। নাম জুনিয়র বয়েজ হস্টেল।

কলকাতার তুলোয় মোড়া জীবন ছেড়ে ওখানে পড়তে যাওয়া মানে ছিল যেন বক্সিং রিং-এ ঢুকে পড়া। সকাল আটটা থেকে ক্লাস। লাঞ্চ ব্রেক সাড়ে বারোটায়। তার পর দেড়টা থেকে চারটে অবধি প্র্যাকটিকাল, ড্রয়িং, ওয়ার্কশপ। সব মিলিয়ে দম ফেলার সময় নেই। আর তার মধ্যে ছিল যাচ্ছেতাই রকমের র‍্যাগিং।

একটা কথা আছে না, পেটে খেলে পিঠে সয়। কিন্তু এখানে পিঠে সহিত না। কারণ, পেটে সে ভাবে কিছু জুটছে না তো।

সারা জীবন খাওয়া নিয়ে মাকে জ্বালিয়ে এসেছি আমি। এক-একদিন মা তাই রাগ করে বলত, “এমন নাক করছিস তো। যে দিন খাবার নিয়ে বিপদে পড়বি, সে দিন বুঝবি কত ধানে কত চাল।”

তখন সত্যি বুঝতে পেরেছিলাম, প্রতি একশোটা চালে আসলে চল্লিশটা কাঁকর। বুঝতে পেরেছিলাম জীবন আসলে এমনই।

মেসে দু’বেলাই দিত পোড়া দুটো রুটির সঙ্গে চিচিঙ্গে ভাজা। তার পর রসম, ভাত আর টক দই। রসমের মধ্যে শতায়ু পার করা বৃদ্ধ কিছু ডাঁটা, কুমড়া আর পটল ফেলে দেওয়া হত। খেতে পারলে খাও, না হলে পেটে কিল মেরে পড়ে থাকো। সত্যি বলছি, এই সব রান্না যে কতটা খারাপ, তা যে খায়নি তাকে বোঝানো যাবে না।

এর মধ্যে আমার লাইফলাইন ছিল হাইওয়ের অন্য দিকে আন্টিজ শপ। সেখানে সন্দেশ-বিস্কিট আর মশলা বাদাম দিয়েই সারতাম অধিকাংশ দিনের লাঞ্চ। মাঝেমাঝে আন্টি বানিয়ে দিতেন নুন, হলুদ আর কারিপাতা সহযোগে এক আশ্চর্য চাওমনি।

কিন্তু ওই-বা কত দিন খাওয়া যায়। ফলে খাবারদাবার নিয়ে বিশাল এক সমস্যায় পড়েছিলাম। আর তখনই আমার এই খাদ্য বিভ্রাটের মধ্যে সেভিয়ার হয়ে নেমে এসেছিল সানিলা রাও।

রোগা, ধবধবে ফর্সা একটা মেয়ে। বিশাল বড় বড় চোখ। পাতলা ঠোঁট আর কোঁকড়া চুল। গালে বাদামি তিল। ক্লাসের নব্বই জন স্টুডেন্টের মধ্যে সবার আগে ওর দিকেই চোখ পড়বে।

সিনিয়র দাদারা একরকম আদেশ জারি করে রেখেছিল যে, জুনিয়র বয়েজরা যেন মেয়েদের সঙ্গে কথা না বলে।

বুঝুন, এটা কোনও কথা হল? কিন্তু সেই সময়, সেই কলেজ আর তার সিনিয়ররা ছিল লজিকের বাইরের এক পৃথিবীর ব্যাপার। তারাই ঠিক করে দিয়েছিল আমাদের ড্রেস কোড। তাই আমাদের, মানে জুনিয়র

বয়েজদের পরতে হত টেরিকটের প্যাণ্টের সঙ্গে গলার বোতাম লাগানো ফুলহাতা জামা। পায়ে দিতে হত হাওয়াই চটি। সিনিয়রদের সঙ্গে দেখা হলে জামার তৃতীয় বোতামে হাত দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে জনাতে হত গুড মর্নিং বা ইভিনিং বা নাইট। পুরুষ সিনিয়রদের বলতে হত ‘স্যার’ আর মহিলাদের ‘ম্যাম’। সেখানে যে-কোনও সিনিয়র এসে মূলে দিতে পারত কান। মারতে পারত থাঙ্গড়। লাল মাটিতে চার হাত-পায়ে দেওয়াতে পারত হামাগুড়ি।

কলেজে সিনিয়ররা আমার নাম দিয়েছিল ম্যাঁওম্যাঁও। সিনিয়রদের সঙ্গে দেখা হলে ভ্যান ড্যাম স্টাইলে হাত জড়ো করে আমায়, “ম্যাঁও ম্যাঁও” শব্দ করতে হত মুখ দিয়ে।

এই সব কিছু পার করে সন্ধেবেলা পড়তে বসলে ঘুম পেত খুব। সঙ্গে খিদেও পেত সাংঘাতিক। কিন্তু সেই সময় ক্যাম্পাসের আশপাশে যে দু’-একটা খাবারের দোকান ছিল, সব বন্ধ হয়ে যেত।

তার পর একদিন মনে হয়েছিল, এ ভাবে হস্টেল রুমে বসে মুরগির মতো ঝিমোনের কোনও মানে হয় না। বরং এই সন্ধেবেলাগুলোয় লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করলে সুবিধে হবে।

লাইব্রেরি ঘরটা ছিল বিশাল বড়। এক পাশে সার সার নিস্তন্ধ বেঞ্চ। আর অন্য দিকে লোহার বইয়ের তাক। আর, এই লাইব্রেরিতেই আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সানিলা।

পড়াশোনার চাপ আর র্যাগিং-এর ভয় আমায় এমন অবশ করে রাখত যে, আমি কিছুতেই অন্য কোনও দিকে তাকাতে বা মন দিতে পারতাম না।

প্রথম দিন লাইব্রেরির একদম শেষ বেঞ্চে বসে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের বইতে টু স্ট্রোক আর ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন পড়ছি, এমন সময় আমার সামনে থেকে মৃদু নরম গলায় কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, “ইউ ওয়ান্ট সাম?”

আমি মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেছিলাম, সানিলা।

আমাদের ক্লাসের মেয়ে। এই দিন দশেকের অনেকবারই দেখেছি। কিন্তু কথা হয়নি। তবে কানামুসোয় শুনেছি, এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন সিনিয়র দাদা নাকি এর পেছনে ইট পেতে রেখেছে।

তা রাখুক। আমার কী! আমি এ সব করতে বাড়ি ছেড়ে এত দূরে আসিনি।

আমি দেখেছিলাম সানিলা আমার দিকে একটা স্টিলের টিফিন বক্স এগিয়ে দিয়েছে। তার ঢাকনা খোলা। আর সেখানে অদ্ভুত দেখতে একটা খাবার।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, “এটা কী?” মানে এমন শব্দ কচুরির মতো দেখতে জিনিস আমি আগে দেখিনি।

সানিলা হেসেছিল। ওরে বাবা, এ মেয়ের গালে যে সাংঘাতিক ঘূর্ণি ও বলেছিল, “কমড ট্র্যাডিশনাল সুইট। সাজ্জাপ্লা।”

আমি দ্বিধা আর ভয় নিয়ে তুলেছিলাম একটা। তার পর খেয়েছিলাম। আরে বাঃ। দারুণ তো। গুড়, নারকেল, সুজি, আটা সব আছে। বেশ ভাল খেতে। একটা খেয়ে আমার ঘুমন্ত খিদে জেগে উঠেছিল বেশ।

খাবারের ব্যাপারে আমি চিরকাল নির্লজ্জ। ফলে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, “ক্যান আই হ্যাভ এনাদার ওয়ান?”

আবার ঘূর্ণি। সানিলা বলেছিল, “অ্যাঞ্জ মেনি অ্যাঞ্জ ইউ লাইক।”

শিয়ালকে ভাঙা বেড়া আর আমাকে খোলা টিফিন বক্স দেখালে মুশকিল। ব্যস, পরের দিনও গুটিগুটি পায়ে গিয়ে আবার হাজির হয়েছিলাম লাইব্রেরিতে। দরজায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখেছিলাম, সানিলা হাত তুলে ইঙ্গিত করেছে, চলে এসো।

সে দিন ছিল আর-এক রকম মিষ্টি। মাইসোর পাক। সে পাক না ঘূর্ণিপাক আমি জানি না। কিন্তু তাতেই একদম তলিয়ে গিয়েছিলাম আমি।

রোজ সন্ধে হলেই আমার পেট আর পা আমায় টেনে নিয়ে যেত লাইব্রেরিতে। আর রোজই সানিলা কিছু না কিছু মিষ্টি নিয়ে আসত।

আমিও জানতে শুরু করেছিলাম বাদাম পেঁড়া, বেলাগাভি কুন্ডা, গুলবাড়গা মালপুরি, চিরোটি ইত্যাদি কী জিনিস। প্রায় কোথাও ছানার ব্যবহার নেই। নারকেল, ময়দা, গুড়, আটা, সুজি, তেল এ সবেরই রাজত্ব। কিন্তু খেতে অসাধারণ।

ক্লাসে আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করতে শুরু করেছিল, রোজ লাইব্রেরিতে কী পড়তে যাই? কারণ, জুনিয়াররা একদম যেতই না সেখানে।

আমি হেসে পাশ কাটিয়ে যেতাম কথার। কারণ, সবার কাছে ওটা লাইব্রেরি হলেও আমার কাছে ওটা যে ক্যান্টিন।

তবে এটা ভাববেন না যে, আমি কেবল অন্যের ঘাড় ভেঙে খেতাম। আমিও ওর জন্য সাধ্য মতো নিয়ে যেতাম মশলা বাদাম, হানি কেক, আন্টিজ শপের সেই বিখ্যাত চাওমিন, সুরির দোকানের অনবদ্য ভেজ মাঞ্চুরিয়ান।

সানিলা খুব যে খেত তা নয়। কিন্তু মুখে দিত আমি নিয়ে যেতাম বলে।

লাইব্রেরিয়ান ম্যাডাম হলের অন্য মাথায় বসে থাকতেন। তাঁর ছিল ইয়া মোটা কাচের চশমা। এত দূরে আমরা কী করছি, সেই নিয়ে তাঁর খুব কিছু মাথাব্যথা ছিল না।

আমি একদিন বলেছিলাম, “তোমাদের কি শুধু মিষ্টি জিনিসই খাওয়া হয়? নোনতা কিছু খাও না?”

সানিলা হেসে বলেছিল, “তুমি নোনতা প্রেফার করো?”

হস্টেলের ছেলেপিলেরা লোহা শব্দ আর নোংরায় গন্ধ থাকে বলে খায় না। বাকি সব কিছু তাদের কাছে অমৃত। ফলে আমি বলেছিলাম, “নোনতাই তো আসল খাবার।”

সানিলা হেসে বলেছিল, “কাল তা হলে একটা জিনিস আনব।”

সেই সন্ধেবেলা লাইব্রেরির ওরকম বড় ঘরে বসে আমার মনে হয়েছিল ‘কাল’ বলে দিনটা কেন এরকম দু’হাজার বছর পরে আসে।

পরের দিন ক্লাসের ফাঁকে আমার পাশে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে সানিলা বলেছিল, “কাম ফিফটিন মিনিটস আর্লি।”

ক্লাসে মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের কথা বলা বারণ ছিল আগেই বলেছি। তাই আমি এমন ভান করেছিলাম যে, আমি যেন কিছু শুনতেই পাইনি।

সে দিন সন্ধেবেলা আমি কুড়ি মিনিট আগেই চলে গিয়েছিলাম লাইব্রেরিতে। আর দেখেছিলাম সানিলা লাইব্রেরির বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমি যেতেই বলেছিল, “লোটস গো সামহোয়ার এলস।”

সন্ধের অন্ধকারে সব কিছুই বেশ আবছা। দূরে দূরে একটু একটু আলো জ্বলে আছে ক্যাম্পাসে। তার মধ্যেই সানিলা আমায় নিয়ে গিয়েছিল মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের পিছনের দিকে লম্বা জলট্যাক্সির গোড়ায়।

ওখানে একটা হলদে আলো জ্বলত। তার চারপাশে উড়ত জোয়ান মৌরির মতো সব পোকা। আর সেই আলোটা থেকে অদ্ভুত এক শব্দ বেরোত। কেমন একটা হামিং সাউন্ড যেন।

আমরা বসেছিলাম সেই জলট্যাক্সির নীচের বাঁধানো জায়গায়। ওই আলোর ভাপ এসে লাগছিল আমাদের গায়ে।

সানিলা টিফিন বক্স বের করে খুলে ধরেছিল আমার সামনে। আর খাবারের গন্ধে মাথা ঘুরে গিয়েছিল আমার। আরে, এ যে চিকেন!

সানিলা বলেছিল, “একে বলে কর্ভার গাসসি। মানে চিকেন কারি। আমাদের এখানকার পপুলার খাবার। অন্য দিন সব কিছু কাজের দিদি বানায়। কিন্তু এটা ননভেজ তো। কাজের দিদি বানাবে না। তাই, আই মেড ইউ ফর ইউ।”

“ত-তুমি? কাজের দিদি মানে? তুমি হস্টেলে থাকো না?” এত দিন আমি খাওয়ায় এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে, সানিলার সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞেস করিনি।

সেই সন্ধেবেলা আমার প্রশ্ন শুনে সানিলা কিন্তু রাগ করেনি। বরং

হেসেছিল সামান্য। তার পর বলেছিল, “সত্যি, সিনিয়রদের কী যে ভয় পাও না, আমি হস্টেলে থাকি না। এখানে বাবার এক বন্ধুর খালি বাড়ি আছে। আমি আর আমার কাজের দিদি সেখানেই থাকি। উইকএন্ডে বাবা-মা আসে ব্যাঙ্গালোর থেকে।”

হ্যাঁ, তখনও ব্যাঙ্গালোরের নাম বেঙ্গালুরু হয়নি।

সানিলা আরও বলেছিল, “আমরা সবাই ভেজিটেরিয়ান। যদিও আমি কয়েকবার ডিম খেয়েছি। কিন্তু চিকেন খাইনি। তাই জানি না কেমন হয়েছে। ইউ টেল মি হাউ ইট ইজ।”

আমি খেতে খেতে বলেছিলাম, “ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চিকেন আই হ্যাভ এভার টেস্টেড।”

ওই অল্প আলোতেই দেখেছিলাম সানিলা লজ্জা পেয়ে আলতো করে আমার কাঁধের কাছে মাথা ঠেকিয়ে হেসেছিল। কেমন যেন কর্পুর আর ভ্যানিলার গন্ধ। আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম সানিলার দিকে। মাথার ওপর দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে ছিল জলের ট্যাঙ্ক। দূরে গুনগুন শব্দ করে জ্বলছিল হলুদ আলো। আর আবছা ক্যাম্পাসে রাত নেমে আসছিল মৃদু পায়ে।

সেই রাতে আচমকা আমার মনে হয়েছিল, সানিলা এত সুন্দর। ওর মন, ব্যবহার এত ভাল। ও আমার এত কাছে বসে রয়েছে। আমি খাওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে।

সানিলা নিজের মনে কত কথা যে বলে যাচ্ছিল। ওরা ব্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা। বাবা কোনও এক কোম্পানিতে বড় চাকরি করেন। মা কলেজে পড়ান। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এন্ট্রান্সে ভাল রেজাল্ট হয়নি বলে ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন নিয়ে পড়ার জন্য প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে আসতে হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি কিছুটা শুনছিলাম। কিছুটা খাচ্ছিলাম। আর এ সবার মাঝে অস্বস্তিকর একটা প্রশ্ন খোঁচাচ্ছিল আমায়, যে-মেয়ের পিছনে কলেজের সিনিয়রদের এত বিশাল লাইন, সে আমার সঙ্গে সন্ধেবেলাগুলো কাটায় কেন?

আচমকা চিকেন কেমন যেন স্বাদ হারাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই বিশাল অন্ধকারের ও দিকে এমন কিছু একটা ঘটছে, যা আমি বুঝতে পারছি না। বা বুঝতে পারলেও মানতে চাইছি না। মানতে চাইছি না এমন একটা মেয়ে আমার জন্য... না, না। ধূস, হতেই পারে না।

সপ্তাহ কাটছিল। লুকিয়ে-চুরিয়ে আমাদের দেখাশোনাগুলো বাড়ছিল ক্রমশ।

তার পর রবিবারের এক নিঝুম বিকেলে একদিন আমরা সাইকেল করে গিয়েছিলাম বেশ কিছু দূরের এক জলপ্রপাতের কাছে। সানিলার তো সাইকেল ছিলই। আর আমি আন্টিজ শপের আন্টির থেকে ধার করেছিলাম তাঁর লেডিজ সাইকেল।

সেটা ছিল ডিসেম্বরের একটা নির্জন বিকেল। পাহাড়ের আশপাশে কী দারুণ হাওয়া ছিল সে দিন। বড় বড় দেবদারু আর ইউক্যালিপটাসের পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে আসছিল ঝিরঝিরি রোদ্দুর। ছোট্ট বর্ণা উঁচু-নিচু পাথর ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছিল দূরে টুমকুরের দিকে।

পাথির ডাক আর বহুতা জলের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না।

সানিলা সে দিন অন্য দিনের চেয়ে বেশ একটু চুপচাপ ছিল। কিন্তু আমি তা খুব একটা পাত্তা দিইনি। কলেজের চাপ আর কোলাহল থেকে দূরে এমন একটা বর্ণার পাড়ে এসে আমার মনে হচ্ছিল, কী হবে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে! আমি তো আসলে লিখতে চাই। নিজের মতো করে সামান্য লিখে আর বাকিটা ঘুরে কাটিয়ে দিতে চাই একটা জীবন। এর বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে আমার নেই।

আমি বর্ণার এক পাশে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে শুয়ে নিচ্ছিলাম ওই আলো, ওই হাওয়া আর জলের শব্দ। আচমকা মনে হয়েছিল এই সব শব্দের ওপর দিয়ে ছোট লজ্জের রূপার খোলার মতো কী যেন একটা ভেসে আসছে। আর আমি চোখ খুলে দেখেছিলাম আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছোট হলুদ রুমাল দিয়ে চোখ মুছে সানিলা।

আমি দ্রুত ঘুরেছিলাম ওর দিকে। তার পর ওর হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “কী হয়েছে? হোয়াই আর ইউ ক্রাইং?”

সানিলার নাক লাল হয়ে গিয়েছিল বেশ। রুমাল দিয়ে ও নাকের মাথাটা মুছে বলেছিল, “সুনীল কওশল আমায় প্রোপোজ করেছে।”

সুনীল কওশল। মানে সিদ্ধান্ত সেমের ওই লম্বা-চওড়া পঞ্জাবি সিনিয়র। ওরে বাবা, সুনীল যে খুব র‍্যাগিং করে। আমরা মানে জুনিয়ররা সুনীলকে খুব ভয় পাই।

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে মাথা নিচু করে নিয়েছিলাম।

“ও, তোমার কিছু বলার নেই,” সানিলার গলায় কান্না মেশানো রাগ।

আমি চোখ তুলে দেখেছিলাম, ও একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আসা ঝিলমিলে রোদ এসে পড়ছে ওর মুখে। কাঁধে। নীল চুড়িদারের ওপর। আর হাওয়া দিচ্ছে খুব। হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে চুল।

আমার মধ্যে কী যে হয়ে গিয়েছিল। আমার নিজের ওপর নিজেরই কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

আমি আলতো করে আবার ধরেছিলাম ওর হাত।

সানিলা একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। আমি আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে হাত ছেড়ে এবার ধরেছিলাম ওর মুখ। সানিলা ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক করে চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল শুধু।

তার পর বর্ণা... ঝিলমিলে রোদ... আর বয়ে যাওয়া একটা ছিপছিপে নদী ছাপিয়ে ভেসে আসা ভ্যানিলা লিপগ্লসের গন্ধ, মিল্ট বাবলগামের স্বাদ।

কিছু পরে একটু সরে গিয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে সানিলা বলেছিল, “প্রমিস মি, আমি কোনও দিন হারিয়ে গেলে তুমি আমায় খুঁজে বের করবে?”

আমি হেসেছিলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম এই সামান্য গাছপালা, বর্ণা, আর পাহাড়ের ওপরে, অনেক ওপরে, আকাশের গায়ে উজ্জ্বল টুথপেস্টের মতো লেগে আছে একটু আলোর দাগ। হেল-বপ। ধুমকেতু।

সানিলা আমায় জড়িয়ে ধরে আমার বুকে মাথা রেখে বলেছিল, “শোনো না, বাবাকে বলেছি তোমার কথা। প্লিজ, মিট হিম নেক্সট মাস। উইকএন্ডে আসবে বাবা। তবে হ্যাঁ, তাঁকে বোলো না কিন্তু যে, তুমি ননভেজ খাও। প্লিজ ইইজ। কেমন?”

সানিলার বাবার সঙ্গে সেই আমার দেখা হল। তবে ছাব্বিশ বছর পরে।

পাঁচ

‘Let’s go Snowy, we have a lot of paths to go.’

আজ চার দিন হল আমাদের বাড়িতে থাকছে সানিলা। কিন্তু আমার সঙ্গে এখনও একবারও কথা বলেনি। সামান্য সামান্য পড়ে গেলে এমন মুখ করছে, যেন আমি এগজিস্ট করি না। তবে আমার খারাপ বা ভাল কিছুই লাগছে না। শুধু মনে হচ্ছে এটা করে যদি সানিলা খুশি থাকে, তা হলে এটাই করুক।

এই চুয়াল্লিশ বছরের জীবনে আমি একটাই কথা বুঝি। লিভ অ্যান্ড লেট লিভ। বেকার অন্যের লাইফে কাঠি করে লাভ নেই। একটাই তো জীবন, কী হবে ঝামেলা পাকিয়ে? আমার তো হচ্ছে আছে আর কয়েক বছর পরে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে অশোকনগরে বুড়োদার ফার্ম হাউসে গিয়ে থাকব। চাষ করব। কোনও একটা মিউজিকাল ইন্সট্রুমেন্ট শিখব। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ব। আর দেদার বই পড়ব। কোনও দিনই আমার টাকাপয়সা নিয়ে হ্যাংলানো নেই। ফলে একটা জীবন ঠিক কেটে যাবে।

এখন এই সকাল সাড়ে এগারোটায় কলেজ স্ট্রিটের কাছে আমার পাবলিশারের অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তার ভয়াবহ ভিড় আর জ্যাম দেখে মনে হল, কয়েক বছর পরে বুড়োদার কাছে গিয়ে থাকার ডিশিশনটা এখন নিয়ে নিলেই ভাল হয়।

কিন্তু উপায় নেই। কারণ, এখনও কাজ আছে। অফিসে যেমন কাজ আছে, তেমন লেখার কাজও আছে। একটা দেড় লাখ শব্দের উপন্যাস জমা দিতে হবে। আজ সেই কথা বলার জন্যই আমাকে পাবলিশিং হাউস থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল।

এখানেই গত কুড়ি বছর ধরে আমি লিখছি। এর বাইরে আমি অন্য কোথাও গল্প বা উপন্যাস লিখি না। দীর্ঘদিন একই হাউসে লেখার ফলে এখানকার অনেকের সঙ্গেই ভাল বন্ধুত্ব আছে আমার। তাই এখানে এলে কাজের পরে কিছুটা আড্ডাও হয়।

সেরকমই পনেরো মিনিটের কাজ আর এক ঘণ্টার আড্ডা সেরে আমি এই সবে বেরোলাম। এখান থেকে নিজেদের অফিস হয়ে সোজা বাড়ি যাব। অফিসের কিছু কাজ আছে, কিন্তু সেটা বাড়ি থেকেই করব। কোভিডের পরে এই যে একটা ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’-এর কালচার চালু হয়েছে, এটা আমার বেশ ভালই লাগে।

পিসি যদিও রেগে যায় আমার ওপর। বলে, “তুই হদ্দ কুঁড়ে। তাই তোর ভাল লাগে। আরে, সারা জীবন যে ভাবে কাজ করলাম, একটা দু’বছরের স্প্যান এসে সেটা ভেঙে দিল। কারও কোনও ক্যারেক্টার বিল্ডিং-ই হয়নি। সব কামচোর।”

হ্যাঁ আমি কুঁড়ে। হ্যাঁ আমি কামচোর। তাতে কী হয়েছে? আমার লাইফ আমি যে ভাবে খুশি কাটাব, তাতে কার কী? আর নিজের কাজ তো করছি রে বাবা। সেখানে তো পালিয়ে যাচ্ছি না। উপন্যাস লেখার মাঝে লেখা থামিয়ে আমি বিজ্ঞানের কাজ করি না? কোটেশন তৈরি। কস্টিং করা। ক্লায়েন্ট ভিজিট। সাইটে যাওয়া। এই সবই করি। তা হলে?

পিসি আসলে খুব রাগী তো, তাই কিছুক্ষণ পর পর রাগ না দেখাতে পারলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর পিসির রাগ দেখানোর সহজ উপায় হল আমাকে বাড়ি দেওয়া।

পাবলিশারের অফিসের পাশের গলিতে গাড়িটা রাখা আছে। হারুদা আজ আমায় নিয়ে এসেছে।

আমি গাড়ির কাছে গিয়ে দেখলাম, হারুদা মন দিয়ে মোবাইলে কিছু একটা দেখছে। আমি যে এসে দাঁড়িয়েছি সেদিকে খেয়ালই নেই।

আমি ইচ্ছে করে কিছু না বলে একটু দাঁড়িলাম। হারুদার হুঁশই নেই। দেখলাম মোবাইলে কী একটা গানের সঙ্গে এক অচেনা নায়িকা মরণপণ করে নেচে চলেছে। আর গানের তালে তালে হারুদার মাথাটা স্প্রিং-বুড়োর মতো নড়ছে।

“আরে রণন। এখানে কী করছ?”

পিছন থেকে প্রশ্নটা শুনে আমি ঘুরে তাকলাম। এই রে, অমলদা। অমল দত্ত। না না, কোচ নন। উনি তো অনেক দিন আগেই চলে গিয়েছেন পৃথিবী ছেড়ে। এই অমলদা একজন লেখক। এক সময় আমার পিসির পাণিপ্রার্থী ছিল বলে শুনেছি। কিন্তু পিসি পাত্তা দেয়নি।

পিসির পাণিপ্রার্থী যখন, তখন তো বুঝতেই পারছেন যে, আমার চেয়ে অমলদা বয়সে অনেকটাই বড়। আমার লোকটাকে ‘কাকা’ বা ‘মামা’ বলেই ডাকা উচিত। কিন্তু লেখার জগতে ‘দাদা’-টাই চলে। ফলে এ-ও আমার কাছে অমলদা।

কিন্তু এই লোকটাকে আমি ভয় পাই। তাই মনে মনে প্রমাদ গুনলাম।

অমলদা হলুদ পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা পরে আছে। তার সঙ্গে কাঁধে একটা সাইডব্যাগ।

“আরে, কত বছর পর দেখা। কোথায় যাবে?” অমলদা এসে দাঁড়াল আমার সামনে।

আমি বললাম, “ওই পার্ক স্ট্রিটে। অফিসে।”

“আমিও তো যাব। আমায় ছেড়ে দেবে চলো,” অমলদা আমায় আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই গাড়ির বন্ধ দরজা ধরে টানাটনি

করতে শুরু করল।

দরজা খুলবে কী! হারুদা তো ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছে। অমলদা ধপধপ করে গাড়ির পেছনের দরজায় বাসের কন্ডাক্টরদের মতো থাবড়া মারল কয়েকটা।

আচমকা এমন শব্দে হারুদার শিল্প-সংস্কৃতির আবহাওয়াটা ভেঙে গেল। শিল্প অনুরাগী হারুদা রেগে গিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে চিৎকার করে উঠল, “কোন শালা রে? এটা তোর বাপের গাড়ি?”

অমলদা কয়েক সেকেন্ডের জন্য থমকে গেল একদম। তার পর পাণ্টা বলল, “ছি ছি, সম্মাননীয় লেখককে এই ভাবে অপমান! রণন কোন লোককে ড্রাইভার রেখেছ?”

আমাদের হয়ে যারা কাজ করে, তাদের কখনও আমরা চাকর, ড্রাইভার, ঝি ইত্যাদি বলি না। ফলে এমন কথা শোনা হারুদার অভ্যাস নেই। তাই হারুদাও রেগে গেল। গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলল, “ড্রাইভার মানে? কে ড্রাইভার। আমি রনোর কাকা।”

“কাকা!” অমলদাও ছাড়ার লোক নন, “আমি রণনকে বহু দিন চিনি। আপনি কোন কাকা? কী নাম আপনায়?”

হারুদা বলল, “আমি হরনাথ মল্লিক। আমি রনোর ঘনিষ্ঠ কাকা।”

“ঘনিষ্ঠ কাকা! এ আবার কী সম্পর্ক। আর মল্লিক-মুখার্জি কাকা ভাইপো! ঘটিকে লালবাজার দেখানো হচ্ছে?”

সকাল সকাল এ কী বেকার বামেলা। আমি দু’জনকেই নিরস্ত করে বললাম, “আরে আরে, প্লিজ। তোমরা বগড়া করো না। কী হচ্ছে এ সব! হারুদা তুমি বোসো। অমলদা তুমিও ওঠো গাড়িতে।”

“না উঠব না। আই প্রোটেস্ট,” অমলদা বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে মাথাটা আটব্রিশ ডিগ্রি ওপরে তুলে রাগ দেখাল।

হারুদা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, “তাতে আমার ঘণ্টা। রনো, তুমি বোসো। পিসিদি বলেছে তাড়াতাড়ি অফিস যেতে,” হারুদা কথা শেষ করে গাড়িতে গিয়ে বসল।

আমি অমলদাকে প্রায় বাইশ বছর ধরে চিনি। জানি লোকটা কেমন।

আমি তাই অমলদার হাত ধরে টানলাম। বললাম, “আরে, এসো না। প্লিজ। রাগ করো না। প্লিজ প্লিজ।”

অমলদা প্রোটেস্ট ভেঙে গাড়িতে উঠল। হারুদা কিছু না বলে নাক দিয়ে অবজ্ঞার শব্দ করল একটা।

অমলদা রাগ করে হারুদার দিকে আঙুল দেখিয়ে আমার দিকে তাকাল। মানে, দেখলে কী করল!

আমি চোখ টিপে মাথার পাশে আঙুল ঘুরিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে হারুদার ক্ষু টিলে আছে।

“তাই!” অমলদা এবার আশ্বস্ত হল। সত্যি, ক্ষু টিলে হলে আর কী করা যেতে পারে।

আমি গাড়িতে বসে বললাম, “হারুদা, চলো।”

হারুদা বিরক্ত মুখে গাড়ি স্টার্ট দিল।

অমলদা আমার পাশে ছড়িয়ে বসল একটু। আমি এক ঝলক নস্যির গন্ধ পেলাম। আজকাল এই নেশাটা আর সে ভাবে দেখতে পাই না। আমার হঠাৎ করে ঠাকুরদার কথা মনে পড়ে গেল। ঠাকুরদা নস্যি নিত। নস্যির টিপ ধরে থাকত সারা দিন। এই গন্ধটা পেলে তাই আমার সামনে ঠাকুরদাই ভেসে ওঠে।

অমলদা বলল, “তা, কী লিখছ এখন?”

আমি হেসে বললাম, “ওই আর কী। তেমন কিছু না।”

অমলদা মাথা নাড়ল, “তেমন কিছু না কেন? অনেক দিন তো ভুলভাল লিখলে। এবার আসল লেখা লেখো। গভীর লেখা। নতুন গদ্য। নতুন ন্যারেটিভ স্টাইল। গল্প আর থাকবে না। ক্রিয়াপদ পাল্টে দাও। বিশেষ্যকে ক্রমাগত ক্রিয়াপদে পরিণত করো। সব এপিককে নতুন ভাবে লেখো। লন্ডভন্ড করে দাও। মানে সব ভাঙচুর করে দাও।”

আমি দেখলাম, হারুদা আয়না দিয়ে ভুরু কুঁচকে অমলদাকে দেখছে।

আমি কিছু বললাম না। হাসলাম।

অমলদা বলল, “তোমাদের সাহস নেই। ইস্ট ইউরোপে দেখেছ? ল্যাটিন আমেরিকা? আফ্রিকা? নতুন ন্যারেটিভ এনে ফেলেছে সবাই। সেখানে তোমরা এখনও প্রেম, বাবা-মায়ের সম্পর্ক, বেকার যুবকের ইতিকথা মারাচ্ছ।”

আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপলাম। গত কুড়ি বছর ধরে এমন কথা যে কত শুনলাম! আরে বাবা, ওই সব দেশ-মহাদেশের নিজের একটা বেড়ে ওঠার গল্প আছে। যেটা আমাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের বেঁচে ওঠা, ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস যেমন, আমরাও তেমনই তো হব। জোর করে কেন ভাই অন্যের মতো হতে যাব?

কিন্তু এ সব তর্কে কোনও দিন ঢুকতে নেই। কারণ, এই তর্কের কোনও মীমাংসা নেই। যারা এই তর্ক করে, তারা আসলে মরাল হাই গ্রাউন্ড-এ উঠে, সেখান থেকে অন্যদের ছোট করে একটা জাম্বু আর স্যাডিস্টিক আনন্দ পেতে চায়। আর কিছু না।

আমার ভাই সোজা কথা। যে যেমন লিখতে চাইছে লিখুক না। সেখানে নিজের ইচ্ছে ও পছন্দকে অন্যের ওপরে চাপানোর মতো র্যাডিকালিজম কেন?

অমলদা বলল, “তুমি বড় হাউসে লেখো। সেখান থেকে বেরিয়ে এসো। না হলে জীবনে কিছু করতে পারবে না। এই আমায় দ্যাখো।”

আবার সামনে থেকে হারুদা নাক দিয়ে সেই শব্দটা করল।

আবার অমলদা আমার দিয়ে তেড়েমেড়ে উঠে তাকাল।

আবার আমি একই ভাবে চোখ ছোট করে জু টিলের ইশারাটা করলাম।

অমলদা আশ্বস্ত হয়ে বলল, “ইয়েস ইয়েস, সরি। শোনো রনো, তুমি যা লিখছ, এ সব লিখে লাভ নেই। ভবিষ্যৎ তোমাকে কিন্তু মনে রাখবে না। কালজয়ী লেখা লিখতে হলে তোমাকে সাব-অলটার্ন জীবনযাপনের দিকে তাকাতে হবে। তোমার মধ্যে সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তুমি নিজেকে কমার্শিয়াল স্ট্রাকচারে ফেলে নষ্ট করলে। আমায় দেখেছ তো, আমি চিরকাল বিপ্লবী। আরে বাবা, আমাকে দেখেই তো পরের প্রজন্ম ইন্সপায়ার্ড হবে। তাই না?”

“ঠিক ঠিক,” আমি জোরে জোরে মাথা নাড়লাম।

অমলদা বলল, “তা হলে? তোমার বই একটু-আধটু বিক্রি হয় ঠিক আছে। কিন্তু বিক্রিই সব নয়। আসল হল যুগ পাল্টানো। বুঝেছা?”

আমি আবার জোরে জোরে মাথা নেড়ে বোঝালাম যে, বুঝেছি। তার পর জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি কী লিখছ অমলদা?”

“একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি। মানে সিনেমায় তো রিমেক হয়, তা হলে কবিতায় বা নভেলে হবে না কেন? আমি এখন মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-টা ধরেছি। এখনকার কনটেক্সটে এনে ফেলেছি। এখানে আমার মেঘনাদ এক জন পাইলট। আর বইয়ের নামটাও হালকা টুইস্ট করেছি। ‘মেঘনাদবধ? ভাবব’। মানে ‘কাব্য’টাকে ‘ভাবব’, বুঝেছ?”

আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

অমলদা ভুরু নাচিয়ে বলল, “হ্যাঁ, রিডারদের এমন স্টান্ড করে দিতে হবে। এর পর ধরব ‘গীতাঞ্জলি’। নামটাও হালকা চেঞ্জ করব, ‘সঙ্গীতা অঞ্জলি’। মানে, আমার দুই মেয়েকে ডেভিলকেট করব। ওদের নাম গ্লাস এক্সপেরিমেন্ট। তার পর ধরব ‘সাতটি তারার তিমির’। এটাতেও টুইস্ট। নতুন নাম দেব, ‘সাতটি তারা ও কুমির’। এরকম একের পর এক কাজ। বাংলা সাহিত্যে কত নতুন ডাইমেনশন দেব।”

আমার আর হাসি পাচ্ছে না। কুমির! এটা কেমন করে হবে?

আমি মাথা ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম। দু’মাস পরে এই শহরে এসে মনে হচ্ছে আমি যেন নতুন কোনও শহরে এসেছি। বাবা, পিসি, হারুদা, অমলদা সবার কি এক সঙ্গে তার কেটে গিয়েছে? যে-শহরটা ছেড়ে গিয়েছিলাম, এখন যেন তার একটা ক্যারিকেচার ফর্মে এসে ঢুকেছি। এ সব কী হচ্ছে আমার চারপাশে! আমি কি কোনও দুঃস্বপ্নে আছি? একটু পরেই কি ঘুম ভাঙবে আমার, নাকি এটাই ডিস্টোপিয়া?

“ইয়ে রণন... বলছি কী... মানে, তুলি কেমন আছে?” অমলদা আচমকা বিদ্রোহী থেকে লাজুক হয়ে গেল।

আমি হাসলাম। বললাম, “ভালই আছে।”

“মেয়েটা আরও ভাল থাকত যদি আমার সঙ্গে থাকত, তাই না? তুমি তো জানো নিশ্চয়ই। আমি ওপেন খুব। তাই খুলেই বললাম।”

হারুদা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর ভিড়, এমবাপের মতো দ্রুতগতিতে কাটাতে কাটাতে আবার নাক দিয়ে শব্দটা করল।

এবার অমলদা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে মাথার কাছে আঙুল ঘোরাল। মানে জু টিলে তো, তাই কিছু মাইন্ড করছে না।

আমিও সায় দিলাম। অমলদাকে সব কথায় সায় দিলেই একমাত্র পার পাওয়া যায়।

অমলদা বলল, “আমি বিবাহিত। কিন্তু বিবাহ তো যান্ত্রিক-সামাজিক প্রক্রিয়া। মন তো আরও গভীর বিষয়। সেখানে তুলিই বসে আছে।”

আমি আবার সায় দিলাম। কিন্তু আমার খুব জানতে ইচ্ছে করল কেমন চেয়ারে বসে রয়েছে পিসি।

গাড়িটা পার্ক স্ট্রিটে ঢুকিয়ে এক পাশে দাঁড় করাল হারুদা।

অমলদা বলল, “এখানেই নেমে যাব। তা, ইয়ে রণন, একটা কথা ছিল। মানে তোমাদের পাবলিশার তো খুবই বড়। তা, সেখানে মানে ইয়ে... লেখা জমা দেওয়ার লাইনটা কী বলো তো? মানে, তোমার এই সব দুর্বল লেখা নিশ্চয়ই লাইন করে রেখেছ বলেই ছাপা হয়, তাই না? তা, আমার লেখাটা তোমার হাতে দিয়ে দেব? তুমি একটু দিয়ে দেবে। হবে না? তোমার তো ভাল যোগাযোগ।”

আমি হেসে বললাম, “অমলদা, আমি তো ওখানে চাকরি করি না। গ্লাস কেউ আমায় ওখানে পান্ডাও দেয় না। আর সবার মতো আমার লেখাও সিলেকশন প্রসেসের মধ্য দিয়ে যায়। কত লেখা বাতিল হয়। তাই আমার কথা শুনবে কেন বলো? আর আমিই-বা ওদের ইন্টারনাল ব্যাপারে মাথা গলাব কেন? তাই না? তুমি নিজেই জমা দিয়ে। অসুবিধা কী! গ্লাস তুমি তো দারুণ লেখো। অন্য লেভেলের লেখক।”

“তা ঠিক তা ঠিক। আমি তোমাদের চেয়ে অনেক গভীর লেখালিখি করি। বাংলা ভাষাকে চেঞ্জ করে অন্য কিছু বানাই,” অমলদা হাসল, বলল, “লাস্ট একটা কথা বলে নিই। বিমল মিত্রের ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’-টাকেও আমি রি-রাইট করব। ‘Sorry দিয়ে চিনলাম’। এখনকার কনটেক্সটে আর কী। কে কাকে কেমন করে ‘সরি’ বলে তাই দিয়েই তো মানুষ চেনা যায়, তাই না? এগুলো জমা করা যায়?”

লোকটা কি ইয়ার্কি করছে? আমাকে লেগ পুল করছে? নাকি মাথার সার্কিটে শর্ট হয়েছে? এই বয়সে লোকটার দাবিটা কী?

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে বললাম, “আমায় না এবার যেতেই হবে অমলদা। সরি।”

অমলদাও বোধহয় আমায় ‘সরি’ দিয়েই চিনল। ফলে ছেড়ে দিল।

অমলদাকে নামিয়ে অফিসের দিকে এগোলাম আমরা। অমলদা নেমে যাওয়ার পরে হারুদা বলল, “কোথা থেকে এই মালদের জোগাড় করে। বাংলা ভাষাকে চেঞ্জ করে নেপালি ভাষা বানাবে নাকি?”

আমি কিছু বললাম না। রাস্তার দিকে মন দিলাম। পার্ক স্ট্রিটে এখনও কলোনিয়াল এলিট কলকাতার কিছু অংশ পড়ে আছে। মানে প্রায় খালি বিস্কিটের টিনের তলায় যে রকম দু’-এক টুকরো ভাঙা বিস্কিট পড়ে থাকে, সে রকম আর কী।

আসলে আমার ছোটবেলাতেও দেখেছি কলকাতায় খুব সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর ছিল। কিন্তু এখন সব গুঁড়িয়ে দিয়ে শুধু ফ্লাট উঠছে। শহরের সৌন্দর্য্য পুরনো সুন্দর বাড়িঘরের যে একটা স্থাপত্যমূল্য আছে, ঐতিহাসিক মূল্য আছে, সেটা কে কাকে বোঝাবে?

কিছুটা গিয়ে বিখ্যাত হোটেল পার করে আলো-ছায়ার চেক কাটা রাস্তায় বাঁক নিয়ে দেখলাম অফিস বিল্ডিংয়ের সামনের ফুটপাথে পিসি দাঁড়িয়ে আছে। আর পিসির পাশে একটি অল্পবয়সি ছেলে। এটা আবার কে? পিসি দেখছি গল্পে সারাক্ষণ নতুন ক্যারেক্টার ইন্ট্রোডুস করেই

চলেছে।

ছেলেটার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। বেঁটে, কটা চোখ। চোখে ভারী কাচের চশমা। চুলগুলো নুডলসের মতো কোঁচকানো। মুখে ফাঁকা গোল মিস করার মতো হাসি। ছেলেটার সঙ্গে একটা বড় সুটকেস আর হোল্ড-অল আছে।

আমি ভাবলাম এ-ও আমাদের বাড়িতে থাকবে নাকি? মানে, পিসি দেখছি বাড়টাকে ইউথ হস্টেল বানিয়েই ছাড়বে।

আমি গাড়ির দরজা খুলে নামতে গেলাম। কিন্তু পিসি নামতে দিল না। দরজার সামনে এসে বলল, “রনো, এর নাম নিখিল। পুরুলিয়া থেকে এসেছে। ও টফির দূর সম্পর্কের আত্মীয়। এখানে এসেছে ইউপিএসসি-র জন্য পড়াশোনা করতে। ওকে টফিই নিজের আর আমার নাম্বার দিয়েছিল। টফি ফোন ধরছে না। তাই আমায় ফোন করেছিল সকালে। তুই ওকে বাগমারিতে দিয়ে আয়। দাদার বড় ফ্ল্যাট, ওখানেই টফির কাছে থাকবে। দিয়ে আয়।”

ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়ে দু’হাত তুলে নমস্কার করল।

“হারুদা, ডিকিটা খুলে দাও,” বলে আমি নিখিলকে বললাম, “তুমি ভাই মালপত্র ডিকিতে তুলে দাও।”

হারুদা ডিকিটা খুলে দিয়ে নিজেই নেমে গিয়ে মালপত্র তুলে দিল। নিখিল উঠে বসল আমার পাশে।

পিসি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “ওকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি গিয়ে ইমেল দেখবি। আসানসোলার একটা প্রোজেক্ট কস্ট তৈরি করে পাঠানো হয়েছে। তুই ভেরিফাই করে নিবি একবার। যা এখন।”

পিসি আর দাঁড়াল না।

কলকাতায় রোদ চড়ছে বেশ। ধুলো আর ধোঁয়ায় চারিদিক কেমন যেন ঘোলাটে। আমাদের গাড়ির কাচ তোলা আছে। তাই রক্ষে।

এত গাড়ি, বাস, ট্যাক্সি আর মানুষজন। মাঝেমাঝে মনে হয় এটা কি পৃথিবীর সবচেয়ে কনজেস্টেড শহর? এত মানুষ কোথায় থাকে? আমি দেখছি আমাদের দেশের শহরগুলো যতটা বাজে দেখতে, গ্রামগুলো ততটাই সুন্দর। সেটা কি এই জনবসতির বাড়াবাড়ির জন্য?

“সার,” পাশ থেকে নিখিল ডাকল আমায়।

“কোন স্কুলের ভাই?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“মানে?” নিখিল থতমত খেল।

“মানে, আমি কোন স্কুলের সার?”

“না মানে ইয়ে... কী ডাকব... বুঝতে পারছি না,” নিখিল এখনও থতমত।

আমি বললাম, “দাদা বলতে পারো। মামা বলতে পারো। নাম ধরে ‘রনো’ বলে ডাকতে পারো। মানে ‘সার’ ছাড়া যা খুশি বলতে পারো।”

নিখিল মাথা নেড়ে ঠোঁট চেটে সামান্য দ্বিধা নিয়ে বলল, “দাদা, টফিপিসি শুনলাম বিয়ে করেছে। সত্যি?”

“হ্যাঁ,” আমি মাথা নাড়লাম।

নিখিল বলল, “এই বয়সে? কাকে?”

আমি একই ভাবে বললাম, “আমার বাবাকে।”

“কী? যাঃ, আপনি খুব ইয়ার্কি করেন তো,” নিখিল হ্যা হ্যা করে হাসল।

আমি বললাম, “হাসার কী হয়েছে? আমার বাবা বিয়ে করতে পারে না?”

“না না পারেন পারেন... কিন্তু... মানে...” নিখিল থতমত খেয়ে চুপ করে গেল। কোন দিকে এগোবে বুঝতে পারল না। হয়তো ভাবল, কোন ছেলে বাপের বিয়ে নিয়ে এমন বলে।

বাকি পথটা নিখিল আর কথা বলার রিস্ক নিল না। কেবল মাঝেমাঝে আমায় আড়চোখে দেখতে লাগল। ও আসলে বুঝতে পারছে না আমি ইয়ার্কি মারছি কি না।

বাগমারির ফ্ল্যাটে আমি আর নিখিল দু’জনে মিলে মালপত্র নিয়ে উঠলাম। আর আমাকে অবাক করে বেল বাজানোর আগেই দরজা

খুলে দিল টফিপিসি।

“আরে, তুমি জানতে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

টফিপিসি স্লান মুখে বলল, “তুলি মেসেজ করেছিল যে, নিখিলকে এখানে পাঠিয়েছে।”

“বাহু,” আমি খুশি হয়ে বললাম, “তোমাদের কথা হচ্ছে। এটা তো বেস্ট।”

“না হচ্ছে না,” টফিপিসি বলল, “ওটা বলেই ও আর আমার মেসেজের রিপ্লাই করছে না।”

আমি মালপত্র আর নিখিলকে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম, বাবা বারমুড়া আর লাল টি-শার্ট পরে টিভিতে খেলা দেখছে। আমাদের দেখে বাবা টিভির ভলিউম কমিয়ে দিল।

আমি বললাম, “নিখিল রইল। আমি আসি।”

“রইল মানে?” বাবা ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

টফিপিসি দ্বিধা নিয়ে বলল, “মানে, ও আমার এক দূর সম্পর্কের দাদার ছেলে। দাদা তো নেই। তাই... মানে এখানে ক’দিন থাকবে। পরীক্ষা আছে আসলে। সেই কারণেই...”

টফিপিসি কথা শেষ করার আগেই নিখিল হাসিমুখে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে বলল, “আমি নিখিল ঘোষাল। আপনি ভাল আছেন তো দাদু?”

“দাদু!” বাবা এমন করে নিখিলের দিকে তাকাল যে, এটা সত্য যুগ হলে নিখিল তখনই ভস্ম হয় যেত।

নিখিল ঘাবড়ে গেল, “কেন? আপনি ভাল নেই দাদু?” তারপর টফিপিসির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “তোমার নতুন বর কোথায় গো টফিপিসি? মানে আমার পিসেমশাই?”

আমি বাবাকে দেখিয়ে বললাম, “ইনিই...”

“ইনিই?” মোটা কাচের আড়ালে নিখিলের চোখ দুটো গুপী গাইন বাবা বাইন সিনেমার রসগোল্লার মতো হয়ে গেল, “দাদু কাম পিসেমশাই।”

আমি হাসতে গিয়েও সামলে নিলাম। কারণ, শুধু যে আমার পিসিই খুব ফর্সা তা তো নয়। শুধু যে আমার পিসিই মুড অনুযায়ী কালার চেঞ্জ করে তাও নয়।

আমি দেখলাম, আমার বাবার গায়ের রং লাল টি-শার্টের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আমার মনের ভেতরে বসে থাকা সাবধানী আমিটা বলে উঠল, এখন থেকেই না এই গল্লের ক্রাইসিস পয়েন্ট শুরু হয়।

ছয়

‘My memory isn’t the way it used to be.’

বুড়োদার একটা পিক-আপ ট্রাক আছে। সেটা নিয়ে মাঝেমাঝে কলকাতায় আসে ও। ফার্মের জন্য কী সব যেন কেনার থাকে।

আর কেনাকাটার পর আমায় ফোন করে ডেকে নেয়। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে যেতেই হয়। বুড়োদার ডাক অবহেলা করা যায় না।

আজও বুড়োদা আমায় ডেকেছে। তাই সাড়ে দশটা নাগাদ একটা ক্যাব নিয়ে বুড়োদার সঙ্গে মিট করেছি গড়িয়াহাট মোড়ে।

বুড়োদার পিক-আপ ট্রাকটা দামি। গাঢ় নীল রঙের। ওখানে পৌঁছে দেখেছিলাম ট্রাকের পিছনে ত্রিপল, ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম থেকে শুরু করে কাপড়ের গাঁটরি-সহ আরও কী সব যেন রাখা আছে।

গড়িয়াহাটে বুড়োদা ঘুরে ঘুরে আরও কিছু জিনিসপত্র কিনেছে। আর ট্রাকের পিছনে জড়ো করেছে।

আমি জিজ্ঞেস করে জেনেছি, এবার নাকি ফার্মে জগদ্ধাত্রী পূজো হবে। তাই তার জন্য কিছু জিনিস কেনাকাটি করতে এসেছে বুড়োদা।

গড়িয়াহাটে কেনাকাটি করে, সেখানেই একটা রেষ্টুরায় দুপুরের খাওয়া সেরেছি আমরা। আর এখন বাড়ি ফেরার পথে আমায় নামিয়ে

দিয়ে অশোকনগর ফিরে যাবে বুড়োদা।

আমি সিট বেল্টটা একটু ঠিক করে নিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। সায়েন্স সিটি ছাড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে।

জনলা খোলা আছে। হু হু করে হাওয়া আসছে। শেষ অক্টোবরের হাওয়া। বুড়োদা ঠোঁটে উত্তমকুমারের কায়দায় সিগারেট বুলিয়ে এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছে। হাতে ট্যাটু। বৃকের দুটো বোতাম খোলা। বুড়োদার বড় বড় কাঁচা-পাকা চুল উড়ছে হাওয়ায়। বুড়োদা আমার দেখা একমাত্র রকস্টার।

না, বুড়োদা গান-টান গায় না। কিন্তু তাও অ্যাটিটিউডের দিক থেকে বছর পঞ্চাশেকের বুড়োদা পুরো রকস্টার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি তো ঠাকুর মানো না। তা হলে পূজো?”

বুড়োদা আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, “আমার সেলিব্রেশন ভাল লাগে। প্লাস যারা ফার্মে আছে তাদের খুব হচ্ছে। রনো, জীবনে অন্যের ইচ্ছেরও দাম আছে। সবটাই আমিহুে ভরা হলে খুব মুশকিল।”

আমি মাথা নাড়লাম। আসলে আমার যে-ব্যাপারে কোনও মত নেই, সে ব্যাপারে যে যা বলে আমি শুনে নিই। মেনে নিই।

বুড়োদা বলল, “ফার্মটাকে বড় করছি। লোকাল লোকদের সঙ্গে নিয়ে নানা ফ্রেডারের বিস্কিট মানে কুকিজ বানাচ্ছি। বিদেশে তো কানেকশন আছে। ওদের ভাল লেগেছে। বলছে নেস্টট ইয়ার থেকে বান্ধব অর্ডার দেবে। আমি লোন নিয়েছি। ফ্যাক্টরি বানাব একটা ছোটখাটো। ভাল, বিশ্বস্ত ছেলেপিলে লাগবে। তাকে বলে রাখলাম, এমন কাউকে পেলে জানাস। আপাতত কুড়ি হাজার দেব। থাকা-খাওয়া তো ফ্রি জানিসই। কুকিজ-এর সঙ্গে আচার, কন্ডিমেন্টস, আর অনেক রকম কেকও তৈরি করব। ভাল শেফ হায়ার করব। ওই অঞ্চলের আশপাশে দরিদ্র মানুষজনের খুব আর্থিক সমস্যা। চেষ্টা করছি সবাইকে নিয়ে কিছু করার।”

বুড়োদা চিরকালই এরকম। আমি যখন ফুটবল খেলতাম, তখন থেকে বুড়োদার সঙ্গে আলাপ। আমি খেলতাম রাইট উইং-এ আর বুড়োদা লেফট উইং-এ। আমাদের টিম সেকেন্ড ডিভিশনে উঠেছিল।

প্রভূত সম্পত্তির মালিক হলেও বুড়োদা চিরকাল নিয়মের বাইরের মানুষ। এখনও যে তাই নিয়মের বাইরে গিয়েই কিছু করবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী!

বুড়োদা আবার বলল, “সামনের ডিসেম্বরে ওখানেই একটা ফাইভ-আ-সাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট করছি। ফার্মের মধ্যেই যে-মাঠটা আছে, সেখানে। মাটি তুলে সেখানে ভাল ঘাস লাগাচ্ছি। জমে যাবে, কী বল? তুই খেলবি আমাদের টিমে?”

আমি হাসলাম, “কী যে বলো বুড়োদা। সেই ফিটনেস আর নেই। হাঁপ ধরে যায়। পারব না।”

“খালি বাজে কথা,” বুড়োদা সিগারেটটা শেষ করে জনলা দিয়ে ফেলে দিয়ে বলল, “রোজ সকালে উঠে দু'কিলোমিটার দৌড়ো। সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টুকটুক করে পাস দিবি। আমিও খেলব। না খেললে ক্যালাব বাড়ি এসে।”

আমি হেসে মাথা নাড়লাম। বুড়োদা তো বলেই খালাস। আমার যেন কাজ নেই! অফিস, লেখা এ সব কে করবে? কিন্তু বুড়োদাকে এই নিয়ে এখন বললে ঝাড় খাব। তাই চুপ করে গেলাম।

বুড়োদা বলল, “হরিণ নিয়ে এসেছি ফার্মে। আসিস একদিন, দেখাব। চারটে আছে। দুটো ছেলে দুটো মেয়ে। ভাবছি ঘোড়াও কিনব। আচ্ছা, তুই জানিস, জিরাফ কোথায় কিনতে পাওয়া যায়? বা জেব্রা?”

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। বুড়োদাকে ভাল করে দেখলাম। আমি কোনও প্যারালাল কলকাতায় চলে আসিনি তো? মানে আমার পুরনো কলকাতায় তো মানুষজন এমন ছিল না। কিন্তু এখানে সবাই এমন ছুঁচোবাজির মতো বিহেভ করছে কেন। জিরাফ, জেব্রা এ সব কিনবে? এবার তো বলবে পুকুরে তিমি মাছ রাখব।

বুড়োদা আরও নানা কথা বলতে লাগল। কিছু আমার মাথায় ঢুকল,

কিছু ঢুকল না। কিন্তু শুনতে মজাই লাগল।

আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি এমন করে থেকে কি সতি আনন্দ পাও বুড়োদা?”

বুড়োদা হাসল এবার। বলল, “আমি আমার লাইফ নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি, বুঝলি। বুঝতে চাইছি মায়া কী। কোথায় মানুষ কষ্ট পায়। কেন পায়? আমি এমন একটা পরিবেশ গড়তে চাইছি, যেখানে সব দুঃখ এসে আনন্দে মিশে যাবে।”

“মায়া কী, বুঝলে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“আমার মনে হয়েছে, কোনও কিছু থেকে কিছু ফেরত পাওয়ার ইচ্ছেটাই হল মায়া। আমি কাউকে ভালবাসলাম, সে-ও ইন রিটার্ন আমায় ভালবাসবে। এটাই মায়া। এই যে মনের এক্সপেক্টেশন, এটাই মায়া। এটা কাটাতে পারলে আমাদের ভাল থাকা আটকায় কোন শালা।”

“কিন্তু হরিণ জিরাফ এ সব?”

“আরে, এ সব তো মজা,” বুড়োদা হাসল, “ছোটবেলা থেকেই মনে হত আমি নানা প্রাণী এনে তাদের রাখব আমার কাছে। পেঙ্গুইন রাখারও ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মনে হয় ঠান্ডা ছাড়া বোধহয় বাঁচে না ওরা, তাই না?”

আমি বুঝলাম বুড়োদার সঙ্গে এই নিয়ে কিছু বলা বৃথা। একদিকে মায়া থেকে মুক্তি চাইছে। আবার অন্যদিকে জিরাফ, পেঙ্গুইন এই সব নিয়ে ভাবছে। কী চলছে চারদিকে, কিছু বুঝতে পারছি না। আমার কি জেটল্যাগ কাটেনি!

বুড়োদা আমায় বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বলল, “তুই আসবি কিন্তু। হরিণগুলোকে দেখিস, দারুণ লাগবে। মন ভাল হয়ে যাবে। নেচার হল আসল আর্টিস্ট, জানিস তো? সেই নেচারের কাছে থাকতে হবে। আর্টিস্টের কাছে থাকতে হবে।”

বুড়োদা চলে যাওয়ার পরে আমি একটু সময় একলা দাঁড়িয়ে, তার পর বাড়ি ঢুকলাম। দেখলাম ড্রাইভওয়েতে একটা বড় এসইউভি দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িটা চিনি আমি। অমিতদার গাড়ি।

আমি ঘড়ি দেখলাম। বিকেল সাড়ে তিনটে বাজে। আজ রবিবার। ছুটি। অমিতদা ছুটির দুপুরে আরাম করে ঘুমোনের মানুষ। সে হঠাৎ এসেছে কেন এখন? তামি আবার কিছু করল নাকি?

বাগানে প্লাস্টিকের চেয়ারে লালু আর হারুদা বসে গল্প করছে। একটু দূরে মালিদা আর একটা ছেলে মাটি খুঁড়ে কী যেন করছে। আমায় দেখে হাত তুলল। আমি হাসলাম।

আমি বাগানেও আর-একটু দাঁড়লাম। পাতলা একটা হাওয়া দিচ্ছে এখন। বড় বড় গাছপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো সোনালি রিবনের মতো নেমে আসছে মাটিতে। পাতায় পাতায় নরম ঝিরঝিরে শব্দ। পাখি ডাকছে এদিক-ওদিক। কী শান্ত, ধীর আর নরম একটা বিকেল।

আমি চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

“কী হল? শরীর খারাপ করছে নাকি?” হারুদা জিজ্ঞেস করল।

এই হয়েছে জ্বালা। সবার এখানে সব ব্যাপারে নাক গলাতে হবে।

আমি মাথা নেড়ে, সামান্য হেসে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। দেখা যাক অমিতদা আবার এসেছে কেন।

বসার জায়গাটা আমাদের বেশ বড়। দুটো বড় বড় সোফা সেট রাখা আছে। সেখানেই বসে আছে সবাই।

আমি দেখলাম, আমাদের বাড়ির সবাই তো আছেই, সঙ্গে পৌষালি, তামি আর অমিতদাও রয়েছে। আরও অবাধ হলাম দেখে যে, এক পাশে এসে সানিলাও বসেছে।

আমাকে দেখে পিসি বলে উঠল, “কোথায় থাকিস? ছুটির দিনও টইটই। বাড়িতে মন টেকে না, না?”

আমি হাসলাম।

পৌষালি সরে গিয়ে ওর পাশে জায়গা করে দিল। আমি সেখানে না বসে সানিলার উল্টো দিকের একটা ফাঁকা নিচু সেটিং-তে বসলাম।

অমিতদার সামনে কফির কাপ। যদিও ফাঁকা।

অমিতদা বলল, “রনো, সবাইকে বলে দিয়েছি। এবার তোমাকেও বলছি ভাই। আমাদের বিয়ের তারিখ সামনে। সেই উপলক্ষে একটা পার্টি হবে আর কী। মানে পৌষালির ইচ্ছে। সেই মতো একটা ব্যালোয়েন্ট ভাড়া করেছে। কার্ডও ছাপাতে হয়েছে। এই যো।”

আমি হেসে বললাম, “এটা বেস্ট,” তার পর হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিলাম। সুন্দর কার্ড। সামনে পৌষালি আর অমিতদার বিয়ের সময়ের ছবি দেওয়া।

তামি মুখ বেকিয়ে বলল, “কিসের বেস্ট। এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে আজো লোকজনকে খাওয়ানো। সব মালগুলো খাওয়ার পর বলবে, বিরিয়ানির মাটনে শুধু হাড়। ফিশফ্রাইয়ে গন্ধ। আইসক্রিমটা স্টেল। ডেকোরেশন ঢাকি।”

“তোর সবচেয়ে নেগেটিভিটি,” পৌষালি বিরক্ত হল।

“রিয়েলিটি ইজ সাচ মান্নি ডিয়ার। ওয়েক আপ। ফেক অপটিমিজম দেখাতে হলে আমি ট্রেনে দাদের মলম বেচতাম। নয়তো ভোটে দাঁড়াইতাম,” তামি এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “ইউ ভোল্ট হ্যাভ টু কাম ইফ ইউ ভোল্ট ওয়ান্ট।”

“কেন যাব না?” আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম।

“হা হা,” তামি চোখ রোল করে বলল, “আজ ইফ ইউ ভোল্ট নো।”

পৌষালি চোখ বড় বড় করে বলল, “তামি, সব জায়গায় অসভ্যতা করবি না। খুব বাড় বেড়েছিস।”

তামি পান্ডা দিল না। আমায় বলল, “রনো জানো, ওই দিন সবার সামনে বাবা-মা আবার বিয়ে করবে। ভাও এন্সচেন্স। ভাবো। পুরোহিত আসবে। মালাবদল, শুভদৃষ্টি সব হবে। এমনকি, তার পরে নাচ-গানও হবে। বাবা এই ভুঁড়ি নিয়ে নাচবে। ঠিক যেমন আজকাল, বয়সের গাছ-পাথর নেই টাইপের কিছু জোকর নাচে না সোশ্যাল মিডিয়ায়? সবাই থিল্লি করে, আবার দেখেও? তেমন করে। জাস্ট ইম্যাজিন। বাড়িতে কোরিওগ্রাফার আসছে। কী গান জানো? কালা চশমা। ভাবো একবার। এই অত্য়ানে জেমিনি সার্কাস। উইথ ফুড অ্যান্ড ড্রিংক্স।”

আমি দেখলাম ওর বলার ধরনে পৌষালি আর সানিলা ছাড়া সবাই হাসছে। সানিলা বাংলা বুঝতে পারে না বলেই বোধহয় হাসছে না।

অমিতদা বলল, “সত্যি কী কাণ্ড। আমি নাচতে পারি বলুন পিসিমা? কিন্তু এরা ছাড়বে না।”

অমিতদা প্রায় আমার পিসিরই বয়সি। তাও ‘পিসিমা’ বলেই ডাকে। পিসি বলল, “তাতে কী হয়েছে। আনন্দের দিন তো। নাচবে নিশ্চয়ই।”

তামি বলল, “আর-একটা ফান ফ্যাক্ট।”

“কী কী?” রিতু উৎসাহিত হয়ে তাকাল।

তামি হেসে বলল, “আমি আবার বাবা-মায়ের বিয়ে দেখব। লোকে বলে না, বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব। দ্যাট উইল হ্যাপেন ইন রিয়েলিটি।”

কাকু বলল, “তামি, তুই এমন করে দেখছিস কেন? ব্যাপারটা তো ভাল।”

“দ্যাখো ছোটাদু, বাপি সব বড় ক্লায়েন্টদের কোটি কোটি টাকার ব্ল্যাক মানি আর ট্যাক্স বাঁচিয়ে নিজেও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা করেছে। তার থেকেই একটু শো অফ করবে, বুঝেছ?” তামি বাঁঝিয়ে উঠল।

পৌষালি বলল, “তুই বাড়ি চল। চুলের মুঠি ধরে তোকে বাথরুমে বন্ধ করে রাখব।”

তামি ভুরু কুঁচকে তাকাল। কিছু একটা বলত, কিন্তু আমি চোখের ইশারায় বারণ করলাম।

অমিতদা নির্বাক মানুষ। ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্য বলল, “বুঝেছেন তো, বাড়িটা কেমন মাইন ফিল্ড হয়ে থাকে। সারাক্ষণ রিয়াল মাদ্রিদ আর বার্সেলোনা লেগেই আছে। আমার হয়েছে বিপদ।”

তামি বলল, “সত্যি কথা বললে গিয়ে জ্বালা হবেই।”

কাকু হাসল আবার। পৌষালিকে বলল, “তুমি রাগ কোরো না। এটাই তো রেবেল হওয়ার বয়স। এখনই তো এমন কথা বলবে এরা। আরও বয়স হলে বুঝবে, লাইফ ইজ মোর দ্যান জাস্ট সার্কাজম।”

অমিতদা এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, “আমরা এবার যাই। আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে। আপনাদের তো বলার কিছু নেই। সে দিন সকাল থেকে আপনাদের সবার নেমন্তন্ন। আর সানিলা ম্যাডাম, উই আর ইনভাইটিং ইউ টু। গ্লিড্জ ডু কাম।”

সানিলা হেসে হাতজোড় করে নমস্কার করল।

অমিতদারা বেরিয়ে গেল বাইরে। সানিলা ছাড়া সবাই ওদের সঙ্গে এগিয়ে গেল গাড়ি অবধি। দেখলাম, সানিলা উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

আচমকা বিশাল বড় বসার ঘরটা খাঁ খাঁ করে উঠল। আমি ভাবলাম ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পাাল্টে একটু ছাদে যাব।

আর তখনই দেখলাম পৌষালি আবার ঢুকে এল ঘরে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম, “কী রে? কী হল আবার!”

পৌষালি বলল, “বসার জায়গায় রুমালটা ফেলে গিয়েছি।”

আমি দেখলাম সোফার পাশে ছোট্ট একটা রুমাল পড়ে আছে।

পৌষালি রুমালটা নিয়ে চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল আমার সামনে। তার পর চাপা গলায় বলল, “তোর তো কিছু যায় আসে না বল।”

আমি সামান্য অবাক হয়ে বললাম, “কী ব্যাপারে?”

পৌষালি বলল, “এই যে আমার এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে?”

আমি হাসলাম, “ভাল তো। সেলিব্রেশন ইজ ইমপোর্ট্যান্ট। তাই না?”

পৌষালি চোয়াল শক্ত করে বলল, “স্বাভাবিক। এখন তো আমি পুরনো হয়ে গিয়েছি।”

“কী সব বলছিস?” আমার এবার বিরক্ত লাগছে।

পৌষালি বলল, “সানিলা রাও। এর সঙ্গেই তুই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তিস না। হঠাৎ এত বছর পরে সে এসে এখানে থাকছে কেন রে?”

আমি বললাম, “দেখ, পিসি ওকে এনে রেখেছে। আমার কাছেও এটা সাংঘাতিক কেইসিডেন্স। আমি জানি না ঠিক কী কারণে ও এখানে এসে আছে।”

পৌষালি হাসল। ঠেস দেওয়া হাসি, “বলবি না বুঝতে পেরেছি। আমি তো এখন তোর কাছে বাড়তি।”

আমি আর হাসলাম না। শান্ত গলায় বললাম, “পৌষালি তুই-ই আমায় তড়িয়ে দিয়েছিলি। আমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার দু’সপ্তাহের মধ্যে অমিতদার সঙ্গে তোর এনগেজমেন্ট হয়েছিল। তার পর দু’জনে একসঙ্গে বিয়ের আগে অবধি অনেক ঘোরাঘুরিও করেছিস। ভুলে গিয়েছিস বোধহয়।”

পৌষালি বলল, “সারা জীবন এটা আমায় শুনতে হবে জানি। আমার ভুল হয়েছিল রনো। তুই কোনও দিন ক্ষমা করতে পারবি না আমায়?”

“ক্ষমা কিসের পৌষালি? আমি কিছু মনে করি না আর। তোর লাইফ। তুই যা করেছিস ঠিক করেছিস,” আমি এবার হাসলাম একটু।

পৌষালি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, “দেখি কোনও দিন সব ঠিক করতে পারি কি না।”

আমি আর অপেক্ষা না করে সিঁড়ির দিকে এগোলাম। আমার এ সব জটিলতা ভাল লাগে না। আসলে কী জানেন, এখন ভাবলে অবাক লাগে, আমি কী ভাবে এই মেয়েটার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আজ বুঝি, সেটা প্রেম ছিল না, ছিল অবসেশন। কাউকে পাচ্ছি না বলেই যেন তার জন্য মরে যাওয়ার মতো অবস্থা। ‘ডিজায়ার অফ দ্য মথ ফর দ্য স্টার’।

আমাদের জীবন সত্যি এক আশ্চর্য জার্নি। এখানে সব গোলমালের সূত্রপাত হয় মিসটাইমিং থেকে।

আমি তিনতলায় গিয়ে জামাকাপড় পাাল্টে ভাল করে হাত-মুখ ধুলাম। তার পর আমার ঘরের কাঠের স্ক্র্যাক্স রাখার ছোট আলমারি থেকে একটা বাদামের প্যাকেট বের করে ছাদের দিকে এগোলাম।

আমাদের বাড়ির ছাদটা খুব বড় আর সুন্দর। গেলেই মন ভাল হয়ে যায়।

আমি ছাদে উঠে কয়েক পা গিয়েই থমকে গেলাম। দেখলাম, ছাদের

এক পাশে যে বসার জায়গা আছে, সেখানে বসে রয়েছে সানিলা।

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে ভাললাম, আমার কি এখানে থাকা উচিত হবে? মেয়েটা এখানে এসেছে বেশ কিছু দিন। কিন্তু এখনও আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। এমন ভাব করছে যেন আমাকে চেনেই না।

সানিলা ঘুরে তাকাল আমার দিকে। একটু সময় নিয়ে দেখল। তার পর আমাকে চমকে দিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলল, “এখনও তোমার বাদাম খাওয়ার হাবিট যায়নি দেখছি। আর ওই পৌষালি বলে মেয়েটা। শি ইজ ইয়ার্স এক্স, না? নাকি শি ইজ স্টিল দেয়ার?”

সাত

‘Ten thousand thundering typhoons.’

পৌষালি সেন ফার্স্ট ইয়ার, ইংলিশ অনার্স। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন সেমেস্টার হিসেবে পরীক্ষা হত না। তখন তিন বছরের অনার্স কোর্সের প্রথম দু’বছর নিয়ে হত পাট ওয়ান, আর শেষের বছরটা হত পাট টু। পাট ওয়ান-এ অনার্সের সাবজেক্ট ছাড়াও দুটো পাসের পেপার নিতে হত। আমার পাসে ছিল ইতিহাস আর অর্থনীতি।

ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে বাড়ি ফিরে এসে আমি প্রায় সাত মাস চুপ করে বসেছিলাম। মানে ঠিক চুপ করে নয়, বাড়িতে বসে আমি সারাক্ষণ বই পড়তাম, নয়তো কবিতা লিখতাম। কিন্তু তার বাইরে কিছু করতাম না।

স্কুলের বন্ধুরা তখন কলেজে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। তাদের নতুন জীবন। নতুন বন্ধু। বান্ধবীও। ফলে কারও আর আমার জন্য সময় ছিল না। চিরকালই আমি মুখচোরা। সঙ্গে সামান্য ভিত্তি, আর ‘হলেও হয়, না হলেও হয়’ টাইপ। মিষ্টির দোকানের ভিড়ে গিয়ে সবাব পিছন থেকে গলা তুলে ‘আমায় চারটে গুজিয়া দাও তো’ বলে সবাব আগে মিষ্টি কিনতে পারি না। অটোচালককে এগারো টাকার ভাড়ায় একশো টাকার নোট দিতে পারি না। শপিং মলের এসকালেটরে কেউ আমায় গুঁতিয়ে আগে গেলে আমি পাল্টা গুঁতো দিতে পারি না। টিকিটের লাইনে কেউ বেলাইন করলে প্রতিবাদ জানাতে পারি না।

মানে, কয়েকটা এগজাম্পল দিলাম আর কী। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন যে, আমি ঠিক ‘প্রতিবাদে মুখর’ টাইপ নই। বরং একটু একাচোরা। শান্ত। আনমনা ধরনের। আমার কোনও কোনও বান্ধবী তাই আমায় ‘বাউল’ বলে ডাকে।

না, বাউল আমি নই। সেই যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু ‘আমার আমার’ করে সব জায়গায় ঢুকে জোর করে কেড়ে নেওয়া বা সেয়ানাগিরি করে, কাঁদুনি গেয়ে লোককে টুপি-টাপা দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করার মতো মানসিকতাও আমার নেই। বা বলা যায় এ সব আমি ঘৃণা করি।

যাই হোক, ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ফিরে এসে আমার জীবন মূলত একাই কাটত। তার ওপর ইয়ার লস হয়েছে। সেই নিয়েও একটা কষ্ট আর অপরাধবোধ ছিল। তাই কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় মনে হয়েছিল যে, আর যাই হোক না কেন, মন দিয়ে পড়াশোনাটুকুই করব শুধু।

ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আচমকা সানিলাকে ছেড়ে আসার পরে মনে একটা কষ্ট ছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কী, সেই বয়সে তার তীব্রতা অটটা ছিল না। আর সাত মাস ঘরে বসে যে-পরিমাণ গিল্ট খেয়েছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল, এই সব প্রেম-টেম আসলে নিষিদ্ধ জিনিস।

তখন শুধু মনে হত আর সায়েন্স পড়ব না। এবার আর্টস নিয়ে পড়ব। ইংলিশ নিয়ে। আর তার পর মাস্টার্স করে ব্রিটেনে যাব পিএইচ ডি করার জন্য। লেক পোয়েটসদের ওপর কাজ করব। তাই কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করাটাই ছিল জীবনের আসল লক্ষ্য।

মনে আছে প্রথম দিন বাড়ি থেকে কলেজ যাওয়ার পথে নিজেকে পইপই করে বলেছিলাম, অন্য দিকে যদি মন দিয়েছ না, এমন ক্যালাব যে, কোনও মজুবত জোরের আঠাও আর তোমায় জুড়তে পারবে না।

কিন্তু আমার বিধি চিরকালই বাম। জীবনে যা ঘটলে আমার বাঁশ

হবে, ঠিক সেটাই ঘটবে। না হলে আপনারাই বলুন না, কোথাকার কবে হারিয়ে যাওয়া সানিলা রাও এত বছর পর এসে আমাদের বাড়িতেই ওঠে। মানে ঠাকুরের একটা বিচারব্যবস্থা বলে কিছু নেই?

যাই হোক, সেই যে বাড়ি থেকে নিজেকে পাখি পড়ানোর মতো করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কলেজে গিয়েছিলাম, তাতে কোনও কাজই হয়নি। কারণ, প্রথম ক্লাসেই ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে আমি আবিষ্কার করেছিলাম পৌষালিকে। ঘন নীল চুড়িদার আর সাদা শিফনের ওড়না পরেছিল ও। এবং ক্লাসের শুরুতে একপাশে দাঁড়িয়ে কয়েকটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল।

আমি লাস্ট বেঞ্চে বসেছিলাম। সামনে বই খোলা ছিল একটা। কিন্তু সে দিকে না তাকিয়ে আমি হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিলাম পৌষালিকেই। কে এই মেয়েটা! কোথা থেকে এল? এর সঙ্গে আমার এখানে দেখা হবে বলেই কি আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে ফিরে এসেছি?

ভাল লাগার মোড়কে যখন বিপদ আসে, আমরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যাই। এটাই হয়তো আমাদের নিয়তি। ব্যস, সেই যে পৌষালিকে দেখেছিলাম, তাতেই কেস খেললাম। আমার লেক পোয়েটসরা লেকের ধারে বসে রইলেন আর আমি পৌষালির পিছনে ঘুরতে শুরু করলাম।

না, এ ব্যাপারে আমি কিছু ডিটেল দেব না। শুধু এটুকু বলি, তার পরের তিন বছর পৌষালি আমাকে একবার ‘হ্যাঁ’ বলে কাছে ডেকেছে আর তার কিছু দিন পরে ‘চলে যা’ বলে দূরে ঠেলেছে। তার পর আবার একবার কাছে ডেকেছে আর আবার দূরে ঠেলেছে। তার পর আবার একবার... ইত্যাদি।

আমি মানুষ না ইয়ো-ইয়ো জানি না, কিন্তু আমিও গাধার মতো একবার কাছে গিয়েছি আর-একবার দূরে সরেছি।

তার পর যথাসময়ে আমাদের অনার্স কমপ্লিট হয়েছে আর পৌষালি ওর বাবা-মায়ের বাধ্য মেয়ের মতো বাড়ি থেকে ঠিক করে দেওয়া অমিতদার সঙ্গে এনগেজমেন্ট সেরে, ঘোরাঘুরি করে বিয়ে করে নিয়েছে। আর আমি মাস্টার্সে ভর্তি হয়েও আর ক্লাসে যাইনি। অভিমান আর কষ্টের নির্জন চূড়ায় মনখারাপের তাঁবু টাঙিয়ে মাথা নিচু করে তাতে বসে থেকেছি একা একা।

আসলে সাহসীরা জীবনকে ঘাড় ধরে নিজের বশে আনে। আর আমার মতো সেন্টিমেন্টাল ও ভিতুরা মনখারাপের দোহাই দিয়ে জীবন থেকে পালায়। নেহাত বাবা পিসি কাকারা একটা বড় ব্যবসা তৈরি করে রেখেছিল, তাই এই যাত্রায় আমি সেখানকার কর্মচারী হয়ে বেঁচে গিয়েছি। তার পর একটু-আধটু লেখালিখি করার সুবাদে এখনও কোনও মতে ভেসে আছি। না হলে আমিও তো লস্ট কেসই ছিলাম।

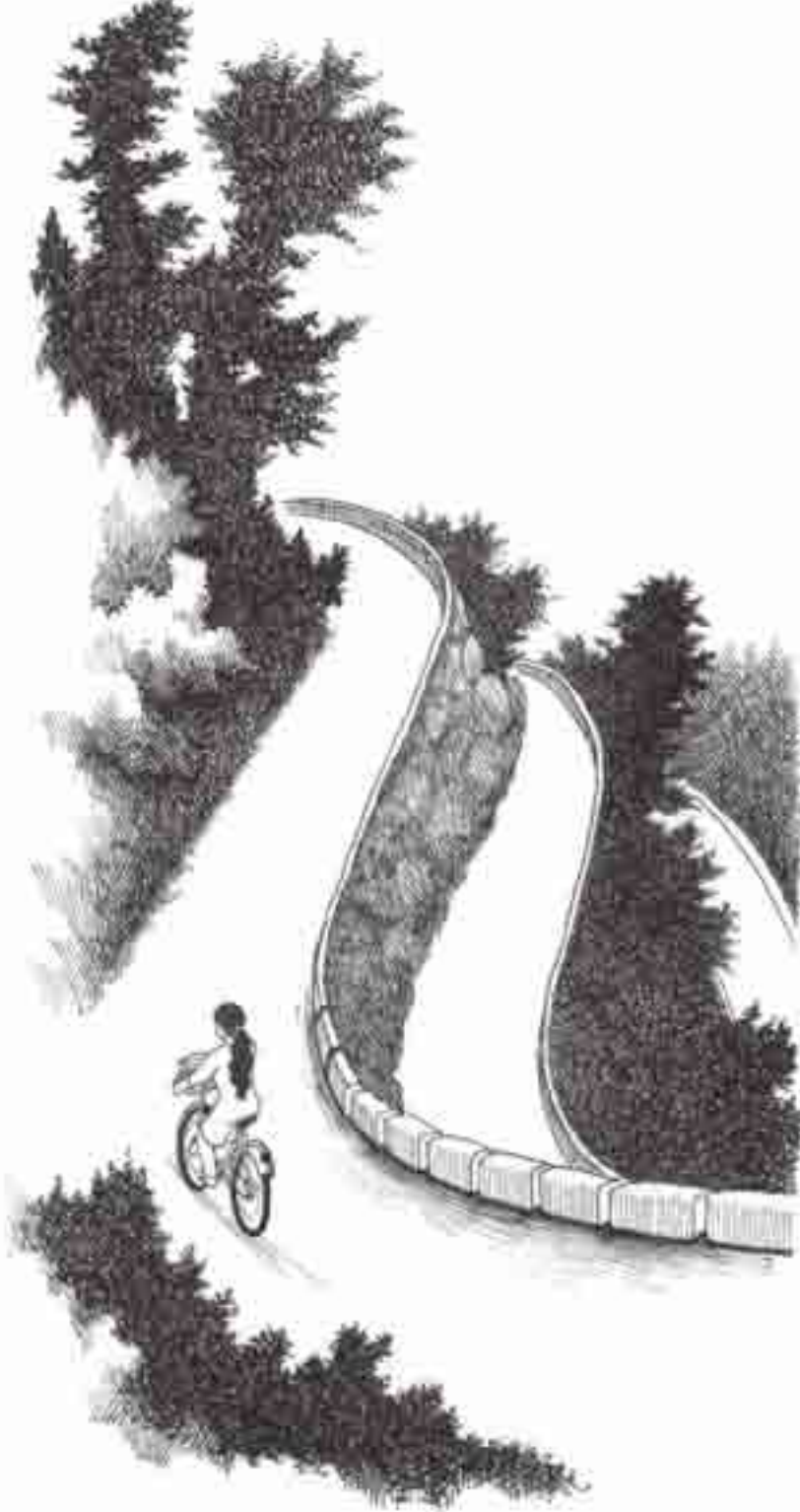
না না, এটাকে একদম সেলফ পিটি ভাববেন না। আমি অবজেকটিভলি দেখলাম সব। সে ভাবেই বললাম।

যাই হোক, এখানে মজার ঘটনা হল এই যে, বিয়ের এত বছর পরে আবার পৌষালির ইচ্ছে হয়েছিল হারিয়ে যাওয়া ইয়ো-ইয়োটা খুঁজে পেতে। তাই আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।

তবে তত দিনে আমি জীবনকে আর অতটা সিরিয়াস ভাবে নিই না। আমি তত দিনে বুঝে গিয়েছি যে, আপনি যদি আপনার ভালমন্দ থাকার ব্যাপারটা অন্যের হাতে দিয়ে দেন, তা হলে সে আপনার পিণ্ডি চটকে ছেড়ে দেবে।

পৌষালি তার পর থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গিয়েছে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে আর আগের সেই হ্যাংওভারটা নেই। বরং অমিতদার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লেগেছে আমার। আর সর্বোপরি তামি তো আছেই। ওর সঙ্গে আমার একটা মজার বন্ধুত্ব আছে।

এই যে এতক্ষণ ধরে আমি এত কিছু বললাম, কারণ সানিলার সেই আগের চ্যাপ্টারের প্রশ্নটা। প্রথম থেকে যাঁরা এই লেখটা পড়ছেন, তাঁরা যদি এখনও বিরক্ত না হয়ে পড়া চালিয়ে যান, তা হলে তাঁদের জন্য আমি কিছুটা কৈফিয়ত হিসেবেই জানালাম যে, পৌষালি আমার কাছে এখন এনশেন্ট হিস্ট্রি ছাড়া আর কিছু নয়।



আপাতত আমি একটা মিটিং সেরে রিসেপশনে অপেক্ষা করছি। তাই কিছুটা অবসর পেয়েছি। আর সেই সুযোগে আপনাদের এই সব বলে নিলাম।

“স্মরণ সব ঠিক আছে। আপনি এবার যেতে পারেন।”

আমি দেখলাম সেক্রেটারি ছেলেটা কনফারেন্স রুমের বড় কাচের দরজাটা ঠেলে কচ্ছপের মতো মুখ বের করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

যাক, আর এখানে থাকতে হবে না। দিনকে দিন ব্যবসাপত্র আর আমার ভাল লাগছে না।

আমি রিসেপশনের সোফা ছেড়ে উঠে পড়লাম। এবার বাড়ি যাব। গত দু’দিন একদম লেখালিখি হয়নি। আজ গিয়ে লিখতে বসতে হবে। কাজ শুরু না করলে শেষ করব কী করে?

এই কোম্পানিটা খুব বড়। নদিয়ার একটা জায়গায় শুগার মিল বানাবে। ওরা আমাদের হাতেই কাজটা টানকি বেসিসে ছেড়ে দিতে চায়। সেই কারণেই কথাবার্তা চলছে কিছু দিন ধরে। বেশ বড় প্রোজেক্ট। কয়েক কোটি টাকার। ফাইনালাইজ হতে সময় লাগবে।

এই কাজে নানা যন্ত্রপাতি লাগবে। তার মধ্যে ডিক্যান্টার সেন্ট্রিফিউজ বলে একটা যন্ত্রও আছে। সলিড-লিকুইড সেপারেশনের কাজে লাগে। একটা যন্ত্রের দামই প্রায় পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা।

জিনিসটা আমরা বানাই না। কিন্তু অন্যের থেকে জিনিসটা কিনে গোটা প্রজেক্টের একটা পার্ট হিসেবে সাপ্লাই করব।

আজ আমার এখানে আসার কথা ছিল না। কিন্তু এই কোম্পানির সাহেব আচমকা আমাদের আজ বলেন যে, ডিক্যান্টার সেন্ট্রিফিউজ জিনিসটা কী, উনি একটু বুঝতে চান। তাই আজকেই আমাদের কাউকে এখানে এসে ব্যাপারটা কী, ঠুকে বোঝাতে হবে।

আমরা যাদের থেকে জিনিসটা কিনব, তারা কোনও টেকনিকাল লোককে এত শর্ট নোটিসে পাঠাতে পারেনি। অগত্যা আমাকেই আসতে হয়েছে। কারণ, এর আগে এমন কয়েকটা সেন্ট্রিফিউজ আমি সামলেছি।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আমাকে গোটা জিনিসটা বোঝাতে হয়েছে। এই এমডি ভদ্রলোক শুধু পয়সা গোনা টাইপ নন। কাজের ব্যাপারেও আগ্রহ আছে। তাই গুঁর নানান কোয়্যারি ছিল। আমি সাধ্য মতো উত্তর দিয়েছি সব।

তার পর আমায় বলা হয়েছিল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে, মানে আরও যদি কিছু জানার থাকে। কিন্তু এইমাত্র জানলাম যে, আর কিছু জানার নেই গুঁদের। আই অ্যাম ফ্রি টু লিভ।

এই অফিসটা টি বোর্ডের কাছে। চারতলায়।

আমি অফিস থেকে বেরিয়ে পিসিকে ফোন করলাম। কারণ, পিসি আর কাকুই এখন কোম্পানির বস। বাবা আর অফিসে আসছে না।

কয়েকবার রিং হওয়ার পরে পিসি ওদিক থেকে ফোনটা ধরল, “কী রে রনো, কাজ হয়েছে?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ, ব্যাপারটা মিটে গিয়েছে। কিন্তু সেন্ট্রিফিউজের ওদের বলতে হবে, দরকারে

টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্স না পেলে কেন মাল নেব ওদের থেকে? বাজারে সাপ্লায়ার কি কম আছে?”

“সে ঠিক আছে। আমি বলব বলে দিতে,” পিসি খুব একটা পান্ডা দিল না যেন আমার কথাকে। তার পর জিজ্ঞেস করল, “তুই কোথায় আছিস রে?”

“এই টি-বোর্ডের সামনে। কেন?”

“সানিলাকে বিসিএল থেকে তুলে নিয়ে বাড়ি আসবি। বুঝেছিস?” পিসি নিজের হুকুমের গলাটা বের করল।

“যাঃ বাবা। সানিলাকে? ও বিসিএল-এ এসেছে? ক’দিনে এই ফার্স্ট বাড়ি থেকে বেরোল, না? আচ্ছা পিসি, কী কেস বলো তো, ও আমাদের বাড়িতে আছে কেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“নিশ্চয়ই কারণ আছে। আমি রাও সাহেবকে কথা দিয়েছি, কাউকে বলব না কী হয়েছে। ও যত দিন ইচ্ছে হয় থাকবে। তোর আপত্তি আছে? ও তো একসময় তোর ক্লাসমেট ছিল, না?” পিসির এই জেদের গলাটা আমি ভালই চিনি।

সত্যি সানিলাকে সেই যে রাও সাহেব আমাদের বাড়িতে রেখে গিয়েছেন, তার পর উনি আর আসেননি। সানিলাও বেরোয়নি। সেখানে আজ একেবারে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে গিয়েছে? কেসটা কী? সবচেয়েই এমন হাস-হাস কেন বাবা। সানিলা আবার ‘র’-এর এজেন্ট নয়তো?

সেদিন ছাদে সেই যে সানিলা কথা বলেছিল, সেটাও কিন্তু ওইটুকুই। ও নিজের করা প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করেনি। আর, তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথাও বলেনি। সেই মেয়েকে আমাকে পিক আপ করতে হবে? কী অস্বস্তিকর পরিস্থিতি রে বাবা।

আমি পিসিকে বললাম, “ও আমার সঙ্গে কথা বলছে না। সেখানে আমি গেলে কি ও গাড়িতে উঠবে? মানে আমায় যে এড়িয়ে যাচ্ছে...”

“যা বলছি কর। বড্ড মুখে মুখে কথা বলিস। যা এখন,” পিসি কট করে ফোনটা কেটে দিল।

আমি আর কী বলি। নাও, ঠালা সামলাও।

এখানে গাড়ি পার্ক করা একটা ঝকঝক ব্যাপার। তাও একটা জায়গায় পার্ক করছিলাম। কিন্তু আশপাশে অন্য গাড়ির এমন জ্যাম যে, পার্কিং চার্জ দিয়ে আমার নিজের গাড়ি বের করতে দশ মিনিট লেগে গেল।

কলকাতায় এখন বিকেল হচ্ছে। মহামারির দু’বছর পরের কলকাতা আবার পুরনো ভিড়ের মধ্যে ফিরে গিয়েছে। আকাশে এখন রোদ। গরমও আছে ভালই। তবে গাড়ির এসির মধ্যে মালুম হচ্ছে না।

ভিড় ঠেলে আমি সামনের দিকে এগোলাম। কিন্তু পদে পদে লাল সিগনালে আটকে যাচ্ছি। এ কী ঝামেলা বলুন। আজ পর্যন্ত এক চাপে আমি কোনও দিন কোনও সিগনাল সবুজ পেলাম না। যে-বিধাতা পুরুষ আমার ভাগ্য লিখেছিলেন, তিনি কি ক্রনিক ডিপ্রেসনের রোগী?

একের পর এক সিগনালে ধাক্কা খেতে খেতে ও নানা বাসের অসভ্যতা সহ্য করে বিসিএল-এ পৌঁছোতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগে গেল।

দেখলাম, লাইব্রেরির সামনের ফুটপাথে বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সানিলা। ওর কোঁকড়া চুল হাওয়ায় উড়ছে। ফর্সা মুখ রোদ লেগে লালা দেখেই বুঝলাম খুবই বিরক্ত হয়ে আছে।

আমি গিয়ে সামনে গাড়ি দাঁড় করলাম।

সানিলা ঠোঁট টিপে এমন করে দেখল, যেন আমি সাংঘাতিক কোনও অপরাধ করে ফেলেছি গাড়ি নিয়ে এসে।

আমি সুইচ টিপে দরজার লক খুলে দিলাম। আর সানিলা আমায় অবাক করে, আমার পাশে না বসে পেছনের দরজা খুলে উঠে বসল। আমি হাঁ হয়ে গেলাম। এ কী রকম ভদ্রতা ভাই?

সানিলা আমার মুখ দেখে কঠিন গলায় বলল, “হোয়াট? ড্রাইভ?” তার পর চোখ রোল করে হাতের ব্যাগটা পাশে রেখে মোবাইলে মন দিল।

আমি আর কী করি। কান লাল হয়ে গিয়েছে আমার। সেই কোথা থেকে কোথায় পিক আপ করতে এলাম, আর এসে এমন কাণ্ড!

আমার পিসির ওপর রাগ হল। আরে, বাড়িতে হারুদা আছে। অফিসে মলয়, সঞ্জল আছে। কাউকে বললেই হত। আমায় কেন ভাই! কার পাকা ধানে আমি মই দিয়েছি যে, এ ভাবে অপমানিত হতে হবে। সানিলার বাবা আমাদের বড় ক্লায়েন্ট। তার মানে তার সব কথা মানতে হবে। এ কেমন ক্যাপিটালিজমের দাসত্ব। আমার মনের মধ্যে রাগের বুড়বুড়ি কাটতে লাগল।

আমি বাড়ির দিকে গাড়ি ঘোরালাম। তার পর ইংরেজিতে বললাম, “ইউ হ্যাভ এজড কোয়াইট ব্যাডলি।”

আয়নায় দেখলাম সানিলা মুখ তুলে তাকিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলল, “আমি বাংলা বলতে পারি এখন। আর তুমি এখনও অ্যাসহোলই রয়ে গিয়েছ।”

আমি কনফিউজড হয়ে গেলাম। গালি দেওয়ার জন্য রাগ করব, নাকি এমন পরিষ্কার বাংলা বলার জন্য আশ্চর্য হব, বুঝতে পারলাম না।

আমি অবাক হয়ে পিছনে তাকালাম।

সানিলা বিরক্ত হয়ে আমার মাথা ধরে সামনে ঘুরিয়ে দিল। বলল, “কয়েক সপ্তাহ আগে হলে আই উডন্ট মাইন্ড। কিন্তু এখন আই ডোন্ট ওয়ানা ডাই।”

আমি রাস্তার দিকে তাকালাম। কী বলল এটা? কয়েক সপ্তাহ আগে... এর মানে? আমি বুঝলাম ওই ‘অ্যাসহোল’ থেকে আমার মন সরে গিয়েছে অন্য দিকে।

সানিলা বলল, “লাস্ট ফিউ উইকস ব্যাক আমি সুইসাইড করতে গিয়েছিলাম। স্লিপিং পিলস। নার্সিং হোমে ছিলাম। বাবা একা মানুষ। আমাকে সামলাতে পারবে না। তোমার পিসি, মানে তুলি আন্টি কেম ফরোয়ার্ড। ডক বলেছেন আমি যেন একা না থাকি। তাই তোমাদের বাড়িতে নিয়ে রেখেছে। আমাদের সে ভাবে কোনও রিলেটিভ নেই এখানে। মা মারা গিয়েছে অনেক দিন। বাবাও বাইরে গিয়েছে। আসলে বাবা ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কাইভ মি।”

“এই সেরেছে!” এ আবার সুইসাইড করতে গিয়েছিল নাকি!

সরি সরি, আমার হয়তো এ ভাবে ‘এই সেরেছে’ বলা উচিত হয়নি। মানসিক কষ্ট খুব সিরিয়াস একটা ব্যাপার। কিন্তু সত্যি বলতে কী, সব সময় আমার মনের এই অ্যালার্টনেসটা কাজ করে না। এটা আমার একটা দোষ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কেউ নেই মানে? মা নেই বুঝলাম... কিন্তু আর...”

সানিলা আবার ফোনে ফিরে গিয়েছে। তাও বলল, “আমার হাঙ্গরাম নেই। টেন ইয়ারস ব্যাক হি ডায়েড। আর এখন ভিন্নশ আমায় চিট করেছে।”

এতগুলো ইনফরমেশন আমি এক সঙ্গে প্রসেস করতে পারলাম না। তার আগেই আমার মোবাইল বেজে উঠল। আমার মোবাইলটা গাড়ির সঙ্গে সিঙ্ক করা, ফলে গাড়ি জুড়ে টিংটিং করে ডাক পড়ল আমার।

সানিলা চুপ করে গেল। আমি ফ্রিনের দিকে তাকালাম। অচেনা নান্দার। এটা আবার কে রে ভাই! আজকাল যা দিন পড়েছে, অচেনা নান্দার দেখলেই ভয় লাগে। তাও ফোনটা ধরলাম।

“হ্যালো?”

“রনোদাদাবাবু বলছেন?” ওদিকে অচেনা গলা।

“বলুন,” আমি দ্বিধা নিয়ে বললাম।

ও দিক থেকে বলল, “আমি বাগমারির ফ্ল্যাট থেকে পটলা বলছি। দাদুর সব কাজ করি। এখানে তাড়াতাড়ি আসুন। বিপদ হয়েছে।”

“বিপদ। মানে? বাবা ঠিক আছে তো?” আমি ঘাবড়ে গেলাম।

“না না, শরীর খারাপ হয়নি। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন প্লিজ,” ও দিক থেকে পটলা ফোন কেটে দিল।

আমি ঘাবড়ে গেলাম একদম। হাত কাঁপছে আমার। মুখ শুকিয়ে

গিয়েছে নিমেষে। বাবার কী হল আবার। সামনে কলকাতার দিকে তাকিয়ে আমার সব গুলিয়ে গেল। এত গাড়ি, এত জটিল রাস্তা, এত জট, এ সব কাটিয়ে আমি তাড়াতাড়ি পৌঁছোব কী করে বাবার কাছে?

“গাড়ি থামাও,” পেছন থেকে সানিলা বলল আমায়।

আমি চুপ করে গাড়টাকে দাঁড় করলাম। সানিলা গাড়ির পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, “নামো।”

আমি কিছু না বলে নেমে দাঁড়লাম।

সানিলা গাড়িতে উঠে আমার সিটে বসে বলল, “পাশে এসে বোসো। আমায় বলে দাও, আমি নিয়ে যাব। যে ভাবে হাত কাঁপছে তোমার, আই সিরিয়াসলি ডেন্ট ওয়ানা ডাই।”

পটলা দরজা খুলেই দাঁড়িয়েছিল। ইয়ং ছেলে। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স। আমি একে আগে দেখিনি। নতুন রাখা হয়েছে আর কী।

আমি বললাম, “কী হয়েছে ভাই? আমি রনো। বাবা কোথায়?”

পটলা আমার পিছনে সানিলাকে দেখে ইতস্তত করল একটু, তার পর বলল, “আসলে আজ সকালে দাদু আর মায়ের মধ্যে খুব ঝগড়া হয়েছে। তার পর মা ওই নিখিলবাবুকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে।”

টফিপিসি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে! আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। এটা কী হল? কেন হল? আমি কী করব বুঝতে না পেরে দৌড়ে ঘরের ভেতরে গেলাম।

দেখলাম, ভেতরের বড় ঘরে বাবা মাটিতে বসে আছে আর সোফার একটা কুশন বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে বাচ্চাদের মতো শব্দ করে কাঁদছে।

আট

‘How’s your thirst for adventure, Captain?’

আমার মায়ের কোনও দিন বিশেষ কোনও চাহিদা ছিল না। মা শুধু একটা জিনিসই চাইত। সবাই যেন মায়ের সঙ্গে একটু মিষ্টি মুখে কথা বলে। বাড়ির সকলেই মায়ের সঙ্গে ভাল করে কথা বললেও একমাত্র বাবা কেমন যেন আড় হয়ে থাকত। সারাক্ষণ রাগের একটা অদৃশ্য বোলতা বাবার মাথার ওপর বনবন করে ঘুরত। মাসের পর মাস কারও সঙ্গে ভাল করে কথা বলত না। দশবার কিছু জিজ্ঞেস করলে একবার শুধু হুঁ হাঁ করে উত্তর দিত। বাড়ির সবাই বাবাকে এই কারণে ভয় পেত। মা-ও বাবাকে বিশেষ ঘাটাত না তাই। কে আর সাধ করে ঝামেলা বাড়ায় বলুন!

তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি। মনে আছে আমাদের বাড়িতে বগলাদাদু আসত। বগলাদাদুর ছিল শাড়ির ব্যবসা। একটা সাদা বড় কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে আসত মানুষটা। সঙ্গে অল্পবয়সি একটা ছেলে থাকত। মনে আছে প্রতিটা শাড়ির পাড়ের কাছে তিনকোণা প্রাইস ট্যাগ স্টেপল করে লাগানো থাকত।

বগলাদাদু ধুতি-পাঞ্জাবি পরত। পান খেত খুব। আর কথায় বাঙাল-টান ছিল স্পষ্ট। আচমকা দেখলে মনে হত প্রমথেশ বড়ুয়া গৌঁফ লাগিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে এসেছেন।

বগলাদাদু এলেই পিসি-কাকিমা ঘিরে ধরত। মা-ও থাকত, কিন্তু সেটা গল্প শোনার লোভে। আসলে বগলাদাদু দারুণ গল্প বলতে পারত। আমি দেখতাম শাড়ি বা গয়নার প্রতি বরাবর একটা নির্বিকার ভাব ছিল মায়ের। সবাই যখন শাড়ি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে, তখন মা বগলাদাদুর সঙ্গে নানান বিষয় নিয়ে গল্প করত। বগলাদাদু মাকে ‘বৌমা’ বলে ডাকত।

পুজোর আগে সেবার বগলাদাদুর কাছ থেকে প্রায় পনেরো হাজার টাকার শাড়ি কেনা হয়েছিল। না, মা একটাও কেনেনি। পুজো উপলক্ষে বাড়িতে তখন আত্মীয়স্বজনরা এসেছিল। তারাই সবাই মিলে কিনেছিল। আজ থেকে চৌত্রিশ বছর আগে অত টাকার শাড়ি কেনা

কিন্তু চাট্টিখানি কথা ছিল না।

বগলাদাদু যাওয়ার আগে মায়ের হাতে একটা শাড়ি দিয়ে বলেছিল, “তুমি তো কিছুই কিনলা না বৌমা। এইখান তোমায় দিলাম। অষ্টমীর সকালে পরবা। দাম দেওন লাগব না।”

মাখন রঙের জমি ঘেরা দুধে-আলতা রঙের পাড়। সারা গায়ে রুপোলি সুতোর ঘন কাজ। আজও মনে আছে শাড়িটার নাম— তাঞ্জোর বেনারসি।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বাবা সেই শাড়িটা দেখে কী যে অশান্তি করেছিল, আজও মনে আছে আমার। এক বাড়ি আত্মীয়স্বজনের সামনে মা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল মাথা নিচু করে। বাবার বক্তব্য ছিল কেন এত দামি শাড়ি কিনবে মা।

বাবাকে মা বলতেই পারছিল না যে, শাড়িটা গিফট পাওয়া, কেনা নয়।

শেষে আর থাকতে না পেরে কাকু গিয়ে বলেছিল, “দাদা, সারা বাড়ির লোকজন অনেক শাড়ি কিনেছে। তাই বগলাদাদু এটা বৌদিকে এমনি গিফট দিয়ে গিয়েছে।”

বাবা সঙ্গে-সঙ্গে আক্রমণের মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে অশান্তি কন্টিনিউ করেছিল এই বলে যে, কেন মা বাইরের লোকের থেকে গিফট নেবে।

সেই দশ বছর বয়সের আমি দরজার ফ্রেম ধরে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম মা চুপ করে সহ্য করে নিচ্ছে সব কিছু। মায়ের যে কী অসীম সহ্যক্ষমতা ছিল। মায়ের মতো আর একজনেরই সহ্যগুণ দেখেছি আমি। সে হল পৃথিবী।

মা কোনও দিন ওই মাখন-রঙা তাঞ্জোর বেনারসিটা পারেনি। কেউ সেই নিয়ে কিছু বললে মা হেসে এড়িয়ে যেত।

এক বর্ষাকালের সকালে আমার মা মারা গিয়েছিল। দিনটা ছিল তেরোই অগস্ট। আমার তখন চব্বিশ বছর বয়স। ক’দিন ধরে নার্সিং হোমে ভর্তি ছিল মা। সেখানে ভুল ওষুধের রিঅ্যাকশনে মা আচমকা চলে যায়।

রাতেও জানতাম পরের দিন মা ডিসচার্জ নিয়ে চলে আসবে বাড়িতে। আর সকালে উঠেই শুনলাম মা আর নেই।

সে দিন মেঘ করেছিল আকাশে। কেমন ঘোলাটে চুন জলের মতো আলো ছিল চারিদিকে। অ্যান্থ্রলেন্স থেকে মাকে নামিয়ে আমাদের বড় ঘরের মেঝেতে রাখা হয়েছিল। পাড়ার কত লোক যে এসেছিল তার ঠিক নেই। আশপাশ থেকে অনেক দরিদ্র মানুষজন এসেছিল ভিড় করে। আর আমরা জানতে পারছিলাম, মা কতজনকে সাহায্য করত।

আমি মাথা নিচু করে মায়ের পা ধরে বসেছিলাম। কী ঠান্ডা পা! মনে পড়ছিল শীতকালে মা বলত মায়ের নাকি পায়েই ঠান্ডা লাগে শুধু। সেই পা দুটো কী যে ঠান্ডা হয়েছিল! আমি ধীর পায়ে উঠে গিয়ে দুটো মোজা নিয়ে এসেছিলাম। তার পর পরিয়ে দিয়েছিলাম মায়ের পায়ে।

মাকে চন্দন দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল কাকিমা। শুনছিলাম কাচের গাড়ি এসে গিয়েছে। পিসি বলছিল, “একটা ভাল শাড়ি এনে জড়িয়ে দে রনো।”

আমি আবার উঠে গিয়েছিলাম ভেতরে। স্টিলের আলমারি খুলে দাঁড়িয়েছিলাম এক মুহূর্ত। তার পর বের করে এনেছিলাম সেই মাখন আর দুধে-আলতা রঙের তাঞ্জোর বেনারসিটা। তিনকোণা প্রাইস ট্যাগটা তখনও লাগানো ছিল সেখানে। শুধু স্টেপলারের পিনটা জং ধরে কালো হয়ে গিয়েছিল।

শাড়িটা এনে মায়ের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমি মুখ তুলে দেখেছিলাম, একটু দূরে সোফায় বসে বাবা চা খাচ্ছে।

সেদিন শ্মশানে মাকে চুল্লিতে ঢোকানোর আগে আমি প্রণাম করেছিলাম। আর মনে মনে বলেছিলাম, “যদি পুনর্জন্ম বলে কিছু থাকে, তা হলে মা তুমি সেখানে কোনও দিন কষ্ট পেয়ো না। এত তাড়াতাড়ি তোমার সন্তানকে ছেড়ে চলে যেয়ো না।”

আজ এখনও এই সব মনে পড়লে আমার চোখে জল আসে।

শরীরের মধ্যে কোথায় যেন কী একটা ছিঁড়ে যাওয়ার মতো কষ্ট হয়। কিন্তু সেটা ঠিক কী, আমি বুঝি না।

আপনাদেরও কি এ সব পড়ে কষ্ট হল একটু? যদি হয়, তা হলে আমায় মার্জনা করবেন। আপনাদের কষ্ট দেওয়া আমার জীবনধর্ম নয়। আমি খুব ছোট্ট এবং সামান্য একজন লেখক। বাংলা সাহিত্য আমাকে মনে রাখবে না জানি। তাই যে ক’টা দিন আছি, আমি মানুষকে কষ্ট দিতে চাই না। আপনারা কখনও যদি দুর্ঘটনাবশত আমার লেখা পড়ে থাকেন, দেখবেন আমি হাসিখুশি, ভালবাসা আর আনন্দময় মিলনাত্মক গল্পই লিখি। সেই গল্প, যেখানে সবাই খুশি থাকে। যেখানে যে যাকে ভালবাসে তাকে অধিকাংশ সময়ই পেয়ে যায়। সেই গল্প যেখানে কেউ বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখ মোছে না।

কিন্তু তাও জানেন বাবাকে গুরুত্ব করে বুকে কুশন জড়িয়ে কাঁদতে দেখার পরে আমার কেবলই মায়ের চলে যাওয়ার দিনটা মনে পড়ছে। বড় হলঘরের এক পাশে মাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে আর তার একদিকে সোফায় বসে বাবা চা খাচ্ছে।

সত্যি বলছি উদ্ভিদকোষ আর প্রাণিকোষের পার্থক্য বোঝানোর মতো করে আমি মা আর টফিপিসির মধ্যে তুলনা টানতে চাইছি না। কিন্তু তাও আমার মনের মধ্যে এসে পড়ছে। মাঝেমাঝে আমাদের মন আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

“রনো, তোমায় শরবত করে দেব?” টফিপিসি ভেতরের ঘর থেকে এসে আমার সামনে বসে জিজ্ঞেস করল।

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, “তুমি কেমন আছ?”

টফিপিসি জোর করে হাসল। বলল, “এই চলছে আর কী।”

আমি আবার চুপ করে গেলাম। কী বলব বুঝতে পারছি না। বাবার অবস্থা দেখে আমি আর থাকতে না পেরে দু’দিনের মাথায় আজ টফিপিসির বাড়িতে এসেছি।

টফিপিসির বাড়িটা নিউ মার্কেটের কাছে। সেখানে টফিপিসি একাই থাকে। আসলে টফিপিসি বর্ধমানের মেয়ে। এখানে একটা ফ্ল্যাটে থাকে। কলেজে পড়ায়। বাবার সঙ্গে ঝগড়ার পরে নিজের এই বন্ধ ফ্ল্যাটেই নিখিলকে নিয়ে চলে এসেছে।

আমায় আজ দেখে কিন্তু টফিপিসি কোনও রকম রাগারাগি করেনি। বরং শান্ত ভাবে বসিয়েছে। তার পর কী একটা কাজ শেষ করতে ঘরে গিয়েছিল। এখন, এই এসে বসল আবার।

আমি আবার বললাম, “দ্যাখো, তুমি তো জানোই বাবা কেমন। তুমি ফিরে চলো।”

টফিপিসি বলল, “একটা লোক অকারণে সবার সঙ্গে অসভ্যতা করবে আর বাকিদের সেটা মেনে নিতে হবে, এমনটা সব সময় সম্ভব নয়, তাই না?”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কী হয়েছে বলো তো?”

টফিপিসি বলল, “নিখিল কেন ওখানে গিয়ে উঠেছে, সেই নিয়ে তোমার বাবার সমস্যা। মানে, কাকে কী বলব!”

“সে কী। কেন?” আমি অবাক হলাম।

বাবার বাগমারির ফ্ল্যাটটা খুবই বড়। ডুপ্লেক্স আবার। অনেক জায়গা। সেখানে এক জন কেন, দশ জন থাকতে পারে।

টফিপিসি বলল, “নিখিলকে আমি দোতলায় একটা ঘরে থাকতে দিয়েছিলাম। ও বেশির ভাগ সময় নিজের মতোই থাকত। শুধু খেতে আসত নীচে। তাতেও তোমার বাবার অসুবিধে। বলে কিনা ওকে পিজি-তে থাকতে বলো অন্য কোথাও। যা টাকা লাগে তোমার বাবা দেবে। নিখিল থাকলে নাকি ওর প্রাইভেসি নষ্ট হচ্ছে।”

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। বাবা মাঝেমাঝে এমন সব কাণ্ড করে যে, আমার কিছু বলার থাকে না।

টফিপিসি বলল, “সেই নিয়ে আমায় কী যে যা-তা কথা বলেছে, ভাবতে পারবে না। রাগলে তো মাথার ঠিক থাকে না। আমার বালিশ ছুড়ে ফেলে দিয়েছে বিছানা থেকে। আমায় ধাক্কা মেরেছে। আরও খারাপ খারাপ কথা বলেছে। তোমার মা অনেক কিছু সহ্য করেছে,

আমি তুলির থেকে আগেই স্তনেছিলাম। এখন নিজে বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। দ্যাখো রনো, তোমার মায়ের হয়তো অনেক সহ্যগুণ ছিল। কিন্তু আমার সেটা নেই। আমি সহ্য করব না।”

কথা বলতে বলতে দেখলাম টফিপিসির গলা ধরে এসেছে।

আমি মাথা নাড়লাম। বাবা সব মহিলাদের ওপর একই এফেক্ট ফেলে। লোকটার এত বয়স হয়েছে, তাও বেয়াড়া বাচ্চার মতো ব্যবহারটা পাল্টাল না। টফিপিসিকে ধাক্কা মেরেছে। আমি তো ভাবতেই পারছি না।

আমি মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইলাম।

টফিপিসি বলল, “তুমি আমায় ফিরে যেতে বোলো না। আমি অপমান মেনে নিতে পারি না।”

শেষ কথাটা বলে টফিপিসি কেঁদে ফেলল। আমি বুঝলাম সমস্যাটা। সবার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে এই বিয়েটা করেছে টফিপিসি। সেখানে যার জন্য এমনটা করেছে, সে-ই যদি এ ভাবে কষ্ট দেয় তো আর কী করবে একটা মানুষ।

এর পরও আমি মিনিট পনেরো মতো ছিলাম। তার পর উঠে চলে এসেছি। আসার আগে টফিপিসি আমাকে একটা টিফিন-বস্ত্র দিয়েছে। তাতে আচার আছে। জানে আমি আচার ভালবাসি, তাই দিয়েছে।

বাইরে এসে ঘড়ি দেখলাম আমি। সাড়ে চারটে বাজে। আজ আর অফিসে যাব না। বাড়ি ফিরে যাব। লেখাটা ধরেছি। সেটা শেষ করতে হবে। যখন লেখার চাপ থাকে, আমি অন্য কোনও কাজ করে শান্তি পাই না। সারাক্ষণ ছোট্ট একটা পাখি যেন আমার বুকের মধ্যে বসে ঠোকরায় আমাকে। বলে, “শেষ কর, শেষ কর।”

এখান থেকে ক্যামাক স্ট্রিট কাছেই। সেখানে গিয়ে তার পর বাড়ি যেতে হবে আমাকে। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, সানিলাকে তুলতে হবে আজও। মেয়েটা আমাকে কি নিজের শোফার বানিয়ে ছাড়বে শেষমেশ!

সানিলা এখন কথা বলে আমার সঙ্গে। মানে সারাক্ষণ নয়, তবে মাঝেমাঝে। আমি নিজে থেকে কিছু বলি না সে ভাবে। আসলে আমি নিজে থেকে কাউকেই কিছু বলি না। সবার থেকেই একটু সরে থাকি।

সানিলা আজ সকালে আমায় বলেছিল ওকে যেন পৌনে পাঁচটা-পাঁচটা নাগাদ বিসিএল থেকে পিক-আপ করে নিই। ও যে ওখানে কী করছে, সেটা যদিও আমি জানি না।

কলকাতার এই নিউ মার্কেট অঞ্চলটা বেশ কনজেস্টেড। গাড়ি বের করে মেন রোডে যেতেই কিছুটা সময় লেগে গেল।

মেন রোডেও বেশ ভিড়। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশে রোদ নেই তেমন। বরং একটু মেঘ আছে। সঙ্গে হাওয়া দিচ্ছে বেশ। গাছের পাতা নড়ছে। আমি এসিটা বন্ধ করে গাড়ির কাচ নামিয়ে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে এক বলক হাওয়া এসে ঢুকল। কলকাতায় মেঘ ঢুকছে। ভিক্টোরিয়ার ও দিক থেকে মেঘ আসছে। ভাবলাম, বৃষ্টি হবে কি? অনেক দিন কলকাতায় বৃষ্টি হয় না। কলকাতায় বড় ধুলো। গাছপালা, বাড়ির কাচ, গাড়ির গায়ে সব জায়গায় ধুলোর পাতলা একটা চাদর জড়িয়ে থাকে সব সময়। শুধু বৃষ্টি হলে কলকাতা বেশ ঝকঝকে হয়ে ওঠে। ইউরোপের শহরগুলো পরিষ্কার ওখানে মাঝেমাঝে বৃষ্টি হয় বলেই। এখানে কেন যে এমন হয় না! অবশ্য একটা দিকে ভালই যে, হয় না। ফুটপাথে থাকে যে সব মানুষ, তাদের খুব অসুবিধে হয় বৃষ্টিতে।

সানিলা আজও ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিল। হাওয়ায় চুল উড়ছে ওর। আজ জিনিস আর টি-শার্ট পরে আছে। বিয়াল্লিশ বছর বয়স হলেও দেখলে মনে হয় মিড থার্ডিজ চলছে। খাওয়ার ব্যাপারে খুবই কনশাস মেয়েটা। বাড়িতে খেতে বসে লক্ষ্য করেছে। সকালে ব্যায়ামও করে। এই মেয়ে সুইসাইড করতে গিয়েছিল? কেন? মানুষকে সত্যি বোঝা দায়। কে যে কখন কী করবে। তার সঙ্গে এই মনখারাপ ব্যাপারটা খুবই সাংঘাতিক। আসলে মনকে তো ধরা যায় না। দেখাও যায় না। তাই তাকে নিয়েই গোল বাঁধে বেশি। আর আমরা এখানে মনকেই পাশা দিই না সে ভাবে। নিজের ছাড়া অন্যের মনের কষ্টকে বিলাসিতা বা ন্যাকামো বলে বাতিল করে দিই। মনের জন্য কোনও প্রফেশনালকে দেখালে

লোকে বলে পাগলের ডাক্তারের কাছে গিয়েছে। আমরা একটা আশ্চর্য গোষ্ঠী। মাঝেমাঝে ভাবলে হাসি পায়।

“একা একা হাসছ কেন?” সানিলা ভুরু কঁচকে গাড়ির দরজা খুলে সামনে বসে জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, “আরে, না না এমনি।”

সানিলা পেছনে ঘুরে সিটে ব্যাগটা রেখে থমকে গেল। দেখল পেছনের সিটে একটা টিফিন-বক্স রাখা আছে।

টিফিন-বক্সটা নিয়ে ঘুরে বসল সানিলা। বলল, “এটা কী?”

তবে আমার উত্তরের অপেক্ষা করল না। খুলে ফেলল, “আরে, আচার।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “একটা কথা, তুমি এত ভাল বাংলা শিখলে কোথা থেকে?”

আচারের পাশে একটা ছোট্ট স্টিলের চামচ। সেটা দিয়ে একটু আচার তুলে মুখে দিয়ে সানিলা বলল, “আমি লাস্ট আট বছর কলকাতায় আছি। আফটার মাই ডিভোর্স আমি কলকাতায় চলে এসেছিলাম একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ নিয়ে। এইট ইয়ারস একটা জায়গায় থাকলে ভাষা জানব না। আর আমরা সাউথ ইন্ডিয়ানরা মাল্টিলিঙ্গুয়াল হই। ডোন্ট ইউ নো দ্যাট?”

আমি হাসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, “আট বছর?”

“হ্যাঁ। তোমাদের অফিসেও গিয়েছি বাবার সঙ্গে। এ ছাড়াও তোমাকে দেখেছি কয়েকবার।”

“সে কী!” আমি ঘুরে বসলাম একটু, “তা হলে যোগাযোগ করোনি কেন?”

সানিলা বলল, “কার সঙ্গে? যে কোনও কিছু না জানিয়ে এক রাতের মধ্যে পালিয়ে যায়, তার সঙ্গে? যাকে আমি বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করাব বলেছিলাম। যার জন্য খাবার করে নিয়ে যেতাম। যার সঙ্গে বর্নার ধারে... তার সঙ্গে? কার সঙ্গে নো? কোন তুমিটা আসল তুমি? কার সঙ্গে যোগাযোগ করব?”

আমি কিছু না বলে মাথা নামিয়ে নিলাম। বুঝলাম সানিলা আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

“বাদ দাও, কেউ কেউ থাকে এমন। ইরেস্পনসিবল। গোস্টিং করে। অন্যের মনের কোনও গুরুত্ব নেই তাদের কাছে।” সানিলা মাথা নেড়ে যেন জোর করেই হাসল। তার পর আর-একটু আচার খেয়ে বলল, “দারুণ করেছে। তা, নতুন এই টিফিন-বক্সের বান্ধবীটি কে? নাকি ওল্ড ওয়াইন পৌষালি?”

আমি ছোট্ট করে বললাম, “টিফিপিসি। মানে, বাবা যাকে...”

“আই অ্যাডমায়ার আঙ্কল। উনি দারুণ কাজ করেছেন। মানে, বিয়েটা আই মিন,” সানিলা জোরের সঙ্গে বলল।

আমি আর কিছু না বলে গাড়ি স্টার্ট করলাম। ও তো আর বাবাকে চেনে না। তাই এ ভাবে বলছে। চিনলে কিছুতেই বলত না। তবে এ সব নিয়ে বলতে গেলে বেকার ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। কারণ, সানিলার কথার মধ্যে একটা ‘ঝগড়া করতে চাই’ টাইপের ভাইভ পাচ্ছি আমি।

ঝগড়াঝাঁটি করতে একদম পারি না আমি। কথার পিঠে কথা বলাটা একটা আর্ট আর স্কিল। সেটা আমার নেই। আমি জানি। কেউ ঝগড়া করতে চাইলে আমার মনের মধ্যেটা পুরো ব্ল্যাক হয়ে যায়। পাল্টা কী যে বলব বুঝতে পারি না। কোনও যুক্তি কাজ করে না। খালি মনে হয় উল্টোদিকের জন সব অকাটা কথা বলছে। পরে, রাতে একা-একা যখন থাকি, তখন কাউন্টার-লজিকগুলো সব মনে পড়ে যায়। মনে হয় এটা বললে হত, ওটা বললে হত। আর কী অস্থির লাগে। নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে করে। তাই পারতপক্ষে আমি কারও সঙ্গে তর্কাতর্কিতে যেতে চাই না।

সানিলা বলল, “গড়িয়াহাট হয়ে যাবে একটু? হিন্দুস্থান পার্ক আর কী। বাবার জন্মদিন। আমি কুর্তা পাজামা কিনব।”

আমি ‘হ্যাঁ’ বলে গাড়িটা এগোতে গোলাম, কিন্তু আচমকা গড়গড় শব্দ তুলে ডান দিক দিয়ে একটা বড় বিদেশি বাইক গোঁতা খেয়ে এসে

দাঁড়াল আমার পথ আটকে। আমি ঘাবড়ে গিয়ে গাড়িটা ব্রেক করে দাঁড় করলাম কোনও মতে। কে এটা? উজবুক নাকি! এফুনি একটা বড় অ্যান্ড্রিডেন্ট হয়ে যেত।

আমি কিছু বলতে গিয়েও পারলাম না। দেখলাম, আমার পাশে বসে সানিলা কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল। আর যে-লোকটা বাইকটা দাঁড় করিয়েছিল, সে বাইকটাকে সাইড-স্ট্যান্ড করিয়ে প্রায় দৌড়ে এল আমাদের গাড়ির দিকে।

তার পর চিৎকার করে বলল, “সানিলা প্লিজ, প্লিজ সানিলা, আমার সঙ্গে কথা বলো। প্লিজ। আমায় এ ভাবে আউট করে দিয়ে না। প্লিজ।” লোকটার বয়স হয়েছে। মাথার চুল কাঁচা-পাকা। চাপ দাড়ি। দুই হাতে ট্যাটু। কে লোকটা? আমি হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

লোকটা এবার আমার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে সানিলাকে বলল, “ও, হি ইজ দ্য গাই, না? এর জন্য তুমি আমার সঙ্গে এরকম করছ? এর জন্য?”

আমি থতমত খেয়ে গোলাম। আমার মনের মধ্যেটা আবার ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আর আমি বুঝতে পারছি ঝগড়াঝাঁটি করার স্কিল ছাড়া মানুষ হল আসলে দাঁত ছাড়া ফোকলা পিরানহা মাছ।

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

‘It may be prodigious, but it’s all Greek to me!’

বাড়িটা ওই দূরে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওখানে যাওয়ার পথের পাশে ছোট ছোট কত রঙের যে ফুল ফুটে আছে। এই পথে আমি আগে আসিনি, তাও কেন যে মনে হচ্ছে এই পথের সব কিছুই আমার চেনা। বাড়ির সামনে একটা লাল রঙের গেট। তার ওপর বোগেনভেলিয়া গাছ বেয়ে উঠেছে। গোলাপি-সাদা কাগজ ফুল পড়ে আছে গেটের সামনে। আমি সেই ফুল মাড়িয়ে, লাল গেট খুলে, বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকলাম। দেখলাম, সামনে কী সুন্দর একটা উঠোন। উঠোনের পাশে একটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট। সেখানে দুটো রোলার রাখা আছে। নীল রোলার, লাল রোলার। রোদ এসে পড়েছে সেখানে। আর সেই রোদের ভেতর একটা মাদুরের ওপর তামি বসে আছে। কানে ইয়ারফোন। তামি হাসছে। অল্প অল্প মাথা নাড়ছে। তামি গান শুনছে। দেখলাম, পিসি বেরিয়ে এল বাড়ির ভেতর থেকে। হাতে ট্রে। কী একটা খাবারের বাটি এগিয়ে দিল তামিকে। আমি গিয়ে দাঁড়লাম ওদের পাশে। কিন্তু কেউ দেখতে পেল না আমাকে। আমি আরও এগোলাম। উঠোন থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম বারান্দায়। দেখলাম সেখানে টুপুন খেলছে। হাতে একটা বল দেওয়ালে ছুড়ে দিচ্ছে, আবার সেটা ফিরে এলে দু’হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে। আমি দাঁড়লাম টুপুনের সামনে। না, টুপুনও দেখতে পেল না আমায়। বাড়ির ভেতর থেকে কিসের শব্দ আসছে? আমি এগোলাম বাড়ির ভেতরে। দেখলাম কাকু একটা পুরনো গ্রামোফোনের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। আমি কাকুর সামনে গিয়ে দাঁড়লাম। না, কাকুও দেখতে পেল না আমায়। দেখলাম, লালু নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। লালুর কানেও ইয়ারফোন। লালুও গান শুনছে। এই বাড়িটা তো আমাদের নয়। তা হলে এখানে আমার পরিচিত লোকজন রয়েছে কেন? আর বাড়িটা কি দোতলা? পালিশ করা কাঠের সিঁড়ি ওই তে ডোত গিয়েছে ওপরে। আমি পায়ে পায়ে উঠলাম ওপরে। দোতলায় কী সুন্দর লাল মেঝে। আলো পড়ে চকচক করছে। চৌকা একটা ঘরের চারিদিকে আরও সব ঘর। সেখানে হালকা গোলাপি নেটের পর্দা ঝুলছে। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে গোলাম সেই ঘরের দিকে। পর্দার আড়ালে ওটা কে বসে রয়েছে ঘরে? পর্দা সরিয়ে আমি এগিয়ে গোলাম। দেখলাম, পুরনো দিনের একটা পালঙ্ক আর সেখানে বসে রয়েছে সানিলা। আজ লাল পাড় আর হলুদ জমির শাড়ি পরে আছে ও। ওর চুলটা ছোট করে কাটা। সামনে ল্যাপটপ খোলা আর পাশে একটা গিটার। সানিলা গান করে? হ্যাঁ, গান করে তো। মনে পড়ল আমার। আমি এগিয়ে গোলাম আর সানিলা মুখ তুলে তাকাল। বড় বড় চোখ। ছোট করবী ফুলের পাপড়ির

মতো ঠোঁট। গালে ছোট্ট এক ফোঁটা বাদামি তিল। সানিলা আমায় দেখে হাসল। তার পর সুন্দর হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আর চোখ খুলে উঠে বসলাম আমি।

ক'টা বাজে এখন? কোথায় আছি আমি?

স্বপ্নের সেই সুন্দর বাড়িটা থেকে আমাদের সল্টলেকের বাড়িতে ফিরে আসতে সামান্য সময় লাগল আমার। এটা কী দেখলাম আমি? ওটা কার বাড়ি ছিল? কেন সানিলা ছাড়া কেউ আমায় দেখতে পাচ্ছিল না। আমি চোখ বন্ধ করলাম আবার। আর আবার সামনে ভেসে উঠল নেটের হালকা গোলাপি পর্দা। তার ওই দিকে সানিলা বসে আছে। আমি চোখ খুললাম। এটা কী হচ্ছে! সানিলাকে দেখে এমন লাগছে কেন আমার? এই তো গতকালও বাড়ি ফিরলাম এক সঙ্গে। তখন তো কিছু মনে হল না। তা হলে এখন এমন লাগছে কেন? মানুষের মধ্যে কি ডুবো-পাহাড় থাকে।

আমি মাথা ঝাঁকলাম। স্বপ্নটা যেন জড়িয়ে আছে চুলের মধ্যে। যেন মাথা ঝাঁকিয়ে ঝেড়ে ফেলতে হবে আমায়।

ক'টা বাজে? আমি দেওয়ালের ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে দশটা। ওরে বাবা, অনেকটা সকাল গড়িয়ে গিয়েছে। আমি যেন সত্যি সত্যি এই পৃথিবীতে ফিরে এলাম এবার। আর তখনই বুঝলাম বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। কাল শেষরাতের দিকে শুরু হয়েছিল বৃষ্টিটা। এখনও হয়ে চলেছে। একটা ডিপ্রেসন হয়েছে শুনেছি। ক'দিন চলবে কে জানে!

আমি দেখলাম, আমার বিছানার একপাশে ল্যাপটপটা খোলা আছে। জ্বিন কালো। মনে পড়ল আজ ভোর অবধি লিখছিলাম। তার পর পিঠটা একটু টান করতে গিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি। মনে হল, লেখাটা সেভ করেছি তো?

আমার লেখার ল্যাপটপটা অনেক পুরনো। স্লো হয়ে গিয়েছে। কি-বোর্ডের একটা 'কি' লুজ। ব্যাটারি ব্যাকআপও প্রায় নেই। তাও ছাড়তে পারি না। পুরনো জিনিসের ওপর আমার এই মায়াটা ভাল নয়, বুঝি। কিন্তু কাটাতে পারছি না কিছুতেই।

আমি ল্যাপটপটা চালু করলাম একবার। দেখি কাল রাতে লেখাটা সেভ করেছি কি না।

আমার বন্ধ ল্যাপটপ সময় নিয়ে ঘুম থেকে জাগল। দেখলাম। না, ঠিক আছে সব। ল্যাপটপ বন্ধ করে আমি বিছানা থেকে নামলাম এবার।

আজ শনিবার। অফিস ছুটি। সারা দিন লেখা ছাড়া আর অন্য কাজ নেই। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। তাই হয়তো একটা পাতলা শিরশিরে ঠান্ডার চাদর জড়িয়ে আছে হাওয়ায়। আমি ঘরের লাগোয়া বাথরুমে ঢুকলাম।

ফ্রেশ হয়ে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে নিলাম একেবারে। তার পর একটা ট্রাক প্যান্ট আর টি-শার্ট পরে নিলাম। দরজার কাছে গিয়ে ডাকলাম, “লালু।”

লালু এল একটু পরে। হাতের প্লেটে দুটো টোস্ট। আমি সকালে এটা খাই শুধু।

লালু জিজ্ঞেস করল, “সানিলাদিদি উপমা বানিয়েছে। খাবে?”

সানিলা এখানে আবার রান্না করছে নাকি? আমি অবাক হলাম। এত দিন তো করেনি।

লালু আবার বলল, “নীচে গিয়ে খাও। পিসিদিদি ডাকছে। ক'টা বাজে দেখেছ?”

আমি হাসলাম। সব জায়গায় সবাই আমাকে বকে। এমনকি, বাড়ির কাজের ছেলেরাও ছাড়ে না।

আমি প্লেটটা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে খাবারের ঘরে গেলাম। আরে, কে এসেছে? আমি থমকে গেলাম একটু। তার পর বুঝলাম এ যে বাবিকাকু। কত দিন পরে দেখলাম। মাথার চুল উঠে গিয়েছে সব। গোঁফটাও পাকা। বঁটেখাটো মানুষটা একটু মোটা হয়েছে। কিন্তু এখনও হাসিখুশি ভাবটা পাল্টায়নি।

বাবিকাকু আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। যেন আমি স্কুলের হেডস্যার। আমি হাসলাম। দেখলাম, খাবারের টেবিলে রিতু, ছোট্ট আর টুপন ছাড়া সবাই আছে। রিতু আর ছোট্ট হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত।

ওদের কাজের চাপ খুব। ডাক্তাররা খুব ব্যস্ত হয়।

আমি চেয়ার টেনে সানিলার পাশে বসলাম। কিন্তু ও তাকাল না আমার দিকে। আমি চোয়াল শক্ত করে নিলাম। আর মনের মধ্যে দুলে উঠল পাতলা নেটের একটা গোলাপি পর্দা।

দেখলাম, বাবিকাকুর সঙ্গে হেসে-হেসেই কথা বলছে কাকু। আমার ভাল লাগল। সময় সত্যিই কত কিছু যে বদলে দেয়।

পিসির দিকে তাকলাম আমি। দেখলাম, পিসির মুখে একটা পাতলা লাজুক হাসি। পাথরে সত্যিই ফুল ফোটে।

পিসি জিজ্ঞেস করল, “কী রে উপমা খাবি? সানিলা বানিয়েছে।”

আমি টোস্টে কামড় দিয়ে চিবোতে চিবোতে বললাম, “নাঃ, ইচ্ছে করছে না।”

আর বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার থাইতে কুটুস করে জোরে চিমটি কাটল সানিলা। আমি ‘আঃ’ বলে চমকে উঠলাম।

“কী হল?” কাকু আর পিসি চমকে উঠল।

আমি বললাম, “কিছু না... কী একটা লাগল... পায়ে টান... ইয়ে মানে... কিছু না।”

দেখলাম, টেবিলের মাঝে রাখা কাচের বড় বোতল-টা টেনে নিয়ে সেখান থেকে কিছুটা উপমা প্লেটে বেড়ে আমার সামনে রাখল সানিলা। তার পর বড় বড় চোখ মেলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

আমি হাসলাম। মানে, আর কী করব বুঝতে পারলাম না। আমার বুকের মধ্যে আশ্চর্য একটা কষ্ট হচ্ছে। আনন্দ হচ্ছে। যেন বহু পুরনো আর বিপজ্জনক বাড়ির রেলিং-ভাঙা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। আর সেই বারান্দাটা যেন যে-কোনও সময়ে ভেঙে পড়বে পড়বে ভাব।

এ কী হচ্ছে আমার সঙ্গে? আমি আড়চোখে একবার সানিলাকে দেখলাম। ও হাসছে কাকুর কী একটা কথায়। ওই তো বাদামি এক ফোঁটা তিল। ওর গা থেকে কী সুন্দর ল্যাভেন্ডারের গন্ধ ভেসে আসছে। সানিলার চুলটা বেশ বড়। আমার মনে হল সানিলা ছোট করে চুল কাটায় না কেন!

কাকু বলল, “রনো, তাকে একটা ব্যাপার বলার ছিল।”

আমি উপমাটা চামচ দিয়ে খেতে খেতে মাথা নাড়লাম। মানে, আমি শুনতে প্রস্তুত।

কাকু বলল, “বাবি তো সাউথ থেকে ফিরে এসেছে কলকাতায়। মানে পার্মানেন্টলি। হি ইজ ফিফটি এইট নাউ। হিন্দুস্থান পার্কে থাকে। একাই। ও এখন তুলিকে বিয়ে করতে চায়। তুই কী বলিস?”

আমি আবার কী বলব? শুধু মনে হল এই গল্পটা বয়স্কদের প্রেমের গল্প হয়ে যাচ্ছে পুরো। অল্পবয়সিরা লিভ-ইন করতে চাইছে আর বয়স্কদের মধ্যে ‘বিয়ে করব বিয়ে করব’ বলে ধুম-ধ্বি লেগেছে।

আমি ইচ্ছে করে সময় নিলাম। এমন ভাব করলাম যেন গভীর ভাবে চিন্তা করছি ব্যাপারটা নিয়ে। আমিই যেন পিসির বাবা, মানে আমার ঠাকুরদা।

আবার পায়ে কুটুস করে চিমটি কাটল সানিলা। আমি অবাক হয়ে তাকলাম ওর দিকে। মেয়েটা এমন করছে কেন? তখন থেকে সবার অলক্ষ্যে এ ভাবে চিমটি কাটছে কেন?

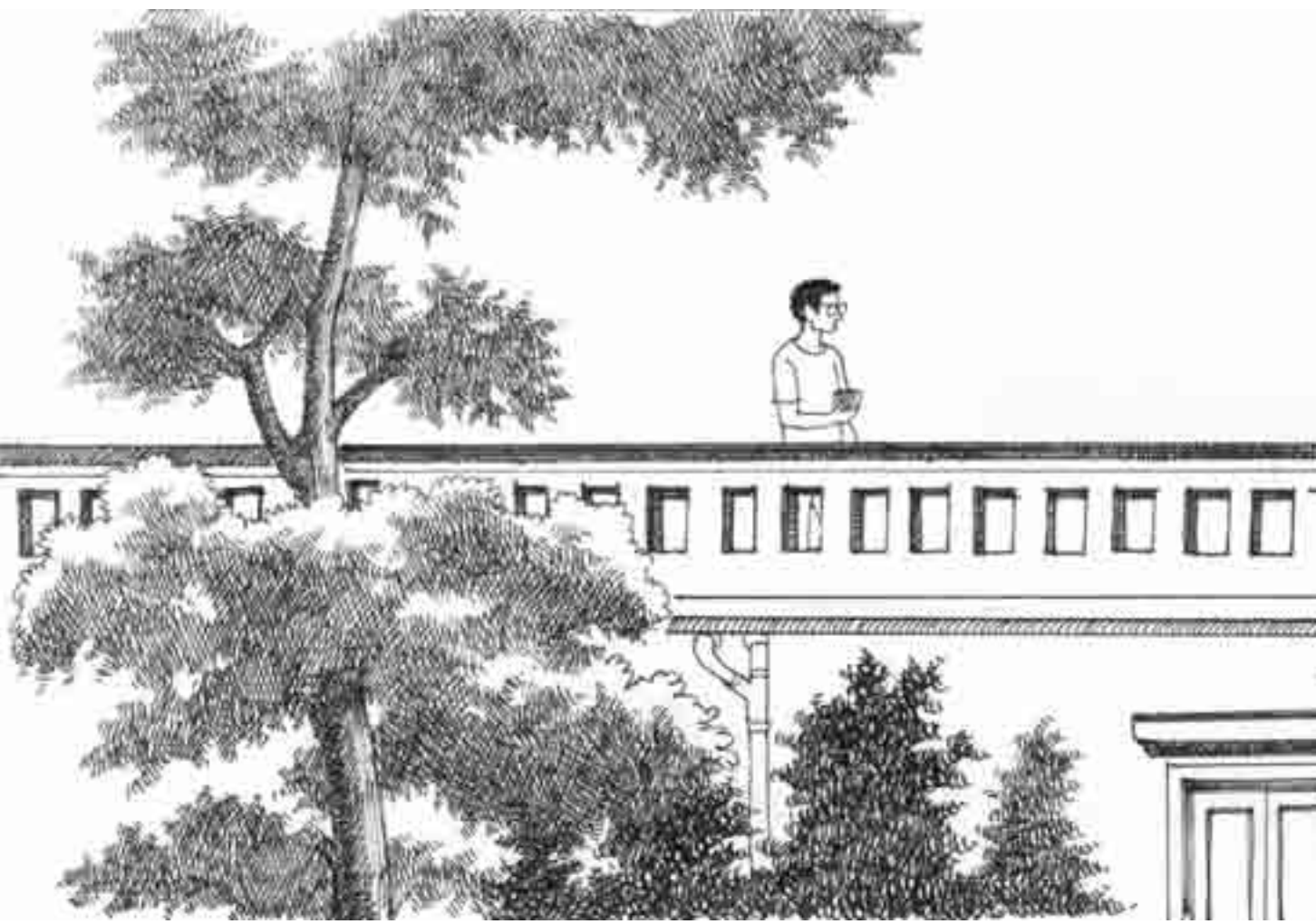
সানিলা স্বাভাবিক গলায় বলল, “উত্তর দাও। হোয়াই আর ইউ টেকিং সো মাচ টাইম?”

আমি পিসিকে দেখলাম। আরে, পিসি এমন কুড়ি বছরের মেয়ে হয়ে গেল কী ভাবে?

আমি চোয়াল শক্ত করে গভীর গলায় বাবিকাকুকে বললাম, “আমাদের বাড়ির মেয়ে। খুব যত্নে মানুষ। আপনি কত রোজগার করেন মাসে? পারবেন তো সামলাতে?”

কথাটা বলেই আমি টেবিলের তলা দিয়ে খপ করে সানিলার হাতটা চেপে ধরলাম।

বাবিকাকু সিরিয়াস মুখ করে বলল, “মানে রনো, আমি ভালই রোজগার করি। তুলির কোনও অসুবিধে হবে না। তুমি কি জানো মানে উই হ্যাভ আ হিষ্ট্রি। সেই কলেজ থেকে...”



“আরে, তুমি চুপ করো,” কাকু বাবিকাকুকে ধমকে থামিয়ে দিল, “রনো ইয়াকি মারছে।”

“ও তাই?” বাবিকাকুর বৃকের ওপর থেকে যেন হিমালয় নামল। এমন করে শ্বাস নিল যেন বাইশ বছর বাবিকাকুকে শ্বাস নিতে দেওয়া হয়নি।

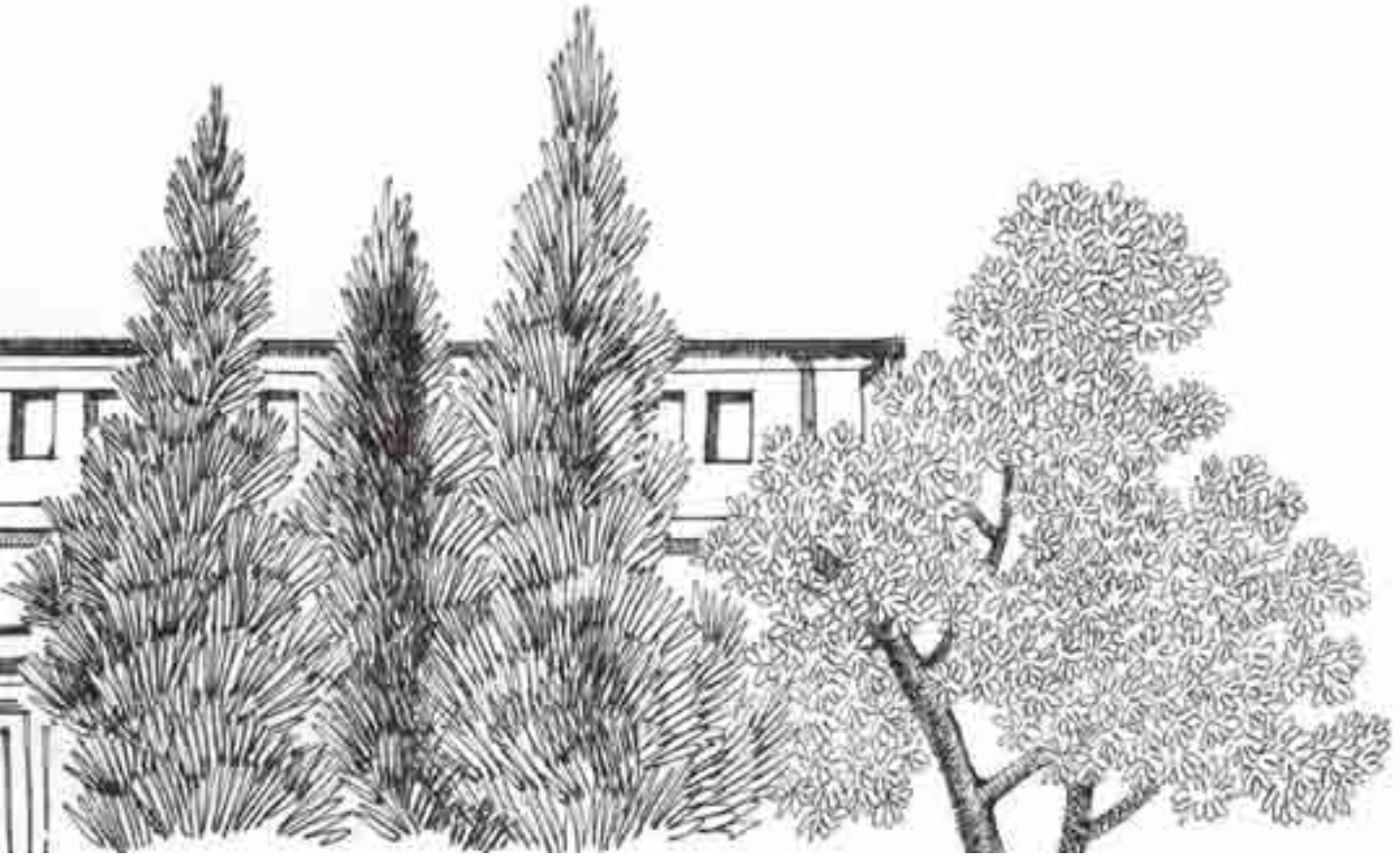
বাবিকাকু তাকাল আমার দিকে। তার পর বলল, “সেই কলেজে ওকে দেখেছিলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত। আর আমি বি কম অনার্স। ওদের কলেজে গিয়েছিলাম এক বন্ধুর সঙ্গে। কী একটা ফাংশন ছিল সে দিন। আর তুলি সেখানে গান গাইছিল। ‘গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে’। জানো রনো, সেই থেকে আজ অবধি আমি তোমার পিসির জন্য গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমাকে তোমার ঠাকুরদা তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। আমি কিছু মনেই করিনি। তুলিকে বলেছিলাম পৃথিবীতে যে খুশি আমায় তাড়িয়ে দিক, আমার কিছু মনে হবে না। শুধু তুমি তাড়িয়ে দিলে আমি সত্যি চলে যাব। তুলিও ওর বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে আমায় বলেছিল, সব শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি যেন চলে যাই। আমি তাই সব ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। এখনকার জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের কাছে ব্যাপারটা খুব বোকা বোকা লাগবে জানি। আমার অনেক বন্ধুরাও বলেছে যে, আমি বোকামো করছি। বলেছে দেয়ার আর প্লেস্টি অফ ফিশ ইন দ্য ওয়াটার। কিন্তু আমি কি ভাই মাছ ধরতে বেরিয়েছি? সারা জীবন এমন একটা প্রেমই আমি চেয়েছিলাম। জি তোড় পেয়ার। তবে পরের জন্মে সত্যি বলছি আর এমন চাই না। খুব কষ্ট রে ভাই। যাই হোক, রিসেন্টলি কলকাতায় ফিরেছি। পার্মানেন্টলি। আবার নিজে থেকেই যোগাযোগ করেছিলাম তুলির

সঙ্গে... তখন...”

“মিথ্যে কথা বোলো না,” পিসি গম্ভীর গলায় বলল, “ও যোগাযোগ করেনি রনো। আমি করেছিলাম। ফেসবুকে আমাদের বন্ধুদের গ্রুপে একটা গেট টুগেদারে আচমকা দেখি ওকে। মাথার চুল সব উঠে গিয়েছে। মোটা হয়েছে। আর পাকা গোঁফ। কিন্তু হাসিটা আর চোখ দুটো একই আছে। সেই ফার্স্ট ইয়ারের মতো। আমিই তখন ওর নাম্বার জোগাড় করে ফোন করেছিলাম। আমি নিজে যখন ওকে চলে যেতে বলেছিলাম, তখন আমার নিজেরই তো ওকে ডাকা উচিত, তাই না। আর ও এক কথার মানুষ। কেউ সরতে বললেও ও সরেনি। কিন্তু আমি যেই বলেছি অমনি... ভাব, মোর দ্যান থাটি ইয়ারস। আমি তো ভেবেছিলাম বিয়ে করে নিয়েছে। কিন্তু শুনি করেনি।”

আমি কী বলব বুঝতে পারছি না। কথা বলতে বলতে পিসির গলা বুজে এসেছে। স্বাভাবিক। একটা জীবন এ ভাবে কেটে গেল যে। একবারই মাত্র বাঁচার সুযোগ। সেটাও যে নষ্ট হয়ে গেল অনেকটা। আমার চোখেও জল এল কি? গলার কাছে ব্যথা করছে। কোনও কারণ নেই, কিন্তু অন্যের চোখে জল দেখলে আমারও চোখে জল চলে আসে। আমার কত যে বদ অভ্যেস আছে। আপনাদের কাছে সব বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমি দেখেছি মানুষের যত বয়স বাড়়ে, সে তত একা হতে থাকে। এ পৃথিবী আসলে নিষ্ঠুর। ঘোর মতলবি। অধিকাংশ মানুষকে সে টাকা রোজগার করা দিয়ে মাপে। মাপে এই ভাবে যে, সে পৃথিবীর সঙ্গে গতি মিলিয়ে চলতে পারছে কি না। বয়স হয়ে গেলে রোজগার বা জীবনের গতি সবই শ্লথ হয়ে আসে। আর পৃথিবী তখন তাকে আস্তে আস্তে লাস্ট বেঞ্চার দিকে ঠেলে তাকে।



নানা পার্কে, লেকে, বৃদ্ধাশ্রমে, ফ্ল্যাটবাড়ির নির্জন বারান্দায় আমি এই লাস্ট বেঞ্চে মাথা নিচু করে বসে থাকা মানুষজনকে দেখেছি। দেখেছি তাদের শূন্য দৃষ্টি। মনে হয়েছে নির্জন কোনও গ্রহে তারা একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হয়েছে এক সময়ের বলমলানো রাজবাড়িটা আজ কেমন যেন মলিন, অবহেলিত। কেউ নেই তার সঙ্গে কথা বলার। ভালবাসার। অসময়ে তার হাতটা ধরার। ‘আমি আছি’ এই ভরসা দেওয়ার। আমার মনে হয় যে সব বয়স্ক মানুষ একা থাকেন, তাঁদের সবার এক জন করে সঙ্গী দরকার। সে বিয়ে করেই হোক বা না-করেই হোক। জীবনের শেষদিন অবধি কেউ হাত ধরুক, এমন একজন সঙ্গী সবার কাছে থাকা খুব দরকার।

আমি খাওয়া শেষ করে উঠলাম। নিজের ঘরে যাব। শুধু তার আগে বললাম, “তোমরা বিয়ে করে নাও। আর সময় নষ্ট করো না।”

বাবিকাকু আমতা আমতা করে বলল, “আসলে, দাদা মানে, তোমার বাবা... ইয়ে... উনি যদি হ্যাঁ বলতেন একবার।”

আমি কী বলব একে। বাবিকাকু খুব ভাল মানুষ। কিন্তু বুঝলাম, এত ভাল হওয়াও খুব খারাপ।

আমি পিসির দিকে তাকালাম। এমনিতে আজকাল বাবার ব্যাপার উঠলেই পিসি রেগে যায়। কিন্তু এখন বাবিকাকুর সামনে কেমন যেন লাজুক মুখে বসে রইল।

আমি বিরক্ত হলাম, ‘তুমি’ করে বললাম, “তোমাদের লাইফ। বাবা কী বলবে? তোমাদের যা ঠিক লাগে তাই করবে।”

“না, মানে উনি গুরুজন,” বাবিকাকু গদগদ গলায় বলল। এই লোকটা দেখছি দরকারের চেয়েও আঠারো ইঞ্চি বেশি ভদ্র।

বাবিকাকু তো জানে না, বাবা নিজের বেলায় আমেরিকান, কিন্তু অন্যের বেলায় মধ্যযুগে পড়ে থাকা পাবলিক। অন্যকে চাপে রেখে কষ্ট দিতে খুব মজা পায়। এর মাধ্যমেই নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, “কারও আশায় থেকো না বাবিকাকু। সবাই এখানে নিজের ধান্দা গোছাতে ব্যস্ত। তুমি এক কাজ করো, পিসিকে নিয়ে পালিয়ে যাও।”

“আমি পালাব কেন?” পিসি ফোঁস করে উঠল।

“না না এমনি বললাম,” আমি বুঝলাম এখানে আর থাকা রিস্ক হয়ে যাবে। বললাম, “আমি একটু ওপরে যাই। কাজ আছে। তোমরা কথা বলো।”

সানিলা তাকাল আমার দিকে। তার পর বলল, “আবার পালাচ্ছে।” হ্যাঁ আমি পালাই। সব কিছুর থেকে আমি পালিয়ে থাকি। মানুষজনকে আমি ঠিক সামলাতে পারি না। তাদের ঠিক গুছিয়ে রাখতে পারি না। ভয় লাগে আমার। কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেলব ভেবে ভয় লাগে। আমি নিজে কষ্ট পাব ভেবে ভয় লাগে। বেকার অশান্তি হবে ভেবে ভয় লাগে। তাই আমার ব্যবহার দেখে সানিলা বলে, আমি পালিয়ে যাই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আমার মনে পড়ল গতকালের কথা। সেই যে আগের অধ্যায়ে একটা হুক ছেড়ে এসেছিলাম, সেই একটা ট্যাটু করা কাঁচা-পাকা লোক বিশাল বিদেশি বাইক নিয়ে আমার গাড়ি আটকে লাফিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। আমাকে দেখে সানিলাকে অভিযোগ করেছিল যে, সানিলা নাকি আমার জন্য তার সঙ্গে এমন করছে। হ্যাঁ, সেই কথাটাই মনে পড়ল। ওখানেও আমি চুপ করে গিয়েছিলাম। পালাতে ইচ্ছে করছিল খুব।

সানিলা গাড়ি থেকে নেমে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। তার পর বলেছিল, “ভিগ্লেস, ডোন্ট ক্রিয়েট আ সিন হিয়ার।” তার পর আমায় দেখিয়ে বলেছিল, “ই হিঁজ নো ওয়ান। জাস্ট অ্যাকোয়েন্টেন্স। তুমি আমার থেকে দূরে থাকো। একবার থানায় জানিয়েছি। এবার লিগালি আমায় তোমার এগেনস্টে রিস্ট্রেনিং অর্ডার নিতে হবে।”

ভিগ্লেস বলেছিল, “আমার ভুল হয়েছে নিলা। ডোন্ট ডু দ্যাট। আই লাভ ইউ। ছ’বছর আমার একসঙ্গে আছি। আর সেখানে তুমি এ ভাবে...”

“বাইক সরাও,” সানিলা বলেছিল, “আমাদের যেতে হবে। সরাও।”

“সরাব না।” ভিগ্লেস জেদের গলায় বলেছিল।

আমি দেখছিলাম আশপাশে কৌতূহলী জনগণ বাড়ছে। সবার মুখে একটা মজা লাগছে ভাব।

আমি আর না পেরে গাড়ি থেকে নেমে সানিলাকে বলেছিলাম, “আমি গাড়ি ব্যাক করে বেরিয়ে যাচ্ছি। এসো।”

“আমরা কেন গাড়ি সরাব?” সানিলা চোয়াল শক্ত করে তাকিয়েছিল আমার দিকে।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে বসে গাড়ি ব্যাক করে নিয়ে বলেছিলাম, “সানিলা, প্লিজ।”

সানিলা ওই ভিগ্লেসের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, “আমার সামনে আর আসবে না।”

ভিগ্লেস বলেছিল, “আই নো ইউ লাভ মি। ইউ আর ক্রেজি আবাইউট মি। আমি জানি তুমি ফিরে আসবে আমার কাছে। আমি তোমাকে আমার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করব, দেখো।”

সানিলা কিছু না বলে গাড়িতে উঠে এসে বসেছিল। আমি গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম ওই নাটকের মধ্য থেকে। রিয়ার ভিউ মিররে দেখেছিলাম, ভিগ্লেস তাকিয়ে আছে আমার গাড়িটার দিকে।

আমি চুপ করেই ছিলাম। কথা বলছিলাম না। কী বলব আর। মেয়ে যোর লেগে যাওয়া কলকাতার মধ্য দিয়ে একেবেঁকে গাড়ি চালাচ্ছিলাম শুধু। আমাদের দু’জনের মধ্যে নীরবতার একটা দেওয়াল উঠে গিয়েছিল যেন।

সেই দেওয়াল ভেঙে সানিলাই প্রথম কথা বলেছিল। বলেছিল, “আমি ভিগ্লেসের সঙ্গে ছ’বছর লিভ ইন করেছি। ও বিয়েতে বিশ্বাস করে না। তার মধ্যে দু’বার ওকে আমি অন্য মেয়ের সঙ্গে বিছানায় ধরেছি। ফার্স্ট টাইম আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এইবার আর নিতে পারিনি। একটা ডিভোর্স। সঙ্গে আবার এমন। আই গট সো আপসেট যে, সুইসাইড করতে গিয়েছিলাম। বাবা ফেল্ট হেল্পলেস। বাবাও অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। তখন তুলি আন্টি কেম টু হেল্প। নাই ইউ নো মাই এন্টার স্টোরি।”

আমি কিছু না বলে চুপ করে ছিলাম। জীবনে কত কী যে হয়! একটু ভাল থাকবে, শান্তিতে থাকবে ভেবেও কেউ সে ভাবে থাকতে পারে না। সবার মধ্যে একটা ছুঁচোবাজি আছে। কে যে কখন কী করে বসবে, সে নিজেই জানে না।

সানিলা আচমকা গলা পাণ্টে বলেছিল, “কিন্তু ইউ হ্যাভ রিমেন্ড দ্য সেম। এক্সপিস্ট। আজও পালিয়ে এলে।”

তিনতলায় ওঠার মাঝপথেই লালু তরতর করে ওপরে উঠে এল, “দাদা, নীচে চলো। কেলেঙ্কারি।”

আবার কী কেলেঙ্কারি হল। আমি ভয়ই পেয়ে গেলাম। এই বাড়িতে সারাক্ষণ এমন ক্রাইসিস চলে কেন। প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে গেলাম আমি।

দেখলাম, কাকুর হাতে মোবাইল। উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার থেকে। মুখ-চোখ লাল।

আমায় জিজ্ঞেস করল, “তোর মোবাইল কই?”

আমি বললাম, “কেন? ওপরে।”

“আরে, দাদার বাড়ির কাজের ছেলেরা ফোন করেছে। দাদা খুব

অসুস্থ। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। এক্ষুনি যেতে হবে।”

বাবা অসুস্থ। আমি হাঁ হয়ে গেলাম। আবার কী হল!

কাকু বলল, “খাচ্ছে না একদম। প্রেশার ফল করে সেন্সলেস হয়ে গিয়েছে।”

আমি যে কী বলব। রাগ হয়ে গেল আমার। বললাম, “লোকটা সারা জীবন এমন করেছে। রাগ আর রাগ। সারা জীবন সবার ওপর রাগ। তার ওপর ছেলেমানুষি। এত বয়স হয়েছে, এখনও এমন। আমি আর পারি না। ভাবলাম টফিপিসির সঙ্গে ভাল থাকবে। কিন্তু সেখানেও গোলমাল বাঁধাল। আমার আর ভাল লাগে না। আমায় কি একটুও শান্তি দেবে না? কেউ কি নেই যে বাবাকে একটু বোঝায়! টফিপিসিকে আবার বাবার কাছে নিয়ে আসে। আমি যে কী করব!”

সানিলা উঠে দাঁড়াল। আমায় বলল, “আপাতত মুখটা বন্ধ করো। বিলাপ করে লাভ নেই কোনও। লেটস গো। চাবিটা আনো। আই’ল ড্রাইভ।”

“তুমি?” আমি আর কী বলব বুঝতে পারলাম না।

“হুয়েস,” সানিলা তাকাল আমার দিকে। তার পর আচমকা আমার হাতটা ধরে টান দিল।

আর, আপনাদের সত্যি বলছি, এমন সময়ও আমার মনের মধ্যটা কেমন একটা করে উঠল। আর, আমি যেন দেখতে পেলাম পাতলা নেটের একটা পর্দা হাওয়ায় অল্প অল্প নড়ছে।

দশ

‘We can’t go back, not now... Not now.’

পিসির সঙ্গে রাও সাহেব মানে সানিলার বাবার দীর্ঘদিনের পরিচয়। রাও সাহেবের বয়স আমার বাবার মতোই। এত দিনে রিটারায়র করে যাওয়ার কথা, কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানি বলে তাঁকে এখনও এক্সটেনশন দিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর শুধু রেখে দেওয়াই নয়, রাও সাহেব এখনও সারা মাসই দেশে-বিদেশে ট্যুর করেন। এখনও দেশের বাইরেই আছেন। তাই সুইসাইডের চেষ্টার পরে, সানিলাকে ওদের বাড়িতে একা রাখার সাহস পাননি।

কিন্তু আপনাদের যেমন আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে যে, সেই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সময়কার একজন সহপাঠিনী কী করে এত বছর পর লাইফে এন্ট্রি নিচ্ছে— এটা কিন্তু আমারও লেগেছিল। তাই আমি সেই নিয়ে পিসিকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম।

তখন পিসি বলেছিল, আমায় যে সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল তার কারণও নাকি রাও সাহেব। সেখানে তাঁর মেয়ে ভর্তি হয়েছিল বলেই নাকি পিসি আমাকেও ব্যাস্কুলোর থেকে অতটা দূরে ভর্তি করিয়েছিল। বোঝো কাণ্ড! কিন্তু কেন যে আমাকে বলা হয়নি যে, সানিলার বাবাকে পিসি চেনে, সেটাই অদ্ভুত ব্যাপার।

জীবনে মাঝেমাঝে এমন নানা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে, যার কারণ আমরা বুঝতে পারি না। আর সত্যি বলতে কী, আমার কয়েক মাসের ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জীবনে আমি পড়াশোনা, র‍্যাগিং, অখাদ্য খাবার-সহ আরও নানা কিছু নিয়ে এতটাই বিব্রত থাকতাম যে, অন্য কোনও দিকে মন দিতে পারিনি সে ভাবে।

সানিলা ছিল ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু ওর সঙ্গে ঠিকমতো আলাপ হওয়ার আগে আমার ওর দিকেও সে ভাবে নজর পড়েনি। শুধু দেখতাম, ক্লাসে একটা মেয়ে চুকলেই অধিকাংশ ছেলেরা হালকা করে ওই দিকে ঘুরে বসছে।

একটা ছেলে ছিল মনে আছে। চিট্রিবারু। আমাদের চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। কিন্তু আমাদের সঙ্গেই পড়ত। সে একবার সবার সামনে সানিলাকে হাঁটু গেড়ে বসে গোলাপ ফুল দিয়েছিল। মানে, বুঝতেই পারছেন ওইখানে এইটিজ নাইন্টিজ-এর রজনীকান্ত, মামুটি, নাগার্জুন, চিরঞ্জীবীরে কমাশিয়াল ছবি দেখে বড় হওয়া ছেলেরা কি আর আল

পাচিনোর মতো শুধু ইনটেন্স লুক দিয়ে যাবে! ফলে যা শিখেছে তাই প্রয়োগ করেছিল। কলেজে একতলা থেকে দোতলায় উঠে যাওয়া সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ হাঁটু গেড়ে গোলাপ ফুল।

সানিলা ফুলটা নিয়ে সোজা ওপর থেকে একতলার হলঘরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। মনে আছে চিট্রি কিছুটা দৌড়ে আর কিছুটা সিঁড়ির রেলিংয়ে স্লাইড করে নেমে এসে, মাটি থেকে তুলে নিয়েছিল সেই গোলাপ ফুল। তার পর সবাইকে অবাক করে ফুলটা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিয়েছিল।

আজ এত দিন পরেও কথাটা মনে পড়ায় আমার হাসি পেয়ে গেল। মানুষ কত কী যে করে!

আজ বৃষ্টির পঞ্চম দিন। ‘আমার কবিতা ছাপুন’ টাইপের গাছে কুঁড়ি আসা কবিদের মতো ঘ্যানঘ্যান করে যাচ্ছে বৃষ্টি। রাস্তাঘাটে জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও নাকি ট্রান্সফর্মার বসে যাচ্ছে ব্যর্থ প্রেমিকের মতো। পালক-ভেজা পায়রারা কার্নিসের বিপজ্জনক কিনারে বসে রয়েছে সার বেঁধে। গোটা কলকাতার মাথার ওপর কে যেন নিচু করে বুলিয়ে দিয়েছে ধূসর রঙের তুলো। চিট্রি-পিট্রি শব্দ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো বেজেই চলেছে একটানা। হেমন্ত যে আচমকা এমন বর্ষার মতো বিহেভ করবে আমরা ভাবতেই পারিনি।

অফিস থেকে ফিরে, খাবার টেবিলে বসে একা একা গোলারুটি খেতে খেতে দেখেছিলাম যে, একপাশে টকটকে লাল গোলাপ ফুলের একটা বড় বোকে পড়ে আছে। আর তখনই আমার এত কিছু মনে পড়ে গেল।

“কী রে লালু তাকে গোলারুটি দিয়েছে? আমি বলেছিলাম চিঁড়ের পালাও করে দিতে। দেয়নি?” পিসি এসে চেয়ার টেনে বসল সামনে।

আমি হেসে বললাম, “আরে, হলেই হল। খাওয়া নিয়ে কথা।”

পিসিকে আজ আবার কেমন যেন লালচে লাগছে। রেগে গেল কেন? অফিসে তো ঠিকই ছিল।

আমি সাবধানে জিজ্ঞেস করলাম, “কিছু হয়েছে?”

পিসি চোয়াল শক্ত করল, “তোর বাবিকাকুটা চিরকাল গাধাই থেকে যাবে।”

এই সেরেছে! বাবিকাকু আবার কী করল? কাকু নাকি পিসেমশাই? আমি বুঝতে পারলাম না আমার সম্বোধনটা পাল্টে ফেলা উচিত কি না। “কেন কী হয়েছে?”

পিসি ভুরু কুঁচকে চিৎকার করে লালুকে চা দিতে বলে আমার দিকে তাকাল। তার পর বলল, “আগে বল তোরা বাপ কেমন আছে? সে কি এখনও দেবদাস হয়ে অন্ন-জল তাগ করে বসে আছে?”

আমি হাসলাম। আমার আবার মনে পড়ে গেল সে দিনের কথা।

আমি গাড়িতে বসে বেশ টেনশন করছিলাম। বাবার কিছু হয়ে যাবে না তো! যাওয়ার আগে আমি অবশ্য দীপ্তেশকাকুকে ফোন করে দিয়েছিলাম। দীপ্তেশকাকু বাবার বন্ধু। আমাদের হাউস ফিজিশিয়ান। বাগমারির কাছেই থাকেন। আমি জানতাম আমার আগে দীপ্তেশকাকু পৌঁছে যাবেন।

তাও আমার ভয় লাগছিল। আসলে আমার আর বাবার সম্পর্কটা এখন উল্টে গিয়েছে। এখন বাবা ছেলে আর আমি বাবা। সারা জীবন ধরে বাবা এমন সব কাণ্ড ঘটিয়েছে যে, কোনও পরিণত মানুষ তা করবে না। এই ব্যাপারটাই ধরুন না। আচমকা বিয়ে করে বসা। আবার সেই স্ত্রীকেই এমন গালাগালি, কথা, ধাক্কা-টাক্কা মারা। ওদিকে স্ত্রী চলে যাওয়ায় আবার কান্নাকাটি করে অন্ন-জল তাগ করা। আপনারাই বলুন, এ সবার কোনও মানে আছে! যাকে ছাড়া আপনার চলবে না তার সঙ্গে কেউ এমন করে। কিন্তু বাবা তো বাবা। সারাক্ষণ একটা লোক কী করে রেগে থাকতে পারে, এই নিয়ে রীতিমতো গবেষণা হওয়া উচিত।

আপনারা ভাবছেন এই ছেলেরা তখন থেকে এমন পিতৃনিন্দা করছে কেন? কিন্তু এটা নিন্দা নয়, বাস্তব ঘটনা। এ সব আপনাদের ভোগ করতে হলে আপনারাও বুঝতে পারতেন।

সে দিন আমাদের যেতে সময় লাগছিল। কারণ ওই, লাল সিগনাল।

সানিলা গাড়ি চালাতে চাইলেও, দিইনি। আমিই গাড়ি চালাছিলাম। আর আপনারা তো জানেনই যে, আমি গাড়ি চালাতে গেলেই পৃথিবীর সমস্ত সিগনাল সারাক্ষণ লাল হয়ে থাকে। আমার থেকে জীবনের দাবিটা ঠিক কী, কে জানে। বৃষ্টির মধ্যে এমনিতেই গাড়ি চালাতে আমার অসুবিধে হয়, তার মধ্যে বারবার লাল আলোয় ঠোঁকর খেতে-খেতে আমার মাথা গরম হচ্ছিল আরও। তাও অবশেষে আমরা গিয়ে পৌঁছেছিলাম ফ্ল্যাটে।

বাবা শুয়েছিল নিজের ঘরে। আর হাতে চিনির শরবত নিয়ে দীপ্তেশকাকু বসেছিল পাশের চেয়ারে।

আমায় দেখে দীপ্তেশকাকু হেসে বলেছিল, “রবিনের কিছু হয়নি। প্রেশার ফল করে গিয়েছিল না খেয়ে। আরে তোরা বাবা একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ। টফিকে গিয়ে নিয়ে এলেই হয়। তা না, সেখানেও বাবুর ইগো। এ দিকে কান্নাকাটি করে, না খেয়েদেয়ে এমন অসুস্থ হয়ে আছে।”

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, “ভয়ের কিছু আছে?”

“কিছু না। ভাল করে খাবে, তা হলেই সব ঠিক হবে,” দীপ্তেশকাকু হেসেছিল। তার পর বাবার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, “তুই-ই শালা একটা প্রেম করে বিয়ে করলি! সার্কাস!”

বাবা উঠে বালিশে হেলান দিয়ে বসে ছিল। দীপ্তেশকাকুর কথায় একটু লজ্জা পেয়েই বোধহয় টপিক চেঞ্জ করতে সানিলাকে বলেছিল, “তুমি এই অপদার্থটার সঙ্গে এসেছ কেন? সে দিনও দেখলাম, আজও দেখছি। নিজের লাইফ এই ছাগলটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নষ্ট করো না। দাঁড়াও, রাও সাহেবকে আমিই বলব।”

সানিলা যে আমাদের অফিসে এসেছে আগে। ওকে তো বাবা চিনবেই। কিন্তু আমি এই বৃষ্টির মধ্যে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে এসে কি এ সবই শুনব!

সানিলা কিছু না বলে হেসেছিল মাত্র। আর আমি দেখছিলাম বাবা আর দীপ্তেশকাকু নিজেদের মতো গল্প করছে। আমাদের দিকে আর খেয়াল নেই।

আমি জোর করে ওদের মধ্যে ঢুকে বলেছিলাম, “বাবা, তুমি ওই বাড়ি চলো। এমন শরীর নিয়ে এখানে একা থাকতে হবে না।”

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, “বেশি ডেঁপোমি করো না। আমার কিছু হয়নি, দীপ্তেশ তো বলল। নাকি ওকেও বিশ্বাস করছ না?”

“আরে!” আমি অবাক হয়েছিলাম, “এই শরীর নিয়ে একা থাকবে?”

“আমি তো একাই,” বাবা আচমকা গলা কাঁপিয়ে উত্তমকুমার হয়ে গিয়েছিল। পরমুহুর্তেই আবার শমিত ভঞ্জর মতো মনে মনে কলার তুলে বলেছিল, “আমি একদম ঠিক আছি। একাই ভাল আছি। প্লাস পটলা আছে। তুই বাড়ি যা।”

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। আচমকা কী যেন স্পর্শ করেছিল আমার হাত। আর আমি দেখছিলাম আমার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে সানিলা আমার আঙুলে আঙুল জড়িয়ে নিয়েছে। আর চোখ দিয়ে যেন বলছে, কথা বাড়িয়ে না। চলো।

ফেরার পথে আমি কথা বলছিলাম না কোনও। ইচ্ছে করছিল না। সারাক্ষণ লাল সিগনাল সহ্য করতে করতে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিলাম সামনের ভিড়ে ঠাসা, অগোছালো কলকাতার দিকে। এই শহরটাকে দেখলেই মনে হয় কোনও বাচ্চা যেন সমস্ত খেলানা ছড়িয়ে, খেলা অর্ধেক রেখে উঠে চলে গিয়েছে।

সানিলা আমার হাত ধরে বলেছিল, “রনো, থিঙ্ক সামথিং এলস। আমায় অন্য কিছু বলো।”

আমার মাথা কাজ করছিল না। বাবার ওপর রাগ হচ্ছিল। সারা জীবন আমাকে আর মাকে কষ্ট দিয়ে এখন ভিকটিম কার্ড খেলছে। কেন? বাবা মা নাকি ঈশ্বরতুল্য? সত্যি? সব বাবা মা-ই কি তাই হয়?

আমি কথা খুঁজে না পেয়ে শেষে বলেছিলাম, “আচ্ছা, তুমি ছোট করে চুল কাটাও না কেন? সে দিন স্বপ্নে দেখলাম, তুমি লাল-পেড়ে হলুদ শাড়ি পরে বসে আছ। আর তোমার চুল ছোট করে কাটা।”

“কী রে?” পিসি বিরক্ত হল।

আমি চটকা ভেঙে পিসিকে বললাম, “না, বাবা এখন ঠিক আছে। আর তুমিও তো খবর নিতে পারো।”

“আমি?” পিসি আর বাবা তো একই কাপড়ের পিস থেকে কেটে তৈরি, তাই মেজাজটাও একই রকম।

পিসি বলল, “আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই। জানিস কী বলেছিল? আমরা নাকি ঠিকমতো দাদাকে দেখি না। বউ নাকি দেখবে। তুই তো বিদেশে তখন মজা করছিস। আর এখানে যুদ্ধ চলছে। তুমি টফিকে বিয়ে করবে, করো। কিন্তু সেই জন্য বাড়ির লোকজনকে আগে থেকে চাপে রাখা কেন? আর নাও, এখন বউ মুখে বামা ঘষে দিয়ে চলে গিয়েছে তো। আর টফিরও বলিহারি। তুই নিজে উদ্যোগ নিয়ে বিয়ে করলি। আর তুই-ই ছেড়ে চলে গেলি? সারা জীবন তো দেখলি দাদার কেমন রাবণের মতো মেজাজ। তাও এমন করলি।”

আমি খাবার শেষ করে উঠে গিয়ে বেসিনে মুখ ধুলাম। পিসিকে জিজ্ঞেস করলাম, “কিন্তু বাবিকাকু কী করল?”

পিসি বিরক্ত গলায় বলল, “সে আজ আমায় এই ফুল পাঠিয়ে নিজে গিয়েছে দাদার কাছে, বাগমারিতে।”

এই কেস করেছে। বাবার এমনিতেই মাথা-ফাথা ফর্টি নাইন হয়ে আছে, সেখানে আবার বাবিকাকু কী করতে গিয়েছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, “এই ওয়েদারে!”

মানে “ওয়েদার”-টা বাবা আর নিমচাপ দু’জনের ফ্লেক্সেই প্রযোজ্য।

পিসি বলল, “আর বলিস না। অল্প বয়সে কুমার গৌরবের সব ছবি দেখলে এমনই হবে। দাদার অনুমতি নিয়েই নাকি আমায় বিয়ে করবে। যেন দাদা কত অনুমতি দেবে!”

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

পিসি আবারও বলল, “আমি এ দিকে ফোন করে যাচ্ছি, আর সে ফোন ধরছে না। তুই বল রনো, ছেলেদের কি আদৌ বুদ্ধি থাকে?”

আমি বললাম, “আমার কি নেই? না থাকলে তো বিয়ে করে নিতাম।”

পিসি আর-একটু লাল হল কি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “সানিলা কই?”

“কোথায় যেন গিয়েছে। ঘুরতেও যেতে পারে,” পিসি উঠে নিজের ঘরের দিকে এগোল।

আমার মনে হল, কোথায় গিয়েছে? সেই ভিগ্নেশের কাছে কি? মনটা খচ করে উঠল আমার। সে দিন বাবার কাছ থেকে আসার পরে আমাদের মধ্যে সেরকম কথা হয়নি। দু’জনেই কেমন যেন একটু গুটিয়ে গিয়েছি। ও যেমন আচমকা আমার হাত ধরে ফেলায় একটু বিব্রত, তেমন আমিও যে ওকে স্বপ্নে দেখেছি, সেটা বলে ফেলায় বিব্রত। আসলে আমরা, বড়রা, হয়তো সব কিছুকেই কমপ্লিকেটেড করে ফেলি। ইগো আমাদের শেষ করে দেয়। যা করলে জীবন সহজ সুন্দর হয়ে যায় তা আমরা করি না। মনের কথা সহজে বলি না। সাধারণ অসুখকে ক্রনিক না-করা অবধি আমাদের শাস্তি নেই।

কিন্তু এখন সানিলা কোথায় গিয়েছে! আমার মনের মধ্যেটা কেমন করতে লাগল। ওকে তো আমিই নিয়ে আসি গাড়ি করে। তা হলে। আর এই ওয়েদারে কেউ ঘুরতে যায়?

পিসি সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে বলল, “আর কয়েক দিন পরে সানিলা চলে যাবে। ও এখন ঠিক আছে। তা ছাড়া রাও সাহেবও চলে আসবেন দুবাই থেকে।”

সানিলা চলে যাবে? কই আমায় কিছু বলেনি তো। আমার বুকের মধ্যে যেন গিট পড়ল একটা। আমি আর কথা না বলে পিসিকে টপকে সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠে গেলাম। আমার নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে করছে।

সানিলা আমার হাত একটু ধরল কি ধরল না, আমি গলে গিয়ে ওকে স্বপ্ন-ফণ্ড সব বলে দিলাম। আমার কি এখনও আঠারো বছর বয়স

আছে। আমার চুল পেকেছে কিছু। উঠেওছে কিছু। সেখানে এমন গাধার মতো কাজ করি কী করে। আমি কি জানি না যে, কেউ যদি বুঝে যায় তার প্রতি অন্য কেউ দুর্বল হয়ে পড়েছে, সে সঙ্গে সঙ্গে ভাও খেতে শুরু করে। অন্যকে সঙ্গে সঙ্গে অবহেলা করতে শুরু করে। গোস্টিং শুরু করে। সব জেনেও আমি কী করে এমনটা করতে পারি!

পরের এক ঘণ্টা আমার কী যে বাজে কাটল। লিখতে বসেও আমি এক লাইন টাইপ করতে পারলাম না। ভিগ্নেশের মুখটা বারবার ভেসে উঠতে লাগল। সানিলা কি ওর কাছে গিয়েছে? এই লোকটাই না দু’বার ওর সঙ্গে...

ধুর। আমার কিছু ভাল লাগছে না। ল্যাপটপের খোলা দুটো পাল্লা যেন হাঁ করে গিলতে আসছে আমায়। এত প্রেমের গল্প, উপন্যাস লিখলাম আমি, কিন্তু নিজের জীবনে কিছু হল না। ঘরামির সত্যি ঘর ছাওয়া হয় না। আমি একটা ইডিয়ট। বাবা বিয়ে করছে। পিসি বিয়ে করবে। সেই সব দেখেই কি আমার মাথা ঘুরে গেল? আরে, একটা মেয়ে ছাব্বিশ বছর আগে গল্প হয়ে গিয়েছে, সে আচমকা ফিরে এল বলে আমিও আদেখলার মতো স্বপ্ন-ফণ্ড দেখে সেমসাইড গোল খেয়ে বসে আছি।

মারোমাঝে জানেন, বাইরের লোকের দরকার পড়ে না। আমরা নিজেরাই নিজেরদের বাঁশ দেব বলে আলোর গতিবেগে গাছকে প্রদক্ষিণ করি। বুড়োদা ঠিক বলত, আমাকে ধরে মাটিতে ফেলে ক্যালাতে হয়।

বুড়োদা। এই তো! কালকেই আমি বুড়োদার কাছে চলে যাব। ওখানে গিয়ে আর ফিরে আসব না। লেখা, অফিস সব ছেড়ে দেব। মাঠে চাষ করব। বীজহীন বেগুন, টুকটুক টোম্যাটো, লাজুক লিটল ফিঙ্গার আর রঙিন ফুলকপি ফলাব। সকালে খেজুর গাছ থেকে রস ভর্তি হাঁড়ি নামাব। ডালিয়া, গাঁদা, ওয়েডেলিয়া, ম্যান্ডেভিলা ফুটিয়ে একটা বিনচ্যাক রঙের প্যালেট বানিয়ে ছাড়ব। এখানে আর থাকব না। আমি শিওর কাল বিবাগি হয়ে গ্রামে চলে যাব।

“রনো।”

আমার আত্মবিলাপের মধ্যে আচমকা বাধা পড়ল।

আমি দেখলাম পৌষালি এসেছে। ও এখন! এই সাড়ে সাতটায়! তাও এমন ওয়েদারে! কী ব্যাপার? একতলায় বেল বাজালে এত ওপর থেকে সব সময় শোনা যায় না। লালু কি দরজা খুলে দিয়েছে?

আমি নিজেকে সামলালাম। বললাম, “আয়।”

পৌষালি ঘরে ঢুকে আমার বিছানাতেই বসে পড়ল। আমি কিছুটা দূরে একটা ছোট গদির চেয়ারে বসলাম। ভাল করে দেখে বুঝলাম পৌষালির চোখ-মুখ লাল। কান্নাকাটি করেছে নাকি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কী হয়েছে তোর? এমন এলি?”

পৌষালি মাথা নিচু করে চোখে রুমাল চেপে ধরল। এই সেরেছে। কান্নাকাটি ভাল লাগে না আমার।

আমি পৌষালিকে সময় দিলাম। মনখারাপ হল ফুলের ফুঁড়ির মতো। যতই আপনি যাই করুন না কেন, ওটা ফুটে উঠতে নিজের সময় নেবে। তাড়া দিলে আর যা কিছুই তাড়াতাড়ি হোক না কেন, মনের মধ্যকার আসল অনুভূতি কিছুতেই সময়ের আগে ফুটেবে না।

পৌষালি সওয়া চার মিনিট কান্নাকাটি সেরে চোখ-নাক মুছে, মাথা তুলল। আমি আমার ঘরের নরম আলোর মধ্যেও ভাল করে দেখলাম ওকে। সামনে, যেখানে সিঁদুর পরে, সেখানকার চুল পাতলা হয়ে গিয়েছে পৌষালির। গাল সামান্য হলেও শিথিল হয়েছে। চোখে ক্লান্তি। কিন্তু এখনও সুন্দর আছে ও। আমি এই মেয়েটার জন্য একসময় পাগল হয়েছিলাম। মনে পড়তেই কেমন অবাক লাগল আমার। মনে হল সেই আমির থেকে এই আমি কতটা দূরে যে চলে এসেছি। পুরনো আমির দিকে এখনকার আমি কেবল নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকাতে পারি শুধু। আর কিছু পারি না। সময় সত্যি অমনিপোটেন্ট।

পৌষালি বলল, “জানিস, তান্নি কী করেছে? এত দিন সিগারেট খাচ্ছিল, আজ দেখি গাঁজা খাচ্ছে। ভাব একবার।”

“গাঁজা!” আমি অবাক হলাম। অবশ্য আজকাল অনেকেই দেখছি

খায়। গন্ধতে বুঝি। আমাদের স্কুল-কলেজ লাইফে কিছু ছেলেপিলে এ সব লুকিয়ে-চুরিয়ে খেত। আর তাদের সবাই বখাটে বাজে ছেলে বলত। আর, এখন সেই বখাটেপনাটাই স্টাইল হয়ে গিয়েছে। আজবাজে কাজ করা, নেশা করা নাকি ‘কুল’। আমরা সত্যি সামনের দিকে পিছোছি। আমি কিছু না বলে পৌষালির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পৌষালি বলল, “আমি বলেছি বাড়ি থেকে বের করে দেব। চড়িয়ে গাল লাল করে দেব। আমায় কী বলে জানিস? বলে, ফাকিং ওল্ড হ্যাগ। বলে বাবার বাড়ি এটা। তোমায় বাবা বের করে দেবে আমার গায়ে হাত দিলে। তুই ভাব।”

বলেই পৌষালি আবার বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগল।

আবার এক পশলা কান্নাকাটি। আমি শালা নিজের ঝামেলায় পারছি না। সেখানে এ আবার নতুন কী বিপদ হল!

আমি পাশের টেবিল থেকে জলের বোতল নিয়ে গিয়ে দাঁড়লাম পৌষালির সামনে। বললাম, “কাঁদিস না। জলটা খেয়ে নে।”

পৌষালি উঠল। চোখে জল টলটল করছে। ঠোঁটটা ফুলে আছে। ও আমার হাত থেকে জলের বোতলটা নিয়ে পাশের বিছানায় রাখল। তার পর আচমকা আমার হাতটা ধরল। বলল, “তুই কেন আমায় জোর করিসনি? কেন সব মেনে নিয়ে সরে গিয়েছিলিস? আমার বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে রনো। আমরা কি এখন কিছু করতে পারি না?”

আমি বললাম, “দেখ, তোর মনখারাপ, তাই এই সব ভাবছিস। প্লিজ, এ সব ভাবিস না।”

“না, তুই শোন,” পৌষালি আচমকা ঝটকা দিয়ে আমাকে নিজের দিকে টানল। আর আমি ঝুঁকে পড়লাম ওর ওপর।

পৌষালি আমার মাথার পেছনে হাত দিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম একদম। এটা কী করছে মেয়েটা?

পৌষালি আমার ঠোঁটে দাঁত দিয়ে কামড়াল আস্তে। তার পর জিভ দিয়ে আমার ঠোঁট ফাঁক করার চেষ্টা করতে লাগল। আমার হাতটা ধরে নিজের শরীরে জড়িয়ে নিতে চাইল। আর চার সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে থাকা আমি যেন আড়চোখে দেখলাম দরজার কাছে একটা ছায়া। কে ওটা?

আমি জোর করে নিজেকে পৌষালির থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেলাম। তার পর দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম দ্রুত। কেউ নেই তো। তা হলে?

আমি দেখলাম তিন তলাটা সম্পূর্ণ নির্জন। আর আমার ঘরের পর্দাটা সামান্য দুলছে। মনে হল দুর্যোগের ভিজে হাওয়ায় যেন ল্যাভেভারের মিহি সুবাস। কে এসেছিল এখানে? আদৌ কি কেউ এসেছিল। নাকি আমার মনের ভুল?

এগারো

‘Tintin. Are you dead? Say yes or no but answer me.’

আমাদের বাড়িতে দুটো রোলার আছে। হাতে টানা, বেশ ভারী। এর কথা আপনাদের আগে বলেছি আমি।

আমার ঠাকুরদা শেষ বয়সে একটু এলোমেলা হয়ে গিয়েছিলেন। হারুদা বলে, “বড়বাবুর মাথাটা কেমন যেন একটু খেপাটে হয়ে গিয়েছিল।” তখনই নাকি তিনি এই রোলার দুটো কেনেন। কলকাতার কোন একটা ক্লাব সস্তায় বিক্রি করে দিচ্ছিল তাদের ক্রিকেটের পিচ রোল করার দুটো রোলার। ঠাকুরদা কিনে নেন।

আর কিনে বাড়িতে নিয়ে আসার পরে এরকম আশ্চর্য রং করান। নীল রোলার, লাল রোলার। সেই অদ্ভুত টাং টুইস্টারের এমবিডিমেন্ট যেন।

কাকু আমায় বলেছে ঠাকুরদা এমন দুটো রং বেছেছিলেন, কিন্তু শুধু মজা করার জন্যই নয়। এর নাকি একটা গুহ্য কারণও ছিল। লাল

হল রাগের রং আর নীল বেদনার। ঠাকুরদার বক্তব্য ছিল, নীল রোলার নাকি সমস্ত দুঃখ বেদনা আর লাল রোলার নাকি সমস্ত রাগ ক্ষোভ গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে এ জীবন আনন্দে আর ভালবাসায় পূর্ণ করে দেবে।

ঠাকুরদার মতে, এই জীবনে এমন নীল রোলার, লাল রোলার আমাদের সবার দরকার।

কার কী দরকার আমি জানি না। কিন্তু আমাদের বাড়িতে এখন এই দুটো রোলারের খুব দরকার। কারণ, আমাদের বাড়ি এখন নীল রোলার, লাল রোলারের মতো একটা টাং টুইস্টারে পরিণত হয়েছে।

আমাদের বাড়ির পেছনের জমিতে দাঁড়িয়ে শেডের নীচে রাখা দুটো রোলার দেখতে দেখতে আমি এ সবই ভাবছিলাম।

আজ বৃষ্টি থেমেছে। মেঘও কেটেছে। কিন্তু পিসির মুখে এসে জমেছে অন্যরকম মেঘ। কারণ, বাবা বাবিকাকুকে বাগমারির ফ্ল্যাট থেকে বের করে দিয়েছে। বাবা নাকি বলেছে যে, বাবিকাকুর কোনও যোগ্যতাই নেই পিসির সঙ্গে জীবন কাটানোর। ঠাকুরদা নাকি ঠিকই করেছিল বাবিকাকুকে ষোঁট ধরে বের করে দিয়ে।

কাল রাতে খেতে বসে আমি দেখছিলাম যে, বাড়ির আবহাওয়া আচমকা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

পিসি গম্ভীর হয়েছিল। কাকু গম্ভীর হয়েছিল। ছোট্ট আর রিতুও সব দেখে আর বিশেষ কথাবার্তা বলছিল না। কাকিমা যা একটু কথা বলার চেষ্টা করছিল মাত্র। কিন্তু কথা তো একতরফা হয় না। জীবন তো শেক্সপিয়রের নাটক নয় যে, সেখানে সলিলকি থাকবে। বা রবার্ট ব্রাউনিং-এর কবিতা নয় যে, সেখানে ড্রামাটিক মোনোলগ থাকবে।

তাই কাকিমা কিছু পরে রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। আর আমি এই সবের মাঝে ভাবছিলাম সানিলা খেতে এল না কেন?

আমি হালকা উসখুস করছি দেখে রিতু আমার দিকে ঝুঁকে চাপা গলায় বলেছিল, “সানিলাদির মাথায় ব্যথা। তাই আসেনি।”

আমি সামান্য হেসে সহজ ভাবে বলেছিলাম, “ও আচ্ছা। তা আমি কী করব?”

রিতু ঠোঁট টিপে হেসে বলেছিল, “দাদাভাই, আমরা সবাই অন্ধ, না?”

কে অন্ধ, কে চক্ষুস্থান আমি জানি না। কিন্তু সানিলায় মাথা ব্যথা? সত্যি? আমার মনের মধ্যে অস্বস্তি হচ্ছিল বেশ। কেবলই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম আমার ঘরের পর্দা নড়ছে। আর বাতাসে ল্যাভেভারের গন্ধ। মেয়েটার কি সত্যি মাথায় ব্যথা না অন্য কিছু?

পৌষালি বেশিক্ষণ থাকেনি। ওই ঘটনার পরে আমায় বলেছিল, “তুই সত্যিই আমার থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিস। কী করে গেলি কে জানে। কিন্তু গিয়েছিস। আমি নিজেকেই অপমান করলাম। যাই হোক। আমি আসি।”

আজকাল মান-অভিমান ব্যাপারগুলো ভাবলেই খুব ক্লান্ত লাগে। অনর্থক লাগে। একটাই তো জীবন। আমার এখন চুয়াল্লিশ বছর বয়স। আর চুয়াল্লিশ বছর যে বাঁচব না, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিছু বছরের মধ্যে দেখতে দেখতে ষাট-পঁয়ষট্টি হয়ে যাবে। শরীরে নানা অসুস্থতা আসবে। বেঁচে থাকটাই বোঝা হতে শুরু করবে। তাই হাতে যেটুকু সময় আছে, তাতে আর আমি এই সব ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে ঢুকতে চাই না।

সেই কারণে পৌষালিকেও কিছু বলিনি। না হলে তো আমি বলতেই পারতাম, কে সারা জীবন আমায় নিয়ে ইয়োর-ইয়োর মতো খেলেছে। কে প্রেম করার পরও এক মুহূর্তে বাবা-মায়ের খুব বাধ্য হয়ে এক কথায় আমাকে ছেড়ে অন্য একজনের সঙ্গে জীবন কাটাতে চলে গিয়েছে। কে আমাকে সারা জীবন টেকেন ফর গ্রান্ডেড করে রেখেছে। কিন্তু আর বলিনি। দূর, কী হবে।

কিন্তু কাল রাতে খেতে বসে আমার নিজের কাছে একটা জিনিস বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, নিজেকে আমি যতটা নিস্পৃহ ভাবি, অতটা নিস্পৃহও আমি নই।

মনে হয়েছিল একবার গিয়ে দেখি সানিলার কী হল। কিন্তু সাহস হয়নি। তা ছাড়া খাবার টেবিলে বসে বাড়ির যা অবস্থা বুঝেছিলাম, তাতে আর অন্য ঝামেলা এনে সেটাকে আরও জটিল করে তুলতে ইচ্ছে করেনি।

কিছুক্ষণ এমন একটা নিস্তর্রতা বিরাজ করার পরে কাকুই প্রথম কথা বলেছিল। আমার দিকে তাকিয়ে কাকু বলেছিল, “দাদাকে তোর কিছু বলা দরকার রনো। এ ভাবে হয়? নিজে এই বয়সে বিয়ে করেছে, ঠিক আছে। দাদার জীবনের দাম আছে। মানলাম। কিন্তু তুলির জীবনের কি নেই? এটা তো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। তুইও বুঝতে পারছিস। বাবাকে আর কত ভয় পাবি সারা জীবন? কাউকে না কাউকে তো প্রতিবাদ করতেই হবে।”

ছোট্ট খেতে খেতে বলেছিল, “দাদাভাইকে বলছ কেন? তোমরা কেউ কিছু বলা না কেন? তোমরাও-বা কত ভয় পাবে?”

কাকু বিরক্ত হয়ে তাকিয়েছিল ছোট্টর দিকে, “তোকে এর মাঝে কথা বলতে বলেছি?”

ছোট্ট বলেছিল, “আমারও ছত্রিশ বছর বয়স। ডাক্তারি করি। দায়িত্ব আছে। আমার কথা বলার মতো বোধ নেই?”

কাকু আরও রেগে গিয়েছিল, “খুব লাটের বাট হয়েছিস। অপদার্থ। আর বাপের মুখে মুখে কথা বলছিস?”

ছোট্ট তেরিয়া হয়ে বলেছিল, “দাদাভাইকে যেটা করতে উস্কাচ্ছ, সেটা আমি করলেই দোষ! ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নয় এটা?”

“তারা চুপ করবি?” পিসি এবার ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, “কাউকে কিছু করতে হবে না। আমি বিয়ে-ফিয়ে করব না। এই বয়সে বিয়ে! আমারও মাথাখারাপ হয়েছিল। বাবি একটা ইডিয়ট। এই বয়সেও কুমার গৌরব যেন। অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করবে না। নিজে ফিল্ম প্রডিউস করতে পারে তো! কাউকে দাদাকে কিছু বলতে হবে না। আমি করবই না বিয়ে। এই নিয়ে আর একটাও কথা শুনতে চাই না আমি। সবাই চুপচাপ খেয়ে ঘরে যা।”

কাকু পিসির চেয়ে বড় হলেও পিসির ওপর কথা বলে না। আমার সবাই তার পর যেমন-তেনমন করে খেয়ে ঘরে চলে গিয়েছিলাম।

আমার মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা চলছিল। মনে হচ্ছিল এক-একটা দিন থাকে, যা একদম ভাল যায় না। মানে, বিশাল কিছু যে গোলমাল হয় তা নয়, কিন্তু গলার কাঁটা আর চোখের বালির মতো সারাক্ষণ একটা অস্বস্তি লেগেই থাকে।

রাতে ঘুমোনের আগে টুপুন আসে আমার কাছে। গতকালও এসেছিল। আমি বিছানায় ল্যাপটপ খুলেও কিছু লিখতে পারছিলাম না।

টুপুন এসে বিছানায় উঠে আমার কোলের মধ্যে ঢুকে বসে বলেছিল, “আজকেও পড়াশোনা করছ?”

আমি হেসে বলেছিলাম, “কী আর করব? আমার যে ছুটি নেই।”

টুপুন আমার দিকে মুখ করে বলেছিল, “এত পড়াশোনা করে কী হবে? মা-বাবা সবাই বলে পড়াশোনা করতে। কিন্তু আমার ভাল লাগে না।”

আমি মাথা নেড়েছিলাম, “আমারও ভাল লাগে না। কোনও দিনই ভাল লাগেনি।”

টুপুন বলেছিল, “তুমি একটু মাকে বলবে যেন আমায় ফ্রাইডে করে পড়তে না বসায়। আমি তো ছোট্ট বলো, ছোট্টদের কেউ এমন করে এত পড়াশোনা করায়।”

আমি মাথা নেড়েছিলাম।

টুপুন আবার বলেছিল, “আমি বড় হয়ে পাহাড়ে উঠব। মাউন্ট এভারেস্ট। ওখানে উঠতে গেলে তো সাহস লাগে, বলো। কিন্তু পড়াশোনাও কি লাগে?”

আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম, এটা তো ভেবে দেখিনি। তাও বলেছিলাম, “পড়াশোনা করতে ভাল না লাগলেও আমাদের পড়াশোনা করতে হয়। বুঝেছ? আগে পড়ে নাও, তার পর পাহাড়ে উঠবে।”

“কেন পড়াশোনা করতে হয় রনো?” টুপুন কোল থেকে নেমে

আমার মুখোমুখি বসেছিল।

আমি বলেছিলাম, “তুমি তালা দেখেছ তো?”

টুপুন মাথা নেড়েছিল, “হ্যাঁ-অ্যাঁ। দেখেছি তো।”

বললাম, “এই পৃথিবী বিশাল বড় বড় অনেক তালা দিয়ে তৈরি। আর পড়াশোনা হল সেই সব তালায় চাবি। যত পড়াশোনা করবে, তত চাবি আসবে তোমার কাছে, আর বেশি বেশি তালা খুলে সামনে এগোতে পারবে। বুঝেছ?”

টুপুন বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞেস করেছিল, “তা হলে নেতা-মন্ত্রীরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক পড়াশোনা করেছে, তাই না রনো?”

এই সেরেছে! এর কী উত্তর দেব আমি? এখনকার বাচ্চারা হেভি সেয়ানা। কথার মধ্যে আসল জায়গায় কাঁক করে চেপে ধরে। এতটা বলে ফেলেছি যখন, তখন কী করে বলি যে না, শুধু পড়াশোনাই নয়, আরও নানা ফ্যাক্টর থাকে জীবনের তালা খুলতে। জীবন যে এক বহুস্তরীয় জটিলতার সমষ্টি, সেটা কী করে বোঝাই? আর সত্যি বলতে কী, আমিই-বা কতটা বুঝেছি?

“কী রনো, বলো,” টুপুন আবার জিজ্ঞেস করেছিল।

আমি বলেছিলাম, “আরও বড় হলে এটা বুঝবে।”

টুপুন চোখ সরু করে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তার পর বলেছিল, “বাবা সে দিন রাতে মাকে বলছিল। আমি মটকা মেরে ঘুমের ভান করে শুনেছি।”

“কী?” আমি ভয়ে সামান্য কাঁটা হয়েছিলাম।

টুপুন বলেছিল, “নেতারা নাকি দু’নম্বর করে অনেক টাকা রোজগার করে। মা হাসছিল। আর বলছিল ছাড়া ছাড়া।”

আমি কথা ঘোরাতে বলেছিলাম, “সবাই করে না টুপুন। সব জায়গাতেই ভাল লোক খারাপ লোক থাকে মা। ওরকম ভাবতে নেই।”

টুপুন ফিচ করে হেসে বলেছিল, “মা-ও বাবাকে বলেছিল, তুমিও দু’নম্বর। মুখে এক কথা বলছ আর অন্য দিকে অন্য কাজ চালাচ্ছ।”

ওরে বাবা, ছোট্টদের কাণ্ডজ্ঞান নেই। জানে না ওরা মাদাম একুশকে এনেছে পৃথিবীতে।

আমি দেখেছিলাম টুপুনকে এ সবার থেকে ঘোরাতে একটা কাজ দিতে হবে। ওকে বলেছিলাম, “আমার টেবিল থেকে হজমির শিশিটা নিয়ে দোতলায় সানিলা আন্টিকে দিয়ে আসবে?”

টুপুন সানিলার সঙ্গে টুকটাক কথা বলে। ভাব আছে। টুপুন আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই বিছানা থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে টেবিলের কাছে গিয়ে হজমির শিশিটা তুলে নিয়েছিল হাতে। তার পর তার ঢাকনা খুলে দুটো হজমি নিজের মুখে পুরে বলেছিল, “আমি দিয়ে আসছি।”

আসলে হজমি নয়, আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল সানিলা কেন খেতে এল না সেটা জানা।

কিন্তু টুপুন বেরিয়ে যেতেই আমার খারাপ লাগল। আমি একটা বাচ্চাকে কেন পাঠালাম? আমি নিজে গোলাম না কেন? আমার কিসের গিল্ট হচ্ছে যে, আমি নিজে যেতে পারছি না সানিলার সামনে।

কিন্তু এ সব ভাবতে ভাবতেই টুপুন ফিরে এসেছিল। টেবিলে হজমির শিশিটা রেখে বলেছিল, “আন্টির ঘরের দরজা বন্ধ। আমি দরজার নীচে দেখলাম, লাইটও বন্ধ। তাই আর ডিস্টার্ব করলাম না।”

আমি ওকে বলেছিলাম, “ঠিক আছে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, যাও। কাল স্কুল আছে তো না কি?”

টুপুন এগিয়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়ে বলেছিল, “তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো রনো। রাত জাগতে নেই। মা বলে, মেলাটোনি তৈরি হয় না রাত জাগলে।”

আমি হেসে ওর মাথার চুল ঘেঁটে দিয়েছিলাম।

টুপুন চলে যাওয়ার পরেও আমি বেশ কিছুক্ষণ লেখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারিনি। ঘুণপোকাকার মতো সানিলার অনুপস্থিতিটা আমায় ভেতরে ভেতরে কাটছিল। আমি ল্যাপটপ গুটিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়েছিলাম।

বাড়ি অন্ধকার। সবাই শুয়ে পড়েছে। সিঁড়িতে শুধু নরম হলুদ আলো জ্বলছিল। আমি দোতলায় নেমে গিয়ে সানিলার ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। দরজা বন্ধ। আমার মাথার মধ্যে কষ্ট হচ্ছিল। আমি কী করব বুঝতে না পেরে আবার ফিরে এসে নিজের ঘরের দিকে এগোছিলাম। আর তখনই পিসির ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় খুব মৃদু কান্নার আওয়াজ পেয়েছিলাম।

পিসি কাঁদছে? আমি নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। পিসিকে কোনও দিন আমি কান্নাকাটি করতে দেখিনি। খুব কড়া ধাতের মহিলা পিসি। তাকে এমন করে ভেঙে পড়তে দেখে আমার খুবই খারাপ লেগেছিল। আমি ভাবছিলাম, বাবা নিজেও শান্তিতে থাকবে না, অন্য কাউকে শান্তিতে থাকতেও দেবে না।

কিন্তু আমি কী যে করব বুঝতে পারছিলাম না। বাবিকাকু এ সব করে বেকার কমপ্লিকেশন বাড়াচ্ছে কেন? পিসি তো এমনিই রাজি ছিল। এখন পিসিও আর রাজি নয়। আমি, সানিলার ঘরের আর পিসির ঘরের বন্ধ দরজার মাঝে দাঁড়িয়েছিলাম একা। আর রাত বাড়ছিল আমাদের দৈত্যের মতো বাড়িতে। বুঝতে পারছিলাম মাঝেমাঝে এমন একটা সময় আসে যখন আমাদের অসহায়ের মতো সব কিছু সহ্য করে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।

রাতে আমার ঘুম হয়নি ভাল। সারাক্ষণ এপাশ-ওপাশ করেছি। আধো ঘুমের মধ্যে মনে হয়েছে, কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে আমার ঘরের দরজায়। স্বপ্নের মধ্যেও যেন ল্যাভেন্ডারের গন্ধ পেয়েছি। তাই মাঝেমাঝেই জেগে উঠেছি। জল খেয়েছি। দু’তিন বার বাথরুম গিয়েছি, তার পর আবার ঘুমোনের চেষ্টা করেছি। শেষে এই সকাল ছ’টায় উঠে এসে দাঁড়িয়েছি এখানে।

শহরের মধ্যে হয়েও আমাদের বাড়িটা অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি। হাওয়া দেয় সুন্দর। সকালের এই সময়টা কী যে ভাল লাগে।

“তুমি সাতসকালে এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?”

আমি প্রশ্ন শুনে পেছনে ঘুরলাম। হারুদা। একটা টি-শার্ট আর বারমুডা পরে উল্লেখ্যক্সে চুল নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখেমুখে এখনও ঘুম লেগে আছে।

আমি বললাম, “এমনি একটু দাঁড়িয়েছি। তুমি তো ভোরে ওঠো, আজ একটু দেরি হল কেন?”

হারুদা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, “আরে, ক’দিন পুরো আবগারি ওয়েদার ছিল যে। কাল একটু হালকা করে রাম মেরেছিলাম। লালু ঝাল ঝাল করে মুরগি বানিয়ে দিয়েছিল। তাই আজ চোখ খুলতে দেরি হয়েছে।”

আমি হাসলাম। হারুদার হালকা করে খাওয়া মানে একটা পাইট উপড় করেছে।

হারুদা বলল, “তোমার চোখ লাল কেন? ঘুমোওনি? অবশ্য ঘুমোবে কী! বাড়িতে যা চলছে! বুড়া বয়সে সব বিয়ে করবে। সবার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমার বয়স এখন আটান্ন। বউ মারা গিয়েছে চার বছর। দুই ছেলে চাকরি করে। বিয়ে করে আলাদা থাকে। আমার ঝাড়া হাত-পা। এখন আবার কেউ বিয়ে-ফিয়ার মতো ফালতু জিনিসে জড়ায়! খাচ্ছিল তর্তি তর্তি বুনে, কাল হল তর্তির ঐড়ে গরু কিনে। তুমি আবার ফস করে এদের অনুপ্রেরণায় বিয়ে করে বোসো না যেন।”

আমি হাসলাম শুধু। হারুদা কি জানে না, প্রেম কী সাংঘাতিক জিনিস। যুক্তি বুদ্ধি সব কিছুকে কী ভাবে নষ্ট করে দেয়। শরীরের মধ্যে আড়াই লক্ষ মৌমাছি ছেড়ে দেয়। আর বুকের মধ্যে সারাক্ষণ ওয়ার্নিং বেল পড়ে যাওয়ার পরেও আরও কুড়ি নান্নার বাকি আছে ধরনের একটা উদ্বেগ হয়। এ সবের থেকে বাঁচতে মানুষ কী কী যে করে!

“রনো, এই রনো।”

আমি ঘুরে দেখলাম, পিসি হস্তদন্ত হয়ে আমার দিকে আসছে। আবার কী হল? পিসি তো সচরাচর এদিকে আসে না।

আমি এগিয়ে গেলাম পিসির দিকে। জিজ্ঞেস করলাম, “কী হল?”

পিসি টেনসড গলায় জিজ্ঞেস করল, “সানিলা কোথায় রে?”

“আমি কী করে জানব!” অবাক লাগল আমার।

পিসি বলল, “ওর নিজের ঘরে নেই। সারা বাড়িতে নেই। ফোন করছি, ফোন সুইচড অফ। ওর ঘরেই রাখা। বাড়ির কেউ ওকে দেখেওনি। ব্যাপারটা কী?”

“নেই মানে?” আমি হাঁ হয়ে গেলাম।

পিসি লাল আর নীলের মাঝামাঝি একটা কালার হয়ে গিয়েছে। বলল, “মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।”

আমি ঘাবড়ে গেলাম। মেয়েটা গেল কোথায়? আচমকা আমার মনে একটা কারণ উঁকি দিল, কিন্তু মশা তাড়ানোর মতো করে সেটাকে আমি তাড়িয়ে দিলাম। নিজেকে অতটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবার কোনও কারণ নেই।

পিসি বলল, “কী হল বল তো? কোথায় গেল সানিলা? রাও সাহেব দু’চারদিন পর ফিরে আসবেন কলকাতায়। কী বলব আমি ঠুকে? রনো, তুই কিছু বলেছিস ওকে?”

“আমি! আরে, আমি কেন কিছু বলতে যাব?” অবাক হয়ে পিসির দিকে তাকলাম।

পিসি মুখ বামটে বলল, “কারণ, ছেলেদের কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। কথাবার্তার ছিরিছাঁদ থাকে না। এখন চল। খোঁজ, কোথায় গেল মেয়েটা।”

আমি কি দীপক চ্যাটার্জি যে খুঁজে বের করব? আমি অবাক হয়ে পিসির দিকে তাকলাম। পিসি এবার লালের দিকে যাচ্ছে।

সানিলা চলে গেল? আমার কষ্ট হচ্ছে হঠাৎ। সুন্দর সকালটা আর ততটাও সুন্দর লাগছে না। কেন চলে গেল মেয়েটা?

দেখলাম, রোলার দুটো পড়ে আছে। বুঝলাম, আজ দুটো রোলারেরই দরকার আছে এই বাড়িতে। কিন্তু কী ভাবে তার ব্যবহার করব, সেটা জানা নেই আমাদের।

বারো

‘Well this is a fine mess.’

সানিলা রাও যে এ ভাবে আমার জীবনে ফিরে আসবে, আমি বুঝতে পারিনি। সাতানব্বই সালে হেল বপ ধুমকেতুর তলায়, বার্নার পারে দাঁড়িয়ে সেই যে সানিলা বলেছিল, কোনও দিন হারিয়ে গেলে যেন ওকে খুঁজে বের করি আমি। সেটা যে এ ভাবে সত্যি হবে কে জানত।

কারণ, এখন সানিলাকে খুঁজতে বেরিয়েছি আমি। মোট আট ঘণ্টা হল হারুদা হয়েছে কিরীটি রায় আর আমি তার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুব্রত রায়। কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়? কর্পূর নাকি?

হারুদা আমার সঙ্গে বেরিয়েছে। আমি নিতে চাইনি। কিন্তু পিসির কথা কে অমান্য করবে? তার মধ্যে হারুদা নাকি ডিটেকটিভ বইয়ের পোকা। সেই যে সানিলাকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে পিসি এসে খবর দিয়েছিল, আমি তাই শুনে তড়িঘড়ি বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছিলাম। কিছু পরে হারুদাও এসে ঢুকেছিল বাড়িতে। হাতে কোভিডের সময় কেনা সার্জিকাল গ্লাভস। সঙ্গে ফুটপাথ থেকে কেনা গোলাপি প্লাস্টিক ফ্রেমের ছোট্ট ম্যাগনিফায়িং গ্লাস আর ট্যালকাম পাউডার।

পিসি খুব অবাক হয়ে তাকিয়েছিল হারুদার দিকে। তার পর জিজ্ঞেস করছিল, “এ সব কী?”

হারুদা প্রচণ্ড সিরিয়াস গলায় বলেছিল, “ক্রাইম সিন। হাতের ছাপ-টাপ যাতে না পড়ে, তাই গ্লাভস পরে এসেছি। এ ছাড়া ম্যাগনিফায়িং গ্লাস আর পাউডার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখার জন্য।”

সানিলাকে খুঁজে পাচ্ছি না। এটা সিরিয়াস ব্যাপার। কিন্তু এই বাড়ির লোকজন কোনও কিছুকে কি সিরিয়াস রাখতে দেবে?

পিসির ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লেগেছিল। তার পর প্রকাণ্ড চিৎকার করে একটা ধমক দিয়েছিল হারুদাকে। বলেছিল, “ইয়ার্কি



হচ্ছে? তুমি যাও রনোর সঙ্গে। আমি কয়েকটা ঠিকানা দিচ্ছি, খুঁজে দ্যাখো সেখানে। এর আগেও মেয়েটা এরকম বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। রাও সাহেব আমায় তাই এই ঠিকানাগুলো দিয়ে গিয়েছেন। যাও। গোয়েন্দা হবে! ব্যোমকেশ বক্সী এসেছে!”

হারুদা পিসিকে ভয় পায় খুব। তাই আর কথা বাড়ায়নি। শুধু যেতে যেতে বলেছিল, “আমি তো কিরীটি রায়।”

“কী? তুমি কিরীটি রায়?” পিসি আবার লাল হয়ে জ্বলে উঠেছিল, “রেডি হয়ে খুঁজতে বেরোও মেয়েটাকে। যাও।”

আমি আর হারুদা কুড়ি মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তার পর থেকে এই দুপুর অবধি হন্যে হয়ে খুঁজেও কোথাও সানিলাকে পাইনি।

এখন দুপুর শেষ হয়ে বিকেল হচ্ছে। খিদে পেয়েছিল খুব। আমি আর হারুদা বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে একটা ধাবায় রুটি-তরকারি খেয়েছি। তার পর হারুদা একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

আমি চুপচাপ মোবাইল খুলে দেখছি যে, আর একটাই লোকেশন আছে খুঁজে দেখার। আর ভাবছি, সেখানে কি থাকবে সানিলা?

জায়গাটা কেয়াতলায়। এখান থেকে কাছেই। কিন্তু সেখানে সানিলাকে না পেলে কী করব? থানা পুলিশ করতে হবে নাকি? কোন একটা ওয়েব সিরিজে দেখেছিলাম চবিশ ঘণ্টা না হলে নাকি মিসিং পার্সন ডায়েরি নেয় না। সত্যি? আমি আবার এ সব ডিটেল খুব একটা জানি না।

আমার মনে পড়ল ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় আমিও একবার হারিয়ে গিয়েছিলাম। মানে হারিয়ে যাইনি, মা ভেবেছিল আমি হারিয়ে গিয়েছি।

একা একা বাবার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আর সেদিন ফিরে আসিনি। আসলে আমি ভেবেছিলাম মাত্র চোদ্দো কিলোমিটার দূরে আছি আমি। একদিন না ফিরলে কী হবে। বাবার সেই বন্ধুর একটা ছেলে ছিল। আমার বয়সি। তার একটা দারুণ গেম ছিল। সেটা খেলার লোভেই বাড়ি ফিরিনি।

এখানে বলে রাখি মা-বাবা আমাকে অনেকটা ছোট থেকেই একা-একা ট্রাভেল করতে দিত।

বাবার সেই বন্ধুর বাড়িতে টেলিফোন ছিল না। আর সত্যি বলতে কী, তখন এমন কথায়-কথায় ফোন করার রেওয়াজও ছিল না। তাই আমি, এই যে বাড়ি ফিরছি না, সেটা জানাবার অন্য একটা পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম। টেলিপ্যাথি।

হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই পড়ছেন। আমি টেলিপ্যাথির মাধ্যমে মাকে জানানোর চেষ্টা করেছিলাম যে, আজ ফিরছি না। তখন সদ্য ‘সোনার কেলা’ পড়েছি। ফেলুদায় যা লেখা থাকে তাই বেদবাক্য হিসেবে দেখছি।

ফলে বাড়ি ফিরব না ব্যাপারটা ডিসাইড করার পরে একটা জায়গায় চোখ বন্ধ করে ধ্যান করার মতো করে বসে মাকে মনে মনে জানানোর চেষ্টা করেছিলাম, ‘আমি ফিরছি না আজ। মা চিন্তা করো না।’

আমি ছোট ছিলাম তাই বুঝিনি টেলিপ্যাথির কানেকশন একমাত্র গল্পের নায়কদের ছাড়া আর কারও কাছে থাকে না।

বাবা আর কাকু সন্ধ্যাবেলা এসেছিল গাড়ি নিয়ে। মুখ-চোখ লাল। বাবাকে দেখেই বুঝেছিলাম বাড়িতে কিছু একটা হয়েছে।

বাবা বলেছিল মায়ের প্রেশার বেড়ে খুব খারাপ অবস্থা। কাকু সঙ্গে থাকায় আমার রগচটা বাবা সে দিন রাগ করেনি। বরং বলেছিল, “আজ এখানেই থেকে যা। বাড়ি গেলে তুই শেষ।”

আমার মা খুব শান্তশিষ্ট ছিল। কিন্তু সে দিন নাকি টেনশন করে এমন হয়ে গিয়েছিল যে, আমায় হাতের কাছে পেলে পিটিয়ে ছাল তুলে দিত।

আমি এই শেষ দুপুরে গাড়ির বনেটে হেলান দিয়ে আশপাশের উঁচু উঁচু বাড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, ছোটবেলাটা কী অদ্ভুত। আমরা কত কিছু বিশ্বাস করি। পৃথিবী যে অমনটা নয়, সেটা বুঝতে-বুঝতেই কখন যেন বড় হয়ে উঠি, অবিশ্বাসী হয়ে উঠি, কুচুটে আর হিংসুটে হয়ে উঠি। আমরা যে ক্রমশ জটিল মানুষ হই, তার কারণ কি ছোটবেলায় ভেঙে যাওয়া আমাদের নানা বিশ্বাস।

হারুদা সিগারেট শেষ করে জিগ্জেস করল, “এ বার তা হলে কোথায়

যাবে?”

আমি কিছু বলার আগেই শুনলাম একটা গলা, “আরে রণন, এখানে?”

আমি পিছনে ফিরলাম। হে ভগবান! আবার অমল দত্ত। মানে আজকেই এই লোকটার সঙ্গে দেখা হতে হল!

আমি কিছু বলার আগেই হারুদা এগিয়ে গেল, গম্ভীর গলায় হাত নেড়ে বলল, “হবে না হবে না, সামনে যান।”

অমলদার মুখটা পেঁয়াজের মতো কালচে লাল হয়ে উঠল। অমলদা খাঁক করে বলল, “আমি সিগনালে ভিক্ষে চাইতে এসেছি নাকি?”

কিরীটি রায় আরও কিছু বলত, কিন্তু আমি পিছন থেকে আবার সেই জুঁকি তিলের চিহ্নটা দেখালাম। অমলদা সামান্য থমকাল। তার পর হারুদাকে উপেক্ষা করে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, “রণন, কী করছ তুমি?”

আমি সামান্য ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, “এই খেলায় একটু আগে। এবার কাজ আছে। একজনকে খুঁজতে যাব। তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।”

অমলদা পাত্তাই দিল না। বলল, “কী সব যে লিখেছ তুমি?”

আমি বুঝতে পারলাম না।

অমলদা বলল, “সে দিন একটা গল্প লিখেছ না? সেটা কী? কী সব লিখছ?”

হারুদা আবার এগিয়ে এল। বলল, “আপনার চেয়ে অনেক ভাল লেখে। লোকজন রাস্তায় চিনতে পারে। সেলফি নেয়। অটোগ্রাফ নেয়। আপনার নেয়? আপনাকে চেনে? রনোর সঙ্গে দেখা হলেই দেখেছি আপনি ওকে ছোট করার চেষ্টা করেন, কেন? কিসের এত চুলকানি আপনার?”

আমি ভাবলাম, এইবার একটা মারামারি বাঁধবে। হারুদা কেন যে এই লোকটাকে দেখতে পারে না কে জানে।

অমলদা কিন্তু হারুদাকে পাত্তা দিল না। আমাকে বলল, “তুমি এ সবার জন্য লেখো? কে চিনবে? কে সেই নেবে এই জন্য? উত্তরাধুনিকতা বোঝো? পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম? ফরমালিজম? বোঝো এ সব?”

আমি হাল ছেড়ে দিলাম। কী বলব একে! এ সবার জন্য কি আদৌ কেউ লেখে? আমি জানি না। আমি যে লিখি না সেটা আমি জানি। তাই তো আমি সবার থেকে সরে থাকি। দূরে থাকি সব কিছুর থেকে। তাই এত বছর লেখার পরেও আমি সে ভাবে কাউকে চিনি না। আমার কোনও ‘হাত’ নেই। দাদা-দিদিদের করিডোরে যাতায়াত নেই। বড় বড় ক্ষমতাবান মানুষের সঙ্গে পরিচয় নেই। হয়তো এ সব আমার ড্রব্যাক। হয়তো আমি বোকা। কিন্তু কী করব। এটাই আমি। কারও গায়ে পড়তে, কাউকে খারাপ কথা বলতে, বা ক্ষমতায় থাকা কাউকে তেল দিয়ে তার থেকে কাজ আদায় করতে পারি না আমি। এ সব স্কিল আমার নেই। ইচ্ছেও নেই। যাদের আছে তাদের আছে। তারা ভাল থাকুক। তাদের আম গাছে কাঁঠাল হোক। আমার কিছু যায়-আসে না। এ সবার পরেও যেটুকু যা হয়, মাইরি বলছি, তাতে আমার হাত-পা-জিভ কিছু নেই। কিন্তু অমলদার মতো লোকজনের তাও চুলকুনি কমে না।

আমি বললাম, “অমলদা, আপনারা অনেক বড় লেখক। কাফকা, কামু, জয়েস এবং আপনারা এক সারিতে। দস্তইয়েভস্কি, লরেন্স, মম, বিভূতিভূষণ আপনারদের থেকে লেখা শিখতে আসেন। অবিনির্মাণ-ফিনির্মাণ অনেক কিছু জানেন, বোঝেন। হাই থট আপনারদের। আপনি পাঠক না পেলেও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। পাবেন। পেতেই থাকবেন। ও সব আমার দ্বারা কিছু হবে না। প্লিজ, আমায় ছেড়ে দিন। আমি জীবনযন্ত্রণায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছি।”

অমলদা কোনও দিন আমায় এমনভাবে কাউন্টার-আটাকে যেতে দেখেনি। তাই ঘাবড়ে গেল।

আমি বললাম, “জানেন আমাদের বাড়িতে একটা মেয়ে এসে থাকছে কিছুদিন হল। পিসি নিয়ে এসেছে। সানিলা রাও নাম। তাকে আজ সকাল থেকে খুঁজ পাচ্ছি না। আমার মাথা-ফাথা খারাপ হয়ে আছে। পিসি এর মধ্যে চোদ্দো বার ফোন করেছে। ফলে— প্লিজ!”

হারুদা পাশ থেকে বলল, “আপনি কাটুন তো। এর পর খিস্তি করে দেব, তখন লেখক-ফেখক মানব না বলে দিলাম।”

এ সব যেন কিছু কানেই গেল না অমলদার। বরং বলল, “আরে, সানিলা রাও? মানে রামচন্দ্র রাওয়ের মেয়ে?”

আমি ঘাবড়ে গেলাম। অমলদা চেনে নাকি? মানে, সত্যিই পৃথিবী এতটা গোল?

অমলদা বলল, “আরে, মেয়েটা ব্যাঞ্চে ছিল। অনেক বড় পোস্ট। আমি চিনি। কিছুদিন আগে চাকরি ছেড়েছে। এই তো পার্ক সাইড রোডে আছে। আজকেও দেখেছি। আমি যেখানে চাকরি করি, সেই মিত্র সাহেবের মেয়ের বান্ধবী। ওদের বাড়িতেই আছে।”

আমি ঘাবড়ে গেলাম। সানিলা ব্যাঞ্চে চাকরি করে? মানে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরে এমবিএ করেছিল জানি। কিন্তু তার পর ব্যাঞ্চে ছিল? তার মানে এখন চাকরি করে না। কী করে? ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতেই বা যায় কেন? মেয়েটা আসলে কিছুই বলে না। আর আমিও অবশ্য জিজ্ঞেস করি না কিছু। কিন্তু অমলদা মেয়েটাকে সত্যি চেনে?

আমি দ্রুত মোবাইল খুলে সানিলার ছবি দেখালাম। পিসি আমায় ফরোয়ার্ড করেছে সকালে।

অমলদা বলল, “হ্যাঁ এই তো। আরে, আমি আমাদের কোম্পানির হয়ে কতবার সানিলা রাওয়ের ব্যাঞ্চে গিয়েছি। সেই সূত্রেই তো সাহেবের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব। একে খুঁজছে? মানে তুলিও খুঁজছে? চলো, আমি নিয়ে যাচ্ছি।”

আমি অপেক্ষা করলাম না। হারুদাকে চোখের ইশারায় গাড়িতে উঠতে বলে, অমলদাকেও একরকম ঠেলেই গাড়িতে তুললাম।

হারুদাও গাড়ি ছোটাল তেমন ভাবে। আশপাশের লোকজন আমাদের গাড়ি দেখে এদিক-ওদিক তাকাতে শুরু করল এই ভেবে যে, ক্যামেরাটা কোথায় আছে। এ নিশ্চিত কোনও সিনেমার চেজ সিকোয়েন্স শট করা হচ্ছে।

দেশপ্রিয় পার্কের পশ্চিমে যে শান্ত নির্জন পাড়াটা আছে, সেটাই পার্ক সাইড রোড। অমলদা সারা গাড়িতে একটাও কথা বলেনি। শুধু পথের ডিরেকশন দিয়ে গিয়েছে। কে জানে হারুদার গালি দেওয়ার খেঁচ কাজ করছে কি না।

নির্জন রাস্তাটায় ঢুকে অমলদাকে আর কিছু বলতে হল না। আমি দেখলাম, ওই দূরে ওটা কে দাঁড়িয়ে রয়েছে? সানিলা না?

হ্যাঁ, সানিলাই তো। কিন্তু ওর সামনে ওটা কে? ভিগ্লেশ।

হারুদাও দেখেছে সানিলাকে। ফলে অমলদা আর কিছু বলার আগেই হারুদা গিয়ে গাড়িটা দাঁড় করাল ওদের সামনে।

আমি প্রায় লাফিয়ে বেরোলাম গাড়ি থেকে।

সানিলা আমাকে দেখেছে। আর দেখেই ভুরু কঁচকে ফেলেছে। ভিগ্লেশও দেখলাম ঘুরে তাকাল।

আমি সামান্য উত্তেজিত হয়ে বললাম, “এ সব কী সানিলা? পিসি চিন্তা করে করে পাগল হচ্ছে। ফোন রেখে এসেছ বাড়িতে। কাউকে কিছু বলেনি। এটা কি ঠিক?”

সানিলা বলল, “আর তুমি?”

আমি বললাম, “কী আমি? আমি কী? চলো, বাড়ি চলো।”

এবার সানিলা কিছু বলার আগেই ভিগ্লেশ এসে আমার বুকে হাত দিয়ে আমায় সামান্য ঠেলা দিল। বলল, “তুই কে? তুই ওকে নিয়ে যাওয়ার কে বে? ফোট।”

আমি বললাম, “প্লিজ, আপনি এর মধ্যে আসবেন না। আমি ওকে বলছি।”

“আমি আসব না?” ভিগ্লেশ আচমকা চিৎকার করে উঠল। তার পর আমায় বলল, “সানিলা আমার। শি ইজ প্রেগন্যান্ট উইথ মাই বেবি। সেখানে তুই কে? দু’পয়সার লেখক। ফোট।”

প্রেগন্যান্ট! আমি কী বলব বুঝতে না পেরে “আরে, আপনি অসভ্যতা করছেন কেন?” বলে ভিগ্লেশকে সরতে গেলাম। কিন্তু

ভিগ্লেস সরল না। বরং আচমকা দু'হাত দিয়ে আমায় ধাক্কা মেরেই ডান হাতে একটা ঘুষি চালাল। আমি ব্যালেন্স হারিয়ে মাথা সরাতে গিয়েও পুরোটা পারলাম না। কানের পাশে মনে হল অ্যাটম বোমা ফাটল।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাই-বাই করে ঘুরে উঠল চোখের সামনে। আমি চোখে এক পৃথিবী সর্ষে ফুল নিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম মাটিতে। আর সেই অবস্থাতেই দেখলাম গাড়ি থেকে জ্যাক রড নিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে এই দিকে দৌড়ে আসছে কিরীটি রায়। আর পোস্টমডার্নিজম থেকে পোস্টস্ট্রাকচারালিজম-সহ সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' থিয়োরি আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে দৌড়ে পালাচ্ছে অমলদা।

তেরো

'There's something you need to know about failure, Tintin. You can never let it defeat you.'

আপনারা কেউ কোনওদিন ঘুষি খেয়েছেন? আমি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর র্যাগিংয়ের সময় প্রথম খেয়েছিলাম। তার পর খেলায় এই এত বছর পরে। সানিলা আমার জীবনে ফিরে আসার পরে কত কিছুই যে ফিরে আসছে।

আজ ছুটির দিন। সকালে উঠে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ব্যালকনিতে। হাওয়া দিচ্ছে বেশ। আবার মেঘও করেছে। ডিপ্রেসন আসবে নাকি আবার? আজকাল সবার মতো পৃথিবীরও ডিপ্রেসন হয়ে যায়।

আমি দেখলাম, বাড়ির পিছনের দিকের ব্যাডমিন্টন কোর্ট পরিষ্কার করা হচ্ছে। শেড-এর থেকে নীল রোলার, লাল রোলারকে সরিয়ে ছোট্ট পুকুরের পাশে রাখা হয়েছে। কোর্ট রোল করা হবে। শীতকাল আসছে। এই মরসুমে ছোট্ট নাকি ব্যাডমিন্টন খেলবে। ওর বন্ধুরাও আসবে। কাল রাতে খাবার টেবিলে বসে বলছিল আমায়। বলছিল, “দাদাভাই, তুই খেলবি?”

আমি খেলতেই পারি। কিন্তু আজকাল শরীর কতটা দেবে কে জানে। তা ছাড়া আমার মনমেজাজও ভাল নেই। এটা শুধু যে ঘুষির এফেক্ট তা নয়। এর চেয়েও বড় এফেক্ট ফেলেছে ভিগ্লেসের সেই কথটা। সানিলা প্রেগন্যান্ট।

দেখুন, সানিলা রাও আমার জীবন থেকে চলে গিয়েছিল ছাব্বিশ বছর আগে। তখন আমি ছিলাম নেহাতই নড়বড়ে একটা টিনএজার ছেলে। তার পর আমার জীবন দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। মা মারা গিয়েছে। পৌষালির সঙ্গে প্রেম ও বিচ্ছেদ হয়েছে। আরও কয়েকটা প্রেম হতে-হতেও হয়নি। লেখক হিসেবে নানা ওঠা-পড়া দেখেছি। অফিসেও নানা ঝামেলা আমায় সামলাতে হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে আমি ভেবেছিলাম, মনের যে মাসল থাকে তা এমন ধরনের বিভিন্ন এক্সারসাইজের ফলে বেশ শক্তপোক্ত হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কোথায় কী! মনের মাসল যে এখনও যুবক চিন্ময় রায়। কবি ভাস্কর চক্রবর্তী, হয়তো আমার মতো এক পিস পৃথিবীতে আসবে ভেবেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন— এত কিশোর হলে হবে!

হবে না আমি জানি। কিন্তু মন বায়বীয় উপদ্রব বিশেষ। শালাকে বশ করে এমন গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত তাত্ত্বিক, ত্রিকালজ্ঞ, স্পেসে রকেট পাঠিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র সাজিয়ে-গুছিয়ে দেওয়া জ্যোতিষ, এখনও কোনও নিউজ চ্যানেল আবিষ্কার করতে পারেনি।

ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। আমাদের বাগানে যে বসন্তবৌরীটা রাজ আসে, সে আজ এসে দেখছে একজন আধদামড়া লোকের খোলে বেঁচে থাকা এক অবুধ কিশোর, ছুটির এক মেঘলা সকালে, তিন তলার নির্জন বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একা।

এই যে আগের দুটো প্যারাগ্রাফে বড় বড় সেনটেন্স লিখলাম তার কারণ, মনখারাপ হলে আমি দীর্ঘশ্বাসের মতো বড় বড় সেনটেন্স লিখি।

মনখারাপ কেন? কারণ প্রেম।

সত্যি, প্রেম আমাদের মনখারাপ করে দেয়। একা করে দেয়। হাজার লোকের মাঝেও একা করে দেয়। স্তব্ধ করে দেয়। প্রেম আমাদের এমন করে ভেঙে ফেলে যে, ভালবাসার মানুষ ছাড়া আর কেউ আমাদের জোড়া লাগাতে পারে না। কী ভাবে যে একজন মানুষ এত কোটি কোটি মানুষের মাঝে থেকেও কেবল একজনেরই প্রেমে পড়ে, সেটাই এক রহস্য। এক কেবল প্রকৃতির কৌশল? মানবজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার অসামান্য এক কৌশল? নাকি এর পিছনে আরও বড় কোনও মহাজাগতিক নকশা রয়েছে? নানা কিছু ভেবেও আমি এর তল পাই না। আমি ব্যক্তিগত জীবনে, গল্প, উপন্যাসে, কবিতায় এর অন্বেষণ করি। কিন্তু তার সঠিক হদিস পাই না। প্রেম আসলে এক সোনার হরিণ। দূরে, আলোছায়ার ডোরাকাটা জঙ্গলে, গাছের পাতার আড়ালে সেই হরিণের সামান্য অংশই দেখা যায় কেবল। পুরোটা কেউ কোনও দিন দেখতে পায় না।

আমি মেঘলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই ঘটনার পরে দু'দিন কেটে গিয়েছে। তবু কষ্ট তো কমেইনি, বরং বেড়ে গিয়েছে।

সেদিন ঘুষি খাওয়ার পরে আমি রাস্তায় পড়ে কিছুক্ষণ ভেবলে গিয়েছিলাম। আচমকা কেউ মার খেলে কেমন লাগবে তার? জানি না ভিগ্লেস আমায় আরও মারত কি না। কিন্তু হারুদা জ্যাক রড নিয়ে ভিগ্লেসকে মারতে আসায় ভিগ্লেস রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। আর আমি ধাতস্থ হয়ে ফুটপাথে বসে দেখেছিলাম, সানিলা এসে ভিগ্লেস আর হারুদার মাঝে দাঁড়িয়ে ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করছে।

আমি কোনও মতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। সারা মাথা বানবান করছিল ব্যথায়। আমি মারটা খেলায় কেন কে জানে? কী এমন বলেছি?

আমি দেখছিলাম, ভিগ্লেস এবার সানিলার পেছনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আড়াল করছিল।

আমি হাত তুলে হারুদাকে বলেছিলাম, “হারুদা ছাড়া।”

হারুদা আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, “আমাদের বাড়ির ছেলের গায়ে হাত দেওয়া? শুয়োরের বাচ্চাকে আমি আজ মেরেই ফেলব।”

ভিগ্লেস, সানিলার পেছন থেকে আমার দিকে তাকিয়ে “সরি সরি” বলে নাচছিল।

আমি এবার জোরের সঙ্গে হারুদাকে বলেছিলাম, “হারুদা বাদ দাও না। এমন করো না।”

হারুদা হাতের রডটা ঘুরিয়ে ভিগ্লেসের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, “এর পরের দিন তোকে যেখানে দেখব, সেখানেই কেলিয়ে আটা করে দেব। কথা দিলাম।”

মানুষ মাঝেমাঝে সিনেমার চরিত্রদের মতো কথা বলে আরাম পায়। সে দিন যেমন হারুদা পেয়েছিল।

সানিলা আমায় বলেছিল, “তুমি এসেছ কেন?”

আমি এত কিছু মধ্যও দেখেছিলাম, হেমন্তের বিকেলের রোদ এসে পড়েছে সানিলার মুখে। গালের ছোট্ট বাদামি তিলটা কেমন যেন স্বচ্ছ লাগছে। ওর বড় বড় শান্ত চোখের মণিটাও যেন বাদামি।

আমি মনের আর শরীরের কষ্ট সামলাতে সামলাতে বলেছিলাম, “পিসি মনখারাপ করছে। খুঁজিয়ে তোমায়। পিসি বারবার ফোন করছে। পিসি চায় তুমি বাড়ি এসো।”

সানিলা শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় বলেছিল, “তুমি ফিরে যাও রনো। আমি সময় করে যাব। মোবাইলটাও তখন নিয়ে আসব। পিসির কষ্ট হয়েছে যখন, আমি পিসির সঙ্গে কথা বলে নেব।”

সানিলা আর অপেক্ষা না করে সামনের বড় বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। ভিগ্লেসও ঢুকে গিয়েছিল পেছন পেছন। লোকটা আমায় মারল আর সানিলা তাকে কিছু বলল না।

আমি কিছু না বলে মাথা নিচু করে গাড়িতে ফিরে এসেছিলাম।

এক হয় শারীরিক ভাবে মাথা নিচু করা আর অন্যটা হয় মনের মধ্যে মাথা নিচু করা। সে দিন বিকেলের পর থেকে আমার মনের মধ্যকার মাথা-নিচু ভাবটা আর যাচ্ছে না। আমি নিশ্চিত, সানিলা আমায়

পৌষালির সঙ্গে দেখেছে। উল্টোপাল্টা কিছু ভেবেছে। ও তো আর জানে না সে দিন আমার মনোভাব কী ছিল।

“রনো, তুমি এখানে একা একা কী করছ?”

টুপুনের গলার স্বরে আমি পেছন ফিরলাম। একটা সুন্দর ফ্রক পরে টুপুন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমি হাসলাম। টুপুন এগিয়ে এসে হাত দিয়ে আমায় নিচু হয়ে বসার ইশারা করল। আমি ওর সামনে গিয়ে হট্টু গেড়ে বসলাম। টুপুন ভুরু কঁচকে হাত বাড়িয়ে আমার কানের আর চোখের মাঝের অংশটা দেখল। তার পর আলতো করে ছুঁয়ে বলল, “ব্যথা?”

আমি হাসলাম। বললাম, “একটু।”

টুপুন গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল। বলল, “তুমি সেক দাও। কমে যাবে।”

“তাই?” আমি হেসে সোজা হয়ে দাঁড়লাম এবার।

টুপুন বলল, “বাবা তো আজকাল ক্লাবে খেলে, আর প্রায় রোজই পায়ে লাগিয়ে আসে। মা তখন সেক দেয়। ওই যে একটা হট্টু প্যাড হয় না, ইলেকট্রিকে চলে। ওতে। দারুণ। তুমি দাও, দেখবে কাজ হবে।”

আমি ভাবলাম, মনের এমন হট্টু প্যাড হয়? যে-প্যাডে সেক দিলে সানিলাকে ভুলে যাওয়া যায়। ভুলে যাওয়া যায় ভিন্নেশের কথা। সানিলা যে প্রেগন্যান্ট, সেটা? এমন হট্টু প্যাড বাজারে আনতে পারেন না ইলন মাস্ক?

টুপুন বলল, “তুমি কি জানো একটা ব্যাপার?”

“কী ব্যাপার?” আমি জোর করে হাসলাম।

টুপুন বলল, “একটা কমেট আসছে। C/2022 E3 (ZFT)। ইউ নো দ্যাট?”

আমি অবাক হলাম, “এটা কী বললে?”

“আরে বাবা,” টুপুন মাথায় হাত দিল, “কিছু নিউজ দ্যাখো না।”

“তুমি দ্যাখো?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“পড়ি। ট্যাবে। মা বলে নিউজ পড়তে হয়। সেখানে পড়লাম একটা কমেট আমাদের সোলার সিস্টেমে এন্টার করেছে। আর সেটা দেখা যাবে। পৃথিবী থেকে ভিজিবল হবে।”

আমি অবাক হলাম। টুপুন খবর পড়ে। আমি নিজে খুব একটা পেপার পড়ি না। ইচ্ছে করে না। অনলাইন টুকটাক দেখে নিই মাত্র।

টুপুন বলল, “আর্যাম সো এক্সাইটেড। এই কমেটটা লাস্ট এসেছিল নিয়ান্ডারথালদের সময়ে। তার পর আবার এখন আসছে। মানে আফটার সো লং। ভাবো রনো। আচ্ছা, তুমি কখনও কমেট দেখেছ?”

আমি চোয়াল শক্ত করে নিলাম। আর এত বছর পরেও আমার মনে পড়ে গেল সেই বর্ণা... বিলম্বিত রোদ... আর বয়ে যাওয়া একটা ছিপছিপে নদী ছাপিয়ে ভেসে আসা ভ্যানিলা লিপপলসের গন্ধ, মিস্ট বাবলগামের স্বাদ। মনে পড়ে গেল আকাশে ছোট্ট জেট প্লেনের মতো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভেসে থাকা সেই আলোর দাগ। হেল বপ।

আমি বললাম, “অনেক আগে। তখন পৃথিবী অনেক সহজ আর সুন্দর ছিল। আমিও ইয়ং ছিলাম।”

টুপুন তাকাল আমার দিকে। তার পর বলল, “তুমি এখনও ইয়ং রনো। চলে একটু একটু সাদা দাগ আসছে, কালার করে নাও ইউ উইল বিকাম ইয়ঙ্গার।”

আমি হাসলাম। নাহ, রং করে সময়কে পিছানোর ইচ্ছে আর আমার নেই। জীবনের যেটা নিয়ম, সেই ভাবেই না-হয় সব হোক।

টুপুন জিজ্ঞেস করল, “কমেটের বাংলা কী গো? উরু?”

“কথাটা উরু নয়, উরু। আর কমেট উরু নয়। কমেট হল ধূমকেতু।”

“ধূমকেতু। ইয়েস।” টুপুন হঠাৎ মাথায় হাত দিল, “আরে, দ্যাখো কাণ্ড। ভুলেই গিয়েছি।”

আমি বললাম, “তুমি আবার কী ভুললে?”

“তুমি তো ব্রেকফাস্ট করোনি। তাই পিসিঠামি বলল, তোমায় জিজ্ঞেস করতে, খাবে কি না।”

আমি বললাম, “আমি লালুকে বলে দিয়েছি। আজ খেতে ইচ্ছে করছে না।”

“সে কী!” টুপুন অবাক হল, “ব্রেকফাস্ট ইজ দ্য মোস্ট ইমপোর্ট্যান্ট মিল। তুমি জানো না রনো?”

আমি হাসলাম, “জানি তো মা। তাও রোজ কি এক রকম ইচ্ছে করে?”

“ঠিক ঠিক,” টুপুন চট করে পিছনে দেখে নিয়ে বলল, “আচ্ছা রনো, একদিন আমায় বিরিয়ানি খাওয়াবে? সানিলা আন্টিকে বলেছিলাম। আন্টি বলেছিল খাওয়াবে। কিন্তু আন্টি তো চলে গেল। তুমি খাওয়াবে?”

আমি হাসলাম আবার। মাথা নাড়লাম।

“ইয়েস!” টুপুন খুশি হয়ে দৌড়ে চলে গেল।

আমি তাকিয়ে রইলাম। মনে হল ঘরের মধ্যে মেঘ করে আসছে এবার। সানিলা চলে গিয়েছে। গতকাল এসে ওর জামাকাপড় নিয়ে গিয়েছে। সবার সঙ্গে দেখা করেছে, শুধু আমার সঙ্গে করেনি। আমি যে কী করেছি! আমার মনের মধ্যে আবার আলতো ভাবে নড়ে উঠল একটা পর্দা।

আমি ঘরে গিয়ে টেবিলে রাখা ল্যাপটপটা অন করলাম। লিখতে হবে। আমি সচরাচর লেখার ডেডলাইন মিস করি না। আমায় যাঁরা লিখতে দেন, তাঁরা নিয়ম করে কাগজ বের করেন। ম্যাগাজিন বের করেন। সেটাতে দেরি করিয়ে দেওয়ার মানে হয় না। তা ছাড়া আমার লেখা তো আর অন্য কেউ এসে লিখে দেবে না। প্লাস লিখলে আমাকে টাকা দেওয়া হয়। প্রফেশনাল কাজ এটা। সময় মেনে চলাটা তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। লেখক হিসেবে বাড়তি ‘ক্রিয়েটিভ টাইম’-এর সুবিধে আমি নিতে চাই না।

আমার ল্যাপটপটা বুড়া হয়েছে বেশ। আড়মোড়া ভেঙে রেডি হতে সময় নেয় খুব। আমি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মাথা পুরো ব্লান্ড। কী লিখব আমি! কিছুই তো আসছে না মনে। কেমন একটা বিশাল বড় ফাঁকা হলঘর গিলে ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে। বুকের মধ্যেটা না হলে এমন করত না।

আচ্ছা, আপনানাই বলুন, সানিলা আর ভিন্নেশ এক সঙ্গে থেকেছে কাপল হিসেবে। তাতে ওদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে। যা খুব স্বাভাবিক। তার পর এখন জানতে পেরেছে যে, ওদের বেবি আসছে। হয়তো মিটমিটও হয়ে গিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। আমি জানি, এটাই হবে। ওরা কাপল। আর সেখানে আমি তিন নম্বর ছাগলছানা। কিন্তু তাও আমার মনের মধ্যেকার শহর, নগর, বন্দর এমন করে ধ্বংস হচ্ছে কেন? আমি তো সবটাই বুঝতে পারছি। কিন্তু তাও আমার মন এমন করছে কেন?

আমি বুঝতে পারলাম, কোনও কিছু জেনে নেওয়ার আর মেনে নেওয়ার মধ্যে হাজার হাজার মাইল পার্থক্য আছে। সব জেনেও এই মানতে না পারাটাই সমস্ত গোলমালের মূল।

“রনো,” দরজার কাছ থেকে এবার তামির গলা পেলাম।

দেখলাম, সামান্য উল্কাখুস্কো ভাবে তামি এসে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

আমি নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললাম, “কী রে তুই! হঠাৎ।”

তামি ঘরে এল এবার। তার পর আমার বিছানায় উঠে বসে একটা বালিশ টেনে কোলে নিল। আমি বুঝলাম আজ হয়েছে আমার লেখা। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, চেয়ার টেনে বসলাম।

তামি তাকাল আমার দিকে। তার পর বলল, “তুমি মাকে ফিরিয়ে দিয়েছ?”

“মানে?” আমি ঘাবড়ে গেলাম।

“কদিন আগে। মা কিসড ইউ, না? বাট ইউ ডিডন’ট কিস হার ব্যাক। রাইট?”

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে মাথা নামিয়ে নিলাম। তামির সঙ্গে আমি খুব ফ্রি। তাও সব কিছু একটা লিমিট আছে। পৃথিবীর সব কিছু

ততক্ষণই ভাল, যতক্ষণ তা একটা গম্বির মধ্যে থাকে। তামি এমন একটা প্রসঙ্গ তুলছে, যাতে ওর মা জড়িয়ে আছে। তাই ব্যাপারটা নিয়ে আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করছি না।

তামি আবার বলল, “রনো, উই আর লাইক ফ্রেন্ডস, রাইট। প্লাস মা আমাকে নিজে বলেছে। মা ক’দিন খুব ডাউন যাচ্ছে। তাই কাল রাতে আমি মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মা তখন বলেছে আমায়। মানে, আর থাকতে না পেরে বলে দিয়েছে। মানুষকে তো কাউকে একটা বলতেই হয়। জানো, মা খুব অপমানিত বোধ করেছে। তুমি কি মায়ের ওপর বদলা নিলে?”

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। কী বলব আমি? কিন্তু ওকে যখন পৌষালি নিজেই বলেছে, তখন আমারও ওকে না বলার কিছু নেই।

আমি একটু সময় নিয়ে তামিকে জিজ্ঞেস করলাম, “তোর কি মনে হয় তামি, আমি বদলা নেওয়ার মানুষ? আমার সঙ্গে অনেকেই খারাপ করেছে। কিন্তু আমি কোনও দিন বদলা নেওয়ার কথা ভাবিইনি। কারও ওপরই না। পৌষালিকে আমি কলেজে ভালবেসেছিলাম। তার পর অনেক দিন ওকে না পাওয়ার একটা কষ্ট আমার মধ্যে ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সেটা কেটে যায়। কোনও কিছু না খেতে-খেতে খাওয়ার ইচ্ছে চলে যায়, জানিস তো? তেমনই কোনও কিছু না পেতে-পেতে, পাওয়ার ইচ্ছেটাও চলে যায়। মন থেকে সরে যায়। আমি আর পৌষালির প্রেমিক নই তামি। আই ক্যানট কিস হার ব্যাক।”

তামি মাথা নাড়ল, “আমিও মাকে বুঝিয়েছি। বাট ইউ নো মা, না? শি ইজ আ জিন্দি বেবি। যা চাই তা চাই-ই।”

আমি হাসলাম, “এটা আমি জানি। কম দিন তো চিনি না। আসলে আমাকে চেয়েও না-পেয়ে এখন এমন লাগছে ওর। যদি আমি ওকে বলতাম যে, এখনও ভালবাসি, অমনি কিছু আমার ওপর থেকে ওর আগ্রহ হারিয়ে যেত। শি ইজ লাইক দ্যাট। অনেকেই এমন হয়। না পাওয়া অবধি অস্থির হয়ে থাকে। আর যেই মনে হয় পেয়ে গিয়েছে, অমনি তাকে হেলাফেলা করে। টেকেন ফর গ্রান্ডেড করে নেয়। তামি শোন, পৌষালির এই কষ্টটা কেটে যাবে। উই আর অল গ্রোন আপস।”

“নো উই আর নট,” তামি মাথা নাড়ল, “উই আর নট গ্রোন আপস রনো। উই প্রিটেন্ড টু বি। বাট উই আর নট। যাক গে। আমার এটাই জানার ছিল। মায়ের সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হয়। বাট আই লাভ হার দ্য মোস্ট। শি ইজ মাই গার্ল। তুমি একটা রিলেশনে যাও রনো। তা হলে দেখবে মা ঠিক হয়ে যাবে।”

রিলেশনে। আমার কেমন যেন বিদ্যুৎ-স্পর্শ লাগল। সামনে দুলে উঠল একটা মুখ। বড় বড় শান্ত চোখ। গালে তিল। রঙ্গন ফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁট। মনে পড়ল, এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করেনি। আর এ-ও মনে পড়ল, ও অন্য পুরুষের। ও আমার কেউ নয়।

“দাদা, শিগগিরি নীচে এসো। এক্ষুণি,” আচমকা লালু এসে হামলে পড়ল আমার দরজার ওপর।

ব্যাপারটা এতটাই আচমকা যে, আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। কেসটা কী! আমার হার্ট এমনিতেই খাঁচা খাচ্ছে, এরা কি সেটাকে ফেল না করিয়ে ছাড়বে না?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কী হয়েছে রে?”

লালু দাঁড়াল না। শুধু বলল, “এসো... এসে দ্যাখো।”

জানেন, আমি না সারাক্ষণই একটু ভয়ে ভয়ে থাকি। জীবনে কখন কী যে হয়ে যায় তার তো ঠিক নেই। তাই লালুর কথায় সত্যি বলতে কী, ভড়কেই গেলাম। কাকু, পিসি এদের বয়স হয়েছে। কিছু হয়ে গেলে!

আমি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। তামিও আমার পিছন পিছন এল।

একদম নীচের তলায় গিয়ে আমি থমকে গেলাম। সিঁড়িটা বসার ঘরেই গিয়ে থেমেছে। কিন্তু এ আমি কী দেখছি?

আমি অবাক হয়ে দেখলাম সোফায় বসে রয়েছে বাবা। আর এক

পাশে পিসিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে চলেছে টফিপিসি। আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। চূপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দেখলাম, বাবা হাসিমুখে আমাকে দেখিয়ে বলল, “এই এসে গিয়েছে অপদার্থ।”

বাবা হাসছে! আজ সত্যি বিরল একটা দিন। আমি ঘাবড়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। আর টুপুন দৌড়ে এসে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, “রনো দ্যাখো, ধুমকেতু এসেছে।”

চোদ্দো

‘At last... some peace Snowy... we are returning home now...’

বেশ কিছুদিন পরে।

(আমার মনখারাপ তো, তাই এগজ্যাক্টলি কতগুলো দিন সেটা গুলিয়ে গিয়েছে।)

এই গল্পহীন গল্প এবার শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁছোল। আমার একটু মনখারাপ করছে আপনাদের থেকে চলে যাব বলে। কিন্তু দিস ইজ লাইফ। চলে যাওয়াটাই জীবন। যে-লোকটি সকালে বলে গিয়েছিল সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে আজ হাতিবাগান মার্কেটে যাবে, সে আর ফিরল না। যে বলেছিল সঙ্গে থাকবে সারা জীবন, তার আচমকা একদিন অন্য একজনকে ভাল লেগে গেল। এক বন্ধু বলেছিল পাশাপাশি ফ্ল্যাট কিনে থাকবে। সেও বড় চাকরি পেয়ে চলে গেল অন্য কোনও ঝকঝকে, নির্জন দেশে।

চলে যাওয়া মানে যে, শুধু মারা যাওয়া তা তো নয়। চলে যাওয়া যে কত রকমের হয়। ছোট থেকেই এই চলে যাওয়া ব্যাপারটা নিয়ে আমার একটা কষ্ট আছে।

টোপের নামে আমার একটা ছোট লোমওলা কুকুর ছিল, জানেন। আমি ছিলাম টিনটিন আর টোপের ছিল আমার স্নোয়ি। দু’জনে সারা দিন একসঙ্গে থাকতাম।

আচমকা একদিন সকালে উঠে মা বলল, টোপের আর নেই। ক্লাস সিল্পে পড়ি তখন। সে যে কী কষ্ট হয়েছিল! টোপের নেই। আর পায়ে পায়ে ঘুরবে না? কোলে এসে ঝাঁপাবে না? আমি বিছানায় শুয়ে থাকলে আমার পাশে এসে ঘেঁষে শোবে না?

সেই এগারো-বারো বছর বয়সে আমি যেন প্রথম অনুভব করেছিলাম চলে যাওয়া মানে কী। কষ্ট পাওয়া মানে কী। জানেন, কষ্ট পেতে চিরকাল ভয় লাগে আমার। বাবাকে ছোটবেলায় সবচেয়ে বেশি ভালবাসতাম আমি। বাবা আমার পাশে বসে যখন কোনও গান গাইত বা গল্প বলত, আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবার মুখ চেপে ধরতাম। জিজ্ঞেস করতাম, “এটা কি কষ্টের গান?” “এটা কি কষ্টের গল্প?”

বাবা যদি “হ্যাঁ” বলত, তা হলে আমি কিছুতেই সেটা গাইতে বা বলতে দিতাম না। বাবার মুখ চেপে ধরে থাকতাম। সবাই বলত, “রনোটা এত ভিতু।”

কিন্তু সেই অল্পবয়সে আমি বুঝিনি কষ্টকে এমন মুখ চেপে ধরে আটকানো যায় না। বন্ধ করে রাখা যায় না।

তার পর তো কত কষ্ট পেয়েছি। কত জন ভুল বুঝেছে। ছেড়ে চলে গিয়েছে। অকারণে কষ্ট দিয়েছে, অপমান করেছে। আমিও নানা ভুল করেছি। আমার জন্যও অন্য লোকজন কষ্ট পেয়েছে। আমিও চলে এসেছি কারও না-কারও জীবন থেকে। আর এ সবার মধ্যে বুঝেছি, যাওয়া-আসা, কষ্ট-যন্ত্রণা জীবনেরই অঙ্গ। এর থেকে পালানো যায় না।

কিন্তু বলুন, পালানো না গেলেই যে সেটাকে মেনে নেবে মন, তা তো নয়। আমিও তাই আজও বিচ্ছেদ, কষ্ট, ভুল বোঝাবুঝি এ সব মেনে নিতে পারি না।

তাই আপনাদের কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় আমার কষ্টই হচ্ছে।

কিন্তু সব কিছুই তো শেষ আছে। তাই এই গল্পও যে শেষ হবে, এটাই স্বাভাবিক। আজ এই রাত আর সন্ধ্যাবেলার মাঝের ব্রিজে দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছে বিচ্ছেদের মতো সত্যি আর কিছু নেই।

আজ যে শুধু আপনারা চলে যাচ্ছেন, তা নয়, আজকের পর থেকে পিসিরও আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। কারণ, আজ পিসির এনগেজমেন্ট হয়েছে।

পিসি ছোট থেকে আগলে রেখেছে আমাদের। বাবা-কাকুর চেয়ে ছোট হলেও পিসিই কিন্তু আসলে আমাদের বাড়টাকে ধরে রেখেছিল। আমাদের সব আবদার, সব সমস্যা সমাধান করেছে পিসিই। এত দিন আমার যে মা নেই, সেটা পিসি কখনও বুঝতেই দেয়নি। তাই আজ পিসির জীবনের আনন্দের দিন হলেও, স্বার্থপরের মতো বলছি, আমার কিন্তু কষ্টই হচ্ছে।

সন্টলেকেই একটা বড় ব্যালোয়েট হল ভাড়া করা হয়েছে। তবে লোকজন বেশি বলা হয়নি। পিসিই না করেছে। বলেছে, “বুড়ো বয়সে বিয়ে করছি এই যথেষ্ট। আর ডেকে ডেকে লোক হাসানোর মানে নেই।”

আমি জানি আমরা প্রেম বা বিয়েকে একটা এজ গ্রুপের বাপের সম্পত্তি ভাবি। কিন্তু ভেবে দেখুন, ভালবাসা পাওয়ার অধিকার কিন্তু সবার আছে। তাই আমার বাবা এই বয়সে বিয়ে করলেও আমি রাগ করিনি, বা বিরক্ত হইনি। তবে হ্যাঁ, মানুষ তো, তাই প্রথম দিকে মায়ের কথা ভেবে একটা অন্য রকমের খারাপ লাগা এসেছিল।

তবে এখন এটাও ভাবি, মা মারা যাওয়ার পরে পরেই যদি বাবার একটা বিয়ে দিয়ে দিতাম, তা হলে বাবা হয়তো আরও ভাল থাকত।

যাই হোক বাবা এখন যে ভাল আছে, সেটা জেনে আমার আনন্দ হচ্ছে। সবাই ভাল থাকুক এটাই তো চাই। এক ফুঁয়ে নিভে যাওয়ার মতো জীবন আমাদের। কেন কেউ কষ্টে থাকবে বলুন।

তবে বিশ্বাস করুন, সে দিন মেঘলা সকালে বাবা আর টফিপিসিকে আমাদের বাড়িতে দেখে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। টফিপিসি ফিরে এসেছে বাবার কাছে। আর শুধু তাই নয় দু’জনে মিলে আমাদের বাড়িতে এসেছে। টফিপিসি ও আমাদের পিসি দু’জনে দু’জনকে জড়িয়ে ধরে আছে। মানুষ একটু নিজের ইগো ভেঙে হাত বাড়ালে কত ম্যাজিক যে হয়!

আমি পাশে দাঁড়ানো তামির দিকে তাকিয়েছিলাম। তামি হেসেছিল। বলেছিল, “যাক, কেউ না-কেউ তো তার নিজের পছন্দের মানুষকে পেলে।”

আমি পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সামনে। আমায় দেখে টফিপিসি চোখ মুছে হেসেছিল। আমার ভাল লেগেছিল দেখে। টফিপিসি চলে যাওয়ার পরে বাবা যা শুরু করেছিল। নিজেই রাগ দেখিয়ে হাবিজাবি করবে, আবার নিজেই পরে বাচ্চাদের মতো কান্নাকাটি করবে। আমার মনে হয়, বাবা-মায়ের লাভ ম্যারেজ হলেও আসলে বাবা-মা কমপ্যাটিবল ছিল না। টফিপিসির মধ্যে বাবা হয়তো খুঁজে পেয়েছে ভালবাসার মানুষকে। এমন তো হয়। আমি জানি। সবাই যে জীবনের শুরুতেই ‘মনের মানুষ’-কে পেয়ে যাবে, তা তো নয়। টাইমিংটাই হল আসল।

আমায় দেখে বাবা বলেছিল, “এই এসেছে অপদার্থ। তোর দ্বারা কি কিছুই হবে না?”

আমার দ্বারা যে কিছু হওয়ার নয়, সেটা তো অনেক দিন হল সবাই জেনে গিয়েছে। সেটাকে এখন আবার ট্রান্স খুলে বের করার কী আছে।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, “এত অপদার্থ কেন তুই? কিছুই বুঝিস না?”

আমি কী বুঝব? অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম বাবার দিকে।

টফিপিসি সবার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, “সানিলা আমার বাড়িতে এসেছিল। যে দিন তাদের বাড়ি থেকে চলে যায়, সে দিন সকালেই। এসে আমায় কনভিন্স করে যে, আমার ফিরে যাওয়া উচিত। আমি রাজি হয়নি প্রথমে। কিন্তু মেয়েটা এমন করে বলল। আর তার পর...”

টফিপিসি মাথা নামিয়েছিল।

আরে, আবার পজ! সবাই আজকাল এত সাসপেন্স ক্রিয়েট করে কেন?

বাবা টফিপিসির কথার খেই ধরে বলেছিল, “মেয়েটা আসলে তাদের এখান থেকে প্রথমে আমার বাড়িতে আসে। সেখানে আমাকে বোঝায়। মানে ঠিক বোঝায় না, ধমক-ধামক দেয়। বলে আমি ছোট হলে নাকি কান ধরে টানতে টানতে টফির কাছে নিয়ে যেতে। বলে, ইগো ধরে বসে থেকে লাভ কী? যাকে ভালবাসি তার কাছেই তো আমার যাওয়া উচিত। জীবন তো একটাই। তার পর আমাকে এক রকম জোর করেই টফির বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। আর...”

টফিপিসি এবার খেই ধরেছিল, “আর তার পর উনি এসে হাজির হন ঘরে। ভাব একবার। এটা কি নাটক? আমার যে কী লজ্জা লেগেছিল। নিখিলের সামনে... ইস। কিন্তু সানিলা বলল, জেশ্চার ম্যাটার করে। যে যাকে ভালবাসে, তাকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়াটা ম্যাটার করে।”

আমি বাবার দিকে তাকিয়েছিলাম। এবার বাবা নিশ্চয়ই কিছু বলবে। এরা দু’জনে যে ভাবে একে অন্যের সেনটেন্স কমপ্লিট করছে, আমি তো ভাবছি আমার সামনে কোনও ‘রম-কম’ চলছে।

হ্যাঁ, আমি ঠিক। বাবাই বলেছিল এর পর। বলেছিল, “আমার বয়স সেভেনটি টু প্লাস। শরীরে নানা সমস্যা শুরু হয়েছে। কখন যে চলে যাব। তাই মেয়েটার কথা শুনলাম। সারা জীবন রাগ করে থেকে থেকে আমি ক্লান্ত।”

টফিপিসি বলেছিল, “সানিলা আশ্চর্য মেয়ে। ও না থাকলে এমনটা হতই না। নিজেই উদ্যোগ নিয়ে যা করার করল। আমায় বলল, চলে যাওয়ার আগে এটা অন্তত করে যেতে চায় ও। চায় রনো যেন বাবার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে। কিন্তু মেয়েটা এত কেন করল কে জানে।”

কেন করল সানিলা। আমি যাতে নিশ্চিত থাকি? আমি? আমি নিশ্চিত থাকলে সানিলার কী? আমি কে হই ওর?

আচমকা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল সঙ্গে হয়ে আসা একটা ছোট্ট শহর। মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের পেছনের একটা লম্বা জলট্যাঙ্কি। আলোর ভাপ। জোয়ান মৌরির মতো পোকা, আর একটা মেয়ে বসে রয়েছে একটা ছেলের পাশে। আর ছেলেটা সেটা না বুঝে খেয়ে যাচ্ছে নিজের মনে।

পিং শব্দে আমার মাথার অ্যাস্টেনা খুলে গিয়েছিল যেন। আর আমি বুঝেছিলাম সানিলা কেন এ সব করেছে।

কিন্তু তা হলে ভিগ্লেশ! তা হলে আমার সঙ্গে দেখা না-করে চলে যাওয়া! সে সব কী? ভগবান মেয়েদের তৈরি করার পরে কেন যে একটা ‘হাউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড’ ম্যানুয়াল সঙ্গে করে দিয়ে দেননি। আর কী বলেছে ও? সবার একটাই জীবন? আর আমার? আমার কি দুটো? একটা নিলে আর-একটা ফ্রি টাইপ?

বাবা বলেছিল, “তুলি, আমি আজ বাবিকে ডেকেছি এখানে। আজই তাদের এনগেজমেন্ট আর বিয়েটার ডেট ঠিক করব। বাবির তো কেউ নেই সে ভাবে। এক বোন আছে। সে আর তার হাডব্যান্ডও আসবে। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই আর আমার ওপর রাগ করে থাকিস না।”

আমি দেখেছিলাম দরজা দিয়ে এবার বাবিকাকু ঢুকছে। সঙ্গে আরও দু’জন।

এ সব কী হচ্ছে? ইউরোপ থেকে এটা আমি কোন কলকাতায় ফিরলাম? এটা ইউটোপিয়া না ডিসটোপিয়া? পিসির কষ্ট, বাবার রাগ, সব হওয়া? নীল রোলার, লাল রোলার, তোমরা কি... তোমরা কি...

আমি আর না দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে সরে এসেছিলাম। আমি একটা সময়ের পরে একসঙ্গে এত কিছু নিতে পারি না।

তামি বলেছিল, “আমি আসি রনো। মা নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে যাবে, বলো?”

আমি নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে শুনেছিলাম, নীচে হাসাহাসি হচ্ছে। আর কেন কে জানে আমার মায়ের কথা মনে পড়ছিল খুব।

ঘরে ফিরে আমি মায়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। মনে মনে সেই তাঞ্জোর বেনারসির আঁচল ছেড়ে দিয়ে বলেছিলাম, “মা আর চিন্তা

কোরো না। বাবা ভাল আছে। তুমি যেখানেই থাকো, ভাল থেকে মা। একদিন তো দেখা হবেই।”

তার পরের দিনগুলো গিয়েছে এনগেজমেন্টের প্রস্তুতিতে। সানিলা আর ফিরে আসেনি।

আজ এনগেজমেন্ট হয়ে গিয়েছে পিসিদের। আমাদের আত্মীয়স্বজন, অফিসের লোকজন ছাড়া আর বাইরের দু’-একজনকে ডাকা হয়েছিল। বাবিকাকুর ও বোন, জামাইবাবু আর কয়েকজন বন্ধু এসেছে। এত বড় ব্যাক্সোয়েটে পঁচাত্তর জন লোক দেখে মনে হচ্ছে চার বছরের বাচ্চাকে ডাবল এক্স এল টি-শার্ট পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমি শুধু অবাক হয়েছিলাম এই দেখে যে, রাও সাহেব আসেননি। কী জানি কেন? সানিলা যে আসবে না সেটা তো জানিই। আমায় যে ভাবে এড়িয়ে গেল, তার পর আর আসে! প্লাস ও মা হতে চলেছে। ভিয়েশের সঙ্গে ওর একটা জীবন আছে। এখানে আসবেই-বা কেন? “একা একা বসে কেন?”

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম অমলদা। হ্যাঁ, এই লোকটাকে আমিই নিমন্ত্রণ করেছি। ওর জন্যই যে সানিলাকে খুঁজে পেয়েছিলাম, সেটা ভুলি কী করে?

অমলদার হাতে মদের গ্লাস। কিন্তু লসির মতো ভরা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কী অমলদা, খাবার খাবে না? শুধু এ সব খেলে হবে?”

অমলদা টলমলে গলায় আমায় পান্ডা না দিয়ে বলল, “তুলি সেই বিয়ে করল বল? আমি কি খারাপ ছিলাম?”

আমি হাসলাম, “তোমার তো অলরেডি বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মনে নেই।”

“তাই, না?” অমলদার চোখ বুঝে আসছে। মাতাল হয়ে গিয়েছে লোকটা।

আমি দূর থেকে হাত দিয়ে হারুদাকে ডাকলাম। মানে, অমলদাকে ধরে এক জায়গায় বসিয়ে দেওয়া দরকার।

অমলদা বলল, “জানিস, ছোটবেলায় আমাকে ধর্মেন্দ্রর মতো দেখতে ছিল। অভিনয়ে গেলে দিলীপকুমার হয়ে যেতাম। লেখালিখি করতে এসে সব মারা গেল। এ দেশে লেখকদের কেউ বেঁচে থাকতে সম্মান করে না। কারণ, এখানে সবাই সব বোঝে। শুধু দয়া করে লেখে না। লিখলে সবাই পঁচিশ-ছাব্বিশটা নোবেল পেয়ে যেত।”

হারুদা এগিয়ে এসে অমলদাকে ধরল, “আপনি এত মদ খেয়েছেন কেন?”

অমলদা হারুদার গলা জড়িয়ে ধরল। বলল, “দুঃখে ভাই দুঃখে। মদ তো পেন কিলার। তা ভাই, তুমি ক্ষুধা পেয়েছ?”

হারুদা ভুরু কুঁচকে তাকাল। আমি ইশারা করলাম যে মাতাল মানুষ, কথা ধোরো না।

হারুদা, অমলদাকে টেনে একটা সোফার দিকে নিয়ে গেল।

যেতে যেতে অমলদা বলল, “রণন, নভেল থেকে সিনেমা হলে, সিনেমা থেকে নভেল হবে না কেন ভাই? তার মানে লেখকরা সিনেমার লোকদের চেয়ে কি সুপিরিয়র? তা হলে সিনেমাওলাদের দেখলে মিডিয়া টু পাবলিক সবার এমন লালা পড়ে কেন মুখ থেকে? আর লেখকদের সবাই আবুলিশ ভাবে কেন? কেন? কেন? কেন হারুভাই, সবার কি ক্ষুধা পেয়ে গিয়েছে?”

আমি এই জন্য কাকু আর বাবাকে বলেছিলাম ককটেল ডিনার না রাখতে। জানতাম, মাতালদের সামলাতে হবে। কিন্তু আমার কথা কে কবে শুনেছে?

আমি উঠলাম। এই গল্প থেকে এবার আমার বেরিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। আমার মন ভাল নেই। তা ছাড়া সবাই এখন ব্যস্ত। আমি না থাকলেও কারও কিছুটা চোখে পড়বে না।

আমি ধীর পায়ে বেরিয়ে এলাম হল থেকে। আমার গাড়িটা রাখা আছে রাস্তার পাশে। গাড়িতে উঠে আমি বিরাট বড় বাড়িটার দিকে তাকলাম। আলোয় ঝলমল করছে। খুশির আলো। মানুষের জীবনে

খুশিও কি ধুমকেতুর মতো?

আমি গাড়ি স্টার্ট করে ব্যাক্সোয়েটের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লাম। সামনে সিগনাল। এতক্ষণ সবুজ ছিল, কিন্তু আমি কাছে যেতেই লাল হয়ে গেল।

আমার হাসি পেল এবার। ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে।

সিগনালের পাশে কাউন্টার চলছে। একশো আশি সেকেন্ড। এদিকে আশপাশে গাড়ি নেই। আমি একা। পরিত্যক্ত শহরের পরিত্যক্ত মানুষ যেন। অপেক্ষা করতে লাগলাম।

টকটক করে আচমকা পাশে শব্দ হল। কাছে কেউ টোকা দিচ্ছে। কে আবার! আমি পাশে তাকলাম আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। আরে, এ কে? সানিলা রাও।

কাচের ও পারে সানিলা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মেয়েটা বেশ সেজেছে তো। কেমন একটা গাউন টাইপ ড্রেস পরেছে। মাথায় একটা ভেল। এখানে সানিলা কী করছে?

আমি কাচ নামলাম।

সানিলা বলল, “ওপেন দ্য ডোর।”

আমি যন্ত্রের মতো দরজা খুলে দিলাম। সানিলা উঠে বসল আমার পাশে। তার পর দরজা বন্ধ করে সামান্য ঘুরে তাকাল আমার দিকে। জিজ্ঞেস করল, “তুমি আবার পালাচ্ছিলে?”

“পালাচ্ছিলাম? না তো। এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করছিল না।”

সানিলা জিজ্ঞেস করল, “আমি যে আসব, আন্টি বলেনি?”

“না তো।”

সানিলা ভুরু কুঁচকে তাকাল। তার পর আলতো হাতে মাথার ভেলটা খুলে ফেলল। আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম সানিলা ছোট করে চুল কেটেছে।

সানিলা বলল, “এমন দেখেছিলে, স্বপ্নে?”

আমি শুধু বললাম, “ভিয়েশ এ ভাবে দেখলে রাগ করবে।”

“আর তোমায় পেটাবে। তাই না? এত ভিত্তি কেন তুমি। তোমায় কেউ মারলে তুমি তাকে ছেড়ে দেবে?” সানিলা সোজা তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

“দ্যাখো, ও তোমার বয়ফ্রেন্ড। তোমাদের বেবি আসছে। আমি তাই ওকে নিয়ে কিছু বলতে চাই না।”

“বেবি? পাগল তুমি? ভিয়েশ অমন অনেক কিছু বলে। ডার্টি লায়ার। দূর করে দিয়েছি ওকে। ব্যাক্সের কাজ ছেড়ে দেওয়া আর ভিয়েশকে দূর করে দেওয়া— এই বছরের দুটো ভাল এলিমিনেশন আমার। আর দুটো ভাল অ্যাডিশনও আছে। এক নভেল লেখা। আর দুই...” সানিলা থেমে আবার সাসপেন্স ক্রিয়েট করল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “দুই?”

“তুমি। আবার তোমার কাছে আসা।” সানিলা আমার দিকে ঝুঁকে আমার কোটের লেপেল ধরে টেনে চোখে চোখ রাখল। শান্ত বড় বড় চোখ। আলো। এত আলো যে আমি তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। চোখ নামিয়ে নিলাম। ও সামান্য হাসল। তার পর আমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। দাঁত দিয়ে অল্প কামড়াল আমায়। আর এত বছর পরেও আবার ফিরে এল সেই বার্না... ঝিলমিলে রোদ... আর একটা ছিপছিপে নদী। ফিরে এল ভ্যানিলা লিপপ্লসের গন্ধ, মিন্ট বাবলগামের স্বাদ।

সানিলা আমার গালে হাত দিয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বলল, “ইউ ফাউন্ড মি।”

আমি কিছু না বলে ওর সুন্দর হাতটা ধরে রইলাম শুধু।

সানিলা আবার বলল, “বাবা কাল আসবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে। বাবা জানে তুমি ভেজিটেরিয়ান। বাবাকে সেটাই বলবে কিন্তু। কেমন?”

আর, আমি হাসলাম। উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে আকাশের দিকে তাকলাম। দেখলাম ওই দূরে, চাঁদের ওপরে, রাত্রির কালো চুলের মাঝে রূপোলি বাকের মতো জেগে আছে একটু দাগ। আলোর দাগ। দেখলাম, আলোর ছোট রুমাল নেড়ে টুপনের সেই ধূমকেতু ভেসে যাচ্ছে অনন্তের দিকে।

ভেসে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে... কিন্তু সে-ও এক দিন ফিরে আসবে আবার। একদিন আবার দেখা দেবে মানুষকে।

আসলে সব কিছুই ফিরে আসে। এ জীবন সমুদ্রের মতো, তাতে আপনি যা-ই ফেলে দিন না কেন, দেখবেন একদিন না-একদিন সে ঠিক কোনও না-কোনও ভাবে আপনার কাছে ফিরে আসছে। হ্যাঁ, তাতে কষ্ট থাকবে, রাগ থাকবে। কিন্তু জানবেন, তাতে আবার নীল রোলার, লাল রোলারও থাকবে। শুধু একটু পরিশ্রম আর সততা দিয়ে আপনাকে সেটা মেনে নিতে হবে মাত্র।

সানিলা আমায় ঠেলল, “চলো, সিগনাল হয়ে গিয়েছে।”

আর আমি দেখলাম লম্বা রাস্তায় দূর অবধি সার-সার সিগনাল আজ কিসের জাদুবলে যেন সবুজ হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

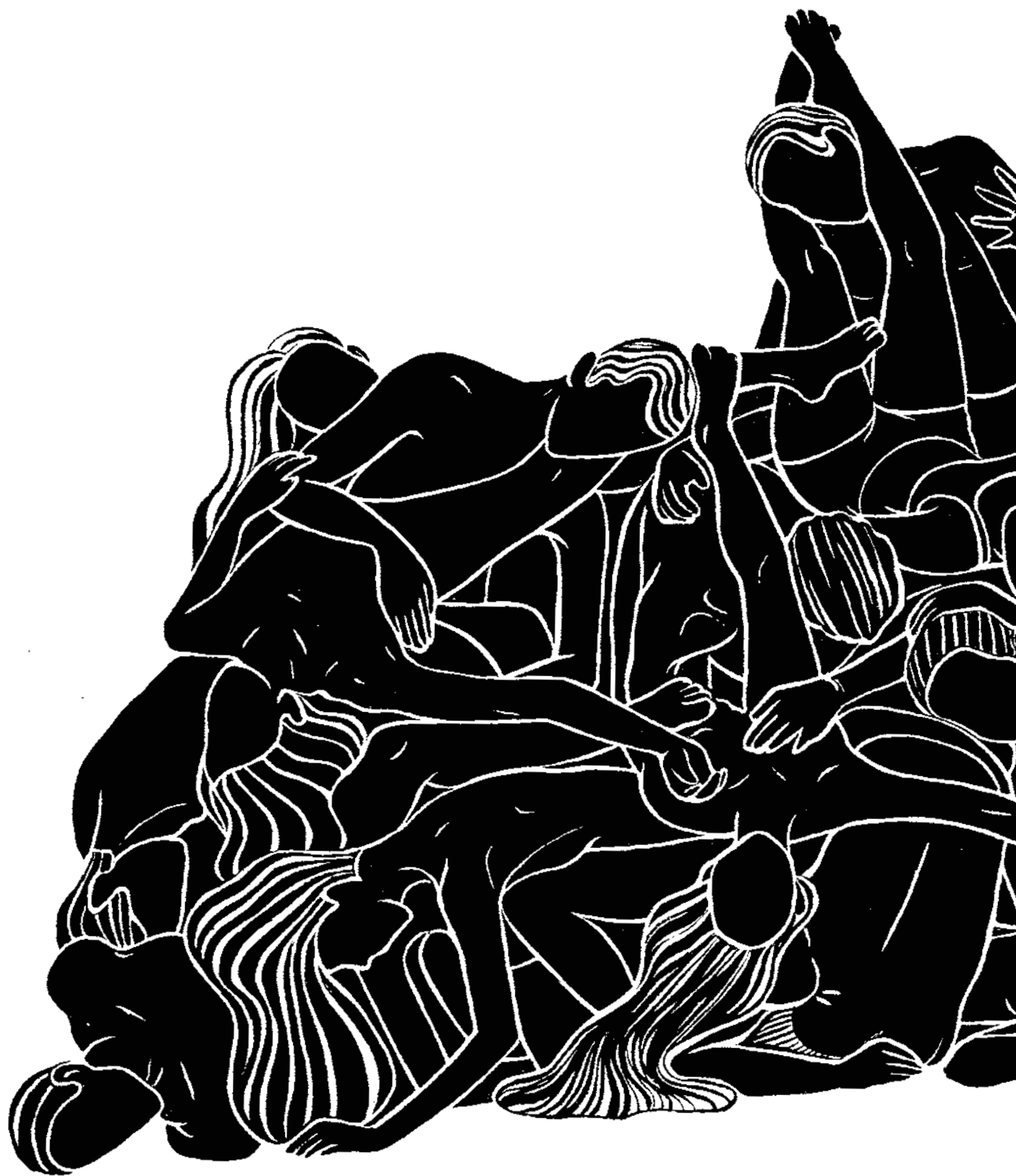
আমি হেসে গাড়ি স্টার্ট করলাম। তার পর অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে বেরিয়ে গেলাম এই গল্প থেকে। মিলিয়ে গেলাম হেমন্ত-রাতের নির্জন হাওয়ায়।

আর মানুষের সমস্ত ভালবাসা, যন্ত্রণা, রাগ এবং মনখারাপের অনেক অনেক ওপরে, আকাশে জেগে রইল আলোর সেই ছোট রুমাল। জেগে রইল আর ভেসে যেতে লাগল অন্তহীন জীবনের দিকে।

(নীল রোলার, লাল রোলার এবং টুপুনের ধূমকেতু ছাড়া এই গল্পের আর সব কিছু কাল্পনিক)

অঙ্কন: অমিতাভ চন্দ্র



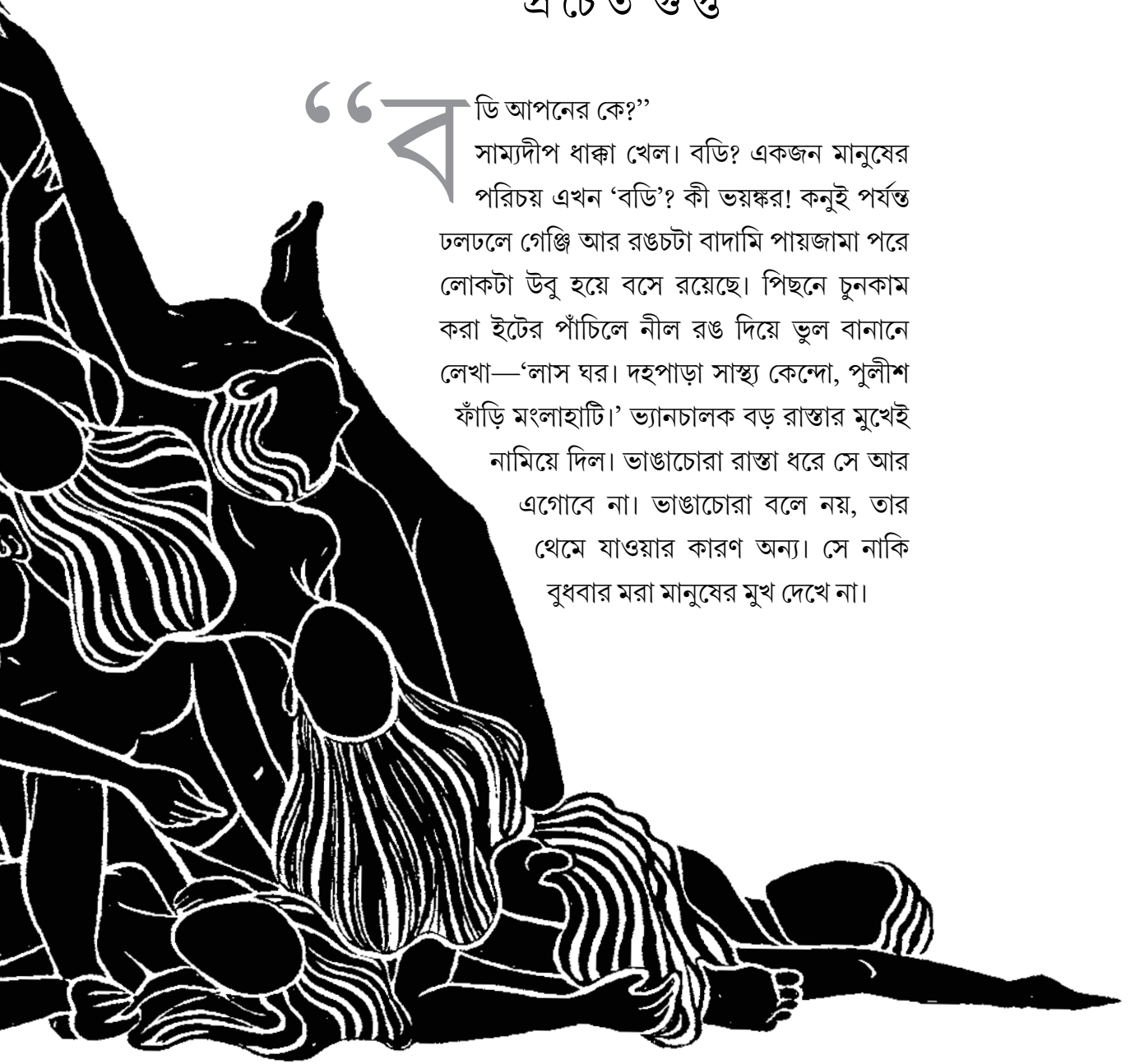


শরীরের ভিতর শরীর

প্র চে ত গু গু

“বডি আপনার কে?”

সাম্যদীপ ধাক্কা খেল। বডি? একজন মানুষের পরিচয় এখন ‘বডি’? কী ভয়ঙ্কর! কনুই পর্যন্ত ঢলঢলে গেঞ্জি আর রঙচটা বাদামি পায়জামা পরে লোকটা উবু হয়ে বসে রয়েছে। পিছনে চুনকাম করা ইটের পাঁচিলে নীল রঙ দিয়ে ভুল বানানে লেখা—‘লাস ঘর। দহপাড়া সাস্থ্য কেন্দ্র, পুলীশ ফাঁড়ি মংলাহাটি।’ ভ্যানচালক বড় রাস্তার মুখেই নামিয়ে দিল। ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে সে আর এগোবে না। ভাঙাচোরা বলে নয়, তার থেমে যাওয়ার কারণ অন্য। সে নাকি বুধবার মরা মানুষের মুখ দেখে না।



সাম্যদীপ অবাক হয়ে বলল, “সে কী! কেন?”

প্যাডেলে চাপ দিয়ে বয়স্ক ভ্যানচালক বলে, “এ আমাদের বংশের নিয়ম। বুধে দেখি মরা মুখ/সব বুধে পাবে দুখ। এর অথো কী? এর অথো হল, কোনও এক বুধবারে যদি তুমি মিত্ত্য দেখো, প্রতি বুধবারেই তোমায় মিত্ত্য দেখতে হবে। অন্যদিনে এ সমস্যা নাই।”

সাম্যদীপ আরও অবাক হয়ে বলল, “পরিচিত কেউ বুধবার মারা গেলে কী হয়? মুখ দেখো না?”

ভ্যানচালক বিরক্ত গলায় বলল, “সাতসকালে অলুস্কুনে কতা বলেন কেন? আমার পরিচিতি কোন দূকে বুধে মন্তে যাবে? আমার সাত শতুরের পরিচিতি কেউ মরুক গিয়ে।”

সাম্যদীপ বুঝতে পারল, কথটা বেঁফাস বলা হয়েছে। সে শান্ত গলায় বলল, “আহা, সে কথা বলিনি। বলছিলাম, এখানে তুমি মৃতদেহের মুখ দেখবে কেন? তুমি তো বাইরে অপেক্ষা করবে। আমি চট করে ফিরব। পুলিশফাঁড়িতেও ফিরতে পারি, আবার কলকাতা ফেরার বাসও ধরতে পারি। তুমি বাসগুমটিতে নামিয়ে দেবে। ওখানে কাজ কেমন হয়, তার ওপর আমার ফেরাফেরি নির্ভর করছে।”

এতটা বিশদে বলার দরকার ছিল না, তারপরেও সাম্যদীপ বলল, যদি মুখের ফসকানো কথটা সামলানো যায়। সামলানো গেল না। ভ্যানচালক গামছা দিয়ে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে বলল, “বললুম তো, ওই ঘর পর্যন্ত যাব না, কেন যাব না সে কতা আপনারা শহরের লোক, বুজবেন না। আপনাদের কাছে সোমবারও যা, বুধবারও তাই। আমাদের কাছে বারে বারে তফাত আছে। সোমের কাজ মঙ্গলে হয় না, আবার মঙ্গলে যা করার, তা বুধে করা মানা। যাক, এসব বুজবেন না। বাকি পথ আপনে হেঁটে যান। খানিক গেলেই বাম দিকে মোড় পড়বে, সেটা ঘুরলে দেয়ালে লেখা রয়েছে দেকবেন, দশ-বারো মিনিটের মামলা।”

দশ-বারো মিনিটের খানিকটা বেশিই লেগেছে। তবে পাঁচিলের গায়ের লেখা চোখে পড়ছে দূর থেকে। এই লেখার কথা ফাঁড়ির হাবিলদারই বলে দিয়েছিল। মানুষটা গোপ্তে ধরনের। কাজের থেকে গল্প বেশি পছন্দ করে মনে হল।

“একসময় এই মর্গ হেলথ সেন্টারের পিছনেই ছিল, কুকুর-শিয়াল চলে আসত।”

সাম্যদীপ অবাক হয়ে বলল, “শিয়াল! এখানে শিয়াল আছে নাকি!”

হাবিলদার বলল, “কেন থাকবে না? বাইরেটুকুই যা শহর-শহর দেখতে, ভিতরে গেলেই তো গাঁ। পুকুর, মাঠ, খেত, রোপবাড়, খালও তো রয়েছে। দু’পাড়ে আগাছার জঙ্গল। শিয়াল থাকতে অসুবিধে কী!”

সাম্যদীপ খতমত খেয়ে বলল, “ও, আমি জানতাম না।”

গল্পের বেগ থামতে পারল না হাবিলদার। বলল, “মরার গন্ধে শিয়াল হেলথ সেন্টার পর্যন্ত তো চলে আসত। গেট, দেয়াল বলে তো কিছু ছিল না, এখনও নেই। শুধু শিয়াল কেন, ইঁদুরের জ্বালাতনও ছিল, খেড়ে ইঁদুর সব। মাঠের ফসল ছেড়ে মরা খায়। মনে হয়, টেস্ট ভাল পেত। তবে হারামজাদারা তো আর শুধু মর্গে থাকত না, হেলথ সেন্টারের ভিতরেও ঘুরঘুর করত। একবার হল বিরাট ঝামেলা। এক পেশেন্ট ভোররাতে পায়ে খেল কামড়। কামড় শিয়ালের হতে পারে, আবার ইঁদুরেরও হতে পারে। হারামজাদারা জ্যান্ত শরীরকে মরা শরীর ভেবেছিল নিশ্চয়ই। পরদিন থেকে তুলকালম কাণ্ড। কোথা থেকে খবর পেয়ে খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেলের লোক চলে এল, পলিটিস্ক্রের নেতারা চলে এল, পাবলিক এল। আমাদেরও বাঁশ গেল। বিস্ফোভ, ভাঙচুর, পথ অবরোধ। একেই তো হেলথ সেন্টারের অবস্থা খারাপ, তার ওপর গোলমাল। একে সাসপেন্ড, তাকে বদলি করা হল। শেষপর্যন্ত মর্গটাকেই সরিয়ে দেওয়া হল।”

সাম্যদীপ বলল, “কত দূরে?”

হাবিলদার বলল, “ভ্যান ধরে মিনিট কুড়ি যেতে হবে। হাইওয়ে থেকে রাস্তা নেমে গিয়েছে। চিনতে অসুবিধে হবে না। পাঁচিলের গায়ে বড় করে লেখা রয়েছে, দূর থেকেই দেখতে পাবেন। ভ্যানে দর করে উঠবেন, বাইরের লোক দেখলে বেঁটা বাঁশ হাঁকে।”

“একটা কাগজে একটু লিখে দেবেন নাকি? যদি দেখাতে না চায়?”

হাবিলদার মুখ তুলে বলল, “এইটা একটা বোকা কথা হয়ে গেল না? আমার কি লেখার ক্ষমতা আছে? বড়বাবুর জন্য অপেক্ষা করুন। কাল সকালে মাঠে হাগতে গিয়ে এক আসামি কোমরের দড়ি খুলে চম্পট দিয়েছে। দড়িতে একটা থান ইট বাঁধা ছিল। ওই ইট ফাঁড়ির ইয়েতে গেছে। বড়বাবুকে সদরে ডেকে পাঠিয়েছে, ফিরতে বিকেল তো হবে, রাতও হতে পারে। শালার সাসপেন্ড না হতে হয়। এখন আবার লেখালিখি করে মরব নাকি?”

আসামি পালালোর ঘটনা থানায় বসে এমন গল্পের ছলে বলা যায়, সাম্যদীপের জানা ছিল না। সে আমতা আমতা করে বলল, “তাহলে?”

“তাহলে কী করতে হবে আপনার জানা নেই? এতদিন ধরে ঘুরছেন, কিসে কাজ হয় জানেন না?”

ফাঁড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে সাম্যদীপ। হাবিলদারের কথা ঠিক, পাঁচিলের লেখা খানিকটা দূর থেকেই দেখা গিয়েছে। সামনে উবু হয়ে বসে-থাকা লোকটার গালভর্তি খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। বয়স বোঝার উপায় নেই। পঞ্চাশ হতে পারে, আবার ষাটও হতে পারে। বিড়ি ফুঁকছে। সেই বিড়ি বারবার নিভেও যাচ্ছে। নিভে-যাওয়া বিড়ির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে হাতের মুঠোয় রাখা গোলাপি লাইটার টিপে সেটা জ্বালাচ্ছে ফের। লাইটারটাও ঠিক মতো জ্বলে না, শুধু আওয়াজ করে। সামান্য একটা বিড়ি খেতে গিয়ে এত বাধা সত্ত্বেও লোকটার ভাব নির্লিপ্ত। মর্গের সামনে কারও এমন নির্লিপ্ত ভাব দেখলে কেমন গা-ছমছম করে। গত কয়েকদিন ধরেই সাম্যদীপের এরকম মনে হচ্ছে। এই নির্লিপ্ত ভঙ্গি যেন বলে, আসলে বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া দুইই সমান। একটা জীবনে দুটোর একটা হলেই চলবে। তাই নিয়ে মাতামাতির কোনও মানে নেই।

লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল, “কী হল? বললেন না, বডি আপনার কে হয়?”

এই প্রশ্ন নতুন নয়, গত দশদিন শুনতে হচ্ছে। থানা-পুলিশে গেলে প্রথমেই জানতে চাইছে, কে আপনি? তারপর মর্গে নিয়ে যাচ্ছে। তবে উত্তরে তেমন গুরুত্ব নেই, একটা কিছু বললেই হল। সম্ভবত একেবারে প্রাথমিক পর্যায় বলেই।

“আমি পরিচিত, খবর পেয়ে ছুটে এসেছি। যদি একবার দেখবার ব্যবস্থা করে দেন।”

বাস, এইটুকু বললেই হচ্ছে। আসলে বেওয়ারিশ মৃতদেহ কে-ই বা ঘরে পুষে রাখতে চায়? পুলিশ, হাসপাতাল, মর্গ সবাই গা-ঝেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচে। মরা শরীরের হ্যাঁপা অনেক। বেশিদিন জায়গা আটকে থাকলে সমস্যা। পচবে, গলবে, শিয়াল-কুকুরে টানাটানি করবে। তারপর পোড়াতেও সমস্যা। সরকারের খরচপাতি আছে, বেওয়ারিশ মরা পোড়ানোর জায়গা পেতে বাকি। যেখানে জীবন্ত শরীরের ওপর মাথায় ছাদ জোটানো কঠিন, সেখানে মরা শরীর ঘরবাড়িতে রাখা ঝামেলা ছাড়া আর কী? সেই ঘরবাড়ি হাসপাতালের পর্দা ঘেরা বেডই হোক, অন্ধকার মর্গই হোক অথবা পুলিশ টোকির পিছনের বারান্দায় বস্তা মুড়ে থাকাই হোক, এ শরীর গেলে আপদ বিদায়। তাই প্রথম পর্বে অত জেরা থাকে না। তা ছাড়া ‘আমি পরিচিত’ বললেই তো আর মৃতদেহ কারও হাতে তুলে দেওয়া যায় না, আগে ঠিক মতো আইডেনটিফিকেশন হবে, তারপর কাগজপত্র দেখলে বোঝা যাবে, কেমন ‘পরিচিত’। তাই কেউ দেখতে চাইলে ‘আগে দেখিয়ে দাও’ গোছের একটা ভাব সবাইরই থাকে। তবে খরচ লাগে, খুব বেশি নয়, তবে লাগে। সাম্যদীপ তৈরিই থাকে, হালকা দরদামের পর আর কথা বাড়ায় না। দরদামের কথাটা বিতান বলে দিয়েছে।

“এক কথায় রাজি হবি না, পেয়ে বসবে। পরে কাজ করতে গেলে দ্বিগুণ, তিনগুণ চাইবে।”

মর্গের লোক অল্পে মেনেও নেয়। মুখে কাপড় বেঁধে ঘরে ঢুকে পড়ে। ঢোকবার আগে সাবধান করে।

“অভ্যেস আছে?”

“আগে ছিল না, ক’দিনে কিছুটা হচ্ছে।”

“ভাল, সঙ্গে রুমাল-টুমাল এনেছেন কিছু? সেন্ট? আতর?”
“এনেছি।”

“আতর ঢেলে নাকে চেপে ধরুন। এরপর থেকে বড় কাপড় নিয়ে ঘুরবেন। শরীরে উলটি দিলে ছুটে বাইরে যাবেন। নর্দমার পাশে বসে পড়বেন চট করে, দরজার গোড়ায় বালতিতে জল আছে।”

“মনে হয় না লাগবে।”

দহপাড়া মগের উবু হয়ে বসে থাকা এই লোক একটু বেশি কথা বলছে। এত পরিচয়ের ওর দরকার কী? টাকা বাড়ানোর মতলব? সাম্যদীপ কঠিন কথা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলাল, গোলমাল হলে মুশকিল। এরা বেকঁবে বসলে কিছু করা যাবে না। হাজার ফাঁকড়া তুলতে পারে। জীবিত, মৃত সবরকম শরীর নিয়ে যে ব্যবসা আছে সাম্যদীপের জানা ছিল, তবে এতটা আছে, জানা ছিল না। চেনা, অচেনা শরীরের আলাদা-আলাদা দাম। একই শরীর জীবন্ত অবস্থা যতটা দাম চায়, মৃত্যুর পর দাবি করে আর এক রকম। এক সময় ধারণা ছিল, বেকঁবে থাকা মানুষই সবার আগে, তার মূল্য সব থেকে বেশি। গত দশদিন ছোট্ট ছুটির পর এই ধারণা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সাম্যদীপ জানে, এখন আর নিশ্চিত হয়ে সে বলতে পারবে না। একটি মৃত শরীরের জন্য সে যেভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে, সময় এবং অর্থ খরচ করছে, তারপরেও কি নিশ্চিত হয়ে বলা যায়, কার দাম বেশি?

উবু হয়ে বসা লোকটিকে সাম্যদীপ শান্তভাবে বলল, “উনি আমার পরিচিত।”

চলচলে গেঞ্জি পরা লোক মুখ তুলে একমুখ ঘন ধোঁয়া ছেড়ে দার্শনিক ভঙ্গিতে বলল, “এইটা কেমন কথা হল ভাই? দুনিয়ার সবাই তো পরিচিত। কারও সঙ্গে চেনাজানা আগে, কারও সঙ্গে পরে। কেউ পরিচয়ের পরেও চিনতে চায় না, কেউ আবার পরিচয় হল কি হল না, বুকে জড়িয়ে ধরে। দুনিয়াটাই এমন। পরিচিত অপরিচিততে সর্বক্ষণ লুকোচুরি খেলা চলে। চলে কিনা?”

নিশ্চয়ই লোকটা সকালেই নেশা করে নিয়েছে। নইলে এত বকবে কেন? এই জায়গায় কাজ করতে হলে নেশাভাঙ ছাড়া উপায় নেই। দশদিন সময়ের হিসেবে খুব বেশি দিন নয়, তাও কম দেখা হল না সাম্যদীপের। কলকাতার বড় হাসপাতালের মর্গ থেকে গাঁ-গঞ্জের টিমটিমে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ‘লাশ ঘর’ পর্যন্ত ছুটছে, যেখানে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

“অজ্ঞাত পরিচয়ের মহিলা, বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ বৎসর। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল। উচ্চতা পাঁচ ফুটের একটু বেশি। বাম ভুরুর ওপরে কাটা দাগ, ডান গালে আঁচিল। নাক লম্বা, কপাল চওড়া। কানে দুল, বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে আঁচিল। পুলিশ মূর্তের পরিচয় জানতে পারেনি।”

শুধু যে খবরের কাগজের এই ‘খবর’ পড়ে সাম্যদীপ যাচ্ছে এমন নয়, মুখেও ‘খবর’ আসছে। সবথেকে বেশি সাহায্য করছে বিতান। বিতান রায়। স্কুলে সাম্যদীপের সঙ্গে পড়েছে। ক্লাসে পাশাপাশি বসত। বাবা বদলি হওয়ায় স্কুল ছেড়ে একদিন উধাও হল। সেই বয়সে বন্ধু হারানো আর বন্ধু পাওয়া কঠিন কিছু নয়। তবে পুরনো বন্ধুরা কেউ কেউ ফিরেও আসে। বিতান এল যেমন। বহু বছর পর একদিন ছট করে ডালহৌসিতে দেখা। ওদিকটা যাওয়া হয় না সাম্যদীপের। অফিসে যেতে হাওড়া স্টেশন থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জার করে। শোভাবাজার ঘাট হয়ে লঞ্চে গঙ্গা পার হয়। উল্টোডাঙা থেকে এই পথটাই সহজ, আরামদায়কও। সেদিন ফিরেছে ডালহৌসি হয়ে। খুঁজে পেতে একটা ছোট টেবিলফ্যান কিনতে হয়েছিল। টেবিলফ্যান পাড়ার দোকানেও পাওয়া যায়, কিন্তু চারপাশে মাথা ঘোরানো জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল না। অথচ উজ্জয়িনী সেরকমই চেয়েছিল। আজকাল রাতে তার বেশি গরম লাগে, শুধু সিলিং ফ্যানের হাওয়ায় ঘুম হয় না। বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। তাই অতিরিক্ত ব্যবস্থা।

“এমন ফ্যান দিতে বলবে, চারপাশে যেন হাওয়া দেয়, এদিক-ওদিক সরাতে না হয়।”

সাম্যদীপ বলেছিল, “সব টেবিল ফ্যানই তো দু’পাশে মাথা নাড়ে উজ্জয়িনী।”

উজ্জয়িনী বলল, “মাথা উপর-নীচে ঘোরাও চাই।”

খাটের ঠিক পাশে টুল রেখে টেবিলফ্যান চালানোর ব্যবস্থা হল। রাতে শোবার আগে স্নান করে ঘরে আসে উজ্জয়িনী। নাইটি বা তোয়ালে ধরনের কিছু বুকের ওপর ধরে উদ্যম গায়ে নতুন ফ্যানের সামনে এসে বসে সে। গায়ের জল মোছে না। বিছানা যে ভেজে, সেদিকে খেয়াল নেই। সাম্যদীপ নরম গলায় বলে, “ঠান্ডা লেগে যাবে।”

উজ্জয়িনী বলে, “থাক। আলোটা নিভিয়ে দাও।”

স্ত্রিং লাগানো পুতুলের মতো সেই টেবিলফ্যান মাথা যেমন দু’পাশে ঘোরায়, তেমন উপর-নীচ ওঠা-নামাও করে। উজ্জয়িনীর এ কাঁধ থেকে ও কাঁধে, গলা থেকে নাভিতে, উরুতে বাতাসের স্পর্শ দেয়। এক সময় উজ্জয়িনী হাতে ধরে-থাকা আবরণটুকু সরিয়ে ফেলে, অন্ধকারে নগ্ন শরীর ভেসে ওঠে ছায়ার মতো। জানলার ফাঁক দিয়ে আসা আলো তার মুখ, গলা বেয়ে বুক, উরুতে, পায়ের পাতায় নামে টুইয়ে। পেনসিলের দাগের মতো অকিঞ্চিৎকর অথচ গভীর রেখায় জেগে ওঠে আঠাশ বছরের মেদহীন, অকপট শরীর। জলে ভিজ়েও যা আগুনের মতো দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে, পুড়ে যাওয়ার হাতছানি দিয়ে। সাম্যদীপের শরীর কঁপে ওঠে, কামনা জাগে প্রবল। কপালে ঘামের বিন্দু, নাকের পাটা ওঠে ফুলে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে তার। জলে আধো ডুবে-থাকা পিছল পাথরের মতো উজ্জয়িনীর ঠান্ডা কাঁধে হাত রাখে সে। উজ্জয়িনী সময় নেয় কোনও দিন, কোনও দিন নেয় না। স্বামীর হাত বটকায় সরিয়ে নিচু গলায় বলে, “থাক, শুয়ে পড়ো।”

সাম্যদীপ আরও এগিয়ে, এক বছর তিন মাস বিয়ে করা স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, “আমি পারব... বিশ্বাস করো উজ্জয়িনী, আজ আমি পারব... পারব আজ।”

উজ্জয়িনী চাপা গলায় বলে, “আগে অনেকবার একথা বলেছ। বিরক্ত কোরো না সাম্য, আমাকে একা থাকতে দাও, অত গায়ের ওপর পোড়ো না, আমার গরম লাগে।”

সাম্যদীপ কাঁপা গলায় বলল, “তোমার শরীর আমাকে পাগল করে দেয় উজ্জয়িনী... মনে হয়... সত্যি পাগল করে দেয়... তারপরেও কেন যে...”

উজ্জয়িনী দাঁতে দাঁত চেপে বলে, “আমার কাছে এই পাগলামির যে কোনও মূল্য নেই সেটাও তো বোঝো না। সরে যাও, এই সময় গায়ে হাত দিলে আমার অসুবিধে হয়।”

মাথা ঘোরানো টেবিলফ্যান ফিসফিস আওয়াজে বাতাস দেয়, যেন সাম্যদীপকে দেখে হাসে। সাম্যদীপের কখনও মনে হয় বিদ্রূপ, কখনও মনে হয় করুণা করছে।

সেদিন ঘুরে ঘুরে সেই টেবিলফ্যান কিনেছিল সাম্যদীপ। প্লাস্টিকের মোড়কে বুলিয়ে ডালহৌসির ফুটপাথ দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই এক ভারী চেহারা পথ আটকে দাঁড়ায় দু’হাত ছড়িয়ে। দু’হাতে দুটো শালপাতার বাটি। একটায় হলুদ আনারসের টুকরো, অন্যটায় গোলাপি তরমুজ। পাশে ডালায় ফল সাজিয়ে রাখা ফলবিক্রেতার মুখে হাসি। পথ আটকে দাঁড়ানো লোকটার অল্প ভুঁড়ি তো রয়েছেই, সঙ্গে টাকও।

“যেতে নাহি দিব, ওগো যেতে নাহি দিব।”

সাম্যদীপ থতমত খেয়ে বলল, “কে আপনি? ঠিক চিনতে পারলাম না।”

ভারী চেহারা চোখ বড় করে বলল, “আপনি কাকে বলছেন রে হারামজাদা? শালা, আমি বিতান, ক্লাস টু থেকে সেভেন পাঁচ বছর আমার পাশে বসে, আমার টিফিন সাঁটিয়ে, আমার পেন পেনসিলে লিখে, আমার পাছায় চিমটি কেটে, রাস্তার ধারে হিসু দিয়ে কাটাকাটি খেলে বড় হয়েছিস হারামজাদা। এখন বলছিস আপনি কো বি-কে মনে নেই শালা?”

বাঙালিদের মধ্যে এখন অতিমাত্রায় ‘হাগ’ প্রথার প্রচলন ঘটেছে। ঝুঁকে পড়ে এক হাতে আলতো জড়িয়ে ধরার এই কায়দাটি বিদেশ থেকে আমদানি। রেলস্টেশন বা এয়ারপোর্টে বিদায়বেলায় আলতো জড়ানোর এই ‘গদগদ ভালবাসা’ আকছার দেখা যায়। আজকাল বিয়েবাড়িতে

ধৃতি, শাড়ি সামলেও ‘হাগ কাণ্ড’ চলছে। তবে বহু বছর পর প্রিয় বাল্যবন্ধুর সঙ্গে মিলনকালে ওই দেখনদারি কায়দাটি এখনও বাঙালি জীবনে ছুঁচ ফোটাতে পারেনি। এই সময় আলতো ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই থাকে না, রীতিমতো জাপটাজাপটি করে তবে নিস্তার মেলে। এখানেও তাই হল। টেবিল ফ্যানের মোড়ক ফুটপাথে নামিয়ে সাম্যদীপ একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ল।

“এ কী চেহারা হয়েছে তোর বি! চোত্রিশেই ভুঁড়ি বাগিয়ে, টাক বানিয়ে একাকার কাণ্ড করেছিস!”

“ভুঁড়ি, টাক দুটোই সুখের লক্ষণ বৎস্য। তুইও তো চোত্রিশে চেহারায়ে জেলা এনেছিস, রোগাপাতলা ছিলি, এখনও ছিপছিপে। মুখের কাটিং একই রকম, নিষ্পাপ সরলমতি। ভাজামাছ উল্টে খেতে গেলে গলায় কাটা ফুটে যাওয়া টাইপ। বিয়ে-থা করেছিস, নাকি আমার মতোই ব্যাচেলর? আমার অবশ্য মেয়ের সন্ধান চলছে। মেয়ে নয়, শ্বশুরের সন্ধান। শাঁসালো শ্বশুর ছাড়া বিয়ে করব না বলে দিয়েছি। লক্ষ্মী মেয়ে নয়, আমার গণেশ শ্বশুর চাই।”

বিতান একই রকম রয়েছে, সেই ছেলেবেলার মতো। একটানা কথা বলে। সাম্যদীপের মজা লাগল। হেসে বলল, “তুই পারিসও বটে বি, এখনও ছেলেমানুষি গেল না। মেয়ের বদলে মেয়ের বাবাকে বিয়ে করবি নাকি? আমি কিন্তু কন্মটি সেরে ফেলেছি, এক বছর তিন মাস দু’দিন। এই দেখ, বৌয়ের জন্য কেমন টেবিলফ্যান কিনে নিয়ে যাচ্ছি, তার গরম দূর করতে হবে।”

বিতান ফল মুখে নিয়ে, হাত নেড়ে বলল, “আরে বেটা, বৌয়ের গরম কি আর ফ্যান দিয়ে দূর করা যায়? তার জন্য অন্য ব্যবস্থা লাগে। এক বছরেও পারলি না? সত্যিই তুই ক্লাস সিক্সের হাঁদাই হয়ে রয়েছিস। আমার কাছে ট্রেনিং নিস। বিয়ে না করলে কী হবে, আমি হলাম ঠান্ডা-গরম এক্সপার্ট,” কথা শেষ করে চোখ টেপে বিতান। সাম্যদীপ কথা ঘোরায়।

“কাজ করছিস কোথায়? চাকরি, না ব্যবসা?”

বিতান বলল, “পুলিশে। ফল খাবি? আনারস দিতে বলি? পেয়ারা? ফ্রুটস খাওয়া ভাল।”

সাম্যদীপ কৌতুকের গলায় বলে, “ভাল যে সে তোকে দেখেই বুঝতে পারছি। পুলিশে কাজ করিস মানে? এই ভুঁড়ি নিয়ে চোরের পিছনে ছুটিস?”

বিতান বলল, “আরে বাপু, পুলিশে চাকরি মানেই কি ছোটছুটি? ঘরে বসে কাজও থাকে। আমিও তাই। মরা নিয়ে কারবার করি।”

সাম্যদীপ ভুরু কঁচকে বলল, “মরা নিয়ে কারবার! সে আবার কী? গুলিতে মেরে গোনাগুনতি করিস?”

বিতান ফলগুলার কাছ থেকে বড় সাইজের একটা কলা নিয়ে এগিয়ে ধরলে সাম্যদীপ হাত নেড়ে ‘না’ জানায়। বিতান খোসা ছাড়িয়ে নিজেই কামড় দেয়। মুখে কলা নিয়েই বলে, “এক রকম তা-ই বলতে পারিস, খানিকটা গোনাগুনতিরই কাজ। আনক্লেমড বড়ির খবর রাখি। আনক্লেমড বড়ি জানিস তো? বেওয়ারিশ মৃতদেহ। রোজ কত যে বেওয়ারিশ লাশ পাওয়া যায় তার ঠিক নেই। নামঠিকানা না জানিয়ে কত লোক যে নিত্যদিন জলে ডুবছে, ট্রেনে কাটছে, গলায় দড়ি দিচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। এর ওপর রয়েছে অ্যান্ড্রিডেট। বাসের ধাক্কা অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু। কাগজে পড়িস তো? এই সব অচেনা মানুষ মৃত্যুর পর সরাসরি সঙ্গে না গিয়ে আগে পুলিশের হাত ঘুরে হাসপাতালের মর্গে জমা পড়ে। নানা থানা, রেলপুলিশ হয়ে সেই খবর হেডকোয়ার্টারে এলে তার হিসেব রাখি। শালা বোঝো ঠেলা। মরবার আগে বুক পকেটে নামঠিকানা লেখা একটা চিরকুট লিখে রাখলেই আর এই সমস্যা হত না। এখানেই কাজ শেষ নয়, বেওয়ারিশ দেহ মাঝেমধ্যে সংকার হল কিনা সে হিসেবও রাখতে হয়,” এই পর্যন্ত বলে দম নেয় বিতান, কলায় আরও দুটো কামড় বসিয়ে বলল, “মরা ডিপার্টমেন্টে আছি বলতে পারিস। ছাড় ওসব, তোর কথা বল। বৌ কে? প্রেম করে, না টেম করে? টেম জানিস তো? টেম হল বিয়ে আফটার টকিং উইথ মাদার। মানে মায়ের কথা মতো, বাড়ির মতো

যাকে বলে।”

দু’জনের সেদিন আরও খানিকটা গল্প, হাসাহাসি হয়েছিল। একসময় দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে ফোন নম্বর দেওয়া-নেওয়া সেরে যে যার পথ ধরল। সেই বিতান সাহায্য করছে খুব। পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি কোনও মহিলার পরিচয়হীন মৃতদেহের খবর পেলেই ফোন করছে।

“আবার একটা খবর এসেছে, খেতের ধারে দেহ পাওয়া গিয়েছে, ডোমকল হেলথ সেন্টারে চালান হয়েছে।”

সাম্যদীপ আগ্রহ নিয়ে বলে, “হ্যাঁ রে, আর কিছু মিল পাওয়া গেছে? ভুরুতে কাটা দাগ? গালে আঁচিল? অতদূর ছুটে যাব তো।”

বিতান ফোনের ওপাশ থেকে গলা লামিয়ে বলে, “ভুরুতে কাটা দাগের কথা রিপোর্টে এসেছে বলেই তো ফোন করছি। বাকিটা বলছে, রেড শাড়ি... টর্নড... ছেঁড়াখোঁড়া আর কী। দিঘিতে বড়ি ভাসছিল। সুইসাইড না মার্ডার এখনই বোঝা যাচ্ছে না। আর কিছু নয়। এবার যাবি কিনা তুই ভেবে দেখ।”

সাম্যদীপ শ্বাস ফেলে বলে, “যেতে তো হবেই।”

একই ভাবে কাল বিকেলে বিতান মংলাহাটির খবর দেয়।

“তোর স্পেসিফিকেশনের সঙ্গে অনেকটা মিল পাওয়া যাচ্ছে। ভুরুর কাটা দাগ তো আছেই, আঁচিলের কথাও লিখেছে। তবে আঁচিলটা কোথায় বলেনি। কানে দুলও নাকি রয়েছে। সাধারণত অর্নামেন্টস থাকে না। বড়ি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে নেয়।”

“কোথায় পাওয়া গিয়েছে?”

“লিখেছে খালের জলে উপড় হয়ে ভাসছিল, জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে দেখে। গায়ে কাপড়চোপড় ছিল না। মনে হয় ছিঁড়ে টিঁড়ে গেছে, দেহ হাত ঘুরে হেল্থ সেন্টারের মর্গে আছে। মংলাহাটি ফাঁড়িতে কেস লেখা হয়েছে।”

ফোন ছেড়ে সাম্যদীপ মংলাহাটির খোঁজ নেয়। শেষ পর্যন্ত অফিসের পিওন মুকুন্দর কাছ থেকে খোঁজ মিলল। ওর বড় শালার বাড়ি ছিল মংলাহাটি। এক সময় যাতায়াত ছিল। শালা মধ্যপ্রদেশের কোন জঙ্গলে গার্ডের চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছে ফলে আর ওদিকে যাওয়া হয় না।

“মংলাহাটি কলকাতা থেকে খুব দূরে নয় স্যার। তবে ট্রেন নেই, বাসই ভরসা। সংখ্যায় কম। বাবুঘাটে ভোর পাঁচটার দিকে একটা প্রাইভেট ছাড়ত, সেটা ধরলে ঘন্টা তিন সাড়ে তিন। এখনও ওই বাস আছে কিনা জানি না। গঞ্জ একটা, শহরের মতো দেখতে হলে কী হবে, একেবারে গাঁ, কিস্যু নেই। ওখানে কেন মরতে যাবেন স্যার?”

‘কেন যাবেন?’ এই প্রশ্ন সাম্যদীপকে শুনতে হচ্ছে ক’দিন ধরে। বেশির ভাগ সময়েই ‘ওই একটু কাজ আছে’, বলে এড়িয়ে যাচ্ছে। এড়িয়ে না গিয়ে উপায় কী? ‘মৃতদেহ চিনতে যাচ্ছি’, একথা কাউকে বলা যায়? হাজার প্রশ্ন করবে। মাঝেমধ্যে নিজেরই অবাধ লাগছে সাম্যদীপের। জুতোতে পা গলিয়ে, মরা মানুষের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার আগে যখন আয়নায়ে চোখ পড়ে, চমকে ওঠে। মুখ দেখলে ভয় লাগে। এ কী করছে সে! কখনও জীবিত মানুষকে চিনতে একটা গোটা জীবন কেটে যায়, তাও চেনা হয় না, সেখানে এক মৃতকে চিনতে চাওয়া তো একরকম অসম্ভব। ভরসা একটাই, চিনতে হবে বাইরে থেকে, শরীর দেখে। হাতের আংটি, ভুরুর কাটা দাগ, নাকের আঁচিল দেখে। হাতে ছবি থাকবে। বরফের বাস্স থেকে ধোঁয়া ওঠা ট্রে টেনে, মুখের চাদর সরিয়ে, অথবা বাস্তব মুখ খুলে মিলিয়ে নিতে হবে ছবির জীবন্ত মানুষটাই নিষ্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে কি? নাকি সে অন্য কেউ?

সেদিন মুকুন্দর প্রশ্নে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল সাম্যদীপ। আজ মংলাহাটির এই লাশঘরের সামনে আবার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হল।

“আপনি ঠিকই বলেছেন, কে কার চেনা, সহজে চেনা যায় না, তবু তো চেষ্টা লাগে।”

খোঁচা দাঁড়ি নিভে যাওয়া বিড়ি দাঁতে চেপে উঠে দাঁড়ায়। পাজামার দড়ি ঠিক করতে করতে বলল, “সেটাই কথা। শলীল তো দূরের কথা, মানুষ চেনা দায়, তবু সারা জীবনই চেষ্টা করে যেতে হয়। ফিমেল বললেন না?”

সাম্যদীপ মাথা নাড়ল। কথার মাঝখানেই একশো টাকার একটা নোট বের করেছে সে। হাতের মুঠোয় রেখেছে এমন ভাবে যাতে লোকটা দেখতে পায়।

“আসুন আমার সঙ্গে, দরজা পিছনে। বডি আপনার কেউ না হলে, টাকাপয়সা কিছু লাগবে না, তবে কেউ হলে ওই নোটের পাঁচ গুণ লাগবে। চেনা মানুষ খুঁজে পাওয়ার একটা আনন্দ আছে, সে মরাই হোক, জ্যান্তই হোক। শলীল হল শলীল। আসুন, সাবধানে আসুন।”

দুই

মৃতদেহের পিছনে ছুটে বেড়ানোর কথা সাম্যদীপ বলেছে শুধু উজ্জয়িনী আর বিতানকে।

বিতান অবাক হয়ে বলেছিল, “মৃতদেহের পিছনে ছুটে বেড়ানো মানে কী? শ্মশানমশানে গিয়ে প্রেতচর্চা করছিস? নাকি আমার মতো মরা নিয়ে কারবার শুরু করলি?”

উজ্জয়িনীও অবাক হয়েছে। তবে কারণ অন্য।

“এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে? তাহলে তো বলতে হয়, তোমার মায়ের কথাই ঠিক।”

সাম্যদীপ এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ করে থেকেছে। ঘটনা বিতানকে জানাতেই হত। আর উজ্জয়িনী বাবার সঙ্গে এই মহিলার সম্পর্কের বিষয়টা জানে বিয়ের আগে থেকেই। তখন অবশ্য মৃতদেহের ব্যাপার ছিল না, মহিলা বেঁচে ছিলেন।

উজ্জয়িনী-সাম্যদীপের ‘প্রাক বিবাহ’ পর্বটুকু অতি-সংক্ষিপ্ত। মোটে ছ’মাস তিনদিনের। তখন পরিচিতদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিল, ছ’মাসের প্রেমকে কি ‘প্রেম’ বলা ঠিক হচ্ছে? ‘স্বল্প পরিচয়’ বলাই ভাল নয় কি? এর পাল্টা কথাও ছিল। ‘একপলকের একটু দেখা’-তেই যদি ভালবাসা হতে পারে, ছ’মাস তো বাড়তি সময়। প্রেমের যেমন বয়স হয় না, তেমন নাকি সময়ও হয় না। এক কথা সত্য কিনা বলা কঠিন। এ বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা কখনও হয়েছে বলে জানা যায়নি, আর তথ্য-পরিসংখ্যান যা বলে, তাও গোলমালে। দেখা গিয়েছে, মুহূর্তের প্রেমে ‘ব্রজ আটুনি’ হয়ে স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে থেকেছে অর্ধশতক পার করে, অথচ ছয় কি দশ বছরের ভাব-ভালবাসার পর সংসার বানিয়েও ‘ফস্কা গেরো’ হয়েছে, বিয়ে ভেঙেছে। তাই এই বিবর্তক সরিয়ে রাখাই ভাল। উজ্জয়িনী আর বিতানের প্রেম হয় পালিয়ে যেতে গিয়ে। হঠাৎ-প্রেম নতুন ঘটনা নয়, কিন্তু ‘পালিয়ে যেতে গিয়ে প্রেম’ বিরল।

এক সহকর্মীর স্ত্রীর অপারেশনের পর সাম্যদীপ গিয়েছিল হাসপাতালে, অফিস থেকে ফিরতি পথে। একেবারেই সৌজন্যরক্ষা। বেশি সময় থাকেওনি। পেশেন্ট সুস্থ, পর দিনই ছুটি পাবে। হালকা মেজাজে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আর তখনই ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের গেটে এক তরুণীকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছোট্ট ছুটি করতে দেখে। নীল জিনসের ওপর একটা বেগুনি কুর্তি পরেছে। চুল কোনও রকমে মাথার ওপরে ক্লিপ দিয়ে বাঁধা, কাঁধের ব্যাগটা নিয়েছে আড়াআড়ি, যাতে পড়ে না যায়। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বিপদে পড়েছে। হাসপাতালে বিপদগ্রস্ত মানুষ নজর কাড়ার মতো ঘটনা নয়। সুন্দরী হলেও নয়। সাম্যদীপ মুখ ফিরিয়ে চলেই আসছিল, তরুণী দ্রুত এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে ওঠে, “আমাকে একটু হেল্প করবেন?”

খুবই থমতন খায় সাম্যদীপ। সে কোনও দিনই স্মার্ট নয়। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করা তো দূরের কথা, আত্মীয় বা অফিস কলিগ ছাড়া কারও সঙ্গে তেমনভাবে কথাও বলেনি, এড়িয়েই চলে। ইচ্ছে হয়নি এমন নয়, হয়েছে এবং সেই ইচ্ছে মন থেকে নেমেছে শরীরেও, আর পাঁচজন পুরুষের মতোই উত্তেজিত হয়েছে, রাতে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেছে, কিন্তু কারও সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সাহসে কুলোয়নি। তাই অচেনা এক তরুণীর এত কাছে এসে কাতর গলায় সাহায্য চাওয়া তাকে ঘাবড়েই দেয়।

তরুণী দ্রুত বলে, “আমার বাবা ওই ট্যাক্সিতে রয়েছেন, মনে হচ্ছে

হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ম্যাসাজি অ্যাটাক। গাড়ি থেকে নামাতে পারছি না।”

সাম্যদীপ এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলে, “একটা হুইলচেয়ার বা স্ট্রিচার লাগবে। হাসপাতালের কোনও স্টাফকে বলুন, ইমার্জেন্সির ভিতরে চলে যান।”

তরুণী এবার সত্যি সত্যি কঁদে ফেলল।

“বাবাকে একা রেখে যেতে পারছি না, বাইরেও হাসপাতালের কাউকে পাছি না। কয়েকজনকে বললাম, তারা শুনেও শুনল না... বাবা মরে যাবো!”

সরকারি হাসপাতালে মৃতপ্রায়কে দেখে চিন্তিত হয়ে ছুটে আসার মতো কর্মী বেশি থাকে না। জীবনরক্ষার জন্য এখানে অত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই, নিয়ম মেনে যেটুকু হবে। সাম্যদীপ এতে অবাক হল না, বরং তরুণীটির তার কাছে এসে পড়ায় সে বিব্রত। ঘাড়ের ওপর হঠাৎ ঝামেলা, তার সঙ্গে আবার এক তরুণী জড়িয়ে। কী করবে, পালিয়ে যাবে? কীভাবে? ‘আমি দেখছি’ বলে পিছনের কোনও গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় না? কেন যাবে না? এই মেয়ের সঙ্গে আর কোনও দিনই দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সে কোনও দিনই বলতে পারবে না, “সেদিন আপনি কেন পালিয়ে গিয়েছিলেন? আমার বাবা হাসপাতালের দরজা পর্যন্ত এসেও বাঁচতে পারল না। আপনি যদি একটু সাহস করে এগিয়ে আসতেন, তাকে মরতে হত না।” একথা শুনতে হবে না।

সাম্যদীপ সত্যি “দেখছি কাউকে পাই কিনা” বলে তরুণীকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। দ্রুত পায়ে একটা দেয়ালের আড়ালেও পৌঁছে যায়। নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলে, যাক, ঝামেলা ঝেড়ে ফেলা গেল। আর তখনই এক কোনায় চুপ করে বসে-থাকা খালি হুইলচেয়ারটি চোখে পড়ে যায়। যেন সবার চোখের আড়ালে এসে তার জন্যই অপেক্ষা করছে। নিজেই ঠেকাতে না পেরেই সেদিন এগিয়ে গিয়েছিল সাম্যদীপ। চেয়ার গড়িয়ে একরকম ছুটেই ফিরে যায় ট্যাক্সির কাছে। তারপরের অংশটা অনেকটা বরফের বল গড়িয়ে যাওয়ার মতো। যত সময় গিয়েছে, সে বড় হয়েছে। তরুণীর বাবাকে ইমার্জেন্সি বিভাগ হয়ে, ওয়ার্ডে সিট পেয়ে ভর্তি করাতে রাত গড়িয়ে যায়। ততক্ষণে জানা হয়ে গিয়েছে, তরুণীর নাম উজ্জয়িনী। স্কুলের শিক্ষিকা। তার কোলিগ, বন্ধু এবং আত্মীয় কয়েকজন হাসপাতালে চলেও এল। তারপরেও সাম্যদীপ যেতে পারেনি। উজ্জয়িনীই যেতে দেয়নি।

“আমি জানি অন্যায় আবদার হয়ে যাচ্ছে, তবু অনুরোধ করছি, আর একটু যদি থেকে যান সাম্যদীপবাবু। আপনার চেনা-জানা ছাড়া বাবা সিট পেতে না, ইমার্জেন্সির মেঝেতেই পড়ে থাকতে হত। আর একটু থেকে যান প্লিজ। প্রপার ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে যাক। আমি প্রাইভেটেই নিয়ে যেতাম, দেরি হয়ে যাবে ভেবে বাড়ির কাছে এসেছি।”

পালিয়ে যেতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল সাম্যদীপ। এরপর যে ক’দিন বাবা হাসপাতালে ছিল, উজ্জয়িনী ফোন করে সাম্যদীপকে হেল্প রিপোর্ট জানিয়েছে।

“কই আপনি তো একদিন বাবাকে দেখতে এলেন না।”

“আমি! আমি আর গিয়ে ভিড় বাড়াই কেন?” সাম্যদীপ আমতা-আমতা করে বলেছিল।

“সে কী! আপনার জন্যই এতটা হল। আপনি না থাকলে, আমি একা কিছুই সামলাতে পারতাম না। আসলে আমি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। চেনা-পরিচিতদের ফোনে ধরতে পারছিলাম না। হার্ট অ্যাটাকে গোল্ডেন আওয়ার বলে একটা সময় রয়েছে। তার মধ্যে ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন। আমার মা তো এই সময়টা পাননি বলেই মারা যান। আমরা ভুল করেছিলাম, পছন্দের হাসপাতাল খুঁজতে গিয়েছিলাম। এবার সে ভুল করিনি। তা ছাড়া আপনাকে পেয়ে গেলাম।”

এরপর এক রকম চক্ষুলাজ্জার কারণেই একবার হাসপাতালে যেতে হল সাম্যদীপকে। বাইরে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়া উজ্জয়িনী। সেদিন সাম্যদীপ বুঝতে পারল, এই মেয়ে আর পাঁচজনের মতো নয়, এই মেয়ে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। এবং মেয়েটি যেন তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে।

বাইপাস সার্জারি করিয়ে বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর

উজ্জয়িনীই জোর করে টালিগঞ্জের বাড়িতে সাম্যদীপকে নিয়ে আসে। ভদ্রলোক বিছানায় আধশোওয়া অবস্থায়। সেই ভাবেই কথা বললেন। অসুখের ধাক্কা খানিকটা শুকিয়ে গেলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না, মানুষটি সৌম্যদর্শন। কন্যা তার রূপ পিতার কাছ থেকেই পেয়েছে।

“উজানের কাছে সব শুনেছি। আপনি না থাকলে কী হত জানি না।” সাম্যদীপ অস্বস্তি নিয়ে বলল, “না না, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই হেল্প করত। হাসপাতালে এত মানুষের চিকিৎসা হচ্ছে।”

ভদ্রলোক বললেন, “শুনি এখনকার ছেলেমেয়েরা বাড়ির লোকেরই রেসপনসিবিলিটি নিতে চায় না তো বাইরের কারও নেবে? যাক, সে ভুল ভাঙল।”

সাম্যদীপ সামান্য হেসে চুপ করে রইল। ভদ্রলোক মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, “যাও, একটু চা নিয়ে এসো।”

পরিপাটি অথচ সাদামাঠা সাজানো ড্রইংরুমে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে সেদিনই উজ্জয়িনী প্রায় প্রেম নিবেদন করে বসে। এত দ্রুত এরকম কিছু ঘটবে সাম্যদীপ ভাবতেও পারেনি। বন্ধুদের কাছে ছড়ানো-ছিটনো কিছু গল্প শোনা ছাড়া, এ বিষয়ে তার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না।

“এই কদিন টেনশনেও আপনার কথা বারবার মনে হয়েছে। আপনার উপকার বড় কথা নয়, এই যুগেও যে এরকম দু’-একজন আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেটাই আশ্চর্যের।”

সাম্যদীপ মাথা নামিয়ে কাঁপা গলায় বলল, “এভাবে বলবেন না, আমি কিছু করিনি।”

উজ্জয়িনী নিচু গলায় বলল, “কিছু করার জন্য নয়, একটা মানুষ তো অন্যভাবেও মনের মধ্যে ঢুকতে পারে। পড়ে না?”

সাম্যদীপ চমকে ওঠে। এই মেয়ে কী বলতে চায়? কী বলতে চায় উজ্জয়িনী আরও স্পষ্ট করে বাড়ি থেকে বেরনোর সময়, গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে।

“আর একটু বসলে ভাল হত।”

সাম্যদীপ বলল, “অনেকটা যাব। টাইমের ট্রেন ধরতে হয়। আর একদিন আসা যাবে, রাগ করবেন না।”

উজ্জয়িনী একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, “তাদাতাড়ি দেখা না করলে অবশ্যই রাগ করব।”

সেদিনের রাতটা এরকম জেগেই কাটায় সাম্যদীপ। শেষরাতে ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন সে দেখে, সকালে মনে পড়ায় লজ্জা পায়। নিজেকে অপরাধী লাগে। যে-মেয়ের মুখই সে এখনও ভাল করে দেখেনি, তার শরীর কল্পনা করল কী করে! সে শরীর আবরণহীন, সে শরীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সে শরীর হাত টেনে নিজের বুকের ওপর রেখে ফিসফিস করে বলেছে, “সাম্যদীপবাবু, আপনি কি আমার হার্টের ধুকপুকনি বুঝতে পারছেন? না পেলে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলুন। প্লিজ, পিছনের দরজা দিয়ে পালাবেন না যেন।”

সাম্যদীপ ধড়ফড় করে উঠে বসে। কপালের ঘাম মুছে বুঝতে পারে, বসনহীন উজ্জয়িনী ঘুমের মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার কথা বলে শুধু খোঁচা দেয়নি, তাকে উত্তেজিতও করেছে। সে উজ্জয়িনীর প্রতি টান অনুভব করে। সেই টান কতটা ভালবাসার আর কতটাই-বা শরীরের, তা সে নিজেও বুঝতে পারে না।

প্রেমপর্ব লম্বা হয়নি। না হওয়ার কারণও সেই শরীর। উজ্জয়িনীর বাবার শরীর খারাপ। চিকিৎসার পরেও তিনমাসের মধ্যে ফের আরও খারাপ হতে থাকে। একদিন সন্ধ্যাবেলা মেয়েকে ডেকে পাঠালেন ভদ্রলোক।

“যা বলছি মন দিয়ে শোনো, মাঝখানে কথা বলবে না। আমি আর কতদিন আছি জানি না। মনে হয় না, বেশি দিন এই অসুস্থ শরীর সামলাতে পারব। যাক, ওতে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। সামলাতে পারলে পারব, না পারলে না। আমি কোনও বিষয়ে কখনও তোমাকে জোর করিনি। তোমার দায়িত্ব একটা সময় পর্যন্ত তোমার মা নিয়েছে, বড় হয়ে তুমি নিজেই সামলেছ। এ যুগে কথাটা হয়তো বোকার মতো শোনায়, তবু আমি মনে করি, মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে বাবা-মায়ের একটা ভূমিকা

থাকে। তোমার মা নেই, আমি একা। তোমার বিয়ের দায়িত্ব পালন করার মতো শক্তি আমার নেই। কিন্তু তোমার বিয়ে হলে নিশ্চিত হতে পারি। আশা করি, অসুস্থ বাবাকে তুমি এইটুকু নিশ্চিত করবে।”

এর পর কথা বাড়ানোর কোনও মানে হয় না, উজ্জয়িনী বাড়ায়ওনি। সে সাম্যদীপের সঙ্গে কথা বলে। সাম্যদীপের মা রাজি হন না।

“বলা নেই, কওয়া নেই, মাত্র ক’টাদিনের পরিচয়ে বিয়ে হয়ে যাবে! এই মেয়েকে সাম্য চিনল কখন? অসম্ভব।”

সাম্যদীপের বাবা শান্ত মানুষ। স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, “মেয়েটির মা নেই, বাবা মৃত্যুশয্যায়। তিনি মেয়ের বিয়ে দেখে যেতে চান।”

সাম্যদীপের মা ঝাঁঝিয়ে উঠেছিলেন, “মেয়ের বাবা মৃত্যুশয্যায় তো কী? আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে শয্যা ছেড়ে উঠে বসবে? এসব বুজরুকির কথা। ছেলে পাকড়ানোর ফন্দি।”

“এমন করে বলছ কেন? ওরা তো ভালবেসে বিয়ে করছে।”

“ভালবাসা! ছ’মাসে ভালবাসা! এইটুকু সময়ে তো মুখ চেনাই হয় না,” এতটা বলে মহিলা থেমেছিলেন এক মুহূর্ত। স্বামীর দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, “ওহু, তুমি তো আবার ভালবাসায় এক্সপার্ট। সে যাই হোক, এ বিয়ে আমি মানব না। ছেলের জন্য আমি নিজে পাত্রী খুঁজব।”

এই জেদ টিকল না। সাম্যদীপ-উজ্জয়িনীর বিয়ে হল প্রায় বিনা আয়োজনেই। মেয়ের বাবা বিছানা থেকে উঠতে পারলেন না। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বাড়িতে এলেন, একরকম শুয়েই সই করলেন। ছেলের মা বিয়ে কার্যত বয়কট করলেন। সাম্যদীপ, উজ্জয়িনী দু’-চারজন পরিচিতকে রেস্টুরায় খাইয়ে দিল। বাকিদের জানাল, অনুষ্ঠান বড় করে হবে, উজ্জয়িনীর বাবা সুস্থ হলে। ভদ্রলোক সুস্থ হননি। মেয়ের বিয়ের একমাস পেরনোর আগেই মারা গেলেন। তখনও শাশুড়িকে নরম করার চেষ্টা চালিয়ে যেত উজ্জয়িনী। মহিলার সমস্যা ছিল গভীরে এবং জটিল। তিনি পুত্রবধূর সঙ্গে এই ভাল আচরণ করতেন, কিছু পরেই কথা বন্ধ করে দিতেন। সকালে স্কুলে বেরনোর আগে মনে করে টিফিন নিয়ে যেতে বলেছেন, অথচ সন্ধ্যাবেলা উজ্জয়িনী ফিরলে দরজা খুলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। উজ্জয়িনী অপমানিত হলেও অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল।

স্বপ্ন প্রেমপর্বে সাম্যদীপ উজ্জয়িনীকে তার বাবা এবং এক মহিলার সম্পর্কের কথা বলেছিল।

“এরকম অনেকেরই থাকে। পুরনো প্রেমিকা কথাটা কি আর এমনি বলা হয়।”

সাম্যদীপ বলেছিল, “খটকা এখানেই। এখনও উনি প্রেমিকা কিনা বলা শক্ত। তবে মনে প্রেম কিছুটা রয়ে গিয়েছে।”

উজ্জয়িনী বলল, “প্রেমিকা আর প্রেম আলাদা নাকি?”

সাম্যদীপ হেসে বলেছিল, “মনে হয়।”

উজ্জয়িনী বলল, “বাপ রে, উনি এসেছেন মস্ত বিশেষজ্ঞ। তা তোমার পিতৃদেবের প্রেম যে এখনও টিকে রয়েছে সেটা বুঝলে কী করে?”

সাম্যদীপ চুপ করে রইল। কী বলবে? সে তো বোঝে না। দুনিয়ার কিছু জিনিস থাকে যা বোঝা হয় না, তবু মনে হয় আছে। সে বলে, “বুঝি না উজ্জয়িনী, আঁচ করি। মা যখন প্রসঙ্গটা তোলে, বাবা যেন জোর গলায় কিছু বলতে পারে না।”

উজ্জয়িনী অবাক হয়ে বলেছিল, “এখনও তোলে! এত বছর পরে? নিশ্চয়ই রসিকতা করেন।”

সাম্যদীপ শান্ত গলায় বলে, “না, রসিকতা নয়। ঘটনাটা শুধু সত্যিই নয়, বিস্তীর্ণ। আমার বলতেও খারাপ লাগছে, কিন্তু তোমার কাছে লুকাতে চাই না। আমার মা সম্পর্কে তোমার জেনে রাখা দরকার।”

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে শাশুড়িকে কখনও চিৎকার করতে, কখনও দরজা আটকে চাপা স্বরে কান্নাকাটি করতে দেখেছে উজ্জয়িনী। তবে ঘন ঘন নয়, মাঝেমাঝে। অবসাদের মতো ফিরে ফিরে আসত বা হয়তো অবসাদই। আগে জানা থাকায় উজ্জয়িনী এতে অবাক হয়নি।

স্ত্রীর এই উত্তেজনার সময় নীলকণ্ঠ সেন, সাম্যদীপের বাবা,

শান্তভাবে বলতেন, “রানি, এই ঘটনা তো এখন অতীত। আজও তুমি ভাবছ কেন? যা হওয়ার তো হয়ে গিয়েছে, ফুরিয়েও গিয়েছে।”

রানি ঝাঁঝিয়ে উঠতেন, “যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে! বলতে লজ্জা করছে না তোমার?”

নীলকণ্ঠ মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলতেন, “প্রেমে পড়া তো অপরাধ নয় রানি। এতে লজ্জার কী আছে?”

“প্রেম? ওটা প্রেম ছিল তোমাদের? বিবাহিত পুরুষের প্রেম তো লাম্পট্য। ওতে শুধু শরীর ছিল। তুমি ওই মেয়ের সঙ্গে গেস্ট হাউসে যাওনি? বলা যাওনি? আমি সব জানি।”

নীলকণ্ঠবাবু জোর গলায় কিছু একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নেন। বলেন, “আস্তে বলো রানি। যা শুনেছ, তা-ও তো অনেকদিন হয়ে গেল। আমিও তো কিছু লুকোইনি, বিশ্বাস করতেও বারণ করিনি। শুধু বলছি, এতদিন পরে, বিয়ের কত বছর হয়ে গেল আমাদের, এসব মনে রাখবার দরকার কী? নিজেকে জোর করে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।”

উজ্জয়িনী দেখেছে, একটা সময়ের পর শাশুড়ি খানিকটা সামলে নিতেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে খানিক কালাকাটির পর স্বাভাবিক হতেন। তার বিশ্বাস, যতই আগের ঘটনা হোক না, সেই মহিলার সঙ্গে তার স্বশুরের কোনও শরীরী ঘনিষ্ঠতার কথা তিনি জেনে ফেলেছিলেন, ঘটনাটা পুরোপুরি মন থেকে ফেলতে পারেন না। মনের ভিতর কোথাও ঘাপটি দিয়ে থাকে, মাঝেমাঝে মাথা চাড়া দেয়। সেটা খুব বিস্ত্রী হয়। আচ্ছা, সাম্যদীপের বাবার যদি আগের কোনও বৈধ স্ত্রী থাকত, তাহলেও কি শাশুড়ি এমন উত্তেজিত হয়ে পড়তেন? ভালবাসার জন্য শরীরকেও কি বৈধ হতে হয়? উজ্জয়িনীর ইচ্ছে করত শাশুড়িকে প্রশ্নটা করতে। নিজেকে সামলেছে। সাধারণ ভাবনাচিন্তার মহিলা উনি। ছোটখাটো চাকরি করেন, স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূকে নিয়ে আর পাঁচজনের মতো সাধারণ সংসারযাপন পছন্দ, শাশুড়ির কাছে পুত্রবধুর একশো শতাংশ আত্মসমর্পণে বিশ্বাস করেন। এমন জটিল প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন তিনি? তার ওপর সম্পর্ক তো সহজ নয়। অবশ্য বেশি জটিল করতে দেয়নি উজ্জয়িনী, বিয়ের বছর গড়ানোর আগেই ‘চাকরিতে অসুবিধে হচ্ছে’ বলে সাম্যদীপকে নিয়ে উল্টোডাঙায় বাড়িভাড়া করে কলকাতায় চলে এসেছে। অসুবিধে হচ্ছিলও। অতটা পথ পেরিয়ে স্কুলে যাওয়া সহজ নয়। প্রায় দু’ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বেরোতে হত। তার ওপর ট্রেনে গোলমাল, হাওড়া ব্রিজে যানজট, বড়বাজারের ভিড়ে বাসের থমকে-থাকা তো ছিলই। সে সবও কষ্ট করে মানিয়ে নিচ্ছিল উজ্জয়িনী, কিন্তু সাম্যদীপের মাকে মানিয়ে নেওয়া হল অসম্ভব।

আরও এক অদ্ভুত সমস্যা দেখা দিল রাতে, বিছানায় সাম্যদীপের সঙ্গে। একটা পর্যায়ে পৌঁছে সাম্যদীপ স্ত্রীর কাছে গুটিয়ে যায়। উজ্জয়িনীর মনে হল, মায়ের চাপেই ছেলেটার এই অসুখ, নিজেকে গুটিয়ে রাখবার অসুখ। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি।

“হতে পারে। বাবা-মায়েরা খুব বেশি অ্যাগ্রেসিভ হলে, ডমিনেন্ট হলে, ছেলেমেয়েরা গুটিয়ে যায় বইকি। পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার হতে পারে। আপনার হাজীব্যান্ডের বেলাতে যে এমন হয়নি কে বলতে পারে? তবে নিশ্চিত করে সেটা বলাও যায় না।”

উজ্জয়িনী কাতরভাবে বলল, “এর থেকে ওকে বের করার উপায় কী ডাক্তারবাবু?”

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, “এগজ্যাক্ট উপায় বলা কঠিন, তবে আলাদা থাকলে কিছু সুফল মিললেও মিলতে পারে।”

সবদিক ভেবে, স্বশুরবাড়ি ছেড়ে, সাম্যদীপকে নিয়ে কলকাতায় চলে এল উজ্জয়িনী। তারপর তো পরিস্থিতি আরও বদলাতে শুরু করেছে। এখন আর শুধু উল্টোডাঙার ভাড়াবাড়িতে থাকে না উজ্জয়িনী, প্রায়ই টালিগঞ্জে নিজের বাড়িতে চলে আসে। একাই আসে। স্বশুরবাড়ি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসার সময় এখানেই সাম্যদীপকে নিয়ে উঠতে চেয়েছিল।

“টালিগঞ্জের বাড়িতে চলো গিয়ে থাকি। একতলার পিছনের পোশর্নে

ভাড়াটে ছাড়া কেউ তো থাকে না, দোতলা বাড়ি ফাঁকিই পড়ে আছে। বাবা চলে যাওয়ার পর তো বাড়ি এখন আমারই। আমি যদি বিয়ের পর তোমার বাবার ওখানে গিয়ে উঠতে পারি, তুমিই বা পারবে না কেন?”

সাম্যদীপ বলেছিল, “মাকে তো দেখলে, এখনই তোমার বাড়িতে গিয়ে থাকলে, অন্য মানে হবে। ক’টা দিন যাক না, ততদিন অন্য কোথাও ভাড়া নিই।”

একেই শিকড় ছেড়ে চলে আসার ধাক্কা, আর নতুন জটিলতা চায়নি উজ্জয়িনী। নিজের বাড়িতে না উঠে উল্টোডাঙাতে দেড় কামরা ঘর ভাড়াই নিয়েছিল। ভেবেছিল, ক’টা দিন যাক, কলকাতায় মন বসুক সাম্যদীপের, ওর সমস্যাও ঠিক হোক, তারপর দেখা যাবে। দেখা অবশ্য আর যায়নি, ইদানীং মাঝেমাঝেই চলে যাচ্ছে নিজের বাড়িতে। প্রথমে শনিবার করে যাচ্ছিল, এখন সপ্তাহের মাঝখানেও যাচ্ছে। সাম্যদীপ কিছু জানতে চাইত না। শুক্রবার স্কুলে যাওয়ার সময় কাপড় জামার ব্যাগ গোছাতে-গোছাতে উজ্জয়িনী নিজে থেকেই বলত, “আজ-কাল ও বাড়িতে থাকব। পরশু একেবারে স্কুল করে ফিরব।”

সাম্যদীপ বলত, “ঠিক আছে।”

উজ্জয়িনী কৈফিয়ত দেওয়ার মতো করে বলত, “নিজের বাড়িতে গিয়ে মাঝেমাঝে থাকা দরকার। তোমার ওখানে ছিলাম আসতে পারিনি, এখন তো হাতের কাছে চলে এসেছি।”

সাম্যদীপ বলত, “আমিও যেতে পারি। শনি-রবি তো ছুটিই আছে।”

উজ্জয়িনী শাড়ি ভাঁজে মন দিয়ে বলেছিল, “এখন থাক, তোমার মায়ের কাছে খবর চলে গেলে কী আবার ভেবে বসেন।”

সাম্যদীপ বলল, “তুমি কি আমার ওপর রাগ করে বলছ?”

উজ্জয়িনী নিশ্চুপ ভঙ্গিতে বলল, “না। খুশি হয়ে বলছি।”

এখন আর আগে থেকে বলেও না উজ্জয়িনী। কাপড়জামা ওখানেই রাখা আছে। বিকেলে সাম্যদীপকে একটা মেসেজ করে দেয়। তারপরেও সাম্যদীপ যে টালিগঞ্জে গিয়ে থাকতে চায়নি এমন নয়। এক-দু’বার চেয়েছে। ঠান্ডা গলায় উজ্জয়িনী বারণ করেছে।

“না, আমি একা থাকব। আমার মনে হয়, মাঝেমাঝে দু’জনেরই একা থাকা প্রয়োজন।”

সাম্যদীপের মুখে মৃতদেহের কথা শুনে উজ্জয়িনী বলেছিল, “তোমার বাবা ওই মহিলার মৃত্যুর খবর জানলেন কী করে?”

সাম্যদীপ নিচু গলায় বলল, “বাবা যেটুকু বলেছে সেটুকু বলতে পারি। মহিলার কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয়া বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে। ফোন করেছিলেন। সেই আত্মীয়ের কাছেই থাকতেন উনি। একদিন ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে চিঠি লিখে যান। সেখানে এমন কিছু কথা ছিল, যাতে সেই আত্মীয়ের মনে হয়েছে, মহিলা আর বাঁচতে চান না। চিঠিতে বাবার ঠিকানা, ফোন নম্বর দুই-ই নাকি রয়েছে। এটা আশ্চর্যের। ঠিকানা না হয় বোঝা গেল, এতদিন পর বাবার ফোন নম্বর কোথা থেকে পেলেন?”

উজ্জয়িনী বলল, “এটা কোনও শক্ত ব্যাপার নয়। হয়ত ওঁর অফিসে গিয়েছিলেন। সেখানে পুরনো কোলিগরা কেউ এটুকু সাহায্য করতেই পারেন। ক’বছর আগে রিটারায় করেছেন বলে এটুকু সাহায্য করবে না? আবার এমনও হতে পারে, দু’জনের যোগাযোগ ছিল। ওটা বিষয় নয়, বিষয়টা হল, তুমি কী করবে?”

সাম্যদীপ একটু চুপ করে থেকে বলে, “কী করব বুঝতে পারছি না। বাবার জন্য খরাপ লাগছে। মানুষটা চাইছে, একবার যদি পৌঁছনো যায়। বেওয়ারিশ হিসেবে নয়, মৃত্যুর পরের শেষ কাজটুকু যদি খানিকটা সম্মান দিয়ে করা যায়। মহিলা বিয়ে-থা করেননি, নিকটজন কেউ নেইও।”

উজ্জয়িনী একটু ভেবে বলল, “ঘটনাটা কেমন গল্পের মতো শোনাচ্ছে না? চড়া সুরের গল্প। মোটা দাগের সিনেমা, যাত্রার মতো। বাবার প্রেমিকার মৃতদেহ খুঁজতে পুত্র মর্গে-মর্গে ছুটে বেড়াচ্ছে।”

সাম্যদীপ বলেছিল, “শোনাচ্ছে হয়তো, হয়তো কেন, শোনাচ্ছে বইকি, কিন্তু তারপরেও কী মনে হচ্ছে জানো উজ্জয়িনী? মনে হচ্ছে, গল্পটার মধ্যে কিছুদিনের জন্য ঢুকে পড়ি। কাজের কাজ তো কিছু হবে না,



খুঁজেও পাওয়া যাবে না। আর পাওয়া গেলেই বা কী? একটা মৃত শরীর নিয়ে কী-ই বা হতে পারে! তারপরেও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে মন চাইছে না।”

উজ্জয়িনী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “যা ভাল বোঝো করো। আর তোমার মা? তিনি জানতে পারেন যদি?”

সাম্যদীপ চিন্তিত মুখে বলল, “চেষ্টা করব গোপন করতে। জেনে ফেললে বলব, বন্ধুর মা হারিয়ে গিয়েছেন... হাসপাতাল, থানা, মর্গে খোঁজ করছি... আর কী-ই বা বলতে পারি?”

উজ্জয়িনী নিষ্পৃহ ভঙ্গিতে বলল, “তোমাদের পরিবারের বিষয়, তোমরাই ভাল বুঝতে পারবে। আমি কে বলার। আমি এসবের মধ্যে ঢুকতে চাই না।”

বাইরে মানুষ নিষ্পৃহ ভঙ্গি দেখালেও, সে ভঙ্গি সব সময় সত্যি হয় না। উজ্জয়িনীর বেলাতেও সেদিন হয়নি। সাম্যদীপের থেকে নিজেকে যতই আলাদা করতে চাক, তার ব্যাপারে এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন হতে পারেনি। সুতো কোথাও লেগে রয়েছে। এটা কি সম্পর্কের বাকিটুকু? বৃষ্টি থেমে যায়, জলের ফোঁটা থেকে যায়। আবার এমনটা না-ও হতে পারে। হয়তো সম্পর্কের শিকল ছেঁড়া সহজ, সুতো কাটা কঠিন। যতক্ষণ না সে নিজে দেখা দেয়, তাকে দেখাই যায় না, এতটা সূক্ষ্ম, এতটাই অকিঞ্চিৎকর হয়ে থেকে যায় সে। উজ্জয়িনীর মনে হয়েছিল, এই অচেনা মৃতদেহের সন্ধানে সাম্যদীপ না বেরোলেই ঠিক করবে। তার ওপর মহিলা। শুধু তো একটা শরীর নয়, শরীরের সঙ্গে কোথায় কোন অপরাধ, অপবাদ লুকিয়ে রয়েছে, তার ঠিক আছে? অহেতুক গোলমাল হতে পারে। আর যদি অপরাধ না থাকে তাতেই বা কী এসে যায়? একজন বাষ্পিত তেবট্টি বছরের পুরুষের প্রেমিকার মৃত শরীর খুঁজে বেড়ানো পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়। প্রাণহীন একটা শরীর নিয়ে, সাম্যদীপের আগ্রহ উজ্জয়িনীর পছন্দ হয়নি।

অন্য দিকে বিতান ঘটনা শুনে এতটাই অবাক হয়েছিল যে, সে বেশ খানিকটা সময় কথাই বলতে পারেনি।

“তুই জানতিস সাম্য?”

সাম্যদীপ একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, “ছোটবেলায় বাড়িতে মায়ের চাঁচামেচি শুনেছি, বুঝতাম না। আমি বড় হওয়ার পর চাঁচামেচি একটু কমল বটে, তবে আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, বাবার জীবনে কোথাও একটা সমস্যা রয়ে গিয়েছে, পুরনো সমস্যা। একটা সময়ের পর ভেবেছিলাম, এসব মিটে গিয়েছে। মা অকারণে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত খোঁচাতে চায়। এখন বুঝতে পারছি, বাবার সমস্যা মেটেনি, ক্ষত শুকোয়নি। মা সম্ভবত ইন্টিউশনে সেটা বুঝতে পারত। বাবা গোপনে ওই মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গিয়েছে, দেখা না করুক, খবরাখবর রাখত বটেই। কে জানে হয়তো টাকাপয়সাও দিত।” একটু থেমে সাম্যদীপ বলে, “বি, ঘটনাটা আশ্চর্যের, তোর সঙ্গে কত বছর পর দেখা হল, আর তাকেই কিনা এখন আমার দরকার হয়ে পড়েছে। তবে তোর যদি মনে হয়, এই বিষয়ে সাহায্য করাটা তোর নীতি-নৈতিকতার বিরুদ্ধে, তাহলে কিছু করতে হবে না। সত্যি তো, ভেবে দেখতে গেলে তাই, জীবনের দ্বিতীয় কী তৃতীয় পর্যায়ে পৌঁছানো একজন সংসারী পুরুষমানুষের এই ধরনের ঘটনা চরিত্রের স্থলন ছাড়া তো কিছুই নয়।”

বিতান শাস্ত গলায় বলল, “চল, কিছু খাই, খিদে পেয়েছে। তুই স্পেশিফিকেশনগুলো আমাকে দিয়ে রাখ। মানে পোশাক, আইডেন্টিফিকেশন মার্কস, একটা ফোটা এই সব।”

সাম্যদীপ বলল, “বাবা লুকিয়ে একটা ফোটা দিয়েছে, ওটা দিলে হবে?”

“পুরনো?”

“হতে পারে। আমি তো আগেকার ফোটা কিছু দেখিনি। তবে পুরনোই মনে হচ্ছে, তখন বয়স ছিল সম্ভবত তিরিশের কিছুটা ওপর।”

বিতান বলল, “চিহ্নগুলো দেখা গেলে, ওতেই হবে। কপি করে দিবি, তোরও তো লাগবে। তবে ঝামেলা আছে। নিয়ম অনুযায়ী বেওয়ারিশ দেহ খুব বেশি হলে পনেরো দিনের মতো সরকারি মর্গে

রেখে দেওয়ার কথা, তারপর এজেন্সির হাতে তুলে দেওয়া হয়। তারা সংকার করে। তবে বেশ কয়েকটা জমা না হলে এজেন্সি নিতে চায় না। খরচে, ব্যবস্থায় পোষায় না বলে। ফলে পনেরো দিনের পরেও অনেকে জায়গায় দেহ পড়ে থাকে। তোর কেস যদি এর মধ্যে পড়ে যায়, তুই গিয়ে আইডেন্টিফাই করতে পারিস।”

সাম্যদীপ বলল, “আর চেনা-জানা কারও খোঁজ না পেলে পুলিশ কী করে?”

বিতান বলল, “কী আর করবে, নির্দিষ্ট সময়ের পর পোস্ট মর্টেম, ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়ে আদালতের কাছ থেকে সংকারের অনুমতি চায়। অনুমতি পেলে ওই যে বললাম, এজেন্সির হাতে তুলে দেয়। এই মহিলা হারিয়েছেন ক’দিন হল?”

সাম্যদীপ বলল, “দু’দিন, না, তিনদিন হল।”

বিতান বলল, “থানায় ডায়েরি হয়েছে?”

সাম্যদীপ বলল, “মনে হয় না। কে করবে! দূর সম্পর্কের আত্মীয় এই বামেলা নিতে যাবে কেন?”

বিতান বিরক্ত গলায় বলল, “এটা খুব ভুল হয়েছে। পরে তো কোনও কিছুই করা যাবে না।”

সাম্যদীপ ক্লান্ত গলায় বলল, “ভুল তো অনেক কিছুই হয়েছে বি। বাবার এভাবে এই মহিলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকাটা কি ঠিক? ভুলে যাওয়া উচিত ছিল। একজন মানুষের মৃতদেহ নিয়ে এই মাথাব্যথা ঠিক? আমিও তো ভুল করছি, এভাবে ছুটে বেড়ানোর কথা ভাবছি কেন?”

বিতান খানিকটা ঝাঁঝিয়ে বলল, “আরে বাপু, ওসব ভাবের কথা আইন-আদালতে চলে না, ডায়েরি, জিডি কিছু একটা না থাকলে পরে বডি ক্লেম করতে বিরাট সমস্যা হবে।”

সাম্যদীপ বলল, “ওসব পরে দেখা যাবে। তুই কি মনে করছিস, ওই মহিলার মৃতদেহ সত্যি কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে? পাওয়া গেলেই বা কী? আমি তাকে চিনতে পারব? যাকে জীবনে কখনও দেখিনি, তাকে ছবি মিলিয়ে চেনা সম্ভব? কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, তাও তো জানি না। মুখ, মাথা খেঁতলে গেছে কিনা কে বলতে পারে।”

বিতান একটু ভেবে বলল, “আরও একটা পয়েন্ট আছে। মহিলা যে মারাই গিয়েছেন সে ব্যাপারে তুই শিওর কি?”

সাম্যদীপ বলল, “বাবা ধরে নিয়েছেন। চিঠিতে নাকি ওরকমই লেখা। যতটা মনে পড়ছে— আমার বাঁচার পালা শেষ, আমি মরতে চললাম। শেষে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা লেখা।”

বিতান নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “তাহলে সবটা ধরে নিয়ে নেমেছিস বল।”

সাম্যদীপ শুকনো হেসে বলল, “আর কী উপায় আছে বল? বাবাকে দেখে কেমন লাগল... বললাম তো একটা ভুল করছি, অনায়াস।”

বিতান বলল, “কাল ফার্স্ট আওয়ারেই অফিসে এসে ফোটোটা দিয়ে যাস। খবরের কাগজের বেওয়ারিশ ডেডবন্ডি নিয়ে যে বিজ্ঞাপনগুলো পাবলিশ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবি।” কথা শেষ হলে বন্ধুর পিঠে চাপড় মেরে বিতান হেসে বলল, “চল, বিটিং দ্য বুশের মতো বিটিং দ্য মার্গে ভালবাসার শরীর খুঁজে বেড়াই। সাম্য, মনে হচ্ছে তোর বাবা লোকটা ইন্টারেস্টিং। এই বয়েসে মৃতদেহকেও ভালবেসে ফেলেছে! একদিন ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যাস তো। লেসন নেব।”

বিতান তাকে সাহায্য করবে জেনে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েই ফিরেছিল সাম্যদীপ। তারপর দশদিন ধরে ছোট্টাছুটি চলছে। বিতান তো খবর দিচ্ছেই, নিজেও সকালে ক’টা খবরের কাগজ খুঁটিয়ে দেখছে। অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার মৃতদেহের খবর দেখলেই খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছে। থানা, হাসপাতাল, মার্গে ফোন করছে, নিজেও চলে যাচ্ছে। সব যে কাছাকাছি হচ্ছে এমন নয়, রাতের জার্নিও করতে হয়েছে। মাঝেমাঝে নীলকণ্ঠ সেন গোপনে ছেলেকে ফোন করেন, মেসেজ পাঠান। রানি অফিসে চলে গেলে, টুকটাক দোকান-বাজারে বেরোলে, অথবা ফাঁক পেয়ে বারান্দায় গিয়ে কথা চালাচালি করেন। রানি ছেলেকে আগ বাড়িয়ে ফোন করা পছন্দ করেন না। বিয়ের পর বাইরের বৌয়েরা যে

ঘরের ছেলেকে বদলে দেয়, সেকথা তাঁর ভালই জানা ছিল, কিন্তু এতটা জানা ছিল না। গত আট বছর সাম্যদীপ নিজের বাড়িতে থেকে অফিস করেছে, কই অসুবিধে তো হয়নি। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে লক্ষ মানুষ এই মফসসল শহর থেকে রোজ স্কুল, কলেজ, অফিস-কাছারিতে যাচ্ছে, কই অসুবিধে হচ্ছে না তো। অসুবিধে হঠাৎ শুরু হল? কলকাতার বাইরের ছেলেকে বিয়ে করবার কী দরকার ছিল? স্কুলের পাশে থাকে, এমন কাউকে খুঁজে নিলেই তো পারত ওই মেয়ে। এই জন্যই বিয়েতে মত ছিল না। ‘কাজে যেতে অসুবিধে হচ্ছে’— এই অজুহাতে বাড়ির ছেলোটাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল! এই মেয়ে আরও গোলমাল করবে, বড় সর্বনাশ করবে। আর সাম্যদীপই বা কেমন। বাবা-মা, বাড়ি ছেড়ে যেতে একবারও থমকাল না? এই মানুষ হয়েছে? এক বছরের বৌয়ের জন্য টোত্রিশ বছরের ঘর ছাড়ল! এই ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা তো দূরের কথা, মুখ দেখাই উচিত নয়। তারপরেও সাম্যদীপ তাকে ফোন করে। রানি সেই ফোন ধরেনও। আসা-যাওয়াও আছে, এখন কমেছে। আগে ছুটির দিন থেকেও যেত। স্বাভাবিক কারণেই, ছেলের সঙ্গে বাবার বেশি কথা হোক, চান না রানি।

“ছেলে যখন ছেড়ে চলে গিয়েছে, তোমার অত আদিখ্যেতার কী আছে?”

নীলকণ্ঠবাবু বলেন, “ছেড়ে চলে গিয়েছে কোথায়? কাজের জন্যই তো যেতে হয়েছে। ছেলেমেয়েরা বাইরে কাজ করে না? তারা কি ছেড়ে চলে যায়? এটাও সেরকম।”

রানি ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, “চুপ করো। তুমি ভাল করেই জানো, এটা সেরকম নয়। ওই বাইরে যাওয়া বাধ্য হয়ে যাওয়া, আর এখানে অসুবিধে একটা বাহানা। ওই নচ্ছার মেয়ের বানানো। তুমি একদম ফোন করবে না।”

গোপনে ফোন করেন নীলকণ্ঠ। ফিসফিস করে বলেন, “কোনও খবর পাওয়া গেল?”

সাম্যদীপ ক্লান্ত গলায় বলে, “এখনও পাইনি। চেষ্টা করছি।”

নীলকণ্ঠ ভাঙা গলায় বলেন, “হাতে তো বেশি সময় নেই। তা ছাড়া... তা ছাড়া মৃত শরীরে পচন ধরে... বেওয়ারিশ শরীরের জন্য ওরা কি বরফটরফের ব্যবস্থা রাখে?”

ফোনের ওপাশে সাম্যদীপ অবাক হয়। কত পুরুষেরই অতীত জীবনে প্রেমিকা থাকে, তারা হারিয়েও যায়। চোখে মনে সব দিক থেকেই হারিয়ে যায়। এই লোকটার এমন কেমন হচ্ছে? হারিয়ে-যাওয়া একটা শরীরে পচন ধরল, না তরতাজা থাকল, কী আসে যায় তাতে?

“আমি তো চেষ্টা করছি বাবা। কালও বনগাঁ গিয়েছিলাম। কিছু খবর হলে তোমাকে জানাব।”

মিনিট সাতেকের মধ্যে মংলাহাটির দহপাড়া লাশঘর থেকে বেরিয়ে এল সাম্যদীপ। বাবাকে ফোন করতে গিয়েও থমকে গেল, নম্বর টিপল বিতানের।

“কী হয়েছে?”

“বি, মনে হচ্ছে, ইনিই সেই মহিলা।”

বিতান উত্তেজিতভাবে বলল, “মনে হচ্ছে মানে! আর ইউ নট কনফার্মড?”

সাম্যদীপ বলল, “না। বাঁ ভুরুতে কাটা দাগ, ডান গালে আঁচিল রয়েছে ঠিকই, তারপরেও ফোটোর সঙ্গে মুখটা পুরো মিলছে না।”

বিতান বলল, “গায়ের রং? হাইট?”

সাম্যদীপ বলল, “হাইট কাছাকাছি, তবে গায়ের রং এতটাই রোদে পুড়েছে যে, ফর্সা কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তার ওপর আরও একটা ব্যাপার হয়েছে। অনেক ওপর থেকে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ায়, যদি অবশ্য দিয়ে থাকে, মুখটা খেঁতলে গিয়েছে। একটা চোখের অবস্থা বীভৎস।”

বিতান বলল, “তাহলে?”

সাম্যদীপ বলল, “বুঝতে পারছি না। আমি মোবাইলে ফোটো তুলে নিয়েছি।”

কথাটা বলতে গিয়ে সাম্যদীপের চোখের সামনে মহিলার মুখ, শরীর

ভেসে উঠল। পচন কি শুরু হয়েছে? শরীরে পাক দিয়ে উঠল।

তিন

খাটের এক কোণায় মাথা নিচু করে বসে রয়েছে সাম্যদীপ। অপরাধবোধে সে বিধ্বস্ত। নিজের শরীরকে চিনতে না পারার অপরাধ। একই সঙ্গে শরীরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ। বারবার এমন কেন হচ্ছে?

একটা বয়স পর্যন্ত নিজের শরীরের প্রতি থাকে বিশ্বাস আর উত্তেজনা। তারা শরীরকে যেমন আড়াল করে, তেমনই আড়ালে রাখা অন্যের শরীর দেখতে চায় গোপনে। সে আবারও, আভরণে যতই ঢাকা হোক অথবা থাকুক উন্মুক্ত। এ যেমন কৌতূহল, তেমন নিষেধ ভাঙার তাড়নাও বটে। সেই কৌতূহলের বয়সটা পেরিয়ে পরিণত মানুষ যখন আয়নার সামনে দাঁড়ায়, শরীর তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। যে শরীর তাকে আদরযত্ন নিয়ে এসেছে এতটা পথ, সে যেন বলতে চায়, “আমাকে কি চিনতে পার?” সত্যি তো, শরীর কতটা চেনা যায়? সৌন্দর্য আর খুঁত দেখে শরীরের কিছুটা চেনা যায়, সবটা নয়। কামনা বা শীতলতা, ক্রোধ বা নিস্পৃহতার অনেক কথা শরীর কাউকে বলতে চায় না, এমনকি শরীর যার, তাকেও নয়। তাই সব জানা হয় না।

সাম্যদীপ এতসব বোঝে না। শুধু বোঝে, সে বিপদে পড়েছে। বিপদ থেকে বেরনোর জন্য কতই না চেষ্টা করেছে গত এক বছরে। যত রকম চিকিৎসা সম্ভব ছুটেছে। কখনও উজ্জয়িনীকে নিয়ে, কখনও লুকিয়ে। চিকিৎসকেরা ওষুধ থেকে পরামর্শ সবই দিয়েছেন।

“আগে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল?”

“আগে মানে?”

বেশি বয়সের ডাক্তারবাবু ভুরু কঁচকে বিরক্তি দেখালেন। বললেন, “আগে মাগে বিয়ের আগে। বিয়ের আগে সেক্সের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল?”

লজ্জা পাওয়ার মতো বয়স নয়, যে সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে সে এসেছে, তাতে এই প্রশ্নে লজ্জা পাওয়ার কথাও নয়, তার পরেও সাম্যদীপ লজ্জা পেল। বিয়ের আগে উজ্জয়িনীর সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক সংক্ষিপ্ত। তাকে কি ‘সেক্স’ বলা যায়? বেডরুম পর্যন্তও সে সম্পর্ক গড়ায়নি, ড্রইংরুমের সোফাতেই শুরু, সেখানেই যবনিকা। উজ্জয়িনীই এগিয়ে এসেছিল। উল্টোদিকের সোফা ছেড়ে উঠে এসেছিল পাশে, হাত ধরে টেনে নিয়েছিল কাছে। লম্বায় সে সাম্যদীপের চেয়ে খাটো নয়, সমানই বলা যেতে পারে। তার বকবাকে সৌন্দর্যের এটাও একটা দিক। পেশায় স্কুলের দিদিমণি হলেও, লম্বাটে মুখে দিদিমণিসুলভ কাঠিন্য নেই। চওড়া কপাল, টানা এবং উজ্জল চোখে গভীর দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ নাকের ওপর যখন আবছা নীল ফ্রেমের চশমা এসে পড়ে তখন কোলিগরা তো বটেই ছাত্রীরাও একবার না তাকিয়ে পারে না। পাতলা ঠোঁটের হাসিটি সুন্দর, তবে সব সময়ের জন্য নয়। কখনও কখনও হাসি দিয়েও যে মানুষকে শাসন ও তাস্খিল্য করা যায়, মেয়েটি তা জানে। বাকি রূপও নজরকাড়ার মতো। দীর্ঘ গ্রীবায চুল এসে থমকে পড়েছে। সেই চুলেই মাথার ওপর এক চিলতে খোঁপা বাঁধা, কখনও আবার ক্লিপ লাগিয়ে ঝুঁটি। চওড়া কাঁধের নীচের উচ্চতার সঙ্গে মানানসই বুক, পেট, কোমর এবং হাত-পা। বাড়তি মেদ যেমন নেই, তেমন ভায়েট করা শুকনো ভাবও নেই। উজ্জয়িনী শরীরে তার বাবার গড়ন পেয়েছে, আর মন পেয়েছে মায়ের মতো। কলেজে পড়ার সময়ই মহিলা মারা যান হার্ট অ্যাটাকে। মায়ের মতোই ব্যক্তিত্ব, সোজাসাপটা কথা, যুক্তিপূর্ণ মন।

সেই সোজাসাপটা কথাই উজ্জয়িনী আজ সাম্যদীপকে বলেছে। তারপরেই চূপ করে সাম্যদীপ বসে রয়েছে খাটের এক কোণায়। এই ঘটনায় যাওয়ার আগে, অতীতের চুমুর কাহিনি শেষ করা যাক।

সেদিন উজ্জয়িনী মাথা টেনে নেওয়ার পর সাম্যদীপকে আর কিছু করতে হয়নি, করতে পারতও না, চুমুর কায়দাকানুন বইতে পড়া ও ছবিতে দেখা থাকলেও হাতেকলমে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না তার। দশ বছরের বালক বয়সে পাশের বাড়ির ‘বালিকা বন্ধু’ অদ্রিজা একদিন

খেলার ছলে গালে আক্ষরিক অর্থেই ‘চকাস’ আওয়াজে চুমু খেয়ে বসে। একেবারেই আকস্মিক, তারপরেই সেই মেয়ে দিয়েছিল ছুট। উত্তেজনার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং রাগ হয়েছিল সাম্যদীপের। একেই তো চুমুর মতো এক ‘ছেলেমানুষি’ কাণ্ড করেছে, তার ওপর আবার খেলা ভেঙেছে। রাগ তো হবেই। সেই চুমু ফিরে এল বড় হওয়ার পর, উজ্জয়িনীর সঙ্গে প্রেমপর্বে। সেদিন অফিস ছুটির পর বাড়িতে না ফিরে কলকাতায় এসেছিল সাম্যদীপ। ঘড়ি সারানো, মায়ের বাতের ওষুধ নেওয়া, কম্পিউটারের জন্য মাউস কেনা, নতুন ডোরবেল নেওয়ার মতো ক’টা কাজ ছিল। এসবই তাদের মফসসল শহরে হয় পাওয়া যায়, নয় অর্ডার দিয়ে আনিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু এতে দেরি হয়, আবার কখনও মনের মতোও হয় না। ডিজিটাল ঘড়িটা তো দুটো দোকানে সারাতেই পারেনি। বাতের ওষুধ নিয়েও মায়ের বাতিক রয়েছে। বৌবাজারের নির্দিষ্ট দোকান ছাড়া ওষুধ নাকি ঠিক মতো কাজ করে না। এই সব কাজ যতটা সম্ভব শেষ করে সাম্যদীপ টালিগঞ্জে পৌঁছে যায়। উজ্জয়িনীর অসুস্থ বাবার ঘরে ছিল মিনিট দশ, বাকি সময়টুকু ড্রইংরুমে। চায়ের সঙ্গে হালকা স্ন্যাক্স। অনলাইনে আনায় উজ্জয়িনী। ওঠার মুখে হঠাৎ উজ্জয়িনী সাম্যদীপের পাশে এসে বসে এবং হাত ধরে টেনে নেয় নিজের কাছে। মুখ নামায় সাম্যদীপের ঠোঁটের ওপর। হতচকিত সাম্যদীপ একরকম আত্মসমর্পণই করে। উপায়ও ছিল না তার। নারীশরীরে সে একেবারেই অপটু। স্মার্ট উজ্জয়িনী তার নীচের ঠোঁট নিজের মুখের ভিতর নিয়ে ফেলে আলগোছে। সাম্যদীপের একটা হাত তুলে আনে তার বেগুনি টি-শার্টের বুকের ওপর। এই যুগে যা একরকম অবিশ্বাস্যই, সাম্যদীপের সেই প্রথম কোনও নারীসঙ্গে হাত রাখা। তাও পোশাকে ঢাকা। শিউরে ওঠে সে, কঁপেও ওঠে অল্প। উজ্জয়িনী নিজেকে খানিকটা উঁচু করে এক রকম চেপে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রেখেই ফিসফিসিয়ে ওঠে।

“চেপে ধরো, চেপে ধরে আদর করো, আরও জোরে...”

জড়ানো গলায় বলতে-বলতে চুমু শেষ করে উজ্জয়িনী। সাম্যদীপের চোখে চোখ রেখে বললে হাঙ্গামা, গলা জড়িয়ে নাকে নাক ঠেকায়। বলে, “ভাল লেগেছে?”

দুই বুকের ছোঁয়ায়, আলোষের চুমুতে এতটাই শিহরিত হয় সাম্যদীপ যে উজ্জয়িনীর মনশিয়ানায় অবাক হতেও ভুলে যায়। মনে প্রশ্ন জাগে না, কই এই মেয়ে তো আনাড়ি নয়! ভালবাসার এই শরীরী কলা সে জানল কেমন করে? ফের মুখ নামায় উজ্জয়িনী, আবার চুমু খেতে চায়, আর তখনই ভিতরের ঘর থেকে প্রতাপ চিৎকার করে ওঠেন।

“শরীরে কষ্ট হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে খুব... উজ্জান কোথায় ভুই?”

ধড়ফড় করে ওঠে উজ্জয়িনী। জামা, পায়জামা ঠিক করতে করতে সোফা থেকে একরকম লাফ দেয়। শরীরে শরীরে টানা হাঁচড়া হয় যেন। এক শরীরের আরাম ফেলে অন্য শরীরের ব্যথার কাছে ছুটে যায় মেয়েটা। পিছনে যায় সাম্যদীপও।

বিয়ের আগে শরীরের অভিজ্ঞতা বলতে এটুকুই। এর পরে সময়ও পাওয়া যায়নি। উজ্জয়িনীর বাবার অবস্থা খারাপ হতে থাকে। বিয়ের কথা ওঠে এবং দ্রুত বিয়েও হয়ে যায় দু’জনের। শরীর চেনা তো দূরের কথা, মনের সম্পর্ক ভাল করে তৈরি হওয়ার আগেই তো বিয়ে।

ডাক্তারবাবুর জিজ্ঞাসা চোখের দিকে তাকিয়ে সাম্যদীপ আমতা-আমতা করে বলেছিল, “না, বলবার মতো কিছু নয়, ওই একটু, সামান্যই যাকে বলে।”

ডাক্তারবাবু হাত তুলে খানিকটা হতাশ গলায় বলেন, “থাক, বিস্তারিত বলতে হবে না। আসলে কী জানেন, আমাদের এটাই সমস্যা। বিয়ের জন্য ঠিকুজিকুঠি, জাত, শিক্ষা, সম্পত্তি, গায়ের রং সব মেলানো হয়, শরীরের কথাটাই কেউ ভাবে না। যেন ওই মিলটা অটোমেটিক হবে! ফুলশয্যায় গোলাপই ক্যাটালিস্ট। জেভার আলাদা হলেই সব হবে, নেগেটিভ পজিটিভের মতো তারে-তারে ঘষা লাগলেই কেবলা ফতে। আরে বাবা, শরীরকে শরীর পছন্দ করবে কিনা সেটা তো গার্জেনরা ঠিক করতে পারেন না, ছেলেমেয়েদের নিজেদেরই পথ ভেবে নিতে হয়। একবারে অন্তরঙ্গ না হোক, ক’টা দিন কাছাকাছি যাওয়ার তো সুযোগ

দেওয়া উচিত। বাড়ির বড়দের না জানিয়ে মেলামেশার সুযোগ পাওয়া দরকার তাদের। প্রেমের বিয়েতে তো ছেলেমেয়েরা আরও গভীরভাবে এই সুযোগ পায়। আপনি তো পেয়েছিলেন। পাননি?”

সাম্যদীপ বলল, “আমাদের চেনা-জানা খুব অল্প দিনের। তা ছাড়া, আমি ঠিক এরকম নই, আমার স্ত্রীও তাই।”

ডাক্তারবাবু ঠোঁটের কোণায় হেসে বললেন, “কী রকম নন? বিয়ের আগে সেক্ষেত্র বিশ্বাস করেন না?”

সাম্যদীপ বলল, “বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। অনেকের মতোই, অনেকের কেন, বেশির ভাগের মতোই অভ্যস্ত নই।”

ডাক্তারবাবু ভুরু কুঁচকে খানিকটা যেন আপনমনে বললেন, “সেটাই তো সমস্যা। বিয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণটাই হল, সেকশ্যুয়াল রিলেশন, অথচ ওটাকেই আমরা সবথেকে ইগনোর করি। মন দিয়ে না হয় বুঝলাম, শরীর দিয়ে কি পার্টনার আমাকে নিয়ে খুশি? অবশ্য এটাও ঠিক, আমাদের দেশে এই ধরনের আলোচনার কোনও মানে হয় না। ছেলেমেয়েদের ফ্রি মেলামেশার কোনও সুযোগই নেই। নিজের পছন্দের বিয়ে হলে তাও একটা সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে, সম্বন্ধের ব্যাপার হলে তো প্রশ্নই ওঠে না।”

এত ভাষণ সাম্যদীপের পছন্দ হচ্ছিল না, অথচ ডাক্তারবাবুর এখানে নামডাক শুনেই আসা। সে খানিকটা কাঁচুমাচু হয়েই বলল, “সমস্যাটা জটিল হয়ে পড়ছে।”

ডাক্তারবাবু বললেন, “আপনি কি কোল্ড ইন নোচার? বিয়ের আগেও কি কখনও নারী শরীরের জন্য কোনও উত্তেজনা বোধ করেননি? কোনও টান?”

সাম্যদীপ খড়কুটো চেপে ধরার মতো করে বলল, “একবারেই নয়। বিয়ের আগে তো বটেই, সেই কিশোর বয়স থেকে, অ্যাডোলেসেন্সের সময়টা আর কী, বাকি বন্ধুদের মতোই স্বাভাবিক ছিলাম। কলেজে পড়ার বয়সে, তার পরেও, মেয়েদের দেখতে ভাল লাগত। একজন পুরুষের যেমন লাগা স্বাভাবিক তেমনই।”

ডাক্তারবাবু খানিকটা থমকালেন যেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, “ভাল লাগত মানে? ডেন্ট হেজিটেট, সরাসরি বলুন। মিলনের ইচ্ছে করত? লজ্জা পাবেন না, এটা কোনও পাপ ইচ্ছে নয়। ঢাক পিটিয়ে বলার জন্য নয় ঠিকই, তবে ডাক্তারের কাছে গোপনের কিছু নেই।”

সাম্যদীপ মাথা নামিয়ে বলল, “আর পাঁচজন ছেলের মতোই ইচ্ছে হত।”

ডাক্তারবাবু চোয়াল শক্ত করে বললেন, “বিয়ের পর?”

সাম্যদীপ বলল, “এটাই সমস্যা ডাক্তারবাবু। উজ্জয়িনীকে আমি ভালবাসি, সে যেমন মনের দিক থেকে ভাল, তেমন সুন্দরীও। একটা সময় মেয়েদের থেকে দূরেই থেকেছি, লাজুক ছিলাম। উজ্জয়িনী সেই জড়তা ভেঙে দিয়েছে, বিয়ের পর আরও ভেঙেছে। যতবার তার সঙ্গে ফিজিক্যালি মিট করতে গিয়েছি, উত্তেজিত হয়েই গিয়েছি, অথচ কাছে যাওয়ার পর যে কী হয়... ঠিক বোঝাতে পারব না... কেমন যেন গুটিয়ে আসি, ভিতর, বাইরে দু'জায়গাতেই গুটিয়ে যাই।”

ডাক্তারবাবু মাথা নামিয়ে একটু চুপ করে রইলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “আপনার কথায় আমি সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেলো। এই ধরনের ফিজিক্যাল সমস্যা যৌ-ধরনের সিমটম থাকা দরকার, সেগুলোর সঙ্গে আপনার কথা মিলছে না। আসুন, একবার চেক করে নিই।”

পর্দার আড়ালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করতে ডাক্তারবাবু বেশি সময় নিলেন না। ফের চেয়ারে এসে বসে প্রেসক্রিপশনের প্যাড, পেন টেনে নিলেন। মুখে একটা নিশ্চিন্ত ভাব।

“এত ভাববেন না, কঠিন কিছু নয়। আমি একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি যৌন অক্ষমতায় ভুগছেন। যাকে সংক্ষেপে বলা হয়, ইডি। আপনার কথা শুনে এবং পরীক্ষা করে বুঝলাম, ঘটনা তা নয়। আপনি স্বাভাবিক অর্থাৎ সক্ষম। কোনও একটা কারণে ব্লকেড হচ্ছে। বিয়ের পরপর এমন হতে পারে, আপনার বেলায়

সময় বেশি নিচ্ছে। তবে চিন্তা করবেন না, কিছুই বয়স হয়নি আপনার, ঠিক হয়ে যাবে। লাইফস্টাইল বদলাতে হবে। স্ট্রেস ফ্রি থাকুন। রাতে ফুরফুরে মেজাজ আর শরীর নিয়ে ঘুমোতে যাবেন। মনে রাখবেন, শরীর চলে মনের ওপর। তা ছাড়া চারপাশটা, এই ধরুন, ঘরের নাইট ল্যাম্প, বিছানার চাদর এসবও খুব জরুরি। এই তো আপনার মতোই এক পেশেন্ট নাইট ল্যাম্পের আলো সবুজ থেকে নীল করে ভাল রেজাল্ট পেয়েছে।”

সাম্যদীপ নিচু গলায় বলেছিলে, “আমার ঘরে নাইটল্যাম্প ছিল না। উজ্জয়িনী ঘুমোতে পারে না।”

“আরে বাবা, সবার কি একই রেমিডি? একটা ট্যাবলেট দিছি। স্ট্রেস ফ্রি ট্যাবলেট। কদিন খেয়ে বন্ধ করে দেবেন। মনের ওপর চাপ নিয়ে কিছু করতে যাবেন না। তাহলে শরীর রিফিউজ করবে। আপনার সেটাই হচ্ছে। আপনার সমস্যা কম ফিজিক্যাল, বেশি সাইকোলজিক্যাল। একদিন দেখবেন ছট করে ব্লকেড কেটে গিয়েছে।”

এই পরামর্শে সমস্যা একটুও কাটল না। অরুণাভকে একদিন ঘটনাটা বলে ফেলল সাম্যদীপ। অরুণাভ পুরনো অফিসের সহকর্মী। কাছাকাছি বয়স। প্রথম চাকরির সময় সহকর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেশি হয়। কর্মস্থল বদলালেও কারও কারও সঙ্গে যোগাযোগ থেকে যায়। যেমন অরুণাভর সঙ্গে রয়েছে। অনেকের তুলনায় বেশিই রয়েছে। বিয়ের সময় ও তাড়াহুড়ো করে সব ব্যবস্থা করেছিল। ‘ব্যবস্থা’ বড় কিছু ছিল না, তাও কিছুটা তো ছিল। রেজিস্ট্রারকে সময় মতো ধরে নিয়ে আসা, ফুল-মালা কেনা, বর-বৌয়ের গাড়ি ঠিক করা, দশ-বারোজনের খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। অরুণাভ করিৎকর্মা ছেলে। পিকনিকের কায়দায় সবটা সেরা ফেলেছিল। সাম্যদীপের কথা শুনে খানিকটা চুপ করে থাকল, তারপর কথা বলল।

“বিয়ের কতদিন হল?”

সাম্যদীপ বলল, “বছর গড়াতে চলল।”

“এত দিন হাত গুটিয়ে বসে আছিস?”

সাম্যদীপ বলল, “ডাক্তার দেখিয়েছি। ওষুধ দিয়েছেন, স্ট্রেস ফ্রি। কাজ হয়নি।”

“ধূস, কিমনোর ওষুধ খেয়ে কী হবে? দরকার তো ঝেড়ে ওঠার।”

সাম্যদীপ বলল, “উজ্জয়িনীর জন্য খারাপ লাগছে।”

অরুণাভ থমথমে গলায় বলল, “লাগবারই কথা। দাঁড়া, আমি একটা চেষ্টা করে দেখি, ফোনটা রাখ।”

খানিক পরেই অরুণাভর ফোন।

“শনিবার অফিসের পর আমার সঙ্গে যাবি।”

সাম্যদীপ বলল, “কোথায়?”

অরুণাভ বলল, “কোথায় জেনে কী করবি? একজন এই ধরনের কেস হ্যান্ডল করে বলে শুনেছি। আসনটাসন দেয়।”

সাম্যদীপ বলল, “হাতুড়ে নয় তো?”

অরুণাভ বিরক্ত গলায় বলল, “হাতুড়ি না পেরেক জানি না। আর হলেই বা কী? শরীরে এনার্জি আনলেই তো হল। শনিবার বিকেলে যাব।” সেই লোক আসন, ব্যায়াম কিছু বলল না, শুধু এককান্ডি টাকা নিয়ে সবুজ রঙের ক’টা ক্যাপসুল দিল।

“রাতে শোওয়ার ঘন্টাখানেক আগে একটা খেয়ে নেবেন। চিন্তা করবেন না, গাছের পাতা, গাছের বাকল, হাড়ের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি।”

সাম্যদীপ ভয়ে ভয়ে বলেছিল, “কিসের হাড়?”

ফতুয়া পরা, গলায় বড় বড় পাথরের মালা ঝোলানো সেই লোক রেগে গিয়ে বলল, “জেনে কী করবেন? আপনার শরীর জানলেই তো হল। শরীর কি আপনাকে সব জানায়? এই যে আপনি বৌমার কাছে পৌঁছেলেই ঠান্ডা মেরে যান, সে সময় কি আপনার শরীর আপনাকে জিজ্ঞেস করে? ক্যাপসুলে ভল্লুক না প্যাঙ্গোলিনের হাড়ের গুঁড়ো থাকে সে খবরে আপনার দরকার কী? ইচ্ছে হলে খাবেন, না হলে খাবেন না। ভাই, আপনার যেমন আপনার আত্মার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, তেমন শরীরের ওপরেও নেই। তাদের কিছু সময়ের জন্য বশে আনতে ব্যবস্থা

লাগে। সেই ব্যবস্থাই করলাম।”

অরুণাভ পরে বলল, “এত ভাবছিস কেন? কাজ হলেই তো হল। অনেকেই খায়।”

ক্যাপসুলে হাত-পা কাঁপুনি আর বুক ধড়ফড় ছাড়া কোনও লাভ হয়নি। পরদিনই ফেলে দিল উজ্জয়িনী।

“লেখাপড়া জেনেও কীভাবে এই সব হাতুড়ের পাল্লায় পড়লে? এবার মাদুলি, তাবিজ নেবো।”

সাম্যদীপ হতাশভাবে বলেছিল, “হয়তো তাই নিতে হবে। কোনও কিছুই তো কাজ করছে না।”

উজ্জয়িনী মুখ ফিরিয়ে থমথমে গলায় বলেছিল, “আমাকে জড়িয়ে এসব করবে না। একেই তোমার মা সহ্য করতে পারেন না, তার পর কিছু একটা ঘটে গেলে, অপবাদ বইতে হবে।”

আর এক ডাক্তারের কাছে উজ্জয়িনী নিয়ে গেল। নরনারীর যৌনসমস্যা নিয়ে বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন সেই মহিলা। সব শুনে, আগের প্রেসক্রিপশন দেখে বললেন, “সত্যি সমস্যাটা পিকিউলিয়ার। একেবারে ফ্রিজিড হলে বোঝা যেত, কিন্তু তা তো নয়, একটা পয়েন্টে এসে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কতগুলো টেস্ট করিয়ে দেখি, মনে হয়, এতে অসুখ ধরা পড়বে।”

গাদাখানেক পরীক্ষা হল, অসুখ ধরা পড়ল না। ডাক্তারও গালে হাত দিয়ে বসলেন। বললেন, “আর একটু দেখি, নইলে হরমোনা লিটমেন্ট শুরু করব।”

একরাতে উজ্জয়িনী বলল, “এই সমস্যার জন্য আমি দায়ী নই তো সাম্য?”

উজ্জয়িনীকে একথা তার ইউনিভার্সিটির সহপাঠী পূর্বা বলেছে। পূর্বীর ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট উজ্জয়িনীর মতো ভাল নয়, তার পরেও সে কলেজে চাপ পেয়েছে। উজ্জয়িনী স্কুলেই আটকে। অনেকে নানা কথা বলেছিল, উজ্জয়িনী কান দেয়নি। সে মনে করে, শুধু ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়ে ছাত্রছাত্রীকে বিচার করা ঠিক নয়, পূর্বীর গবেষণার বিষয় খুবই ভাল ছিল, সেই কারণে তাকে টপকে যেতে পেরেছে। এতে সম্পর্ক তো টিকে গিয়েছেই, পূর্বাও তার বান্ধবীর প্রতি কৃতজ্ঞ। চরিত্রের বিচারে পূর্বা বেশি সোজাসাপটা এবং বাস্তবোচিত। বাবা-মা মারা যেতে দু’বারই উজ্জয়িনীর পাশে ছিল সে। চটজলদি সেরে ফেলা বিয়েতেও এসেছে। বন্ধুকে সাজগোজ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এভাবে বিয়েতে আপত্তি ছিল। এমন ছট বলতে বিয়ে করা সে পছন্দ করেনি। নিজের জীবনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা থেকেই করেনি।

“একজন খুব অসুস্থ বলে, তার মেয়েকে এখনই বিয়ে করে নিতে হবে, এ কেমন কথা!”

উজ্জয়িনী বলেছিল, “বাবা তো আর রাস্তা থেকে ছেলে ধরে এনে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে না। সাম্যদীপকে তো আমি চিনি, পছন্দ করছি নিজেই।”

পূর্বা বলল, “রাখ তোর চেনা। পাঁচ, না ছ’মাস কি চেনা হল? ধরে নিচ্ছি, তোর বাবা কন্যার বিবাহ দেখে শান্তিতে চোখ বুজতে চান, আর তোরাও তাতে মদত দিচ্ছিস, তাই তো? তার থেকে এই সময়টা তোর বাবার জন্য ব্যয় করলে কি তার জন্য বেশি শান্তির হত না? কষ্ট আর-একটু কমানো যেত হয়তো।”

উজ্জয়িনী বলল, “কষ্ট কমানোর আমরা তো কম চেষ্টা করছি না। সাধ্যমতো খরচও করছি। আমার বিয়ে তো হচ্ছে একেবারে নমো নমো করে, সেটাও বাবার জন্য একরকম শান্তি।”

পূর্বা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, “আমি তোদের সিদ্ধান্তকে নমো করছি। বল এবার কী করতে হবে?”

উজ্জয়িনী হেসে বলল, “তা না হয় বলছি, তার আগে বল তো, বেশি সময় ধরে পাত্র খুঁজলে কি সংসার ভাল হয়? নাকি প্রেম করতে করতে বোর হয়ে যাওয়ার পর বিয়ে করলে দাম্পত্য জোরদার হয়?”

পূর্বা বলল, “কোনও নিয়ম নেই। জীবনের কোনও কিছুই নিয়ম নেই, তাও একটা চাপ। সময় নেওয়া, আর একটু জেনে-বুঝে নেওয়া।

আমার বেলায় দেখলি তো কী হল।”

পূর্বীর বিয়ের ঘটনা দুঃখের। পড়াশোনা শেষ করতেই বাড়ি থেকে এক রকম জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ ‘সুপাত্র’ পেয়ে হাতছাড়া করতে চায়নি। পাত্রের ‘সিঁড়ি’ ভাল ছিল, কিন্তু সেটি যে ‘ভুয়ো’, এটা বোঝা যায়নি। বিয়ের তিনমাসের মাথায় যখন বোঝা গেল, ততক্ষণে লোকটি পালিয়েছে। উজ্জয়িনী সেদিন আর এগোয়নি। বলেছিল, “রাখ ওসব। এখন আমার কাজটা কী করে এগোনো যায়, সেটা দেখা।”

বিয়ের পরেও পূর্বীর সঙ্গে মাঝেমাঝে দেখা হয়, তা ছাড়াও ফোনে, ওয়াটসঅ্যাপে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে উজ্জয়িনীর। সেই উজ্জয়িনীর দু’একটা মেসেজ দেখে খটকা লেগেছিল পূর্বীর। ডেকে পাঠায় বাড়িতে। মন দিয়ে ঘটনা শোনে।

“ইমপোটেন্ট? পুরুষত্বহীন?”

“ডাক্তাররা তো তা বলছেন না। বলছেন, ফিজিক্যালি নরমাল। সাম্যও একটা লেভেল পর্যন্ত এন্ড্রাইটেড থাকে, পুরুষমানুষের যেমন হতে পারে আর কী। হঠাৎ কাছে আসবার পর, দুম করে অফ হয়ে যায়।”

পূর্বা বলল, “অফ হয়ে যায় মানে?”

উজ্জয়িনী বলে, “অফ হয়ে যায় মানে থমকে যায়, ওর ভিতরে একটা রিপালশন তৈরি হয় যেন... ঠিক বুঝতে পারি না।”

পূর্বা আবার একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, “উজ্জয়িনী তোর কোনও গোলমাল নেই তো?”

উজ্জয়িনী অবাক হয়ে বলে, “আমার গোলমাল! আমার কী গোলমাল থাকবে? ডাক্তাররা তো এমন কিছু বলেননি।”

পূর্বা বলল, “এটা তো বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তোর অ্যাটিটিউড কোনও ঘাটতি আছে হয়তো।”

উজ্জয়িনী ভুরু কুঁচকে বলে, “অ্যাটিটিউডের ঘাটতি আবার কী?”

পূর্বা অল্প হেসে বলে, “আচ্ছা, ও কথা বাদ দে, পুরুষের শরীর তো মেয়েদের কিছু ভঙ্গি চায়, সে যতই স্বামী-স্ত্রী হোক না কেন, চায় কি না? তুই কি প্রপারলি অ্যাক্ট করিস? সাম্যকে কাছে টানবার জন্য যা যা করা উচিত, নাকি নিজের শরীর নিয়ে শুধু অপেক্ষাই করিস?”

উজ্জয়িনী বলে, “ধূস, কী সব যা খুশি বলছিস। দুনিয়ায় রোজ কোটি কোটি নারী-পুরুষের শরীর ভালবাসছে, আদর করছে, সব কি এত হিসেব করে? তোর কথায়, প্রপারলি অ্যাক্ট করে তারা? কোথায় কোন সাগরপাড়, কোন জঙ্গলের ভিতর, কোন মরুভূমিতে এমন ভাবনাচিন্তা হয়? তোর যত উদ্ভট ভাবনা।”

পূর্বা আবার অল্প হাসে। বলে, “কোথায় কী হয়, তোর-আমার কি সব জানা আছে? কে কাকে কেমন করে কাছে ডাকবে, তার কোনও নিয়ম নেই। ছলাকলার কোন অস্ত্র কার আস্তিনে লুকিয়ে থাকে, কেউ বলতে পারে? সে নিজেও পারে না। সুলেখাকে মনে আছে? হিষ্ট্রির সুলেখা? শুনেছি, রাতে সর্বস্ব পরে বিছানায় না এলে ওর বর নাকি পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। নাইটিফাইটি, সে যতই অ্যাপিলিং, রিভিলিং হোক না কেন, ওই লোকের নাকি কিছু হয় না। অনেকটা সময় ধরে, আদর করে জামাকাপড় মুক্ত করতেই ওর উত্তেজনা।”

উজ্জয়িনী বলল, “স্বামীর সঙ্গে ছলাকলা কিসের? তা ছাড়া, সাম্যর বৌ তো পুরনো হয়ে যায়নি।”

পূর্বা চোখ সর করে বলল, “স্বামী মানে কি সে পুরুষ নয়? স্ত্রীর ব্যাপারেও তো একই কথা, যতই পুরনো হয়ে যাক, সে কি নতুন-নতুন কায়দার আদর চায় না? বাঁপিয়ে পড়া স্বামী এবং দ্রুত ক্রিয়াকর্ম শেষে পাশ ফিরে নাকডাকা স্বামীতে কোন স্ত্রী খুশি বল? এটাও একটা সায়েন্স, শরীরের আর এক রকম বিজ্ঞান, একে অস্বীকার করা বা গোপন করবার মধ্যবিস্তপনা থেকে বেরিয়ে আয় উজ্জয়িনী।”

উজ্জয়িনী বলল, “তুই কি আমাকে সেক্স এডুকেশন দিচ্ছিস?”

পূর্বা দু’পাশে দুটো হাত ছড়িয়ে বলল, “ভাবলে তাই। শিক্ষার কোনও বয়স হয় না। তোদের সমস্যা যা নিয়ে, তাই নিয়েই শেখাতে হবে। পাহাড়ে চড়া নিয়ে সমস্যা হলে, পাহাড়ে চড়া নিয়ে বলতাম। যাক, ঠাট্টা

বাদ দিয়েই বলছি, তুই একবার ভেবে দেখিস, সাম্যদীপের শরীর তোর থেকে আরও বেশি কিছু চাইছে কিনা। স্বামী বলেই টেকেন ফর গ্রান্টেড নিস না। রাগারাগি না করে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখিস।”

এর পরেই এক রাতে সাম্যদীপকে উজ্জয়িনী প্রশ্ন করেছিল, “আমি দায়ী নই তো সাম্য?”

সাম্য অবাক হয়ে বলে, “তুমি! তুমি কেন দায়ী হতে যাবে? সমস্যা তো আমার ভিতরে।”

উজ্জয়িনী অন্যমনস্কভাবে বলে, “আমিও ঠিক বলতে পারব না। তার পরেও তোমার কোনও রকম চাহিদা থাকলে জানিয়ে আমাকে।”

সাম্যদীপ কী বলবে? উজ্জয়িনীর শরীর তাকে যথেষ্ট আকর্ষণ করে। আঠাশ বছরের নারীশরীর যে এমন সুন্দর হতে পারে তার জানা ছিল না। সেই শরীরকে শুধু দেখতে নয়, ছুঁতেও ইচ্ছে করে। সেই ইচ্ছে স্বামীর অধিকারবোধ থেকে আসা রুটিন ইচ্ছে নয়, ভালবেসে আদর করার ইচ্ছে। তাহলে এমন কেন হয়? উজ্জয়িনীর শরীরের কাছে আসার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব থমকে যায় কেন? যেন আলো নিভে যায়। শরীরের এ কী বিশ্বাসঘাতকতা! নাকি শরীর এমনই? সে নিয়মের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। যেখানে মাতবারণ নয়, মেতে ওঠে সেখানে, আর যেখানে তার যাওয়ার কথা সেখানে থেকে মুখ ফেরায়। সাম্যদীপ মনকে শক্ত করেছে বারবার, শরীরকে শাসন করেছে। একা ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ফিসফিস করে বলেছে, “কোনও সমস্যা নেই, কোনও অভাব নেই তোমার। তার পরেও কেন পালিয়ে যাও?”

খানিক আগেও তাই ঘটেছে। আজ উজ্জয়িনী ছিল অনেকে বেশি আক্রমণাত্মক। নাইটির ফিতে সাম্যদীপের হাতে ধরিয়ে দিয়ে, কানের লতিতে ঠেঁট রেখে বলেছিল, “খুলে দাও... সব খুলে মুক্ত করো নিজের হাতে।”

শুধু নাইটি নয়, অন্য রাতের মতো অন্তর্বাঁস না পরে আজ সে শুতে আসেনি, গায়ে সবই রেখেছে। “স্বামী” থেকে বেরিয়ে এসে সাম্যদীপ যাতে শুধুই “পুরুষ” হয়, তার উপকরণ সাজিয়েছে যেন। বান্ধবীর কথা নিয়ে ক’দিন ভেবেছিল, ঠিক হতেও তো পারে। সাম্যদীপের বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজা খোলায় তারও অতিরিক্ত দায়িত্ব থাকতে পারে। সবাই তো আর এক রকম নয়। তার পরেই নিজেকে অন্যভাবে উপস্থিত করেছে। সাম্যদীপ যেমন তাকে আবরণমুক্ত করেছে, সেও করেছে। শরীর জুড়ে আদর করেছে। এতদিন যা জানত না, বাদ রেখেছিল যেটুকু, এড়িয়ে গিয়েছিল হয়তো, আজ সবই স্পর্শ করল। সাম্যদীপের জেগে-ওঠা শরীরের প্রত্যুত্তরে খুশি হয়ে ভেবেছিল, পূর্বাই ঠিক তবে। এক সময়ে দু’জনেই উত্তেজনার চরমে পৌঁছে, সাম্যদীপের একটা হাত নিজের কোমরে টেনে নেয়, পা তুলে দেয় গায়ে। সারা শরীর দিয়ে শরীর ছোঁয়। এক মুহূর্ত, বড় জোর দুই, গায়ের ওপর থেকে উজ্জয়িনীর পা সরিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো কঁপে উঠে, ছিটকে সরে যায় সাম্যদীপ, যেন পালিয়ে যেতে চায়।

দাঁতে দাঁত চেপে উজ্জয়িনী বলে, “কী হল?”

দু’হাতে মুখ চাপা দিয়ে একরকম ককিয়ে ওঠে চৌত্রিশ বছরের শক্তসামর্থ্য চেহারার পুরুষ।

“জানি না কী হল... বিশ্বাস করো উজ্জয়িনী... জানি না।”

রাগে, অপমানে ছিটকে সরে যায় উজ্জয়িনী। নেমে পড়ে খাট থেকে। ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা অবিন্যস্ত পোশাকে, অন্তর্বাঁসে নগ্ন শরীর ঢাকতে থাকে। সাম্যদীপ বিভ্রিভ করে কিছু বলতে যায়। কানে তোলে না উজ্জয়িনী। সে বাথরুমে যায়। গায়ে জল ঢালতে থাকে উম্মাদের মতো। শরীরের আগুন, মনের অপমান, দুটোই ধুয়ে দিতে চায় যেন। খাটের একে কোনায় মাথা নিচু করে বসে থাকে বিধ্বস্ত সাম্যদীপ। উজ্জয়িনী ঘরে এলে একসময় বিভ্রিভ করে বলে, “জানো উজ্জয়িনী, মনে হয়, ওই মহিলাকে খুঁজে পেয়েছি।”

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ঘুরে দাঁড়ায় উজ্জয়িনী। চিৎকার করে ওঠে।

“লজ্জা করে না বলতে? নিজের বোয়ের জ্যাস্ত শরীরের কাছে নেতিয়ে থাকো, বাবার প্রেমিকার মরা শরীর খুঁজে বেড়াও। চুপ করো,

একদম চুপ করো। আমি তোমার সঙ্গে থাকব না। নিজের জীবন বরবাদ করতে পারব না আমি। কিছুতেই পারব না।”

চার

নীলকণ্ঠবাবু ছেলের মোবাইল ফোন হাতে স্থির হয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর চোখ ফোনের স্ক্রিনের দিকে নয়, জানলার বাইরে। নিষ্পলক চোখে তিনি অন্যমনস্ক। হয় তিনি অতীতে ফিরেছেন, নয় অতীত তাঁর কাছে ফিরেছে।

সাম্যদীপ বলল, “বাবা, চিনতে পারছ?”

তেষটি-চৌষটি বছর না চেনার মতো কোনও বয়স নয়। এই ছবির মানুষটাকে তো আরও নয়। তার পরেও নীলকণ্ঠবাবু চুপ করে রইলেন। জবাব দেওয়ার তাড়া নেই। ফোটাতে মহিলার চোখ বোজা, মুখ পাশ ফিরে রয়েছে। ফলে এক পাশ দেখা যাচ্ছে। এই মানুষকে চেনার জন্য নীলকণ্ঠবাবুর এক পাশই যথেষ্ট। সাম্যদীপ এক পাশের মুখসহ মৃতদেহের ফোটা তুলে এনেছে। দুটোর বেশি ফোটা তোলায় দহপাড়ার মর্গের লোক অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা নিয়েছে।

“ভাই, আপনাকে তো বলেছিলাম, চেনা হলে বেশি দিতে হবে। বলিনি?”

উৎকট গন্ধ এবং ভয়ঙ্কর পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে দরদাম করায় মন ছিল না সাম্যদীপের। বুক পকেট থেকে বাবার দেওয়া ফোটা বের করে ততক্ষণে মেলানো হয়ে গিয়েছে। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মুখের সঙ্গে পঞ্চাশের মুখের তফাত তো থাকবেই, তবে গড়ন বদলায় না। তীক্ষ্ণ, কাটা মুখ ভারী হয়েছে, ফুলেছে, পাথরে ধাক্কা খেয়ে থেঁতলে বিকৃত হয়েছে একপাশ, তার পরেও মিল অনেকটাই। বাঁ দিকের ভুরুতে কাটা দাগ, ডান গালে নাকের পাশে আঁচিল। সময়, অভাব, জীবনযুদ্ধের কালে আস্তরণ পড়লেও রং যে একসময় ফর্সা ছিল, তাও বোঝা যায়। মাটিতে শুইয়ে রাখা দেহের মুখ থেকে কাপড় সরাতেই চমকে উঠেছিল সাম্যদীপ। আবরণহীন শরীরও খানিকটা দেখা গেল। গত কয়েকদিন ধরে লাশ কাট ঘরের কাটাছেঁড়া, রক্তাক্ত, ভেঙেচুরে যাওয়া ভয়াবহ শরীর দেখে খানিকটা অভ্যস্ত হয়েছে বইকি। প্রথম ক’দিন বাড়িতে ফিরে খেতে পারেনি। ভাতের থালা সামনে নিলে মনে পড়ে গিয়েছে, নাভি থেকে উঠে এসেছে মৃত্যুর গন্ধ। থালা সরিয়ে উঠে পড়েছে। রাগারাগি করেছে উজ্জয়িনী।

“এই ধাত্মমো বন্ধ করো।”

সাম্যদীপ বলেছে, “আর ক’টা দিন।”

উজ্জয়িনী ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, “কিসের ক’টা দিন? চরিত্রহীন বাবার আবদার বয়ে বেড়ানোর জন্য সময় চাইছ? বলতে লজ্জা করছে না?”

সাম্যদীপ বলেছে, “চরিত্রহীন বলছ কেন? একজন পরিচিত মানুষকে খোঁজটা কি অন্যায়?”

উজ্জয়িনী ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, “মানুষ! খুঁজছেন তো মৃতদেহ, শরীর। যে-শরীরের ওপর তোমার বাবার কোনও দাবি নেই, যে-শরীর থেকে তিনি এতকাল পালিয়ে বেড়িয়েছেন, তার প্রতি নতুন করে আদিখ্যেতা দেখানোকে কোন মুখে গ্লোরিফাই করছ? এর মধ্যে গৌরবগাথা কোথায়?”

সেদিন থমকে গিয়েছিল সাম্যদীপ। উজ্জয়িনীর কথা পুরোটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। কিন্তু মানুষ কি তার শরীর থেকে আলাদা? মৃত্যুর পর শরীরকে শ্রদ্ধা জানানোর কত না সমারোহ থাকে! ফুলে, ধূপে, ধ্বনিতে অথবা নীরবতায় কত আয়োজন! মৃত মানুষ কি তা জানতে পারে? ভালবাসারও কিছু আয়োজন থাকলেই বা দোষ কোথায়? নীলকণ্ঠ সেনের এই সন্দান তো ভালবাসাই। তার ওপর মহিলা তো শেষ ইচ্ছেতে প্রেমিকের কাছে এটুকু নিজেই চেয়েছেন। আত্মীয়ার ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় যে চিঠি তিনি লিখে গিয়েছেন, তা সাম্যদীপ পড়েছে। আজ যেমন মোবাইলে বয়ে আনা ফোটা হাতে নিখর হয়ে বসে রয়েছেন নীলকণ্ঠ সেন, সেদিনও চিঠি হাতে বসেছিলেন। যে-ছেলোটি ঠিকানা

খুঁজে চিরকুট পৌঁছে দিয়েছিল, তাকে সাম্যদীপ দেখেনি। দেখার কথাও নয়। বাড়ি পর্যন্ত আসেনি সে। বাবাই ব্যবস্থা করেছিলেন বাইরে। স্ত্রীকে গোপন করে ফোনে তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

“নীলকণ্ঠবাবু? মানাদি আপনার ফোন নম্বর দিয়েছে। একটা খাম পৌঁছে দিতে বলেছে।”

নীলকণ্ঠবাবু একটু চুপ করে গলা নামিয়ে বললেন, “জানি। আপনার মানাদিকে ফোন করে পাচ্ছি না।”

“আমিও পাচ্ছি না। কী একটা ঘটনার পর উনি খুব আপসেট হয়ে পড়েছেন। ফোনটোনও ধরেন না। যে বাড়িতে ভাড়া থাকেন, সেটাও ছেড়ে দেবেন বলছিলেন। মনে হয়, এতদিনে দিয়েছেনও। যাক, আমি কোথায় যাব সেটা বলুন। বাড়ির অ্যাড্রেস দিন। কাল সকালে আপনি থাকবেন? নাকি বাড়ির কারও হাতে খামটা দেব?”

নীলকণ্ঠবাবু খানিকটা আঁতকে উঠেই বলেন, “না না, বাড়িতে নয়। আমি বলে দিচ্ছি কোথায় আসবেন।”

“সকালে বলবেন। আমার সময় নেই, নেহাত মানাদি ডেকে পাঠিয়ে বললেন তাই...”

সেই অপরিচিত ছেলেকে বাজারের কাছে দুধের দোকানের সামনে আসতে বলেছিলেন নীলকণ্ঠবাবু। সবুজ জামা, চোখে সানগ্লাস দেখে চিনতে হয়েছে। খামের মধ্যে খাতার পাতায় লেখা চিঠি। পাতা ছিঁড়ে পাঠানো হয়েছে। কোনায় হলুদের দাগ। কে জানে রান্না করতে করতে লেখা কিনা। কালিও খুব স্পষ্ট নয়, তবে পড়া যাচ্ছে।

“মানাদি,

অনেকদিন তোমার আশ্রয়ে থাকলাম। যেদিন তোমার কাছে এসে উঠেছিলাম, শরীরে মনে বিধ্বস্ত ছিলাম। সংসারে একা মানুষ ভেঙে পড়লে তা হয় ভয়ঙ্কর। কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তুমি শুধু আশ্রয়ই দিলে না, আমাকে অনেকটা সুস্থ করলে মানাদি। আমার কোনও আক্ষেপ নেই, বরং মনে করি, কুড়ি-বাইশ বছর আগে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সেটাই সঠিক। তোমার উৎসাহে আবার মেয়েদের সমিতিতে যোগ দিয়েছি, লেখাপড়া, গান, সেলাই শেখালামও কয়েক বছর। আর ভাল লাগছে না মানাদি। ক্লান্ত লাগছে। বিকেল হলে মনখারাপ হয়। মনে হয়, অনেকদিন হল, এবার পালাতে হবে। অপারেশন মারা যাওয়ার পর থেকে তুমি একা হয়ে গিয়েছ ঠিকই, কিন্তু এটা তোমারই সংসার। আমি সেখানে থাকা মানে, সংসারেই তো রয়েছি। সংসার ছেড়ে যেতে হবে আমায়। মনে হয়, মনের বিধ্বস্ত ভাবটা আবার ফিরে এসেছে। অবসাদ যেতে যায় না। যাক, ভেবেছি এবার এমন জায়গায় যাব, যেখান থেকে আর কখনও আসতে হবে না। আমার আর বাঁচতে মন চাইছে না। মৃত্যুতে মনখারাপ নেই মানাদি। এসব তোমাকে মুখে জানালাম না, আটকে দিতে, তাই লিখলাম। আজাকাল কেউ চিঠি লেখে না। সিমটা নষ্ট করে, ফোনটাও ফেলে দেব ঠিক করেছে। রাগ করো না, দুঃখ পেয়ো না। যেভাবে হঠাৎ এসেছিলাম, সেভাবেই হঠাৎ চলে যাচ্ছি। এই ভাল। একটাই অনুরোধ, আমি চলে যাওয়ার দু’দিন পরে, পারলে নীলকণ্ঠর সঙ্গে একবার যোগাযোগ করো, ওর ফোন নম্বর তোমার কাছে রয়েছে। হারিয়ে গেলে, আমার এই খাতার পিছন থেকে দেখে নিয়ো। বদলে যাওয়া নম্বর তো তুমিই দিয়েছিলে। যদি সম্ভব হয়, ওকে বলবে, আমি চলে গেলাম। পাকাপাকিভাবে চলে গেলাম। তবে আমার ভালবাসা রইল ওর কাছে। যদি পারে, একবার...থাক ও কথা। অনেক বকলাম, এবার যাই। পাঞ্চালী।”

চিঠি পাওয়ার দিন বিকেলে সাম্যদীপকে ডেকে পাঠান নীলকণ্ঠ। রানি কলকাতায় গিয়েছিলেন। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগটা নেন।

“একটা বয়সের পর বাবার গোপন কথা, ছেলের কাছে গোপন থাকে না। তার পরেও মনের দিক থেকে বাধা থাকে। উচিত-অনুচিতের বাধা। সেই বাধা সরিয়ে তোমাকে ডেকেছি। কারণ এ দায়িত্ব আর কাউকে দিতে পারব না। যদি আমাকে মন্দ মনে হয়, নিজের ছেলেরই তো হবে।”

সাম্যদীপ বলেছিল, “কী হয়েছে?”

নীলকণ্ঠবাবু হাতের কাগজ এগিয়ে বললেন, “এটা পড়ো।”

দ্রুত চিঠিটা পড়ে ফেলে সাম্যদীপ। আন্দাজ করতে পারে অনেকটাই। তাহলে এই মহিলার নাম পাঞ্চালী। মায়ের চোঁচামেচির সময় কখনও-কখনও নামটা শুনতে পেত। চিঠিতে উনি তো সুইসাইডের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

নীলকণ্ঠবাবু গলা খাঁকাড়ি দিয়ে বলেন, “পাঞ্চালী আমার পরিচিত। যখন আলাপ হয়, তোমার বয়স তিন-চার বছর। তোমার মাকে মাঝেমধ্যে যাকে নিয়ে উত্তেজিত হতে দেখো, এই মহিলাই তিনি। হ্যাঁ, আমার সঙ্গে শুধু পরিচয় নয়, একটা সম্পর্ক ছিল। তবে তোমার মা যা বলে, যেভাবে বলে তেমন নয়, অবশ্য তার কোনও দোষ নেই। আমি হলে এ রকমই ভাবতাম। বাদ দাও ওসব। বেশি সময় নেব না, তোমার মা চলে আসতে পারে। মানাদি পাঞ্চালীর দূর সম্পর্কে আত্মীয়া। আমার সঙ্গে একবার আলাপও হয়েছিল। তারপর বহু বছর পর দেখা হয় হাওড়া স্টেশনে। প্রথমটায় চিনতে পারিনি, চিনতে পারার কথাও নয়। উনিই এগিয়ে এসে কথা বলেছিলেন। কোনও কোনও মানুষের মুখ মনে রাখার ক্ষমতা শক্তিশালী হয়। মানাদি তখনই আমাকে বলেছিলেন, পাঞ্চালী কলকাতার বাসা ছেড়ে, কাজ ছেড়ে, তাঁর কাছে উঠেছে। উনি আমার ফোন নম্বরও নেন। দেওয়া ঠিক নয়, তাও দিলাম। মানুষের উচিত নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, সে পারে না। পারে না বলেই হয়তো সে মানুষ।”

নীলকণ্ঠ সেন থামলেন। সাম্যদীপ বলল, “আমাকে কী করতে হবে?”

নীলকণ্ঠবাবু ছেলের চোখে চোখ রেখে বললেন, “অসম্ভব এবং অবাস্তব একটা কাজ।”

সাম্যদীপ অবাক হয়ে বলল, “মানে!”

নীলকণ্ঠবাবু একটু থমকালেন। সম্ভবত ভিতর থেকে শক্ত হলেন। বললেন, “মানাদি আমাকে ফোন করেছিলেন। ওর মনে হয়, পাঞ্চালী অলরেডি কমিটেড সুইসাইড। চিঠি পড়ে আমারও তাই মনে হয়। সে একজন শক্ত মনের মানুষ, যেটা করব মনে করে, সেখান থেকে পিছোয় না। মানাদি খুব বিরক্ত, রেগেছেনও। তিনি মনে করেন, পাঞ্চালী তাঁকে বিপদে ফেলে গেল। মনে করাটা স্বাভাবিক। তিনি আর কোনও রকম ঝামেলার মধ্যে থাকতে চান না। এমনকি থানা পুলিশও নয়।”

সাম্যদীপ বলল, “আমরা কি পুলিশের কাছে যাব?”

নীলকণ্ঠবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন, “হ্যাঁ। বঁচে থাকতে যাকে কোনও সম্মান দিতে পারিনি, মৃত্যুর পর তার অসম্মান হোক আমি চাই না। নিজের পরিবার বলতে কিছু নেই, বিয়ে-থা করেনি, পরিচয় বলে কিছু রেখে যায়নি, মৃত্যুর পর এই সব দেহ আনক্লেমড হয়, বেওয়ারিশ। সেই ভাবে ট্রিট করা হয়। আমি চাই না, পাঞ্চালীর তাই হোক। অন্তত শেষ কাজে সে একটু মর্যাদা পাক,” থামলেন নীলকণ্ঠবাবু। দম নিয়ে ফের শুরু করলেন, “আমার নিজের সেই ক্ষমতা নেই, চেনা-জানা কাউকে যে বলব সে উপায় নেই। এটা এমন একটা বিষয়... তুমি যদি রাজি না হও, না হওয়াই উচিত... হয়তো খানিক পরেই বুঝতে পারব, আমি খুব বড় অন্যায্য করলাম, ছেলেকে এমন কাজে জড়ানোর জন্য নিজের ওপর যেনাও হবে...”

ততক্ষণে বিস্মিত হওয়াও ভুলে গিয়েছিল সাম্যদীপ। এই শাস্ত, চুপচাপ থাকা মানুষটার ভিতরে এত ভালবাসা রয়েছে! নাকি আগুন? বয়স কম তো নয়, জীবনের সময় গড়াল অনেকটাই। এই সময় যাবতীয় অস্বস্তি, ব্যর্থতা ভুলে গুটিসুটি মেরে থাকার সময়। নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে থাকার সময়। যে-ছায়া ছোট হয় আর বলে ‘বেলা ফুরলো’। এই বয়সে নিজের ইচ্ছেপূরণের আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র হয়? আদতে তো লোকটা একটা ভিত্তি মানুষই। ভুল তো বলেনি উজ্জয়িনী। তবু ভিত্তি মানুষও কখনও গর্জন করে নিজের জানান দেয়। ছায়াকে থমকে দেয়, পড়ন্ত বেলাকে দাঁড় করায়। বাবার কথায় সাম্যদীপ যেন ঘোরের মধ্যে চলে যায়। এই বাবাকে সে দেখেনি কখনও।

নিজেকে কোনও রকমে সামলে সাম্যদীপ বলে, “তুমি কি গুঁর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত?”

“মনে হচ্ছে। চিঠির ভাষাও সেকথা বলছে। এটা একটা সুইসাইড নোট।”

সাম্যদীপ বলল, “তুমি কি চাও আমি ঠুঁর সম্পর্কে খোঁজখবর করি?”
নীলকণ্ঠবাবু মাথা নামিয়ে খানিকক্ষণ বসে রইলেন। তারপর অক্ষুণ্ণে বললেন, “তাকে তো আর পাবে না, তার মৃতদেহের কোনও হদিস যদি পাই... আমি জানি না কী করে সম্ভব বা আদৌ সম্ভব কিনা।” আবার খানিক থামলেন নীলকণ্ঠবাবু, ভাবলেন কিছু। মুখ তুলে বললেন, “থাক এসব, আমি উদ্ভাদের মতো বলছি। এই বয়সে এ কী ছেলেমানুষি! শুধু ছেলেমানুষি নয়, অন্যায় আবদার। এতদিন হয়ে গিয়েছে... দূরে রয়েছে... পাঞ্চালী কে আমার? কেউ নয়, নোবডি। তুমি ভুলে যাও আমার কথা। আসলে এত বছর পর মানাদির সঙ্গে যোগাযোগ, পাঞ্চালীর এই সুইসাইড নোট কিছু সময়ের জন্য সব গোলমাল করে দিয়েছে। কিছু না ভেবে তোমাকে এসব বলে ফেললাম, বলা উচিত ছিল না। ছেলেকে এসব বলে কখনও? সম্পর্কের কথা বলে? ছি ছি! সন্ধ্যাচ বোধ করছি... কাকেই বা বলতাম? এই বয়সে স্ত্রীকেই সব বলার কথা, ছোটখাটো সুখদুঃখ ভাগ করার কথা... আমার তো ফেলে আসা কিছু অনুভূতি থাকতেই পারে, তোমার মায়েরও থাকতে পারে। হয়তো আছেও, সে বলে না। বলে না বলেই আমার ঘটনা তুলে কান্নাকাটি করে। হয়তো নিজের অতীত কোনও সম্পর্কের কথা ভাবে। তোমার মা এসব শেয়ার করার সুযোগ রাখেনি। যাক, বাদ দাও, ভুলে যাও। বন্ধ করো এ প্রসঙ্গ। রানি চলে এলে যেন বুঝতে না পারে।”

সাম্যদীপ নিচু গলায় বলল, “আমি জানি না কীভাবে খোঁজ শুরু করব, তবে চেষ্টা করব। কিন্তু উনি যদি বেঁচে থাকেন? এতটা নিশ্চিত হয়ে মৃত্যুর কথা ভাবছি কেন?”

নীলকণ্ঠবাবু চশমার কাচ মুছতে-মুছতে বললেন, “আমি নিশ্চিত, পাঞ্চালী অবশ্যই গোলমাল করেছে। না হলে, এভাবে বলে যেত না। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা কেন বলবে? এত বছর পরে? সে আড়ালে ছিল। হাওড়া স্টেশনে মানাদির সঙ্গে দেখা না হলে জানতেই পারতাম না। থাক ওসব কথা।”

সাম্যদীপ বলল, “ফোটা আছে?”

ছেলের দিকে স্থির চোখে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে উঠে পড়লেন নীলকণ্ঠ। টেবিলের নীচের ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখা একটা খাম বের করে আনলেন।

“এই ফোটা খুব পুরনো নয়।”

এই ফোটা বাবা কোথা থেকে পেল? কিশোর প্রেমিকের মতো যত্ন করে রেখেও দিয়েছে। তবে কি প্রেম নিয়ে যা বলা হয় সে কথাই সত্যি? কোনও বয়স থাকে না? সাম্যদীপ চুপ করে থাকে।

আজ আবার ফোটা হাতে স্থির হয়ে বসে রয়েছেন নীলকণ্ঠ। সেই ফোটা রয়েছে মোবাইলের স্ক্রিনে।

সাম্যদীপ বলল, “চিনতে পারছ?”

নীলকণ্ঠবাবু বিড়বিড় করে বললেন, “খানিকটা পারছি, খানিকটা পারছি না।”

সাম্যদীপ বিরক্ত হলেও, তা গোপন রেখে বলল, “খানিকটা পারলে তো হবে না, পুরোটা পারতে হবে। আইডেনটিফিকেশন পুরো না হলে কিছু করা যাবে না।”

কথাটা বলেও মনে-মনে থমকাল সাম্যদীপ। চিনতে পারলেও মৃতদেহের দাবিদার হওয়ার অনেক সমস্যা। বিতান তাকে বলেছে। যদি কেউ থানায় গিয়ে জানায় উদ্ধার হওয়া মৃতদেহটি তার পরিচিতের, তাকে প্রমাণ দিতে হবে। পরিচিতের ঠিকানা দিতে হবে। যে-থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে, সেই থানা খোঁজ নেবে। যেখানে মানুষটির বাস ছিল, সেখানকার নির্বাচিত কোনও প্রতিনিধির সই করা সার্টিফিকেট লাগবে। স্থানীয় থানার তদন্ত রিপোর্ট এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির সার্টিফিকেট নিয়ে গেলে তবে মর্গ থেকে দেহ ছাড়া হয়।

সাম্যদীপ বিতানকে বলেছিল, “এ তো অনেক সমস্যা।”

বিতান বলল, “সমস্যা তো বটেই। মৃতের কোনও সরকারি পরিচিতিপত্র আত্মীয় বা পরিচিতজন দেখাতে পারলে সমস্যা কম হয়। নইলে ফাঁকড়া তো বটেই।”

সাম্যদীপ বলল, “পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে যদি গোলমাল কিছু বেরায় সে তো আরও বামেলা।”

বিতান বলল, “তাতে আত্মীয়-পরিজনের হাতে মৃতদেহ ছেড়ে দিতে অসুবিধে হয় না, তারপরে ইনভেস্টিগেশন চলতে থাকে। তবে সবটাই জটিল হয়ে যায়।”

সাম্যদীপ বলল, “এই মহিলাই যদি পাঞ্চালী রায় হন, তা হলেই যে মৃতদেহ আমরা হাতে পাব তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। না পাওয়ারই কথা। কী রিলেশন দেখাব আমরা? আমরা ঠুঁর কে?”

বিতান বলল, “সে তো বটেই। তবে পরিচিত মানেই যে ব্লাড রিলেশন থাকবে এমন তো কথা নয়। এই ধর না, তোর সঙ্গে আমার রক্তের কী সম্পর্ক? আত্মীয় কেউ বডি ক্লেম করতে আসছে না, কোনও বন্ধু এসেছে, তখন কী করা হবে? বডি কি দেওয়া হবে না? সে পথও আছে। সব নিয়মের মতো এখানেও ফাঁকফোকর আছে। সেসব বলে দেওয়া যাবে। কিন্তু সবার আগে তো জানাতে হবে দহপাড়া মর্গে যে-মহিলার মৃতদেহ তুই দেখে এসেছিস, তিনিই তোর পিতৃদেবের পাঞ্চালী রায় কিনা।”

সাম্যদীপ বলল, “আজই বাবার কাছে যাচ্ছি। মোবাইলে তুলে আনা ফোটা দেখাব। পুরো মুখের ফোটা তুলতে পারিনি, বীভৎস, পাথরে খেঁতলে গিয়েছে একটা পাশ, অন্য দিকটা তুলেছি। ভুরুর কাটা দাগ, আঁচিল পেয়েছি। গায়ের রং, হাইটও মনে হচ্ছে মিলছে। মহিলা অনেকটা ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। মর্গের লোকটা বলল, ও শুনেছে, ব্রিজের বিম, স্প্যানারে ধাক্কা খেতে খেতে নদীতে পড়েছে। হাত-পায়ের হাড় ভেঙেছে, চোয়ালও ভাঙা। তারপর দেহ জোয়ারে ভেসে খালে ঢুকেছে। সেখানেও ধাক্কা খেতে খেতে গিয়েছে। মংলাহাটির কাছে খাল পারাপারের বাঁশের সাঁকোতে আটকে ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে জল থেকে বডি তোলে। পুলিশই জেনেছে, কে নাকি দেখেছে, ভোররাতে এক মহিলা নদীর ব্রিজে রেলিঙে উঠেছে। যে দেখেছে, সে লোকটা নীচে ছিল, ওপরে উঠতে উঠতে দেখে কেউ নেই। জলে ভারী কিছু পড়ার আওয়াজও পায়। পুলিশের টহলদার গাড়িকে খবর দেয়। তারা ওপর থেকেই ঝুঁকে দেখে। বিশেষ গা করেনি। কী আশ্চর্য।”

বিতান বলল, “আশ্চর্যের কী আছে? এরকম হামেশাই ঘটে। ট্রেনে কাটা, ব্রিজ থেকে ঝাঁপ তো লেগেই আছে। আমি আরও ডিটেলসে খবর নিয়ে নেব, তার আগে, তোরা শিওর হয়ে নে। যারা চেনে, ফোটাটা তাদের দেখা। তারপর আমায় খবর দে। তবে দেরি করা যাবে না।”

সাম্যদীপ বিতানের কথায় মাথা নেড়ে এসেছে বটে তবে পাঞ্চালী রায়কে চেনে কে? নীলকণ্ঠ সেন ছাড়া আর কাউকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ নেই। সেই নীলকণ্ঠ সেনও তো বিভ্রান্ত।

“তোমার ওই মানাদি না কে তার সঙ্গে একবার যোগাযোগ করা যায় না?”

নীলকণ্ঠবাবু বললেন, “আমাকে যে মোবাইল থেকে উনি ফোন করেছিলেন, সেটাও তো বন্ধ করে দিয়েছেন। শুনলাম, বাড়িও তালাবন্ধ। বামেলায় যেতে চায় না। যাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সে তো মরে সমস্যা করে দিল।”

সাম্যদীপ বলল, “কিন্তু এবার কী হবে? কে চিনতে পারবে?”

নীলকণ্ঠবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন, “আরও কিছু চিহ্ন রয়েছে... ডান দিকের...”

সাম্যদীপ বলল, “ডান দিকে? কিসের ডান দিকে? পায়ের?”

নীলকণ্ঠ সেন নিজেই থামিয়ে দিলেন। বললেন, “না, কিছু না। আমি ভুল করছিলাম।”

সাম্যদীপ এবার অর্ধৈর্ষ হয়ে বলল, “যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। বেওয়ারিশ মৃতদেহ ধরে রাখার একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। তারপর সরকার থেকে সংকার করে দেওয়া হয়। তোমার হাতে চিঠি আসবার পর আমি খোঁজ শুরু করেছি, সেই হিসেব ধরলে দশদিন হয়ে গেল। ঘটনা যদি সত্যি ঘটে থাকে, মানে উনি যদি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে থাকেন, সেটা অন্তত দুদিন আগে হয়েছে। সাধারণত পনেরো দিন পর্যন্ত

একটুও মাথাগরম করেননি নীলকণ্ঠ। তিনি মাথাগরম করার মতো মানুষও নন, শান্ত প্রকৃতির। সেদিন স্ত্রীর প্রেমপত্র ব্যাগে নিয়ে অফিস ছুটির পর পার্কের খোলা বাতাসে গিয়ে বসেন। ফ্লাস্কে বিক্রি করা লিকার চা খান লেবু দিয়ে। কাপের ওপর একটু বিট নুন ছড়িয়ে দিতে বলেন। একটা সিগারেট খান আয়েস করে। তারপর ব্যাগ থেকে বের করে চিঠিগুলো যত্ন করে ছিঁড়ে ফেলেন। চলে যাওয়ার সময় চায়ের ভাঁড়ের সঙ্গে পার্কের ডাস্টবিনে ফেলে দেন কাগজের টুকরো। গোটা অধ্যায়টিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে নিশ্চিত মনে বাড়ি ফেরেন। সেদিন রাতে স্ত্রীর খোলা বুক মুখে রেখে জোরে ঘ্রাণ নেন। চিনতেও পারেন, তাঁর নিজের শরীরেরই ঘ্রাণ। তিনি জানতেন, এমনটা হবে। মনে মনে ভাবেন, রানির মনে তিনি প্রবেশ করেছেন, যদি আগে আর কেউ এসেও থাকে, সে মুছে গিয়েছে। আর মনে প্রবেশ করছেন বলেই, রানি শরীরে তাঁর ঘ্রাণ রাখতে পেরেছে। সেই শরীরে আদ্যোপান্ত চুমু খেতে খেতে নীলকণ্ঠ সেদিন প্রতিজ্ঞা করেন, রানিকে কোনও দিনই তার পুরনো প্রেমের কথা বলে আঘাত দেবেন না। যতই প্ররোচনা আসুক।

সেই আঘাত কখনও দেননি। পরে পাঞ্চালীকে নিয়ে অনেক অশান্তি, অনেক আক্রমণ করলেও স্ত্রীকে কখনও অতীতের কথা তুলে সেসব কু-কথার জবাব দেননি নীলকণ্ঠ। উচ্চারণও করেননি। না ঘরের ভিতরে, না বাইরে। ছেলেকে সেদিন প্রথম ইঙ্গিত দিলেন।

রানির প্রেম গড়িয়েছিল অনেক দূর পর্যন্ত। কিশোরীবেলা ছাপিয়ে যায়। কলেজ থেকে নিয়মিত তথাগতের কাছে চলে যেতেন। চুটিয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন। এলোমেলো চুল, জিনস, কাঁধে ঝোলা তথাগত একই সঙ্গে আর্টিস্ট এবং রাগী যুবক। রানি প্রেমে ঝাঁঝ পেয়েছিলেন। ওই বয়সে যে ঝাঁঝ এড়ানো ছিল তাঁর পক্ষে অসম্ভব। মনের সঙ্গে শরীর দিয়ে এই ঝাঁঝ উপভোগ করতেন তথাগতের উদ্দাম শরীর, রাগী শরীর, আনমনা শরীর পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে থাকতেন। মধ্যবিত্ত বাড়ির অনুশাসনের ঘেরাটোপে থেকেও কী করে যে তিনি এমন সাহসী হলেন, ভেবে নিজেই অবাক হতেন। বুঝতেন উচিত নয়, ভুল হচ্ছে, তার পরেও বেহিসেবি হয়ে ছুটে যেতেন। অবশ্য উচিত-অনুচিত নিয়ে তথাগতের মাথাব্যথা ছিল না। তার মাথাব্যথা ছিল চিত্রকলার নানাবিধ দুর্যোধ প্রকার-প্রকরণ নিয়ে। যত না আঁকতে পারত, তার থেকেও অনেক বেশি ‘সমঝদার’ সাজার ভাবভঙ্গি ছিল। কথায় কথায় ‘সুরিয়ালিজম’, ‘কিউবিজম’-এর কথা আওড়াত সে। কিছু না বুঝেই মুগ্ধ হত রানি। কতবার যে ‘নুড’ আঁকার জন্য পোশাক খুলে বসেছে তথাগতের ক্যানভাসের সামনে! প্রথমদিন এই প্রস্তাবে লজ্জা পেলে তথাগত হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

“কেন এমন করছ রানি? কী দাম আছে তোমার ওই শরীরের? কিছু সেক্স আর কিছু সন্তান জন্মেই ফিনিশ? আমার ক্যানভাসে তোমার শরীর দাম পাবে। মরে গেলে কিছু থাকবে না, ওই সুন্দর চোখ, ঠোঁট, স্তন ছাই হয়ে যাবে। ওরা বেঁচে থাকবে আমার পেনসিল, তুলির আঁচড়ে। যেদিন দুনিয়া আমার প্রতিভার মর্ম বুঝবে, তোমার শরীরের দাম কোটি টাকা ছাড়াবে জেনে রাখো।”

রানি অবাক হয়ে বলেছিলেন, “এ কেমন কথা! শরীরের দাম কি দুনিয়ার কাছে আমি চেয়েছি?”

তথাগত ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বলেছিল, “এটাই তোমাদের সমস্যা। শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে। তোমার শরীর কি তোমার কাছে মূল্য পেতে চায়? সে শিল্পের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চায়। বেচারি, নিজের কথা বলবার ক্ষমতা নেই, থাকলে দেখতে এই কথাই বলছে। তবে তোমার আপত্তি থাকলে দরকার নেই। মডেল পেতে অসুবিধে হবে না।”

এরপর আর কোন মুখে আপত্তি করেন রানি? তথাগত মুখে যতই ‘বড় কথা’ বলুক, সে অন্য কোনও নারীকে নগ্ন দেখবে, এটা রানি ভাবতেও পারতেন না তখন। প্রেমিকের ঝাঁঝ যেমন ভাল লাগত, তেমন ভয়ও পেতেন রানি। কম বয়সে রানি কি দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন? তথাগত নামের ছেলেটির কাছে যে আত্মসমর্পণ তিনি করেছিলেন, তা দুর্বলতা নয়, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়া। এ ঘটনা নতুন নয়। একটা বয়সের প্রেম কত দূর যেতে পারে তার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। ঝড়ে-পড়া

নৌকোর মতো সমুদ্রে কখনও ভেসে ওঠে, কখনও ডুবে যায়।

শুধু ক্যানভাসে পেনসিলের আঁচড় নয়, আদর করতে গিয়ে তথাগত আঁচড় দিয়েছিল রানির নরম শরীরেও। সেই আঁচড় দেখেই মা আঁতকে উঠলেন।

“ঘাড়ের নীচে এ তোর কিসের দাগ রানি?”

“দাগ!” রানি অবাক হন।

“দেখি নামা জামাটা।”

রানির অত খেয়াল ছিল না। তিনি পিঠের দিকের জামা কিছুটা নামিয়ে দাঁড়ান।

“এ তো মনে হচ্ছে কারও নখের আঁচড়।”

ছিটকে রানি সরে গিয়েছেন মায়ের কাছ থেকে। জামা ঠিক করতে করতে বলেন, “কী বাজে কথা বলছ মা? কে আঁচড়াবে? ভুতে?”

রানির মা তখনকার মতো চূপ করে যান ঠিকই, তবে রাতেই মেয়ের বাবাকে বলেন, “মেয়ের জন্য পাত্র খোঁজো।”

“এখনই! সব তো গ্র্যাজুয়েট হল, চাইলে আর একটু লেখাপড়া করতে পারে। কোনও ট্রেনিং যদি নেয় নিক না।”

“সব বিয়ের পর হবে। তুমি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো।”

“কেন? ওই ছোকরা জ্বালাতন বাড়িয়েছে?”

রানির মা দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, “ছোকরা জ্বালাতন বাড়ালে সামাল দেওয়া যেত, আমার সন্দেহ ওরা অনেক দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে।”

এরপরই ‘সুপাত্র’-র সন্ধান শুরু হয় এবং নীলকণ্ঠ সেন নামে এক যুবককে পাওয়া যায়। লেখাপড়া শেষে কেরিয়ার তৈরি করে, পিতৃহীন সংসার সামলে বিয়ে করতে দেরি করে ফেলেছে। ফলে বয়স বেড়েছে। কিন্তু তাতে ছেলের গুণ কমেনি। ভাল পদে চাকরি করে, তার ওপর ভদ্রসভ্য। রানির বাবা গোপনে খবর নিয়ে জানেন, ছেলের চরিত্রে কোনও দাগ নেই। আরও নিশ্চিত হন এই জেনে যে, হবু জামাই ছবিটবি থেকে অনেক দূরে থাকে। এসব বিষয়ে কোনও উৎসাহ নেই তার, এলোমেলো হয়ে থাকার কোনও ব্যাপারই নেই। এই ছেলে সংসার এবং বৌতে যে বিশেষ মনোযোগী হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তাই হল। রানিতে মন দিলেন নীলকণ্ঠ। তার পরেও তিনি অনুভব করতে পারলেন, রানি তথাগত নামে যুবকটির সব টান ছিঁড়ে সাজানো জীবনে চলে এলেও, ‘রা’ নামের মেয়েটি তা পারেনি। তার মন এখনও কোথাও ‘ত’ নামে এলোমেলো ছেলেটির কাছে পড়ে রয়েছে। তাই তাঁর বৌ কখনও অন্যমনস্ক, কখনও বিমর্ষ, কখনও বিরক্ত হয়ে থাকে। রেগে যায়। সেই কারণেই নীলকণ্ঠ মনোযোগ বাড়িয়ে দিলেন।

“মেয়েদের ঘরে বসে থাকার দিন অনেক আগে শেষ হয়েছে। লেখাপড়া শিখে, এবার সেটাকে কাজে লাগাও। চাকরি করো। শুধু রোজগারের জন্য নয়, যা শিখেছ সেটা কাজে লাগুক। সোসাইটিকে কিছুটা রিটার্ন দেওয়ার তো দায়িত্ব থাকে।”

কম্পিউটার ট্রেনিং নিলেন রানি। চাকরিও পেলেন। সন্তানের জন্ম হল, তাকে বড় করতে লাগলেন। এসবের মাঝেই বুঝতে পারলেন, জীবন থেকে তথাগতকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেও মন থেকে পারেননি। স্বামীকে ভালবেসেছেন কিনা জানেন না, তবে পছন্দ করেছেন। পছন্দ করেছেন তার শরীরকেও। এই পছন্দের কাছে যতটা সম্ভব আত্মসমর্পণ করলেন। এই সরল পরিস্থিতি জটিল হল, যখন খবর পেলেন পাঞ্চালী নামে এক মহিলার সঙ্গে তাঁর স্বামীর যোগাযোগ হয়েছে। স্বাভাবিক যোগাযোগ নয়, ‘অতিরিক্ত যোগাযোগ’। ছেলে তখন স্কুলে, ক্লাস ফোরে। ভিতরে কেঁপে উঠলেন রানি। যতটা না স্বামীর বাইরের সম্পর্কের কারণে বিচলিত হলেন, তার থেকে বেশি বিচলিত হলেন এই ভেবে যে, “নীলকণ্ঠ প্রেমে পড়েনি তো?” তথাগতের স্মৃতি বুকের ভিতর ফোঁস করে উঠল যেন। ‘প্রেম’ বিষয়টার ওপরই যেনা এসে গিয়েছে। যে ‘প্রেম’ তিনি ওই অল্প বয়সে ধরে রাখতে পারেননি, সংসারী নীলকণ্ঠ এতটা বয়সে এসে, পরিণত হয়ে, পেয়ে গেল? স্বামীর অধিকার ভাগ হওয়ার থেকেও হিংসে, হীনম্মন্যতা রানির গলা চেপে ধরল। তীব্র দ্বিধা। নীলকণ্ঠ সেনের অফিসের যে লোক তাঁকে গোপনে ‘খবর’ দিয়েছিল, তার কাছ



থেকে আরও ‘খবর’ পেলেন রানি। একদিন সরাসরি চেপেও ধরলেন স্বামীকে। একটু চুপ করে থেকে শান্ত গলায় নীলকণ্ঠবাবু সেই জবাব দিয়েছিলেন।

“হ্যাঁ, এমন একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।”

রানি বলেছিলেন, “শুধু পরিচয়?”

নীলকণ্ঠবাবু বলেন, “হয়তো খানিকটা বেশিই হয়েছে।”

“প্রেম?”

নীলকণ্ঠবাবু হেসে বললেন, “এই বুড়ো বয়সে প্রেম হলেও বোঝা যায় না।”

রানি বললেন, “তাহলে শরীর? শুনলাম মহিলা নাকি দেখতে শুনতে ভাল।”

নীলকণ্ঠবাবু একই রকম শান্ত গলায় বললেন, “তুমি অকারণ উদ্বেজিত হচ্ছে রানি। যে বা যারা তোমাকে খবর দিচ্ছে, তারা বাইরেরটুকু রিপোর্ট করছে, ভিতরটা জানে না।”

রানি বললেন, “বাইরে ভিতর জানি না, কী করছ তাও আমার জানার দরকার নেই। তার পরেও যদি কখনও মনে হয় নীলকণ্ঠ সেনের কাছে আমি অপাঙ্ক্বেয়, বলে দিয়ো, ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে যাব।”

নীলকণ্ঠবাবু নিচু গলায় বলেন, “তুমি অকারণে এতদূর ভাবছ রানি। বাইরের লোকের দেওয়া খবরে বিশ্বাস করো, কিন্তু প্রভাবিত হয়ো না। তাছাড়া তুমি বেরোবে কেন? এ বাড়ি তো তোমার নামে লিখে দিয়েছি বছরদিন।”

জীবন ও সংসার, শরীর ও মন নিয়ম মেনেই চলতে লাগল। স্বামীর বাইরের সম্পর্কের খবর তেমন আর কিছু পেতেন না রানি। যে ‘খবর’ জোগান দিচ্ছিল, তার চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ায় সে অফিস ছাড়ল, সুতোটা গেল ছিঁড়ে। রানি নিজে কিছুদিন চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন। তবে মাথায় জট তৈরি হল। সন্দেহের জট। রাগ হলে, মন খারাপ করলে প্রকাশ্যেই স্বামীর সম্পর্কের কথা তুলে চোঁচামেচি করতেন। ছেলের যখন কম বয়স কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হত, বেশি বয়সে বিরক্ত হয়ে সরে যেত। নীলকণ্ঠ চুপ করে বসে থাকতেন। যেন স্তিম বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেন। এক সময় নিজে থেকেই শান্ত হতেন রানি। স্নান, খাওয়াদাওয়া করে অফিস যেতেন, যেন এতক্ষণ কিছুই হয়নি, অথবা যদি কিছু হয়েও থাকে, সেটা নিয়ে পড়ে থাকবার কারণ নেই। সাম্যদীপ চেয়েছিল, মাকে ডাক্তার দেখানো হোক। নীলকণ্ঠ দেখাতে দেননি।

“একটু পরেই শান্ত হয়ে যাবে। এতদিন দেখছিস তো।”

এখনও এমনটাই করেন রানি। ছেলের বিয়েতে সমস্যা বেড়েছে। সম্ভবত সেখানেও ‘প্রেম’ ছিল বলে, রানি এই বিয়ে মেনে নিতে পারেননি। কে জানে, ছেলেকেও হয়তো ঈর্ষা। চোটপাট শুনতে হত উজ্জয়িনীকেই। সে নিজেকেই বাড়ি থেকে সরিয়ে নিল। সাম্যদীপকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় রওনা দিল।

চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার বেশি দেরি নেই রানির। তার পরেও ছুটি-টুটি নিতে চান না। যতক্ষণ অফিসে থাকার কথা সেই পর্যন্ত তো থাকেন বটেই, কখনও একটু বেশি সময়ও কাটান। বাড়ি গিয়ে কী হবে? নীলকণ্ঠবাবু এমনিতেই কম কথার মানুষ, এখন যেন আরও চুপ করে গিয়েছেন।

আজও বেরোতে সঙ্গে গড়িয়ে গেল। অফিসের মূল ফটক থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিতেই ফোন বেজে উঠল।

“রানি, গলা চিনতে পারছ?”

“কে বলছেন?”

“গলা চিনতে পারার কথা নয়। কত বছর পর কথা বলছি? খাটি ফাইভ? নাকি আর একটু বেশি?”

রানি থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, “কে আপনি? কাকে চান?”

“গলা চিনতে আমিও পারতাম না, নেহাত তোমাকে দেখতে

পাচ্ছি তাই। রাস্তার উল্টো ফুটপাথে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে তোমার অফিসের দরজাটা, সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে, তোমাকেও। তুমি কিন্তু বেশি বদলাওনি। নাকি আমার চোখ একই আছে?”

ফোনের ওপাশের হালকা হাসি উপেক্ষা করে রানি কাঁপা গলায় অস্থিরে বললেন, “তথাগত, তুমি! তুমি কেন এসেছ? কী চাও?”

“কিসু চাই না। মুখোমুখি বসে এক কাপ চা খেয়ে কেটে পড়ব।”

রানি এক হাত মুঠো করে, ঠোঁট কামড়ে বললেন, “না।”

“আচ্ছা তাই, না, এবার সাবধানে রাস্তা পেরিয়ে এদিকে এসো দেখি।”

রানির শরীর কাঁপছে। ঠিক এইভাবে ‘না’ বলার পরও তথাগত তাকে কাছে আসতে বলত। কাছে গেলে, আবার ‘না’ শুনে আরও কাছে টানত সে। “না, না” বলতে বলতেই নিজেকে সঁপে দিয়েছেন কতবার!

আজ কী করবেন রানি? মাঝখানে তো অনেক বছর পেরিয়ে গিয়েছে। তার পরেও কেন শরীর কাঁপবে?

ছয়

রেস্তোরার এই কোণটায় লোকজন কম। পূর্বা আগে এসে বসেছিল। উজ্জয়িনী পৌঁছতে হাত দেখিয়ে ডেকে নেয়। ‘বার কাম রেস্তোরা’ শুনে উজ্জয়িনী আপত্তি করেছিল।

“দিনেদুপুরে মদের জায়গায় বসব?”

পূর্বা বলল, “মদের জায়গা মানে! খাওয়ার জায়গাও তো বটে।”

উজ্জয়িনী বলল, “কেউ যদি দেখে ফেলে।”

পূর্বা ধমক দিয়ে বলল, “তুই স্টুডেন্ট নাকি? তা ছাড়া দেখলে দেখবে। তুই তো মদ খাচ্ছিস না। আর খেলেই বা কী?”

“তুই তো খাবি।”

পূর্বা বলল, “অবশ্যই খাব। খাব বলেই ওখানে যাচ্ছি। ধূস, দুটো বিয়ার খাব তাই নিয়ে আবার এত আলোচনা। তোদের মতো ভুলভাল নীতিবাগীশদের জন্যই বাঙালি মেয়েদের আজ এই হাল।”

উজ্জয়িনী হেসে বলল, “বারে বসে বিয়ার খেলেই বৃষ্টি মেয়েদের ফটাফট উন্নতি হত? এবার থেকে তাহলে বারগুলোর সামনে সাইনবোর্ড লাগানো উচিত, হে বঙ্গললনা, আপনি কি জীবনে কিছু করতে চান? তাহলে টুক করে এসে দুটো বিয়ার খেয়ে যান।”

পূর্বা বলল, “এটা ঠাট্টার বিষয় নয়, জড়তার বিষয়, গুটিয়ে থাকার বিষয়। লোকে কী বলবে, সমাজ কী বলবে, ফ্যামিলি কী বলবে, ভাবতে ভাবতে নিজের ইচ্ছেকে লুকিয়ে হেদিয়ে মরার বিষয়।”

উজ্জয়িনী বলেছিল, “থাক আর লেকচার দিতে হবে না। কখন যাব বল।”

উজ্জয়িনী স্কুল থেকে হাফ ছুটি নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। পূর্বা অফিস থেকে বেরিয়েছে লাঞ্চার সময়। খাবার অর্ডার দিয়ে বিয়ারের ক্যান নিয়ে বসল পূর্বা। উজ্জয়িনীকে জোর করে একটা ককটেল দিল।

“কেউ বুঝতে পারবে না। লেবুর সরবত ভাববো।”

উজ্জয়িনী বলল, “শরীর খারাপ করবে না তো?”

পূর্বা বলল, “পাগল হয়েছিস? এমন করছিস যেন আগে কখনও খাসনি। চিন্তা করিস না, আমার তো গাড়ি রয়েছে। ছাড় ওসব, এবার বল দেখি।”

যতটা পারে বলল, উজ্জয়িনী। খুব যে গোছাতে পারল, এমন নয়।

“এমন একটা সাবজেক্ট নিয়ে ভাবতে হবে চিন্তা করতে পারিনি। শরীর নিয়ে যে এমন সমস্যা হবে, কল্পনার মধ্যে ছিল না কখনও... জানতাম, একে গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই... নিজের মতো চলে, মানিয়ে নেয়। তুই তো বলেছিলি, আমার দিক থেকে কোনও খামতি হচ্ছে কিনা দেখতে... দেখছি, চেষ্টা করেছি মেটাতে। বারবার ডক্টরের কাছেও তো গিয়েছি, সবই জানিস। ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশনে লিখে দিয়েছেন, এভরিথিং নর্মা। সাম্যর বেলাতেও তাই। তাও আমার শরীরকে যেন শেষ মুহূর্তে এসে মেনে নিতে পারছে না। এই চাপ আর নিতে পারছি না।

শরীরের যে-ডিমান্ডকে এতদিন নর্মা ভাবতাম, ভাবতাম সহজে মিটে যায়, সেটা যে এমন চেহারা নেবে ভাবতে পারিনি।”

খাবার চলে এল। খানিকক্ষণ মাথা নামিয়ে চূপ করে খাওয়ার পর পূর্বা মুখ তুলে বলল, “উল্টোডাক্তার বাড়ি থেকে চলে এসে ঠিক করেছিস, নাউ গো ফর ডিভোর্স।”

উজ্জয়িনী বলল, “এরকম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কি ঠিক হবে? শরীরই কি সব? সেই পরামর্শ করতেই তোর কাছে আজ আসা।”

পূর্বা বলল, “ঠিক-ভুল পরের কথা, তোকে ডিভোর্স নিতেই হবে। শরীর সব নয়, কিন্তু খুব ইম্পোর্ট্যান্ট যে, সেটা বোঝার মতো বয়স তোর হয়েছে আশা করি। শুধু বয়স নয়, আনফরচুনটেলি অভিজ্ঞতাও হচ্ছে। শরীরের শুধু সেক্স প্রয়োজন এমন নয়, তার সম্মানও প্রয়োজন। সামাদীপ নিজে যতই চেষ্টা করুক, তার শরীর তোর শরীরকে রিফিউজ করছে, এটাই অসম্মানের। চাহিদাকে চেপে রাখতে পারিস, কেউ কেউ রাখে বা রাখতে বাধ্য হয়, কিন্তু তার অসম্মান ইগনোর করতে পারিস না। চেষ্টা করলে বাকি জীবন যন্ত্রণার মধ্যে থাকতে হবে। শরীরের যন্ত্রণার সঙ্গে মনের যন্ত্রণাও।”

উজ্জয়িনী বলল, “সামাদীপের কোনও গোলমাল তো ধরা পড়ছে না।”

পূর্বা খাবার জন্য ফের খানিকটা সময় নিল, “সেটাই তো গোলমাল। কিছু অসুখ থাকলে তুই চিকিৎসা করতে পারতিস, হয়তো বা মেনেও নিতে পারতিস। আমার মতো তো নয়, ভালবেসে বিয়ে করেছিস, সে অল্প সময়ের হোক, আর বেশি সময়ের হোক। প্রেমের জন্য স্যাক্রিফাইস তো হুদো হুদো হয়। কিন্তু সাম্য তো অসুস্থ নয়, মেডিক্যাল সায়েন্স সেরকমটাই বলছে। বলছে তো?”

উজ্জয়িনী বলল, “তা বলছো।”

পূর্বা বলল, “সেখানেই তো আমার সন্দেহ। সন্দেহ নয়, মোটামুটি আমি শিওর বলতে পারিস। সাম্যর শরীর আদরের শেষ মুহূর্তে তার মস্তিষ্কে বার্তা পাঠাচ্ছে, আর নয়, ফিরে এসো।”

উজ্জয়িনী বলল, “এটা কি ওভারথিংকিং হয়ে যাচ্ছে না পূর্বা? ডাক্তাররা তো এমন কিছু বলেননি।”

পূর্বা মুচকি হেসে বলল, “তোরা যেসব চিকিৎসায় গিয়েছিস, সেগুলো সব শরীরের। স্পার্ম কাউন্ট, হরমোনাল মেজারমেন্ট, ইরেকশনাল ডেফিশিয়েন্সি। এমনকী, আমি তোকে অ্যাগ্রেসিভ হতেও বলেছিলাম। তাও হয়েছিল। সবই তো নর্মা। তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা মাথায়।”

উজ্জয়িনী উৎসাহ নিয়ে বলল, “সে চিকিৎসাও তো হয়েছে। স্ট্রেস কমানোর মেডিসিন প্রেসক্রাইব করেছিলেন ডক্টর।”

পূর্বা বলল, “থাক ওসব কথা, অনেকে চেষ্টা করেছিস। নাউ ইউ কুইট। বেরিয়ে আয়।”

উজ্জয়িনী দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, “আর একটু দেখব না?”

পূর্বা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “এক বছর তিন-চার মাসেও যা হয়নি, সেটা আর ঘটবে বলে তুই মনে করছিস? আমার এটাও সন্দেহ হচ্ছে, সাম্য তার ডেফিশিয়েন্সির কথা জানত। জানত, তার শরীর তারই কথা শোনে না। একথা গোপন করে সে বিয়ে করেছে। যদি তাই হয়, সেটা অফেন্স, ঠকানো।”

উজ্জয়িনী বলল, “এতটা কি হবে? ও তো এরকম ছেলে বলে মনে হয়নি। ওর মা গোলমালে, বাবাও শুনছি তাই।”

পূর্বা বলল, “সেসব তো তোর কাছে থেকে শুনলাম। ফ্যামিলিতে বা ছেলেবেলায় ঝামেলা থাকলে নানা ধরনের জটিলতা হতে পারে। সেটা তো সাম্য নিশ্চয়ই জানত। এটা অপরাধ। বিয়ের কারণ তো শুধু মনের সাপোর্ট নয়, শরীরেরও সাপোর্ট। তুই বেরিয়ে আয়। আবার বলছি, সমস্যায় পড়বি। বংশ রক্ষাটম্কার কথা বলছি না, ওসব প্রাচীন ধ্যানধারণা। তোমার শরীর পুরুষ না নারী কার কাছে নিশ্চিন্ত, সেটা তার চয়সে। তবে তাকে পেতে তো হবে।”

অভ্যেস নেই বলে অল্প পানেই উজ্জয়িনীর মাথা হালকা লাগছে।

আগে কখনও মদ মুখে ছোঁয়ায়নি এমন নয়। কলেজে পড়ার সময় সরস্বতীপুজোর আগে হস্টেলে রাত জেগেছিল। বন্ধুরা চেপে ধরে মুখে ঢেলে দেয়। তেতো স্বাদে ‘ওয়াক থুং’ করে ফেলে দিয়ে বঁচেছিল। আজ কিন্তু অন্য রকম লাগছে, মিষ্টি আর ঝাল একসঙ্গে। পূর্বা যেন বাইরে থেকে বান্ধবীর ভাললাগা বুঝতে পারল।

“আর একটা বলব?”

উজ্জয়িনী না ভেবেই ঘাড় নাড়ে। পূর্বা ইশারায় ওয়েটারকে ডাকে। নিচু গলায় অর্ডার দেয়। নিজের জন্যও বিয়ার বলে।

“ডিভোর্স নিলে মনখারাপ হবে।”

পূর্বা মুচকি হেসে বলল, “না নিলে যে শরীর খারাপ করবে।”

উজ্জয়িনী চোখ সরু করে বলল, “তুই কি ভাবছিস, আমার আর্জ বেশি? আমি সেক্সের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকি? আমাকে তুই আজ দেখছিস?”

পূর্বা নতুন করে দিয়ে যাওয়া সাজানো গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল, “আগে একটা লম্বা চুমুক দে। খাবারও পড়ে আছে। আমিও ক্যানটা খুলি, খেতে খেতে বাকিটা আলোচনা করা যাবে।”

এরপর দুই তরুণী আধো আলো, আধো অন্ধকারে বসে খাবার ও পানীয়ে মন দেয়, তার মাঝেই অক্ষুটে মন ও শরীর নিয়ে কথা বলে, তর্ক করে, সমাধান খোঁজে। পানীয়ে অনভ্যস্ত উজ্জয়িনীর মাথার হালকা ভাব বাড়ে, পূর্বাও নেশাতুর। একসময় উজ্জয়িনী বলে, “ইউ আর কারেক্ট, আমি ওই পুরুষের কাছে ফিরব না।”

পূর্বার গলা জড়ায়নি, একটু চড়েছে। বাঁ হাতের তর্জনী তুলে বলল, “নো, নেভার। ওই পুরুষের কাছে ফিরব না নয়, বল, ফিরব না ওই ড্যাম শরীরের কাছে।”

উজ্জয়িনী ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, “আন্তে বল পূর্বা, তোর নেশা হয়ে গিয়েছে।”

আওয়াজ করে হেসে পূর্বা বলল, “কী যে বলিস! দুটো বিয়ারে নেশা হবে? একটু টিপসি হয়েছি বলতে পারিস। সে তোরও হয়েছে। কথা জড়িয়েছে।”

উজ্জয়িনী এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, “ডোন্ট শাউট।”

পূর্বা গলা তুলে বলে, “হোয়াই? কেন চাঁচাব না। যার ইচ্ছে শুনুক, দু’জন মেয়েরও শরীর নিয়ে কথা বলার অধিকার রয়েছে, তাদের শরীর কীভাবে সুখী হয়, সেটা দেখার অধিকার আছে। আমাদের শরীর কি শালা কারও বাপের? লেখাপড়া শিখে, সংভাবে রোজগার করে নিজেই শালা নিজের শরীরকে বাঁচিয়ে রেখেছি। তাকে নিয়ে কথা বললে কার কী? আমরা তো কোনও ভালগার আলোচনা করছি না। করছি কি?”

উজ্জয়িনী পূর্বার হাত চেপে ধরে নিচু গলায় বলল, “তোর নেশা হয়ে গিয়েছে পূর্বা। চল এবার, অনেক খেয়েছিস। গাড়িতে তোর ড্রাইভার রয়েছে তো? আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিবি।”

গাড়িতে উঠে পূর্বা নিজেকে খুব বেশি সামলে নিল এমন নয়। ড্রাইভার অভ্যস্ত। ‘ম্যাডাম’-কে টলমল পায়ে গাড়িতে উঠতে সে আগেও বেশ কয়েকবার দেখেছে। গাড়ির স্টার্ট নিলে পূর্বা বলল, “আমার হাতে ভাল লইয়ার রয়েছে। সে আমার কেস হ্যান্ডল করছে। তোকে নিয়ে যাব।”

উজ্জয়িনী বলল, “সে হবে, এখন বাড়ি গিয়ে রেস্ট নে।”

পূর্বা বান্ধবীর হাতের ওপর হাত রেখে হেসে বলল, “আই অ্যাম ফাইন, চিন্তা করিস না। কীভাবে ফাইন থাকতে হয় আমি জানি ডার্লিং। ভাবিস না তোকেই শুধু জ্ঞান দিলাম, আমিও নিজের ব্যবস্থা করে নিয়েছি। আমাকে বিয়ে করে যে স্কাউন্ডেল পালিয়ে গিয়েছে, আমি তার জন্য হাতজোড় করে বসে আছি ভাবিস না। বলব সব, মনে জোর পাবি।”

উজ্জয়িনী তাড়াতাড়ি বলল, “শুনব পরে, এখন চুপ করা।”

বাড়ি ফিরে হালকা ঝিম ভাব নিয়ে অনেকটা সময় খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল উজ্জয়িনী। বাইরে সন্ধ্যা নামতে তার মনখারাপ হল। এই ‘মনখারাপ’ কি তার মনের? নাকি তার শরীরের?

সাম্যদীপ বসে রয়েছে মংলাহাটি ফাঁড়ির বড়বাবুর সামনে। বড়বাবুর নাম প্রভাকর পাল। আড়ালে লোকে ডাকে ‘পিপি’। আসামি পালানোর কারণে গত কয়েকদিন ধরে তিনি এতটাই অস্থির রয়েছেন যে অন্য কাজে মন দিতে পারছেন না। যে কোনও কথায় সেই পালানোর প্রসঙ্গটি ফিরিয়ে আনছেন। ঘন ঘন ফোন আসছে। ওপরতলার ফোন। একবার ‘হ্যাঁ’, একবার ‘না’ বলে উত্তর দিচ্ছেন।

“না স্যার, এখনও ট্রেস করা যায়নি... হ্যাঁ স্যার বাড়িতে লোক পাঠিয়েছি... না স্যার, সেখানে যায়নি...হ্যাঁ স্যার, টুয়েন্টি ফোর আওয়ার পোস্টিং... না স্যার, কোর্ট প্রোডাকশন হয়নি... হ্যাঁ স্যার, সেদিনই হওয়ার কথা ছিল... না স্যার...হ্যাঁ স্যার...”

ফোন নামিয়ে সাম্যদীপের দিতে তাকিয়ে বললেন, “খুব ঝামেলায় পড়েছি মশাই। চোরের পলিটিক্যাল কানেকশন রয়েছে। কোর্টে তুললে জামিন করানোর ব্যবস্থা ছিল। হারামজাদা তার আগেই পালাল। এবার পার্টির লোকেরা ওপরতলায় নালিশ করেছে, আমরা নাকি পিটিয়ে মেরে বডি পাচার করে দিয়েছি। বুঝুন কাণ্ড। চক্ৰিশ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে। আসামি ধরা না পড়লে ফাঁড়িতে এসে গোলমাল করবে বলছে। একটা চোর কেমন বিপদে ফেলল দেখুন দেখি।”

সাম্যদীপ বড়বাবুর ঝামেলা বুঝতে পারছে, কিন্তু সেও তো ঝামেলায় পড়েছে। আজ সকালে আবার মংলাহাটি এসেছে। আগেরবারের মতো টানা বাসে আসতে পারেনি, বাস মিস করেছে, আসতে হয়েছে ঘুরপথে। ট্রেনে খানিকটা এসে ফেরিতে নদী পেরিয়েছে, সেখান থেকে ট্রেকারে। এই পথে বাসও রয়েছে। তবে দিনে দুটো। লোকে ট্রেকারেই যাতায়াত করে। একটাই ভাল, ফাঁড়িতে এসে বড়বাবুকে পেয়েছে। নইলে পরিশ্রমটা জলে যেত। সাম্যদীপের আজ আবার আসার কারণ, মহিলার ডেড বডি যদি বাড়তি ক’টা দিন মর্গে রাখা সম্ভব হয়। বাবার কাছ থেকে বেরিয়ে বিতানের সঙ্গে কালই কথা বলেছে সাম্যদীপ।

“শিওর না হলে কী করে হবে? আগে তো নিশ্চিত হতে হবে এই মহিলা তোর বাবার পরিচিত।”

সাম্যদীপ বলল, “ফোটা দেখে বাবা কনফিউজড।”

বিতান বলল, “তাহলে নিজে চলে যান।”

সাম্যদীপ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, “বাবা রাজি হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, মহিলার শরীরের ডান না বাঁ দিকে আরও কোনও আইডেন্টিফিকেশন মার্ক রয়েছে, সেটাও বিশদে বলছে না।”

বিতান অবাক গলায় বলল, “মানে কী! কিছু করবে না তো বডি আইডেন্টিফিকেশন হবে কী করে? বেওয়ারিশ মৃতদেহের বেলায় এটা তো সবথেকে প্রয়োজনীয়। তোকে যে এত বুঝিয়ে বললাম। তুই তোর বাবাকে বোঝাসনি?”

সাম্যদীপ আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, “বাবা আসলে এই ফাইলটা বন্ধ করে দিতে চাইছে। বলছে, এখানেই স্টপ আর খোঁজখবরের দরকার নেই।”

বিতান বলল, “ফাইন। স্টপ করে দে। ক’দিন আগে বললে আমাদের এতটা টাইম ওয়েস্ট হত না। আমি না হয় ঘরে বসে খোঁজ রেখেছি, তোর তো রাশ্তা বেরিয়ে হয়রানি হল।”

বিতানের গলায় বিরক্তি তো বটেই, রাগও। রাগ হওয়া স্বাভাবিক। ছেলোটা কম পরিশ্রম করেনি। কোনও মহিলার বেওয়ারিশ লাশের খবর এলেই চিহ্ন মিলিয়ে দেখাটা কম কঠিন নয়। এই কাজ বাড়িতে বসে করা যায় না, অফিসের ডিউটি আওয়ারেই করতে হয়েছে। ‘পুরনো বন্ধু’র অনুরোধ সব সময়েই বেশি ‘খাতির’ পায়। ‘পুরনো বন্ধু’টি আবার যে সে নয়, একেবারে স্কুলজীবনের পাশে-বসা বন্ধু। সেই সঙ্গে ব্যাপারটাও ইন্টারেস্টিং। একজন বয়স্ক মানুষ তাঁর মৃত প্রেমিকার সন্ধান করছেন। যে-প্রেমিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বহুদিন আগেই ছিড়ে গিয়েছে। বিতান এমনটা কখনও শোনেনি। গল্প, উপন্যাসেও পড়েনি। পুলিশে কাজ করলে নানা ধরনের অদ্ভুত সব ঘটনার সাক্ষী হতে হয়,

দপ্তরে শুনতেও হয়। এটা একেবারেই আলাদা ছিল। তার মাঝেমাঝে অবিশ্বাস্য লেগেছিল। মনে হয়েছিল, একজন মধ্যবিত্ত, সংসারী মানুষ এভাবে হারিয়ে যাওয়া ‘প্রেম’-কে ছুঁতে চায়! নাকি লোকে যা বলে সেটা ঠিক? প্রেমকে নতুন, পুরনো বলে আলাদা করা যায় না। নিজে কখনও প্রেম করেনি বলে, বিতান বেশি উৎসাহী হয়। এ ছাড়াও ছেলের কাছে সাহায্য চাওয়াটা তার কাছে চমকপ্রদ মনে হয়েছে। একটা বয়সের পর বাবা-ছেলে বন্ধু হয়ে যায় শুনেছে, তাই বলে এতটা! সে যদি বিয়ে করে, তার যদি ছেলেমেয়ে হয়, এমনটাই করবে সে। একটা বয়সের পর তাদের সব বলবে। বিতানের মনে হয়, নীলকণ্ঠ সেন মানুষটা আর পাঁচজনের মতো মধ্যবিত্ত, সংসারী হলেও সাধারণ নন। এসব ভেবেই সে সাম্যদীপের সঙ্গে পরিশ্রম করেছে। হয়তো অনেকটা এগিয়েওছে। সত্যি যদি পাঞ্চালী নামের মহিলা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে থাকেন, তাহলে মংলাহাটি ফাঁড়ির মর্গে থাকা মৃতদেহটি তাঁর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অনেক ‘আইডেন্টিফিকেশন মার্ক’-ই তো মিলে গিয়েছে। এই অবস্থায় নীলকণ্ঠ সেনের পিছিয়ে এলে রাগ করাই উচিত।

সাম্যদীপ বলল, “সরি, বি। আমার খুব লজ্জা করছে।”

বিতান বলল, “তুই কী করবি? যার কেস সে-ই তো কুইট করছে।”

সাম্যদীপ বলল, “আমি করব না।”

বিতান বলল, “মানে! তুই কী করবি না?”

সাম্যদীপ বলল, “আমি হাল ছাড়ব না। আমি শেষ দেখে ছাড়ব।”

বিতান আরও বিরক্ত গলায় বলল, “তুই কী শেষ দেখে ছাড়বি? বাবার প্রেমিকার মৃতদেহ খুঁজে বের করবি? উনি নিজেই তো চান না,” কথাটা বলেই বিতান বুঝতে পারল, ‘বাবার প্রেমিকা’ কথাটা একটু কড়া হয়ে গেল। সামলে নিয়ে বলল, “সরি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কথাটা তো সত্য, তোর বাবা তো ভালবাসার মানুষকেই খুঁজছিলেন।”

সাম্যদীপ একটু চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বলল, “ভালবাসার মানুষকে নয়, ভালবাসার মৃতদেহকে।”

“ভালবাসার মৃতদেহ! কবিতা বলছিস নাকি? দেখ সাম্য, পুলিশে কাজ করি, তাও লাশ নিয়ে কারবার, এর সঙ্গে কবিতা যায় না। যা বলবি, সোজাভাবে বল।”

এই অশান্তির মধ্যেও সাম্যদীপের ইচ্ছে করল, বন্ধুকে বলে, মৃতদেহে ভালবাসা থাকবে না কে বলেছে? ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতাটি কি সে পড়েনি? সেখানেও তো ‘প্রেম ছিল’। নিজেকে সামলাল সাম্যদীপ। তারও কবিতা নিয়ে বিশেষ কিছু জানা নেই। আর পাঁচজনের মতো সেও কিছু পড়েছে বা শুনেছে। এই কবিতা সে শুনেছে উজ্জয়িনীর মুখে। বিয়ের পরে, কোথায় যেন আবৃত্তি করবে। বাড়িতে বই খুলে কদিন খুব প্র্যাকটিস করত—

‘শোনা গেল লাশকাটা ঘরে/ নিয়ে গেছে তারে;/ কাল রাতে—
ফাল্গুনের রাতের আঁধারে/ যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ/ মরিবার হল
তার সাধ...’

সাম্যদীপের মনে আছে, একদিন সে বলেছিল, “ফাংশনে এসব মৃত্যুর কবিতা বলতে যাবে কেন?”

উজ্জয়িনী ভুরু কুঁচকে বলেছিল, “কে বলেছে, মৃত্যুর কবিতা? ভালবাসারও তো হতে পারে। তুমি আর কবিতা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে না তো।”

সাম্যদীপ হেসে বলেছিল, “তাই ভাল। ওসব বুঝি না বাবা।”

তারপরেও মাথার ভিতর কোথাও সেই কিছুটা কেমন করে রয়ে গিয়েছে যেন। বিতানের সঙ্গে কথা বলার সময় মনে পড়ে গেল। নিজেকে আটকাল সাম্যদীপ। এই সময় কবিতার কথা বাড়ালে বিতান আরও বিরক্ত হবে।

“আমি আর খুঁজব না, দহপাড়া, মংলাহাটির সন্ধানই আমার শেষ সন্ধান। এতদিন বাবা চেয়েছে, এখন আমার ইচ্ছে হচ্ছে।”

বিতান থমথমে গলায় বলল, “কী ইচ্ছে? দেখবার? সে তো ফোটোতেই দেখতে পেয়েছিল। আর কী?”

সাম্যদীপ বলল, “না দেখার নয়। যদি খোঁজ ঠিক হয়, তাহলে অন্তত

নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারব। জানব, আমি পেরেছি, খুব কঠিন একটা কাজ পেরেছি। তুই তো জানিস বি, শুধু শরীরের পরিশ্রম নয়, মনের দিক থেকে চাপ চলছে। মাকে একটুও অস্বীকার, অপমান না করে বাবা এই ভালবাসা বয়ে চলেছেন। এই বয়ে-চলা আনন্দ কিনা জানি না, মনে তো হয় বোঝাই। ছোটবেলা থেকে মায়ের প্রতি বাবার দায়িত্বে একটুও চিড় দেখিনি, ভালবাসাতেও নয়। সংসার মানে না বলে এই সম্পর্ক নিয়ে লোকটা কখনও বাড়াবাড়ি করেননি। উল্টে মাকেই দেখেছি, চোটপাট, অপমান করতো। আমি দায়িত্ব শেষ করতে চাই।”

বিতান বড় করে শ্বাস ফেলে বলল, “পারলে শেষ কর। জানি না কী করে করবি।”

সাম্যদীপ উৎসাহ নিয়ে বলল, “বি, আমি বাবাকে রাজি করিয়ে মর্গে নিয়ে যাব। যে করেই হোক নিয়ে যাব। এই প্রথম, এই শেষ।”

বিতান খানিকটা নিরুৎসাহ গলায় বলল, “দেখ, যদি পারিস।”

সাম্যদীপ একটু থেমে বলল, “আর একটা রিকোয়েস্ট আছে।”

বিতান বলল, “আবার কী?”

সাম্যদীপ অস্বস্তি ভরা গলায় বলল, “কোনও ভাবে কি ওই ডেড বডির ক্রিমেশনটা কিছুদিনের জন্য আটকে রাখা যায়? বাবাকে রাজি করাতে যদি একটু সময় লাগে।”

বিতান এবার আর নিজেকে সামলাতে পারে না। খানিকটা গলা তুলেই বলে, “সাম্য, তুই কি মনে করিস আমার চাকরিটা ছেলেখেলার চাকরি? একেই তো অফিসে বসে একটা মস্ত বেআইনি কাজ করেছি, আনক্লেমড ডেডবডির ডেটা বাইরে সাপ্লাই করেছি। এখন বলছিস, থানাকে ইনফ্লুয়েন্স করে সংকারণের কাজ আটকে দিতে। তুই কি সজ্ঞানে কথা বলছিস? মনে তো হচ্ছে না। এটা একটা ক্রাইম। সরকার থেকে যেমনভাবে অর্ডার হয়, ব্যবস্থা হয়, মর্গ থেকে বেওয়ারিশ মৃতদেহ সেভাবে ডিসপোজ অফ করা হয়। আমাকে তুই সেই প্রসেসটা থামাতে বলছিস? এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?”

সাম্যদীপ বলল, “সরি, এতটা আমি বুঝতে পারিনি।”

বন্ধুর ‘সরি’ শুনে বিতানের রাগ কমল না। বলল, “শুধু বুদ্ধ বাবার প্রেম বুঝব, বন্ধুর চাকরি বুঝব না, এ কেমন কথা? বলতে বাধ্য হলাম। আমি তোকে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন সাম্য, এবার সরে আয়। এই ফাইল ফ্লোজ কর। গোড়াতে রোমান্টিক ভেবেছিলাম, এখন বুঝতে পারছি এটা পাগলামি। তোর বাবার পাগলামি ছিল, এখন তোর পাগলামি। ভাল যে শেষ পর্যন্ত উনি এটা বুঝতে পেরে, সরে গিয়েছেন। তুইও এসব ছেড়ে, নিজের কাজে মন দে, নইলে উম্মাদ হয়ে যাবি। আমাকেও রেহাই দে।”

বিতানের রাগারাগি শুনলেও, ঘটনা থেকে সরে আসেনি সাম্যদীপ। সে আজ নিজেই মংলাহাটি ফাঁড়িতে চলে এসেছে। যদি পুলিশকে বুঝিয়ে ক’দিন দেহটাকে আটকে রাখা যায়। বড়বাবু প্রভাকর পালানো আসামি নিয়ে টেনশনের মধ্যেই সাম্যদীপের কথা শুনলেন। ‘বডি নম্বর সেভেন’ লেখা ফাইল এনে খুলে দেখলেন।

“নদীতে ঝাঁপ? পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে সে রকম লিখেছে। পুলিশ তদন্তে দেখছি, সাক্ষীর কথা রয়েছে, জেলে বা মাঝি হবে। মহিলাকে ব্রিজের রেলিঙে উঠতে দেখেছিল।”

সাম্যদীপ মাথা নেড়ে বলল, “আমিও তাই শুনেছি।”

প্রভাকরবাবু বললেন, “সুইসাইডের জন্য নদীতে ঝাঁপের ধরনটা পুরনো হলেও এখনও চলে। আপনি কোনও জেলা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকুন, দেখবেন, পেস্টিসাইডস খাওয়া আর ব্রিজ থেকে ঝাঁপের কেস ঘন ঘন আসছে। যাক, কী যেন নাম বললেন?”

সাম্যদীপ বলল, “পাঞ্চালী। পাঞ্চালী রায়।”

“বাড়ি কোথায়?”

সাম্যদীপ বলল, “বাড়ি তো নেই, শুনেছি নদিয়ার নাকাশিপাড়ার কাছে এক আত্মীয়র বাড়িতে থাকতেন।”

বড়বাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, “সে কী! এ তো একেবারে

উল্টো দিকে... তবে হতেই পারে। জলে ভেসে-থাকা দেহ কোথায় না চলে যায়।”

কথার মাঝখানে ফোন বেজে ওঠে। বড়বাবু ফোন কানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

“না স্যার, আমি এখন ফাঁড়ি ছাড়ছি না... হ্যাঁ স্যার, এক্সট্রা ফোর্স চেয়েছি... না স্যার, এখনও দিতে পারিনি বলেছে, মেলা ডিউটিতে ফোর্স চলে গিয়েছে... হ্যাঁ স্যার, মেলায় ভিআইপি মুভমেন্ট রয়েছে... না স্যার, আপনি না বললে ফোর্স আসবে না, কিছু একটা হয়ে গেলে, এই ক’টা লোক নিয়ে সামলানো অসম্ভব... হ্যাঁ স্যার, এখন থানা, ফাঁড়ি অ্যাটাক কোনও ব্যাপারই নয়, জ্বালিয়ে দেয়...”

ফোন ছেড়ে কপালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন প্রভাকরবাবু। সাম্যদীপের খারাপ লাগল। বেচারি গভীর ঝামেলায় পড়েছে।

“দেখছেন তো, কী অবস্থায় রয়েছে? চট করে সেরে ফেলুন। আপনারা ডেডবন্ডি আইডেন্টিফাই করেছেন তো? কে হন আপনারা?”

সাম্যদীপ গুছিয়ে এনেছিল কী বলতে হবে।

“স্যার, এখানেই একটা সমস্যা হয়েছে, সেই কারণেই আপনার কাছে ছুটে আসা। চেনার জন্য আমি একা এসেছিলাম, কিন্তু পুরোটা নিশ্চিত হতে পারিনি। উনি যে আমাদের ফ্যামিলির পরিচিত পাঞ্চালী রায় সেটা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না। উঁচু থেকে লাফ দেওয়ায় ব্রিজের লোহায়, পাথরে ধাক্কা খেয়ে শরীর বিকৃত হয়েছে। চট করে চেনা মুশকিল। যিনি হয়তো চিনতে পারবেন, আবার বাবা, তাঁকে নিয়ে আসব। স্যার, বাবা অসুস্থ, আমাদের আইডেন্টিফিকেশনের জন্য ক’টা দিন সময় দিতে হবে।”

বড়বাবু ভুরু কঁচকে বললেন, “সময় দেব মানে! আপনার বাবা কবে সুস্থ হবে, তার জন্য বডি ধরে রাখতে বলছেন?”

সাম্যদীপ আমতা আমতা করে বলল, “যদি সম্ভব হয়।”

বড়বাবু বললেন, “সম্ভব হবে না। আপনি যাকে চিনতে পারেননি, তার দেহ আটকে রাখবার কোনও আইন পুলিশের নেই। নিয়ম মতো ডিসপোজ অফ করতে হবে। সে রকম মনে করলে কোর্টের অর্ডার আনতে হবে আমাদের।”

সাম্যদীপ বলল, “সে তো অনেক ঝামেলা।”

বড়বাবু টেবিলের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে বললেন, “ঝামেলা তো বটেই। শরীর খুব অদ্ভুত জিনিস মশাই। রোগে, ভোগে, অনাহারে পথের পাশে দিনের পর দিন পড়ে থাকলেও কেউ তাকিয়ে দেখে না। অথচ একবার মরে দেখুক। মরা শরীর নিয়ে কত টানাহেঁচড়া, কত আইনকানুন। আপনি মহিলার কে হন?”

সাম্যদীপ একটু থমকে দোমাননা করে বলল, “আমার বাবার পরিচিত।”

বড়বাবু মুখ তুলে তাকালেন। ভুরু কঁচকে বললেন, “পরিচিত? রিলেটিভ?”

সাম্যদীপ ঢোক গিলে বলল, “ওই রকমই ধরতে পারেন স্যার। পাঞ্চালী রায়ের আর কেউ নেই।”

বড়বাবু পিঠি সাজা করে বললেন, “দেখুন, এমনিতেই ঝামেলার মধ্যে রয়েছে। একটা জ্যান্ত মানুষ পালিয়ে আমাকে বাঁশ দিয়ে গিয়েছে, এরপর আর মনুষ্য নিয়ে বিপদ বাড়তে চাই না। শুধু পরিচয়ে আনক্লেমড ডেডবন্ডি হ্যান্ডওভারের নিয়ম নেই। সার্টিফিকেট আনতে হবে। তারপর আপনারদের শেষকৃত্য সারতে পারবেন। অন্যভাবে কিছু করা যায় না। এবার আমি অন্য কাজ করি?”

সাম্যদীপ একটু চুপ করে থেকে বলল, “মৃতদেহ পাওয়ার কথা পরে, বাবাকে আইডেন্টিফিকেশনের জন্য তো একবার নিয়ে আসতে পারি স্যার।”

প্রভাকরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “যতক্ষণ আমাদের হেফাজতে বন্দি থাকবে, আসতে পারবেন। তবে ফাইলে যে তারিখ দেখছি এবং মর্গে যেভাবে ভিডিও আছে, তাতে মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি যারা সংকার করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, হাতে সময় নেই। আচ্ছা,

এবার তাহলে আসুন।”

বেলা বেড়েছে, রোদের তেজও বেড়েছে। ফাঁড়ি থেকে বেরিয়ে সাম্যদীপ বাস স্ট্যান্ডে এসে শুনল ফেরার বাস পেতে প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরি। বেশিও হতে পারে। আবার ট্রেকারে করে গিয়ে ফেরিতে নদী পেরনো যায়, কিন্তু ইচ্ছে করছে না সাম্যদীপের। ক্লান্ত লাগছে। সবদিক থেকে ক্লান্ত। শরীর, মন। তা ছাড়া তাড়াহুড়ো করে কী হবে? অফিস তো কামাই হয়েই গেল। বাড়িতে গিয়েও একা। কলকাতায় চলে আসার পর নতুন করে বন্ধুও কেউ হয়নি। উজ্জয়িনীর সঙ্গেই যা সময় কাটত। সেটাও তো বন্ধ হয়ে গেল। সাম্যদীপ বাস স্ট্যান্ডের বুপড়ি চায়ের দোকানে ঢুকল। একেবারেই ফাঁকা। কোণে একজন ছাড়া কেউ নেই। এত বেলায় পাড়াগাঁয়ের চায়ের দোকানে কে-ই বা থাকবে? দোকানে ঢুকে সাম্যদীপের খিদে পেয়ে গেল। খাবার পাওয়া যাবে? পাওয়া গেল। বেঞ্চে বসে পাউরুটি, ঘুগনি, আর ডিমের অমলেট নিল। একবার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে উজ্জয়িনী জোর করে খাইয়েছিল।

“ঘুগনি, অমলেট না খেলে প্রেম করার স্মৃতি মনে থাকে না।”

উজ্জয়িনী চলে গিয়ে ঠিকই করেছে। নিজের জীবন নষ্ট করার কোনও কারণ নেই। খাওয়া শেষ হলে এক কাপ চা দিতে বলে বেঞ্চে গা এলিয়ে দিল সাম্যদীপ। দরমা বেড়ার দেয়ালে পিঠি ঠেকিয়ে চোখ বুজল। একসময়ে আধো ঘুম আধো জাগরণে কে যেন ফিসফিস করে তার কানে কানে কথা বলতে থাকে।

“তুমি অপরাধী, তুমি দোষী...”

টেবিলে কাচের গেলসে রাখা চা ঠান্ডা হতে থাকে।

আট

রাত এগারোটা।

রানি রাতে খাননি। নীলকণ্ঠ সেন জিজ্ঞেস করলে জবাবও দেননি। বসে আছেন ড্রইংরুমে। সামনে টিভি চলছে। সেই টিভি তিনি দেখছেন না, তাকিয়ে আছেন মাত্র। রিমোট দিয়ে অনবরত চ্যানেল বদল হচ্ছে, আওয়াজ ‘মিউট’ করা। মুখ থমথমে। নীলকণ্ঠ সেন ঘরে এলেন। স্ত্রীর এই থম মেরে থাকা আচরণে তিনি অভ্যস্ত। আগের তুলনায় রানির চৌচামেচি কমেছে। সাম্যদীপ-উজ্জয়িনী বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় যাওয়ার পর নিজের ভিতর খানিকটা গুটিয়ে গিয়েছেন যেন। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যতই বিয়ে নিয়ে বিরোধ থাকুক, ছেলে তো। এখন আর স্বামীর অতীত সম্পর্কের প্রসঙ্গটিও বিশেষ তোলেন না। এক সময়ে মাসে, দু’মাসে একবার করে লেগেই ছিল। সেটা হঠাৎ থমকে গিয়েছে। হতে পারে বয়স বেড়েছে, মানসিক উত্তেজনা নিজেই সামলাতে শিখেছেন। অথবা বদলেছেন, বুঝেছেন, একজন পরিণত মানুষ হয়ে এই আচরণ ঠিক নয়। তবে মানুষ কি আদৌ বদলায়? নাকি বদলায় না, কেবল সময়, পরিস্থিতির সঙ্গে সমঝোতা করে। যেটাই হোক, বাড়ি খানিকটা শান্ত হয়েছে।

নীলকণ্ঠবাবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “শুতে যাবে তো?”

রানি টিভির পর্দা থেকে মুখ না সরিয়ে নিচু গলায় বললেন, “বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।”

এটা কি পূর্বাভাস? ঝড় কি ফিরে আসছে? উল্টো দিকের সোফায় বসলেন নীলকণ্ঠ।

রানি টিভি বন্ধ না করে শান্ত গলায় বললেন, “পাঞ্চালী রায়ের ডেডবন্ডি খুঁজে পাওয়া গেল?”

চমকে উঠলেন নীলকণ্ঠ। কী করে জানল? সাম্যদীপ বলেছে? হতেই পারে না। সে জানে এতে তারই বিপদ। তাহলে আর কে জানে? উজ্জয়িনী? যতই ‘কাউকে বলব না’ ভবে থাকুক, নিশ্চয়ই সাম্যদীপ তাকে জানিয়েছে। উজ্জয়িনী কিছুতেই আগবাড়িয়ে শাশুড়িকে এসব বলতে যাবে না। সে এই মহিলাকে এড়িয়ে চলে। বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মাত্র একবারই এসেছে। ফোন করে বলেও মনে হয় না। করলেও এক-দু’বার।

নীলকণ্ঠ বললেন, “এসব কে বলল তোমাকে?”

রানি বললেন, “যে কথা বলছি, তার জবাব দাও। ওই বেশ্যার শরীর খুঁজে পেয়েছ? নাকি এখনও পাওনি?”

মাথায় আঙুন জ্বলে উঠল শান্ত নীলকণ্ঠ সেনের। রাগে শরীর কেঁপে উঠল থরথর করে। কত বছর পর এমন হল? শেষ কবে রেগেছিলেন রানির ওপর? মনে পড়ছে না। আদৌ কি সেভাবে রেগেছেন কখনও? তথাগতর কথা জানানর পরও তো রাগেননি। বরং উল্টোটাই ঘটেছিল, আগ্রহ্য করেছিলেন। এক তরুণীর জীবনে ‘প্রেমিকের প্রবেশ’ অতি স্বাভাবিক বলেই মনে করেছিলেন। সেই প্রেমে যদি একটু শরীর থাকে তাতেই বা কী এসে যায়? নিজেকে মুক্তমনের মানুষ বলে মনে করে আসছেন সেই কলেজজীবন থেকে। নিজের জীবনযাপনেও তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই মুক্ত মনের কারণেই তো পাঞ্চালীর সঙ্গে দেখা, তাকে ভালবাসা। একে অপরাধ বলে মনে করেন না নীলকণ্ঠ। এই সম্পর্কের কারণে স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালনে সামান্য অবহেলা করেননি, ভালবাসাও কমেনি। নীলকণ্ঠ মনে করেন, ভালবাসা কোনও ব্যক্তির সঞ্চয় সার্টিফিকেট নয় যে, তাকে ভাঙতে হয় এবং ফুরিয়ে যায়। রানিকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করেননি এমন নয়, সে বুঝতে চায়নি। ফলে, একটা সময়ের পর হাল ছাড়তে হয়েছে। এর আগে পাঞ্চালীকে জড়িয়ে রানি খারাপ কথা যা-ই বলে থাকুন, কখনওই তা সীমা অতিক্রম করেনি।

রানি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, “কী হল? চুপ করে আছ কেন? ওই মেয়েমানুষটার জ্যান্ত শরীর নিয়ে তো অনেক ফুর্তি করেছে, এবার মরা শরীর চাই? পাঞ্চালীর শরীরে কী এমন আছে যে, বুড়ো বয়সেও ভুলতে পারছ না?”

নীলকণ্ঠ নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করে নিচু গলায় বললেন, “রানি, যে সব কথা তুমি একজন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে বলছ, তা কি তোমাকে মানায়?”

রানি ঠোঁটে বিক্রপের হাসি নিয়ে বললেন, “ভদ্রমহিলা! কাকে ভদ্রমহিলা বলছ? বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে শুয়ে বেড়ানোটা ইয়ার পেশা, তাকে ভদ্রমহিলা বলছ?”

চোখ বুজলেন নীলকণ্ঠবাবু। ছোটবেলায় মা বলত, “খুব রাগ হলে চোখ বুজে উল্টো দিক থেকে দশ পর্যন্ত গুনবি। দেখবি রাগ অনেকটা কমে গিয়েছে।”

আজও কি কমবে? নাকি চিৎকার করে বলতে হবে, “চুপ করো, চুপ করো রানি। পাঞ্চালী এমন নয়। আমাদের মধ্যে কোনও দিন শরীরের সম্পর্ক ছিল না। যদি-বা কখনও আমার শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সে আলতো আদরে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সে অন্য রকম, আলাদা।”

একথা কি বিশ্বাস করবেন রানি? করবেন না। না করলেও যা সত্যি তা জানেন শুধু নীলকণ্ঠ আর পাঞ্চালী। পাঞ্চালীর সঙ্গে পরিচয় ছত্রিশ ঝুঁই-ঝুঁই বয়সে। অফিস, সংসার পুরোদমে চলছে। ছেলে স্কুলের নিচু ক্লাসে। তার মা তাকে বড় স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছোট্ট ছোট্ট শুরু করে দিয়েছে। কখনও কোচিং, কখনও নাম-করা স্কুলে ফর্ম সংগ্রহের জন্য লাইন, কখনও ‘ধরাধরি’র জন্য ক্ষমতাশালীর বাড়িতে হাজিরা। নীলকণ্ঠও তখন প্রমোশন পেয়ে অফিসের বড় দায়িত্ব সামলাতে শুরু করেছেন। সব মিলিয়ে ঘরে-বাইরে বিরাট ব্যস্ততা। রাতে ঘুমটুকুই যা বিশ্রাম। তাও হতে সময় কম। ভাঙে উঠতে হত। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাবাসিও লাটে উঠেছিল। ছেলে ঘুমিয়ে পড়লে দু’জনে পা টিপে পাশের ঘরে যেতেন। রানি চাপা গলায় বলতেন, “তাড়াতাড়ি, সাম্য উঠে পড়বে।”

নীলকণ্ঠ বলতেন, “রাগারাগি তাড়াতাড়ি হয়, ভালবাসা তাড়াতাড়ি হয় না রানি। আয়োজন লাগে।”

আদরের আয়োজন রানির ভাল লাগত। অল্প বয়সে তথাগত অভ্যেস করিয়ে দিয়েছিল। সেই তরুণ বিশ্বাস করত, প্রেম শুধু শরীরেই হতে পারে। শরীর যদি শরীরকে মেনে নেয়, তবেই মন সেখানে প্রবেশের অধিকার পায়। তাই শরীরের ছাড়পত্রটিই আসল। মনের সঙ্গে মনের মিলন আসলে ছবি। পেনসিলের আঁচড়ে, তুলির টানে, রঙের ছটায় তাকে যত্ন করে আঁকতে হয়। ছবি মনের মতো না হলে, তাকে

নষ্ট করতে হয়। মন মনের সঙ্গে অনেক সময় বোঝাপড়ায় যায়, শরীর কোনও বোঝাপড়ায় বিশ্বাস করে না। কম বয়সের রানির আড়ষ্টতা সে ভেঙেছিল। তাকে আদর যেমন করেছে, অনাবৃত শরীরের মডেলও করেছে। সেই কারণেই বিয়ের পর রানির জড়তা ছিল না।

নীলকণ্ঠ মুখে বললেও আয়োজন যে খুব বেশি জানতেন, এমন নয়। আদরের সময়ে রানিই হতেন মুখ্য। দেহের কোন বাঁকে, কোন ভাঁজে সুখ, কোথায় শিহরন, তিনি জানতেন। তথাগতর উল্টো মানুষ নীলকণ্ঠ। শরীরের থেকে মনের দখলে তিনি উৎসাহী। যে আদর-সোহাগ স্ত্রীর শরীর উপর মন পর্যন্ত পৌঁছয়, তাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

তবে সব সময় তো সে সুযোগ হয় না। যেমন ঘুমন্ত ছেলেকে রেখে পাশের ঘরে গেলে মিলন-আয়োজনে আড়ম্বর রাখা যায় না, যেতও না।

এমন ব্যস্ততার জীবনেই পাঞ্চালীর প্রবেশ। সেই সময় অফিসের একটি ‘বেনেভোলেন্ট ফান্ড’-এর দায়িত্ব নিতে হয়েছিল নীলকণ্ঠকে। প্রকল্পের নাম ‘দুঃস্থ নারী সহায়তা’। মূল কাজের সঙ্গে এটা করতে হবে। অফিসের কর্তারা ভেবেচিন্তেই তাকে বেছেছিলেন। এই দায়িত্বে মানবিক, স্পর্শকাতর অফিসার প্রয়োজন। সপ্তাহের একটা দিন সময় দিলেন নীলকণ্ঠ। বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতেন। আবেদন দেখে, দরকার হলে সরেজমিনে ঘুরে এসে টাকা মঞ্জুর করা হত। এই সময়েই দেখা হয় পাঞ্চালী রায়ের সঙ্গে। দেখে মনে হয়েছিল, এখনও কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। রোগাপাতলা, লম্বা চেহারার মেয়েটির বিনুনি করা লম্বা চুল আর কপালে একটা ছোট টিপ ছাড়া সাজগোজ নেই। তবে চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ রয়েছে। কথা বলে সরাসরি। নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন, পাঞ্চালী নামের এই মেয়ে ইতিহাস নিয়ে লেখাপড়া শেষ করে এখন একটা চাকরি করছে বটে, তবে বেশি সময়টায় ব্যস্ত একটি নারীসমিতির কাজে। সুন্দরবনের গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে কাজ। ঝড়খালিতে নদীর কাছে একজন একটু জমি দিয়েছেন। সেখানে একটা ওয়ার্কশপ করার পরিকল্পনা। মেয়েরা হাতের কাজ শিখবে, জিনিস তৈরি করবে। বিক্রির ব্যবস্থাও হবে। কিছু টাকাপয়সা পাওয়া গেলে কাজটা শুরু করা যায়।

নীলকণ্ঠ আবেদন পড়তে পড়তেই বললেন, “আমাদের ক’টা দিন সময় লাগবে। দুঃস্থ নারীকল্যাণ প্রকল্পে আমরা টাকা দিই ঠিকই, তবে খুব বেশি তো পারি না। যদি আপনাদের প্রজেক্ট অনুমোদন হয়, যোগাযোগ করা হবে।”

তরুণী পাঞ্চালী বলছিলেন, “আপনারা কি আমাদের জায়গাটা একবার দেখবেন?”

নীলকণ্ঠ বললেন, “দরকার হলে দেখা হবে। আপনাদের জানিয়েই যাওয়া হবে। অবশ্য যদি যাই।”

পাঞ্চালী একটু ইতস্তত করে বললেন, “যদি অনুমতি দেন, একটা কথা বলতাম।”

নীলকণ্ঠ মুখ তুলে সামান্য হেসে বললেন, “বলুন। আপনি তো বলতেই এসেছেন। অবশ্য, আমি জানি কী বলবেন। বলবেন, যদি আমরা যাই, ক’দিন আগে থেকে যেন আপনাদের জানানো হয়। আপনারা রেডি থাকবেন। তাই তো?”

পাঞ্চালী স্থির চোখে তাকিয়ে একটু সময় নিয়ে বলেছিলেন, “না, তা বলব না। বলব, অনুগ্রহ করে আপনারা আমাদের কিছু না জানিয়ে যাবেন। তাতেই প্রকল্পের আসল চেহারাটা দেখতে পাবেন। যাদের সঙ্গে কথা বলবেন, তাদের শেখানো কথা শুনতে হবে না। আর দ্বিতীয়ত, আপনাদের উপযুক্ত আপ্যায়ন করার মতো ক্ষমতা কিন্তু আমাদের নেই।”

নীলকণ্ঠ ভুরু কুঁচকে থাকলেও, তরুণীর প্রতি চাপা আকর্ষণ বোধ করেন। এমন ধরনের কথা এই প্রথম তিনি শুনছেন। একজন সাধারণ চেহারার কম বয়সের মেয়ে এমন স্পষ্টবক্তা, এতটা সাহসী!

“আপনার ধারণা হল কেন, উপযুক্ত আপ্যায়নের জন্য আমরা ব্যস্ত?”

পাঞ্চালী একটুও না ভেবে উত্তর দিলেন, “অভিজ্ঞতা থেকে। এর

আগেও ফান্ডের জন্য আমরা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম। তাঁরা সকলেই আপ্যায়ন চেয়েছিলেন। এমনকি বলেছিলেন, লঞ্চার ব্যবস্থা রাখলে ভাল হয়, সুন্দরবনের বাঘ দেখতে যাবেন। বাঘ দেখিয়ে মেয়েদের হাতের কাজের পুঁজি জোগাড় করার মতো সঙ্গতি আমাদের নেই।”

নীলকণ্ঠ হেসে বললেন, “সবাই বাঘ দেখতে চায়, এমন ভাবছেন কেন? অভিজ্ঞতা বয়সের সঙ্গে বদলাতেও তো পারে।”

পাঞ্চালী বললেন, “বদলালে ভাল। না বদলালেও ক্ষতি নেই। আবার কোথাও একটা ভিক্ষার বুলি নিয়ে যাব। ভাল কাজে ভিক্ষে চাইতে লজ্জা নেই।”

নীলকণ্ঠ হাসিমুখে বললেন, “আপনি দেখছি ঝগড়ার মন নিয়ে এসেছেন। প্রথমেই অ্যাটাক।”

পাঞ্চালী হেসে বললেন, “ছি ছি, আক্রমণ বলবেন না। খাঁটি কথায় সব সময় ঝাঁঝ থাকে।”

নীলকণ্ঠের চাপা আকর্ষণ যে ভিতরে-ভিতরে তীব্র হতে থাকে, তিনি বুঝতেও পারেন না। মেয়েটির কথায় তো বটেই, হাসিতেও মুগ্ধ হলেন তিনি।

“ঠিক আছে, আমরা আপনাদের আবেদন পরীক্ষা করে দেখি। তারপর আপনাকে খবর দেব। পরের মাসেই দেব।”

পাঞ্চালী বলল, “আমি নিজেই এসে জেনে যাব। যদি অনুমতি দেন, যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই।”

নীলকণ্ঠ বললেন, “কথায় ঝাঁঝ থাকলে বলুন।”

পাঞ্চালী হেসে বললেন, “আছে। আপনাদের এই প্রকল্প থেকে ‘দুঃস্থ নারীর সহায়তা’ কথাটাই তুলে দিলে হয় না? সেলাই বোনা থেকে শুরু করে চট, বেত, শোলা, মাটি, কাপড় দিয়ে নানা ধরনের জিনিসপত্র বানানো তো গুণের কাজ। এঁরা তো গুণী মহিলা। তাঁদের পরিচয় ‘দুঃস্থ’ হতে যাবে কেন? কথাটায় অপমান মিশে রয়েছে। সহায়তাই বা কেমন কথা? এই সব মানুষের পাশে থাকা যায় মাত্র, আসল কাজ তো এঁরা নিজেরাই করেন।”

নীলকণ্ঠবাবুর ইচ্ছে করেছিল মেয়েটির হাত চেপে ধরেন। সে তো সম্ভব নয়। তবে পরদিন থেকেই উঠে পড়ে লাগেন। অফিসের কর্তাদের তো বটেই, ওপরতলাতেও চিঠিপত্র লেখেন। একুশ দিনের মাথায় প্রকল্পের নামবদল হয়। ‘দুঃস্থ নারীর সহায়তা’-র বদলে ফাইলে লেখা হল, ‘গুণী নারীদের পাশে’।

ঠিক একমাস একদিন পরে পাঞ্চালী রায় অফিসে এলে, নীলকণ্ঠ সেন তাঁকে জানিয়ে দেন, তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়নি। যোগাযোগ এখানেই থেমে যাওয়ার কথা ছিল। থামল তো না-ই, উল্টে ঘন হল।

“এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। তোমার কাজটা করতে পারলাম না, তাও আমাদের এমন সম্পর্ক তৈরি হল!”

পাঞ্চালী বলেছিলেন, “আমার তো মনে হয়, সেই জন্যই হয়েছে। সম্পর্ক ব্যাপারটাই তো আশ্চর্যের, কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।”

নীলকণ্ঠ বললেন, “আবেদন নাকচ হওয়ার কারণ তো তুমি একবারও জানতে চাইলে না।”

পাঞ্চালী বললেন, “প্রয়োজন মনে করিনি। প্রথম দিন তোমার সঙ্গে কথা বলেই বুঝেছিলাম, তুমি আমাকে পছন্দ করে ফেলেছ। তোমার চেষ্টার ভ্রুটি থাকবে না। আবার আমাকে পছন্দ করেছ বলে বাড়তি সুবিধেও দেবে না। এরকম মানুষ চট করে পাওয়া মুশকিল।”

নীলকণ্ঠ গাঢ় স্বরে বলেছিলেন, “এখন কী পেলো?”

পাঞ্চালী বললেন, “যতটা পাওয়া সম্ভব, ততটা পেয়েছি। এর বেশি আমার লাগবে না।”

সংসারী নীলকণ্ঠ উন্মাদের মতো অবিবাহিত তরুণী পাঞ্চালীর প্রেমে পড়লেন। তবে নিজেকে রাখলেন সংযত। সেটা সম্ভব হল পাঞ্চালীর জন্যই। এই প্রেমকে তিনি পরিণত মনে গ্রহণ করলেন। অসম বয়স এবং ভিন্ন সামাজিক অবস্থানের কারণে দেখা করা, গল্প করাতেও পায়ে শিকল আটকে গেল। ইচ্ছেমতো পথে ঘুরে বেড়ানো, গঙ্গার পাড়ে, পার্কে

যাওয়ার উপায় নেই। পথেও যে এলোমেলো ঘুরে বেড়াবেন, তাও হবে না। রেষ্টোরাঁ, সিনেমা হলে যাওয়াও সম্ভব নয়। তার ওপর নীলকণ্ঠ সেন অতটা বেরোয়ান না। পাঞ্চালীও এসব চাননি।

“দেখা করা, গল্প করার সঙ্গে ভালবাসার কী সম্পর্ক? প্রেমিক-প্রেমিকারা তো হাজার হাজার মাইল দূরেও থাকে।”

নীলকণ্ঠ বললেন, “হাজার মাইল দূরে থাকলে এক রকম, সে তো মেনে নিতে বাধ্য। পাশে থাকলে তো মেনে নেওয়া কঠিন।”

পাঞ্চালী বোঝান। বললেন, “তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও।”

নীলকণ্ঠ বললেন, “ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছি পাঞ্চালী।”

পাঞ্চালী মাকে নিয়ে থাকতেন দমদমের বাড়িতে। বাবা মারা যান কলেজে পড়ার বয়সে। দেড় কামরার ঘরে মা-মেয়ে দ্বিবি হাত-পা ছড়িয়ে থেকেছেন। এর থেকে বড় জায়গার সঙ্গতিও ছিল না। পাঞ্চালীর চাকরিটাই যে ছিল ছোট। বড় কাজ নিতে পারতেন, বেঙ্গালুরুতে চলে যাওয়ার প্রস্তাব পেয়েছিলেন, নেননি। দরিদ্র, অসহায় মেয়েদের জন্য কাজ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন অনেক ছোট বয়সেই। বড় চাকরি করতে গেলে সময় কোথায় পাবেন? ইউনিভার্সিটি পাশ করার পর, রাজনীতি থেকে ডাক পান। ওদের ওপর সংগঠনের নজর ছিল। পাঞ্চালী নামের একটি ঝকঝকে মেয়ে যে পরিশ্রমী এবং ভাল সংগঠক, সেকথা নেতারা জেনেছিলেন। সেই কারণেই দলে নেওয়ার চেষ্টা। পাঞ্চালী গোড়াতেই প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি রাজনীতি পছন্দ করেন না। সেখানে কারও জন্য কিছু করলে, গোপনে প্রতিদানের হিসেব থাকে। হয় ভোট, নয় আনুগত্য, নয় দুর্নীতি। কোনও দলের পতাকা না নিলে কাজ অনেক স্বচ্ছ। কেরিয়ারের সঙ্গে সমঝোতা করে পাঞ্চালী কাজ করে গিয়েছেন। যেটুকু প্রয়োজন তার বাইরে উপার্জনের জন্য হাত বাড়াননি। তাই কোন নিশ্চিত আড়ালে ‘প্রেম’ তৃপ্তি পাবে, তা নিয়ে মাথাব্যথার সময় ছিল না। বিশ্বাসও করতেন না। বরং নীলকণ্ঠই আড়াল চাইতেন। এর পিছনে শুধু ভালবাসা ছিল এমন নয়, অনেকটাই ভয় ছিল। রানি, অফিসের কোনও সহকর্মী, পাড়ার কেউ যদি দেখে ফেলে।

কিন্তু একদিন দেখে ফেলল। পাটুলির এক কাফেতে চা খেতে বসেছিলেন দু’জনে। কাফেটি ছোট এবং গলির মধ্যে। নিশ্চিন্তেই কথা বলছিলেন। হঠাৎ চমকে ওঠেন। ‘চমকে’ না বলে ‘আঁতকে’ বলাই উচিত। মাথা নিচু করে উল্টো দিকে বসা পাঞ্চালীকে বললেন, “সরে বোসো, আমাকে একটু গার্ড করো।”

পাঞ্চালী বললেন, “কেন? কী হয়েছে?”

নীলকণ্ঠর কপালে ঘাম জমতে শুরু করে। বললেন, “সাম্যর স্কুলের ক্লাসটিচার।”

“তাত্তে কী? ছেলের ক্লাসটিচারের কি কাফেতে ঢোকা নিষেধ?”

নীলকণ্ঠ নামানো মাথাতেই জবাব দেন, “তা নয়। কালই পেরেন্ট-টিচার মিটিং দেখা হয়েছে। আমি আর রানি দু’জনেই গিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই মুখ মনে রয়েছে।”

পাঞ্চালী হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, “ছেলের দুটুমির কথা বলতে গিয়ে বাবার দুটুমির ধরে ফেলল যো।”

কাফে থেকে বেরিয়ে নীলকণ্ঠ বলেছিলেন, “তুমি তখন হাসলে বটে, তবে উনি দেখে ফেললে একটা কেলেক্সারি হত।”

পাঞ্চালী ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, “কী কেলেক্সারি?”

নীলকণ্ঠ বানানো হেসে বললেন, “যাঃ, তুমি যেন জানো না। স্কুলের কোলিগদের নিশ্চয়ই গল্প করত। সাম্যর বাবাকে দেখলাম, এক সুন্দরীর সঙ্গে চা খাচ্ছে।”

পাঞ্চালী মুখ শক্ত করে বললেন, “ঠিকই বলেছ। ভাগ্যিস আমি আড়াল করে কেলেক্সারির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলাম। দিলাম কি না? আমিও বেঁচেছি। আমার পরিচিত হলেও নিশ্চয়ই বলে বেড়াতে, পাঞ্চালীকে দেখলাম এক সংসারী, ছেলের বাবা, উচপদস্থ অফিসারের সঙ্গে বসে বেহারার মতো চা খাচ্ছে। ছি ছি।”

নীলকণ্ঠ বুঝতে পারলেন, এই কথা সহজভাবে বললেও, পাঞ্চালী আহত হয়েছেন। তিনি কথা ঘোরানোর জন্য বললেন, “সাম্যর

লেখাপড়ার দিকে নজর দিতে হবে। ওর মা, আমি দু'জনেই তো বাইরে-বাইরে থাকি। একজন ভাল টিচারের দরকার। তোমার খোঁজ থাকলে জানিও তো পাঞ্চালী।”

পাঞ্চালী সেদিন ঠান্ডা গলায় বলেছিলেন, “জানাবা।”

সেদিনের এই অতি সামান্য ঘটনা ‘অতি সামান্য কাটা’র মতো সম্পর্কে বিধে যায়। কাটা ছোট হলে কী হবে, খচখচ করতে থাকে। নীলকণ্ঠের খচখচানি অপরাধবোধ থেকে। সাম্যর স্কুলশিক্ষিকাকে দেখে অমন প্রতিক্রিয়া ঠিক হয়নি। এ তো ছেলেমানুষি। উনি দেখে ফেললেই বা কী হত? পাঞ্চালীর খচখচানিটাও অপরাধবোধের। অন্য অপরাধ। তার মনে হতে থাকে, এই সম্পর্ক অনুচিত, এই সম্পর্ক ভুল, এই সম্পর্ক ভবিষ্যৎহীন। কিন্তু সমাজ, সংসারের নিষেধ করে দেওয়া সম্পর্কে যে তীব্র আকর্ষণ, গাঢ় আনন্দ, সে তো যুগ-যুগান্তরের কথা। যে একবার এতে স্বাদ পায়, তার সরে যাওয়া কঠিন। নীলকণ্ঠ-পাঞ্চালী দু'জনেই তাই সেই কাটার খচখচানির কথা গোপন রাখলেন। ভালবাসা চলল দূর থেকেই। তরুণীর বয়স বাড়ল, বয়স বাড়ল সংসারী পুরুষেরও। প্রেমের দেবতা মজার খেলাও খেললেন। যে-পাঞ্চালী একসময় এই সম্পর্ককে অনুচিত বলে অপরাধ অনুভব করেছিলেন, তাকেই গভীর প্রেমে ঠেলে দিলেন তিনি। যতই চোখের আড়ালে থাকুক, ততই যে চোখ বুজলে প্রেমিক নীলকণ্ঠকে দেখতে পেতেন। কয়েক বছর পর টাকাপয়সা কিছু জোগাড় করে সুন্দরবনের কাজ খানিকটা শুরু করে ফেলেছিলেন পাঞ্চালী। একবার সেখানে নীলকণ্ঠকে নিয়ে গেলেন। নীলকণ্ঠ অফিসে বললেন, ছেলের পরীক্ষা, বাড়িতে বললেন, অফিসের ইনস্পেকশন। খুব ভোরে গাড়ি নিয়ে রওনা হলেন।

পাঁচিলঘেরা জমির ভিতর ছোট-ছোট ছাউনি। সেগুলোই প্রশিক্ষণকেন্দ্র, স্কুলও। মেয়েরা এখানে কাজ শিখবে, লেখাপড়াও। ঘুরে ঘুরে সব দেখা হল। অতিথি থাকার গেস্ট হাউস রয়েছে একটা। এই গেস্ট হাউসের কথাই রানি পরে কোনওভাবে জানতে পেরেছিলেন। স্বামীকে গালিগালাজের সময় সে কথাই বলেন। মজার কথা হল, যে বা যারা এসব খবর দিত, সে গেস্ট হাউসে দু'জনের ঢোকাটুকুই দেখতে পেয়েছে, ভিতরের ঘটনা জানতে পারেনি। সেদিন তৃতীয় ব্যক্তিকে গেস্ট হাউসে ঢুকতে দেননি পাঞ্চালী।

“আমি কখনও তোমাকে নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াইনি। জানি না সুযোগ পাব কিনা। আজ খাওয়াব।”

খাবার বলতে ডাল, ভাত, শাকভাজা আর নদী থেকে তোলা ছোটমাছের ঝাল। গেস্ট হাউসের বেতের টেবিলে যত্ন করে বসিয়ে খাইয়েছিলেন পাঞ্চালী। খাওয়ার পর চেয়ারে বসে বিশ্রাম। রোদ পড়লে কলকাতার জন্য রওনা। পাঞ্চালীর সঙ্গে কখনই কোনও রকম শরীরের সম্পর্ক হয়নি নীলকণ্ঠের। সেদিন গেস্ট হাউসে কিছু না করলেও নীলকণ্ঠবাবু সুযোগ পেলে প্রেমিকার শরীর পেতে চেষ্টা করেছেন। হাতধরা, গালে আলগা চুমু অথবা মাথার চুলে বিলি কাটা ছাড়া কখনওই তা এগোতে দেননি পাঞ্চালী।

“তোমার কি ইচ্ছে করে না পাঞ্চালী?”

পাঞ্চালী নিচু গলায় বলেন, “করে, শরীরকে বোঝাই।”

নীলকণ্ঠ অর্ধেকভাবে বলেন, “কেন বোঝাও? একদিন কি বেপরোয়া হওয়া যায় না? ভাঙা যায় না বেড়া?”

পাঞ্চালী ঠোঁটে আবছা হেসে বলেন, “যায় বইকি, একদিন কেন? বহুদিনই যায়।”

নীলকণ্ঠ হাত ধরে বলেন, “তাহলে? কিসের বাধা? আমার দু'জনেই তো প্রাপ্তবয়স্ক। শরীর, মনে দু'ভাবেই, তুমি কি নীতি-নৈতিকতার কথা ভাবো পাঞ্চালী?”

পাঞ্চালী হাত ছাড়ান না, বরং চেপে ধরেন। বলেন, “ভয় করে।”

“ভয়! কিসের ভয়?”

পাঞ্চালী আর্দ্র চোখে তাকিয়ে বললেন, “যদি তোমার থেকে তোমার শরীরকে বেশি ভালবেসে ফেলি? সে বড় কষ্টের হবে।”

নীলকণ্ঠ থমকে যান। শরীর কি মনের থেকে আলাদা? তার কি আলাদা অস্তিত্ব থাকে? হয়তো তাই। সে-ও মনের সঙ্গে লড়াই করে, মনের কাছ থেকে প্রিয় মানুষকে ছিনিয়ে নেয়। এতদিন এভাবে ভাবেননি, প্রয়োজনও হয়নি। পাঞ্চালী শরীরের নতুন জানলা খুলে দিল যেন। অজানা জানলা।

নীলকণ্ঠ বললেন, “তা না হয় বুঝলাম, তাই বলে এভাবে স্যাক্রিফাইজ করবে? শরীরেরও তো চাহিদা থাকে।”

পাঞ্চালী হাত সরিয়ে বলেছিলেন, “আছে বইকি। তবে ভালবাসার জন্য ত্যাগ তো সহজ ঘটনা নীলকণ্ঠ। ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে। তা বড়াই করে বলার মতো যেমন নয়, আফসোস করার জন্যও নয়।”

নীলকণ্ঠ বললেন, “এ তোমার জোর করে বলা যুক্তি। তুমি বিয়ে করো পাঞ্চালী। স্বামী, সন্তান নিয়ে সংসারী হও।”

পাঞ্চালী হেসে বলেন, “এই রে, তুমি তো দিদিমা-ঠাকুরমার মতো কথা বলছ। ভাদ্যভেদে বাংলা উপন্যাসের মতো।” হাত বাড়িয়ে নীলকণ্ঠের নাকটা আলতো নাড়িয়ে বললেন, “চিন্তা কোরো না। সংসার না করলেও সংসার ভাঙবে না। রানিদি, সাম্যকে নিয়ে তুমি সুখে থাকবে।”

নীলকণ্ঠ খতমত খেয়ে বললেন, “সে কথা বলতে চাইনি... তোমার ভালই চেয়েছি...”

পাঞ্চালী এবার খানিক এগিয়ে এসে দু'হাতে নীলকণ্ঠের গলা জড়িয়ে ভুরু তুলে বলেন, “আমার ভাল? নাকি আমার শরীরের?”

নীলকণ্ঠ বললেন, “একই হল। শরীর ভাল না থাকলে কি তুমি ভাল থাকবে?”

পাঞ্চালী মিটিমিটি হেসে বললেন, “তা নয় প্রিয়তম। শরীর ভাল থাকলেও আমি ভাল না-ও থাকতে পারি। শরীর বড় হিংসুটে। নিজের তৃপ্তিটুকু নিয়ে সরে পড়ে। এবার শরীরের কথা বাদ দাও দেখি, দুটো মনের কথা বলি।” এরপর মুখ নীলকণ্ঠের কানের কাছে নিয়ে ফিসফিস করে পাঞ্চালী বলতে থাকেন, “বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে/ কোথা হতে এলে তুমি হৃদমাঝারে/ ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালবাসি,/ কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে...”

যেমন হঠাৎ এসেছিলেন, তেমন হঠাৎ পাঞ্চালী সরে গেলেন। ততদিনে বয়স অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। পাঞ্চালী ঘর-সংসার করলেন না। ফলে মা মারা যাওয়ার পর হয়ে পড়লেন একা। চাকরিটুকু রেখে, গ্রামেগঞ্জে ঘুরে নিজের সংগঠনের কাজ করতেন। কখনও মেয়েদের কাজ শেখানো, কখনও লেখাপড়া। আর শুধু কাপড়, মাটির বাসন, ফুলদানি, পুতুল নয়, তাদের কম্পিউটার কীভাবে শেখানো যায়, শহুরে রেষ্টোরাঁর রান্নার কায়দা জানানো যায়, নিজেরা যাতে ছোটখাটো খাবার হোটেল খুলতে পারে, তার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এর মাঝখানেই, রানির কাছে ‘খবর’ এল। উড়ো খবর। ঠিক যেমন বিয়ের আগে নীলকণ্ঠের কাছে ‘চিঠি’ পৌঁছেছিল। তবে এবার আর চিঠি নয়, মোবাইল। মাঝেমধ্যেই অচেনা গলার কেউ অচেনা নম্বর বদলে-বদলে ফোন করতে থাকে।

“তোমার সাধুপুরুষ স্বামীর খবর কিছু শুনেছ?”

“কে আপনি? কী বলতে চান?”

“চুপটি করে শুনে রাখুন রানি ম্যাডাম। আপনার বর তো আর একটা ঘর-সংসার ফেঁদেছে।”

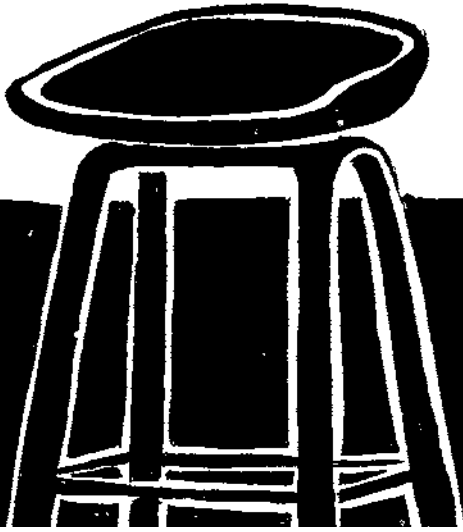
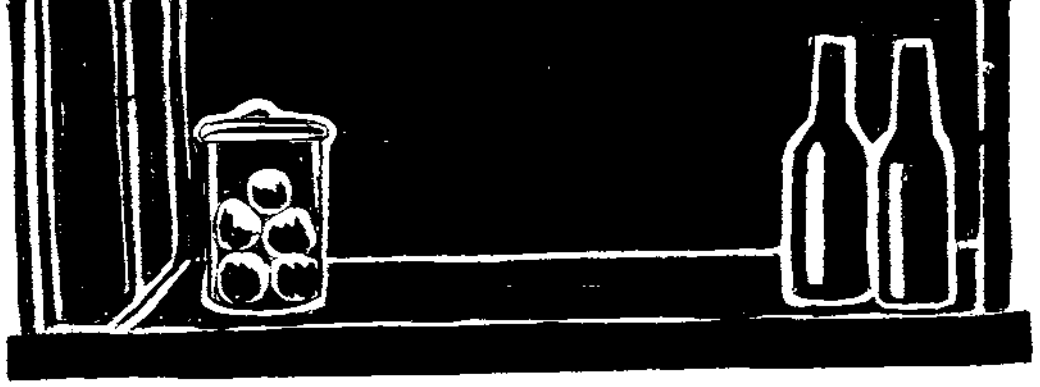
“কী বলছেন এসব!”

ফোনের ওপার থেকে ঠান্ডা গলায় বলল, “বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। এবার মনে হয় ছেলেপিলের কথাও ভাবছেন।”

রানি চিৎকার করে ওঠেন, “শাট আপ, স্কাউন্ডেল কোথাকার। নীলকণ্ঠ সেনকে আপনি চেনেন? সে একজন সৎ, দায়িত্বশীল মানুষ। কার নামে অপবাদ দিচ্ছেন আপনি!”

ফোনের ওপাশের গলা ‘খুক খুক’ করে হাসে। বলে, “নিশ্চয়ই দায়িত্বশীল। তিনি আপনার শরীরের পর, এবার পাঞ্চালী রায়ের শরীরের দায়িত্ব নিয়েছেন। আজ রাখি।”

এই ফোনের সব কথা স্বামীকে বলতে গিয়েও চুপ করে যান রানি।



শুধু জেনে নেন, এই নামের কোনও মহিলাকে নীলকণ্ঠ চেনেন কিনা। নীলকণ্ঠ প্রবল উৎসাহে পাঞ্চালীর প্রশংসাও করে ফেলেন।

“দারুণ মেয়ে। বড় চাকরির সুযোগ ছেড়ে সমাজসেবা করে বেড়ায়। আমার কাছে এসেছিল, ফান্ডের জন্য, দিতে পারিনি, কিন্তু সম্পর্ক রেখে গিয়েছে।”

ক’দিন অন্তর ‘সেই ফোন’ আসতে থাকে। রানি ভিতরে-ভিতরে ভেঙে পড়তে থাকেন। এমনকি একদিন গাড়ি ভাড়া করে স্বামীকে ফলোও করে বসেন। নীলকণ্ঠ সেদিন যোধপুরে পার্কের এক ফুলের দোকানের সামনে পাঞ্চালীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। উল্টো ফুটপাথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। যতটা না বিশ্বাসভঙ্গ, তার থেকেও নিজের অতীত ভেবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি যাকে ভালবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, সে সরিয়ে দিয়েছে। আর তার স্বামী সুখের সংসারে থেকেও নতুন ভালবাসার পিছনে ছুটছে। নাকি এটাই তার প্রথম ভালবাসা? স্ত্রীকে ভালই বাসেনি কখনও? আবার সরে যেতে হবে? নীলকণ্ঠ কি ডিভোর্স দেবে? রাতের পর রাত ঘুম হয় না রানির। এই বিপর্যস্ত অবস্থা লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেও পারেন না। রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চিৎকার করে ওঠেন। সেই শুরু। চিৎকার, গালিগালাজ বাড়তে থাকে। একদিন পাঞ্চালী রায়ের সঙ্গে দেখাও করলেন। বিশ্রী কথায় আক্রমণ করেন।

“শরীরের এত খাঁই থাকলে বিয়ে করলেই তো পারো, নয়তো নতুন-নতুন পুরুষ খুঁজে নাও। প্রেমের নাম করে আমার স্বামীর শরীর ধামসাচ্ছ কেন?”

পাঞ্চালী নিচু গলায় বলেছিলেন, “আপনি নীলকণ্ঠের স্ত্রী না হলে কষিয়ে একটা চড় মারতে আমার অসুবিধে হত না। যেখান থেকেই জেনে থাকুন, আপনি যা বলছেন, তা ঠিক নয়। নীলকণ্ঠের সঙ্গে আমার কোনও শারীরিক সম্পর্ক নেই, তবে হ্যাঁ, মনের যোগাযোগ রয়েছে।”

রানি দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছিলেন, “সেটুকুও বাদ দিলে হয় না? আমাদের একটা সংসার রয়েছে, ছেলে রয়েছে। যদিও তুমি এটা বুঝবে না, তাও বললাম।”

পাঞ্চালী বললেন, “বোঝা আমার একার দায়িত্ব নয়, তবু চেষ্টা করব। আপনি এতটা নীচে নেমে গিয়ে কথা বলতে পারেন জানতাম না। নীলকণ্ঠের স্ত্রী জানতাম শিক্ষিত, মার্জিত। যাক, আপনি এবার আসুন।”

রানি বললেন, “যাব তো বটেই। তোমার মতো মেয়েদের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে শিক্ষায় ধাক্কা লাগে। যাই হোক, তুমি আবার নীলকণ্ঠকে আমার নামে নালিশ করো না। আমাদের এই সাক্ষাৎ তাকে না জানালে দু’জনের জন্য ভাল কিনা জানি না, নীলকণ্ঠের জন্য ভাল।”

এরপরেই পাঞ্চালী সরে যেতে থাকেন। একদিন দেখা করে নীলকণ্ঠের কাছে কথা আদায় করেন।

“তোমাকে একটাই কথা দিতে হবে নীলকণ্ঠ, আজই শেষ। আর কোনও দিন আসবে না।”

নীলকণ্ঠ প্রায় আত্ননাদ করে ওঠেন।

“কী বলছ পাঞ্চালী! তুমি সম্পর্ক ভেঙে দিতে চাইছ? কী হয়েছে তোমার, কেন এমন করছ? রানি কোনও ভাবে আমাদের কথা জেনেছে,



বাড়িতে মাঝেমধ্যে চাঁচামেচিও করে। তাই বলে, তুমি এভাবে সরে যাবে?”

পাঞ্চালী শান্তভাবে বললেন, “সরে তো যাচ্ছি না, থাকবই তো ঠিক করেছি। সেই কারণেই এখানেই দেখা করার, কথা বলার পর্ব শেষ করছি। সব কিছুরই এক-একটা পর্ব থাকে, তাকে শেষ করতে হয়।”

এই পাঞ্চালীর সম্পর্কে কুৎসিত কথা শুনে রানিকে ধমক না দিয়ে থাকবেন কী করে নীলকণ্ঠ সেন?

নয়

ধমক দিলেন নীলকণ্ঠ সেন। নিচু গলায় হিসহিসিয়ে উঠলেন।

“চুপ করো, একদম চুপ করো। পাঞ্চালী এরকম নয়।”

থমকে গেলেন রানি। স্বামীকে কখনও পাঞ্চালী রায়ের জন্য রুখে দাঁড়াতে দেখেননি। সব সময়ই মাথা নামিয়ে শুনেছেন। আজ কী হল? মরে গিয়ে ওই মেয়েমানুষ তার প্রেমিককে খানিকটা তেজ দিয়ে গেল নাকি? এ ধরনের অলৌকিকতায় কোনও দিন বিশ্বাস ছিল না, এখন হয়। যে-মেয়ে মরার পরও এভাবে তেড়েফুঁড়ে ওঠে সে সব পারে। নিজেকে সামলালেন রানি। আজ চাঁচামেচি নয়, আজ মাথা ঠান্ডা রেখে এসপার-ওসপার করার দিন। চাঁচামেচি, দরজা বন্ধ করে কান্নাকাটি করতে আর ইচ্ছে হয় না। কেন করে না জানেন না রানি। স্বামীর প্রেম নিয়ে রাগ, দুঃখ যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমন হঠাৎ চলে গিয়েছে যেন। এখন মনে হয়,

সব রাগটা নীলকণ্ঠের ওপর নয়, নিজের ওপরও, চাঁচামেচি নিজেকেও, কান্নাকাটি নিজের জন্যও। মানুষ সুখদুঃখের এক-একটা পর্যায় পেরোতে পেরোতে চলে। সেই পথ বৃত্তের মতো। ছেড়ে আসা জায়গায় আবার পৌঁছতে হয়। আজ এত যুগ পরে তথাগত দেখা করে সে কথাই যেন বলে গেল।

“কেন চুপ করব? আমি কি মিথ্যে বলেছি?”

নীলকণ্ঠ লম্বা শ্বাস টেনে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, “পাঞ্চালী একজন ভাল মানুষ। নিজের মতো করে অন্যকে বিচার করতে যেয়ো না রানি।”

“আমার মতো! আমি কী করেছি? কোন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে বিছানায় উঠেছি?”

নীলকণ্ঠ আঙুল তুলে বললেন, “আবার? আবার তুমি সেই কুৎসিত কথায় ফিরে এসেছ। এসব নোংরা এবং মিথ্যে।”

রানি বললেন, “নোংরা মানুষের জন্য নোংরা কথাই উপযুক্ত। আমার সঙ্গে তুলনা করছ কোন সাহসে?”

নীলকণ্ঠ বললেন, “কোন সাহসে তুমি জানো না? আমাকে বলতে বাধ্য কোনো না রানি। এতদিন যা বলিনি আমি, আজও যেন তা বলতে না হয়।”

রানি আবার থমকালেন। নীলকণ্ঠ কী বলতে চায়? তথাগতর কথা? সেকথা কী জানে সে?

তথাগত কিন্তু তাদের সবটাই জানে। আজ শুনে এতটাই অবাক হয়

রানি, যে বেশ কিছুটা সময় মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি। তারপর নিচু গলায় বলেছিল, “তুমি এসেছ কেন?”

দাড়িতে হাত বুলিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে তথাগত হেসে বলল, “কেন? তোমার সঙ্গে দেখা করতে। বাইরে চলে যাচ্ছি, দেশে আবার কবে ফিরব জানি না,” তারপর জ্যাকেটের পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। ধরিয়ে লম্বা টান দেয়, একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, “যদি বলি টানে এসেছি, সত্যি হলেও বিশ্বাস হবে না। তাই বলছি, একটা ইনফর্মেশন দিতে এসেছি। জরুরি তথ্য। একটা নয় দুটো।”

বয়সের সঙ্গে তথাগত বেশ খানিকটা মোটা হয়েছে। জ্যাকেট পরার কারণে তাকে আরও ভারি ক্লি দেখাচ্ছে। চোখে চশমা উঠেছে। মাথার চুল আগে এলোমেলো ছিল, এখন ব্যাকব্রাশ করে গোছানো। তাও রাস্তার উল্টো দিক থেকে চিনতে অসুবিধে হয়নি। কেন হল না? এতটা চেহারা বদলালে তো অসুবিধের কথা। হয়তো কাউকে চেনার জন্য শুধু বাইরেটা নয়, ভিতরের থেকেও কোনও সিগন্যাল আসে। সাগরপারের লাইট হাউসের আলোর মতো। ডাঙা চেনায়। তথাগত তো রানির ডাঙা ছিল না কখনও, জল ছিল, অতল জল। ঢেউ দিয়ে এলোমেলো করে ভাসিয়ে, ডুবিয়ে ছেড়েছে। মডেল করে ছবি আঁকবে বলে যখন রানিকে নগ্ন করেছে, তখন তো সে সবে কিশোরীবেলা পার করেছে এসেছে। ভয়ঙ্কর বয়স, ভেসে যাওয়ার বয়স। ক্যানভাস থেকে দূরে বসিয়ে পেনসিল মুখে ভেবেছে, কেমন করে দেখবে। কখনও রঙিন একফালি কাপড় রেখেছে কাঁধে, কখনও উরুতে পেতে, কখনও দাঁড় করিয়ে, মাথায় পাতার মুকুট পরিয়ে, গ্রিক রমণী সাজিয়েছে, কখনও আবার জলটোঁকিতে বসিয়ে, হাতে কলসি ধরিয়ে বাংলার পুকুরঘাটের ছায়া এনেছে। শুধু তো ছবি আঁকাতে নয়, তথাগত আদরেও ভাসিয়েছিল বারবার। বিছানায় যেতে চাইত না সে ছেলে।

“সাজানো শয্যায শরীর কষ্ট পাবে না রা, কষ্ট না পেলে সুখ আসবে কেমন করে? রা, মেঝেতে এসো। ওই রং, তুলি, ইজেল সরিয়ে দাও। না-ও দিতে পার, এ সবার মাঝখানে আমাদের মিলন হতে পারে। আমাদের গায়ে ইচ্ছেমতো রং লেগে যাবে হয়তো। কেমন মজা হবে বলে তো? বাড়ি ফিরে স্নানের সময় হয়তো দেখলে, বুকের মাঝখানে খানিকটা নীল রং বিষণ্ণ হয়ে লেগে রয়েছে, অথবা তোমার দুই পায়ের গভীর লাল রঙে হাতছানি দিচ্ছে। দারুণ হবে না রা?”

ওসব নিয়ে ভাবেনি রানি। মেঝেতে গড়িয়ে যাওয়ার সময় শুধু বুঝেছে, এই শরীর তথাগত নামে এক বেপরোয়া তরুণের।

এই ধারণা ভাঙতে বেশি দেরি হয়নি রানির। নীলকণ্ঠের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর জেনেছিল, শরীরের অধিকারী যতই নিজে হোক না কেন, সে কার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, ইচ্ছেতে বা সমঝোতায়, তা পূর্বনির্ধারিত নয়। শরীরের ব্যাপারে তথাগত ঝড় হলে, নীলকণ্ঠ অবশ্যই ‘মৃদু-মন্দ বাতাস’। সময় মেনে বয়, সময় মেনে খেমেও যায়। যত্ন করে স্ত্রীকে নিরাবরণ করেন, প্রথম প্রথম লজ্জা পেয়েছেন বেশি। রানি সতর্ক থাকতেন, যাতে বোঝা না যায়, তিনি অভ্যস্ত। নিজেকে সামলে রাখতেন। স্বামীর অপটু হাতে আত্মসমর্পণ করে অপেক্ষা করতেন। তা-ই বা কতক্ষণ? নিজে শান্ত থাকলেও শরীর থাকবে কেন? থাকতও না। যা হয় হোক, ভেবে শরীরও এক সময় লাফিয়ে উঠত। জেগে উঠত পুরনো শরীর, শেষ হয়ে যাওয়া কিশোরীবেলার শরীর, যে স্বাদ পেয়েছিল লভভন্ড করে দেওয়া পুরুষের। নীলকণ্ঠকে উন্মুক্ত করতেন দ্রুত হাতে। তার শাস্ত, রুচিতে আঘাত না লাগে ভেবেচিন্তে চলা হাত দুটো টেনে উদ্ধত দুই স্তনের ওপর চেপে ধরে মুখ নামাতেন মুখে। ফিসফিস করে বলতেন, “আঁচড় দাও, কামড় দাও।”

আঁচড়, কামড়ে না গেলেও বাকটুকু নীলকণ্ঠ পারতেন। শরীর নামিয়ে আনতেন শরীরে। পরে রানির চিন্তা হত, তাঁর দক্ষতা খোয়াল করেননি তো নীলকণ্ঠ? অথবা তাঁর ফিসফিসানি? কেন এমন বেহায়ার মতো আচরণ করলেন ভেবে নিজের ওপর রাগ হত। আরও বেশি সতর্ক হওয়ার প্রতিজ্ঞা নিতেন। রাখতে পারতেন কই?

অফিসের সিঁড়ি থেকে নেমে খানিকটা ঘোরের মধ্যেই রাস্তা পেরিয়ে

তথাগতের কাছে পৌঁছে গেলেন।

“চলো রানি, ওই কফিশপে ঢুকি।”

রানি বললেন, “না, যাব না। তুমি এসেছ কেন?”

তথাগত ঘাড় নিচু করে সহজভাবে বলল, “দেখতে। কথা না বাড়িয়ে এগোও দেখি, ঢুকে পড়ি চট করে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে সেটা ভাল হবে না কি?”

একতলায় জায়গা পাওয়া গেল না, বসতে হল কফিশপের দোতলায়। বসতে বসতে রানি নিজের ওপর অবাধ হলেন। কী করে তিনি তথাগতের কথায় রাজি হয়ে, নিজের পথে না গিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে তার কাছে চলে গেলেন! কী করেই বা এখানে ঢুকে পড়ায় রাজি হলেন? এই মানুষটার কম বয়সে যে সম্মোহনের ক্ষমতা ছিল, হাতছানি এড়ানো যেত না, যা বলত মুগ্ধ করে দিত, মেনে নিতে ভাল লাগত, এখনও কি সেই ক্ষমতার কিছুটা রয়ে গিয়েছে? নাকি ভালবাসার এক চিলতে পড়ে রয়েছে চলে যাওয়া পাখির পালকের মতো?

“যা বলবার তাড়াতাড়ি বলো।”

তথাগত বলে, “বলছি, আগে কফি তো বলি। কী খাবে?”

গলার স্বর বদলেছে, কিন্তু সেই মায়া যেন রয়ে গিয়েছে। নাকি ভুল শুনছে রানি? কই খুব একটা অচেনা তো লাগছে না! তবে কি এত বছরের মাঝে কোথাও শুনেছে এই কণ্ঠস্বর?

রানি গলায় কঠিন ভাব এনে বললেন, “আমি কিছু খাব না। যা বলার তাড়াতাড়ি বলো।”

তথাগত চেয়ারে হেলান দিয়ে গুছিয়ে বসল খানিকটা। যেন কিছুই ঘটেনি, এমন ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল।

“তোমার চেহারা ভারী হয়ে গিয়েছে রানি। এক্সারসাইজ-টাইজ কিছু করছ তো? নিদেনপক্ষে হাঁটা তো উচিতই। অবশ্য বয়স কম হল না। আমারও তাই। তোমার থেকে কত বড় আমি? ফাইভ নাকি সিক্স ইয়ার্স? সেই সময় কত স্বপ্ন, কত বড় বড় কথা বলতাম। আর্টিস্ট হয়েছি, তবে পিওর নয়, ডিজাইন করি। ফলে প্যারিস যাওয়া হয়নি, এই বুড়ো বয়সে দোহাতে একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে চললাম।”

রানি হাতে রাখা মোবাইলে সময় দেখে অধৈর্য গলায় বললেন, “তোমার জীবনবৃত্তান্ত শোনার সময় আমার নেই। যা বলার তাড়াতাড়ি।”

বেয়ারার কফি দিতে আসার কারণে তথাগত এক মুহূর্ত চুপ করল। তারপরে নিচু গলায় বলল, “কেন? আমার জন্য সময় নেই কেন? আমি কি খারাপ লোক রানি?”

রানি থমথমে গলায় বললেন, “তুমি জানো। না জানলেও এতদিন পরে আর নতুন করে জানার দরকার নেই। আমি ও জীবন ভুলে গিয়েছি তথাগত।”

কফির মাগে চামচ নাড়াতে-নাড়াতে তথাগত বলে, “আমি ভুলিনি।”

রানি উঠে পড়ার ভঙ্গিতে বলে, “আই ডোন্ট বদার।”

মুখ শক্ত হয়ে গেল তথাগত। ঠোঁটের কোনায় সামান্য হেসে বলল, “এবার বদার করা। একটু অপেক্ষা করো।”

রানি কড়া গলায় বললেন, “অনেকটা সময় দিয়ে ফেলেছি।”

তথাগত মাগে চুমুক দিয়ে বলল, “রানি, তোমার বিয়ে যে আমি মেনে নিতে পারিনি তুমি নিশ্চয়ই জানো।”

“এসব পুরনো কথা শুনতে চাইছি না। তোমার সঙ্গে কোনও আর্গুমেন্টেও যাব না। বুঝতে পারছি, এখানে ঢোকাটা ভুল হল।” রানি উঠে দাঁড়ালেন।

তথাগত কঠিন গলায় বলল, “এক মিনিট। তোমার বিয়ের পর হাত গুটিয়ে বসে থাকিনি। আগেই ভেঙে দিতে চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। আমি না হয় খুব মন্দ লোক, আমার কাছে তোমার শরীরই সব, চরিত্র খারাপ, কিন্তু কোন সচ্চরিত্র রাজকুমারকে তুমি বিয়ে করেছ তার খোঁজখবর রাখলাম। হালকা খোঁজখবর। বিয়ের পরও নজরদারির ব্যবস্থা করি। দীর্ঘ অপেক্ষা করতে করতে একসময় আমার কাছে খবর এল, তোমার নীলকণ্ঠমশাই বিয়পান করছেন। মুখ নামিয়ে চোঁ চোঁ করে বিয়পান। টেলিফোনে সেই মহিলার খবর তোমাকে জানিয়েছিলাম।

আমার গলা চিনতে পারনি, সে না পারো, নিজেকে গোপন রেখে তোমার উপকারই করেছে। ভেবেছিলাম কিছু হবে, কিন্তু কোনও অ্যাকশন নাওনি। নিলে আজ আবার এভাবে তোমাকে বলতে হত না। অথচ আমি বিয়ের জন্য সময় চাইতে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিলো।”

রানি স্থির চোখে থমথমে গলায় বলেন, “কী বলতে চাইছ তুমি?”

তথাগত মুচকি হেসে বলল, “তোমার রাজকুমারের বান্ধবী, নাকি আর একটা বোঁ? ঠিক বলতে পারব না, তিনি দেহ রেখেছেন।”

রানি চমকে উঠে বললেন, “মানো!”

তথাগত বলল, “মানে সহজ রানি। দ্যাট পাঞ্চলী রায় ইজ ডেড। মারা গিয়েছে এবং আমার কাছে খবর, সুইসাইড করেছে। গলায় দড়ি না বিষ খেয়ে জানি না, তবে মরেছে এবং এখন বেওয়ারিশ ডেডবডি হয়ে মর্গে পড়ে রয়েছে।”

কথা শেষে চোখ বুজে, জিভ বের করে মূতের অভিনয় করল তথাগত। রানি হাঁপাচ্ছেন। অস্ফুটে বললেন, “কে বলেছে তোমায়? এসব কে বলেছে?”

তথাগত কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, “আমার সোর্স। আর্টিস্ট বলে কি চেনাজানা নেই? সব চেনাজানা তোমার বরেরই থাকতে হবে? তোমার বর এখন হন্যে হয়ে প্রেমিকার ডেডবডি খুঁজে বেড়াচ্ছে।” একটু থেমে তথাগত বলল, “আমাকে সিনেমার ভিলেনের মতো লাগছে? তা তো লাগবেই, তোমার বর সিনেমার মতোই গল্প ফেঁদেছে যো।”

দাঁতে দাঁত চেপে রানি বললেন, “মিথ্যে কথা, ইউ লায়ার।”

তথাগত বলল, “আমি লায়ার কিনা তোমার সুপুত্রকে ডেকে জিঙ্গেস করলেই তো জানা যাবে রানি। নীলকণ্ঠ সেন তার প্রেমিকার ডেডবডি খুঁজে বের করার জন্য তার ছেলেকে পথে নামিয়েছে। গত দশদিন ধরে সে হাসপাতালের লাশঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাশঘর জানো তো? মর্গ।”

রানি মাথা নামিয়ে বসে রইলেন। তথাগত কফি শেষ করে গলা নরম করে বলল, “সরি রানি। ফ্যামিলি কেচ্চার কথা তোমাকে বলতে আসিনি। তোমাকে এখনও... থাক, সতর্ক করতে বললাম। আগেও তাই করেছে, তুমি গা করনি। আমাকেই শত্রু ভেবেছ। এবারও ভাবতে পার। তোমার কাছ থেকে কম পাইনি। তোমার ভালবাসা পেয়েছি। এখন আর কোনও লেনাদেনা আমার নেই। পরশু ভোরের ফ্লাইটে বেরিয়ে যাচ্ছি, দেখাও হবে না আর।”

রানি টেবিল থেকে ব্যাগ তুলে উঠে দাঁড়ালেন। তথাগতও উঠল। বলল, “আর একটা কথা। এটা বোধহয় তোমার জন্য ভাল খবর। তোমার পুত্র এবং পুত্রবধূ এখন আলাদা থাকে।”

রানি ধরা গলায় বললেন, “এত সব তুমি জানলে কোথা থেকে? কেনই বা জানলে?”

তথাগত সামান্য হেসে বলল, “কোথা থেকে আর জানব? পুলিশে, তোমার বরের অফিসে, পাঞ্চলী রায়ের এনজিও-তে, সে যার কাছে লাস্ট কয়েকটা বছর থেকেছে, তাদের সঙ্গেও তো আমার যোগাযোগ থাকতে পারে। পারে না? আর কেন জেনেছি? সেটা বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। উল্টো ভাববে। সুতরাং থাক। গুডবাই রানিদেবী, যদি কোনও দিন সুযোগ হয়, আবার দেখা করব। আমাকে একটা থ্যাঙ্ক ইউ তো বলবে? আচ্ছা, থাক, বলতে হবে না।”

রানি কোনও রকমে একটা ট্যাক্সি ধরে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। বড়ঘড়ির নীচে বেষ্ট খুঁজে বসে রইলেন দীর্ঘ সময়। এখানে সবাই অপেক্ষা করে। ট্রেনের, সহযাত্রীর। রানি যেন এবার কী করবেন, মনের কাছে সে প্রশ্ন রেখে জবাবের অপেক্ষা করতে থাকেন। বারবার মোবাইল বেজে ওঠে, ধরেন না। একসময় বন্ধও করে দেন। শেষপর্যন্ত মনে হয়, বাড়ি কেন ফিরবেন না? বাড়ি তো তার। সে-ও তো নীলকণ্ঠর কাছে, পাঞ্চলীর কাছে আর-এক ভাবে পরাজিত হওয়া। তথাগতও তো তাই চাইছে। তাকে পথে বসাতে। দুটো লোকাল ছেড়ে তিন নম্বর ট্রেনে উঠে পড়লেন।

টিভি বন্ধ করে রানি স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমার কথা কী বলবে, আমার জানা আছে। আমার প্রেমের কথা বলবে তো?

কমবয়সি মেয়ের প্রেম কোনও কেচ্ছা নয়। তোমার মতো ছেলের বাবা হয়ে লুচামি করিনি।”

নীলকণ্ঠ নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন, “আমার সম্পর্কটাও অন্যায় ছিল না। আমি তোমার কাছে লুকোইনি। সেটা অতীতের ঘটনা।”

রানি হিসহিসিয়ে ওঠেন। বলেন, “অতীত! এখনও তো তুমি ছাড়োনি। ওই মেয়েমানুষের মরা খুঁজতে ছেলেকে মর্গে মর্গে ঘোরাচ্ছ। এটা মিথ্যে?”

“কে বলল তোমাকে?”

রানি বললেন, “যে-ই বলুক, তাতে কী তফাত? মিথ্যে কিনা বলা।” মুহূর্তখানেক চূপ করে থেকে নীলকণ্ঠ বললেন, “না, মিথ্যে নয়।”

স্বামীর এই স্বীকারোক্তিতে রানি থমকালেন। খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। পুরুষমানুষ কি এতটাই নির্লজ্জ?

বিড়বিড় করে বললেন, “কী বলছ তুমি!”

লম্বা শ্বাস নিয়ে নীলকণ্ঠ বললেন, “যা ঘটনা তাই বলছি। পাঞ্চলী একটা অ্যান্ড্রিডেন্টে মারা গিয়েছে। যার কাছে থাকত সেই মহিলা আমাকে খবর পাঠিয়েছেন, পাঞ্চলীর দেহ পাওয়া যায়নি।”

চোখ সরু করে রানি বললেন, “দেহ যদি না পাওয়া যায়, অ্যান্ড্রিডেন্টে মারা গেছে জানলে কী করে?”

নীলকণ্ঠ বললেন, “অনুমান করছে।”

রানি বললেন, “তোমাকে খুঁজতে বলছে কেন? তুমি কে?”

নীলকণ্ঠ একটু চূপ করে থেকে বললেন, “জানি না, কেন বলছে।”

“তুমি শিয়াল, না কুকুর যে মরা খুঁজবে?”

নীলকণ্ঠের ইচ্ছে করল উঠে গিয়ে রানির কাঁধদুটো চেপে ধরে এবং ঝাঁকতে ঝাঁকতে চিৎকার করে ওঠেন, “তুমি কে ছিলে রানি, যখন তথাগত নামে এক যুবকের সামনে দিনের পর দিন জামাকাপড় খুলে বসতে? তুমি ছিলে সেই যুবকের ভালবাসার মানুষ, তাকে তুমি তোমার সব দিয়েছ নির্দিধায়। আমিও পাঞ্চলীর ভালবাসার জন। এর থেকে বেশি কী পরিচয় লাগে?”

নিজেকে সামলালেন নীলকণ্ঠ। চট্টামেচি করলে আরও বাড়াবাড়ি করবে রানি। এত রাতে পাড়ার লোকে জানতে পারবে। ইতিমধ্যেই তো আশপাশের বাড়িতে কিছুটা জানাজানি হয়েছে। হওয়ারই কথা। রানির চট্টামেচি, কান্নাকাটির খবর তো ছড়িয়েছে। তার ওপর ছেলের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া। এত কিছু তো আর চাপা থাকে না।

“ওভাবে বোলো না। পুরনো পরিচয়ের তো একটা ভরসা থাকে। হয়তো সেই ভরসাতেই বলেছে।”

রানি বললেন, “ওরা ভরসা করল, আর অমনি তুমি ছেলেকে মরা খুঁজতে নামিয়ে দিলে?”

চূপ করে রইলেন নীলকণ্ঠ। এ প্রশ্নের জবাব তাঁর কাছে নেই। সামাদীপকে তিনি প্রথমে খোঁজ করতে বললেও, পরে সরে আসতে বলেছিলেন। সে শোনেনি। কেন শোনেনি তিনি জানেন না। বাবার পুরনো প্রেমিকার মৃতদেহ কি ভূতের মতো তাকে চেপে ধরেছে? যেখান থেকে সে বেরোতে পারছে না। নীলকণ্ঠের খারাপই লাগছে। সামাদীপকে বলাটা উচিত হয়নি। সে তার মায়ের কাছে ছোট হলে। হেনস্তাও হতে হবে নিশ্চয়ই। বরের বান্ধবী, সে জীবিত বা মৃত যা-ই হোক না কেন, তার সঙ্গে ছেলের জড়িয়ে পড়াটা কোনও মায়ের পক্ষেই মেনে নেওয়াটা সম্ভব নয়।

“একজন মরা মানুষের সন্ধান কোনও খারাপ কাজ নয় রানি। আমি সাম্যকে আগেও বলেছি, এখন আবার বলছি, সে যেন না আর না জড়ায়।”

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রানি। চোখ-মুখ লাল। কান্নায় গলাও বুজে আসছে। নিজেকে সামলে বললেন, “তুমি তোমার মরা মেয়েমানুষের শরীর জড়িয়ে থাকো। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। এই বয়সে বাইরে গেলে লোকে হাসবে, অফিসে কথা হবে। বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি না, নইলে তা-ই যেতাম। তুমি আমার ঘরে ঢুকবে না।”

রানির চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে খানিকটা সময় চূপ করে বসে রইলেন নীলকণ্ঠ। থাক, রাগ পড়ুক। তার রাগ, অভিমান তো অন্যায্য নয়। কে বুঝবে পাঞ্চালীর সঙ্গে এই সম্পর্ক ছিল অনিবার্য? এড়িয়ে থাকা ছিল অসম্ভব। উচ্চপদস্থ অফিসার, দায়িত্বশীল সংসারী নীলকণ্ঠ নারীর সংস্পর্শের জন্য ছুটফট করেননি কখনও। মন সংবেদনশীল, তবে এমন তরল ছিল না যে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে। সে মেয়ে যতই বুদ্ধিমতী আর সুন্দরী হোক। আগে তো দেখা হয়েছে কতজনের সঙ্গে, কই টলমল তো লাগেনি। পাঞ্চালীকে তিনি ঠেকাতে পারেননি, কারণ ঠেকানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল না। রানিও কি পেরেছিল? সে-ও তো সুন্দরী ছিল, বুদ্ধিমতীও। শুধু তো বিয়ের অধিকারে স্ত্রী নয়, নীলকণ্ঠ তাকে ভালওবেসেছেন। রানিও তো কখনও হেলাফেলা করেননি। যত্ন করেই স্বামীকে, স্বামীর শরীরকে ভালবেসেছিলেন। মিলনে দু'জনের কেউ যে অতৃপ্ত হতেন, এমন নয়, বরং নীলকণ্ঠকে এমন সব কৌশলে রপ্ত করেছেন, যাতে শরীর উল্লসিত হয়েছে। রানিও আল্লাদিত হতেন। রাতে আসার আগে উপযুক্ত সাজগোজ সেরেছেন। আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতেন নীলকণ্ঠ। পাঞ্চালীর কথা জেনে মানসিক বিপর্যয়ের আগে পর্যন্ত রানি কোনও ক্রটি করেননি। তাহলে কেন পাঞ্চালী এলেন? কোন জটিল পথে?

ছেলের ঘরের চাবি নিয়ে ওপরে এলেন নীলকণ্ঠ। ছাদের একদিকে ঘর, বাকিটুকু খোলা। ঘরের আলো না জ্বলে খোলা ছাদে দাঁড়ালেন। একতলা থেকে উঠে-আসা নারকেল গাছ ছাদের ওপর আলগোছে পাতা মেলেছে আঁচলের মতো। বহুদিন পর আকাশের দিকে তাকালেন নীলকণ্ঠ। ছাদেই ওঠা হয়নি কতকাল! চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, তবু আকাশ আলোময়। রাতের নিজের আলো? এই আলো স্নিগ্ধ, মন কেমন করা। ছাদেও মনকেমনের ছায়া পড়েছে। রহস্যময় সেই সব ছায়ার দিকে হাত বাড়ালেন নীলকণ্ঠ। এতটা বয়স পেরিয়ে আসার পরও চোখ ভিজে উঠল। তিনি মনকে শক্ত করতে চাইলেন।

দশ

“তোমার নামে যা শুনছি, তা কি সত্য?”

সাম্যদীপ আধখানা মাথা নামিয়ে বলল, “কী শুনছেন স্যার?”

‘স্যার’ বললেন, “শুধু শুনছি না, রিপোর্টও চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। গত বারোদিনে তিনদিনও অফিসে আসনি।”

অফিসের বসেরা কড়া হন। সাম্যদীপের ‘বস’ স্বর্ণাভ মিত্র কড়া নন। এবার তাঁকে কড়া হতে হয়েছে। কড়া না হয়ে উপায় নেই। তাঁর কাছে অভিযোগ এসেছে জুনিয়র অফিসার গত কয়েকদিন ধরে ঘন-ঘন কামাই করছে। সে সুস্থ এবং কামাই করার আগে অফিসকে কিছু জানাচ্ছে না। কোনও কোনও সময় সে শহরের বাইরেও যাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। অফিসের নিয়ম অনুযায়ী, এ কাজ করা যায় না। শহর ছাড়তে গেলে ওপরতলায় জানিয়ে যেতে হয়। ছুটি অনুমোদিত হলে, দায়িত্ব অন্য কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয়। এইভাবে কামাইয়ের কারণে, অফিসের কাজে বিশেষ ক্ষতি হয়েছে, আরও হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই জুনিয়র অফিসারের নাম সাম্যদীপ সেন। সাম্যদীপের নামে অভিযোগ এসেছে, সে কাজে অমনোযোগী হয়ে পড়েছে। ডিউটির সময় তার মাঝেমধ্যেই টেলিফোন আসছে, ফোনের কোনও নম্বর দেখে সে তড়িঘড়ি ঘর ছেড়ে করিডোরে চলে যাচ্ছে। সম্ভবত অমনোযোগের কারণে তার ফাইলে ইতিমধ্যে দু’টি ভুল হয়েছে। তার মধ্যে একটি ভুল গুরুত্বপূর্ণ, অফিসকে তার জন্য খেসারত দিতে হতে পারে। বস স্বর্ণাভ মিত্রের কাছে আর-এক মারাত্মক অভিযোগ এসেছে। একে ‘অভিযোগ’ না বলে ‘খবর’ বলাই ভাল।

সাম্যদীপের ডিপার্টমেন্টের প্রধান মানস পাইন ঘরে এসে সেই ‘মারাত্মক খবর’ জানিয়েছে।

“এতদিন জানাওনি কেন?”

“স্যার খবর পাইনি। ঠিক খবর পাইনি তা নয়, খবর বিশ্বাস করিনি।

এমন তো আগে কখনও শুনিনি। এক সময়ে কেউ কেউ ভেবেছিলাম, সাম্যদীপ ড্রাগ খেতে শুরু করল নাকি? সেই কারণে এমন ছটফটানি নয়তো? শুনেছি নেশাটেশা করলে নাকি ছেলেছোকরারা এমন ঘর-বার করে। তারপর তো জানলাম, ঘটনা এরকম মারাত্মক।”

স্বর্ণাভ মিত্র হাতের কলম টেবিলে রেখে দিয়ে বললেন, “বিশ্বাস তো আমিও করছি না, তাই বলে আমাকে একবার ইনফর্ম করবে না? ডিপার্টমেন্টাল হেডের রেসপন্সিবিলিটি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।”

মানস পাইন কাঁচুমাচু মুখে বললেন, “সরি স্যার, জানানো উচিত ছিল।”

স্বর্ণাভ মিত্র বিরক্ত মুখে বললেন, “এখন আর সরি বলে কী লাভ? সাম্যদীপ যে ছটপাট কামাই করছে, কাজে মন নেই, সেটা তো বলতে পারতে। এখানে তো আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনও ব্যাপার নেই। অ্যাটেনডেন্সের খাতা খুললেই জানা যাবে।”

মানস পাইন বললেন, “সেটাই তো জানাতে এসেছি। আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করুন স্যার। ডিসিপ্লিন তো ব্রেক করছেই, অফিসের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।”

“বলানি কেন? তুমিও তো ডিপার্টমেন্টের হেড। অফিসের ক্ষতি তো তুমি করেছ।”

মানস পাইন এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললেন, “বলব ভেবেছিলাম। মড়াটড়ার কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছি। কে যেন বলল, তত্ত্বসাধনায় মড়ার খুলিটুলি লাগে। এই সাধনা যারা করে, তারা নাকি শ্মশানে, মর্গে বেওয়ারিশ লাশ খুঁজে বেড়ায়।”

চমকে উঠলেন স্বর্ণাভ মিত্র। চমকে ওঠার কারণ রয়েছে। তিনি বিশ্বাস না করলেও, তাঁর স্ত্রী আবার ভূতপ্রেত মানে। একটু বেশিই মানে। ভয়ও পায়। সন্দের পর আলো না জ্বলে থাকতে পারে না।

স্বর্ণাভ মিত্র নিজেকে সামলে, চাপা গলায় ধমক দিলেন, “এসব কী যা-তা বলছ মানস?”

“আমরাও তো চাইছি, এসব যেন যা-তাই হয়। আর একটা কথা স্যার, অফিসের দু’-একজন সাম্যদীপকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে।”

স্বর্ণাভ মিত্র মনে-মনে খতমত খেলেও কড়া গলায় বলল, “এসব কী মানস! ঘটনা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে কীভাবে?”

মানস পাইন মাথা চুলকে বলল, “অফিসের বেয়ারা পিওনের মধ্যে কথাটা ছড়িয়েছে। যে লোক মড়া ঘাঁটাঘাঁটি করে, তার কাছে ষেষতে চাইছে না। জানেন তো স্যার, যতই স্যাটেলাইট, মাইক্রোচিপস, রকেট নিয়ে লাফালাফি করি না কেন, দেশটা তো আজও কুসংস্কারে ডুবে।”

“লেকচার দিয়ে না মানস। তুমি যাও এবার, আমি দেখাচ্ছি।”

এর পরেই সাম্যদীপকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্বর্ণাভ মিত্র। না বলে কামাইয়ের কারণ জানতে চাইলেন।

সাম্যদীপ খানিকটা সময় চূপ করে বসে রইল। সে আঁচ করেছিল অফিসে এরকম একটা কিছু ঘটবে। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে। এই ঝুঁকি নিয়েই কাজ শুরু করেছিল। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলল, ঘটনা বলে দেবে। তার বস মানুষটা ভাল। সমস্যাটা বুঝতেও পারে, না পারলে কী আর করা যাবে। লুকিয়ে রেখে লাভ নেই, জানাজানি হবেই। একটা মৃতদেহের সন্ধানে এত জায়গায় ঘুরে বেড়ানো কতদিন গোপন করা যায়?

“স্যার, একটা ব্যক্তিগত কাজে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।”

স্বর্ণাভ মিত্র ঠিকই করে রেখেছিলেন, কড়া ভাব দেখাবেন, তবে বকাঝকা বিশেষ করবেন না। তাঁর স্বভাবও নেই। তার ওপর ছেলেটা কাজকর্ম ভালই করে। মড়াটড়ার ব্যাপারটা যদি সত্যি না হয়, তাহলে বুঝিয়েসুঝিয়ে আবার কাজে ফেরানো যাবে।

“সাম্যদীপ, ব্যক্তিগত কাজে ঘুরে বেড়ালেও অফিসের তো একটা ডিসিপ্লিন আছে। একটা রেসপন্সিবল পোস্টে থেকে ছুট বলতে এভাবে কামাই করতে পারো না। লিভও তো ফুরিয়ে ফেলেছ দেখলাম।”

সাম্যদীপ বলল, “কাজটা হঠাৎ এসেছে স্যার।”

স্বর্ণাভ মিত্র বললেন, “হঠাৎ এসেছে তো কী? ছুটি নেওয়ার আগে

জানাবে না?”

সাম্যদীপ মুখে তুলে বলল, “জানানোর সময় পাইনি, কাজটা একটু অভূত। কোথায় যেতে হবে, হঠাৎ হঠাৎ জানতে পারি। অফিসে দরখাস্ত দেওয়ার সময় পাই না।”

স্বর্ণাভ মিত্র চোখ বড় করে বললেন, “হঠাৎ জানতে পার মানো? তুমি কি পাচি-টাইম কাজ করছ কোথাও? এটা তো হতে পারে না।”

সাম্যদীপ বলল, “না স্যর কোনও চাকরি নয়, বললাম তো ব্যক্তিগত একটা কাজে জড়িয়ে পড়েছি।”

কী কাজ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থমকালেন স্বর্ণাভ মিত্র। নিজে থেকে না বললে ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে জিজ্ঞেস করার অধিকার তাঁর নেই। তিনি ভুরু কঁচকে বললেন, “শুধু কামাই তো নয় সাম্যদীপ, কিছুদিন হল, অফিসে থাকলেও তুমি কাজে মন দিতে পারছ না, কাজের ক্ষতি হচ্ছে।”

সাম্যদীপের মনে হল, এবার বলে ফেলাই উচিত। মানুষটার কথা শুনে এবং মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছে, খানিকটা শুনেছে। এলোমেলো কিছু মনে করার আগে সত্যিটাই জানুন বরং।

“স্যর, আমি জানি, আমার জন্য অফিসে সমস্যা হয়েছে, আর দুটো দিন, তারপর আর এমন হবে না। আমি আসলে একটা ডেডবন্ডি খুঁজছি। আমার এক পরিচিত নিখোঁজ এবং মনে করা হচ্ছে, তিনি কোনও অ্যান্ড্রিডেট মারা গিয়েছেন। সেই কারণে কোথাও আনক্রেমড ডেডবন্ডির খোঁজ পেলে সেখানে ছুটে যাচ্ছি। পুলিশে আমার এক বন্ধু রয়েছে, যাকে বেওয়ারিশ মৃতদেহের তথ্য রাখতে হয়। সে স্যর মাঝেমাঝে আমাকে ফোনে সেই তথ্য জানায়। আমি সেই খবরের জন্য কাজের ফাঁকে ফোন ধরি। সাধারণত অফিসটাইমেই বন্ধু খবর জেনে ফোন করে। টেবিলে বসে তো মৃতদেহ নিয়ে কথা বলা যায় না, তাই বাইরে চলে যাই। আমি আইডেন্টিফিকেশন মার্ক, শরীরের বিশেষত্বগুলো মিলছে কিনা জেনে নিয়ে পরের দিনই রওনা হই।”

থামে সাম্যদীপ। স্বর্ণাভ মিত্রের কাছে ঘটনা পরিষ্কার হয়েছে। দুর্বল হয়ে পড়েন তিনি। পরিচিতজনের মৃতদেহ খুঁজে বেড়ানোর মধ্যে বেদনা রয়েছে। ছেলটি ছটপাট ছুটি নেওয়ায় অফিসের নিয়ম ভেঙেছে ঠিকই, কাজেও সমস্যা হয়েছে, কিন্তু এরকম একটু পরিস্থিতিতে বেচারি কী করবে? মৃতদেহের খবর তো আর অফিসের সময় মেনে আসবে না। মানস পাইনের ওপর রাগ হচ্ছে। একটা সিরিয়াস বিষয়ে, ভূতপ্রেত জড়িয়ে কত কথাই না বলল।

“চা খাবে সাম্যদীপ? দিতে বলব? কিছু খাবে?”

সাম্যদীপ বলল, “থ্যাঙ্ক ইউ স্যর। টিফিন খেয়ে এলাম।”

কথাটা ঠিক নয়। কদিন হল কিছু খেতে পারছে না সাম্যদীপ। খাবার দেখলেই গা গুলিয়ে উঠছে। পাক মারছে নাভি থেকে। মর্গের দৃশ্য এসে চোখের সামনে ভিড় করছে। গোড়ার দিকে একজন বলেছিলেন, মর্গে ঢুকলে তখনই সমস্যা হতে পারে, পাক দেবে, আবার ক’দিন পরেও হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে হলে বমিটমি করে, দুটো দিন না খেয়ে সামলানো যায়, পরে হলে সমস্যা জটিল হতে পারে। সাম্যদীপের মনে হচ্ছে, সমস্যা জটিলের দিকে যাচ্ছে।

সাম্যদীপ বলল, “স্যর, আমি জানি কাজটা অন্যায় হচ্ছে, কিন্তু আর কোনও পথ নেই।”

স্বর্ণাভ মিত্র হাত নেড়ে বললেন, “আরে ওভাবে বলছ কেন? আমারও অভিজ্ঞতা আছে। একবার পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক দুম করে হারিয়ে গেলেন। তখন ছোট আমি। সেই বয়সে সবটা বুঝতে পারিনি, কিন্তু সেই ভদ্রলোককে খুঁজে বের করার জন্য বাড়ির লোকদের ছোটোছুটি দেখেছি। সাম্যদীপ, যিনি নিখোঁজ, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের কাছের কোনও আত্মীয়।”

সাম্যদীপ অস্বস্তিতে বলল, “পরিচিত। আর একটা-দুটো দিন। তার পরই একটা কিছু হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।”

স্বর্ণাভ মিত্র উৎসাহ নিয়ে বললেন, “খোঁজ পাওয়া যাবে বলছ?”

সাম্যদীপ খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে বিড়বিড় করে বলল, “না, চেনা যাবে।”

স্বর্ণাভ মিত্র কথাটা ঠিক মতো শুনতে পেলেন না। তড়িঘড়ি বললেন, “এত ভেবো না। আমি মানসকে বলে দিচ্ছি, এই ক’দিন জরুরি ফাইল অন্য কাউকে দিয়ে দেবো।”

সাম্যদীপ নিজের টেবিলে ফিরে এসেও কাজে মন বসাতে পারল না। মন বসানোর মতো তেমন কিছু কাজ ছিল না। একবারে রুটিন কিছু চিঠিপত্র, দু’-একটা পুরনো ফাইল। মনে হয়, স্বর্ণাভ মিত্র ঠিক থেকে বেরোতে না বেরোতে ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। সাম্যদীপ ঠিক করল, উজ্জয়িনীর সঙ্গে দেখা করবে। ওর স্কুলে যাবে? ছুটির সময় খানিকটা এগিয়ে মোড়ের চায়ের দোকানটায় বসে চা খাবে? প্রেম করার সময় যেত। রাগ দেখাত উজ্জয়িনী।

“তোমাকে স্কুলের এত কাছে দাঁড়াতে বারণ করেছে না?”

“কেন? কী হবে?”

“কী হবে জানো না? মেয়েরা দেখে ফেলবে।”

সাম্যদীপ জোরে হেসে বলেছিল, “একেই বলে উলট পুরাণ। কোথায় মেয়েরা প্রেম করে লুকিয়ে, পাছে দিদিমণি দেখে ফেলে, এখন দিদিমণি প্রেমের জন্য লুকোতে চাইছে।”

উজ্জয়িনী হাতে চিমটি কেটে বলেছিল, “একদম হাসবে না। বাবু কত প্রেম করে আমার দেখা হয়ে গিয়েছে। একটু হাত ধরা নেই, আমার করা নেই। হাই স্কুলের মেয়েরা প্রেম করলে তোমার থেকে অনেক বেশি সাহস দেখায়।”

সাম্যদীপ বলে, “সুযোগ পেলাম কোথায়?”

উজ্জয়িনী মুখ ভেঙে বলে, “সুযোগ পেলেও তোমার মুরোদ জানা আছে।”

সাম্যদীপ কৌতুক মেশানো গলায় বলে, “সুযোগ পেলে দেখবে।”

“ছাই দেখব।”

কথা শেষে উজ্জয়িনী মুঠি পাকিয়ে সাম্যদীপের পিঠে আলতো করে মারে। এই আনন্দ, খুনসুটি যে এত তাড়াতাড়ি ভেঙে মুচড়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল? নবীন, অনাস্বাদিত, আদরের জন্য উন্মুখ হয়ে-থাকা দুটো শরীরের তো হুল্লোড়ের কথা ছিল। কেন সরে গেল? তবে কি কাছাকাছি গেলে শরীর যেমন শরীরের সঙ্গে কথা বলে, তেমন বলেও না আবার? মুখ ফিরিয়ে নেয়? যা ঘটেছে, তা তো মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই।

সাম্যদীপ টেবিলের কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে ঠিক করল, স্কুল নয়, উজ্জয়িনীর টালিগঞ্জের বাড়িতে যাবে। আগে ফোন করবে না। ফোন করলে উজ্জয়িনী বাধা দেবে। ফাইল গুছিয়ে চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় ফোন বেজে উঠল। স্ক্রিনে নাম ভেসে উঠল, অরুণাভ।

“তোর খবর কী?”

সাম্যদীপ বলল, “কিসের খবর?”

অরুণাভ বলল, “বুঝতে পারছ না হারামজাদা? ইন বেড স্টোরির কথা জিজ্ঞেস করছি।”

বন্ধুর ভাষা এরকম হতেই পারে। অরুণাভ তো আরও বেশি মুখ খারাপ করে। সাম্যদীপ এক মুহূর্ত থমকায়। অরুণাভর হাতুড়ে চিকিৎসার যে ধারকাছ দিয়ে যে সে যায়নি, এটা কি বলবে? দরকার নেই।

“কোনও উন্নতি হয়নি, বরং সমস্যা জটিল হয়েছে। উজ্জয়িনী চলে গিয়েছে।”

অরুণাভ বলল, “আঁ, বলিস কী! চলে গিয়েছে মানে, ছেড়ে চলে গিয়েছে?”

সাম্যদীপ বলল, “অনেকটা সেরকম। নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছে।”

ফোনের ওপাশে একটু চুপ করে থেকে অরুণাভ বলল, “এরকম যে একটা কিছু হতে পারে, আমার ভয় ছিল।”

সাম্যদীপ বলল, “আমি আজ ওর কাছে যাব ভেবেছি। ওকে বলব, আমার মনে হয়, সমস্যা কেটে যাবে।”

অরুণাভ চাপা গলায় ধমকে উঠল, “একদম যাবি না। তোর মনে হওয়া দিয়ে কী হবে? অনেকদিন থেকেই তো মনে হচ্ছে, হবে, হবে... হয়েছে কিছু? তোকে বিশ্বাস আনতে হবে। বিশ্বাস এনে বৌয়ের কাছে

যেতে হবে। যা বলছি, মন দিয়ে শোন। আমার এক পরিচিতজনের সঙ্গে কথা বলেছি, সে একটা জবরদস্ত পথ বলেছে। ট্রিটমেন্ট বলতে পারিস। শক ট্রিটমেন্টের মতো। সত্যি যদি তোর শরীরে কোনও ব্লকেজ থাকে, এতে কেটে যেতে নাকি বাধ্য।”

সাম্যদীপ বলল, “আমি আর হাতুড়ে চিকিৎসায় নেই অরুণাভ।”

অরুণাভ দাঁত খিঁচনো ধরনের বকুনি দিয়ে বলল, “চুপ কর। বড় বড় কথা এবার বন্ধ কর। সারা জীবন কি নপুংসক অপবাদ নিয়ে থাকবি? যা বলছি, তাই কর। কস্টলি ট্রিটমেন্ট। সোয়া সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে এন্টালির মোড়ে এসে দাঁড়াবি, যেখানে ট্যাক্সিগুলো দাঁড়ায়। আমি তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাব।”

সাম্যদীপ বলল, “আজ?”

অরুণাভ বলল, “হ্যাঁ, আজই। আমি অনলাইনে ফিজ দিয়ে বুক করে নিচ্ছি। পরে টাকা দিয়ে দিবি। আমি শিওর ওখান থেকে বেরিয়ে যখন তুই উজ্জয়িনীকে ফোন করবি, সে তোর গলার দাপট শুনে অবাধ হয়ে যাবে।”

ফোনে কথা বলতে বলতে অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে সাম্যদীপ। অরুণাভ তাকে নিয়ে কোথায় যেতে চায়? এবার কি মস্ত্রটম্বের মধ্যে নিয়ে ফেলবে? আজ যে সে উজ্জয়িনীর কাছে যাবে ভেবেছিল।

এগারো

অরুণাভর পিছনে থাকলেও যে-মেয়েটি দরজা খুলেছে, সাম্যদীপ তাকে দেখতে পেল।

মেয়েটিকে ‘সবুজকন্যা’ বললে ভুল হবে না। গাঢ় সবুজ শাড়ির সঙ্গে সবুজের হালকা শেডের স্লিভলেস ব্লাউজ। গলায় সবুজ পুঁতির মালা, কপালে সবুজ টিপ, সবুজ রঙের ইয়াররিং। লম্বা ধরনের মুখে লিপস্টিক ছাড়া অন্য মেকআপ আছে বলে মনে হয় না। তবে না থাকলে এত বলমল করছে কেন? আলোর জন্য হতে পারে। বাইরে থেকেই বোঝা যাচ্ছে ঘরে উজ্জ্বল আলো। বয়স কত মেয়েটির? আঠাশ? তিরিশ? নাকি বত্রিশ?

সুন্দর হেসে ‘সবুজকন্যা’ বলল, “এসো অরুণাভদা।”

অরুণাভও সহজভাবে বলল, “দেরি করিনি তো মধুমঞ্জরী?”

মধুমঞ্জরী একই রকম হেসে বলল, “তুমি তো অলওয়েজ পাংচুয়াল।”

অরুণাভ এবার সরে গিয়ে সাম্যদীপকে দেখিয়ে বলল, “এই আমার বন্ধু সাম্য। একেই আজ তোমার কাছে ধরে এনেছি। হি নিডস ইয়োর ট্রিটমেন্ট।”

মধুমঞ্জরী বলল, “ইটস মাই প্লেজার। বাইরে কেন? ভিতরে আসুন।”

দরজা পেরোতেই বইয়ের ছবির মতো সাজানো ডইংরুম। শুধু ছবির মতো নয়, সাজের পিছনে হিসেব এবং ভাবনাচিন্তাও রয়েছে। ছাপোষা সাম্যদীপ খানিকটা খতমতই খেয়ে গেল। ঘর জুড়ে তিন রকমের বসার আয়োজন। সোফা তো আছেই, একপাশে বেতের চেয়ার, অন্যদিকে ডিভানে গদি, তাকিয়া। ঘরে এক ধরনের মিষ্টি গন্ধ। মাঝারি ঠাণ্ডায় এসি চলছে। বাইরের গরম থেকে এসে ভাল লাগছে। মধুমঞ্জরী গায়ে শাড়ি জড়িয়ে নিয়েছেন। উন্মুক্ত হাত, কাঁধ, পেট ঢেকে গিয়েছে। বলল, “কী খাবে অরুণাভদা? চা? শরবত?”

বোঝাই যাচ্ছে, অরুণাভর সঙ্গে এই মেয়ের বিশেষ চেনাজানা। একথাই আসবার পথে সে বলছিল।

“মধুমঞ্জরী আমার চেনা। এফিশিয়েন্ট, নতুন মেথডে কাজ করছে। একবার চল, গেলেই বুঝতে পারবি।”

সাম্যদীপ বলেছিল, “কিসে এফিশিয়েন্ট?”

অরুণাভ সহজভাবে বলল, “নিজের কাজে।”

“কী কাজ করেন?”

অরুণাভ বলল, “নানা রকম কাজ। তার সঙ্গে আছে কাউন্সেলিং। তোর মতো যারা বিদ্যুটে সমস্যায় ভুগছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে কারেকশনের কাজ করে। নিজের থেরাপিও রয়েছে।”

সাম্যদীপ বলল, “থেরাপি মানে? জড়িবিটি খেতে বলবে নাকি?”

“আরে না বাবা। আমি কথা বলে নিয়েছি। মধুমঞ্জরী বলল, এমন নাকি হয়, কোথাও একটা গিঁট পড়ে থাকে, ছাড়িয়ে দিলেই ফাইন। কিছু প্র্যাকটিস, কিছু এক্সারসাইজ আছে। শি ইজ ভেরি বিজি। সময় দিতে পারে না। আজ ফোন করে বলল, সন্ধ্যার পর একটা স্লট ফাঁকা পেয়েছি অরুণাভদা, তুমি যদি তোমার বন্ধুকে নিয়ে আসো একবার, দেখতে পারি। আমিও তাকে তাকে ছিলাম। ডাক্তার-বদ্যি, ওয়ুথ-টয়ুথ তো অনেক হল, এবার অন্য ভাবে যদি তোকে নরমাল করা যায়।”

সাম্যদীপ একটু চুপ করে থেকে বলল, “আমার কেমন সুবিধের ঠেকছে না অরুণাভ। কার না কার কাছে যাচ্ছি...”

অরুণাভ রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এক রকম ঝাঁঝিয়ে উঠল, “আমাকে যখন সন্দেহ, ছেড়ে দে। যেতে হবে না তোকে। আমার নিজের কোনও ইন্টারেস্ট নেই। যা করছি, তোর জন্য করছি। একটা সংসার যদি সুখে থাকে, সেই কথা ভেবে করছি। এমন নয় যে তুই পুরুষত্বহীন, এমন নয় যে তোর শরীর নারীসঙ্গে উত্তেজিত হয় না, অথবা এমন নয় তুই হঠাৎ করে অপারগ হয়ে গিয়েছিস। সবাই বলেছে, দেয়ার ইজ আ ব্লকেজ। এটা কাটানোর চেষ্টা নানাভাবে ফেল করছে। এই কাউন্সেলিং মেথডটা একবার দেখতে চাইছিলাম। যদি রাজি না হোস, আমার আগ বাড়িয়ে এত কিছু করার দরকার কী? প্রবলেম আমার নয়। তোর শরীর, তোর কথা শোনে না, আমার তো নয়। তোকে যেতে হবে না। তুই বাদ দে। এখানে খরচটা বেশির দিকে, আমি অনলাইনে দিয়েও ফেলেছি। সেটা নষ্ট হলে হোক। আমি গাড়ি ঘুরিয়ে নিচ্ছি, কোথায় নামবি বল।”

বন্ধুর রাগ দেখে সাম্যদীপ দ্রুত নিজেকে ঝাড়া দিল। ঠিক বলছে অরুণাভ। ও তো নিজের স্বার্থ ছাড়াই ছুটে বেড়াচ্ছে। সমস্যা কাটানোর জন্য এতই যখন করেছে, আর একটু দেখতেই বা ভয় কিসের? তার নিজেরও তো জানা উচিত, সত্যি তার শরীর উজ্জয়িনীর শরীরের জন্য উপযুক্ত কিনা। অরুণাভর হাত চেপে ধরে বলল, “সরি, আমার বলাটা ঠিক হয়নি। চল, আমি রেডি।”

“ভেবে বল।”

সাম্যদীপ বলল, “বলছি তো। ভেবেই বলছি। উনি যেমন বলবেন ট্রাই করব।”

গাড়ি ফের স্টার্ট দিয়ে অরুণাভ বলল, “অসুখ হওয়াটা যেমন অস্বাভাবিক নয়, সেটার চিকিৎসা করাটাও অস্বাভাবিক নয়।”

মধুমঞ্জরী আর তার সাজানো ফ্ল্যাট দেখে অস্বস্তি কেটে গেল সাম্যদীপের। অনেকে ঘর সাজায় গাদাখানেক টাকাপয়সা খরচ করে। এই মেয়ে যেমন খরচ করেছে, তেমন রুচিও রয়েছে। এক দিকের দেয়ালে পুতুলের আলমারি আর বইয়ের র‍্যাক। পুতুল সাজানো হলেও, বইগুলো এলোমেলো। তার মানে সাজানো নয়, পড়া হয়। উজ্জয়িনী সাজানো বই দেখলে রেগে যায়। নিজের বইয়ের টেবিল, তাক সব অগোছালো। দু’-একবার গোছাতে গিয়ে বকুনি খেতে হয়েছে সাম্যদীপকে। তার কেমন একটা লাগছে। জীবনটা সত্যি অদ্ভুত। একদিকে মরে যাওয়া শরীর চিনতে দুর্গন্ধময়, রক্তাক্ত, বিকৃত শব্দেহের অন্ধকার ঘরে ঢুকতে হচ্ছে, আর-একদিকে শরীরকে চেনাতে এসে পড়েছে এক আলো বলমলে, সাজানো ঘরে। শরীরে শরীরে কত পার্থক্য!

মধুমঞ্জরী শরবত নিয়ে এসে টেবিলে রাখলে অরুণাভ বলল, “তুমি আবার কষ্ট করলে কেন?”

মধুমঞ্জরী বলল, “তুমি তো জানো, এই ফ্ল্যাটটা আমার একার, মাঝেমধ্যে নিজে এসে থাকি, স্পেশাল কাজ থাকলে করি। আর কাউকে এখানে অ্যালাও করি না। যেমন আজ।”

অরুণাভ বলল, “ঠিক করছ। যাই হোক, তোমাকে তো সাম্যদীপের সমস্যার কথা সবই বলেছি। এবার দেখো যদি কিছু করা যায়।”

একজন অপরিচিত কমবয়সি মেয়ের সামনে প্রসঙ্গটা ওঠায় সাম্যদীপ লজ্জা পেল। বলল, “সে ঠিক আছে।”

মধুমঞ্জরী বসেছে সাম্যদীপের উল্টো দিকের সোফায়। বলল, “আমি অরুণাভদার কাছে সবটা শুনেছি। সব ঠিকই তো আছে। যেটুকু নেই,

আমি শুধু সেটুকুই আপনাকে দেখিয়ে দেব।”

অরুণাভ এবার ফট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “মধুমঞ্জরী, আমি উঠলাম। যাদবপুরে একজনের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরতে হবে। রাত হয়ে যাবে। মেঘ করেছে দেখলাম, ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। ভদ্রলোক আটকে পড়বেন।”

সাম্যদীপ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “সে কী! তুই চলে গেলে কী করে হবে?”

অরুণাভ হেসে বলল, “আমি থাকব কেন? কথা তো ও আমার সঙ্গে বলবে না, তোর সঙ্গে বলবে। আমাকে থাকতেও দেবে না।”

সাম্যদীপ বলল, “তাহলে তুই একটু অপেক্ষা কর বাইরে। আমি সেরে নিই।”

মধুমঞ্জরী এবার হাসতে শুরু করল। একটু হাসি নয়, বেদম হাসি। হাসতে হাসতে মুখে হাত চাপা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল। শরীর কঁপে উঠতে লাগল। সাম্যদীপ থতমত খেয়ে গেল। অরুণাভ বিরক্ত মুখে ইঙ্গিতে রাগ দেখাল সাম্যদীপকে। একসময় মধুমঞ্জরী সোজা হয়ে বসে, এক হাত বুকের ওপর রেখে, অন্য হাতে চোখ মুছতে মুছতে বলল, “উফ বাবা, হাসতে হাসতে চোখে জল চলে এসেছে। সাম্যদীপবাবু, আপনাকে চোদ্দো বছরের কিশোর বলে মনে হচ্ছে। আপনি ট্রিটমেন্ট করতে এসে, মহিলা দেখে এমন লজ্জা পেয়ে গিয়েছেন যে পালাতে চাইছেন!” কথাটা বলে আবার হাসতে শুরু করে মধুমঞ্জরী। একই রকমভাবে মুখে হাত চাপা দিয়ে, এবার ঝুঁকে পড়ে নয়, সোফায় পিঠে হেলান দিয়ে, মাথা পিছনে নিয়ে। খানিকটা হাসার পর সোজা হয়ে বলল, “অরুণাভদা, তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়ে যাও। এত ছেলেমানুষের বড়মানুষি অসুখ আমি সারাতে পারব না। কাউন্সেলিং, এক্সারসাইজে কিছু হবে না। তোমার পাঠানো ফিজি আমি রিটার্ন করে দিচ্ছি।” তারপর সাম্যদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, “তবে একটা কথা বলে দিই, আপনার অসুখ কিন্তু ধরে ফেলেছি। মনে হয়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঠিক করে নিতে পারবেন।”

অরুণাভ বিরক্ত গলায় বলল, “থাক, অসুখ ধরে লাভ নেই মধুমঞ্জরী। ওকে আমি নিয়েই যাচ্ছি, পেশেন্টের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো কিছু করা যাবে না। চল সাম্যদীপ।”

সাম্যদীপ মাথা নামিয়ে বলল, “আমি আছি। একটা ক্যাবট্যাব নিয়ে চলে যাব, তুই যা অরুণাভ। নো প্রবলেম।”

অরুণাভকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে মধুমঞ্জরী সাম্যদীপের মুখোমুখি এসে বসল। হেসে বলল, “অনেক হয়েছে, এবার রিল্যাক্স করুন দেখি।”

“আমি ঠিকই আছি।”

“কোথায় ঠিক আছেন? এমন গুটিয়েসুটিয়ে রয়েছেন যে, দেখে মনে হচ্ছে, আপনাকে একটু পরেই ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হবে। ভিতরের ঘরে তার ব্যবস্থা চলছে।”

সাম্যদীপ হেসে বলল, “না না, তেমন ভাবছি না।”

মধুমঞ্জরী গলা নামিয়ে বলল, “দেখুন সাম্যদীপ, গোড়াতেই বলে রাখি, আমি কোনও চিকিৎসক নই। কিছুটা কথা আর কিছুটা কাজ দিয়ে এই ধরনের সমস্যা সামলানোর চেষ্টা করি। আপনি যদি রাজি থাকেন, হাত তুলুন।”

সাম্যদীপ হেসে ফেলে ডান হাতটা একটু তুলে বলল, “কাজটা কেমন জানতে পারি কি?”

মধুমঞ্জরী বলল, “তাড়াছড়োর কী আছে? অবশ্যই জানতে পারবেন।”

সাম্যদীপ বলল, “অনেকদিন পরে স্কুলের মতো হাত তুললাম।”

মধুমঞ্জরী হেসে বলল, “গুড বয়। এরপর আমার কথার অমান্য করলে কিন্তু স্কুলের মতো পানিশমেন্ট পাবেন। দাঁড়ান ঘরের লাইটগুলো একটু কমিয়ে দিই, চোখে লাগছে।”

একটু না, বেশ অনেকটাই আলো কমিয়ে দিয়ে এল মধুমঞ্জরী। শুধু আলো নয়, মিউজিক সিস্টেমে বাজনাও চালিয়ে দিয়েছে। নিচু ভলিউমে সেতার বাজছে। ঘরের চড়া ভাব কেটে এক স্নিগ্ধ, মায়াময় পরিবেশ তৈরি

হয়েছে। পরিবেশ এমন চমৎকার হবে একটু আগেও ভাবতে পারেনি সাম্যদীপ। কাউন্সেলরদের ভাল কথা বলতে হয়, মধুমঞ্জরী নামের এই মেয়েটির কথা ‘ভাল’ ছাড়াও আরও বেশি কিছু। সাম্যদীপ বুঝতে পারল, সে সহজ হয়ে যাচ্ছে, জড়তা কেটে যাচ্ছে। মধুমঞ্জরীও সহজ। এতক্ষণ যেভাবে গায়ে শাড়ি জড়িয়ে বসেছিল, এবার তা সরিয়ে দিয়েছে। উন্মুক্ত গলা, কাঁধ, হাত। সে ফর্সা নয়, আবার কালোও নয়, গায়ে সদ্য বাদামি রং ধরেছে যেন।

“সাম্যদীপ, আপনি চাকরি ছাড়া আর কী করেন?”

সাম্যদীপ একটু থতমত খেয়ে বলেন, “চাকরি ছাড়া? কই তেমন তো কিছু করি না।”

মধুমঞ্জরী বলল, “কেন, সংসার?”

সাম্যদীপ একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল, “তা খানিকটা... যদিও এই মুহূর্তে আমার মিসেস...”

মধুমঞ্জরী বলল, “আপনার স্ত্রীর কথা অরুণাভদার কাছে শুনেছি। বুদ্ধিমতী, সুন্দরী।”

সাম্যদীপ একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল, “উজ্জয়িনী খুব ভাল মেয়ে। আমি ওর জন্য উপযুক্ত নই।”

মধুমঞ্জরী প্রসঙ্গ পাটে বলল, “কী রাগ বাজছে বলতে পারেন? সন্ধেবেলার রাগ।”

সাম্যদীপ একটু সঙ্কুচিত হয়েই বলল, “আমি ঠিক অত রাগ-রাগিণী জানি না।”

মধুমঞ্জরী বলল, “আমিও যে জানি, এমন ভাববেন না। তবে এটা জানি। শ্রী রাগ। কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন, সামান্য ক’টা ধাতব তার দিয়ে কী মধুর সঙ্গীত তৈরি হয়েছে! এই কারণে স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট, মানে তারের বাদ্যযন্ত্র দেখলেই আমি বিম্মিত হই।”

সাম্যদীপ বলল, “আমার এক মামা, ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের সমঝদার ছিলেন। সরোদ বাজাতেন।”

মধুমঞ্জরী উৎসাহী হয়ে বলল, “তাহলে তো আপনার রক্তের কোথাও না কোথাও এই গানবাজনা লুকিয়ে রয়েছে।”

সাম্যদীপ হেসে বলল, “কী যে বলেন। আমি হারমোনিয়ামে প্যাঁ-পোঁ পর্যন্ত করতে পারি না।”

কথা যত এগোতে লাগল সাম্যদীপের ভাল লাগা তত বাড়তে লাগল। কী কারণে এসেছে, তা যেন ভুলেই গেল সে। মনে হচ্ছে, এখানে আসার কথাই ছিল তার। অনেকদিন পর পুরনো এক পরিচিতের কাছে এসে পড়েছে। একবারও মনে হচ্ছে না, মেয়েটি পেশাদার। নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে জটিল সমস্যার সমাধান করে। করে? নাকি সমাধানের পথ দেখায়? কলকাতা শহরে যে এত রকমের ব্যবস্থা রয়েছে, কে জানত? অরুণাভ শুধু হাতুড়েই চেনে না, আধুনিক বন্দোবস্তের খবরও রাখে। এক সময় ডোরবেল বাজলে মধুমঞ্জরী উঠে গিয়ে খাবারের প্যাকেট নিয়ে এল। কখন যেন অনলাইনে অর্ডার করে রেখেছে। ওয়াইনের গ্লাস আর প্লেট নিয়ে এসে বলল, “টেবিলে আসুন খেতে খেতে কথা বলি।”

সোফা ছেড়ে ঘরের একপাশের ডাইনিং টেবিলের কাছে এসে সাম্যদীপ সঙ্কোচে বলল, “এত আনালেন কেন?”

মধুমঞ্জরী গম্ভীর মুখে বলল, “ফাঁসির খাওয়া বলে বেশি করে অর্ডার দিয়েছিলাম। চিন্তা করবেন না, খাদ্য আর পানীয় দুটোর দামই ফিল্ডের মধ্যে ধরা আছে।”

অবাকই হল সাম্যদীপ। সত্যি এতটা হিসেব করেছে? অবশ্য করবে না-ই বা কেন? সবাই হিসেব করে। যে শরীর সারাতে চায়, সে-ও যেমন হিসেব করে, যে শরীর চেনায় সে-ও তো ছাড়ে না। এতগুলো মর্গে ঘোরার সময় কম টাকা তো খরচ করতে হল না।

“সে কথা বলছি না। ক’দিন ধরে আমি কম খাচ্ছি। মনে হয় অরুচি ধরনের কিছু হয়েছে।”

মধুমঞ্জরী খাবার দিতে-দিতে বলল, “ওসব কিছু নয়, মন খারাপ। শরীর ঠিক না থাকলে মন তো খারাপ হবেই। যতটা পারবেন, ততটাই খান। জোর করার কিছু নেই। সাম্যদীপ, শরীরকে জোর করলেই

গোলমাল বাধে। কিছু কিছু সময় তাকে তার মতো ছেড়ে দিতে হয়। কীভাবে সে রিঅ্যাক্ট করবে, তাকে বুঝতে দেওয়াই ভাল। চিকেনটা একটু ট্রাই করতে পারেন। ওয়াইন খাচ্ছেন না কেন? অভ্যেস নেই?”

সাম্যদীপ বলল, “নেই, তবে আজ একটু খেতে পারি।”

আনাড়ির মতো ওয়াইনের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল সাম্যদীপ। মুচকি হেসে মধুমঞ্জরী বলল, “এটাই আপনার মেডিসিন। শরীরের ইচ্ছেকে মূল্য দিলেন। সে যা চাইল, তাকে করতে দিলেন। বাধা দিলে মুশকিল হত।”

ওয়াইন খেতে সাম্যদীপের খারাপ লাগল না। মদ্যপান সে করে না, করতে চায়ও না। আজ পরিস্থিতি তাকে একটু বেসামাল করছে। মধুমঞ্জরী কি শরীরের ইচ্ছে বলতে, এটাই বলতে চাইল? আবার গ্লাস তুলে লম্বা চুমুক। পর পর বেশ কয়েকটা চুমুকে গ্লাস প্রায় শেষ হয়ে গেল। দেখে মুচকি হাসল মধুমঞ্জরী।

সাম্যদীপ বলল, “তাই বলে শরীরকে নিজের ইচ্ছেমতো চলতেও তো দেওয়া যায় না। তাহলে তো সব এলোমেলো হয়ে যাবে।”

মধুমঞ্জরী হেসে বলল, “ঠিকই তো। আপনার হাত যদি বলে আমাকে এখন ঘুসি মারবে, তাকে কি আপনি অ্যালাও করবেন?”

সাম্যদীপের মাথা কেমন বিমবিম লাগছে, হালকাও। হাত-পাগুলো কেমন যেন শিথিল। ওয়াইনে কি এমন লাগে? গ্লাসের বাকিটুকুও মুখে ঢেলে, জিভ কেটে বলল, “ছি ছি, আপনি কী যে বলেন মধুমঞ্জরী, আমার হাত খামোখা আপনাকে ঘুসি মারতে চাইবে কেন? হাত তো আমারই। তার চাওয়া, না-চাওয়ার মধ্যে আমার মনের তো একটা প্রভাব থাকে। তাই না?”

মধুমঞ্জরী বোতল থেকে আরও খানিকটা ওয়াইন সাম্যদীপের সুদৃশ্য শূন্যগ্লাসে ঢেলে দিতে দিতে বলল, “বেশ বুঝলাম, ঘুসি মারতে দেবেন না, তবে আপনার হাত যদি এখন আমার হাত ধরতে চায়, অ্যালাও করবেন?”

সাম্যদীপ নার্ভাস হেসে বলল, “আপনি যে কী সব বলেন...”

কথাটা বলেই ফের গ্লাসে চুমুক দিল সাম্যদীপ। মধুমঞ্জরী খাওয়া শেষ করেছে। কোলের ওপর পাটা ন্যাপকিন তুলে মুখ মুছতে গেলে তার শাড়ির আঁচল পড়ে গেল। চোখ পড়ল সাম্যদীপের। বুকের বেশ খানিকটা নীচে নেমে ব্লাউজ শুরু হয়েছে তার। ফলে বুকের কিছুটা দেখতে পেল সে। স্তন তো নয়, জামার ভিতর দুটি ছোট্ট ডেউ যেন চলে গিয়েছে দু'দিকে। তীরে পৌঁছে ভেঙে পড়ার জন্য তারা ব্যস্ত। মাঝবরাবর তটরেখা, গভীর ও রহস্যময়। কম আলোতে এই দৃশ্য চকিতে এতটাই মায়ী তৈরি করে যে, সাম্যদীপ চোখ ফেরাতে পারে না। মধুমঞ্জরী হঠাৎ ধমকে যাওয়া সাম্যদীপের চোখ অনুসরণ করে ঘাড় নিচু করে নিজের আঁচল খসা বুকের দিকে তাকায়, আঁচল নিজের জায়গায় না ফিরিয়ে ঠোঁটের কোনে মুচকি হেসে বলে, “কই সাম্যদীপ, বললেন না তো, আপনার হাত যদি ঘুসির বদলে আদর করতে চায়, রাজি হবেন?”

চমকে উঠে চোখ ফেরায় সাম্যদীপ। দ্রুত গ্লাসে চুমুক দেয়। কান গরম। মদ্যপানের কারণে? নাকি মধুমঞ্জরীর শরীর? কেন হবে? এই প্রথম তো সে নারীশরীর দেখছে না। উজ্জয়িনীকে দেখেছে বারবার। মুগ্ধ হয়েছে, উত্তেজিতও। সে শরীর তো পুরনো হয়নি। শেষদিনও যখন রাতে জামাকাপড় খুলে এসেছিল সে, মনে হয়েছিল, তার গলা, বুক, পেট, উরু এই প্রথম দেখাছে সে। আগের দিন যদি পেনসিলে আঁকা হয়, আজ তাতে রং পড়েছে। তবে আজ মধুমঞ্জরীর এইটুকুতেও ভাল লাগছে কেন? সাম্যদীপ কোনও রকমে বলল, “হাত যদি এমন কিছু চায় যা আপনার জন্য অপমানের হবে, তাকে আমি অনুমতি দিই কী করে?”

“বাঃ, আপনি তো চমৎকার করে ভাবতে পারেন। আপনি একজন যুক্তিসম্পন্ন মানুষ। আজকাল এরকম সহজে পাওয়া যায় না।”

আঁচল কোলের ওপর রেখে সংক্ষিপ্ত জামায় মধুমঞ্জরী এক অতি স্বল্পপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এত স্বচ্ছন্দে কথা বলছে যে, মনে হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক। গ্লাসে চুমুক দিয়ে সাম্যদীপ বোঝবার চেষ্টা করল, এই সুন্দরী কি তাকে সিডিউস করতে চায়? সেই কারণে এভাবে আবার

সরিয়ে ফেলেছে? শরীর কী আশ্চর্য! মর্গে, দুর্গন্ধে, অন্ধকারে যখন শুয়ে থাকে, ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়, কাপড় সরালে এক বলক তাকিয়েই ছুটে পালিয়ে যেতে হয়। আবারও উন্মোচন সেখানে ভয়াবহ। অথচ সঙ্গীত, আলোয় সাজানো ঘরে, সুগন্ধে, খাদ্য-পানীয়ে আপ্যায়নে সেই শরীর হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে। আবারও সরে গেলে চোখ সরতে চায় না। যতই পরিবেশে, চেহারায়ে তফাত থাক, দুটোই তো শরীর, যতই ক্ষতবিক্ষত, পচন-ধরা হোক না কেন, মানুষকে তো তার কাছেও যেতে হয়। প্রয়োজনেই যেতে হয়। যেমন, সাম্যদীপ মর্গে গিয়েছে পাঞ্চালীকে চিনতে, এখানেও এসেছে মধুমঞ্জরীর কাছে। অনুরোধ করতে পারে, জোর তো করেনি কেউ, নিজের ইচ্ছেতেই তো এই আসা। কিছুদিন আগে নারীশরীর দেখে তীব্র বিবমিষা হয়েছিল, ছুটে গিয়ে নর্দমার পাশে উবু হয়ে বসেছিল। আর আজ? ঠিক উল্টো। সামান্য আভাসেই ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছে ছুঁয়ে দেখে, ওই শরীর, ওই বুক তাকে চেনে কিনা।

মধুমঞ্জরী ঠোঁট টিপে হেসে বলল, “আর যদি অসম্মানের না হয়? একটা শরীর যদি আর-একটা শরীরের আশা করে থাকে? তাহলে কী করবেন সাম্যদীপ?”

“তাহলে তো সমস্যাই নেই।”

মধুমঞ্জরীর নড়াচড়ায় কম আলোতেও তার আঁচলহীন বুক বলসে-বলসে উঠছে। যেন ঢাল-তরবারি নিয়ে সে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে, এখনও রণভূমিতে আসেনি, যে-কোনও সময় এসে পড়বে।

মধুমঞ্জরী বলল, “না, কথাটা ঠিক নয়, সমস্যা আছে। শরীর আসলে দুটো। শরীরের ভিতর আর-একটা শরীর থাকে। আমরা তাকে জানতে চাই না। বাইরের শরীর চাইলেও ভিতরের শরীর কি আপনার কামনা বাসনায়, অন্য শরীরের হাতছানিতে সাড়া দিতে চাইছে? যে হরমোন আপনার বাইরের শরীর ও মনকে উত্তেজিত করেছে, তাকে ভিতরের শরীর কি মেনে নিল? না নিলে সমস্যা।”

এই মেয়ে যে এক অদ্ভুত কথা বলছে। এক শরীরের ভিতর অন্য আর-এক শরীর থাকে? এমন তো সে কখনও শোনেনি। তার, উজ্জয়িনীর, পাঞ্চালী রায়ের দুটো শরীর! নীলকণ্ঠ সেনেরও?

মধুমঞ্জরী সামান্য হেসে বলল, “কথাটা জটিল হয়ে গেল?”

গ্লাস শেষ করে সাম্যদীপ বুঝতে পারল তার বিমবিমানিভাব বেড়ে গিয়েছে অনেক। আরও ভাল লাগছে। কথা বলতে গিয়ে বুঝল, জিভ জড়িয়েছে।

“মনে হচ্ছে, আমি আগেও এরকম কথা শুনেছি কোথাও। শরীরের ভিতর আর একটা শরীরের কথা। হয়তো শুনি, ভেবেছি,” একটু থামল সাম্যদীপ। খানিকটা অসহায়ভাবে বলল, “মধুমঞ্জরী, এটাই কি আমার সমস্যা? ভিতর থেকে কেউ বাধা দেয়? সেই শরীর? এক শরীর কাছে গেলেও আর-একজন টেনে আনে? অথচ উজ্জয়িনী একজন ভাল আর সুন্দর মেয়ে। তার শরীর যেমন উত্তেজনার, তেমন নিখুঁত, আমি সেই শরীর চাইছি... কেন পারছি না?”

মধুমঞ্জরী চেয়ার ঠেলে উঠে এল। একহাতে খাবার শেষ হয়ে যাওয়া প্লেট আর পানীয় শেষ হওয়া গ্লাস। সাম্যদীপের কাছে এসে দাঁড়াল, একেবারে গা ঘেঁষে। সাম্যদীপের মনে হল ছোঁয়া লাগছে। হেসে বলল, “পারবেন, নিশ্চয়ই পারবেন। আগে একটা কাজ করুন দেখি, আঁচলটাকে আমার কাঁধে তুলে দিন। দুটো হাতই আটকা।”

আলতো জামায় ঢাকা স্তন, অনাবৃত সরু কোমর, পেট, নাভি—সাম্যদীপের মাথা এলোমেলো করে দিল। উচ্ছল এই মেয়ের শরীরও উচ্ছল, হাসছে। উজ্জয়িনীও কি এমন মাথা এলোমেলো করে দেয় না? দেয়ই তো।

“কী হল? আঁচলটা তুলুন। নাকি হাত বারণ করছে? বলছে, থাক এই মেয়ে এমনই থাক।”

খিলখিল আওয়াজ করে হেসে উঠল মধুমঞ্জরী। চেয়ারে বসেই খানিকটা ঘুরে কাঁপা হাতে আঁচলটা তুলল সাম্যদীপ, কাঁধের ওপর এলোমেলো করে রাখতে গিয়ে, বুকে ছোঁয়া লাগলে শরীর ঝনঝনি

উঠল, আর তখনই দুদাড়ি আওয়াজে ভিতরের ঘরে কোথাও জানলার কপাট পড়ার আওয়াজ হল। ছিটকে সরে গেল মধুমঞ্জরী।

“এই রে, নিশ্চয়ই বাড়ি উঠেছে। জানলা খোলা রয়েছে।”

হাতের গ্লেট, গ্লাস টেবিলে রেখে এক রকম ছুটল মধুমঞ্জরী। ঠিকই, বাড়ি উঠেছে। এসি চলছে বলে বসার ঘরের জানলা সবই বন্ধ। তবে বাপটার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এক দিকের জানলার বাইরে কোনও একটা আলো দুলছে। অন্যদিন হলে সাম্যদীপের চিন্তা হত। বাড়বুষ্টির মধ্যে বাড়ি ফেরার চিন্তা তো হবেই।

মিনিট দেশের মধ্যেই ঘরে ফিরে এল মধুমঞ্জরী। গুনগুন করে গানও করছে। মুখ ফিরিয়ে চমকে উঠল সাম্যদীপ। পোশাক বদলেছে, রংও। ট্র্যাকসুট ধরনের কালো পোশাক। নীচে দড়ি বাঁধা ট্রাউজার্স, ওপরে ফুলহাতা জ্যাকেট। জ্যাকেটের ভিতর নেভি ব্লু গেঞ্জি। চুলটাও টেনে খোঁপা করেছে মাথার ওপর। যেমন ঝকঝকে লাগছে, তেমন স্মার্ট। মনে হচ্ছে, ব্যাডমিন্টন বা টেনিস খেলে এল।

“শ্রী রাগ তো শেষ হয়েছে। একটা বর্ষার গান বাজাব নাকি? বাইরে কিন্তু বৃষ্টি নেমেছে।”

যে-সাম্যদীপ উজ্জয়িনীর সঙ্গে আলাপের আগে পর্যন্ত মেয়েদের এড়িয়েই এসেছে, সে বলেই ফেলল, “আপনাকে ভারী সুন্দর লাগছে মধুমঞ্জরী।”

মধুমঞ্জরী একটু ঝুঁকে বৃকে হাত রেখে বলল, “আমি ধন্য। কিন্তু এবার যে আপনাকে একটু উঠতে হবে সাম্যদীপবাবু। মুখে যা বলার আমার আজকের মতো বলা হয়ে গিয়েছে। এবার কতগুলো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ দেখিয়ে দেব। ব্যস, তাহলেই আজ আপনার ছুটি।”

সাম্যদীপ চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে হালকা টাল খেল। ভুরু কঁচকে গেল সাম্যদীপের। একেই কি নেশা হওয়া বলে? হলে হবে। তবে তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা অন্য। খানিক আগেই আঁচলহীন বৃকের আভাসে মুগ্ধ করেছে যে-মেয়ে, উত্তেজিত করেছে, এখন ফুলহাতা জ্যাকেট পরেও সে একই ভাবে আকর্ষণ করছে কীভাবে! বেশিই করছে। এ-ও কি তবে শরীরের নানা খেলার একটা? আড়ালে থেকেও সে নিজেকে দেখায়? ভেবে লজ্জা পেল সাম্যদীপ। ছিঃ, এমন সব কথা মনে আসছে কেন? টলমল পা সামলে উঠে দাঁড়াল সে।

মধুমঞ্জরী বলল, “এবার কিন্তু সোফায় নয়, আসুন, আমরা ডিভানে গিয়ে বসি।”

“আপনার কথা হয়ে গিয়েছে বললেন? কই তেমন কিছু শুনলাম না তো।”

মধুমঞ্জরী বলল, “নিশ্চয়ই শুনেছেন। ওই যে বললাম, ভিতরের শরীরটাকে রাজি হতে হবে। নইলে সমস্যা।”

সাম্যদীপ বলল, “কীভাবে রাজি করাব?”

মধুমঞ্জরী এগিয়ে এসে একটা হাত ধরল সাম্যদীপের। বলল, “আপনাকে করতে হবে না, সে নিজেই রাজি হবে।”

ডিভানে বসতে বসতে সাম্যদীপ নিচু গলায় বলল, “কবে?”

মধুমঞ্জরী সাম্যদীপের দুটো কাঁধে হাত রেখে বৃকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, “খুব তাড়াতাড়ি, খুউব...”

ঠিক এই সময়ে আচমকা এমন এক কাণ্ড করল সাম্যদীপ যা একমুহূর্ত আগেও সে ভাবেনি। মধুমঞ্জরীকে টেনে নিল নিজের শরীরে। ঘটনাটা বড়ের মতো হুড়মুড়িয়ে এল যেন, আছড়ে পড়ল বন্ধ জানলায়। আর মধুমঞ্জরী? সে কি জানত? যদি না জানত, সাম্যদীপের টেনে নেওয়ায় বাধা দিল না কেন? শুধু টেনে নেওয়া তো নয়, অনভ্যস্ত হাতে সাম্যদীপ যখন তার জ্যাকেট খুলছে, ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি কেন তার? সংক্ষিপ্ত স্নিভলেস গেঞ্জিতে আঙনের মতো জ্বলতে থাকে মেয়েটা। কোনও রকমে যেন বৃকটুকু ঢেকে রেখেছে। সাম্যদীপ আঙনে ঝাঁপানোর জন্য খেপে উঠল। গেঞ্জি খুলতে চাইলে আত্মসমর্পণ করার চণ্ডে দুই নগ্ন হাত তুলে দিল মধুমঞ্জরী। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে সাম্যদীপের। সে অবাক হয়ে দেখল, মধুমঞ্জরীর বৃকে আলতো লেগে-থাকা অন্তর্বাসের রংটিও সবুজ। দুই কাঁধ থেকে খামচে সরু স্ট্রাপ নামাতে সময় নিল না, পিঠের

ছক খুলল টেনে। মধুমঞ্জরীর সাহায্য নেই, বাধাও নেই। ঘরের মায়াবী আলোয় দুটি ভরা স্তন নদীর জল থেকে মাথা তুলে ভেসে উঠেছে যেন। জলকণার মতো তাদের গায়ে লেগে রয়েছে কামনা, স্তনবৃত্ত থেকে বারেও পড়ছে। এবার উজ্জয়িনীকে দেখতে পেল সাম্যদীপ। মিল নেই, উজ্জয়িনী আরও উদ্বৃত্ত, আর উদ্দাম। মধুমঞ্জরীর মতো আদুল গায়ে এমন চুপ করে বসে থাকার পাত্রী নয় সে। শুরুতেই ঝাঁপিয়ে, কামড়ে, আঁচড়ে জাগিয়ে রাখতে চায়। আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য, সাম্যদীপ মধুমঞ্জরীর শরীরে দেখতে পেল পাঞ্চালীকেও। বরফের ট্রেতে শুয়ে-থাকা তার নগ্ন শরীর শীতল ও শান্ত। না-পাওয়া পুরুষদেহের সুখ ও তৃপ্তিকে যত্নে রেখে দিয়েছে নীল হয়ে যাওয়া, মাছি বসা ঠোঁটের কোনায়, বেদনার হাসিতে। রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে সে। তিন নারীর নগ্ন শরীর তিন রকম। সেটাই স্বাভাবিক। তারপরেও যেন এক! না হলে এত চেনা লাগছে কেন? তবে কি শরীরের ভিতরে থাকা তার অন্য শরীর সাড়া দিতে শুরু করেছে? বৃক ধক করে ওঠে সাম্যদীপের। সত্যি? মধুমঞ্জরীর মাথার পিছনটা ধরে এক হাতে তার মুখ টেনে নামায় নিজের মুখের ওপর, ওয়াইনে কষটে যাওয়া ঠোঁট চেপে ধরে লিপস্টিকের ওপরই। অন্য হাত রাখে মধুমঞ্জরীর ট্রাউজার্সে, মুক্ত করতে থাকে। চুমু নিতে নিতে এতক্ষণে এগিয়ে আসে মধুমঞ্জরী। সাম্যদীপের জামা, জিনসের বোতামে হাত রাখে নিখুঁত হিসেবে। খুলতে থাকে কোনও ভুল না করে। চড়াই-উতরাই ধরে সাম্যদীপের হাত, মুখ, পায়ের পাতা মধুমঞ্জরীর গোটা শরীরে ঘুরতে থাকে। রমণ-পূর্বের আদর চলতে থাকে কোমলতা ও কাঠিন্যে। এতদিন পর নিজের শরীরের ভিতরে আর-একটা শরীরকে খুঁজে পেয়ে আত্মহারা সাম্যদীপ। কখনও বসে, কখনও ডিভানে গড়িয়ে পড়ে। একসময়ে শুয়ে-পড়া মধুমঞ্জরীর শরীরের ওপর উঠে বসে সাম্যদীপ। এই প্রথম বৃকতে পারে, সে প্রস্তুত, সে পারবে। ভিতরের শরীর বাইরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। দুই শরীর চরম সুখে যাওয়ার আগে মুখোমুখি হয়েছে। ঠিক এই সময়ে মধুমঞ্জরী এক আত্মত্যাগ আচরণ করে বসল। ধাক্কা দিয়ে নিজের ওপর থেকে সরিয়ে দিল সাম্যদীপকে। তারপর লাফিয়ে উঠে বসে হাতড়ে টেনে নিল এলোমেলো পড়ে থাকা পোশাক।

চাদরে, তাকিয়ায় নিজেকে কোনও রকমে আড়াল করতে করতে সাম্যদীপ আত্ননাদ করে ওঠে, “কী হল? কী হল তোমার? আর একটু, প্লিজ আর-একটু মধুমঞ্জরী...”

অন্তর্বাস পরতে পরতে সহজ গলায় মধুমঞ্জরী বলে, “এই পর্যন্ত আমার কাজ, এর পরেরটুকু নয়। চরম মুহূর্তে সরে আসার যন্ত্রণাটুকু আপনার ভিতরের শরীরকে একটু বুঝতে দিন সাম্যদীপ। জানেন তো, সঙ্গমের সময় সাপ বাধা পেলে ভয়ঙ্কর, ছোবল মারে। কে জানে আপনার ভিতরের শরীর বাইরেকে এখন ছোবল দিচ্ছে কিনা। দিলে ভাল, সেটাই আপনার চিকিৎসা।”

সাম্যদীপ আবার বলে ওঠে, “একটু সময় দাও, আমি পারব মধুমঞ্জরী, আমি বুঝতে পারছি, এবার আমি পারব...বাধা কেটেছে, ভিতরের শরীরের কথা বুঝতে পেরেছি, প্লিজ, মধুমঞ্জরী...”

ট্রাউজার্সে পা গলিয়ে মধুমঞ্জরী বলল, “আপনি কী বুঝেছেন আমাকে প্রমাণ দেওয়ার দরকার নেই। যেখানে দরকার সেখানে জানানো উচিত। আমার ফিজ কেন বেশি, সেটা নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পেরেছেন।” একটু থেমে, একটু হেসে মধুমঞ্জরী বলল, “বিশ্বাস হচ্ছে না তো? না হোক, দুনিয়ায় সব কিছু সবাইকে বিশ্বাস করতে হবে, এমন কথা কে বলেছে? ড্রেস করে নিন সাম্যদীপ, তারপর গুডনাইট বলে বেরিয়ে পড়ুন। আমার ঘুমোবার সময় পেরিয়ে গেছে। চিন্তা নেই, ক্যাব পেয়ে যাবেন। ও, আর একটা কথা, আমাকে আপনি সম্বোধন করাটাই আমি পছন্দ করব। যদিও মনে হয় না, আমার সঙ্গে আপনার আর কথা বলার প্রয়োজন হবে।”

ফুটপাথে যখন পা রাখল সাম্যদীপ তখন বাড়বুষ্টি চলে গেলেও, একটু ঠান্ডা বাতাস, সেই বাতাসে একটু জলকণা রেখে গিয়েছে। সাম্যদীপ বুঝতে পারল, তার মাথার মধ্যে আর কোনও ঝিম ভাব নেই, বরং একটা হালকা আনন্দ হচ্ছে। মধুমঞ্জরী নামের এক অবিশ্বাস্য নারীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দ। উল্টোডাঙা পর্যন্ত হেঁটে গেলে কেমন হয়?

রাতের কলকাতায় কোনও দিন হাঁটা হয়নি। বেশ হবে, নিশ্চয়ই নানা অবিশ্বাস্য ঘটনাও দেখতে পাবে। আজকের সন্দের মতো।

খানিকটা যেতে না যেতে পকেটের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। কানে দিতে ওপাশ থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠ।

বারো

“সরি, ফোন করতে বেশি রাত হয়ে গেলা।”

বিস্মিত সাম্যদীপ ভয় পাওয়া গলায় বলল, “কোনও বিপদ হয়েছে উজ্জয়িনী?”

ফোনের ওপাশে উজ্জয়িনী একটু থমকে থেকে শান্তভাবে বলল, “না সেসব নয়। তোমাকে একটা জরুরি কথা বলব বলে ফোন করেছি। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সাম্যদীপ। সিদ্ধান্তটা নিতে সময় লাগল, তাই ফোন করতেও দেরি।” একটু থামল উজ্জয়িনী। বলল, “আজ বিকেলে আমি উকিলের সঙ্গে দেখা করেছি। উনি ডিভোর্স মামলার দ্রুত সেটলমেন্ট করেন।”

সাম্যদীপ থমকে দাঁড়িয়েছে ফুটপাথের একপাশে। পথে মানুষ নেই বললেই চলে। অনেক রাত, তার ওপর খানিক আগে বাড়বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। কে আর এই সময় পথে থাকবে? তবে কলকাতার রাস্তা কখনওই একেবারে ফাঁকা হয়ে যায় না। বাসটাস না থাকলেও ভিজে রাস্তা দিয়ে একটা-দুটো করে গাড়ি চলছে। খানিকটা দূরে ফুটপাথের ওপর ঝড়ে উড়ে-পড়া টিন-দরমার চালা টেনেহিঁচড়ে তোলার চেষ্টা করছে এক চা-দোকানের মালিক। রোগাসোগা চেহারার বয়স্ক মানুষ। অত বড় চালাটাকে সামলাতে পারবে তো?

কথাটা ঠিক বলেছে উজ্জয়িনী। মুরলী পাল ডিভোর্স মামলার জন্য কড়া আইনজীবী। উনি মনে করেন, কেউ যদি সম্পর্ক ভেঙে দিতে আইনের শরণাপন্ন হয়, তাকে সে সুযোগ দেওয়া উচিত। পার্টনারের সঙ্গে বামেলা মিটিয়ে আবার একসঙ্গে থাকতে শুরু করায় তিনি বিশ্বাসী নন। ক্লায়েন্ট তার কাছে আলাদা হতে এসেছে, জোড়া লাগাতে নয়। সুতরাং লড়াই হবে। পূর্বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিলেও স্কুল কামাই করে উজ্জয়িনী আজ একাই গিয়েছিল। সব শুনে মুরলীবাবু বললেন, “সহজ মামলা। পুরুষত্বহীন হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি সেকথা গোপন করে বিয়ে করে, ত্রী তুড়ি মেরে ডিভোর্স পেয়ে যাবে। সঙ্গে হেভি কমপেনসেশন।”

সমস্যা শরীরের, আইনজীবী হলেও মুরলী পাল পুরুষমানুষ, সেই কারণে উজ্জয়িনীর একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। মুরলীবাবু বললেন, “উকিল আর ডাক্তারের কাছে কোনও লজ্জা নেই, লুকনোরও কিছু নেই। আপনি সহজভাবে বলুন। যদি মনে করেন, আমি একজন লেডি অ্যাসিস্ট্যান্টকে ডেকে নিচ্ছি।”

উজ্জয়িনী বলল, “না না। সে সবে দরকার নেই। কিন্তু, আমার স্বামীর সমস্যাটা ঠিক ওইটা নয়। ডাক্তার পরীক্ষায় রিপোর্ট তাই বলছে। পার্টিকুলার একটা মোমেণ্টে পৌঁছেলে ওর রিফিউজাল হয়। তার আগে পর্যন্ত উনি নরমালি রিঅ্যাক্ট করেন।”

মুরলী পাল বললেন, “ওসব রিপোর্ট মিনিংলেস, অর্থহীন। আমাদের কাছে দেখার বিষয় হল, একজন স্বামী তার স্ত্রীকে খাওয়া-পারার মতোই ফিজিক্যালি সাপোর্ট দিতে পারছে কিনা, নাকি সে অক্ষম? কতক্ষণ তিনি স্ত্রীসঙ্গ করেন, কখন বেরিয়ে আসেন, এসব আইনের বিষয় নয়। আমরা ফাইনাল রেজাল্ট দেখাব। আপনি তো সেই রেজাল্টে সন্তুষ্ট নন বলেই আমার কাছে এসেছেন। তাই নয় কি?”

উজ্জয়িনী মাথা নেড়ে সায় দেয়। নিচু গলায় বলে, “কেমন যেন অপমানিত লাগে।”

উকিলবাবু খানিকটা তেড়েফুঁড়ে বলেন, “মান-অপমানের কথা বাদ দিন ম্যাডাম। লড়াই হবে আইনের ধারায়। আমরা বলব, উনি নিজের সমস্যা জেনেও বিয়ে করেছেন। ইট ইজ আ ক্রাইম।”

উজ্জয়িনী বলল, “ও আগে এসব জানত বলে মনে হয় না।”

“আহা, ওসব দেখলে হবে না, আমাদের নালিশ এভাবেই করতে

হবে। তাতে ক্ষতিপূরণটা বেশি পাবেন আপনি।”

উজ্জয়িনী একটু চুপ করে থেকে বলল, “উকিলবাবু, বিষয়টা কোর্টে না তুলে কিছু করা যায় না?”

মুরলী পাল মুখ তুলে ভুরু কৌঁচকালেন।

“মিউচুয়াল বলছেন?”

উজ্জয়িনী উৎসাহ নিয়ে বলল, “হ্যাঁ, বিষয়টা এতটাই ব্যক্তিগত যে, লোক-জানাজানি না হলেই ভাল... সাম্যদীপের ক্ষতি হবে, আমারও... স্কুলের টিচার আমি...”

মুরলী পাল চুপ করে খানিকক্ষণ টেবিলে রাখা কাগজে আঁকিবুঁকি কাটলেন। তারপর বললেন, “বুঝতে পারছি। শরীরের ব্যাপারটা সোসাইটি এখনও সহজভাবে নেয় না। কিন্তু আপনার হাজ্জব্যান্ড মেনে নেবেন তো?”

“কথা বলে দেখতে পারি।”

মুরলীবাবু বললেন, “দেখুন, মিউচুয়াল হলে সেটা রুটিনের মধ্যে পড়বে। আমার খুব একটা কিছু করার নেই। আপনি রেফারেন্সে এসেছেন, সেটাও আমাকে দেখতে হবে। দেখুন কথা বলে, যদি রাজি করাতে পারেন, চট করে হয়ে যাবে।”

বাড়ি ফেরার পর থেকে উজ্জয়িনীর মাথায় কথাটা ঘুরে ফিরে আসছে।

‘চট করে হয়ে যাবে... চট করে হয়ে যাবে... চট করে হয়ে যাবে...’

বই পড়ায়, স্কুলের মেয়েদের পরীক্ষার খাতা দেখায়, স্নানে, খাওয়ায়, ঘর গোছানোর সময়ও কথা গুনগুন করে চলল। দুপুরে একটু চোখ বুজে শুতে চেষ্টা করেছিল উজ্জয়িনী, পারেনি। তীব্র যন্ত্রনায় মাথা চেপে ধরে উঠে বসতে হয়। সেই একই কথা ঘুর পাক খাচ্ছে।

কী চট করে হয়ে যাবে? স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানের সুতোটা ছিঁড়ে যাবে? নাকি সম্পর্কটাই ভেঙে যাবে? নর-নারী সম্পর্কের পুরোটা কি শরীর? বাকি সব শূন্য? ভালবাসা, নির্ভরতা কি গেঁথে থাকে শুধু সন্তোগে? হাত ধরা, চুমু খাওয়া, বুকে মাথা রাখার কোনও মূল্য নেই? যদি না-ই থাকে, এককাল ধরে মানুষ ভালবাসার জন্য হন্যে হয়ে থাকে কেন? কেন একটা চুমুর জন্য অপেক্ষা করে থাকে দিনের পর দিন? কেন একবার চোখে দেখতে মাইলের পর মাইল হাঁটে যায়? যদি সন্তোগই সব, আসল, তাহলে যৌনাচারের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় গেলেই তো হয়। ফোন করে ডাকলে অর্থের বিনিময়ে মহিলা, পুরুষ চলে আসে। একসময় না পেরে পূর্বাক্ষে ফোন করে বসে উজ্জয়িনী। কড়া গলায় ধমক দেয় পূর্বা।

“এসব ন্যাকামির কথা বন্ধ কর উজ্জয়িনী। স্টপ ইট। তুই তো কাল পর্যন্তও ডিটারমাইন্ড ছিলি। হঠাৎ কী হল? ন্যাকামি নিয়ে গোটা জীবনটা চালাতে পারবি তো? দেখবি একদিন আফসোস ছাড়া কিছু থাকবে না। তুই বড়ি হয়ে যাসনি উজ্জয়িনী যে, বড়ো স্বামীর মুখোমুখি বসে, একে অপরকে ওষুধ খাইয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিবি। তোর জীবনের গোটা সাধ-আত্মদটাই পড়ে রয়েছে। অনেকেবার বলেছি, ভাল লইয়ার পর্যন্ত ঠিক করে দিলাম, আর কিছু বলব না। নাউ ইয়োর ডিসিশন, তুই সিদ্ধান্ত নিবি। ওই ছেলের সঙ্গে তোর প্রেম ক’দিনের হয়েছিল? হাতেগোনা কটা দিন। ওটা প্রেম ছিল নাকি? মুরলী পাল তো ঠিকই বলেছেন, চট করে হয়ে যাবে। আজই সাম্যদীপকে ফোন কর, তাকে রাজি করা।”

বান্ধবীর যুক্তি কাটতে পারে না উজ্জয়িনী। সে নিজেই বোঝাতে থাকে, পূর্বাই ঠিক বলছে। একসময় বৃষ্টি নামে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাঁটে ভজে। মনে হয়, খানিকটা কেঁদেও নেয়। বৃষ্টির জন্য চোখের জল আলাদা করা যায় না। বৃষ্টি ধরে আসতেই ফোন আসে শাশুড়ির। চমকে ওঠে উজ্জয়িনী। এই মহিলা তাকে ফোন করছেন!

“বলুন।”

রানি ভাঙা গলায় বললেন, “উজ্জয়িনী, খুব অল্প কথা বলব। আশা করি, তুমি মন দিয়ে শুনবে। আমি ঠিক করেছি, নীলকণ্ঠ সেন এবং সাম্যর সঙ্গে আর থাকব না। যদি আইনগতভাবে ওদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে পারতাম, তাই হতাম। এই বয়সে সেটা সম্ভব নয়। তবে এই বাড়ি আমার নামে, তাই নীলকণ্ঠ সেনকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। যে মানুষ

এতটা বয়সে পৌঁছে তার অতীতের প্রেমিকার খোঁজ করে, তাও জ্যান্ত নয়, মরা, তার সঙ্গে বিবাহিত স্ত্রীর থাকা উচিত নয়। তুমি জানো কিনা জানি না, এই খোঁজে তার নিরলস পুত্র মর্গে-মর্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে খবর পেলাম। লম্পট বাবাকে যে ছেলে সাহায্য করে, তার সঙ্গেও আমি আর যোগাযোগ রাখতে চাই না। উজ্জয়িনী, আমি নিজে উপার্জন করি, আমার মাথার ওপর ছাদ রয়েছে, এই নোংরামি আমি বরদাস্ত করব না।” এবার উজ্জয়িনী একটা কিছু বলতে যায়, থামিয়ে দেন রানি। বলেন, “তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা ভুল ছিল, শুনলাম, এখন তুমি সাম্যকে ছেড়ে আলাদা থাকছ। দেরিতে হলেও তাকে চিনতে পেরেছ। যদি মনে করো, আমার এই বাড়িতে ফিরে আসতে পার তুমি। দরজা খোলা থাকবে। তুমি আর আমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারি।”

উজ্জয়িনী আবার কিছু বলতে যায়, ফোন কেটে দেন রানি। অনেকটা সময় ভেজা শরীরে চুপ করে বসে থাকে। মনকে স্থির করে, শান্ত করে। রাত বাড়লে ফোন করেছে সাম্যদীপকে।

সাম্যদীপ ক্লান্ত গলায় বলল, “তোমার সিদ্ধান্তের কথা কাল শুনলে হবে না উজ্জয়িনী? আমি এখন রাস্তায়, হাঁটছি।”

উজ্জয়িনী একটু চুপ করে থেকে নিচু গলায় বলল, “না, আজই বলব, এখনই। আমি তোমার কাছে ফিরে যাব সাম্য, তুমি আমাকে নিতে এসো, যত তাড়াতাড়ি পার, আমার মন কেমন করছে।”

সাম্যদীপ কিছু বলার আগেই ফোন কেটে গেল। সাম্যদীপ বুঝতে

পারছে না, কী করবে এখন? কী করা উচিত তার? ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, চায়ের দোকানের মালিক উড়ে-যাওয়া চাল অনেকটা তুলে ফেলেছে দোকানের মাথায়। আর একটু বাকি। ‘টুং’ আওয়াজে হাতে ধরে-থাকা ফোনে মেসেজ এল। এত রাতে কে কথা বলে? ফোন তুলে সাম্যদীপ দেখল, পর্দায় লেখা ফুটেছে— ‘বাবা’। বাবার মেসেজ! বাবা তো মেসেজটেকেই বিশেষ করেন না। কী লিখলেন?

“কালই আমি তোমার সঙ্গে মর্গে যাব। তুই ব্যবস্থা করিস।”

খানিকটা হেঁটে, খানিকটা ট্যাক্সি ধরে উজ্জয়িনীর কাছে যখন পৌঁছল সাম্যদীপ, তখন মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছে।

ওরা শুয়ে আছে এখন। দু’জনের শরীরে মিলনের উল্লাস আর তৃপ্তি, ক্লান্তিও। সুখের ক্লান্তি। জানলার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতের ঝলক মাঝেমধ্যে এসে লুকিয়ে দেখে যাচ্ছে এই আনন্দের মিলনদৃশ্য। উজ্জয়িনী ফিসফিস করে কিছু বলল। সাম্যদীপ আরও গলা নামিয়ে তার জবাব দিল। কোনওটাই শোনা গেল না।

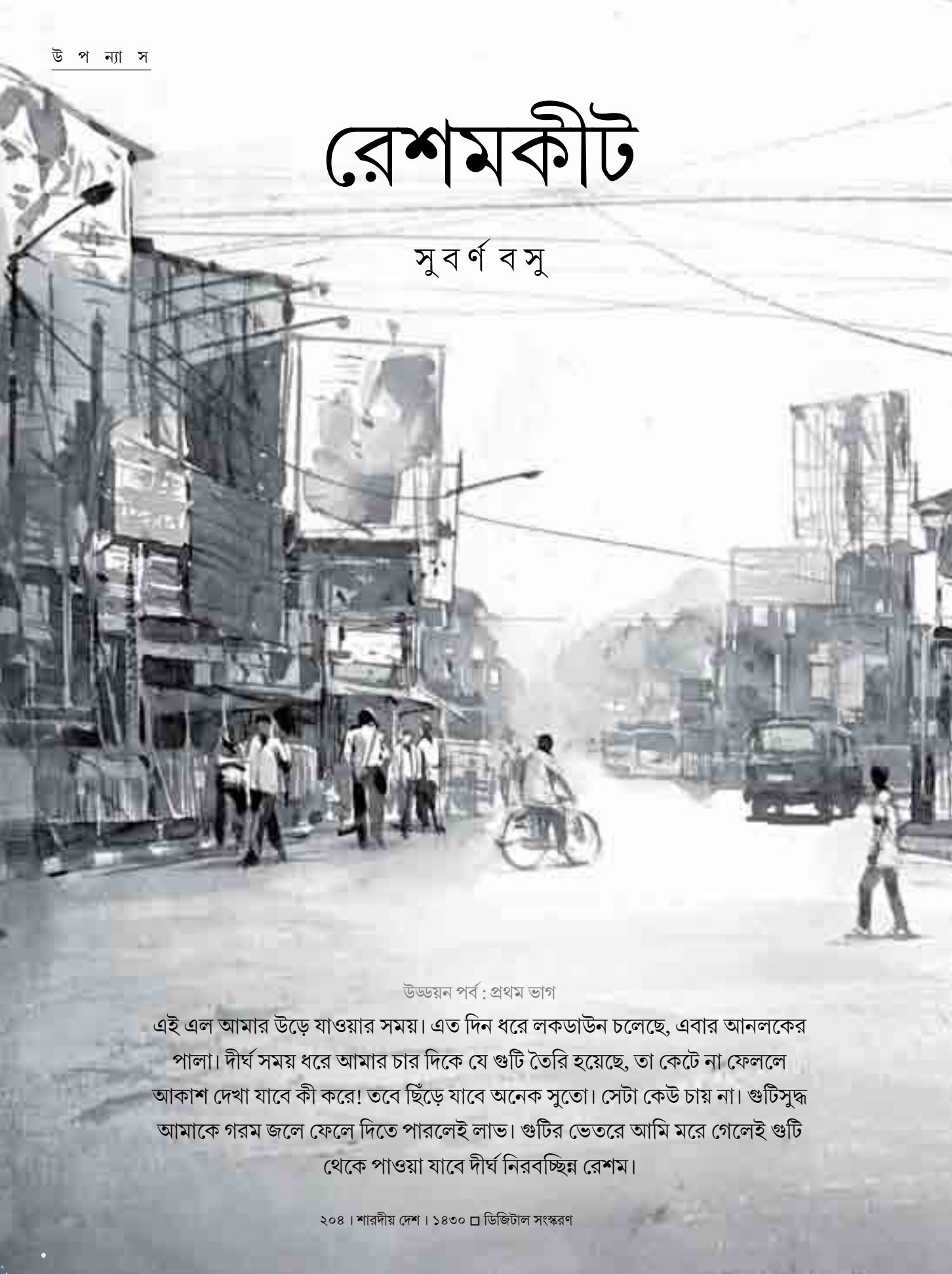
(এই কাহিনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাস্তবের কোনও ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে মিল পাওয়া গেলে তা আকস্মিক বলে মনে করতে হবে)

অঙ্কন: বৈশালী সরকার



রেশমকীট

সুবর্ণ বসু



উড্ডয়ন পর্ব: প্রথম ভাগ

এই এল আমার উড়ে যাওয়ার সময়। এত দিন ধরে লকডাউন চলেছে, এবার আনলকের পালা। দীর্ঘ সময় ধরে আমার চার দিকে যে গুটি তৈরি হয়েছে, তা কেটে না ফেললে আকাশ দেখা যাবে কী করে! তবে ছিঁড়ে যাবে অনেক সুতো। সেটা কেউ চায় না। গুটিসুদ্ধ আমাকে গরম জলে ফেলে দিতে পারলেই লাভ। গুটির ভেতরে আমি মরে গেলেই গুটি থেকে পাওয়া যাবে দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন রেশম।



তার জন্য আমার শেষ হয়ে যাওয়া জরুরি।

আচ্ছা বলুন তো, হয় রেশম, না হলে মথ, এই পরিস্থিতির জন্যই কি আমার এই দীর্ঘ বয়নকর্ম? তা তো নয়! তা হলে রেশমের সূতো নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করব কেন আমি! আমাকে বেরোতেই হবে। শুধু বেরোতে নয়, পালাতে হবে। আমি আর এখানে থাকব না। এখানে আমার জন্য আর কিছু পড়ে নেই। এমনিও কিছু ছিল না। ভাবতাম, হয়তো কিছু একটা করে নিতে পারব এক দিন। হল না। তাই চলে যাচ্ছি। যেখানে আমাকে কেউ চেনে না, সেখানে। নতুন করে শুরু করব। ‘থাকব নাকো বন্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে’... করোনার মতো বিশ্বজোড়া মহামারি কি পারল মানুষকে পুরোপুরি পেড়ে ফেলতে! পারল না। সেই তো ঘরবন্দি দশা ঘুচল, ঘরে ঘরে দোর খুলল, বেরোল মানুষ। সকলে বলল, “কাজ করতে দাও, না হলে করোনা হোক বা না-হোক, খিদের জ্বালাতেই শেষ হয়ে যাব। মৃত্যুই যদি ভবিষ্যৎ হয়, তা হলে লড়াই করেই মরি না হয়!” ইশকুলে পড়া সেই কবিতাটা বড় মনে পড়ে এই সব সময়ে— “...এখনো রাত শেষ হয় নি; / অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর/ কঠিন পাথরের মত, তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারছ না।/ মাথার ওপর একটা ভয়ঙ্কর কালো আকাশ/ এখনো বাষ্পের মত থাবা উড়িয়ে বসে আছে।/ তুমি যেভাবে পারো এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও/ আর আকাশের ভয়ঙ্করকে শান্ত গলায় এই কথাটা জানিয়ে দাও/ তুমি ভয় পাওনি...”

চলে যাচ্ছি। যাব না-ই বা কেন? এই যে লকডাউন হল, তার পর একটু একটু করে উঠেও গেল, তাতে সমস্যা কি মিটল? মানুষ ঘরের দোর খুলল, কিন্তু মনের দোর? সে তো বন্ধই রইল। সে যাকগে, যাদের মন, তারা বুঝবে। আমি চলে যাব। কারণ, খুব একটা ভাল কিছু করে উঠতে পারিনি। কনকবাবুর আমাকে নিয়ে একটা প্রত্যাশা ছিল, আমি তাঁকে কিছু সদুত্তর দিতে পারব কি? গোলাপিকে যদি আশুবাবু বলে দেন, তিনি কোথা থেকে টাকা জোগাড় করেছেন, তখন আমি কী কারণ দেখাব? শুভজয় আর বিদিতার সম্পর্ক আজ যে অবস্থায় আছে, তাতে কি আমার কোনও ভূমিকা নেই? মিসেস করণ তো আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আমি উত্তরে কিছু বলতে পারব কি? হৈমন্তী কি আসবে রাখি কিংবা ভাইফোঁটার দিন? কী শুনবে? আমি আর ওখানে থাকি না? কোথায় থাকি কেউ জানে না? উপায়নবাবু- বা আমায় কী ভাবলেন? ঠগ, জোচ্চোর, প্রতারক? যা ভেবেছেন, ভেবেছেন। সবার ভাবনা নিয়ে ভাবতে গেলে রেশমের গুটি আরও বড় হবে। তখন কেটে বেরোনো আরও কষ্টকর হয়ে উঠবে। শুধু কি এঁরা... কুসুমিতার কথাও কি ভুলে যাওয়া সম্ভব? ওর কথায় বিরক্ত হয়েছি, কষ্টও পেয়েছি, তবু মেয়েটার মনটা যে হিরের মতো, তা কি অস্বীকার করতে পারব?

আর কথা বাড়াব না। জিনিসপত্র গোছগাছ কমপ্লিট। একটা ব্যাকপ্যাক আর একটা কিটব্যাগের মধ্যে এঁটে গেছে আমার তুচ্ছতুচ্ছ যথাসর্বস্ব। এখন ভোর সাড়ে ছ’টা। এবার দুগ্ধা দুগ্ধা। আর মিনিট পঁয়তাল্লিশ, কিংবা জ্যামজট থাকলে বড়জোর ঘন্টাখানেক, হাওড়া স্টেশন পৌঁছোতে তার বেশি সময় লাগবে না। সওয়া আটটায় আমার ট্রেন। সময় হাতে রেখে পৌঁছানোই ভাল। প্ল্যাটফর্ম নম্বর চিনে ট্রেনের কামরা খোঁজা নিয়ে আমার বরাবর টেনশন থাকে। সময়ে সবটা না করে উঠতে পারলেই চিঠির।

হাতে পুঁজি খুব বেশি নেই। পুঁজি ছিল। এনজিও-তে কাজ করে, স্টুডেন্ট পড়িয়ে বেশ কিছুটা জমিয়েছিলাম। খরচ করে দিয়েছি। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে পড়ে আছে জিনিমাম ব্যালেন্সের চেয়ে সামান্য বেশি কিছু। ফলে টিপে টিপে খরচ করার ব্যাপার আছে। ট্যাক্সিভাড়াই লেগে যাবে শ-দুয়েক, কি আর একটু বেশি। ট্রেনের টিকিট কাটা আছে। তার পর? কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঠিক। ঠাকুরদাদা বলতেন, জীব দিয়েছেন যিনি, আহাির দেবেন তিনি। কথাটা মনে করে মনে জোর পাচ্ছি।

আমি শূন্য থেকে শুরু করব। হাতে পুঁজি থাকলে চলবে না। আর্থিক নিরাপত্তা, অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের নিশ্চয়তা মানুষকে ভোঁতা করে দেয়। আমি মানুষের হাত ধরব। কারণ, আমি জানি সে কিছু বলতে চায়। ও হো! বলতে ভুলে গেছি, একটু আগে যে-কবিতাটা শোনালাম, কবিতাটার নাম ‘জন্মভূমি আজ’। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আবৃত্তি করে প্রাইজও পেয়েছি

একবার। যাঁদের কবিতা পড়ে আমি বুঝতে পারি, তাঁরা সকলেই আমার প্রিয় কবি। যেহেতু আমার মোটা মাথায় কবিতা বিশেষ ঢোকেই না, তাই আমার প্রিয় কবির সংখ্যা খুব কম।

কথা বলতে বলতেই ট্যাক্সি পেয়ে গেছি। জিনিসপত্র তুলে গুছিয়ে বসেছি। ভোরের কলকাতা দেখতে দেখতে আরাম করে পৌঁছে যাব হাওড়া স্টেশন।

কলকাতার এই মায়াময় শীতের ভোর আবার কবে দেখতে পাব কে জানে! শীতের ভোর খুব ধীরে ধীরে হয়। আলোর ফুল থেকে একটা একটা করে অন্ধকারের পাপড়ি খুলে নেওয়ার মতো। শীতের নিজস্ব রং নেই বলেই তাকে সাজানোর জন্য প্রকৃতির কত আয়োজন। ফুলের দোকানে ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, ফলের দোকানে থরে থরে কমলালেবু, ঘন মধুরঙা গাঢ় লালচে পাটালি, রাস্তার মানুষজনের রংবাহারি শীতপোশাক— রঙের যেন মোচ্ছব!

এতটা বকবক যাঁরা ধৈর্য ধরে শুনলেন, তাঁদের নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, এত গৌরচন্দ্রিকা করে এই শীতের ভোরে আপদটা যাচ্ছে কোথায়! আর যাচ্ছেই-বা কেন! কে মাথার দিবি দিল! কী আর করব বলুন, যেতে তো আর ভাল লাগছে না। খারাপ লাগার মুহূর্তটা চেনা লোকজনের সঙ্গে শেয়ার করারও উপায় নেই। তাই একটু অচেনা মানুষজনেরই দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছি আর কী!

আজ ২০২২ সালের ১৭ ডিসেম্বর। ১৪২৯ বঙ্গাব্দের পয়লা পৌষ। আমার চিরতরে কলকাতা ছাড়ার তারিখ। আমি কথা রাখতে পেরেছি। এই বছরের শেষ দিন অবধি ধার্য হয়েছিল আমার শহরবাসের মেয়াদ। তার মধ্যেই ধীরেসুস্থে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

আর আমার গল্পটাই রেশমের সূতো, যা কেটে উড়ে যাচ্ছি আমি। যা কেটেই দেব, তা একবার সবাইকে দেখাতে মন চায় না? সেই কারণেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে একটু বেশি বকে ফেলছি। শীতের সকাল, মুখ বুজে থাকলে বেশি শীত করে। আপনাদের সব কথা বলে ফেলাই যায়, আপনারা তো আর চেনা লোক নন।

চেনা লোক বলতেই মনে পড়ে গেল, কাজটা আমি মোটেই ঠিক করছি না। এই যে প্যাটপ্যাটে সকালের আলোয় আমি ট্যাক্সির জানলা দিয়ে গলা বের করে চার দিক দেখতে দেখতে চলেছি, তাতে চেনা কারও নজরে পড়ে যেতে কত ক্ষণ! আমার তো আর একটু সাবধান হওয়া উচিত। আর কেউ কি ভোরবেলা রাস্তায় বেরোয় না!

বলতে বলতেই বিপদ! ওই তো কনকবাবু। ভুলেই গেছিলাম। উনি তো এই সময় ছেলেকে ইশকুলে পৌঁছাতে বেরোন। কিন্তু কই, সঙ্গে ছেলে নেই তো! তা হলে বোধ হয় শীতের ছুটি চলছে। কনকবাবু একাই বাজার করতে বেরিয়েছেন। শ্যামবাজারের মোড়ে কালীবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে নমস্কার করবেন। যেমন উনি প্রায়ই করেন। অন্যমনস্ক মানুষ। সেই কারণেই হয়তো আমাকে খেয়াল করেননি। তবু সাবধানের মার নেই। আমি মাথা ঢুকিয়ে যথাসম্ভব নিচু হয়ে সিটে ঠেসান দিয়ে বসি।

এখনও হাওড়া আসতে দেরি আছে। চোখ বন্ধ করে ফেলি। ফেলে আসা সময়ের পুরো ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সিনেমার মতো। যেতে যেতে বলেই যাই। বেশি দিনের কথাও নয়। ২০২২ সালেরই ঘটনা সব, মানে যখন করোনা-ভয়টা মানুষের মনে অনেকটাই কমে এসেছে। আমি আমার মতো বলে যাব। সবটা উত্তমপুরুষে হবে না। যতটুকু নিজের মুখে বলার, মাঝে-মাঝে বলব ঠিকই, কিন্তু ঘটনা আমার জ্ঞানে-অজ্ঞানে যা যা ঘটছে, সে সব প্রথম পুরুষেই চলতে থাকবে। সে সব হচ্ছে পটভূমি। মানে, যার ওপর বেস করে আমার শহরত্যাগ দাঁড়িয়ে আছে। টানা চলতে চলতে পাটা উল্টেপাল্টে দেখে নিতে পারেন। দেখাশোনা ফ্রি। পড়া না পড়া আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

আর দেরি করব না। হাওড়া আসা অবধিই মোটে সময়... আশীর্বাদ করুন, গল্প শেষ করে যেন সুষ্ঠু ভাবে উড়ে যেতে পারি, রেশমের রং যেন সকলের ভাল লাগে, মসৃণ ভাবে উড়ন্ত রঙে, মানে বাংলায় যাকে বলে ‘ফ্লাইং কালার্স’-এ যেন বেরিয়ে যেতে পারি... দোহাই দক্ষিণ রায় এই করো বাবা/ অন্তিম না পাই যেন চরণের থাবা... একবার উড়ে যেতে পারলে

রেশমকীট আর বাঘকে ভয় পাবে না। কিন্তু যতক্ষণ না উড়ছে, ততক্ষণ বাঘকে বিশ্বাস নেই... অভিজ্ঞ পাঠক জানেন, বাঘ এবং দক্ষিণ রায় এখানে যথাক্রমে বিপদ এবং বিপত্তির সর্বশক্তিমানে রূপক।

যাক, শুরু করায় আর দ্বিধা নেই। কনকবাবু যখন প্রথমে চোখে পড়েছেন, তখন তাঁকে দিয়েই শুরু হয়ে যাক...

আপনাদের সঙ্গে ফের দেখা হচ্ছে উড্ডয়ন পর্বের দ্বিতীয় ভাগে। অনুরোধ রইল সঙ্গে থাকার।

নদীর ওপার কহে

কনকবাবুর পুরো নাম কনককান্তি মিত্র। দার্শনিক ধরনের লোক। ‘কাজ কম ভাবনা বেশি’ নীতিতে বিশ্বাস করেন। সমাজ সংসারের চোখে এঁরা আলসে এবং গোঁড়ে, গতর নাড়ানোর ভয়ে ভাবের ঠাকুর সেজে বসে থাকেন। এ সব ঠারঠারে কানে আসে কনকবাবুর। কষ্ট পান। মুখে কিছু বলেন না।

এই ধরনের লোকজনের পক্ষে বিয়ে করা মহাভুল। এঁরা বিয়ে করলে, যাকে বিয়ে করেন, তিনি সারা জীবন দায়িত্ব নিয়ে বুঝিয়ে চলেন— কেন এ সব লোকের বিয়ে করা উচিত নয়। কনকবাবুরও হয়েছে সেই জ্বালা। কনকবাবু অতিরিক্ত ভালমানুষ, এবং সেই কারণেই সাংসারিক ঘোরপ্যাঁচ বোঝেন না এবং তারই শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিক্রিয়ার ফলে অনেক কিছু গুলেট করে ফেলেন। সর্বক্ষণ ভাবনাচিন্তায় ডুবে থাকলে যা হয়। কনকবাবুর নানা ঝামেলার ওপর শাকের আঁটি হল কনকবাবুর ছেলে। বৃদ্ধিমান, কিন্তু ফাঁকিবাজ। লেখাপড়া এবং সমস্ত কো-কারিকুলার বিষয়ে ফাঁকি মারাটাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ফলে কনকবাবুর স্ত্রী নানা কারণে ছেলের ওপর চিলচিৎকার জোড়েন। ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটে কনকবাবুর। তিনি ছেলের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ফেলেন এবং তার পর কনকবাবু একা নন, সারা পাড়া বুঝতে পারে কনকবাবু কী ভুলটা করেছেন।

এই যেমন এখন। আশ্চর্য একটা ভাবনা নিয়ে মনটাকে খাটিয়ে চলেছেন কনকবাবু। বাজার করতে গিয়ে শিমের বদলে পটল নিয়েছেন, বিনের বলে বরবটি, দুটো জিনিস ভুলেও গেছেন। তাতে হুঁশ নেই। ভেবে চলেছেন অফিসের দুই সহকর্মীর কথা।

কনকবাবুর ভাবনার গতিপ্রকৃতি দেখে নিলে লোকটাকে বুঝতে সুবিধে হবে।

দার্শনিক, পণ্ডিত, মহাপুরুষ মহীয়সীরা বলেছেন, লোকের ভালটা দেখবে, খারাপটা নয়। গুণটা দেখবে, দোষটা নয়। এ ব্যাপারে মানুষ পক্ষপাতিত্ব করে না। তারা নিরপেক্ষ এবং সমদর্শী। তারা ভালটাও দেখে, যাতে মন ভরে হিংসে করা যায়, ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে বেগুনপোড়া হওয়া যায় এবং অকাতরে নজর দিয়ে অপরের সাজানো বাগান শুকিয়ে দেওয়া যায়। তারা খারাপটাও দেখে, যাতে প্রাণভরে নিন্দে সমালোচনা করা যায়, গায়ের ঝাল মেটানো যায়, সুযোগ পেলেই হাতে হাঁড়ি ভেঙে তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দেওয়া যায়। অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য ভালটা কিংবা এড়িয়ে চলার জন্য খারাপটা তারা দেখে না। এ একেবারে অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য।

যেমন, কনকবাবুর দুই কোলিগ, ধরা যাক, রামবাবু আর শ্যামবাবু একই অফিসে কাজ করেন গত বছর দশেক। ধর্মতলায় অফিস। রামবাবু থাকেন বৌবাজারে, শ্যামবাবু চন্দননগরে। রামবাবু বেলা আটটায় ঘুম থেকে উঠে আয়েস করে চা খেয়ে খবরের কাগজ পড়ে বাজার দোকান করে ন’টায় চানে ঢোকেন। সোয়া ন’টা নাগাদ ডাল ভাত তরকারি মাছের বোল খেয়ে, আঁচিয়ে পান মুখে দিয়ে বেরোন। তাঁর বাড়ি থেকে অফিসের দূরত্ব মিনিট পনেরোর হাঁটপথ। বিকেল পাঁচটায় ছুটি হলে, অফিসের স্টাফ রিক্রিয়েশন রুমে আধঘণ্টা ক্যারাম খেলেও ছ’টার মধ্যে বাড়ি ঢোকেন রামবাবু। কিন্তু শ্যামবাবুকে ভোর ছ’টায় উঠে দিন শুরু করতে হয়। বাজার, দোকান, চান ইত্যাদি সারতে হয় ঘড়ির কাঁটা ধরে। আগুনের মতো গরম ডাল, একটু আলুসেদ্ধ। একটা মাছভাজা কালেভদ্রে গিল্লির পক্ষে সম্ভব হয়। গায়ে ফুটন্ত তেলের বুদ্ধ-লাগা সেই মাছভাজা মুখে দিতে গিয়ে বহু বার জীবদ্দশাতেই মুখাগ্নির অভিজ্ঞতা হয়েছে শ্যামবাবুর। তার পর ট্রেন ধরতে আটটার মধ্যে প্ল্যাটফর্ম। পৌনে দু’ঘণ্টায় কলকাতা। তার পর হাওড়া থেকে শেয়ার

ট্যাক্সি। মাঝে মাঝেই দশটা পেরিয়ে যায়। ঢুকেই দেখেন পাশের চেয়ারে রামবাবু সুরু করে কাগজ পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি খাচ্ছেন। আবার বাড়ি ফিরতেও শ্যামবাবুর প্রায় আটটা বেজে যায়। শ্যামবাবু রামবাবুকে হিংসে করবেন, এ খুব স্বাভাবিক কথা। কিন্তু রামবাবুও শ্যামবাবুকে হিংসে করেন। কারণ, রামবাবুর বাড়িটা প্রায় একশো বছরের পুরনো। বহু শরিকের ভাগ। রামবাবুর ভাগে সাকুল্যে দুটি ঘর। তিনটে ফ্যামিলির একটা বাথরুম। দিবারাত্রি চ্যাঁ ভ্যাঁ। হাতের কাছে সব কিছুই আরামটুকু উপভোগ করবেন বলে কোথাও নড়েননি। অন্য দিকে শ্যামবাবুর নিজস্ব ছ’কাঠা জমির ওপর তিন তলা বাড়ি। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। পিছনে ফল আর আনাজ। প্রচুর ফলন। খোলা হাওয়া। গাড়িঘোড়ার শব্দ নেই। স্ট্যান্ড রোড পেরিয়ে সরাসরি গঙ্গার হাওয়া। গরম কালেও পাখা চালাতে হয় না। শুনতে শুনতে রামবাবুর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মনের ভেতরটা হিংসেয় তছনছ হয়ে যায়।

আসল কথা হল, কার কী বেশি আছে দেখতে গিয়ে, লোকে নিজেরটা দেখে না। ভাল করে হিসেব কষে দেখলে বুঝত, ভগবান লোকটা একটোখো নন, হাতের সূক্ষ্ম টানে কোথাও না কোথাও পাল্লা সমানই রাখেন।

কনককান্তি মিত্র বিশ্বাস করেন, ভগবান লোকটার ক্লাস নাইন টেনে অ্যাডিশনাল ছিল বুককপিং। তার পর থেকে কমার্স নিয়ে লড়েছে। অ্যাকাউন্টেন্টিংও পোক্ত। মাঝে মাঝে লোকটাকে খুব অবিচারী, পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হয় বটে, কিন্তু চুলচেরা বিচার লোকটা কোথাও না কোথাও ঠিকই করে। জীবকুলের জন্মজন্মান্তরের জমাখরচ মেলাতে মেলাতেই লোকটা প্রশ্নাতীত দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছে। ফট করে তাকে চ্যালেঞ্জ করা মুশকিল। লোকটার প্লাস পয়েন্ট, সামনে-পিছনে মানুষের চেয়েও বেশি পাল্লায় তার নজর চলে!

ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতেই শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের কালীবাড়ির কাছে এসে পড়েছেন কনকবাবু। কনকবাবুর কালীভক্ত মানুষ। তিনি বেশ সময় নিয়ে নমস্কার করেন। শ্যামবাজারের জয়কালী বাড়ি, শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের কাছে কন্সুলেটোলা কালীবাড়ি, মধ্য কলকাতার ঠনঠনিয়া, বৌবাজারের ফিরিঙ্গি কালী— এই হল মোটামুটি পরিসর। দু’মাসে চার মাসে কালীঘাট কিংবা দক্ষিণেশ্বর।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানেন নমস্কার করতে কনকবাবু খুবই ভালবাসেন, পাঁচ-সাত মিনিটের নীচে তাঁর নমস্কার শেষ হয় না। প্রত্যক্ষদর্শীরা যা জানেন না তা হল, কনকবাবুর সঙ্গে মা কালীর কথা হয়। কনকবাবু প্রশ্ন করেন, মা উত্তর দেন। এ ঘটনা বহু পুরনো। কনকবাবু নিজেই এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা হাতে গোনা দু’-এক জনকে বলেছেন। আর এই জানলেন আপনারা। জানি, আপনারা সংবেদনশীল মানুষ। পাঁচ-কান করবেন না।

আজও যেমন তিনি মায়ের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে চলেছেন। নমস্কারের আগে তিনি দেখেছেন, অনন্ত ট্যাক্সি চেপে কোথাও যাচ্ছে। আর তাঁকে দেখে ছেলোটো গুঁড়ি মেরে ট্যাক্সির মধ্যে মাথা ঢুকিয়েও নিয়েছে। অনন্তকে পছন্দ করেন কনকবাবু। কনকবাবুর একটি খুড়তুতো বোন আছেন। অনন্তর চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোট। এই দু’জনের চার হাত এক করে দেওয়ার একটা স্বপ্ন মনের গভীরে লালন করেন কনকবাবু। কিন্তু নানা কারণে এত গোলমাল এবং ভুলভ্রান্তি করে ফেলেন যে, সাহস করে কথাটা কারও সামনে পেড়ে উঠতে পারেননি আজও।

মেরন সামান্য চাঞ্চল্য মন্দিরের সামনে দাঁড়াতেই মাথা থেকে উবে গেল কনকবাবুর। মন্দিরে মায়ের মুখ দেখলে তিনি বিশ্বসংসার ভুলে যান। চোখ জ্বালা করে, গলার কাছটা কেমন চাপা কষ্ট হয়। চটি জোড়া পাশে খুলে রেখে বাজারের থলি বগলদাবা করে নমস্কার শুরু করে দেন কনকবাবু।

কী যাতনা বিধে

জয়গাটা শ্যামবাজার থেকে হাঁটপথ। হাতিবাগান থেকে হরি ঘোষ স্ট্রিট হয়ে যাওয়া যায়। আহিরীটোলা থেকে বিকে পাল মোড় হয়েও যাওয়া যায়। মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট, আবার দর্জিপাড়া বললেও ভুল হয় না। যাঁরা উত্তর চেলেন, তাঁরা হয়তো একটা ধারণা পেলেন। যাঁরা নিরুত্তর, তাঁদের বলি, ওখানকার অনেক গেরস্তই এ রকম ঘুরিয়ে পেরিয়ে ঠিকানা বলেন। কারণ,

জায়গাটা সুবিধের নয়। জায়গায় জায়গায় লাল আলোর বিলিক আছে। কাণ্ডজ্ঞানহীন মাতাল শরীরসন্ধানীরা অনেক সময় ভুল করে ভদ্রবাড়ির দরজাতেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে। এখানকার লোকজনের সে সব মোটামুটি গা-সওয়া।

এখানেই থাকে নতমুখ শান্ত বিষণ্ণ মেয়েটি। জন্মানোর সময় তার ফর্সা রঙে দুধে-আলতার মতো গোলাপি একটা আভা ছিল বলে তার নাম রাখা হয় গোলাপি। পরে ওই নামটাই পাকাপাকি হয়ে যায়। ওদের প্রাচীন বাড়িটার জায়গায় জায়গায় গজিয়ে ওঠা বট অশ্বখের চারা ইতিহাসের গন্ধ ছড়ায়। কাঠা তিনেক জায়গা নিয়ে তৈরি আগেকার দিনের বড় বাড়ি। খুপরি খুপরি চব্বিশটা ঘর এবং তাতে মোট বারোটি পরিবার। প্রত্যেকের ভাগে দু'টি করে ঘর বরাদ্দ। তিনতলা বাড়িটায় জ্ঞাতিগুপ্তি মিলে প্রায় পঁয়ত্রিশ জনের বাস। দোতলার পূর্বদিকের কোণের দুটো ঘর নিয়ে থাকে গোলাপি আর ওর মা।

ওই ঘরে গোলাপির বাবাও আছেন, তবে তিনি কাচফ্রেমে বন্দি। উপরে শুকনো একটা রজনীগন্ধার মালা বুঝিয়ে দেয় পৃথিবীতে তাঁর সুবাস দেওয়ার দিন ফুরিয়ে গেছে। তিনি একটা মারোয়াড়ি গদিতে খাতা লিখতেন। কষ্টেসৃষ্টে তিন জনের সংসার চলে যেত। গোলাপির বাবা নিজের দিকে না তাকিয়ে মেয়ে বৌকে একটু সুখে রাখার জন্য প্রাণপাত করতেন। সেই কারণেই ঘাড় বেয়ে যে যন্ত্রণাটা মাথার শিরায় শিরায় অসহ্য দপদপানির বিস্ফোরণ ঘটাত আর দু'চোখে নামিয়ে দিত আঁধারের নিকষ পর্দা, সেটাকে পান্ডা না দিয়েই নিজে নিজেই সারিয়ে ফেলবেন ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন গোলাপি মেধাবী মেয়ে। তার পায়ের তলায় জমিটুকু শক্ত না করে দিলে, তাঁর মুক্তি নেই। তিনি বুঝতে পারেননি, নোংরা এবং অথেলোয়াড়ি এই পৃথিবীতে পোয়েটিক জাস্টিস বলে আসলে কিছু নেই। পাঁচ বছর আগে, মার্চশেষের এক রাত্তিরের মধ্যেই সেরিব্রাল অ্যাটাকে শেষ হয়ে যাওয়া মানুষটার একটাই জিত, চিকিৎসা বাবদ পরিবারকে একটা কড়ি খসানোরও সুযোগ দেননি। সুযোগ দিলে পরিবার কত দূর কী করতে পারত, সে অবশ্য আরও জটিল প্রশ্ন। বিয়াল্লিশ বছরে যখন গোলাপির বাবার বয়স চিরতরে আটকে গেল, তখন গোলাপি বারো। ক্লাস সিক্স। শুরু হল মা-মেয়ের জীবনযুদ্ধ।

যে-মারোয়াড়ির গদিতে গোলাপির বাবা খাতা লিখতেন, তিনি ভাল লোক ছিলেন। তিনি এককালীন হাজার দশেক টাকা দিয়েছিলেন। গোলাপির মা নিয়েছিলেন দু'রকমের কাজ। সকাল আর রাতে তিনটে বাড়িতে রান্না করা এবং মারের সময়টাতে শাড়িতে ফলস পিকো বসানো। সেলাই মেশিনটি তাঁর বিয়েতে পাওয়া। শখের সেলাই-ফোঁড়াই জানতেন। সে সবও কাজে লাগল। গোলাপির বাবার মতো মায়েরও একটাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল, গোলাপিকে তার পড়াশোনা করে যেতে দেওয়া। গোলাপি পড়াশোনায় ভাল। সে দাঁড়ালে সংসারের অবস্থা ফিরবে।

ইশকুলে কথা বলে গোলাপির স্কুল-ফিজ মকুব করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাহায্য করেছেন স্থানীয় বিধায়ক। সরকারি খাতে কিছু স্কলারশিপ এবং সাইকেলেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সে ভাবেই কেটেছে চারটে বছর। টিউটর দিতে পারেননি গোলাপির মা। ইশকুলের মাস্টারমশাই দিদিমণিদের ধরে-করে যতটা হয়, তাতেই দিনরাত এক করে মাধ্যমিকে বিরশি শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করে ইলেভেনে ভর্তি হয়েছে গোলাপি। সমস্যা সে সব দিকে নেই। সমস্যা অন্য দিকে।

গোলাপির মা মাঝে মাঝে কপাল চাপড়ে বলেন, ভিথিরির ঘরে রূপের চেয়ে বড় অভিশাপ আর নেই। কথাটা এমনি এমনি বলেন না। কারণ, গোলাপির ক্লাস নাইন পেরোনো থেকেই বাতাসে গুঞ্জন উঠেছে। এলাকাটা তো ভাল নয়। বাড়ি বয়ে এসে জনৈকা মাসি গোলাপিকে চেয়েছেন। এককালীন পঁচিশ লক্ষ টাকা কবুল করে। অতি কষ্টে মেজাজ সামলে সেই মাসিকে দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন গোলাপির মা। পাশের ঘর থেকে টাকার অঙ্ক শুনে চমকে গেছিল গোলাপি। মাসি বিদেয় হতে মাকে বলেছিল, “মা, আমার দাম পঁচিশ লাখ টাকা!”

নিজেকে আর সামলাতে না পেরে ঠাস করে মেয়ের গালে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন গোলাপির মা। তার পর সারা রাত কেঁদেছিলেন।

মেয়ে বুঝেছিল। মায়ের চোখ মুছিয়ে মাঝরাতিরে সে মাকে কড়কড়ে ভাত কনকনে ঠান্ডা ডাল দিয়ে মেখে খাইয়ে দিয়েছিল। তার পর নিজে খেয়েছিল।

গোলাপির বাড়িতেও ক্রমশ গোলাপির একঘরে হয়ে পড়েছে। গরিবের ঘরে লেখাপড়ায় ভাল রেজাল্ট আবার রূপের ডালি— জ্ঞাতিগুপ্তি ঈর্ষাকাতর হলে তো তাদের দোষ দেওয়া যায় না। ঠারঠারো বাড়ির লোকও কথা শুনিয়ছে, “গরিবের ঘরে বিদ্যেধরী পুষে কী লাভ বাছা, তার চেয়ে বরং...” খুড়তুতো জেঠতুতো দাদারাও আড়ালে আবডালে গোলাপিকে দেখলে চোখের পলক ফেলতে ভুলে যায়। চোখের কোটর থেকে ফণা তোলে উপোসি সাপ। চোঁটের ফাঁকে চেরা জিভ লকলক করে ওঠে। গোলাপি জানে, সাপের বড় যন্ত্রণা। বিষ না ঢাললে তার রেহাই নেই। গায়ে শক্ত করে ওড়না জড়িয়ে সে ঘরে ঢুকে পড়ে। দিনের আলো ফুরিয়ে এলে ঘরের বাইরে, বারান্দায় বা ছাদে না যাওয়ারই চেষ্টা করে। চার দিকের ওত পেতে থাকা জন্তু-জানোয়ারদের এড়িয়ে যেতে পড়াশোনায় মুখ ডুবিয়ে দেয়। যেমন উট মুখ গুঁজে দেয় বালিতে, তেমনই।

তবে ইলেভেনটা আর হচ্ছিল না টিউটর ছাড়া। গত দু'বছর এবং মাধ্যমিকটা করোনার জন্য নানা ভাবে সমস্যার মধ্যে কেটেছে। গোলাপি নিজে লেখাপড়া করে এবং ফোনে টিচারদের সঙ্গে কথা বলে সবটা সামলেছে। ইলেভেনে স্কুল খুলে গেছে। পড়াশোনায় সে অনেকটাই বেশি সিরিয়াস। তাই মাকে বলায় মা রাজি হলেন। কারণ, মেয়ের পড়াশোনার ক্ষেত্রে তিনি আজও একই রকম আপসহীন। মেয়ে যখন নিজে বলছে, তখন আর দেরি করলেন না গোলাপির মা। নিজের মতো করে খোঁজখবর শুরু করলেন।

গোলাপির বাবার ছোটবেলার এক বন্ধু, পাড়াতেই থাকেন, ওদের ভালমন্দের খোঁজ নিয়ে এসেছেন বরাবর। খুব বিচক্ষণ মানুষ। গোলাপির বাবার শ্রদ্ধশাস্তি মিটে যাওয়ার পরও বারবার স্ত্রীকে পাঠিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন। কিছু প্রয়োজন হলে জানাতে বলেছেন। ভদ্রলোকের নাম আশুতোষ সেন। আশুবাবু নামে সকলেই চেনেন। আশুবাবুকেই প্রয়োজনের কথা জানানেন গোলাপির মা। দিনকতক পরই খবর এল টিউটরের।

টিউটর একটি বছর ত্রিশের ছেলে। একটা বেসরকারি সংস্থায় কাজ করে। রেডলাইট এরিয়ার বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পড়ায়। প্রেসিডেন্সির সোশিওলজির এম এ। ক্লাস ইলেভেনের আর্টস দেখিয়ে দিতে পারবে। তবে সে কারও বাড়ি আসবে না। যেখানে বাচ্চাদের পড়ায়, সেখানেই বাচ্চাদের পড়ানোর আগে অথবা পরে সময় বের করে নিয়ে পড়াবে। বাচ্চাদের পড়ায় সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আটটা। আটটার পরে একা একা তিনটে গলি পেরিয়ে পড়তে যাওয়া গোলাপির মার খুব একটা সুবিধের মনে হল না। তাই ঠিক হল সাড়ে চারটে থেকে পড়বে গোলাপি। ২০২২ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই শুরু হল গোলাপির টিউশন।

গোলাপির স্কুল মনিং। সকাল আটটা থেকে দুপুর একটা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেড়টা। ভোর ছ'টায় ওঠে। তাই বাড়ি ফিরে ভাত খেয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমোয়। না হলে রাতে বেশিক্ষণ পড়তে পারে না। সাড়ে তিনটের মধ্যে উঠে পড়ে। চোখে-মুখে জল দিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে পড়তে যায়। মাসদুয়েক হল গোলাপি পড়ছে। টিউটর ভাল বোঝায়। এক ভাবে না হলে অন্য ভাবে। স্টুডেন্টের চোখমুখ দেখে ধরে ফেলে কেউ পড়া বুঝেছে না বোঝেনি।

সে দিন একটু গোলমাল হয়ে গেল। সরস্বতী পূজোর সপ্তাহখানেক আগের কথা। বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলের পূজোর জায়গা ধোয়া-মোছা সেরে বাড়ি ফিরতেই তিনটে বেজে গেল। খেয়েদেয়ে উঠে ঘুমোবে না ভেবেও পিঠ ঠেকাতেই ঘুম নেমে এসেছিল দু'চোখে। ঘণ্টাদেড়েক কখন কেটে গেছে বোঝেইনি। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই দেখে সাড়ে চারটে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পড়িমরি করে সাইকেল উড়িয়ে কোচিংয়ে পৌছোতেই বাজল পাঁচটা।

ভুরু কুঁচকে টিউটর বলল, “এই যে স্লিপিং বিউটি, লেখাপড়া করতে গেলে খাওয়া, ঘুম, টিভি দেখা, বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা যাওয়া, এ সব

লাগাম দিতে হবে যে... নইলে মাধ্যমিকের বিরান্ধি পার্সেন্ট উচ্চ মাধ্যমিকে আঠাশে নেমে যেতে সময় লাগবে না। পাঁচ মিনিট নয়, দশ মিনিট নয়, একেবারে আধঘণ্টা দেবি! তুমি ভেবেছটা কী, অ্যাঁ? করোনার ভয়ে দুটো বছর ঘুমিয়ে কেটেছে বলে, ইলেক্ট্রনটাও ঘুমিয়ে কাটবে? অনলাইনে পড়াশোনার যা হাল হয়েছে সব, সে তো দেখতেই পাচ্ছি...”

বেশ মিনিট পাঁচেক কড়ায় গন্ডায় কথা শুনিযে, তার পর থেমেছিল টিউটর। চোখে প্রায় জল এসে গেছিল গোলাপির। এক দিন একটু ঘুমিয়ে পড়েছে বলে এত কথা শোনাযে স্যার, ভেবে একটু অভিমানও হচ্ছে গোলাপির। বেরসিকের গাছ একটা। হাবভাব করে যেন বুড়ো দাদু। পরক্ষণেই মনে হয়, বুড়োই তো! না হলে আজকালকার দিনে কারও নাম ‘বিশ্ব’ হয়! আশুবাবু এই নামই বলেছিলেন, মনে আছে গোলাপির। অনেকে বিশ্ব না বলে বিশু বলেও ডাকে লোকটাকে।

এলোমেলো ভাবনা মাথা থেকে ঝেঁটিযে, পড়ায় মন দেয় গোলাপি।

ভুলিও স্মৃতি মম

ব্যাপারটা ওরা শুরু করেছিল করোনা ছড়িয়ে পড়ার সময়ই। ২০২০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ। তখন কঠোর লকডাউনে চার দিক বন্ধ। শুভজয়ের বেসরকারি কোম্পানি প্রথমে তাদের মাইনের চল্লিশ শতাংশ কমিয়ে দিল। তার ছ’মাস পর যাদের ছাঁটাই করল, তাদের মধ্যে ও-ও একজন। প্রথমেই জলে পড়েনি শুভজয়। কারণ, সে খুব গোছানো ছেলে। বাড়তি কিংবা বাজে খরচ তার ধাতে নেই। কিছু জমাতে পেরেছিল। তবে সেটুকুর ভরসায় সে থেমে থাকল না। নতুন কাজ কী করা যেতে পারে, এই চিন্তায় দিনরাত নেটদুনিয়ায় মাথা গুঁজে পড়ে থেকে শেষ অবধি তার মনে ধরল ভিডিও ব্লগিং বা ব্লগিং। কোনও খরচখরচা নেই, ভিডিও করে আর ইউটিউবে আপলোড করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা আর ভিউ-আওয়ারের একটা নির্দিষ্ট বেড়া টপকাতে পারলেই ডলারে পেমেণ্ট। কিন্তু ভিডিওর কনটেন্ট কী হবে?

খুব ভাল করে ইউটিউবের দুনিয়া ঘেঁটে দেখল, মানুষ যতই উন্নত হোক না কেন, পরের সংসারে উঁকি মারার প্রবণতা তার রয়ে গেছে আদিম স্তরেই। তাই সংসারের নানা গালগল্প, দুঃখ বেদনা অপ্রাপ্তির ঝুলি খুলে বসে একদল ইউটিউবার বেশ জমিয়ে ব্যবসা জুড়ে দিয়েছে। নাম দিয়েছে লাইফস্টাইল ব্লগ। তুমুল ব্যবসা দিচ্ছে বাড়ি-বাড়ির হাঁড়ির খবর। কে পালিয়ে বিয়ে করেছিল বলে বাপ আর মুখ দেখে না, কার বরের অবস্থা খারাপ বলে শ্বশুর আর ভাণ্ডার মিলে দিনরাত ছড়কো দেয়, কার মেসোর বাড়ির ছাদে ভূতের উৎপাত আছে, কার শাশুড়ি বিউটি পার্লার খুলেছে বলে শ্বশুর অভিমানে পাঁচ গাল ভাত বেশি খায়— এই সাত-সতেরো কিসসা। ইন্টারনেটের জন্মেরও আগে বাড়ির কাজের মহিলারা যে চলমান গেজেটের কাজটা করতেন, সার্ভিসটা ঠিক সেরকমই। কিন্তু এখন মানুষ আরও অগ্রসর। নিজের কেছা নিয়ে অনাকে ফুটেজ খেতে দেবে কেন, তাই নিজেই সে-পসরা সাজিয়ে হাটে বসে গেছে। এই ব্ল্যানটাই নিয়ে নিল শুভজয়। তার পর তৈরি করতে শুরু করল ক্রিপ্ট।

অনলাইনে অর্ডার দিয়ে কিনে আনল লেপেল, ভাল ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল। ল্যাপটপ তার একটা ছিলই, এবার ব্যবস্থা করল একটা আনলিমিটেড ডেটা প্যাকওয়ালা ডঙ্গলের। তার পর একটা দিশ্বে খাতা নিয়ে ক্রিপ্টের খসড়া করতে বসল।

শুভজয়ের বিয়ে হয়েছে গত বছরেই। তার স্ত্রী বিদিতা শ্যামবাজারের মেয়ে। মোহনলাল স্ট্রিটে শুভজয়ের শ্বশুরবাড়ি। শুভজয়রা থাকে মানিকতলার কাছে। কারবালা ট্যাক্স লেনে। বিদিতাও প্রথমে খুব ইন্টারেস্ট পেল শুভজয়ের এই নতুন ভেষগারে। সে প্রথমে বলতে চেষ্টা করেছিল, সে বিয়ের আগে বছর তিনেক তার মাসির কাছে ক্লাসিকাল গান শিখেছিল। গানটা সে সত্যিই খারাপ গায় না। গানের ভিডিও করলে কেমন হয়?

কথাটা শুনে শুভজয় তাকিয়েছিল তাক্সিলা আর বিরক্তিশি মিশিয়ে। বলেছিল, “যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না তো, এ দিকে ভাঁড়ে মা ভবানী, ও দিকে উনি গান গাইবেন। বোধবুদ্ধি বলে কি কিছুই নেই? ভগবান

যখন বুদ্ধি বিলোচ্ছিলেন, তখন কি তোমার পটি পেয়ে গেছিল? ওই জন্য এত বয়সেও এরকম আবোধই রয়ে গেলে?”

শুভজয়ের কথাবার্তাই এ রকম। এখন বিদিতার অনেকটা সয়ে এসেছে। প্রথম প্রথম চোখে জল এসে যেত। সে বরাবর খুব ভিত্তি আর নরম প্রকৃতির। না হলে কি নিজের মনের কথা বলে উঠতে পারত না! নিজের মনের কথা বলার জন্য পাঁচ বছর ধরে একটু একটু করে সাহস সঞ্চয় করেছিল। কিন্তু যার জন্য নিজেকে এতটা গোছানো, সেই যে আচমকা পাড়া ছেড়ে চলে যাবে, সে কথা সে জানবে কী করে?

বিদিতা যে-ছেলেটাকে ভালবাসত, তার ভাল নামটাও কোনও দিন জানা হয়নি ওর। মোহনলাল স্ট্রিট থেকে সামান্য দূরে বিপিন মিত্র লেনেই ছেলেটা থাকত। অস্তু বলেই সবাই ডাকত ওকে। শুধু জানত ছেলেটার মা খুব ছোট বয়সেই মারা গেছেন। বাবা আবার বিয়ে করায়, ছেলেটির একমাত্র মামা, ভাগ্নেকে মামার বাড়ি নিয়ে চলে আসেন। ছেলেটির বাবা এবং সং মা আপত্তি করেনি।

মামা পোস্ট অফিসের কেরানি। মামার দুই মেয়ে। টানাটানির সংসার। বোন আর ভাগ্নেকে পাগলের মতো ভালবাসতেন বলেই ভাগ্নেকে ঝোঁকের মাথায় নিয়ে চলে এসেছিলেন মামা। মামির মতামতের ধার ধারেননি। ফল ভুগতে হয়েছিল ভাগ্নেকেই। না, গল্পের বইয়ের মতো অত্যাচার, সংসারের খাটাখাটনির কাজ করানো এবং খেতে না দেওয়া— এগুলো মামি করেননি। কিন্তু ভাল না বাসা, প্রতি মুহূর্তে তাকে সংসারের বাড়তি কেউ বলে চিহ্নিত করা এবং একটা অদৃশ্য বেড়ার দূরত্ব বজায় রাখা— এ সব এক জন সংবেদনশীল কিশোরকে মনে মনে মেরে ফেলার চেয়ে খুব কম কিছু কি?

এ সব কথা বিদিতা শুনেছিল পাড়ার আশপাশ থেকে নানা জনের মুখে। আর শুনতে শুনতেই ভালবেসে ফেলেছিল একাবোকা শাস্ত মুখচোরা ছেলেটাকে। ভেবেছিল, এক দিন তাকে বিয়ে করে তার জীবনের সমস্ত ভালবাসার অভাব সে একা পূরণ করে দেবে। কিন্তু ছেলেটা যে সে সব কথা কখনও জানতে পারেনি। তাই হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার জন্য তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না। ছেলেটা ভালবাসাহীন সংসারে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে গেছিল। মাধ্যমিক পাশ করার পর থেকেই শুরু করেছিল ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়ানো। সারা সন্ধ্যা পড়াত, রাতে বাড়ি ফিরে দুটো রুটি দিয়ে কুমড়োর ঘ্যাঁট খেয়ে নিজের পড়া পড়তে বসত। টিউশনির খরচ থেকে টাকা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে পুজোর সময় মামির জন্য ছাপা শাড়ি, দুই বোনের ফ্রক, আর মামার জন্য শার্ট প্যান্টও কিনত অস্তু।

শেষ দিকে ওরকম কঠিন মামিরও ভালবাসা আদায় করতে পেরেছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু মামি কোনও দিন একটা বেশি রুটি কিংবা আর-এক হাতা কুমড়োর ঘ্যাঁট দিতে চাইলে হাসিমুখে ফিরিয়ে দিত ছেলেটা। বলত, “বিকেল থেকে রাত অবধি পড়াই। তার পর নিজের পড়া পড়তে-পড়তেই তিনটে বেজে যায়। তিনটে থেকে সাতটা অবধি আমার ঘুমের সময়। এর বেশি খেলে আরও ঘুম পাবে মামি।”

ছেলেটা পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল। গ্র্যাজুয়েশনে ভাল কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিল। ফাইনালে হাই ফার্স্ট ক্লাসও পেয়েছিল। তত দিনে সে টিউশনির সংখ্যা বাড়িয়েছে। সল্টলেকে একটা টিউটোরিয়ালে সপ্তাহে তিন দিন ইংরেজি মাধ্যমের ছেলেগুলোর ব্যাচও পড়াত। তখনই একটা মেস জাতীয় ব্যবস্থা করে সে মামার বাড়ি ছেড়ে দেয়। সে দিন বিস্তর কালাকাটি করেছিলেন মামি। মামা পাথরের মতো চুপ করে ছিলেন। তিনি জানেন, তাঁর ভাগ্নে তাঁর বোনের মতোই অভিমানী। চোচামেচি তার প্রতিবাদ নয়, সে নীরবে সরে যেতে জানে শুধু। তিনি জানতেন, তাঁর বোন বিবাহিত জীবনে সুখ পায়নি। যে-লোক তার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর পরই আবার বিয়ে করতে পারে, নিজের ছেলেটাকে পর্যন্ত কাছে রাখতে চায় না, সে-লোক জীবদ্দশায় তার বোয়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছে, তা সহজেই অনুমেয়।

যাওয়ার সময় অস্তু তার মামিকে প্রণাম করে বলে গেছিল, “তুমি চিন্তা কোরো না মাইমা। তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। রুম বুঝ বড় হয়েছে। কতদিন আর আমি তোমাদের ছোট বাড়িটার ঘর দখল করে রেখে দেব বলো তো? মামা তো আর টাটা-বিড়লা নয়। রুম বুঝের বিয়ের ব্যবস্থাও

তো করতে হবে। তোমরা বারো বছর ধরে আমাকে প্রতিপালন করলে, আমি যথাসাধ্য তোমাদের পাশে থাকব। যে-কোনও প্রয়োজনে নির্দিধায় আমাকে ডেকো।”

ন’বছর বয়সে মামার বাড়ি এসেছিল, একুশ বছর বয়সে নিজের থাকার জায়গা করে নিল অম্ব। সে-ও প্রায় ন’বছর পেরিয়ে গেল। অম্ব যখন মামার বাড়ি ছাড়ে, মামাতো বোনদের মধ্যে বড় রুম তখন ক্লাস টেন, ছোট রুম ক্লাস সেডেন। ওরাও খুব কালাকাটি করেছিল। ঠান্ডা গলায় রুমের মাথায় হাত বুলিয়ে অম্ব বলেছিল, “আমি বড় অভাগা রে, আমাকে সংসারে রাখতে নেই।”

একেবারে বেরোনোর আগের মুহূর্তে মামাকে প্রণাম করতে মামা মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে খুব মৃদুস্বরে বলেছিলেন, “সব জেনেশুনেও সব সময় প্রতিবাদ করে উঠতে পারিনি, বাবা। সংসারী মানুষের বাধ্যবাধকতার শেষ নেই। পারলে ক্ষমা করে দিয়ো।”

মামার কাছে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি সে। কঁদে ফেলেছিল মামার বুকে মাথা রেখে। ভিজে গিয়েছিল প্রৌঢ় মানুষটির ফতুয়ার বুকের কাছটা। তার পর বেরিয়ে গেছিল অম্ব।

এই সমস্ত কথাই রুমের কাছে শুনেছিল বিদিতা। রুম বিদিতার সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত। বছর তিনেক আগে অম্বদা পাড়া ছাড়ে।

বিদিতা পড়াশোনায় সেরকম ভাল ছিল না। অনেক কষ্টে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছিল। তবে তার জন্য সে একা দায়ী নয়। তার বাবা মধ্যযুগীয় মানসিকতার মানুষ। তিনি মেয়েদের বেশি পড়াশোনা কিংবা ছেলেরদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে টিউশন পড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। কমবয়সি ব্যাটাছেলে টিউটর রাখাও পছন্দ করেননি। কোনও কমবয়সি মহিলা টিউটর, যে বাড়ি এসে পড়াবে, সে রকমও পাননি। চেষ্টাও করেননি মেয়ের পড়াশোনায় কোনও সাহায্য করার। এমনকি, যে-মেয়ের গানের গলা অত ভাল, তাকে যে গান শেখানো যেতে পারে, সেটাও তাঁর মনে হয়নি। বিদিতার মাসি যে ভাল গান গায়, তা নিয়ে বরং কটাক্ষ করেছেন সুযোগ পেলেই, “ভদ্রবাড়ির মেয়েছেলে আবার গান গায় নাকি!”

বিদিতা উচ্চ মাধ্যমিকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কোনও রকমে সেকেন্ড ডিভিশন পেতে, তিনি বাড়িতে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, “এ রকম অতি সাধারণ মানের মেয়ের জন্য কলেজের টাকা গোনা আর টাকার নোট আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া একই ব্যাপার। যথেষ্ট হয়েছে পড়াশোনা। আমি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেব। শেষে গ্র্যাজুয়েশনে ফেল করলে তো আরও কোনও পাত্র জুটবে না।”

প্রতিবাদ করার মতো কেউ ছিল না বাড়িতে। বিদিতার সে জোর কোনও কালে তৈরিই হয়নি। গত বছর আঠারো পুরতেই বিদিতার বাবা তার বিয়ে দিয়ে দেয়। আপনারা বলতেই পারেন, দু’হাজার সালের পর আরও দু’-দুটো দশক পেরিয়ে এসেও এ রকম ঘটনা ঘটে?

ঘটেছে, খাস কলকাতাতেই ঘটেছে। ঝাঁ চকচকে এই মেট্রোপলিসের সব জায়গায় সূর্যের আলো সমান ভাবে পড়ে না। খাঁজে-ভাঁজে ফাঁক-ফোকরে কত রকমের অন্ধকার এখনও যে বহাল তব্বিতে রাজত্ব করে যাচ্ছে, প্রত্যক্ষ না করলে বিশ্বাস করা কষ্টকর।

প্রতিবাদ বিদিতার ধাতে নেই। ইউটিউবে গান গাওয়া তার ভাগ্যে নেই বুঝেও, সে উৎসুক হয়ে রইল জানার জন্য যে, ইউটিউব নিয়ে শুভজয়ের প্ল্যানটা ঠিক কী।

দেখা হল দু’জনে

সল্ট লেক জায়গাটা গোলকধাঁধার মতো। সব আইল্যান্ডেই মনে হয় যেন ঘুরেফিরে একই জায়গায় এসে পড়া গেল। ভাগ্যের কথা, অসমঞ্জ পালিতের বাড়ির রাস্তা বেশি দূরূহ নয়। উল্টোভাঙা থেকে পিএনবি-র মোড়। সেখান থেকে রাস্তা পেরিয়ে বিবি ব্লকের শেষ প্রান্তে অসমঞ্জবাবুর অট্টালিকা। হ্যাঁ, প্রায় আট কাঠা জমির মাঝামাঝি দৃষ্টিভঙ্গি তিনতলা বাড়িটাকে অট্টালিকা বলেই ঠিক হয়। বাড়ির সামনে তিনটে গাড়ি পাশাপাশি রাখার জায়গা। পিছনে ঠাকুর-চাকর-ড্রাইভারদের থাকার

কোয়ার্টার। অসমঞ্জবাবুরা তিন পুরুষের উকিল। বিপুল বিত্তের মালিক। অসমঞ্জবাবু দানশীল মানুষ। পাঁচটা এনজিওকে তিনি নিয়ম করে প্রচুর ডোনেশন দেন।

তখন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিক। সকাল দশটায় অসমঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করার কথা অনিন্দ্য বিশ্বাসের। সঙ্গে তাদের এনজিও-রই এক জন কর্মী। সে নতুন নয় বটে, কিন্তু এখানে আগে কখনও আসেনি। অসমঞ্জবাবু তাদের এনজিও-র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক। আজ মাসের তিন তারিখ। প্রতিমাসের তিন তারিখে অনিন্দ্য চেকটা নিতে আসেন। কিন্তু এই ফেব্রুয়ারির শেষেই অনিন্দ্য নয়ডায় বদলি হয়ে যাবে। তাই সঙ্গের কর্মীটিকে এনেছে বাড়িটা এবং অসমঞ্জবাবুকে চিনি দিয়ে দিতে। পরের মাস থেকে তাকেই আসতে হবে চেকটা নিতে। সঙ্গের কর্মীটি সল্টলেকের রাস্তাঘাট বিশেষ চেনে না। তাই চার দিক মাথায় গেঁথে নিচ্ছিল। তাকে সবাই ঘোষ বলে ডাকে। এনজিও অফিসের ফাইফরমাশ খাটার একটি লোক আছে। তার সঙ্গে এই কর্মীর নাম মিলে যাওয়ায়, একে ডাকার জন্য শুধু পদবিটিই বরাদ্দ হয়েছে।

অনিন্দ্য আর ঘোষ যখন চেষ্টা করে বসে আছে, তখন ঘরের বাইরের বারান্দা দিয়ে একটি মেয়ে যাচ্ছিল। অনিন্দ্যদের দেখে মেয়েটি ঘরে ঢুকে এল। বছর বাইশ-তেইশ বয়স। চোখা নাক, পাতলা ঠোঁট, দুর্গাঠাকুরের মতো টানা টানা চোখ। দু’চোখে সব সময়ই যেন অপার বিস্ময়। চোখ দুটো দেখলে বয়স আরও কম মনে হয়।

ঘরে ঢুকেই সে বলল, “ভাল আছেন, অনিন্দ্যদা?” কাচের গ্লাসে গ্লাসে ঠোকা লাগার মতো গলার আওয়াজ।

অনিন্দ্যদা উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতজোড় করে নমস্কার করে বলেছে, “নমস্কার ম্যাম, আমি ঠিক আছি।”

মেয়েটিও হাতজোড় করে তাকিয়েছে ঘোষের দিকে, “উনি নতুন বুঝি?”

“না, মানে হ্যাঁ, আগে কখনও আসেনি, ও হল ঘোষ, মানে ভাল নাম...”

অনিন্দ্যদাকে মাঝপথে থামিয়ে মেয়েটি বলেছে, “তা প্রতিবার তো আপনি একাই আসেন, আজ ঘোষের দরকার হল কেন?”

বাবা! কমবয়সি মেয়ে হলে কী হবে, কথায় ছল আছে তো! মনে মনে অবাক হয় ঘোষ নামে কর্মীটি।

অনিন্দ্য বলে, “আমি বদলি হয়ে যাব, এবার থেকে সাহেবের কাছে চেক নিতে ঘোষই আসবে। তাই দেখিয়ে-শুনিয়ে দিতে এসেছি।”

“বেশ বেশ, খুব ভাল...” বলে মেয়েটি চলে যায়।

অনিন্দ্যদা ধপ করে সোফায় বসে পড়ে রুমাল দিয়ে কপাল মোছে। ঘোষ বলে, “তুমি এত নার্ভাস হয়ে গেলে কেন অনিন্দ্যদা?”

“জানো না তো, তাই বলছি। মেয়েটার জিভের ধার সাংঘাতিক। একটা বের্ফাস কথা বলেছ কী, লেজে-গোবরে করে ছেড়ে দেবে!” ফিসফিস করে বলে অনিন্দ্যদা।

এমন সময় ঘরে ঢোকে অসমঞ্জবাবু। ওরা দু’জনেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানায়।

অসমঞ্জবাবুর বয়স পঞ্চাশের আশপাশে। ফর্সা রং। সামান্য ভারী চেহারা। কাঁচাপাকা চুল। মোটা গোঁফ। মুখে মৃদু হাসি। ঢুকতে ঢুকতেই বলেন, “মামণিকে দেখলাম ঘর থেকে বেরোতে। আবার তোমাদের কিছু না কিছু বলে গেছে তো?”

অনিন্দ্যদা একগাল হেসে, “না না, কিছু বলেননি স্যার... জিজ্ঞেস করছিলেন কেমন আছি...”

অসমঞ্জবাবু তাঁর চেয়ারে বসে মাথা নেড়ে বলেন, “মেয়ের যা স্বভাব, লোকজনকে নার্ভাস করে দিয়ে মজা পায়। তা, ইনিই বুঝি এবার থেকে আসবেন? তুমি তো বাইরে চলে যাচ্ছ...” বলে ঘোষের দিকে তাকান অসমঞ্জবাবু।

“আজ্ঞে হ্যাঁ, এই আমাদের ঘোষ, এই এবার থেকে আসবে...”

ঘোষ নামের ছেলেটি ফের নমস্কার করে। মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে নমস্কার নেওয়ার ভঙ্গি করেন অসমঞ্জবাবু। তার পর ঘোষের পরিচয় নেন।

কী করে, কতদূর লেখাপড়া, কোথায় থাকে ইত্যাদি রুটিন কথাবার্তা। ঘোষকে অসমঞ্জ্যবাবুর খারাপ লাগে না। চেহারা বিনয় এবং ভদ্রতার ছাপ আছে। গায়ের রং বেশ পরিষ্কার। চোখমুখ শান্ত, কিন্তু বুদ্ধির ছাপ আছে। ছিপছিপে চেহারা। সামান্য বিষণ্ণতাও যেন ধরা পড়ে অসমঞ্জ্যবাবুর অভিজ্ঞ চোখে। পুরো নাম জিজ্ঞেস করেন। ঘোষ বলে, “শুনে অসমঞ্জ্যবাবু বলেন, ‘নামটা তো মন্দ নয়। তা হলে শুধু ঘোষ কেন?’”

অনিন্দ্যদা বলে, “ওই নামের প্রথম অংশটুকু আমাদের ফাইফরমশ খাটার লোকটার সঙ্গে মিলে যায় কি না, কনফিউশন হয়, সেই জন্যই।”

অসমঞ্জ্যবাবু টেবিলের ডায়ার থেকে চেকবই বের করে তাতে টাকার অঙ্ক বসিয়ে সই করেন। চেকটা কেটে অনিন্দ্যদার হাতে দিয়ে বলেন, “আজ আমাকে একটু বেরোতে হচ্ছে। তোমরা চা খেয়ে যোগা।”

বলে বেরিয়ে গেলেন অসমঞ্জ্যবাবু। তৈরি হয়েই নেমেছিলেন। কোর্টে যাওয়ার সময় হয়েছে হয়তো।

অনিন্দ্য চেকটা একঝলক দেখে হাতের ফোলিয়ো ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। খানিক পর চা এল। পিছু পিছু আবার ঘরে ঢুকল সেই মেয়েটিও। ফের দাঁড়িয়ে উঠতে যাচ্ছিল অনিন্দ্য। মেয়েটিই তাড়াতাড়ি বলল, “আরে বসুন বসুন, আপনাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে এলাম। আজ আমার ইউনিভার্সিটি নেই,” বলে অনিন্দ্য আর ঘোষের হাতে চায়ের কাপ তুলে দেয়।

অনিন্দ্য খুব জড়সড় হয়ে কাপ নেয়, তার পর হেঁ হেঁ করে। ঘোষ অবাক হয়ে ভাবে, অনিন্দ্য মেয়েটাকে এরকম সমীহ করে কেন। কারণটা বুঝতেও তার দেরি হয় না। কারণ, তখনই এক জন মাঝবয়সি মানুষ, সম্ভবত ফাইফরমশ খাটেন, কাঁচুমাচু মুখ করে এসে বললেন, “দিদিমণি, আপনি ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে আনার জন্য চেকটা কি আমাকে দিয়েছিলেন? কোথায় যে রাখলাম মনে করতেই পারছি না...”

মেয়েটি অবাক হয়ে বলে, “তোমার হাতেই তো দিলাম রাখালদা! তুমি যদি তখন বলতে যে চেকটা হারিয়ে ফেলবে, তা হলে তখন না দিয়ে বলতাম ব্যাঙ্কে যাওয়ার সময় আমার কাছ থেকে নিয়ে যোগা।”

অনিন্দ্যদা চায়ে চুমুক দিয়ে বিষম খেল। ঘোষ বুঝল, মেয়েটি মিছরির ছুরি।

রাখালদা লোকটি বলল, “কী করি এখন দিদিমণি! কোথায় যে রাখলাম...”

“ভাল করে খোঁজো রাখালদা। সই করা বেয়ারার্স চেক। হারালে কী হবে, তুমি জানো...” কেটে কেটে কথাগুলো বলল মেয়েটি। নির্দেশ পেয়ে রাখালদা চলে গেল। চেক খুঁজে না পেলে মানুষটার কপালে আজ দুঃখ আছে।

পলকে অনিন্দ্যর দিকে ফিরল মেয়েটি, “চেক পেয়েছেন অনিন্দ্যদা?”

অনিন্দ্য বিগলিত হয়ে বলে, “পেয়েছি ম্যাম।”

“বেশ বেশ, অনিন্দ্যদা, আমাকে একটা ব্যাপারে একটু হেল্প করতে পারবেন প্লিজ?” খুব নরম সুরে বলে মেয়েটি।

অনিন্দ্যদা একটু নার্ভাস গলায় বলে, “হ্যাঁ ম্যাম, বলুন কী করতে পারি...”

“আমার না আজ একটু পার্ক স্ট্রিট যাওয়ার আছে। সঙ্গে কাউকে দরকার। আমাকে হেল্প করার জন্য। আপনাকে তো এখন আপনার সংস্থায় গিয়ে চেক জমা দিতে হবে, আপনার ওই ঘোষ যদি একটু আমার সঙ্গে যায়। মানে, অফ কার্স যদি ঘোষের কোনও আপত্তি না থাকে...” বলে খুব কাতর চোখে তাকায় মেয়েটি।

কিছু কিছু মেয়ে আছে যাদের ফেরানো যায় না। তাদের আবদার কিংবা অনুরোধ যেন আদেশের চেয়েও বেশি। ঘোষদের কলেজে অনন্যা বলে একটি মেয়ে পড়ত। ডানাকাটা পরি বললে কিছুই বলা হয় না। ফচকে সুরেশের কাছে সেই অনন্যা এক দিন একটা মার্কার পেন চেয়েছিল। ফচকে সুরেশ, মানে সুরেশ শ্রীবাস্তবের বাপের বিশাল কাঠগোলা, করাতকল, আরও নানা কারবার। তবে তিনপুরুষের কলকাতাইয়া। ওর মা-জেটিমা কলকাতারই বাঙালি। ফলে ওর বাংলায় এক বিন্দু অবাঙালি টান ছিল না। বরাবর হাতে একটা স্বচ্ছ ফোল্ডারের মধ্যে কিছু কাগজ আর

ইউজ অ্যান্ড থ্রো-একটা পেন নিয়ে কলেজে আসত। পড়াশোনায় মন ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। যে-ছেলেটার কাছে ওই রাফ লুজ কাগজ আর গোটা দুয়েক পেন ছাড়া কিছুই থাকত না, সে-ও অনন্যা চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে মার্কার পেন বের করে অনন্যার হাতে দিয়ে দিয়েছিল। সবক’টা দাঁত দেখিয়ে হেসে বলেছিল, “তুই চাইলে যার কাছে যা নেই, সে তাও দিয়ে দেবে... মার্কার তো তুশু...”

অনন্যা লজ্জা পেয়ে হেসেছিল। আমরা ধরেছিলাম সুরেশকে। রগচটা শ্রেয়দীপ বলেছিল, “অ্যাঁ ছাগল, তোর খাতা বই পেনের ঠিক নেই, পকেটে মার্কার রাখিস কেন রে?”

সুরেশ বাঁকা চোখে তাকিয়েছিল, তার পর বলেছিল, “যাতে অনন্যার মতো সুন্দরী সহজেই আমার মতো হ্যান্ডসামকে মার্ক করে নিতে পারে, তাই জন্য।”

শ্রেয়দীপ একটা চড় হাঁকড়েছিল, কিন্তু ছিপছিপে সুরেশ ঠিক সময়ে হাওয়া হয়ে যাওয়ায় দেবাংশর চড়টা হাওয়াতেই ঘুরে এসেছিল। শ্রেয়দীপ দাঁত কিড়মিড় করে বলেছিল, “এমন ভাবে কলেজে আসে, ভাবতাম সর্বহারা। এখন দেখছি সর্বহারামজাদা।”

এ-ও অনেকটা সে রকমই ব্যাপার। অনিন্দ্য ভাবার সময় নিল না, একেবারে ঘাড় কাত করে বলে দিল, “হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম... ঘোষ আপনার কাজ করে দেবে, নিশ্চয়ই করে দেবে, একশোবার করে দেবে। ওর তো আজ কোনও কাজই নেই। শুধু এই বাড়িটা চিনতে এসেছিল জাস্ট...”

ঘোষের আপত্তি-সম্মতির ধার ধারল না কেউ। ঠিক হয়ে গেল অনিন্দ্য বেরিয়ে যাবে চেক নিয়ে। ঘোষ থাকবে। ম্যাম যখন বেরোবেন, তখন তার সঙ্গে ল্যাংগেট হয়ে পার্ক স্ট্রিট যাবে।

ঘোষকে অসমঞ্জ্য পালিতের সেই চেন্নারেই বসিয়ে রেখে অনিন্দ্য বেরিয়ে পড়ল। ঘোষ অপেক্ষা করতে করতে ঘড়ি দেখতে লাগল। এখন বেলা পৌনে এগারোটো প্রায়। ম্যামের কতক্ষণের কাজ পার্ক স্ট্রিটে? চারটের মধ্যে কি রেহাই পাবে ঘোষ? এনজিও-তে যাওয়া নেই বলে কি ঘোষের নিজস্ব কোনও কাজ থাকতে পারে না!

মহন্তের মরিনি আমরা

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ থেকেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, কী যেন ভয়ঙ্কর ভাইরাস বেরিয়েছে, নাম তার নোভেল করোনা। ভয়ঙ্কর ছোঁয়াছে, মৃত্যুহার যদিও কম, তবু এত বেশি হারে ছড়াচ্ছে যে, সকলকে চিকিৎসা দেওয়াই মুশকিল হচ্ছে! এক জনের হলে সবার হচ্ছে। তার পর মার্চের প্রথমার্ধ পেরোনোর পর শুরু হল লকডাউন। তিন মাস তিন মাস করে অনিদিষ্ট কাল। প্রতিদিন খবরে করোনায় মৃতের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বগামী হচ্ছিল সুস্থ মানুষের হতস্পন্দনও। সে বড় সুখের সময় নয়, সে বড় শাস্তির সময় নয়।

তবে প্রথম থেকেই, কেন যেন, পুরো ব্যাপারটাকেই সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন মিসেস রজনী কর। তাঁর মনে সন্দেহের পিন ফোটে একদিন হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিনতে গিয়ে। করোনা পরিস্থিতিতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিনতে গিয়ে পাড়ার ফার্মেসিতে গিয়ে তিনি যখন দেখলেন, লোকজন লাইন দিয়ে স্যানিটাইজার কিনছে এবং পঁচিশ টাকার স্যানিটাইজার একশো টাকায় বিকোচ্ছে, তখনই তাঁর সন্দেহ হয়। সত্যিই কি করোনাকে যতটা ভয়াবহ করে তুলে ধরা হচ্ছে, করোনা ততটাই ভয়ঙ্কর? এর পিছনে কোনও ব্যবসায়ীচক্র কাজ করছে না তো? তাঁর সন্দেহ আরও জোরালো হয়, যখন খবরের কাগজে জানতে পারেন যে, হসপিটাল আর নার্সিং হোমগুলো করোনায় চিকিৎসার জন্য তিন লাখ-চার লাখ টাকা করে বিল তুলে দিচ্ছে। সে যাই হোক, সন্দেহের বিশদ নিপ্রয়োজন। এক জন মানুষের ব্যক্তিগত সন্দেহ তাঁরই থাকুক, তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই।

তবে করোনা যখন একটু একটু করে কমছে, সেই ২০২১ সালের পুজোর আগে আগে পাড়ার একটা অনুষ্ঠানের কথা মিসেস করের বিশেষ

করে মনে আছে, অনুষ্ঠানটার ঘোষকের জন্য। অনুষ্ঠানটা আর কিছুই নয়, করোনা-দুর্গতদের জন্য ত্রাণ আহরণ। স্থানীয় বিধায়ক একটি মঞ্চ উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর চেলাচামুণ্ডরা পাড়ার সকলকে ডেকে ডেকে সাধ্য মতো সাহায্যের অনুরোধ করছে। করোনায় ঢেউ মোটামুটি থিতুয়ে পড়লেও, কোথাও কোথাও এখনও তাকে কেন্দ্র করে এর ত্রাণ আহ্বান বা ত্রাণ বিতরণ এখনও চলে। মিসেস কর থাকেন রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে। সে দিনের অনুষ্ঠানটা ছিল তাঁর বাড়ির রাস্তার ঠিক মুখটায়া। প্রায় চারটে বাড়ি পরে। কিন্তু একটা মাইক লাগানো হয়েছিল তাঁর বাড়ির ঠিক পাশে। ইচ্ছে না থাকলেও সমস্ত বক্তৃতি কানে ঢুকছিল তাঁর। এবং এমনই আশ্চর্য সে-ঘোষণার ভাষা, কোনও ভাবেই অন্যান্য মঞ্চ হতে পারছিলেন না মিসেস কর। ঘোষকের গলার আওয়াজটাও চেনা চেনা লাগছিল, সেই কারণেই দেখতে বেরিয়েছিলেন।

ঘোষক ছেলেটি বলছিল, “আজ দেড় বছর অধিগত হল, আমরা করোনা মহাকালের প্রাচুর্যে দিন অতিবাহিত করছি। মানুষজন টাকাপয়সা খাবারদাবারের জন্য যত্র তত্র সর্বত্র সন্দিহান চিত্তে পরিভ্রমণ করে চলেছেন। দিবাত্রা তাঁদের একটাই অভিপ্রায়, এই কঠোর পরিস্থিতিতে কী ভাবে তাঁরা স্বজনপোষণ করবেন। সেই জন্যই আমরা উদ্যম বিনিয়োগ করছি, যাতে সাধারণ মানুষের জন্য খাদ্য উৎসর্গ করে আমরা তাঁদের দাঁতে হাসি ফোটাতে পারি। মনে রাখবেন বন্ধুগণ, মুচকি হাসি মানেই মেকি হাসি, মনের হাসি হল দাঁতের হাসি। কারণ, দাঁতই হল মনের দর্পণ। যাক সে কথা, আজ এই শুভ প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে মঞ্চ আলো করে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক এবং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাহেব। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা অকুস্থলে সমাগত হয়ে পড়বেন। তাঁদের যথাযোগ্য অভিবাসন জানাই। তাঁদেরই অপরিসীম অনুপ্রেরণায় আমরা সকলে আজ একই মঞ্চের নীচে একই ছাতার উপরে অবনত হয়ে উঠতে পেরেছি...”

এমন সময় এক জন বয়স্ক লোক ঘোষককে কানে কানে কিছু বলে। ঘোষক তাতে পাত্তা দেয় না, বলে চলে, “হ্যাঁ ঠিকই। আবেগের চোটে আমি একটু উল্টো বলে ফেলেছি। আমরা অপনীত হয়েছি একই মঞ্চের ওপর এবং একই ছাতার নীচে। কিছুই নয়, আজকে এখানে এত বড় বড় মানুষ আপতিত হবেন, মনে পড়লেই আমি আবেগে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছি। কে না জানে, বিধায়ক মানে আলো আর কাউন্সিলর মানে উৎসব। করোনা আমাদের দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ, এতে মাস্কের দমবন্ধ আছে, গোলাপের সুগন্ধ নেই, তবু গুণিজনদের পরমাদরে বরণ করে নিতে আমরা পশ্চাদবর্তী হব না। কিছু মনে করবেন না বন্ধুগণ, পবিত্র এবং আনন্দের মুহূর্তে আমি সূষ্ঠ সুভদ্র বাংলায় আশ্রিত হয়ে পড়ি। যাক সে কথা, পল্লিবাসীদের আমার সপ্রবন্ধ অনুরোধ, নিজ নিজ সাফল্য অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী দান করে কিংবা টাকাপয়সা, পরিধানসম্পদ জামাকাপড় দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে জয়যুক্ত করুন...”

এই আশ্চর্য বাংলা শুনে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস কর। দূরে স্টেজ দেখা যাচ্ছে। স্টেজের ওপর ঘোষককেও। চিনতে অসুবিধে হয় না মিসেস করের। তিনি একতলায় নেমে বাড়ির কোলাপসিবল টেনে লক করে গুটিগুটি পায়ে স্টেজের দিকে এগোন। যখন স্টেজের কাছে পৌঁছিলেন, তখন স্টেজ ঘিরে বেশ ভিড়। সবাই হাসছে। কিন্তু ঘোষকের সে দিকে ভ্রক্ষেপ নেই। সে অক্লান্ত বলে চলেছে, “আমাদের নেতা বলেছেন, অসময়ের বন্ধুই হল ক্ষমতার উৎস। তাই মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সবাইকে অগ্রগণ্য হতে হবে। মনে রাখতে হবে, অসময়ে ত্রাণ যে করিবে দান, ভয় নাই তার ভয় নাই... কারণ, আমাদের দাদা সব সময় তার পাশে থাকবেন। এগিয়ে আসুন বন্ধুরা। মনে রাখবেন, ধনধান্যে পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা— তাকে সুস্থ সুন্দর ও হস্তগত রাখতে আমাদের সকলকে হাত বাড়িয়ে দিতেই হবে। কাজেই আর বিলম্ব নয়... এখনও আমরা রয়েছি শক্ত, করতে বিশ্ব করোনা মুক্ত, আমরা সবাই দাদার ভক্ত... করতেই হবে জয়। একে-একে চলে আসুন, চাল ডাল বিস্কুট ছাতু মুড়ি সুজির প্যাকেট নগদ টাকা কঞ্চল জামাকাপড় যা হোক... মুক্ত হস্তে আমাদের পার্শ্ব দাঁড়িয়ে পরস্পরকে সম্ভ্রষ্ট করুন...”

প্রচুর লোক জমা হল, তারা হাসল প্রাণ খুলে এবং যা পারল দিল হাত খুলে। দানের পেটি ভরে উঠল। স্থানীয় বিধায়ক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। রসিক মানুষ। জানালেন, এমন অশ্রুতপূর্ব বক্তৃতার পর আর কিছু বলে তিনি আসর মাটি করবেন না। তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তিনি তাঁর নিজ দায়িত্বে সমস্ত ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেবেন সুন্দরবনের দুর্ভিক্ষ এবং অতিমারি-পীড়িত মানুষের কাছে। অনুষ্ঠানের শেষে বিধায়ক ওই ঘোষক ছেলেটির পরিচয় জানলেন। ছেলেটি ওই এলাকায় নতুন। বিধায়ক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “বক্তৃতাটা কি তোমার রেডি ছিল ভাই? না হলে এমন অভুত...”

ছেলেটি সলজ্জ হেসে জানিয়েছিল, “না স্যার, পুরোটাই এক্সটেম্পো। দেখছিলাম সকাল থেকে কেউই তেমন আসছেন না, তাই একটু অন্য ভাবে চেষ্টা করলাম।”

বিধায়ক পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, “ভাল থেকো ভাই।”

স্টেজ থেকে নামতেই অনুষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা এসে ছেলেটির হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল একটা খাবারের প্যাকেট। রাধাবল্লভি-আলুর দম আর মিষ্টির ব্যবস্থা হয়েছিল, ছেলেটি জানে। বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই দেখতে পেল একটা বছর দশেক বয়সের ছেলে, তার কোলে একটা ছোট বাচ্চা আর পাশে জামা ধরে দাঁড়িয়ে আছে কোলেরটার চেয়ে একটু বড় একটা বাচ্চা। তিনজনেরই চেহারা ধুলোয় মাখামাখি। পোশাকও মলিন এবং শতচ্ছিন্ন। ছোট দু’জনের নাক ভর্তি সর্দি। ওরা কিছু পাওয়ার আশায় এসেছিল। জানত না সব ত্রাণসামগ্রী সুন্দরবন আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যাবে। তারা দৃশ্যতই হতাশ।

খানিকটা দূর থেকে মিসেস রজনী কর দেখলেন, বক্তৃতা দিয়ে মাতিয়ে দেওয়া ছেলেটি তার হাতের খাবারের প্যাকেটটা এসে তুলে দিল বাচ্চাগুলোর হাতে। মাথায় হাত বুলিয়ে আদরও করে দিল। সামান্য নাক কুঁচকোলেন মিসেস কর। ছেলেটি তাঁর এক তলাতেই পেয়িং গেস্ট থাকে। করোনা ছড়ানোর আগে থেকেই। তিন বছর হয়ে গেলে, ছেলেটার মনটা ওর বকবকে দাঁত আর প্রাণখোলা হাসির মতোই পরিষ্কার। একটু আগে ছেলেটিই বলছিল দাঁতই হল মনের দর্পণ। মনে পড়ে গেল মিসেস করের।

এখনও মিসেস করের মনে আছে সেই দিনটার কথা, যে দিন দালাল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল ছেলেটিকে। বলেছিল, পেয়িং গেস্ট থাকতে চায়। একতলাটা ফাঁকা পড়ে আছে বলে মিসেস করই দালাল লাগিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই এসেছিল ছেলেটি। লম্বা, রোগাটে চেহারা, গায়ের তামাটে রংটা এক কালে ফরসা ছিল বেশ বোঝা যায়। নাক চোখ মুখ পরিষ্কার, দেখলেই মনে হয় মাতৃমুখী ছেলে। চোখে ক্লাস্তির ছাপ, চোখের কোলে সামান্য কালির পোঁচ। মাথার ঘন চুল সামান্য অবিন্যস্ত। পোশাক-আসাকে পরিচ্ছন্নতা আছে, কিন্তু বাছল্য নেই। সামান্য কোঁচকানো, ইস্তির স্পর্শরহিত। টাকাপয়সার টানাটানি থাকাটা অসম্ভব নয়। তবু সব মিলিয়ে প্রথম দর্শনেই ছেলেটিকে ভাল লাগল মিসেস করের। হয়তো অবস্থার বিপাকে পড়েছে, তবু ভাল ঘরের ছেলে বলেই মনে হয়। দালাল পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর মাথা ঝুকিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করার বিনীত ভঙ্গিটিও বেশ ভাল লাগল মিসেস করের।

প্রতিনমস্কার করে বলেছিলেন, “তোমাকে তুমিই বলছি, তোমার নাম কী?”

ছেলেটি মৃদু কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলেছিল, “আঞ্জে, আমার নাম অনন্তবিষ্ণু ঘোষ।”

উড্ডয়ন পর্ব : দ্বিতীয় ভাগ

আবার ফিরে এসেছি আমি। আজ সারা কলকাতার সমস্ত গাড়ি যেন এই সন্ধ্যাবেলায় বিধান সরণিতে এসে জড়ো হয়েছে। ভোরবেলাতেই প্রবল যানজট। শ্যামবাজার থেকে হাতিবাগান পৌঁছোতে কখনও পর্যায়ক্রমশ মিনিট লাগে! আমি হাওড়া পৌঁছোব কখন! আমার যে ট্রেন আছে। আজকের দিনটা খুব সুবিধের নয় বলেই মনে হচ্ছে, বুঝলেন বন্ধুরা। শুভ কাজে এত জ্যাম হওয়া ঠিক নয়। অথচ প্রাজ্ঞজনেরা বলেন, শুভ

কাজে নাকি বাধাবিঘ্ন আসবেই। আমাদের কলেজে শ্রেয়া বলে একটা মেয়ে পড়ত। অনন্যার মতো সুন্দরী না হলেও খুবই ছদ্মক ছাচ্ছে ধরনের বলা যেতে পারে। ছদ্মক ছাচ্ছে কথার সঙ্গ ছলাকলার সম্পর্ক আছে কি না জানি না, তবে শ্রেয়ার সাপেক্ষে বিচার করলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, সম্পর্ক আছে। সেই শ্রেয়া তার বয়স্কদের কখনও কোনও ব্যাপারে হতাশ করত না। শোনা যেত, সপ্তম স্বর্গেরও উপরে যদি কিছু থাকে, তার সফরও শ্রেয়া তার বয়স্কদের করিয়ে দিত। উদার স্বভাবের মেয়ে, এক বয়স্কের বেশি দিন আটকেও থাকত না। সবাইকে সুযোগ দিত। তবে লম্বা লাইন পড়ত বলে আগ্রহীদের দীর্ঘ অপেক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হত। ফচকে সুরেশ একবার অনেক দিন চাল না পেয়ে অধৈর্য হয়ে কী যেন একটা হতাশার কথা বলে ফেলে। তাতে আমাদের সংস্কৃত অনার্সের মোহন আচার্য বলেছিল, “এত সহজে কী হয় রে ভাই! বাধাবিঘ্ন তো আসবেই, এই কারণেই তো শাস্ত্রে বলে, শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।”

মোহন ছিল বয়সের তুলনায় খুব গম্ভীর। কথায় কথায় বলত, “আমি নবদ্বীপের পণ্ডিত বংশের ছেলে। সংস্কৃত আমার রক্তে।”

না, আর এদিক-ওদিক নয়। এবার কাজের কথায় আসার পালা। সেই যে শুরুতে ট্যাক্সিতে উঠে নিজের গল্প বলব বলে শুরু করেছিলাম, তার পর এতখানি গল্প এগিয়ে গেল, পাঠকবন্ধুরা তো নিশ্চয়ই বিরক্তির শেষ সীমায়! এতশত ঘটনার মধ্যে আমি, মানে ট্যাক্সি চেপে হাওড়া স্টেশনগামী সেই পলাতক ছেলেকে কই? নিজে একটু শুরু করে, তার পর হাপিশ হয়ে গিয়ে আমি কাদের গল্প শোনাতে বসেছি! হাজারো ব্যস্ততা ফেলে আপনারা একটু গল্প-উপন্যাস পড়ছেন বলে আপনারা কি সময়ের দাম নেই?

ভুল বুঝবেন না পাঠকবন্ধুরা। আমিই সেই রেশমকীট, যে এত দিন ধরে বোনা গুটির মধ্যে ছিলাম। সেই গুটি কেটে এবার মথ হয়ে উড়ে যেতে চলেছি। আমার গল্পই শুনছিলেন এতক্ষণ। একটু ধরিয়ে দিলেই ব্যাপারটা জলবৎ হয়ে যাবে। আসলে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাইছি। আসলে একই গল্প নানা জায়গা থেকে বললে আর এক গল্প থাকে না, নতুন নতুন গল্পো বলে মনে হয়। মনোটিনি আসে না। কষ্ট করে পড়ছেন, আপনারা সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার চেষ্টা আর কী!

আমি, মানে এই অধমেরই ভাল নাম অনন্তবিষ্ণু ঘোষ। আমাকে কনকবাবু অনন্ত বলে ডাকেন। আমি একটা এনজিও-র হয়ে কাজ করি। কাজটা পড়ানো। সমাজে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের আমি পড়াই। বিভিন্ন অনুন্নত এলাকায় আমাদের এনজিও ঘর ভাড়া করে পড়ানোর ব্যবস্থা করেছে। আমি সমাজতন্ত্রের ছাত্র বটে, কিন্তু পড়াই প্রধানত ছোটদেরই। খুব বেশি হলে ইলেন্ডেন-টুয়েলভ। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, গোলাপি আমার কাছেই পড়তে আসে। কোচিংটা আর সি নন্দী লেনের কাছে। ওখানে লোকজন আমার পুরো নামটা জানে না। আমার নামের অনন্তটুকু ছেঁটে ফেলে বিষ্ণু নামটাই ওখানে চালু। তার পর ‘বিষ্ণু’-তে এসে ঠেকেছি। কেউ কেউ বিশুদ্ধ বলে। বিশুদ্ধ নামটাই-বা খারাপ কী! ব আর তালব্য শ আছে বটে, তা বলে শ-কার ব-কার তো নয়।

আমাদের এনজিও-র সর্বক্ষণের কর্মী অনিন্দ্যদা। অনিন্দ্য বিশ্বাস। আমার চেয়ে সিনিয়র, কিন্তু কাজের কোনও বাধবিচার নেই, দরকার পড়লেই অনিন্দ্যদা হাজির। অনিন্দ্যদার সঙ্গেই সে দিন প্রথম সন্টলেকের বিবি ব্লকে গিয়েছিলাম অ্যাডভোকেট অসমঞ্জ্যবাবুর বাড়ি। তার পর থেকে মাসে মাসেই যেতে হয়। প্রথম দিনই পার্ক স্ট্রিটে যেতে হয়েছিল অসমঞ্জ্যবাবুর মেয়ে কুসুমিতা ম্যামের সঙ্গে। তিনি একজন সামাজিক মানুষ। ঠিক যেন আফ্রিকা। সেই যে ছোটবেলায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চাঁদের পাহাড়’-এ পড়েছিলাম, ‘আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে— কিন্তু আফ্রিকা ভয়ঙ্কর। দেখতে বাবলা বনে ভর্তি বাংলাদেশের মাঠের মতো দেখালে কী হবে, আফ্রিকা অজানা মৃত্যুসঙ্কুল! যেখানে সেখানে অতর্কিত নিষ্ঠুর মৃত্যুর ফাঁদ পাতা— পর মুহূর্তে কী ঘটবে, এ মুহূর্তে তা কেউ বলতে পারে না।’ কুসুমিতা ম্যাম ঠিক তেমনি।

সে দিন তো আমাকে ফেলে রেখে অনিন্দ্যদা চম্পট দিল। তার পর বসে আছি তো বসেই আছি। ম্যাডাম আর নামেন না। প্রায় পঁয়তাল্লিশ

মিনিট পর তিনি তৈরি হয়ে নামলেন। ব্লু ডেনিম, সাদা কুর্তি। তিনি খুবই সুন্দরী, আগেই বলা হয়েছে। তার ওপর রূপটান যোগ হয়ে তো আর কথাই নেই। তার ওপর গন্ধ, মানে ইয়ে পারফিউমের তো কথাই নেই। মনেই হচ্ছে না পারফিউম। মনে হচ্ছিল বর্ষায় ভিজে বেলফুলের বাগানে দাঁড়িয়ে আছি। কী ন্যাচারাল সে গন্ধ, না শুকলে পেতায় যাবেন না। তিনি ঘরে আসতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, “চলুন।”

আমি পেছন পেছন চললাম।

উর্দি পরা ড্রাইভার ম্যামকে দরজা খুলে দিল। আমাকেও সৌজন্য দেখাতে এসেছিল, আমি অ্যালাও করলাম না। ম্যাম গাড়িতে ওঠার পর নিজেই ড্রাইভারের পাশের সিটে উঠে বসে পড়লাম। ড্রাইভার উঠে গাড়ি চালাতে শুরু করল। গাড়ির মধ্যেও বেশ সুন্দর একটা গন্ধ। তবে সে গন্ধ খুবই হালকা। বেলফুলের গন্ধটাই সবাইকে চাপা দিয়ে দিচ্ছে।

মিনিট দশেক গাড়ি চলেছে কি চলেনি, পিছনের সিট থেকে স্পষ্ট নির্দেশ ভেসে এল, “গুপিদা, গাড়ি থামাও।”

বুঝলাম, সারথির নাম গুপি। সে তড়িঘড়ি রাস্তার একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। তার পর ম্যাডামের বক্তব্য ভেসে এল, “শুনুন ঘোষ, আমি এ ভাবে অচেনা অজানা কারও সঙ্গে এতটা রাস্তা যেতে পারব না।”

কী জ্বালা! আমি কি যেতে চেয়েছিলাম! খুব খারাপ লাগল। অকারণে এরকম অপমানের কারণ কী! আমাদের এনজিও ওঁর বাবার সাহায্যপ্রার্থী, তাই? কিছু বললাম না। আমি অপমান গায়ে মাখি না, অপমান নিয়ে মাথাও ঘামাই না। তবু আচমকা কেউ এ রকম করে বললে কষ্ট হয়। চূপচাপ গাড়ির দরজা খুলে বেরোলাম। এক বার মনে হল কিছু না বলে চলে যাই। তার পর মনে হল, তাতে যদি ম্যামের খারাপ লাগে! যদি অনুদান বন্ধ হয়ে যায়! আমি একটা অচল পয়সা, আমার মানসম্মান মানে জাঙিয়ার বুকপকেট, নটেশাকের ক্যাশমেমো। নিজেকে খামোকা বড় করতে গিয়ে ম্যামকে চটানো ঠিক হবে না। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে ঢোক গিলে পিছনের জানলার কাছে গেলাম। নিচু হয়ে বললাম, “তা হলে আমি আসি ম্যাম?” গলার আওয়াজটা নিজের কানেই বড় বিষম আর থমথমে শোনাল।

ম্যাম সারা পৃথিবীর বিশ্বয় তাঁর মুখে এনে আমার দিকে তাকালেন, “আমি কি আপনাকে চলে যেতে বললাম, ঘোষ?”

এবার আমার মুখে কথা ফুটল না, আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

ম্যাম বললেন, “আমি তো বললাম যে, অচেনা অজানা কারও সঙ্গে এতটা রাস্তা যেতে পারব না। সেই কারণে আপনার সঙ্গে আমার ঠিকমতো চোখোচোখি হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণেই গাড়ি থামাতে বললাম। পিছনে এসে বসুন।”

আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। দেখলাম ম্যাম একেবারে ডান দিকের জানলার কাছে সরে গেলেন। সিটের মাঝে ম্যামের হাতব্যাগ। পুতুলের মতো দরজা খুলে পিছনের সিটে বাঁ দিক ঘেঁষে বসলাম। বেলফুলের গন্ধ আরও ঘন হয়ে যেন ঘিরে ধরল আমায়।

তার পর শুরু হল প্রশ্নমালা। ভাল লাগছিল না নিজের সাতকাহন বলতে। বলার মতো তো কিছু নয়ও। ছোটবেলায় মা মারা গেছেন। তার পর বাবা ফের বিয়ে করতেই মামার হাত ধরে বাড়ি ছাড়া। শ্যামবাজারের বিপিন মিত্র লেনে মামার টানাটানির সংসারে মামির ঠান্ডা ব্যবহার আর অনাদরে বেড়ে ওঠা। দাঁতে দাঁত চেপে বড় হলাম। বারো বছর মামার বাড়িতেই থাকা। তার পর যে দিন ডানায় একটু জোর এল, মামার বাড়ি ছাড়ি। দুই মামাতো বোন, রুম আর ঝুম বড় হয়েছে। তাদের থাকা, পড়াশোনার জন্য জায়গা দরকার। তত দিনে অবশ্য পরিস্থিতি বদলে গেছিল। আমার দায়িত্ব কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই কিছুটা অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। মামির প্রথমদিককার অনাদর বা বিরাগ অনেকটাই কমে এসেছিল। এ সব আপনারা শুনেছেন একটু আগে। আমার সঙ্গে ইশকুলে পড়ত, সেই শুভজয়, আর তার স্ত্রী বিদিতার প্রসঙ্গে। বিদিতা মামার বাড়ির কাছাকাছিই থাকত। আমার বড় মামাতো বোন রুমের ইশকুলে পড়ত। বিদিতার মনের কথা আমি জানতে পেরেছিলাম অনেক পরে। তখন সে শুভজয়ের ঘরনি।

শুভজয় আমার সঙ্গে পড়ত বটে, ইশকুল পাশ করার পর দীর্ঘদিন যোগাযোগ ছিল না। যোগাযোগ থাকার কথাও নয়। ছেলেটাকে আমার খুব একটা সুবিধের লাগত না। অকারণে লোককে নাকাল করে মজা পেত। পরে ফেসবুকে আবার যোগাযোগ। তার পর দেখাসাক্ষাৎ। সে কথা পরে।

ন'বছর আগে যখন আমার একুশে পা, তখনই আমার বাড়ি ছেড়ে বেরোই। আমার বাড়ি ছাড়ার পর মেসেই ছিলাম বছর পাঁচেক। শেষ অবধি মেসটা উঠে গেল। তখনই ভাড়াবাড়ি বা পেয়িং গেস্ট খোঁজার প্রয়োজন হয়েছিল। আমার সঙ্গে ছিল পাড়ারই এক বন্ধু রটাই। ওদের পরিবারের ইট বালি সিমেন্টের পুরনো ব্যবসা। সেই কারণে জমি-বাড়ির দালালদের সঙ্গে কিছু চেনাজানা আছে। রটাইয়ের মাধ্যমেই আমার ঢেকুর দাসের সঙ্গে পরিচয়। ঢেকুর দাস কমিশনের বিনিময়ে জমি বাড়ি ফ্ল্যাট মেস পিজির খোঁজ দেয়। ঢেকুর দাসই আমাকে মিসেস করের কাছে পেয়িং গেস্ট থাকার সুলুক দেখিয়েছিল। প্রথম দিন ভদ্রলোকের নাম শুনে চমকে গিয়েছিলাম। রটাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “এ কী রে! এ রকম অদ্ভুত নাম কেন!”

রটাই বলেছিল, “ঢেকুর নিজেই সে কথা সবাইকে বলে বেড়ায়। সে জন্মেছে বেলা দুটোর সময়। তখন ওর বাবা নাকি হাসপাতালের পাশের গলিতে একটা পাইস হোটেলে বসে ভাত খেয়ে ঢেকুর তুলছিল। ঢেকুর তুলতে তুলতে ছেলের জন্মের খবর, তাই নাম রাখলেন ঢেকুর। ঢেকুরের ভাল নাম হরিপদ না তারাপদ, কী যেন একটা। সেটা ধরে কেউ ডাকেও না।”

আমি বলেছিলাম, “যাক বাবা। ছেলে জন্মানোর খবরের সময় সোজা ঢেকুর তুলছিলেন। ভাগ্যিস উল্টো ঢেকুর তোলেননি। তা হলে কী নাম রাখতেন কে জানে!”

রটাই ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল, “উল্টো ঢেকুর আবার কী?”

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, “সে কী কথা! উল্টো ঢেকুর জানিস না?”

রটাই ভুরু কঁচকে বলেছিল, “না। জীবনে এ রকম অদ্ভুত কথা শুনিনি।”

আমাকে বাধ্য হয়ে বুঝিয়ে দিতে হয়েছিল, “শোন, শরীরে জন্মে থাকা বায়ু দুটো রাস্তা দিয়ে বাইরে বেরোয়। সোজা রাস্তাটা হল মুখ। সেখান দিয়ে বেরোলে নর্মাল ঢেকুর বা সোজা ঢেকুর। আর অন্য রাস্তাটা হল ইয়ে, মুখের উল্টো দিক। সেখান দিয়ে বায়ু নির্গত হলে তাকে বলে উল্টো ঢেকুর...”

আমি আরও কিছু বলতে পারতাম, তখনই ঢেকুরবাবু সেখানে এসে গেছিলেন। এ সব কথা আর বিশদে কুসুমিতা ম্যামকে বললাম না। ঢেকুরবাবুই আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে। মিসেস কর একাই থাকেন। তার একতলায় আমি পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতে শুরু করি। তখন ২০১৯-এর মাঝামাঝি। তখনও করোনা নিয়ে গোলমাল শুরু হয়নি। মিসেস কর অত্যন্ত শান্ত এবং ঝামেলাহীন মহিলা। মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হয়। দিনে দু'বার খাবার পাই। একতলার মিটার আলাদা। ইলেকট্রিকের খরচ ভাড়ার সঙ্গে আলাদা করে দিয়ে দিই। রান্নার লোক আছে, কাজের লোক আছে। কাজের লোকই খাবার দিয়ে যায়। কোনও দিন না খেলে সকাল ন'টার মধ্যে জানাতে হয়। তা এই সব মেনে-টেনে ভালই আছি। সপ্তাহান্তে মামার বাড়ি দেখা করতে যাই।

এই সমস্ত কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানলেন কুসুমিতা ম্যাম। মনে হচ্ছিল, একবার জিজ্ঞেস করি, ‘এত কথা জেনে কী করবেন ম্যাম! পাত্রীটাত্রী দেখবেন নাকি!’ কিন্তু জিজ্ঞেস করিনি। বড়লোকদের আমি খুব ভয় পাই। ম্যাম যদি চাঁদ হন, আমি বামনও নই, নেহাত লিলিপুট। দূরত্বটা মৃদু ইয়ার্কি কিংবা লঘু চালের কথাবার্তার পক্ষেও দুষ্টর। দূরত্ব কখনও ভুলি না আমি। সম্মান বজায় রাখতে গেলে মানুষের সঙ্গে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখা খুব দরকার। আর গরিব মানুষের সম্মান ছাড়া আছোঁটা কী! তা ছাড়া ম্যামের ভুরু-কোঁচকানো ঠোঁট-কামড়ানো গম্ভীর মুখ দেখলে মজা-টজা বিশেষ আসে না। আমার থেকে বয়সে ছোটই হবেন, কিন্তু গাভীরে

ভারে তা বোঝা যায় না।

আর হ্যাঁ, পার্ক স্ট্রিট? সে দিন পার্ক স্ট্রিট আসতেই ড্রাইভার গুপিদা বলেছিল, “পার্ক স্ট্রিট এসে গেছে দিদিমণি।”

“আমি পার্ক স্ট্রিট চিনি গুপিদা। তুমি ময়দান চলো। মেট্রোর রুট ধরে যাবে...” ঠান্ডা গলায় বলেছিলেন ম্যাম।

না, সে দিন ময়দানেও নামিনি আমরা। আমাকে জেরা করা শেষ হয়নি বলেই বোধ হয়। ময়দান থেকে প্রায় রবীন্দ্র সরোবর পর্যন্ত গিয়ে ম্যামের মনে হয়েছিল হয়তো যে, সে দিনকার মতো যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই বললেন, “গুপিদা, গাড়ি যোরাও, আমি ফিরব। সোজা বাড়ি। তোমাকে কোথায় নামাব, ঘোষ?”

প্রথম প্রথম তো আপনিই বলছিলেন, হঠাৎ তুমি শুনে কি সামান্য চমকে উঠেছিলাম? সে চমক কি মুখে ফুটে উঠেছিল? ঠিক মনে নেই। ম্যাম নিজেই বলেছিলেন, “আমি আবার কাউকে বেশি ক্ষণ আপনি-আজ্ঞে করতে পারি না। তোমাকে তুমি বললে আশা করি মাইন্ড করবে না।”

আমি সম্মতিসূচক হাসলাম। আমার আবার মাইন্ড!

“কোথায় নামবে বললে না তো?”

আন্দাজ করেছিলাম গাড়ি আবার মেট্রো স্টেশনগুলো ছুঁয়েই ফিরবে। তার পর শোভাবাজার থেকে ডান দিকে অরবিন্দ সরণি ধরে বাঁক নেবে উল্টোডাঙার দিকে। তাই বলেছিলাম, “শোভাবাজার মেট্রোর কাছে নামালেই হবে।” ওখান থেকে আর সি নন্দী লেন বেশি দূর নয়। পড়াতে যাওয়া আছে। বিকেল বিকেলই পৌঁছোতে পারব।

ফেরার পথে আর একটাও কথা বলেননি ম্যাম।

গুপিদা শোভাবাজারে গাড়ি দাঁড় করাল। আমি নেমে পড়লাম। জানলা দিয়ে ঝুঁকে বললাম, “আসি ম্যাম,” বলে নিজেরই কেমন বোকা বোকা লাগল। ম্যাম মন দিয়ে মোবাইল স্ক্রল করছেন। আমার কথা হয়তো শুনতেই পেলেন না। গাড়ি ছেড়ে দিল। আমি হাঁটা লাগলাম কোচিং ক্লাসের উদ্দেশ্যে।

অনাদর তাচ্ছিল্য অবহেলা বড় একটা ছুঁতে পারে না আমায়। ছোট থেকেই অভ্যস্ত। যার মা নেই, বাবা যাকে ভুলে যায়, কখনও খোঁজ নেয় না, তাকে আর কে কেমন করে কষ্ট দেবে! আমি সব কিছু থেকে দূরে সরে থাকি। নিজেকে প্রত্যাহার করে বেঁচে থাকি। তবু জড়িয়ে পড়তে হয়। সেই কারণেই এবার সত্যি সত্যি দূরে চলে যাওয়া।

হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়বে। কলকাতা, আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে? কলকাতার সঙ্গে কবে দেখা হবে জানি না, তবে আপনাদের কাছে ফিরব শিগগিরই, উড্ডয়ন পর্বের তৃতীয় ভাগ নিয়ে।

মোরা মায়াজাল গাঁথি

“করোনা যে কাকে কাকে কী ভাবে মেরে ফেলল, সে কথা আর কেউ না বুঝুক আমি বুঝি। অনেক ধরনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমার বড় হয়ে ওঠা, যার মধ্যে করোনাই সবচেয়ে সাম্প্রতিক। ছোটবেলা থেকেই নানা অশান্তি আমার সঙ্গী। বিয়ের পরের কথা ছেড়ে দিন, বাপের বাড়িতেও কোনও দিন শান্তি পাইনি একফোঁটা। বলেছিলাম, আমার বিয়ের আগের কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমার বাবা-মা'র ছ'টি সন্তান। আমি সবার ছোট। আমার এক দাদা। চার দিদি। প্রথম সন্তান মেয়ে হওয়ার পর থেকেই আমার বাবা একটি ছেলের জন্য খেপে ওঠেন। সেই ভাবেই আরও তিন মেয়ে। তবু বাবাকে নিরস্ত করা যায়নি। পঞ্চম সন্তান হয় ছেলে। শুনেছি, সে দিন বাবা আনন্দে পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলেন। বিরাট ধুমধাম করে অন্নপ্রাশন করেছিলেন। আমার চার দিদি, যাদের ভাগ্যে অন্নপ্রাশন তো দূরে থাক, জন্মদিনে পায়েরসটুকুও জোটে না, তারা অবাক হয়ে গেছিল অন্নপ্রাশনের ঘটনা দেখে।

“মায়ের কাছে শুনেছি, অন্নপ্রাশনের পর মাস খানেকও নাকি কাটেনি, শুরু হয়েছিল বাবার ঘ্যানঘ্যান। বাবার বক্তব্য ছিল, বাবার খারাপ গৃহদশা নাকি কেটে গেছে, তাই ছেলে হয়েছে। এবার শুধু ছেলেই হবে। চারটে মেয়ে বিয়ে দেওয়া কি সোজা কথা, তিনি তো পথে বসে যাবেন! তাই

বেশি কিছু না, বাবার দাবি, আর একবার... ছেলে হবেই। বাবা নিশ্চিত। অনেক বিক্ষোভ বিদ্রোহের পর চোখে জল নিয়েও রাজি হয়েছিল মা। জানেন বন্ধুরা, আমার ধারণা, মেয়েরা কোনও দিনই রাজি হয় না, তাদের রাজি হতে বাধ্য করে সিস্টেম। তাদের রাজি হতে বাধ্য করে নির্লজ্জ পুরুষতন্ত্র... সরি, আমি একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছি, কিন্তু কী করব বলুন... যতবারই এই ঘটনাগুলো মনে পড়ে, ততবারই... যাকগে, যে কথা বলছিলাম, আমার দাদার পরে আমার বাবা-মা আর-একটি ছেলের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। হলাম আমি। আমার বাবা শোকে দুঃখে পাগলের মতো হয়ে গেছিলেন।

“বড় হয়ে কাকিমার কাছে শুনেছি, জন্মের রাতে আমার কাকিমা সারা রাত সদ্যোজাত আমাকে আর আমার মাকে পাহারা দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি দেখেছিলেন, রাতে সবার খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে আমার বাবা চোরের মতো চুপিচুপি রান্নাঘর থেকে নুনের কৌটো সরিয়ে এনে নিজের ঘরে রেখেছিলেন। কাকিমার মন কু গিয়েছিল। তিনি সারা রাত আঁতুড় পাহারা দিয়েছিলেন। আমার আর আমার মায়ের কাছে কাউকে খেঁষতে দেননি। আপনারা হয়তো বলবেন, আমার কাকিমার কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস কী জানেন, আমি আমার কাকিমাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ঘেঁষা করি। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, তিনি আমার বহু জন্মের শ্রুততার শোধ নিয়েছেন সেই রাস্তার। একটা মৃত্যু আটকে দিয়েছেন, যাতে সারা জীবন আমি জীবন্মুতের মতো বেঁচে থাকি, আর বারবার মৃত্যুযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হই। বাবা আর স্বামীর চটি বেস্ট জুতো চেলাকাঠের সোহাগ আমাকে প্রতিমুহূর্তে মনে করিয়ে দিয়েছে, জন্মের রাতে আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আসলে কাকিমাই আমাকে সবচেয়ে বেশি যত্নগাদায়ক মৃত্যুটা উপহার দিয়েছেন, যার নাম বেঁচে থাকা।

“আমার কাকা, কাকিমার মতো ছিলেন না। কাকার দুই ছেলে। তাই উঠতে-বসতে বাবাকে খোঁচা মারতে ছাড়ত না কাকা। বলত, ‘বুঝলে দাদা, তোমার লাস্ট মেয়েটার নাম কী হওয়া উচিত বলো তো?’ ‘অতি লোভে তাঁতি নষ্ট’ বলে হ্যা হ্যা করে হাসত। আর সে সব দিনগুলোতেই, কারণে অকারণে বাবার মারে আমার জ্বর এসে যেত। জ্বরের ঘোরের স্বপ্ন দেখতাম বাবা আমাকে মারছেন, আর আমি ভয়ে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি। বলতে কষ্ট হয় বন্ধুরা, ক্লাস সেভেন-এইট পর্যন্তও বাবার অক্লান্ত মারে নিজেকে আটকাতে না পেরে জামাকাপড় নোংরা করে ফেলেছি আমি...”

এই জায়গাটায় চোখে-মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলতে হবে। আর তার পর ফোঁপানি মিশিয়ে, “সরি বন্ধুরা, আজ এখানেই শেষ করছি, আজ আর পারছি না। খুব শিগগিরই আসব পরের এপিসোড নিয়ে... ভাল থাকবেন সবাই,” বলে অফ হয়ে যেতে হবে।

এই ছিল স্ক্রিপ্ট। পড়ে হাঁ হয়ে গেছিল বিদিতা। এগুলো কী লিখেছে শুভজয়! ও কি পারভাট!

করোনার বামেলায় চাকরি যাওয়ার পর শুভজয় যে-ইউটিউবকে কাজে লাগিয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে, সে কথা বিদিতা আগেই বুঝেছিল। কিন্তু তাতে মেকআপ কী কাজে লাগবে, সেটা প্রথমে ধরতে পারেনি। যে দিন রাস্তার শুভজয় তার সব প্ল্যানটা খুলে বলল, শুনে চমকে উঠেছিল বিদিতা। কী সাংঘাতিক প্ল্যান! ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছিল, “এ তো মিথ্যে মিথ্যে লোক ঠাকানো!”

শুনে খিঁচিয়ে উঠেছিল শুভজয়, “সতীপনা ধুয়ে জল খেলে কি পেট ভরবে! মিথ্যে কথা বেচে না লোকে? মিথ্যে মিথ্যে বানানো গল্পো লিখে লেখকরা রোজগার করে না? ফিল্ম মেকাররা সেই মিথ্যেটাকে বড় পর্দায় দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা রোজগার করে না? আমরা করলেই দোষ? তোমার ফালতু কথা তোমার কাছে রাখো, আর যা বলছি তাই করো। না হলে সবাই মিলে উপোস করতে হবে বলে দিচ্ছি।”

বিদিতা আমতা আমতা করে বলেছিল, “তুমি যে বলেছিলে, তোমার তিন লাখ টাকার একটা ফিল্ম ডিপোজিট আছে, সেটা ভাঙাবে...”

পাঁচন খাওয়ার মতো মুখে চুক চাক করে নানা বিরক্তিসূচক আওয়াজ করেছিল শুভজয়, তার পর বলেছিল, “অলক্ষী মেয়েছেলের স্বভাবই

এই। টাকা রোজগারের ত্রিসীমানায় নেই, খালি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমানো টাকা খরচের দিকে নজর। এই জন্য তোমার কিছু হল না। তুমি আমারও কিছু হতে দেবে না। সত্যি, এত লোকের বিয়ে হয়, তোমার মতো অপোগণ্ড বৌ তো কারও জোটে না। আমার কপালটাই সোনা দিয়ে বাঁধানো...” বলে আরও ঘণ্টাখানেক বিলাপ করেছিল শুভজয়।

শুভজয়ের প্ল্যানে রাজি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না বিদিতার। রাজি হতে হয়েছিল ভিডিও ব্লগ, মানে ব্লগে কাজ করতে। সেই থেকেই শুরু হল ‘অলক্ষে অলক্ষী’— এক গৃহবধূর আত্মজীবনী। সারা দিন ধরে ভেবে ভেবে স্ক্রিপ্ট লিখত শুভজয়, আর যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সেটাকে তুলে ধরত বিদিতা।

পুরনো ছেঁড়া রংচটা শাড়ি বা সালায়ার কামিজ, যেগুলো ফেলে দেবে বলে রেখে দিয়েছিল বিদিতা, সেগুলোকে ফের গিঁট বাঁধা প্লাস্টিক খুলে বের করল শুভজয়। চুলে তেল, মুখে ময়শ্চারাইজার এবং অন্যান্য প্রসাধনী ত্যাগ করতে হল বিদিতাকে। ফোনে এক পরিচিত মেকআপ আর্টিস্টের থেকে শুভজয় বিশদে জেনে নিল কেমন করে মূলতানি মাটি কিংবা তিলকমাটি গুলে শুকিয়ে ঠোঁটে খড়ি ওঠাতে হয়, পেট্রোলিয়াম জেলি আর কাজল মিশিয়ে চোখের তলায় কালি ফেলতে হয়। তার পর শুরু হল ব্লগ। প্রথম প্রথম রিহাসাল পছন্দ না হওয়ায় বিদিতার একবেলার খাওয়া বন্ধ করল শুভজয়। কথাটা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি বিদিতা। শুভজয় বলেছিল, “দুপুরে শুট হবে। যতক্ষণ না শুট হবে, তোমার খাওয়াদাওয়া বন্ধ। চোখে-মুখে ক্ষুধার্ত শুকনো ভাবটা ফোটাতে হবে। না হলে তোমার দুঃখের গল্প বিশ্বাস করবে না কেউ। পাবলিক আজকাল বহুত সেয়ানা।”

ভিডিও শুটের দিন সারা সকাল কিছু খেতে পায় না বিদিতা। শুভজয় জানে তার গ্যাসট্রাইটিসের সমস্যা আছে। বিকেল থেকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয় পেটে। গ্যাসট্রাইটিসের ওষুধও কাজ করে না এক- এক সময়। ডাক্তার দেখানোর কথা বললেই আকাশ থেকে পড়ে শুভজয়, “তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? চার দিকে করোনো পেশেন্ট থিকথিক করছে, আর তার মধ্যে তুমি যাবে ডাক্তারখানায়! শেষে টিটেনাস নিতে গিয়ে গ্যাংগ্রিন বাধিয়ে আসবে... শোনো, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরই একবেলা খাওয়া জোটে, একবেলা উপোস করতে হয়। তাতে কি তারা সব পটাপট পটল তোলে? এ ভাবেই কয়েক মাস চালাও, সংসারের আয়পয় বাড়ুক, ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ঠাকুরের দয়ায়, ভিউ সাবস্ক্রাইবার তো মন্দ হচ্ছে না দেখছই! বেশি ছটফট করতে গিয়ে কি শেষে নিজের বাড়ি ভাতে নিজেই ছাই দেবে?”

বিদিতা অবাক হতেও ভুলে যায়। শুভজয়ের অনুমান নির্ভুল। আজও মানুষের দুর্দশা আর কষ্টের গল্পই মানুষের সবচেয়ে বড় বিনোদন। যন্ত্রণা আর বঞ্চনার সিংহ যখন কোনও দুর্ভাগাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, তখনই কোটি কোটি হাতের উন্নত করতালিতে মুখরিত হয় জীবনের কলোসিয়াম। হু হু করে বাড়ে ‘অলক্ষে অলক্ষী’-র ভিউ এবং সাবস্ক্রাইবার। এক বছরের মধ্যে এক হাজারের ওপর সাবস্ক্রাইবার আর চার হাজার ঘণ্টা পাবলিক ওয়াচ আওয়ারের স্বপ্নে বঁদে থাকে শুভজয়। আর সাজানো মিথ্যেগুলোকেই যেন নিজের করে নিতে নিতে অলক্ষী ভাবে, আজ যদি সে সেই ছেলেটার সঙ্গে থাকত!

পরক্ষণেই তার মনে পড়ে, সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণার সঙ্গে দূরত্ব বাড়াবে বলেই তো আস্ত সবার চোখের আড়ালে চলে গেছে। তখন কি বিদিতা ভাবতে পেরেছিল আবার তার সঙ্গে দেখা হবে? সে আসবে এই বাড়িতেই?

নূতন যুগের ভোরে

তেরো বছর বয়সে ক্লাস সেভেনে উঠতে না পেরে বাপ সুদেবের কাছে বেদম ঠ্যাঙানি খেয়েছিলেন তেলঙ্গাবাগানের জয়দেব দত্ত। তখনই পড়াশোনায় জলাঞ্জলি, স্বাধীন উপার্জনের চেষ্টা শুরু। ঠাম্মার গোপন কৌটো হাতিয়ে বাহান্ডর টাকা মেরে সেই টাকার তেঁতুল কেনেন জয়দেব। সে আজ থেকে বছর সত্তর আগের কথা। বাড়ির রান্নার লোকটির সঙ্গে



ব্যবস্থা করে সমস্ত তেঁতুল থেকে বীজ ছাড়িয়ে তেঁতুলের চাটনি তৈরি করান। সেটা বিক্রি করেন পাড়ার শিঙাড়া-তেলেভাজার দোকানে। তার পর এক দেহাতি মুচির কাছে শেখা বিদ্যে কাজে লাগিয়ে তেঁতুলের বীজ সেদ্ধ করে তৈরি করেছিলেন কড়া আঠা। সে আঠা প্রধানত মুচিরা জুতোর চামড়া পেস্ট করার কাজে লাগায়। সেই আঠা জয়দেব স্থানীয় মুচিদের বিক্রি করেন। মোট হয় একশো তিরিশ টাকা। সেখান থেকে রামার লোককে কিছু দিয়ে আবার তেঁতুল কেনেন এবং একই ভাবে চাটনি আর আঠা তৈরি করে বিক্রি শুরু করেন। ছেলের বুদ্ধি এবং উদ্যোগ দেখে সুদেব বুঝেছিলেন, লেখাপড়া এ ছেলের জন্য নয়। বছর পাঁচেক পর থেকে তিনিও কিছু মূলধন জোগান।

কালক্রমে তেঁতুলের চাটনি বন্ধ হয়ে যায় এবং আঠার কারবার ফলাও হয়ে ওঠে। ছেলে দেবায়নকে রসায়ন পড়ান, বিদেশে পাঠান এবং উন্নত মানের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাডহিসিভ তৈরির প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করেন। আঠার কারবারকেই উন্নতির শিখরে নিয়ে যান দেবায়ন। ‘অ্যাডোবন্ড’ নামক কোম্পানিটি সারা দেশে তার উৎপাদন সরবরাহ করে। জয়দেব আশি পেরিয়ে চোখ বুজেছেন বছর তিনেক হল। ‘অ্যাডোবন্ড’-এর সর্বময় কর্তা দেবায়ন দত্তর বয়স এখন পঞ্চাশ। ছেলে উপায়ন বিলেত থেকে রসায়ন এবং ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেছে বছর দুয়েক হল। তার পর থেকেই দেবায়ন তাঁর একমাত্র ছেলেকে অফিসে নিয়ে আসছেন এবং কাজকর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে বর্তমানের মালিক ব্যাটন হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ভবিষ্যতের মালিককে প্রস্তুত করে দিচ্ছেন। এই হেড অফিসটি সন্টলেকের সেক্টর ফাইভে। জিএন ব্লকে। দেবায়নবাবুরাও আর তেলেঙ্গাবাগানে থাকেন না। তাঁরা থাকেন নিউটাউনে।

উপায়ন সাধারণ ভাবে অমায়িক হলেও অত্যন্ত সিরিয়াস। তার বয়স যে মোটে ছাব্বিশ, তা তাকে দেখলে বোঝার উপায় নেই। সে বাবার সঙ্গে অফিসে আসে এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সমস্ত কাজকর্ম বোঝে। হঠাৎ হঠাৎ যে-কোনও ডিপার্টমেন্টের দরজায় উদয় হয় এবং কাচের দরজায় নক করে, মুখে মৃদু হাসি বুলিয়ে বলে, “একটু আসতে পারি?”

স্বয়ং মালিকের একমাত্র ছেলে, অদূর ভবিষ্যতের মালিক এ ভাবে সেলস, ডিজাইনিং, পারচেজ, লিগাল কিংবা অ্যাডভার্টাইজিং ডিপার্টমেন্টে হুট করে উদয় হলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই লোকজন সন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন। “আসুন স্যার, আসুন স্যার...” করে সকলে উপায়নকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসান। উপায়ন বসে না। সে সকলকে আশ্বস্ত করে বলে, “ব্যস্ত হবেন না, আমি একটু কাজ দেখতে এলাম আপনাদের। সব কিছু শিখে-পড়ে নিলে সুবিধে হয় আর কী...”

সকলে শিরদাঁড়া টানটান করে যার যার চেয়ারে বসে কাজকর্ম করেন আর উপায়ন প্রত্যেকের পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিন-চার মিনিট ধরে সেই কর্মীর কাজের ধরনটা বোঝার চেষ্টা করে। কখনও-বা খুব মৃদুস্বরে টুকটাক ভুলও ধরিয়ে দেয়। একটুক্ষণ পরেই বোঝা যায়, উপায়ন সমস্ত কাজের ধরন সম্পর্কেই খুব ওয়াকিবহাল। মুখে সে যা-ই বলুক, তার আর শিখোপড়ে নেওয়ার বিশেষ কিছু বাকি নেই।

উপায়ন যে দিন এ রকম হঠাৎ করে উপস্থিত হল পারচেজ দফতরে, পারচেজ-এর সিনিয়র অফিসার মনোহরবাবু এক্সেল শিটে একটা বিরাট হিসেব নিয়ে বসেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই মেলাতেই পারছিলেন না। শেষ ফিগারটা এতটাই খাপছাড়া হয়ে পড়ছিল যে, তিনি রীতিমতো গলদঘর্ম হয়ে পড়ছিলেন। তখনই তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে উপায়ন। সে খুব মন দিয়ে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত দেখে নিয়ে খুব ঠান্ডা গলায় বলল, “ওপর থেকে ফোর্থ, নাইস্থ আর সেভেন্টিস্থ এন্ড্রির ফিগারগুলো একটু অ্যাবসার্ড লাগছে। আর-একবার চেক করবেন প্লিজ?”

মনোহরবাবু রুমাল দিয়ে চেপে চেপে টাকের ঘাম মুছে বললেন, “শিয়োর স্যার, তবে আমি কিন্তু প্রত্যেকটা এন্ড্রি ভাল করে মিলিয়ে...” বলতে বলতে তিনি মেল খুললেন এবং নির্দিষ্ট দিনের মেল থেকে ফিগারগুলো চেক করতে গিয়ে দেখলেন, তিনটি ফিগারেই ভুল আছে। কিছু বেসিক জায়গা মেলানো হয়নি। ফাইনাল হিসেবের আগে মনোহরবাবুরই উচিত ছিল এগুলো রিচেক করা। তিনি যা পেয়েছেন বসিয়ে হিসেবটা খাড়া করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি সটান উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে হাতজোড়

করে, “সরি স্যর। এক্সট্রিমলি সরি স্যর... আমারই ভুল স্যর। চেক করা হয়নি স্যর। ওভারলুক করে গেছি স্যর...” বলে প্রায় পায়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম করলেন।

উপায়ন খুব লম্বা। ছ’ফুটেরও সামান্য বেশিই হবে। সে দু’হাতে শক্ত করে মনোহরবাবুকে ধরে বলল, “ভুল মানুষমাত্রই হয়। আমরা কেউ রোবট নই। আমার চোখে পড়ল বলে, বলে দিলাম। না হলে তো আপনিই মেলানোর সময় ভুলটা ধরে ফেলতেন। এত নার্ভাস হবেন না। ঠান্ডা মাথায় কাজ করুন। আমি জানি, আমার কোনও স্টাফই অলস বা অকর্মণ্য নয়।”

উপায়ন ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মনোহরবাবু রুমাল দিয়ে টাক আর চোখ দুটোই ভাল করে মুছে নিয়ে বলেছিলেন, “এত দিন বিদেশে পড়াশোনা করেছে, অথচ বাংলাটা একটুও মরচে ধরেনি। কী শিক্ষা! কী সংস্কার! কী...”

পাশ থেকে ফচকে সুদীপ মন্তব্য করেছিল, “উচ্চ বংশ!”

মনোহরবাবু শ্বাস ফেলে বলেছিলেন, “ওই কর! অন্নদাতা মনিবকে সম্মান না করলে কোনও দিন বড় হতে পারবি না এই বলে দিলাম।”

এখন ২০২২ সালের মার্চ। আজ উপায়ন সকাল থেকে একটু ব্যস্ত। আজ ইন্টারভিউ আছে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, ডেটা অপারেটর রিক্রুট করা হবে। ইন্টারভিউ নেবেন ডিপার্টমেন্টাল হেড, হিউম্যান রিসোর্সের লোকজন। উপায়ন তার নিজের ঘর থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ে পুরো প্রসেসটা দেখবে। পরে তার মতামত জানাবে। যারা ইন্টারভিউ দেবে, তারা এক এক করে জমা হচ্ছে দশটা বাজার কিছু আগে থেকেই। আটত্রিশটা অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছে, নেওয়া হবে দু’জনকে।

ঠিক এগারোটা থেকে শুরু হয়ে গেল ঝাড়াই-বাছাই পর্ব। দেখা গেল, ছাব্বিশ জন ছেলে এবং বারো জন মেয়ের মধ্যে শেষ অবধি শর্টলিস্টেড হয়েছে দু’টি ছেলে এবং একটি মেয়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মেয়েটির শিক্ষাগত যোগ্যতা বাকিদের চেয়ে অনেকটাই কম। সাধারণ সেকেন্ড ক্লাস গ্রাজুয়েট। কম্পিউটারের কিছু কোর্স আছে। কিন্তু ডেটা অপারেটিংয়ের সঙ্গে ফিন্যানশিয়াল অ্যাকাউন্টিংয়ের কোর্সও করা আছে একটি মাঝারি মানের কম্পিউটার ইনস্টিটিউট থেকে। সে সব সার্টিফিকেট ভাল। দু’টি ছেলেই মাস্টার্স করেছে। ছেলে দু’টির পক্ষেই ভোট বেশি হলেও উপায়ন কিন্তু মেয়েটির হয়ে সওয়াল করল। তার যুক্তি তিনটি। প্রথম, ওভার কোয়ালিফায়েড ক্যান্ডিডেট সব সময় আরও বেটার কিছু খোঁজে থাকবে, তার কাছ থেকে লয়ালিটি কিংবা ইন্টিগ্রিটি আশা করা মুশকিল। দ্বিতীয়, মেয়েটির ফিন্যানশিয়াল অ্যাকাউন্টিংয়ের কোর্স করা আছে, যা বাকিদের নেই। তৃতীয়, মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছে মেয়েটির কিছু ফিন্যানশিয়াল স্ট্রেস আছে, চাকরিটা পেলে সে চাকরিটা ধরে রাখার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে খাটবে। সুতরাং, দু’টি ছেলের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিয়ে এই মেয়েটিকেও সুযোগ দেওয়া হোক।

কোম্পানির মালিক দেবায়নবাবুরও উপায়নের যুক্তি মনে ধরল। তিনিও বরাবর সব কিছু জেনে আসার চেয়ে কাজ করতে করতে শেখার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। ফলে মেয়েটিই চাকরি পেল। উপায়নকে ভেঙে দেবায়নবাবু বলে দিলেন, “মনে রেখো, মেয়েটির চেয়েও কিন্তু জোরালো দাবিদার ছিল। এই মেয়েটি কেনম কাজ করছে না করছে, একটু নজর রেখো। কেউ যেন ওকে মালিকের ক্যান্ডিডেট হিসেবে না দেখে। কোনও রকম সমস্যা কিংবা ইনকম্পিটেন্স দেখলে কিন্তু কনট্রাক্ট রিনিউ করা যাবে না। কিছু কিছু সময় মস্তিষ্কের চেয়ে মনের কথাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হয় বটে, তবে ভুল হলে তা শুধরে নিতে দেরি করতে নেই। আমি বলছি না, মেয়েটি খারাপ হবে। কিন্তু সব রকম সম্ভাবনার জন্যই তৈরি থাকতে হবে আমাদের।”

কথাগুলো উপায়ন খুবই সিরিয়াসলি নিল। কারণ, ‘অ্যাডভান্স’ কোম্পানির এটা প্রথম রিক্রুটমেন্ট, যেখানে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে উপায়ন তার মতামত জানাল এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হল। নতুন মেয়েটি জানতেই পারল না, প্রথম থেকেই তাকে ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের

তলায় রাখা হচ্ছে।

মেয়েটি অফিসে জয়েন করার দিন পাঁচকের মধ্যেই ডেটা অপারেটিং দফতরের হেড অনিমেসবাবুকে দিয়ে মেয়েটিকে নানা প্রশ্ন করিয়ে তথ্য সংগ্রহ করল উপায়ন। জানা গেল, মেয়েটি বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে। বাবা একটা বেসরকারি ফার্ম হাউসে ছোটখাটো পোস্টে ছিল। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহবধূ। মেয়েটির উচ্চশিক্ষার ইচ্ছে ছিল। টাকাপয়সার সমস্যায় সম্ভব হয়নি। উচ্চ মাধ্যমিকের পর থেকেই সে টিউশনি করে তার পড়াশোনার বেশির ভাগ খরচ জোগাড় করেছে। চাকরি করতে করতে ডিসট্যান্স এডুকেশনের মাধ্যমে প্রাইভেটে মাস্টার্স করার ইচ্ছে আছে। অনিমেসবাবু জানিয়েছেন, মেয়েটির মাথা পরিষ্কার। চটপট কাজ শিখে নেয়। কাজ করেও তাড়াতাড়ি। বরং নতুন ছেলেটি কিছুটা আড়ষ্ট। কাজ শিখতে সময় নিচ্ছে। মেয়েটি তাকেও হেল্প করে দেয়। এ সব খবর স্বস্তি দেয় উপায়নকে। কিন্তু তখনও মেয়েটি সম্বন্ধে উপায়নের অনেক কিছুই জানা বাকি ছিল।

হালকা মনেই গত শনিবার উপায়ন অফিস থেকে বেরোল। সুবিধেমতো কোনও কোনও শনিবার উপায়ন আর কুসুমিতা একটা নির্দিষ্ট কফিশপে দেখা করে। সেই শনিবার তাদের দেখা করার কথা ছিল।

নীল মৃত্যু উজাগর

অরবিন্দ কর যখন আইআইটি থেকে পাশ করে দিল্লির আইআইএম-এ ভর্তি হন, তখনও ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনার হিড়িক আকাশ ছোঁয়নি। তিনি যখন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পাশ করে একটি বিখ্যাত গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থায় যোগ দিলেন, তখনই তাঁর মাইনে শুনলে অনেকেরই হাঁ বন্ধ হত না। পর পর প্রমোশন পেয়ে পূর্বাঞ্চলের রিজিয়োনাল ম্যানেজার হয়ে বসতেও তাঁর বেশি সময় লাগেনি। তখন সল্টলেকে তাঁকে একটি বিশাল ফ্ল্যাটও দিয়েছিল কোম্পানি। সর্বক্ষণের গাড়ি। ড্রাইভার এবং তেলখরচা কোম্পানির। এবং আরও বহু সুযোগসুবিধে। প্রতি বছর বেড়াতে যাওয়ারও সুযোগ ছিল তাঁর। ফলে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে প্রায় সারা ভারতই ঘোরা হয়ে গিয়েছিল। এবং সব জায়গাই প্লেনে। দু’বার বিদেশ ভ্রমণও স্পনসর করেছিল কোম্পানি। একবার ইওরোপ, একবার ইজিপ্ট। মোট কথা অরবিন্দবাবু ছিলেন আদ্যন্ত সফল, সুখী এবং অবস্থাপন্ন একজন মানুষ। তাঁর মেয়েটিও পড়াশোনায় ভাল ছিল। আইএসসি পাশ করে ইকনমিক্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিল কলেজে।

অরবিন্দবাবুর স্ত্রী একটা কিডারগার্টেন স্কুলে পড়াতেন। প্রয়োজন না থাকলেও, চাকরিটা ছাড়েননি উনি। গাড়ি করে সকাল সাতটায় বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন বেলা দেড়টা-দুটো নাগাদ। মেয়ে কখনও মাকে মিস করেনি। কিন্তু সুখ এক জিনিস, সুখের স্থায়িত্ব অন্য জিনিস। এক রকম সুখ আছে, কালীপুজোর ম্যাগনেশিয়াম বা ইলেকট্রিক তারের মতো, অল্প অল্প করে বহু ক্ষণ জ্বলে। ধোঁয়া হয়, খারাপ গন্ধ হয়, তবু জ্বলে। আবার কোনও কোনও সুখ রংমশালের মতো। চোখধাঁধানো আলো দেয় ঠিক কথাই, কিন্তু দ্রুত শেষ হয়। রংমশালের আলো নিভে যাওয়ার পর অন্ধকার যেন আরও বেশি করে চোখ চেপে ধরে। অরবিন্দবাবুর স্ত্রীর সুখ ছিল তেমনি।

এখন থেকে ঠিক আঠারো বছর আগের কথা। তখন অরবিন্দবাবুর স্ত্রীর বয়স বিয়াল্লিশ, অরবিন্দবাবু ছেতাল্লিশ এবং তাঁদের মেয়ে দিগন্তিকা আঠারো। সে সময় অরবিন্দবাবুর স্ত্রীর স্কুলে কিছু পরিবর্তন চলছিল। স্কুলটা আরও বড় হচ্ছিল এবং একটা নতুন জায়গায় চলে যাওয়ার কথা হচ্ছিল। সে সময় একজন সিনিয়র টিচার এবং গভর্নিং বডির মেম্বর হিসেবে প্রচণ্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েন অরবিন্দবাবুর স্ত্রী। ফলে সে বার তাঁদের বাৎসরিক বেড়াতে যাওয়াটা বন্ধই হতে বসেছিল। দিগন্তিকার মনখারাপ। অরবিন্দবাবুকে তাঁর স্ত্রী অনেক করে বুঝিয়েছিলেন যে, সবাই মিলে না যাওয়ার চেয়ে যদি বাবা-মেয়ে মিলে সে বারের মতো ঘুরে আসেন। গুঁরা নিমরাজি হয়েছিলেন। দিল্লিতে অরবিন্দবাবুর একটা মিটিং ছিল। মায়ের জোরাজুরিতে বাবা-মেয়ে ঠিক করেছিল দিল্লিতে দু’দিন থাকা হবে। তার পর মিটিং শেষ করে সেখান থেকে হরিদ্বার, মুসৌরি, দেবাদুন ঘুরে

আসা হবে। সেই ঘটনার জন্য আজও নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন না মিসেস কর। মুসৌরি যাওয়ার পথে অরবিন্দবাবু আর তাঁর মেয়েকে নিয়ে খাদের গভীরে হারিয়ে যায় বাস। আগুনও লেগে গিয়েছিল। দু’দিন পর উদ্ধারকারী দল গিয়ে অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করে।

মিসেস কর তাঁর বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে। তাঁর বাপের বাড়ি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে। বাবা-মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। সল্টলেকের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে তিনি বাপের বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। টাকাপয়সার অভাব তাঁর কোনও কালেই ছিল না। এখনও নেই। কিছুদিন আগে পর্যন্তও স্কুলের কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখছিলেন। বছর তিনেক আগে রিটারায়মেন্টের পর ঘরবন্দি হয়ে পড়েন। সারা দিন কাজের লোক আর রান্নার লোক ছাড়া ফাঁকা বাড়িতে কাউকে দেখতে না পেয়ে মনটা খুব অস্থির হত মিসেস করের। তখনই মনে হয়েছিল বাড়ির একতলাটা ফাঁকা পড়ে আছে, কাউকে ভাড়া দিলে তো মন্দ হয় না। তাই কাজের লোককে দিয়ে দালাল ঠিক করিয়েছিলেন। সেই দালাল ঢেকুর দাসই অনন্তবিষ্ণুকে এই বাড়ির একতলার ভাড়াটে করে নিয়ে আসে।

অনন্তবিষ্ণুকে বড় পছন্দ করেন মিসেস কর। সেই স্নেহ-ভালবাসা নিজের মধ্যেই শক্ত আবরণে লুকিয়ে রাখেন বটে, তবু বারবার মনে হয়, অনন্ত ছেলেটি যেন তাঁর খুব নিজের কেউ। তার একটা সূক্ষ্ম কারণও আছে। অনন্তবিষ্ণুর বয়স তিরিশ। এখন থেকে ঠিক তিরিশ বছর আগে, যখন মেয়ে দিগন্তিকার বয়স ছয়, তখন দ্বিতীয়বার কনসিভ করেছিলেন মিসেস কর। ঠিক ন’মাসের মাথায় বাথরুমে পড়ে গিয়ে মিসক্যারেজ হয়। ডাক্তারবাবু ছিলেন অরবিন্দবাবুর বন্ধু। তিনি জানিয়েছিলেন পৃথিবীর আলো দেখতে না পাওয়া সেই সন্তান ছিল ছেলে। সে বেঁচে থাকলে তারও এখন তিরিশ বছর বয়স হত। মনে মনে ভাবেন মিসেস কর, দিগন্তিকা আর অনন্ত— দু’জনের নামেও কেমন ধ্বনিগত মিল আছে না! তবু বাড়িওয়ালির নির্মাক খুলতে পারেন না তিনি। কোথাও যেন বাধে। অনন্তবিষ্ণুরও শামুকসভাব। নিজস্ব সীমার মধ্যে গুটিয়ে থাকতেই ভালবাসে। খাবারদাবার নিয়ে তার কোনও বক্তব্য নেই। খেতে না দিলেও হয়তো সে বিশেষ আপত্তি করবে না। খোঁজখবর নিয়ে মিসেস কর দেখেছেন। মামা-মামি ছাড়া ছেলেটির কেউ নেই।

মাঝে মাঝে মিসেস করের মনে একটা অদ্ভুত ইচ্ছে হয়। তাঁরও সাতকুলে কেউ নেই। তা হলে এত সম্পত্তি কী করবেন তিনি? কোনও আশ্রমে দিয়ে দেবেন? কোনও দাতব্য সংস্থায়? কোনও স্কুলে ডোনেট করে দেবেন? হয়তো উপায় না থাকায় তাই করতে হবে একদিন, তবু মনে অদ্ভুত ইচ্ছেটা উকি দেয়। অনন্তবিষ্ণুকে দত্তক নিলে হয় না? এমনি-এমনি নয়, একেবারে আইনানুগ পথে, লেখাপড়া করে? ছেলেটা তো তেমন বড় চাকরি-বাকরি কিছু করে না। খুব একটা উদারমীও নয়। এনজিও না কিসে যেন কাজ করে। সামান্য কিছু উপার্জনেই বোধ হয় চালিয়ে নেয়। এই ছেলেটাকে সব কিছু দিয়ে দিলে তিনি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করবেন। তিনি ছেলেটাকে তিন বছরেরও কিছু বেশি সময় ধরে দেখছেন, তাঁর স্থির বিশ্বাস, আচমকা হাতে অনেক টাকা চলে এলেও এই ছেলেটা উড়িয়ে দেবে না। আবার একটা সন্দেহও আছে। ছেলেটার কোনও লোভ নেই। আচমকা এমনি একটা প্রস্তাবে রাজি না-ও হতে পারে। খুব ভাল করে ছেলেটার গতিবিধি সংক্রান্ত খবরাখবর নেওয়ার চেষ্টা করে যান তিনি। কখন বাড়ি ঢোকে, কতক্ষণ বাইরে থাকে। বন্ধুবান্ধব আসে কি না, কোনও নেশা আছে কি না। যতটা পারেন আর কী!

সে দিন বিকেলের ঘটনা। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর ঠিক বিকেল চারটেয় তিনি দোতলার বারান্দায় বসে বিকেলের চা খান। তখনই মেয়েটি এল। ডোরবেলের আওয়াজ শুনে তিনি বারান্দা দিয়ে উকি মেরে দেখলেন, একটি অচেনা মেয়ে। চোখাচোখি হতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কাকে চাই?”

মেয়েটি এই বাড়িরই ঠিকানা বলে জিজ্ঞেস করল, “এখানে মিসেস রজনী কর থাকেন?”

মিসেস কর বলেন, “আমিই মিসেস রজনী কর। কী দরকার বলুন।”

মেয়েটি ইতস্তত করে বলে, “আমি কি আপনার সঙ্গে দু’চার মিনিট

কথা বলতে পারি? একটু দরকার ছিল। আমি ঢেকুরবাবুর কাছ থেকে আসছি।”

ভুরু কোঁচকালেন মিসেস কর। ঢেকুর দাস হঠাৎ একটি মেয়েকে তাঁর কাছে পাঠাবে কেন? কাজের লোক পাঠিয়ে মেয়েটিকে উপরে নিয়ে এলেন তিনি। অনন্ত এখন বাড়ি নেই। শোভাবাজারের দিকে পড়াতে যায় এ সময়। ফিরতে সন্ধ্যে পেরিয়ে যায়। থাকলে সে-ই দরজা খুলে দিত।

মেয়েটি উপরে উঠে এসেই আগে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল মিসেস করকে। তিনি “হয়েছে হয়েছে, থাক থাক” বলেও আটকাতে পারলেন না। আজকাল পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের পাট উঠে গেছে। তবু কেউ করলে খারাপ লাগে না। মনে হয়, এ ভাবেই দৃষ্টপা্য কিছু খড়কুটো আঁকড়েই হয়তো সংস্কার বেঁচে থাকে। ভাল করে দেখলেন মেয়েটিকে। বেশ ফর্সা, বড় বড় টানা টানা চোখ, নাক চোখা, ঠোঁট পাতলা। জিনসের ওপর কুর্তি পরে আছে, কাঁধে একটা ছোট ব্যাগ। চেহারায় ভাল ঘরের ছাপ স্পষ্ট। মেয়েটিকে চেয়ারে বসতে বললেন তিনি।

মেয়েটি জানাল, তার নাম পুষ্পিতা রায়। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে পুষ্পিতা যা বলল, তা হল তার নাকি সোনারপুরে থাকে। কাছেই কোথাও একটা ফ্ল্যাট পছন্দ করেছে। সে, তার বাবা এবং মা এখানে শিফট করতে চায়। এই জায়গাটা কী রকম, তা নিয়ে একটু খোঁজখবর করতে চায়। তাকে ফ্ল্যাটের সন্ধান দিয়েছে ঢেকুর দাস। সে-ই নাকি বলেছে, মিসেস রজনী কর এই পাড়ারই মেয়ে। দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। এলাকা সম্বন্ধে কোনও খোঁজখবর নিতে হলে তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। তাই মেয়েটির আগমন।

কী বলবেন, সামান্য একটু গুছিয়ে নিলেন মনে মনে। তার পর টুকটুক করে পুষ্পিতার নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন। মেয়েটি বড় আলাপী এবং অসম্ভব ভাল শ্রোতা। বহু দিন কারও সঙ্গে কথা বলে উঠতে না পারা মিসেস করের মনের আগল খুলে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। দু’চার মিনিট গড়াল প্রায় চল্লিশ মিনিটে। কথায় কথায় এল একতলার পেয়িং গেস্টের কথা। নীচে এক জন যুবক একা থাকে শুনেই পুষ্পিতার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল।

মিসেস কর জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতাই সে বলল, “এ রকম একা ছেলেকে পেয়িং গেস্ট রেখেছেন মাসিমা, এ বিষয়ে আমাদের পাশের বাড়ির অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। সেখানকার একতলাতেও পেয়িং গেস্ট হয়ে এসে উঠেছিল একটি ছেলে। প্রথম প্রথম কিছু বোঝা যায়নি। পরে দেখা গেল, হাজার রকম নেশা করে। বাড়ির সামনে খালি বিয়ারের বোতল, অনলাইনে আসা খাবারের প্যাকেট ভী করে ফেলে রাখে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসে রাত বারোট্টা-একটা পর্যন্ত হইছল্লোড় আড্ডা চলে, জোরে জোরে গান বাজায়। সে দিন তো এক ভয়ানক কাণ্ড...”

কৌতুহলী হয়ে মিসেস কর জিজ্ঞেস করলেন, “কী কাণ্ড?”

“আর বলবেন না মাসিমা, বাড়িওয়ালার বারণ সত্ত্বেও, বাড়িতে বান্ধবী এনে জুটিয়েছে। হেলমেট পরা, ছেলেদের পোশাক পরা বলে কেউ অত বুঝতেও পারেনি। রাত্রিবেলা অনলাইনে আসা খাবারের ডেলিভারি দিতে একটি ছেলে এসেছে, আর বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকও নেমেছেন সদরে তালা দিতে। ঘর থেকে যেই মেয়েটি খাবার নিতে বেরিয়েছে, ব্যস বাড়িওয়ালা দেখে ফেলে সে কী অশান্তি! সারা পাড়া জড়ো হয়ে যায় আর কী! শেষ অবধি পারকবল পাটি, বিধায়ক ধরে ছেলেটিকে ওঠাতে হল। কী বামেলা ভাবতে পারবেন না মাসিমা! একা ছেলে থাকে বলছেন, শুনেই চিন্তা হয়। খারাপ অভিজ্ঞতা আছে তো!”

শুনে মিসেস কর বললেন, “এ সব অসুবিধে আমাকে পোহাতে হয়নি। নীচে যে ছেলেটি থাকে, তার কোনও বন্ধু কিংবা বান্ধবীকে আমি আজ অবধি আসতে দেখিনি। বাইরে থেকে অনলাইনে খাবার কখনও আসে না তা নয়, তবে খাবারের প্যাকেট নিয়ে কোনও নুইসেন্স কখনও দেখিনি। আমার কাজের লোক কিংবা কেউ কোনও নেশার গন্ধ পায়নি। ছেলেটা বাড়িতে যে আছে, তাও টের পাওয়া যায় না। খুবই শান্ত এবং নিরুপদ্রব।”

একটু বেশিই বলে ফেললেন কি? হোক গে, কেউ অনন্তবিষ্ণুর সঙ্গে কোথাকার কে এক বেয়াড়া লুম্পেনের তুলনা করার চেষ্টা করবে, তা তিনি

মেনে নেবেন না।

“এখানে একা থাকে? গ্রামের ছেলে বুঝি? পড়াশোনার জন্য কলকাতায় এসে থাকে? বাড়ি কোথায়?” জনতে চায় পুষ্পিতা।

“বাড়ি নেই। মা-বাবাও নেই। মামার কাছে মানুষ। মামার ভাড়াবাড়িতে জায়গা সঙ্কুলান না হওয়ায় নিজের জায়গা দেখে নিয়েছে। মামার বাড়িও খুব দূরে নয়। আমি লোকজন দিয়ে খোঁজখবর নিয়েছি। ছেলেটি কিছু লুকোয়নি বলেই খবর পাওয়া গেছে...” স্পষ্ট করে বলেন মিসেস কর। অনন্তবিশ্বকে নিয়ে কাটাছেঁড়া তাঁর পছন্দ নয়। তিনি ছেলেটিকে বাইরের কেউ বলে ভাবেন না। সে এই বাড়িরই একজন।

পুষ্পিতা শুনে বলল, “ভাল হলেই ভাল মাসিমা, যা সব হচ্ছে চার দিকে, দৃষ্টিস্তা কিছু ছাড়ে না।”

আরও দু’চার কথার পর মেয়েটি বিদায় নিল। মিসেস করের সঙ্গে কথা বলে যে তার খুবই ভাল লেগেছে, সে কথা জানাতে ভুলল না। এও বলে গেল, “যদি সব ঠিকমতো হয়, তা হলে কিছু দিন পরই আপনার প্রতিবেশী হব মাসিমা। তখন কিন্তু মাঝে মাঝে এসে গল্প করে যাব।”

মিসেস কর হেসে বলেছেন, “নিশ্চয়ই আসবে মা। কথা বলার লোক পাই না, কেউ এলে ভালই লাগে।”

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর ভুরুতে ভাঁজ পড়েছে মিসেস করের। মেয়েটা কিছু একটা লুকাচ্ছে। কেন এ রকম মনে হচ্ছে, বুঝতে পারছেন না। আর সেই কারণেই আরও বেশি অস্বস্তি হচ্ছে তাঁর।

সেই বাঘেতেই মানুষ মারে

২০২২ সাল। এপ্রিলের শুরু তখন। পূর্ণ বসন্ত। কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ায় রঙের প্লাবন। কোকিলের তীব্র ডাক ফালাফালা করে দিচ্ছে নীল আকাশ। তখন ছেলেটাকে মাঝে মাঝেই দেখতে পেয়েছে গোলাপি। দোহারা চেহারা। গালে হালকা দাড়ি। গায়ের রং মাজা মাজা। চোখ দুটো খুব শান্ত আর মায়াময়। ছেলেটা মাথায় বেশ লম্বাও। তবে বেশ লাজুক। চোখে চোখ পড়লে চোখ নামিয়ে নেয়। ছেলেটির চোখে মুগ্ধতা আছে, লোভ নেই। কথা হল, ছেলেটাকে চলনপথে বারবার দেখতে পায় কেন গোলাপি? স্কুলের সামনেও যেন এক-দুদিন... কিন্তু কেন? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছে, উত্তর পায়নি।

গোলাপির বয়সটাই পুজো পাওয়ার। জীবনযুদ্ধ মানুষকে যতটাই কোণঠাসা করে ফেলুক না কেন, জৈবিক প্রবৃত্তি তার মতো করে মাথা তুলবেই। পুরনো অট্টালিকার ভেঙে পড়া ইটের পাঁজর থেকে কোন রসের সন্ধান পেয়ে বটের চারা লকলকিয়ে বাড়ে, তা কি কেউ বলতে পারে! গোলাপি দেখতে সুন্দরী। একটি উঠতি বয়সের মেয়ের চেহারাছবি ঠিক যেমন হলে পারিপার্শ্বিক কামগন্ধে ভারী হয়ে ওঠে, গোলাপি ঠিক তেমনই। নানা সমস্যা, অভাব এবং টিকে থাকার লড়াই তাকে এ সব উপভোগ করতে দেয় না। তবে তেমন মানসিকতা গোলাপির নয়ও। অবশ্য এই লাজুক চেহারার ছেলেটিকে তার খারাপ লাগে না।

বিষ্টস্যরকে আপনারা এত ক্ষণে চিনে গিয়েছেন। অনন্তবিশ্ব ঘোষ। তাকে এই অঞ্চলে সকলে বিষ্টস্যর বলে। সে যে এনজিও-তে কাজ করে, সেখানে অনন্ত সাউ নামে ফাইফরমাশ খাটার একটি লোক আছে, তাই সেখানে তাকে সবাই ঘোষ বলে ডাকে। তার বাড়ির ডাকনাম শুধুই অন্ত। এই নামে তাকে মামা-মামিরা ডাকেন।

গোলাপির আজ পড়তে পড়তে বারবার মনে পড়ছিল রাস্তায় প্রায়ই চোখে পড়ে যাওয়া সেই লাজুক ছেলেটাকে। কেন বারবার তাকে দেখা যায়? সে কি গোলাপিকে পছন্দ করে? কিন্তু করে কী লাভ? গোলাপির রূপ দেখলে তো হবে না, তার অভাব, কষ্ট, সমস্যা সেগুলোও তো দেখতে হবে। সে সব দেখলে ছেলেটার প্রেম কপূর হয়ে যাবে। ভেবে নিজের মনেই ফিক করে হেসে ফেলল গোলাপি। আর পড়বি তো পড় বিষ্টস্যরেরই চোখে। ব্যস, হয়ে গেল ঝামেলা।

“এ কী! তোমাকে চ্যাপ্টারটা এক বার চোখ বুলিয়ে দেখে নিতে বললাম কোথাও আটকাচ্ছে কি না, আর তুমি হাসছ! ওটা কি জোকসের

বই? অ্যাঁ? ছি ছি ছি...” বলে উঠল বিষ্টস্যর।

গোলাপি বেজার হয়ে ফের বইয়ে মুখ গুঁজল। কেমন বেরসিক লোক এই বিষ্টস্যর! একটু ভাবনাচিন্তার স্বাধীনতাও কি গোলাপির নেই! টিউটর বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি! গোলাপির অভিমান তার মুখে-চোখে ফুটে উঠে থাকবে হয়তো, তা দেখেই বিষ্টস্যর খুব নরম গলায় বললেন, “শোনো গোলাপি, পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হতে নেই। তাতে পিছিয়ে যায় মানুষ। আবার প্রথম থেকে পড়া শুরু করতে হয়। সামনে অনেক কাজ, সময় নষ্ট করলে চলবে কেনা!”

জানে গোলাপি। একমাত্র এই বাধ্যবাধকতার কথা স্মরণ করেই সে নিজের মনকে আগল দেয়। মন নিবিশ্ট করে বইয়ের পাতার কালো কালো অক্ষরে। তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। তার নিজের জন্য, তার মায়ের জন্য। পছন্দের পুরুষকে ঘিরে লতিয়ে বেড়ে ওঠার স্বপ্ন তার জন্য নয়। গোলাপি জানে তার মধ্যে দুটো মেয়ে পাশাপাশি থাকে। একটা হল গোলাপি। যে গোলাপি রঙের চিন্তাভাবনা করে নানা স্বপ্ন তৈরি করে। আর অন্য মেয়েটা গোলাপিকে সরিয়ে দিয়ে বারবার তার মনের দখল নেয়, তার কর্তব্য মনে করিয়ে দেয়, শুধু বলে, আপনারা লয়ে ফ্যান্টাসি করিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে/ শ্রমের জন্য মোদের যেন দিবারাত্র ঘর্ম ঝরে— এই বেরসিক কেঠো আর পড়াশোনা-সর্বশ্রেষ্ঠ মেয়েটার নাম গোলাপি দিয়েছে ধূসরী। ধূসরী মস্তিষ্কের কথা শোনে, আর গোলাপি শোনে মনের। মাঝে মাঝেই দু’জনের বগড়া বেধে যায়।

রাস্তায় দেখা, দোহারা চেহারা, গালে হালকা দাড়ি ছেলেটার কথা যে গোলাপি মাঝে মাঝে চিন্তা করে, সেটা আবার মোটেই সহ্য করতে পারে না ধূসরী। সে বলে, “ও সব হল ডিসট্র্যাকশন। আসলে বিয়ে মানাই মেয়েদের পরাধীনতা। নিজস্ব কেরিয়ারের স্বপ্নে জলাঞ্জলি। মুখে যে যাই দেখাক, কোনও স্বশ্রববাড়িই বাড়ির বোয়ের চাকরি করতে যাওয়া পছন্দ করে না। বাড়ির মেয়েদের চাকরি করা নিয়ে কিন্তু আপত্তি নেই! তুমি বিয়ে হয়ে গিয়ে দেখবে, তোমারই বয়স নন্দ ড্যাং ড্যাং করে চাকরি করতে যাচ্ছে, আর তুমি ভোরে উঠছ তার অফিসের ভাত রোঁধে বেড়ে দেবে বলে। খবরদার! না দাঁড়িয়ে বিয়ে কোরো না! অকালে পুরুষ কিংবা স্বশ্রবঘর ছুঁলেই অনন্ত নরক!”

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অর্থনীতির নীরস অধ্যায়ে মুখ গোঁজে গোলাপি।

তবে শুধু গোলাপির কথা জানলেই তো হবে না, তার চার দিকে ঘোরা লাটুর সম্বন্ধেও তো জানতে হবে। লাটুর নাম অত্র। মানে সেই ছেলেটি, যাকে বারবার তার চলনপথে দেখতে পাচ্ছে গোলাপি। দোহারা চেহারা। গালে হালকা দাড়ি। গায়ের রং মাজা মাজা। বেশ লম্বা সেই ছেলেটির নামই অত্র। অত্রদীপ দে। কলেজ স্ট্রিট আর আমহার্স্ট স্ট্রিটের মাঝামাঝি কোথাও একটা থাকে। বোধ হয় পটুয়াটোলা লেন কিংবা এ রকমই একটা ঠিকানা। সদ্য এম.কম পাশ করে একটা অডিট ফার্মে কাজে ঢুকেছে। ফার্মটা সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপরেই। সেখানে থেকেই কী একটা কাজে এক দিন এসে ছিল আর সি নন্দী লেনের কাছে। সেখানেই দেখেছে গোলাপিকে... আর ব্যস! মদনদেবের পাঁচটা তিরের একটাও মিস হয়নি। স্কুলের কাছে গিয়ে ছুটির পর সহপাঠীদের জটলায় কান পেতে সুন্দর মেয়েটার নামও জেনেছে অত্র, গোলাপি। আহা! কী অপূর্ব আধুনিক আর অ্যাথ্রোপ্রিয়েট নাম! মুগ্ধতা বেড়েছে অত্র।

মাঝে মাঝেই অফিস ছুটির পর সে চলে আসছে ওই অঞ্চলে। ভাল করে দেখে শুনে তার চেনা হয়ে গেছে গোলাপির বাড়িও। সে সপ্তাহস্থানেক গভীর পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে। সাইকেলে চেপে স্কুলে যাওয়া এবং আর সি নন্দী লেনে পড়তে আসা ছাড়া গোলাপি মোটেই বাড়ি থেকে বেরোয় না। তার বিশেষ বন্ধুবান্ধবীও নেই, যাদের মধ্য দিয়ে সে অ্যাকসেস পেতে পারে। শেষ অবধি মরিয়া হয়ে সে নজরদারি শুরু করল বিষ্টস্যরের ওপর। কী বোরিং লোক! প্রায় দুপুর থেকে সন্ধ্যা পড়িয়েই যায়, পড়িয়েই যায়। পা ধরে গেলে পায়েচারি করতে করতে পড়ায়। সন্ধ্যাবেলা সব ক্লাস শেষ হয়ে গেলে কাঁধে কালোপানা গেদে লোকালের ডেলিপ্যাসেঞ্জারের মতো একখানা সাইড ব্যাগ বুলিয়ে বেরোয়। মুখ গভীর। যেন সরকারি

ক্যাবিনেট থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করিয়ে বেরোচ্ছে। তার পর মোড়ের গুমটি দোকানটার সামনে যায়। প্রথম দিন অভ ভেবেছিল, ধোঁয়াফোঁয়ার অভ্যাস আছে বোধহয়। তার পর দেখেছিল না, লোকটা পাঁচটাকার বিস্কুটের প্যাকেট কেনে। তার পর খেতে খেতে শ্যামবাজারের দিকে হাটা লাগায়।

অভদীপ খুবই বিবেচক, ধীরস্থির এবং সুযোগসন্ধানী ছেলে। কখনও তাড়াহুড়ো করে না। সে খুব ভাল করে বিষ্টুস্যারকে দেখল। লোকটা সাতবুড়োর এক বুড়ার মতো গম্ভীর মুখ করে থাকে বটে, কিন্তু লোকটার চেহারা খারাপ নয়। তার মতো ছ'ফুট না হলেও, বেশ লম্বা। ছিপছিপে। রংটাও পরিষ্কার। নাক চোখমুখ কাটা-কাটা। নিয়ম করে দাড়ি কামায় না, চুল উল্লেখ্যস্কো বলে চেহারায় একটা শ্যাবি ভাব আছে বটে, তবে ভাল করে দেখলে বোঝা যায় বিষ্টুস্যারকে দেখতে ভাল।

এ রকম পর্যবেক্ষণের কারণ আছে। অভদীপের মনের কোণে আশঙ্কার মেঘ আছে। পৃথিবীর খুব ক্লিশে ধরনের লাভস্টোরিগুলোর মধ্যে একটা খুব পপুলার টাইপ হল—শিক্ষক-ছাত্রীর ইনটুপিটু। প্রথমে ছাত্রী ছিল, পরে পাত্রী হয়েছে—এ রকম ঘটনার সংখ্যার কোনও গোনাগুনতি নেই। বিষ্টু আর গোলাপির মধ্যে কিছু নেই তো? তা হলে তো গোড়াতেই হাতে হারিকেন! বিষ্টুস্যারের বদলে যদি কোনও দ্বিধামণি থাকতেন, কিংবা মাঝবয়সি কোনও গোলগাল ভদ্রলোক, অথবা ধৃতি আর বাংলা শার্ট পরা কালো ছাতা হাতে বুড়োসুড়ো মাস্টারমশাই—এতটা দৃষ্টিভ্রান্ত পড়ত না অভদীপ। কিন্তু বিষ্টুস্যার তো বেশ ইয়ং! তার চেয়ে সামান্যই বড় হবেন। ত্রিশের এ দিকে বলেই তো মনে হয়। এমনভাবে তো গোলাপিকে কোনও ছেলের সঙ্গে দেখা যায় না। কিন্তু বাঘের ঘরেই যোগের বাসা নেই তো? মনের ভেতরটা দৃষ্টিভ্রান্ত যেমি ওঠে অভদীপ। মনে মনে ঠিক করে, এক দিন সে বিষ্টুস্যারকে ধরবে। সব জেনেবুঝে তবেই এগোবে। আলটপকা কাজকর্ম অভদীপ মোটেই পছন্দ করেন না। সে খুবই সাবধানী ধরনের ছেলে।

যেমন ভাবা তেমনই কাজ। মাসখানেক পর্যবেক্ষণের পর এক সন্ধ্যায় তৈরি হয়েই এসেছিল সে। আজ বিষ্টুস্যারের মুখোমুখি তাকে হতেই হবে। লোকটা বেরোক। বিস্কুট খাক। তার পর পিছন থেকে গিয়ে ডাকবে অভ। বলবে, ‘বিষ্টুবাবু নমস্কার। আমি কি আপনার মিনিট পাঁচেক সময় পেতে পারি? আপনার সঙ্গে আমার দু’-একটা খুব দরকারি কথা আছে।’

সেই সন্ধ্যায় অভদীপ দাঁড়িয়ে ছিল বিস্কুটের গুমটি দোকানটার আড়ালে। দেখল, বিষ্টুস্যার আপন মনে বিস্কুটের প্যাকেট কিনে নিয়ে হাটতে শুরু করল শ্যামবাজারের দিকে। মিনিট পাঁচেকও হয়নি। রাস্তা ফাঁকা দেখে ধীরে ধীরে গতি বাড়াল অভ। বিষ্টুস্যারের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে কথাটা সেরে নিতে হবে। সে যখন বিষ্টুস্যারের হাতখানেকের মধ্যে, আচমকা দাঁড়িয়ে পিছন ঘুরল বিষ্টুস্যার। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটানোর সময়ও পেল না অভ।

সরাসরি অভর চোখের দিকে তাকিয়ে বিষ্টুস্যার বলল, “আপনি বোধ হয় আমাকে কিছু বলবেন, তাই না?”

অভর কথা গুলিয়ে গেল, সে বলে ফেলল, “না, মানে হ্যাঁ, বিস্কুট... স্যারি বিষ্টু, ইয়ে... স্যার, আমি একটু কথা... মানে পাঁচ মিনিট...”

বিষ্টুস্যার বলল, “এখানেই বলবেন? না কোথাও বসবেন?”

অভ বলল, “এখানেও বলা যায়...” বলে কিছুতেই আর আসল কথাটা মুখে আনতে পারল না। কী বলবে ও? আপনি কি গোলাপিকে ভালবাসেন? এ রকম একটা কথা দুম করে জিজ্ঞেস করা যায় কাউকে? সে আমতা আমতা করতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত ওর ওপর থেকে চোখ সরাল না বিষ্টুস্যার। তার পর সেই ভাবেই চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, “যদি খুব ভাল না করি, আপনি বোধ হয় গোলাপিকে নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান, তাই কি?”

পেটের ভেতরটা বড্ড ফাঁপা লাগল অভদীপ। এ সব কেমন লোকজন! আলাভোলা উল্লেখ্যস্কো চেহারার পুরোটাই ক্যামোফ্লাজ! আসলে শার্লক হোমসের মতো ধুরন্ধর! ‘হ’ না বলতেই হাওড়া থেকে হনলুলু বুঝে যাবে নাকি লোকটা! সে এ বার কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না।

অতি পুরাতন বিরহ-মিলনকথা

কনকবাবুকে চেনে এমন দশটা মানুষকে ডেকে যদি কনকবাবু সম্মুখে কিছু বলতে বলা হয়, তা হলে সর্বসম্মত ভাবে কোনও সিদ্ধান্তই পাওয়া যাবে না। অনন্তবিষ্ণুর সঙ্গে কেন যেন কনককান্তির একটা প্রায়-বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। অনন্তবিষ্ণু মিশুক নয়। তার চেনাপরিচিতের সংখ্যাও হাতে গোনা। তবু কনকবাবুর সঙ্গে তার মাঝে মাঝেই দেখা এবং কথাবার্তা হয়।

বছর চারেক আগের কথা। তখন বাংলার ভাগ্যাকাশে করোনার ছায়া অবধি নেই। কনকবাবুর সঙ্গে অনন্তবিষ্ণুর আলাপ একটা বিয়েবাড়িতে। অনন্তর স্কুলের বন্ধুর বিয়ে। কনককান্তি মিত্র অনন্তর সেই বন্ধুর কাকা। কিছু কিছু মানুষ থাকেন, যাঁদের কোনও কারণ ছাড়াই বেশ ভাল লাগে। কনককান্তিকে সেই গোত্রেরই মানুষ বলে মনে হয়েছিল অনন্তর। কনকবাবুর বয়স চল্লিশের সামান্য বেশি। লম্বা, একটু ভারী চেহারা, রং ফর্সা। হাসিটা বেশ মনোহারা।

কী একটা কারণে রিসেপশন ফ্লোরের এসিটা সে দিন ঠিকমতো কাজ করছিল না। অনন্তর গরম লাগছিল। সেই ঘরের লাগোয়া বিশাল বারান্দাটা ছোটখাটো ছাদের মতোই। তাই খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এসে পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল অনন্ত। খানিক ক্ষণ দাঁড়ানোর পর বাঁঝালো মেয়েলি গলায়, “তোমায় দিয়ে কিছু হবে না কানুরায়, তুমি একটা উৎকৃষ্ট ধরনের কাওয়ার্ড...” শুনে চমকে উঠেছিল সে।

কথাটা শেষ করেই ছাদের এক অন্ধকার কোণ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল বাঁঝালো কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী। সোনালি পাড়ের চন্দনরঙা সিন্ধু আর লাল রাউজ পরা এক পরমা সুন্দরী হনহন করে তার সামনে দিয়ে বারান্দা ছেড়ে ঢুকে গিয়েছিল রিসেপশন হলে। অন্ধকার কোণে দাঁড়ানো ছায়ামূর্তি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল হতভম্ব অনন্তর দিকে। অনন্ত দেখেছিল, মানুষটার মুখে কেমন অসহায় ফ্যাকাসে একটা হাসি। চোখে চোখ পড়তে অনন্তও হেসেছিল।

“এমব্যারাসড হবেন না ভাই, ও একটা পাগলি, ওর নাম ভ্রমরা সেন, ওর স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা কোনও কালেই ছিল না...” এগিয়ে এসে বলেন মানুষটি। তার পর হাতজোড় করে নমস্কার করেন, “আমার নাম কনককান্তি মিত্র। আমি পাত্রের কাকা হই।”

অনন্তও প্রতিনমস্কার করে, “আমি অনন্তবিষ্ণু ঘোষ। পাত্র আমার স্কুলের বন্ধু।”

খুশি হন মানুষটি, বলেন, “তা হলে তোমাকে তুমিই বলি, কেমন?”

সম্মতি দেয় অনন্ত। কনকবাবু, অনন্তর পিঠে হাত রেখে ছাদ-বারান্দার ধারের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলেন, “ছেটবেলায় ওকে খুব ভাল লাগত, জানো। ও আমায় সে ভাবে পাত্তা দিত না। কলেজে উঠে এক পঞ্জাবি ছেলের প্রেমে পড়ল। সে ছেলেটার হিরিয়ানায় নাকি প্রায় ষাট বিঘে ধানী জমি। গোয়ালে তিরিশটা দুধেল গরু, খাটালে কুড়িটা মোষ। বছরে তাদের ফ্যামিলির টার্নওভার প্রায় ছয় থেকে সাত কোটি টাকা। এমন পাত্র কে হাতছাড়া করে বেলো! ওরাও করল না। কিন্তু বছর ঘুরতেই দেখা গেল ছেলের সঙ্গে তার এক বিধবা বৌদির খুবই গোপন এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ধরা পড়ে লজ্জা পাওয়া দূরে থাক, ছেলেটি ভ্রমরার গায়ে হাতও তোলে। ভ্রমরা আর মেনে নিতে না পেরে ডিভোর্স দেয় এবং জাঠমুলুক থেকে কলকাতায় ফিরে আসে। তত দিনে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে দু’বছরের। কিন্তু ভ্রমরা কোনও কথা শুনতে চায় না। আমাকে বলছে ডিভোর্স করে ওকে বিয়ে করতে। বলছে, ওর ওই একটা ভুলের শাস্তি কেন ওকে আমি সারা জীবন ধরে দিয়ে যাব! কী মুশকিল বেলো তো ভাই!”

সত্যিই মুশকিল। অনন্তর মনে হয়। কী বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে।

“আমার স্ত্রী খুব কোমলস্বভাবের নন, আমার সঙ্গে খিটিমিটি লাগে। কিন্তু ডিভোর্স করার মতো সাংঘাতিক কিছু নয়। তা ছাড়া আমার ছেলেটা আমাদের দু’জনকেই ভালবাসে। স্পিষ্ট ফ্যামিলির সন্তানদের মেন্টাল ব্যালেন্স ঠিক থাকে না...” শেষ কথাগুলো কিছুটা স্বগতোক্তির মতো করে বলেই তার হাঁশ ফিরল। অনন্তর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, “দ্যাখো দেখি, সবে মাত্র আলাপ হতেই কী না কী সব বলে যাচ্ছি... তুমি কিছু মনে

করলে না তো ভাই?”

অনন্ত হাসে। বলে, “কিছু মনে করিনি।”

অনন্তর মনে হয়েছিল, বেশ সরল এই কনককান্তি লোকটি। মানুষটার মন আর মুখ আলাদা নয়। মনের কথা অকপটে বলতে পারেন। সহজ কথা সহজ ভাবে তুলে আনেন।

কনকবাবু বলেছিলেন, “আমার ডাকনাম কানু। ও কানুরায় বলে ডাকে। আমি আমার স্ত্রীকে সব কথা জানিয়ে ডিভোর্স দিচ্ছি না কেন, তাই আমাকে কাওয়ার্ড বলল। প্রায়ই বলে।”

তখনই কনকবাবুকে কেউ ডেকে নিয়ে যাওয়ায় কথাবার্তা আর এগোয়নি।

সেদিনই রাতে খাওয়ার জায়গায় একটা মজার ঘটনা দেখেছিল অনন্ত।

বন্ধুরা মিলে সবাই টুকটাক কাজকর্ম আড্ডা সেরে শেষ ব্যাচে খেতে বসেছিল। সে ব্যাচে কনকবাবু আর তাঁর স্ত্রীও ছিলেন। কনকবাবুর ওপর মুদুমন্দ চাপা খবরদারির বহর দেখে কনকবাবুকে চিনতে অসুবিধে হয়নি। তিনিও অতীত সুন্দরী। টানা টানা চোখ, সুন্দর নাক, পাতলা ঠোঁট। ভ্রমরা সেনের সঙ্গে লড়াই লাগলে তুল্যমূল্য ব্যাপার হবে। যা বোঝা যাচ্ছে, ইনি খুবই কড়া ধাঁচের মহিলা।

সব ঠিক মতোই চলছিল, গোল বাঁধল শেষ দিকে। কমলাভোগ খাওয়া নিয়ে। কনকবাবু একটা খেয়ে আর-এক বার নিতে যাবেন, অন্তর-টিপুনি দিলেন কনকবাবুর স্ত্রী, “গত অগস্টে চল্লিশ পেরিয়েছে, রান্ধিরবেলা গুচ্ছের রসের মিষ্টি খেয়ে না। একটা তো খেলে, আবার কেন!”

এত ক্ষণ নানা জেরজুলুম মনে নিয়েছিলেন কনকবাবু। কিন্তু কমলাভোগের বেলা কেমন কাঁচুমাচু আর ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। মরিয়া হয়ে বললেন, “আমার তো শুগার নেই, তা হলে প্রবলেম কী! শুগার হলে তো সবই বারণ হয়ে যাবে। যত দিন না বারণ হচ্ছে তত দিন প্রাণ ভরে...”

কটমটে দৃষ্টি-সহ উত্তর এল, “এক বার কমলাভোগে হাত দিয়ে দ্যাখো, আমি খাবারের থালা রেখে এই মুহূর্তে বিয়েবাড়ি থেকে চলে যাব।”

খুব মৃদু নয় কনকবাবুর স্ত্রীর গলা। অনন্তদের কানে সবই এসেছিল। উচ্ছে গেলার মতো মুখ করে পানের কাউন্টারের দিকে এগোছিলেন কনকবাবু, হঠাৎ সেখানে উড়ে এল কনকবাবুর ওল্ড ফ্লেম ভ্রমরা সেন। কনকবাবুর কাছে এসে চাপা গলায় কিছু একটা বলল। কৌতুহল চাপতে না পেরে পায়ে পায়ে ভ্রমরা আর কনকবাবুর কাছাকাছি হয় অনন্ত। তার মন বলছিল, কিছু একটা ঘটবে। শুনতে পেল, কনকবাবু বলছেন, “অসম্ভব। তুমি পারবে না!”

ভ্রমরা বলেছিল, “ভ্রমরা সেনকে চ্যালেঞ্জ করো না কানুরায়, ভ্রমরা পারে না এমন কাজ নেই। তোমাকে অ্যাট লিস্ট আরও একটা কমলাভোগের ব্যবস্থা আমি করে দেব এবং তোমার ঝগড়ুটে বৌয়ের সম্মতিতে। জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ...” বলে টুক করে সরে গেল।

একটু পরেই দেখা গেল এক আশ্চর্য নাটক।

সকলে দেখল, ভ্রমরা কনকবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে গল্পে মশগুল। এমন সময় হঠাৎ কনকবাবুকে উদ্দেশ্য করে ভ্রমরা বলে উঠল, “এই কনকদা! তুমি কমলাভোগ খাওনি তো?”

কনক-দম্পতি অবাক। কনকবাবু আমতা আমতা করে বললেন, “হ্যাঁ, মানে একটা জাস্ট...”

অত্যন্ত দুঃখ-দুঃখ মুখ করে ভ্রমরা কনকবাবুর স্ত্রীকে বলে, “তুমি কেন অ্যালাও করলে বৌদি! একে কনকদা জাস্ট অ্যারাইভ ফার্ট, এই সময়ই কত কিছু কন্ট্রোল করতে হয়। রান্ধিবোলা মিষ্টি খেলে শুগার লেভেল শূট আপ হয়। তার ওপর কমলাভোগটা তো খুবই মিষ্টি। অ্যাডেড কালার থেকে অ্যাসিডিটি হওয়ার চান্স থাকে... না না বৌদি, কনকদাকে অ্যালাও করে তুমি ঠিক করোনি... কনকদা ছোটবেলা থেকেই এরকম নটি, জানো তো, একদম কথা শোনে না। হাজারো দুষ্টমির জ্বালায় আমরা পাড়াশুদ্ধ সবাই জেরবার... তুমি বরং বাড়ি গিয়ে একটু জোয়ানের আরক, আর কাল সকালে উচ্ছে সেন্দ্র করে...”

এই ভাবে নানা কথা শুনিতে আস্তে আস্তে সরে পড়ল। তার পর অবাক কনকবাবুকে আরও অবাক করে দিয়ে কনকবাবুর স্ত্রী ভুরু কঁচকে বললেন,

“সামান্য একটা কমলাভোগ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি! মা’র চেয়ে যার দরদ বেশি, তাকে বলে রান্ধুসি মাসি! আমার হাজ্জব্যাড কী খাবে না খাবে, সেটা আমি বুঝব। ও ওপরপড়া হয়ে এত জ্ঞান দেবে কেন! শোনো, তুমি আর-একটা খাও তো, দেখি কী হয়... যত্ন বাজে কথা। উঁহ! কনকদা কনকদা করে তিনি নালেকোলে হয়ে গেলেন একেবারে...”

কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে গেল কনকবাবুর। তিনি ছুটে গিয়ে দুটো কমলাভোগ পাতে তুলে নিলেন। তার পর টপাটপ এ-গালে ও-গালে। মিসেস কনক কিছু বলার সুযোগ পেলেন না। তারিয়ে তারিয়ে শেষ করে স্ত্রীকে বললেন, “একটা তোমার পারমিশনে, অন্যটা তোমাকে জ্ঞান দেওয়ার প্রতিবাদে...”

কনকবাবুর স্ত্রী ভুরু কঁচকে বললেন, “তাঁর তো সংসারের বালাই নেই, একে উপোসি ঠাকরুন, তায় রূপসী। তোমাকে বলে দিচ্ছি, খুব সাবধানে থেকো। বয়স তো সুবিধের নয়। আগে দুষ্টমি করছে, সে তো তিনি ঠারঠারো শুনিয়েই গেলেন! কিন্তু এখন কোনও বেচাল দেখলে মহামুশকিল হয়ে যাবে বলে দিলাম।”

কনকবাবু কমলাভোগে রসস্থ মুখে গদগদ স্বরে বলেছিলেন, “তুমি থাকতে বেচাল... আমার ঘাড়ে তো একটাই মাথা গিলি।”

পুরো ঘটনাটা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল অনন্ত। মনে হয়েছিল, ভ্রমরা সেন নমস্য মহিলা। কনকবাবুও বড় ভাল মানুষ।

তবে শুধু কনকবাবু নন, অনন্তর কাউকেই খারাপ লাগে না। কারও ওপর রাগ হয় না, বিরক্তি আসে না। সেই যে ‘সাড়ে চূয়াস্তর’ ছবিতে নবদ্বীপ হালদারের ডায়ালগ ছিল, ‘আমরা হলুম গে চাকর-মনিষি লোক’—সেই দর্শনটা অনন্ত নিজের মধ্যে গেঁথে নিয়েছে। তার মনে হয়, কাউকে জাজ করার কোন যোগ্যতাটা তার আছে। মা নেই। বাবা ভুলে গেছেন। মামা আশ্রয় দিয়েছিলেন। তবে সে-আশ্রয়ের সঙ্গে উপরি জুটেছিল শীতল ব্যবহার—সদ্য ফ্রিজ থেকে বের করে দেওয়া খাবারের মতো—যাতে আত্মসম্মানের মর্মমূল পর্যন্ত কনকন করে ওঠে। এখন অনন্ত একটা কোনও রকম চাকরি করে। নিজের ভাড়া আর খাওয়াদাওয়াটুকু চালিয়ে নেওয়ার মতো। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই। সে জানে বাইরের প্রদেশ থেকে কলকাতায় এসে যে-লোকটা পানের গুমটি করেছে, কিংবা রাস্তার ধারে বসে তোলা উনুনে তেলেভাজা ভাজে, সে-ও অনন্তর চেয়ে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট জীবনযাপন করে। অনন্তর কোনও কিছুতে আগ্রহ নেই। তার কিছু ভাল লাগে না। মায়ের মুখে শুনেছিল, শৈশবে তার জন্মছক দেখে নাকি তার দাদামশাই বলেছিলেন, তার জন্মছকে শনি এবং চন্দ্রের এক আশ্চর্য সংযোগ আছে। এই যোগ মানুষকে বিষণ্ণ আর নিঃসঙ্গ করে দেয়। এরা না চাইলে কোনও কিছু এদের ভেতর পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না। তার ধরনধারণ দেখে অবাক হয় কুসুমিতাও। সে কিছুতেই ধরতে পারে না অনন্তবিশ্ব মানুষটা কেমন। বুঝতে চায়, কিন্তু কিছুতেই যেন নাগাল পায় না।

উড্ডয়ন পর্ব: তৃতীয় ভাগ

কথামতো আবার ফিরে এলাম। বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে ফের আটকে বসে আছি। শীতকাল বলে কষ্ট হচ্ছে না। গরম হলে সেন্দ্র হয়ে যেতাম। চড়চড় করে ট্যাক্সির ভাড়া বাড়ছে। দুশো কেন, তিনশোর মধ্যেও হবে কি না সন্দেহ। কপাল আজ খুবই ডবলিউ বুঝেছেন না! ডবলিউ স্ট্যান্ডস ফর ওয়ার্ল্ড। আমার ট্যাক্সির সামনের বাসটাকে পুলিশে ধরল। বাস-ড্রাইভারটাও মহা তেওঁটে। সমানে তক্কো করে গেল রাস্তা আটকে। পেছনে গাড়ির লাইন। এই বার পুলিশটা বাসের গায়ে লাঠিপেটা করছে। তুমুল গালাগালির বন্যা। মহা জ্বালা! তক্কোবাজ ড্রাইভারটাকে না হয় লাঠিপেটা করে বাস থেকে নামাল, তা হলে বাস সরাবে কে! পুলিশটা কি বাস সাইড করতে পারবে গাড়িতে উঠে! দ্রুত রাস্তা পরিষ্কার হওয়ার কোনও আশা দেখতে না পেয়ে আমার মাথাটা গরম হচ্ছে আস্তে আস্তে, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। ট্যাক্সিভাড়াতেই সমস্ত টাকা শেষ করে কপর্দকশূন্য হয়েই শেষে ট্রেনে উঠতে হবে আমাকে! আমার কি নিরুদ্দেশ যাত্রার আগে পাঁজিপুঁথি

দেখে বেরোনো উচিত ছিল!

নাঃ! মাথা গরম করে লাভ নেই। কন্ট্রোল অনন্ত, কন্ট্রোল। তার চেয়ে বরং গল্পটা এগিয়ে নিই। এক জনের কথা বলা বাকি আছে। তবে তার সঙ্গে গল্পের খুব একটা সম্পর্ক আছে কি না, সে ব্যাপারেও ততটা নিশ্চিত নই। তবু সময় যখন একটু পাচ্ছি, তখন ওই অদ্ভুত মেয়েটার কথাই-বা বাদ থাকে কেন।

২০২২ সালের অগস্টের শেষ দিকের ঘটনা। সে দিন দুপুরবেলা খেয়ে উঠে ক্লাস ইন্টেলভেনের বইপত্র ওল্টাচ্ছিলাম। আজ গোলাপির ক্লাস আছে। একেবারে কিছু না দেখে শুনে গিয়ে পড়ানো যায় না। সেই কারণেই ঘটনাক্রমে দেখে নেব। তার পর বেরোব। সব দুটো বাজে। বইটা নিয়ে খাটের ওপর উঠে বসেছি, তখনই দরজায় আওয়াজ। এখন আবার কে! সপ্তাহখানেক হল ডোরবেলটা খারাপ। একতলায় থাকি বলে দরজা খোলার উপদ্রবটা আমারই ঘাড়ে। বেশির ভাগই উপরের, মানে মিসেস করের ভিজিটর। আমি দরজার টোকা শুনে দরজা খুলি এবং উপরে খবর দিই। বারান্দায় মিসেস কর কিংবা তার কাজের লোক বাতাসির আগমন ঘটে। প্রয়োজন হলে কোলাপসিবল গেট খুলে উপরে ওঠার সিঁড়িও দেখিয়ে দিই।

সে দিন দরজা খুলে দেখি একটা কমবয়সি মেয়ে। রোদে ঘামে মুখ লাল। চোঁট শুকনো। সামনের কিছু চুল ক্লিপ কাঁটার শাসন এড়িয়ে এলোমেলো। পরনে সাদামাটা সালোয়ার কামিজ। কাঁধে একটা ব্যাগ। বুঝলাম, সেলস গার্ল। কিন্তু আমার তো নেওয়ার মতো কিছু নেই। এ রকম হলে ‘কিছু নেব না’ বলেই দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে আমার ঠিক হাত ওঠে না। মায়া হয়। মেট্রো স্টেশন কিংবা শপিং মলে কিছু সুবেশ তরুণী-তরুণী আচমকা রাস্তা আটকে খুব নম্র ভাবে জিজ্ঞেস করে, “কোনও ক্রেডিট কার্ড ইউজ করছেন স্যার?” অনেকে মশা মাছি তাড়ানোর মতো হাত পা নাড়িয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যান। আমি পারি না। দাঁড়িয়ে সত্যিটাই বলি। আমি ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার শর্ত পূরণ করতে পারব না। আমি এলিজিবল নই। সে সময় আমার মুখে ফুটে ওঠা অসহায়তা উল্টো দিকের ছেলে বা মেয়েটিকে ছুঁয়ে যায়। বুঝতে পারি ওরাও আমারই মতো। আমার তাও হচ্ছেমতো পোশাকআসাক পরার স্বাধীনতা আছে, ওদের তাও নেই। গরমকালেও গলায় টাই বেঁধে, পায়ে বুট পরে থাকতে হয়।

ফলে এই মেয়েটিকেও কিছু বলে উঠতে পারলাম না। বরং মেয়েটি কী বলে শোনার অপেক্ষায় সামান্য স্নান চোখে তাকিয়ে রইলাম।

মেয়েটি হাতে ধরা একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, “রমাপতি সরকার এখানেই থাকেন তো?” মৃদু ভিত্তি নম্র গলা।

মেয়েটির হাতের কাগজের টুকরোয় এ বাড়িরই ঠিকানা লেখা। আবার ‘গ্রাউন্ড ফ্লোর’-ও লেখা আছে। আমি বললাম, “গ্রাউন্ড ফ্লোরে তো আমিই থাকি। পেয়িং গেস্ট। আমার নাম অনন্তবিশ্ব ঘোষ। উপরে বাড়ির মালকিন থাকেন, তাঁকে বরং জিজ্ঞেস করে দেখি...”

মেয়েটি ব্যস্ত হল, বলল, “কিন্তু নেমপ্লেটে তো লেখা আছে শ্রীমতী রজনী কর। আমাকে তো বলা হয়েছিল, এটা রমাপতি সরকারেরই বাড়ি। থাক, আমি ঠিকানাটা আর-একবার চেক করে নেব। ফোনে শুনে লেখা তো, কিছু ভুলও করতে পারি,” বলে মেয়েটি জিভ দিয়ে শুকনো চোঁট ভেজানোর একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে ওড়না দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। তার পর বলল, “শুধু শুধু আপনার ঘুম ভাঙলাম। আতঙ্কিত হুঁশিয়ার।”

কী যেন মনে হল, বলে ফেললাম, “জল খাবেন?”

মেয়েটি হাসল, “হলে ভাল হয়। সঙ্গে ছিল। ফুরিয়ে গেছে। আপনার অসুবিধে করলাম খুব...”

আমি ঘরের দরজা খুলে একটা বসার টুল ঘরের বাইরের দাওয়ায় এনে রাখলাম। বললাম, “এখানেই বসুন। আমি জল আনছি। আমি একা থাকি। অনেক নিয়মকানুন মানতে হয়। আপনাকে ঘরে বসতে বলতে পারলাম না, কিছু মনে করবেন না।”

মেয়েটি কিছু বলল না। সম্মতিসূচক হাসল শুধু।

শুধু জল দিতে নেই। আমার কাছে সাদা বাতাসা থাকে। মাঝে মাঝে মুড়ি দিয়ে খাই। দুটো বাতাসা একটা ছোট প্লেটে রেখে, ফিস্টার থেকে

এক গ্লাস জল এনে মেয়েটির সামনে ধরলাম। মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, “আবার বাতাসা!” বলে কচমচ করে খেয়েও ফেলল। তার পর এক নিঃশ্বাসে শেষ করল জল। তার পর খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, “আর-একটু জল হবে?”

আমি আরও এক গ্লাস জল এনে দিলাম। সেটাও একই ভাবে উড়ে গেল। কিন্তু গ্লাস ফিরিয়ে দেওয়ার পর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল মেয়েটা। বলল, “আমাদের আজ একটা প্রোগ্রাম ছিল, পথশিশুদের রাখি পরানো। আজ তো রাখির দিন। আমার ব্যাগে একটা রাখি আছে এখনও। আপনাকে পরাতে খুব ইচ্ছে করছে, নেনবন?”

আমি খুবই অবাক হলাম। কলেজে রাখির দিন অনেক ছেলেই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, কোনও পছন্দের মেয়ে তাকে রাখি পরিবেশ দেয় এই ভয়ে। সুরেশকে একবার কেউ রাখি পরাতে এলে সে হাত দুটো বিবেকানন্দ স্টাইলে ভাঁজ করে বুক লুকিয়ে বলেছিল, “অন্যায়ী মেয়েদের থেকে আমি রাখিও পরি না, ভাইফোঁটাও নিই না।” ডায়ালগটা ভাইরাল হয়েছিল, কলেজ ভর্তি ছেলেদের মুখে মুখে ফিরেছিল।

কিন্তু আমার তো তেমন কিছু গ্রাউন্ড নেই। মেয়েদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা কিংবা কাউকে ভাল লাগার মতো বিলাসিতা আমার কাছে গরিবের ঘোড়ারোগ। রাখি পরতেই বা দোষ কী! বলছে যখন, দিক। আমাকে রাখি পরিবেশ কেউ যদি খুশি হয়, শান্তি পায়... ইত্যাদি ইত্যাদি। বললাম, “দিন।” বলে ডান হাত এগিয়ে দিলাম।

মেয়েটিও তার কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা খুব সাধারণ রাখি বের করে আমার হাতে বেঁধে দিল। তার পর, ব্যাগের সাইড পকেট থেকে দুটো লজেন্স বের করে হাতে দিল। নিজেই কেমন পথশিশু পথশিশু মনে হল। আজকাল ছেলেমেয়েরা বড় হিসেবি, জল-বাতাসার ঋণটুকুও রাখতে চায় না হয়তো।

হঠাৎই মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে প্রণাম করতে গেল আমায়। আমি হাত ধরে ফেললাম। বললাম, “এটা করবেন না দয়া করে। আমার বড় অস্বস্তি হয়। প্রার্থনা করি, আপনি খুব ভাল থাকুন।”

মেয়েটি মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। কী আশ্চর্য! দেখি, মেয়েটির চোখ দুটোয় টলটল করছে জল। খুবই চমকে গেলাম। কী ব্যাপার! কাঁদছে কেন। তখনই মেয়েটি খুবই তাড়াহুড়ো করে, “আজ আসি। আবার কখনও দেখা হবে,” বলে দ্রুত দু’ধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে গেল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, যেতে যেতে মেয়েটি চোখ মুছেছে।

আর সে দিন তখনই আমার মনে হয়েছিল, কী কাণ্ড, মেয়েটার নাম তো জানা হল না! এত দূর পড়ে আপনারা কী ভাবছেন, আমি বুঝতে পারছি। সেই যে এক দিন দুপুরবেলা, যখন আমি বাড়ি ছিলাম না, তখন মিসেস করের সঙ্গে পুষ্পিতা রায় নামে একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছিল। পাড়া পরিবেশ এলাকার নাড়িনক্ষত্র সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে। এই রাখি পরাতে আসা মেয়েটিও কি কোনও ভাবে সেই পুষ্পিতাই? এর উত্তর এখনও খোলসা করার সময় হয়নি। শুধু বলব, না, পুষ্পিতা নয়। অন্য কেউ। তার পরিচয় এখনও পাইনি। আদৌ গল্পে মেয়েটা দরকারি কি না, তাও ঠিক হয়নি। মনে রাখবেন বন্ধুরা, আমি কিন্তু সাজিয়ে-গুছিয়ে উপন্যাস লিখছি না। যা যা ঘটেছে, আপনারা শুনছেন। ট্যান্ডিতে বসে মাঝে মাঝে আমি আমার অংশটুকু যোগ করে যাচ্ছি।

এখানে মনে পড়ে গেল, আমার স্কুলের সহপাঠী শুভজয়ের সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল। তখন বোধ হয় জুন-জুলাই মাস হবে। সেই শুভজয়ের স্ত্রী মেয়েটিও খুব অদ্ভুত। আর শুধু ওই মেয়েটাকেই-বা বলি কেন! শুভজয় নিজেই কি কম অদ্ভুত! ছেলোটাকে কেউ তেমন পছন্দ করত না। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধাত, আর নানা টারাব্যাকা কথা বলত, কারও কোনও গলতি ধরা পড়লে সবচেয়ে মারকুটে স্যারদের কাছে গিয়ে চুকলি কাটত। তার পর যাকে কাঠি করা হল, সে উত্তম-মধ্যম খেলে শুভজয় ব্যাটা খ্যা খ্যা করে হাসত। সেই কারণে দেখবেন, আমি শুভজয় প্রসঙ্গে বন্ধু কথাটা বলছি না। বলছি, একসঙ্গে পড়ত। মহা বদ ছেলে। অনেকেই পছন্দ করত না। তা স্কুল পেরোনোর বছর পনেরো পর কি আর সে সব স্মৃতি তো হালকা হয়ে যায়। তাই ফ্রেড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম। সে দিন

মানিকতলায় দেখা হতেই ছুটে এসে পরিচয় দিল। কী গ্যালগেলে হাসি! কারণটা তখন বুঝিনি, পরে বুঝলাম উদ্দেশ্য আছে।

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দেখাল, সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সারের কাজ করে। ভিডিও ব্লগ করে ইউটিউবে দেয়। অলক্ষে অলক্ষী না কী যেন! সেখানে ওর স্ত্রী তার জীবনের কথা বলে। একটুখানি শোনালও। কী প্রচণ্ড দুঃখ কষ্ট আর যন্ত্রণার কথা। বেশিক্ষণ শুনলে ডিপ্রেসন হয়। অথচ সে সব দুঃখের কথা শুনতে নাকি হু করে সাবস্ক্রাইবার বাড়ি। টাকা আসে। শুভজয় নাকি মাসদুয়ের মধ্যে গাড়িও কিনবে। তার পর স্পষ্ট কাজের কথায় এল— “তুই তো কলেজে নানা অনুরূপের স্ক্রিপ্ট লিখতিস, মাঝে মাঝে কবিতা গল্পও লিখতিস। এ রকম একটা সেন্টিমেন্টাল স্ক্রিপ্ট লিখে দিতে পারবি না? ধর সপ্তাহে একটা করে লিখলি? মিনিট দশ পনেরো বলার মতো? কী রে? তোকে না হয় কিছু পেমেণ্টও...”

মন চাইল না। বললাম, “বহু দিন কিছু লেখার অভ্যাস নেই রে। পেরে উঠব না। তা ছাড়া তুই তো ভালই লিখতিস। লেখ না।”

কথার মাঝখানেই শুভজয়ের স্ত্রী ঘরে ঢোকে। ময়লা রং, ক্লান্ত, বিষণ্ণ চেহারা, চোখদুটো বড় নিস্ত্রাণ। আমাকে দেখে মলিন হাসল। আমি হাতজোড় করে নমস্কার করলাম। সেও প্রতিশ্রুতি করে বলল, “আপনাকে চিনি। আপনি রূপার দাদা তো? ওদের বাড়িতেই থাকতেন না মোহন লাল স্ট্রিটে? আমার বাপের বাড়ি ওখানেই। রূপা আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত।”

বিশী ভাবে হাসল শুভজয়। মনে হল যেন ওর হাঁ মুখের মধ্য দিয়ে একটা অতল কালো গহ্বর পাতেলে নেমে গেছে। তার পর বলল, “বা! বা! তোমাদের পুরনো চেনাজানা তা হলে। ভালই তো হল। দেখ না, যদি স্ক্রিপ্ট লিখতে পারিস। নিজেদের মধ্যকার তো ব্যাপার... কী!”

আমার মেয়েটিকে মনে পড়ল না। রুম আর রুম, আমার দুই মামাতো বোনের ভাল নাম রূপা আর দীপা। তাদের কোন বন্ধু কবে আমার বাড়িতে এসে আমাকে দেখেছে, সে আমি জানব কী করে! আমি নিজের মতো থাকতাম। সব কিছু খেয়াল করতাম না। তাই শুভজয়কে বললাম, “আসলে আমার ঠিক মনে পড়ছে না। বোনের বন্ধুদের সঙ্গে তো আমার আলাপ হয়নি কখনও।”

শুভজয়ের বৌ বলল, “আমার নাম বিদিতা। রূপাকে বললে বলতে পারবে।”

শুভজয় কোন এক কাজের অফিসে ঘরের বাইরে যেতে বিদিতা হঠাৎ একটু কাছে সরে এসেছিল। সামান্য চাপা গলায় বলেছিল, “আপনি লিখবেন আমার জন্য স্ক্রিপ্ট? এখনও পর্যন্ত যতটা চলেছে, সবটা তো আপনারাই লেখা, তাই না? আপনি আপনার মতো বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকবেন, ইচ্ছেমতো পাড়া ছেড়ে কোথাও চলে যাবেন, কেউ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে কি না, খেয়াল করার প্রয়োজন মনে করবেন না— এ ছাড়া আর কী ভাবে লিখবেন স্ক্রিপ্ট? কাগজ-কলমের লেখা তো কিছুই নয়, আপনি যা করেছেন তার কাছে।”

আমি অবাক হতেও ভুলে গেছিলাম! এ সব কী বলছে এ মেয়ে! শুভজয়কে চেনে না ও। আমাদের পুরনো আলাপ থাকতে পারে ভেবেই ও আমাদের একা ছেড়ে গিয়ে আড়ি পাতছে হয়তো। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, “ঠিক বুঝলাম না।”

বিদিতা আর কিছু বলার আগেই শুভজয় ঘরে ফিরে এসেছিল। আমি উঠে পড়েছিলাম। আর ওখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত মনে হয়নি। আমার উপস্থিতি বিদিতা মেয়েটির পক্ষে বিশেষ ভাল হবে না। কথাটা আমার আগে বিদিতার বোঝা উচিত ছিল। তা হলেও কেন ও রকম ভাবে বলল? শুভজয়কে যত দূর চিনি, কথাগুলো আমাকে একেবারেই স্বস্তি দিতে পারেনি।

এখানে বলে রাখা ভাল, আমার কলকাতা ছাড়ার কারণগুলোর মধ্যে একটা বিশেষ কারণ হল, টাকা। ‘নটনটী’ নামে একটা সিনেমা দেখেছিলাম। ইন্দ্রাণী হালদার ছিলেন এক থিয়েটার-অভিনেত্রীর ভূমিকায়। দু’টি বাবুগোছের লোক কিছু বদ মতলবে ইন্দ্রাণী হালদারের থিয়েটার

করা বন্ধ করার জন্য তাঁর মায়ের হাতে নোটের বাউল গুঁজে দিয়ে যায়। সেখানে ইন্দ্রাণী হালদারের মায়ের ভূমিকায় যিনি ছিলেন, তাঁর মেয়েকে বলা একটা ডায়ালগ ছিল, “আমি ট্যাকা নিয়েছি, তাই তুই থিয়েটারে যেতে পারবি না।” আমারও সেই কথাটা মনে পড়ছে এখন। কলকাতা ছাড়ার অনেক কারণের মধ্যে ‘ট্যাকা’-ও একটা কারণ। আমি ‘ট্যাকা’ নিয়েছি, সেই কারণেও আমার আর কলকাতায় থাকা চলবে না। কত টাকা, কেন টাকা, কার টাকা— সে সব ঘটনায় যথাসময়ে আসবে।

আজ কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার সময় নানা কথার মধ্যে সেই রাখি-পরতে আসা মেয়েটার কথা মনে পড়ছে হঠাৎ। শুভজয়ের স্ত্রীর সেই আশ্চর্য কথাগুলো মনে পড়ছে। এ-ও কি এক রকমের পিছুটান? কে জানে! গুটি ভেঙে রেশমকীটের উড়ান কি এরকমই কঠিন একটা প্রক্রিয়া? এ ভাবেই কি তার নিজের সূতোয় বারবার আটকে যায় তার নানা উপাঙ্গ? এতখানি ভার বোধ হবে, আগে বুঝতে পারিনি তো!

তবু... পারতে আমাকে হবেই। রেশমকীট গাছ নয় যে, শেকড় উপড়ে অন্যত্র চলে যেতে হলে আর বাঁচবেই না। আস্তে আস্তে খোলসা হচ্ছে যানজট। হাওড়া স্টেশন আর কতই-বা দূর!

হাওড়া স্টেশন যত দূরেই হোক না কেন, উড্ডয়ন পর্বের চতুর্থ ভাগ আর বেশি দূরে নয়। নিয়ে ফিরব কিছুক্ষণের মধ্যেই।

আছে তো হাতখানি

সেক্টর ফাইভের ওয়েবেল মোড়ের কাছে একটা কফিশপ আছে। সেখানেই উপায়নের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করে কুসুমিতা। ওরা কোনও একটা কফিশপে বসে। নানা কথাবার্তা বলে। এতটা শুনে মনে হতে পারে, ওরা কি তা হলে...?

এই উত্তরটা এক কথায় দেওয়া খুব মুশকিল। পৃথিবীতে সব কথার উত্তর এক কথায়, মানে অন্ততপক্ষে শুধু হ্যাঁ বা না-এ হয় না। ধরা যাক, কোনও ছেলেকে জিজ্ঞেস করা হল, “হ্যাঁ রে, তুই তোর গার্লফ্রেন্ডের ঘাড় ভেঙে বড় বড় রেন্টরায় খাওয়া বন্ধ করেছিস কি?”

উত্তরে কেউ যদি বলে ‘হ্যাঁ’, তা হলে স্বীকার করে নেওয়া হবে, যে এই বদ অভ্যাসটি তার আগে ছিল। আর যদি বলে ‘না’, তা হলে বুঝতে হবে এই বদ অভ্যাসটি চালুই আছে। ঠিক সেরকমই, উপায়ন আর কুসুমিতার সম্পর্কটা ঠিক কী, সে কথা এক কথায় বলা খুব মুশকিল। বরং আন্দাজ পেতে গেলে শুরু করতে হবে, ওদের আগের জেনারেশন থেকে।

অ্যাডোবন্ড কোম্পানির দেবায়ন দত্ত এবং অ্যাডভোকেট অসমঞ্জ পালিত ছোটবেলা থেকে একই স্কুলে ক্লাস টেন অবধি পড়াশোনা করেছেন। বন্ধু দেবায়ন দত্তর কোম্পানির যাবতীয় আইনি কাজকর্ম দেখাশোনা করে অসমঞ্জবাবুর ল-ফার্ম। বড় হয়েও তাঁদের বন্ধুত্ব কমেনি বরং বেড়েছে। এঁদের দু’জনকে পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে। এঁদের পরিচয় আগে দেওয়া হয়েছে।

দেবায়নবাবুর ছেলে উপায়ন এবং অসমঞ্জবাবুর মেয়ে কুসুমিতা ছোটবেলা থেকেই পরস্পরকে খুব ভাল করে চেনে। এ রকম ক্ষেত্রে যা হয়, দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, দেবায়ন এবং অসমঞ্জ কি তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে ঠিক করে রেখেছেন? না। সেটা হয়নি। দেবায়ন এবং অসমঞ্জ দু’জনেই যথাক্রমে তাঁদের বন্ধুকন্যা এবং বন্ধুপুত্রকে খুবই স্নেহ করেন, তবে তা নিয়ে এমন কোনও প্ল্যান তাঁরা করেননি, যা কাউকে সমস্যা ফেলে দেয়।

দেবায়ন একবার অসমঞ্জকে বলেছিলেন, “আজকাল চার দিকে যা সব আলট্রামডার্ন আর আপস্টার্ট মেয়ে দেখছি, মাথা ঘুরে যায়! তোর মেয়েটা বড় ভাল রে! কুসুমটাকে আমার বৌমা করতে পারলে বেশ হত।”

অসমঞ্জ বলেছিলেন, “হলে আমার তো কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কী জানিস, আমি আমার মেয়ের ওপর জোর করে কোনও কিছু চাপিয়ে দিইনি কখনও। আমি সব সময় মনে করে এসেছি, ছেলেমেয়েদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজে নিজেই নেওয়া উচিত। জিতলে নিজেদের সিদ্ধান্তে জিতবে, ঠকলে নিজেদের সিদ্ধান্তেই ঠকবে। জিতলে পিঠ চাপড়ে দেওয়ার জন্য কিংবা ঠকলে চিয়ার আপ করার জন্যই বাবা-মাকে পাশে থাকতে হবে।

কিন্তু ছটছাট ঢুকে পড়ে তার হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে হবে না।”

সহমত হয়েছিলেন দেবায়ন। বলেছিলেন, “ঠিকই। আমারও তাই মত। আমরা দু’জন আলাদা মানুষ। আমাদের সম্ভানরাও আলাদা আলাদা মানুষ। আমাদের ভালমন্দের ভাবনা ওদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। আমার ছেলেকে যে আমি আমার কোম্পানিতে ইন্ট্রোডিস করেছি, তাতে কিন্তু খবরদারি নেই। ওর ইচ্ছে হয়েছে ফ্যামিলি বিজনেসে ঢুকবে, তাই ঢুকেছে। সে নিজের মতো করে কোম্পানিটা বুঝে নিচ্ছে, নিজের মতো করে কিছু কিছু ডিসিশন নিচ্ছে। আমি ধীরে ধীরে রাশ ছেড়ে দিচ্ছি। মনিটর করছি। সাজেশন দিচ্ছি। কিন্তু ডিসিশন ওর। এক দিন তো ও-ই সবটা চালাবে বলে ঠিক করছে, তা হলে শিখে নিক। কোম্পানিই বল, আর জীবন, প্রত্যেকেরই নিজের মতো করে তার ভাল-মন্দ ভাবার অধিকার আছে। আর ট্রায়াল অ্যান্ড এরর না হলে শেখা কমপ্লিট হয় না।”

অসমঞ্জ বলেছিলেন, “আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি ওয়েভলেংথ সচেতন। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা সংস্কারে যদি গলত না থাকে, ওরা ঠিক সিদ্ধান্তই নেবে। তার পর ভাগ্যে যা আছে।”

দেবায়ন হেসে বলেছিলেন, “বড়লোক বাপ বলেই তো আর আমরা আগেকার বাংলা সিনেমার কমল মিত্র নই যে, সিন্ধের ড্রেসিং গাউন পরে দাঁত চেপে পাইপ চিবিয়ে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নিজেরাই ডিসাইড করে তার ঘাড় চাপিয়ে দেব। ও সব আগেকার দিনেও চলত না, অশান্তি হত, ঝগড়া হত। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না।”

এতটা পড়ার পর প্রশ্ন উঠতে পারে, উপায়ন এবং কুসুমিতা পরস্পরের সম্বন্ধে কী ভাবে? ওরা পরস্পরকে পছন্দ করে কি? সে ব্যাপারটাও এককথায় বলা মুশকিল। ভালবাসার ব্যাপারে দু’জনেই খুব ক্রিটিকাল। ভালবাসা ব্যাপারটা নিয়ে ওদের মধ্যে নানা কথা আলোচনাও হয়। কুসুমিতা জানে হিসেব করে ভালবাসা যায় না। উপায়ন জানে, ভাল না বাসতে পারলে কুসুমিতা কখনও সুখী হবে না, সুখী করতেও পারবে না কাউকে। ভালবাসাহীন সম্বন্ধ করা বিয়ে পৃথিবীতে আর যে-ই মেনে নিক না কেন, কুসুমিতা কখনও মেনে নিতে পারবে না।

উপায়ন বাইরে থেকে খুব শান্ত, ঠান্ডা আর গম্ভীর প্রকৃতির হলেও ওর ভেতরে একটা চাঞ্চল্য সব সময় কাজ করে। ওর চোখে কুসুমিতা খুব ইমপালসিভ। ওর মনে হয়, কুসুমিতা ঠিক ম্যাচিয়োরড নয়। ছটছাট রেগে যায়। রেগে গিয়ে চোঁচামিচি না করলেও নানা রকম জ্বালা-ধরানো কথাবার্তা শোনায। এটাও উপায়নের পছন্দ নয়। সে সোজা কথা সোজা পছন্দ করে। এগুলো বাদ দিলে সে জানে, কুসুমিতা খুব ভাল মেয়ে। চুলচেরা বিচারে এ রকম দু’একটা সমস্যা সব মানুষেরই আছে। তবে উপায়নের একটু মধ্যবিস্তৃতি আছে। বড়লোকের মেয়েরা একটু ইমপ্র্যাকটিকাল হয় বলে সে বিশ্বাস করে। সে জানে, কুসুমিতাও এর ব্যতিক্রম নয়।

আর কুসুমিতার ভাবনা একটু অন্য রকম। প্রেম মানে তার কাছে, ঝোড়ো দমকা হাওয়ার মতো কিছু একটা। দুই সম্পন্ন মানুষের ছেলেমেয়ে পরস্পরকে চেনে মানেই এক দিন তারা বিয়ে করবে, পুরো ব্যাপারটার মধ্যে তো কোনও গ্লিল নেই! ভালবাসা এত ক্যালকুলেটিভ হয় নাকি। উপায়ন খুবই ভাল ছেলে, কিন্তু কোনও গোপন কল্পনায় তাকে কখনও দেখেনি কুসুমিতা। সে বাবার রাস্তায় হেঁটেই আইনের ছাত্রী। এবং খুব উজ্জ্বল ছাত্রী। কিন্তু ভালবাসার রাজ্যে যুক্তিতর্ক কাজ করে না বলেই তার ধারণা।

তা হলে প্রশ্ন হতে পারে, তারা পরস্পরের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করে কেন? কারণ, ওরা খুব ভাল সিক্রেট কিপার। কেউ কারও গোপন কথা ফাঁস করে দেয় না। এবং ওরা জানে, ওদের বিয়ে হোক বা না হোক, পেশার জগতে ওদের একসঙ্গে কাজ করতেই হবে। সেই কারণে কো-অর্ডিনেশন বজায় রাখে। দু’জনেই বিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার বন্ধুত্ব থাকা খুবই দরকার। ওরা জানে, ওদের মধ্যে কেউ একজন প্রেমে পড়লে, সে অপর জনকেই সে কথা প্রথমে জানাবে। আর কুসুমিতা প্রেমে পড়লে উপায়নকে বলতেও হবে না, ও নিজেই বুঝতে পারবে। উপায়নের অন্তর্দৃষ্টি প্রখর। সবর ক্ষেত্রেই।

নানা কারণে উপায়ন আর কুসুমিতা পরস্পরকে পছন্দ করে বটে, কিন্তু

লাইফ পার্টনার হিসেবে ভাবে না। অন্তত এখন পর্যন্ত ভাবেনি।

২০২২ সালের মার্চের প্রথম দিকে, যে দিন উপায়নদের অফিসে নতুন তিন জনকে নিয়োগ করা হল, সে দিনই উপায়নের কথা ছিল কুসুমিতার সঙ্গে দেখা করার। কারণ, কুসুমিতাই গত দু’দিন ধরে ফোন করছিল। সে-ই উপায়নকে কিছু বলতে চায়।

সেক্টর ফাইভের ওয়েবেল মোড়ের কাছে কফি শপটায় উপায়ন ঢুকল ঠিক সঙ্গে ছটায়। সে খুবই পাণ্ডুয়া। তখনও কুসুমিতা আসেনি। সে চুপ করে বসে একটা ম্যাগাজিন ওল্টাতে শুরু করল। কুসুমিতা এল ছটা দশে। এসেই ধূপ করে বসে পড়ে হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা টিস্যু পেপার বের করে মুখটা মুছে নিল। গরম এখনও সে ভাবে পড়েনি। তার পর বলল, “অনেক ক্ষণ এসে গেছিস? সরি, আমার একটু দেরি হয়ে গেল। কোথা থেকে আসছি বল তো, সেই রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট। চিনিস?”

উপায়ন খুব ভাল রাস্তা চেনে। কাজের ফাঁকে গাড়ি চালিয়ে কলকাতা ঘুরা তার একটা নেশার মতো। সে বলল, “আমি এসেছি এই দশ মিনিট হল। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট চিনব না কেন? কিন্তু সেখানে কী?”

মুচকি হেসে কুসুমিতা বলে, “তদন্ত।”

উপায়ন তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে। কোনও প্রশ্ন করে না। তার মন বলছে, কুসুমিতার জীবনে কিছু একটা ঘটেছে। কী ঘটতে পারে? প্রেম? একটা চাপ নেবে কি? দেখাই যাক না! লাগে তুক না লাগে তাক।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে উপায়ন জিজ্ঞেস করে, “ছেলেটি কে?”

একটু কি চমকায় কুসুমিতা? উপায়ন নিষ্পলক। তার প্রিয় শব্দ মানুষের ভেতরটা দেখা।

নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে কুসুমিতা বলে, “তুই যা ভাবছিস, তা নয়।”

উপায়ন বলে, “তা হলে?”

কুসুমিতা ভুরু কুঁচকে বলে, “তা হলে... হয় ছেলেটা ভয়ঙ্কর বদমাঁইশ, নয়তো অত ভাল ছেলে এ যুগে পাওয়াই যায় না। দ্বিতীয় অপশনটা এতটাই অলীক যে, কিছুতেই মানতে পারছি না।”

উপায়ন খাবারের অর্ডার দেয়। কফি আর গ্রিলড চিকেন স্যান্ডউইচ। তার পর বলে, “ভাল হোক, বদমাঁইশ হোক... তোর পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্টটা কী?”

“কেনম যেন চুপ করে থাকে, বোকাসোকা হাবভাব, সব সময় যেন পালাতে পারলেই বাঁচে, খুব একটা কথা বলতে চায় না। নিজের যে ব্যাকগ্রাউন্ড বলল, সেটাও বেশ সহানুভূতি তৈরি করে। কিন্তু সত্যি-মিথ্যে বুঝতে পারছি না। মুখোশ পরে থাকলেও এক্সপোজ করতে পারছি না। খুব পিচ্ছিল ধরনের, ঠিক পিচ্ছিলে বেরিয়ে যাচ্ছে। খুবই সন্দেহজনক। খুবই গোলমালে... তবে দেখিস, আই শ্যাল ক্র্যাক হিম ডাউন...” এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে থামল কুসুমিতা।

উপায়নের কেন যেন মনে হয়, গম্ভীরা সত্যিই সন্দেহজনক। একটা ছেলে— ভাল, মন্দ, সং-অসং, খোলামেলা কিংবা মুখোশ পরা, মিশুক অথবা মুখচোরা— কুসুমিতা এত চিন্তিত কেন? তবে উপায়ন বিচলিত হয় না। সে জানে, কুসুমিতা সব বলবে। সে তো বলতেই এসেছে। সে শান্ত হয়ে অপেক্ষা করে। তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছে, কোনও একটা ছেলেকে কুসুমিতার পছন্দ হয়েছে। সে কুসুমিতাকে যত দূর চেনে, তাতে তার ধারণা, একটু অন্য ধাঁচের চরিত্র না হলে কুসুমিতা ইন্টারেস্টেড হবে না।

মেঘে কৈল অন্ধকার

২০২২ সালের মে মাস। ভালই গরম পড়েছে, তবে সন্দের মুখে বেশ হাওয়া দেয় কোনও কোনও দিন। সে দিন সন্দের আলোছায়ায় রাস্তার মাঝখান থেকে অপ্রদীপকে ধারে সরিয়ে এনেছিল অনন্তবিষ্ণু। বলেছিল, “রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে কথা বলাটা ঠিক হবে না। চলুন, আমরা একটু ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলে নিই। আমার মনে হয়, আমাদের বেশি সময় লাগবে না।”

অভ্রদীপের মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, “আপনি কী করে জানলেন স্যার?”

অভ্রদীপ ঠিক করে এসেছিল বিষ্ণুর সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের ওজন বজায় রাখবে। বিষ্ণুকে ‘বিষ্ণুবাবু’ বলে সম্বোধন করবে। ‘স্যার’ বলবে না। কেনই-বা বলবে? অভ্রদীপ কি ওর ছাত্র! কিন্তু কার্যকালে প্রথম থেকেই ‘স্যার’ বলে ফেলায় নিজেরই একটু অস্বস্তি হল। কিন্তু বলা হয়ে গেছে, আর উপায় কী!

অনন্তবিষ্ণু খুব শান্ত গলায় বলে, “দেখুন, গোলাপিকে পড়ানোর দায়িত্ব যিনি আমাকে দিয়েছেন, তিনি এখানকার খুবই শ্রদ্ধেয় এবং সম্ভ্রান্ত মানুষ। তিনি গোলাপির বাবার বন্ধু ছিলেন। গোলাপিকে খুবই স্নেহ করেন। তিনি এই টিউশনি আমাকে দেওয়ার সময়ই বলে দিয়েছিলেন, শুধু পড়াশোনা দেখানোই নয়, আমি যেন মেয়েটির ওপর নজর রাখি। জায়গাটা ভাল নয়। গোলাপির বয়স কম। তার ওপর একটা কথা আছে, ‘অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী/ খনন হ ছাড়অ ভুসুকু অহরি’— শুনেছেন কোনও দিন কথাটা? মানে জানেন?”

অভ্রদীপ চিরকাল কন্সার্সের ছাত্র। বিষ্ণুস্যরের ফর্ম দেখে এমনিতেই দমে গেছিল। তার ওপর ভুসুকু-টুসুকু শুনে আরও ঘাবড়ে গেল। তার ফ্যাকাসে মুখ দেখেই ঘটনা আন্দাজ করে ফেলল অনন্তবিষ্ণু। অভ্রদীপের সমস্যা না বাড়িয়ে তাই সে বলল, “বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য হল চর্যাপদ। সেখানকার নামী কবিরা ছিলেন লুইপাদ, কাহুপাদ, ভুসুকুপাদ। এঁদের মধ্যে ভুসুকুপাদ সেই কবে লিখে গেছেন, হরিণের শত্রু হল তার মাংস, মাংসের জন্যই সে ব্যাধের হাতে মরে। এটা হল বাইরের মানে।”

অভ্রদীপ অবাক হয়ে বলে, “ভেতরেও আবার আলাদা মানে আছে নাকি?”

অনন্তবিষ্ণু বলে, “নিশ্চয়ই। ভাষাটার নামই সন্ধ্যাভাষা। সন্ধ্যা কেন? কারণ, অর্থের আলোআঁধারি। নিজের মাংসের জন্য হরিণ যেমন নিজেরই শত্রু, তেমনিই মন বা চিত্তরূপ হরিণও নিজের অবিদ্যা ও মাংসর্ষ দোষে নিজের শত্রু। ভুসুকু ব্যাধ তাকে রেহাই দেয়নি। সদগুরুর উপদেশরূপ তির দ্বারা তাকে বিন্ধ করেছে, যাতে তার অবিদ্যা ও মাংসর্ষ ছিন্ন হয়। যাক সে সব কথা... বলুন আপনি কী বলবেন? আসলে ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে পড়িয়ে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। দরকার না থাকলেও জ্ঞান দিয়ে ফেলছি। কিছু মনে করবেন না।”

অভ্রদীপ তত ক্ষণে নড়ে গেছে। কী বলতে এসেছিল, কী ভাবে সাজিয়ে এনেছিল, সবটা এমন অগোছালো হয়ে গেছে যে, বলতে গেলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চেপে কেলোর কীর্তি অবশ্যস্তাবী। সে আমতা আমতা করে বলে, “না স্যার, ভুলই তো... নতুন একটা কথা জানলাম...”

অনন্তবিষ্ণু বলে, “সে না হয় হল, এবার গোলাপি প্রসঙ্গে কী জানাতে এসেছিলেন, জানিয়ে ফেলুন।”

মনের গভীরের অস্বস্তি এবং ইতস্তত ভাব কাটিয়ে অভ্রদীপ জানতে চায়, “আসলে আপনি অনেক দিন গোলাপিকে পড়াচ্ছেন, তাই জানতে চাইছিলাম, ওর কোনও ব্যয়ফ্রেন্ড ট্রেড...”

অনন্তবিষ্ণু ভুরু তুলে বলে, “এই প্রশ্নটা করার জন্য আমাকেই উপযুক্ত বলে মনে হল?”

অভ্রদীপ সলজ্জ ভাবে বলে, “না মানে, যদি আপনার চোখে কেউ পড়ে থাকে...”

অনন্তবিষ্ণু বলে, “থাকলেই-বা আপনার কী? আপনি কি গোলাপির ব্যয়ফ্রেন্ড হতে চান?”

লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলে অভ্রদীপ। কোনও কথা বলতে পারে না। অনন্তবিষ্ণু বলে, “বুঝিছ। তা আমার কাছে না এসে গোলাপিকে ধরলেই তো পারতেন!”

অভ্রদীপ বলে, “আসলে স্যার, কিছু মনে করবেন না, ওর আপনার প্রতি কিংবা আপনার ওর প্রতি কোনও দুর্বলতা নেই তো? কারণ, আপনি ছাড়া ওর সঙ্গে অন্য কোনও ছেলের কমিউনিকেশন নেই।”

শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল অনন্তবিষ্ণু। কমিউনিকেশন থাকলেই দুর্বলতা থাকতে হবে? অনন্তবিষ্ণু তো কখনও সে ভাবে ভাবে না। সে

চায়, তার জীবন হবে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতো। কোথাও মিশবে না সে, কোথাও আটকাবে না, কোনও দুর্বলতাকে সিঁধ কাটতে দেবে না তার মনের দরজায়। অনন্তবিষ্ণু দৃঢ় গলায় অভ্রদীপকে বলে, “এরকম কিছু নয়। আমি যত দূর জানি, গোলাপির কোনও ব্যয়ফ্রেন্ড নেই।”

অভ্রদীপ শ্বাস ফেলে। সম্ভবত নিশ্চিন্ত হয়। অনন্তবিষ্ণুকে তার খারাপ লাগছে না। ন্যাতপেতে লোক নয়। ছাত্রীর প্রতি ছোঁকছোকানি এ লোকটাকে মানাবে না। সে বলে, “এইটুকুই জানার ছিল।”

“সে তো জানলেন। তার পর? এবার কী করবেন? গোলাপিকে প্রোপোজ করবেন?” স্টান প্রশ্ন করে অনন্তবিষ্ণু।

মনোবল সঞ্চয় করে অভ্রদীপ বলে, “সে রকমই হচ্ছে। আমি অনেক দিন ধরেই মনে মনে গোলাপিকে...”

“ভালবাসেন? তাই তো? সে তো খুব ভাল কথা...” বলে একটু থামে অনন্তবিষ্ণু। তার পর বলে, “তবে এখানে কিছু সমস্যা আছে। কিছু দায়িত্ব আছে। গোলাপিকে ভালবাসলে হবে না কিন্তু, তার সমস্ত দায়দায়িত্ব আর সমস্যাগুলো মাথায় রেখেই এগোতে হবে। পারবেন তো?”

“নিশ্চয়ই!” প্রত্যাী শোনায অভ্রদীপের গলা।

মৃদু হাসে অনন্তবিষ্ণু, বলে, “যে-ছেলে একটা মেয়েকে ভাল লেগেছে বলে তার মাস্টারকে জেরা করার জন্য পাকড়ায়, তার ধরনই হল আটঘাট বেঁধে কাজ করা। সে বিশদে না জেনে কোনও দায়দায়িত্ব বা সমস্যা নিতে পট করে রাজি হয় কী করে?”

অভ্রদীপ আর ঘাবড়ায় না। সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, গভীর গলায় বলে, “ওর জন্য সব পারব স্যার। যদিও জানি না ও আমাকে কী রিপ্লাই দেবে...”

কেন যেন ছেলেটিকে ভাল লাগে অনন্তবিষ্ণুর। ছেলেটির কাজকর্মে ভাবনাচিন্তার ছাপ আছে। চেহারা পোশাক-আসাকও বেশ সভ্য ভদ্র সপ্রতিভ। গোলাপির সঙ্গে খারাপ লাগবে না। পরক্ষণেই নিজেকে সামলায় অনন্তবিষ্ণু। সে এ সব চিন্তা করার কে! সে কেন কারও হয়ে ভাববে!

কিন্তু অভ্রদীপের মতলব অন্য। সে খড়কুটো ধরার মতো করে আবেদন করে, “স্যার, আমাকে একটু হেল্প করতে পারেন না? মেয়েটা তো সাইকেল চেপে মাথা নিচু করে পড়তে আসে, মাথা নিচু করে ফেরে। কোনও দিকে তাকায় না। কী ভাবে মেয়েটার সঙ্গে যে একটু কথা বলার সুযোগ পাই...”

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনন্তবিষ্ণু। সংসার বড় নাছোড় চোরাবালি... কখন যে কী ভাবে টেনে নেয়, বোঝা মুশকিল। নিজেকে কেমন যেন বড় দাদা মনে হয়। আর এড়াতে পারে না অভ্রদীপকে। জিজ্ঞেস করে ফেলে, “কী নাম? কোথায় থাকেন? চাকরিবাকরি করেন বলেই তো মনে হচ্ছে, না কি?”

অভ্রদীপ বলে, “সব বলছি স্যার, প্লিজ আমাকে আপনি বলবেন না। তুমি বলুন।”

অনন্তবিষ্ণু বলে, “সে না হয় হল, কিন্তু তুমিও আমাকে স্যার বোলো না। তুমি তো আর আমার স্টুডেন্ট নও। বিধ্বদা বোলো বরং। চলো, আমরা ওই পার্কের বেঞ্চটায় বসে কথা বলে নিই...”

সন্ধের আলোয় দু’জন মানুষ পাশের পার্কটার দিকে এগোয়।

ওই দু’জন মানুষ যাকে নিয়ে সে দিন আলোচনা করেছিল, তার মাস তিনেক পরের কথা। কলকাতা থেকে বর্ষা বিদায়ের পথে। মাঝে মাঝে শরতের আকাশ দেখা যাচ্ছে। পুজোর আর খুব বেশি দেরি নেই। মাসখানেক বড়জোর। গোলাপি সে দিন টিউশন থেকে বাড়ি ফিরছিল। তাদের কোচিং থেকে খানিকটা এগিয়ে একটা গলির মুখে, যে-রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরে গোলাপি, সেখানে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল গলির দেওয়াল ঘেঁষে। গলির বাঁক ঘোরার মুখে সাইকেলটা সামান্য আন্তে করতেই মেয়েটা হাত নেড়ে ডেকেছিল তাকে, “ভাই, একটু শুনবে?”

দাঁড়িয়েছিল গোলাপি। এগিয়ে এসেছিল মেয়েটা। কাছে আসতে দেখা গেছিল মেয়েটাকে। ফরসা, টানা টানা চোখ, নাক-ঠোঁট সুন্দর। গোলাপির চেয়ে কিছুটা বড়ই হবে। কিন্তু মেয়েটি প্রথমে এসেই হাত ধরল গোলাপির, বলল, “কী সুন্দর দেখতে ভাই তোমায়!”

গোলাপি অবাক হল, লজ্জাও পেল। তার মনে হল, এই কথা বলতেই কি তাকে দাঁড় করাল মেয়েটা!



“একটু ধারে সরে এসো, বেশিক্ষণ নেব না তোমার।”
সাইকেল থেকে নেমে এগোল গোলাপি।

মেয়েটি বলল, “শোনো না, তুমি এখানে কোচিং-এ পড়ো, না? আমরা সোনারপুরে থাকি। এই অঞ্চলে ফ্ল্যাট কিনে চলে আসার কথা হচ্ছে। আমার মাস্টার্সের পড়া দেখিয়ে দিতে পারবে এমন কাউকে খুঁজছি। তোমাদের কোচিংয়ে কোন স্ট্যান্ডার্ড অবধি পড়ানো হয় ভাই?”

গোলাপি আমতা আমতা করে বলে, “এখানে তো আন্ডার প্রিভিলেজড বাচ্চাদের পড়ানো হয়। আমি একাই উচ্চ ক্লাসে পড়ি। ইলেভেন। চেনাজানার সূত্রে বিটুস্যার আমাকে পড়া দেখিয়ে দেন।”

“তাই! এখানে যিনি পড়ান, তাঁর নাম বুঝি বিটুস্যার? তিনি তোমার চেনা?” জানতে চায় মেয়েটি।

“না, তা ঠিক নন। আমার বাবার বন্ধু বলে-কয়ে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তাই...” বলে গোলাপি।

মেয়েটি এবার বলে, “আচ্ছা, একটা কথা বলছি, কিছু মনে করো না, বিটুস্যারের বয়স কেমন? বয়স্ক মানুষ?”

গোলাপি বলে, “না, না, বেশি বয়স নয়। সাতাশ-আটাশ মনে হয়।”

শুনে মেয়েটি যেন খুব চিন্তায় পড়ে গেল, “তা হলে তো খুব প্রবলেম ভাই।”

গোলাপির মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, “কেন?”

মেয়েটি কাঁচুমাচু হয়ে বলে, “আসলে আমাদের বাড়ি খুব কনজারভেটিভ। কমবয়সি টিচার অ্যালাও করবে না। তা এই বিটুস্যার মানুষটি কেমন? মানে, তুমি তো একটা মেয়ে, তোমার অন্য রকম কিছু

মনে হয় না মানুষটার সম্পর্কে? মানে, তুমি ধরতে পারছ আমি কী মিন করতে চাইছি...”

তা পারছে গোলাপি। বিটুস্যারের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট চাইছে মেয়েটি। সে কী বলবে? বিটুস্যার ওকে কোনও ইশারা-ইঙ্গিত দেন কি না? বিটুস্যার লুজ ক্যারেক্টার কি না? ভাবনার ছায়া বোধ হয় তার মুখে এসে পড়ে।

মেয়েটি তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করতে করতে বলে, “এনি প্রবলেম? তুমি কি কিছু বলতে ভয় পাচ্ছ বা হেজিটেট করছ?”

গোলাপি দ্বিধা কাটায়। স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে বলে, “বিটুস্যার ওরকম মানুষ নন দিদি। আমি প্রায় বেশ কয়েক মাস পড়ছি ওঁর কাছে। পড়াশোনার বাইরে একটা কথাও কোনও দিন বলেননি। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি একবার তাকিয়েও দেখেননি পর্যন্ত। আর তা ছাড়া...” বলে একটু থমকায় গোলাপি।

ভুরু কুঁচকে কথা শুনতে শুনতে প্রশ্ন করে মেয়েটি, “তা ছাড়া কী?”

গোলাপি একটা শ্বাস ফেলে বলে, “আপনারা তো এখানে ফ্ল্যাট কিনে আসছেন, নিশ্চয়ই খোঁজখবর নিচ্ছেন। রেডলাইট এলাকা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। আমার বাবার বন্ধু আশুকা, আশুতোষ সেন, আমাকে বিটুস্যারের কাছে পড়তে পাঠানোর আগে স্যারের সম্বন্ধে যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়েছেন। বিটুস্যার বহু দিন ধরে এঁদের এনজিও-র হয়ে রেডলাইট এরিয়ায় কাজ করছেন। কখনও তাঁর নামে একটাও খারাপ কথা শোনা যায়নি। আমি দেখেছি, এখানে যে-বাচ্চাগুলো পড়ে, তারা তো বেশির ভাগই... মানে তাদের বাড়ি থেকে যে-সব মহিলারা



নিতে আসেন, তাদের সাজপোশাক দেখলেই বোঝা যায়... তাদের ছোট-বড় প্রত্যেককে দিদি বলে ডাকেন বিষ্টুস্যার। তারাও বিষ্টুস্যারকে খুব সম্মান করে।”

শুনতে শুনতে ভুরু কঁচকে যায় মেয়েটির। তার চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছাপ পড়ে। সে বলে ওঠে, “বাবা! আজকালকার দিনে কেউ এরকম ভাল হয় নাকি!”

কথাটা গোলাপির বিশেষ ভাল লাগে না, তবু সে মাথা নেড়ে বলে, “তা তো জানি না দিদি। যতটুকু জানি, বললাম। আপনার যদি আর কিছু জানার না থাকে, আমি যেতে পারি? দেরি হলে মা চিন্তা করবেন।”

নিজেকে সামলে নেয় মেয়েটি। বলে, “হ্যাঁ ভাই, সরি, তোমার দেরি করিয়ে দিলাম। তোমার নামটাই তো জানা হল না...”

“আমার নাম গোলাপি সরকার।”

“কী সুন্দর নাম! আর আমার নাম পুষ্পিতা রায়। এখানে শিফট করে চলে এলে মাঝে মাঝে দেখা হবে, কেমন?”

মাথা নেড়ে সাইকেলে উঠে প্যাডেলে চাপ দেয় গোলাপি।

তার বাড়িতে যে ততক্ষণে একটা ভারী গোলমেলে সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে, সে কথা তার জানার কথা নয়। সন্দের মুখে টিউশনি থেকে ফেরার পরপরই গোলাপিকে কিছু বলেননি গোলাপির মা। গোলাপি হাত-মুখ ধুয়ে আসার পর বাটি করে মুড়ি মেখে দিয়েছেন। গোলাপি খেয়েছে। সারা দিনের ক্লান্তি আর খিদে চোটে গোলাপিও খেয়াল করেনি তার মায়ের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। তার মা এমনতেই চুপচাপ। তাই কিছু মনে হয়নি। তার খাওয়া শেষ হতেই মা তাকে খুব ধীরে ধীরে

বললেন, “কাল সকালে আমার সঙ্গে একবার আশুতোষবাবুর বাড়ি যেতে পারবি?”

অবাক হয় গোলাপি। বলে, “সকালে কখন মা? ইশকুল আছে তো!” গোলাপির মা বলেন, “ইশকুল না গেলে হবে না কাল? আশুবাবুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি কথা বলা দরকার।”

কিছু বুঝতে পারে না গোলাপি। বলে, “কেন মা? কী হয়েছে?” গোলাপির মা উঠে গিয়ে ভেতর থেকে একতড়া কাগজ নিয়ে আসেন। দেখে মনে হয় কোর্টের কাগজপত্র। স্ট্যাম্প পেপার। সেই কাগজের তাড়াটা বাড়িয়ে দেন গোলাপির দিকে। গোলাপি হাতে নেয়। দু’-এক পাতা উল্টে দেখে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, “এটা কী মা?”

গোলাপির মা থমথমে মুখে বলেন, “আদালতের নোটিস। আমাদের মাসখানেকের মধ্যে এ বাড়ি ছেড়ে উঠে যেতে হবে।”

গোলাপি কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে যায়। মানে কী কথাগুলোর? কোথায় যেতে হবে? যে-বাড়িতে তার বাবার জন্ম, তারও জন্ম, সে বাড়ি তাদের ছেড়ে দিতে হবে? কেন?

বড় বেদনার মতো

শুভজয়ের চিত্রনাট্য অনুযায়ী বিদিতার নিরুপায় অসহায় কষ্টকাহিনীর অভিনয় বেশ ভালই চলছে। যদিও এখন লকডাউনের ঝামেলা আর সে রকম নেই। কিন্তু ভিডিও ব্লগিংটা এমন নেশার মতো ধরে গেছে

শুভজয়ের যে, সে চাকরি খুঁজতেও আর খুব বেশি আগ্রহী নয়। মাঝে একদিন অনন্তবিষ্ণুর সঙ্গে তার দেখা হতে, তাকে ক্রিপ্ট লিখে দিতে বলেছিল শুভজয়। অনন্তর ব্যাপারটা মোটে ভালও লাগেনি, তাই ক্রিপ্ট লিখে দিতে রাজিও হয়নি। তাতে শুভজয়কে দমানোও যায়নি। সে অবিরাম লিখে চলেছে টাকা উপার্জনের নেশায়। সময়টা ২০২২ সালের প্রায় মাঝামাঝি।

দুঃখ আর যন্ত্রণার মর্মস্পর্শী কাহিনি বিক্রি করে চ্যানেলও ভালই টাকা দিচ্ছে। ‘অলক্ষে অলক্ষী’-ই এখন শুভজয়ের আসল লক্ষ্মী। বিদিতার এখনও সকাল থেকে খাওয়া জোটে না। সে বিকেলে একটু টিফিন খায়, রান্ধিরেও সে রকমই না। খেতে খেতে মানুষের থিদে, পেট, খাওয়ার ইচ্ছে সবই মরে যায়। বিদিতারও তাই হয়েছে।

হাতে টাকাপয়সা আসার পর থেকেই মাস ছয়েক হল শুভজয় আর প্রোটেকশন নেয় না। সে এবার বাবা হতে চায়। বিদিতার ইচ্ছে বা অনিচ্ছে, অন্যান্য সব ব্যাপারের মতো এই ক্ষেত্রেও গুরুত্বহীনই থেকে গেছে। তবে হ্যাঁ, ওপরওয়ালার ইচ্ছে কী, তা জানা যায়নি। কারণ, গত ছ’মাসের চেষ্টাতেও একবারের জন্যও ছেদ আসেনি বিদিতার স্বাভাবিক রজঃচক্রে। আজকাল সেই কারণে মাঝে মাঝে ভুরুতে ভাঁজও পড়ে শুভজয়ের। বলে, “ব্যাপার কী তোমার?”

ক্লান্ত বিদিতা বলে, “কিসের কী ব্যাপার?”

“সব বেরিয়ে যাচ্ছে কেন? গাছে ফল ধরার তো নামগন্ধই দেখতে পাচ্ছি না। বিয়ের আগে কোনও অপারেশন-ফপারেশন ছিল নাকি? তোমার বাপ লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছে?”

বিদিতার মুখে উত্তর জোগায় না। গা গুলোয়। মাঝে মাঝে টক জল ওঠে গলা দিয়ে। আশান্বিত হয় শুভজয়। কিন্তু প্রেগন্যান্সি টেস্টের পর তার বুকভরা আশা ধুক করে নিভে যায়। সে বুঝতে পারে না, সমস্যাটা কোথায়। তার মাথায় ডাক্তার দেখানোর চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে আজকাল। কয়েক বার শাসিয়েছে, “যদি জানতে পারি, তোমার বাপ কোনও রোগ লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছে, তা হলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাপের বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে আসব।”

ছাড়েনি বিদিতাও, বলেছে, “ভাল তো। ‘অলক্ষে অলক্ষী’র জন্যও নতুন অলক্ষী খুঁজে নিয়ো। আমিও বাঁচি। বুড়ি-বুড়ি মিথ্যে কথা সত্যি বলে চালাতে হয় না।”

এইখানেই একটু থমকে যায় শুভজয়। তাকে কি আবার চাকরি খুঁজতে হবে? দুঃখের গল্প এদিক-ওদিক থেকে টুকে ঝেড়ে ম্যানেজ করছে বটে, কিন্তু বিদিতা অভিনয়টা তো করছে। তার কথামতো না খেয়ে তো থাকছে। হাজার জ্বালাতনে রা তো কাড়ছে না! এ সব সুযোগ-সুবিধে ও কোথায় পাবে!

তবু পিছু হটে না শুভজয়। বলে, “সতীপনা কপচাবে না। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।”

একটা নতুন প্রোফাইল থেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসে অনন্তবিষ্ণুর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে। মিসেস বি। কোনও ছবি নেই। এ রকম নাম নেই, ছবি নেই প্রোফাইল থেকে রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে না অনন্তবিষ্ণু। এবারেও করেনি। কিন্তু মেসেঞ্জারে একটা মেসেজ এল মিসেস বি-এর প্রোফাইল থেকে— “প্লিজ অ্যাকসেপ্ট। আমি শুভজয়ের স্ত্রী বিদিতা। আমার কিছু কথা বলার আছে।”

হাওয়া ভাল বুঝল না অনন্তবিষ্ণু। সে অ্যাকসেপ্ট করল না। ফ্রেন্ড-লিস্টে না থাকলেও কেউ তাকে মেসেঞ্জারে মেসেজ করতে পারে। সে প্রাইভেসি তার সেট করা নেই। ফলে শুরু হয়ে গেল মেসেজের পর মেসেজ। লম্বা লম্বা মেসেজ। সে উত্তর দেয় না। কিন্তু তাতে মেসেজ আসা বন্ধ হয় না। অনন্তবিষ্ণু মেসেজগুলো পড়ে আর ভাবে, এই ফোন যদি কোনও দিন শুভজয়ের হাতে পড়ে, সে দিন কী কাণ্ডটাই না হবে। সে-ও কি রেহাই পাবে! শুভজয় তার বাড়ি বয়ে এসে অশান্তি করবে না তো!

তার চেয়েও বড় কথা, একটা মেয়ে অনন্তকে এমন পাগলের মতো ভালবাসল, এখনও ভুলতে পারল না, এর বিন্দুবিসর্গ অনন্ত জানতেও

পারল না! সমস্যাটা কোথায় ছিল? মেয়েটার ট্রান্সমিটারে? না তার রিসেপ্টরে? নাকি দুটোতেই? ভেবে ভেবে কুলকিনারা পায় না অনন্তবিষ্ণু।

মাঝখান থেকে কলকাতা ক্রমে ক্রমে তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

এরই মধ্যে এক দিন মিসেস কর তাঁকে ওপরে ডেকেছিলেন। সেদিন তাঁর আচরণে স্বাভাবিক গাভীর ছিল না। তিনি যেন কিছু একটা বলতে চেয়েও বলে উঠতে পারছিলেন না। পাড়ার নানা জায়গা থেকে মিসেস করের জীবনের কথা সে শুনেছিল। শুনেছিল তাঁর স্বামী এবং মেয়ের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথা। সল্টলেক ছেড়ে দিয়ে বাপের বাড়িতে চলে আসার কথা। কিন্তু এই বয়সে এসে মিসেস করের মধ্যে একটা একাকিছু এবং কষ্ট তৈরি হয়েছে, তিনি যে কোনও অবলম্বন খুঁজছেন, সে কথাটা এই দিনের আগে কখনও মনে হয়নি অনন্তর।

মিসেস কর বলছিলেন, “দ্যাখো, তোমার তো নিজের বলতে সেরকম কেউ নেই। আমারও নেই। এই বয়সে এসে একটা চিন্তা আমায় বড় বিরক্ত করে। আমি চলে যাওয়ার পর আমার বাড়ি, আমার সম্পত্তির কী হবে। সবার হয় কি না জানি না, তবে আমার হচ্ছে। অনন্ত, তুমি এ ব্যাপারে আমাকে কোনও সমাধান বলতে পারো?”

এই কথাগুলো যখন হচ্ছিল, তখন বাড়ির কোথাও কোনও পরিচারক বা পরিচারিকা ছিল না। বৈষয়িক কথা হবে বলেই হয়তো তাদের সরিয়ে দিয়েছিলেন মালকিন।

অনন্তবিষ্ণু কী বলবে, বুঝে উঠতে পারছিল না। এক্ষেত্রে একটাই সমাধান। কোনও সংস্থায় কিংবা আশ্রমে বাড়ি এবং সম্পত্তি দান করে দেওয়া, যাতে তারা সে সব মানুষের কল্যাণের কাজ লাগায়। অনন্তবিষ্ণুর মনের কথা আন্দাজ করে ফেলেছিলেন মিসেস কর। তিনি বলেছিলেন, “তুমি হয়তো ভাবছ কোথাও দান করে দেওয়ার কথা। কোনও চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন কিংবা অনাথাশ্রম। না হলে কোনও ধর্মীয় সংস্থা। কিন্তু কী জানো অনন্ত, আমার পাঁচ ভূতে বিশ্বাস নেই। প্রথম কথা আমি এরকম কোনও সংস্থা চিনি না। সেই কারণে সেই সংস্থার ভেতরে আদৌ কোনও দুর্নীতি আছে কি না, তা জানতে পারব না। তা ছাড়া কোনও ধর্মীয় সংস্থায় আমি বিশ্বাস করি না। কারণ, ভারতবর্ষে হাজার হাজার গুরু। প্রত্যেকের মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ, বাকিরা বোগাস। অধিকাংশ ধর্মীয় সংস্থার কাজই হল এনক্রোচমেন্ট। আশ্রমের সংখ্যা এবং শিষ্যশিষ্যার সংখ্যা বাড়ানো, যাতে ডোনেশনের ফ্লো বন্ধ না হয়। ধর্মে আমি বিশ্বাস করি না অনন্ত, কর্মে বিশ্বাস করি। সংস্থায় বিশ্বাস করি না, মানুষে করি। নামগান, জপ-ধ্যানের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করি সত্যায়, চরিত্রে। যার এই দুটো গুণ থাকে, সেই পারে। এগুলো আমি কোনও বই পড়ে বলছি না অনন্ত। এ আমার নিজস্ব জীবন এবং অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া শিক্ষা।”

মিসেস কর থামেন। ঘরে অথগু নৈঃশব্দ্য। শুধু দেওয়াল ঘড়ির টিকটিক। সময় চলিয়া যায়। একবার যে সময় চলে যায়, আর ফিরে আসে না।

মিসেস কর আবার বলতে শুরু করেন, “যা যায়, ঠিক তা ফিরে আসে না। কিন্তু তার আদল আসে। আপন হয়তো হয় না, তবু অবলম্বন মেলে। হারানোর কষ্ট গভীর। কিন্তু নতুন করে পাওয়ার আনন্দ তাকে ভুলিয়ে দিতে পারে।”

এবার আরও কিছু বুঝতে পারে না অনন্তবিষ্ণু। সে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

মিসেস কর বলেন, “তিরিশ বছর আগে যে আমাকে ছেড়ে চলে গেছিল, সে তোমার মধ্য দিয়ে আবার ফিরে এসেছে অনন্ত। আমি আইনানুগ পথে তোমাকে দত্তক নিতে চাই। আমার সম্পত্তি এবং বাড়ি আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই। তুমি আমার টাকাপয়সার মালিক হও। তুমি নিজে এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত। তুমি নিশ্চয়ই আমার টাকাপয়সা সং কাজে লাগাতে পারবে। আমি তোমাকে জোর করব না। কিন্তু ভেবে দেখো, আমার কথা শুনলে তোমার ক্ষতি হবে না। আমিও শেষ বয়সে একটু শান্তি নিয়ে চোখ বুজতে পারব। দ্যাখো, পরিণত বয়সে আমাদের মধ্যে মা-ছেলের সেই আবেগ তো আসবে না। আমার পৃথিবীর আলো দেখতে না পাওয়া সেই ছেলের জায়গাও তুমি নিতে পারবে না, আমিও

তোমার পরলোকগতা মায়ের রিপ্লেসমেন্ট হতে পারব না। তবু, একটা পারস্পরিক নির্ভরতা এবং বিশ্বাসের জায়গা তো থাকবে। অন্তত বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের চেয়ে বেশি। তাই না? ভেবে দেখো। আমাদের জানিয়ে।”

তার পর থেকেই অনন্তবিষ্ণু ভেবেছে। বারবার ভেবেছে। কিন্তু কিছুতেই সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। কেন যেন তার মনে হয়েছে, মিসেস করের প্রচুর সম্পত্তিই তার সিদ্ধান্তে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উত্তরসূরীহীনা ধনী বৃদ্ধার পুণ্যপুত্র হতে কেউ আপত্তি করবে না। টাকাপয়সার গন্ধেই রাজি হয়ে যাবে। সেই জায়গাটাতাই নিজেকে বসাতে পারছে না অনন্তবিষ্ণু। তার কিছু নেই যেমন, তেমন লোভও নেই। সে যদি মিসেস করকে নির্ভরতা দেওয়ার জন্যও তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়, কেউ তা মানবে না। সবাই তাকে মনে মনে লোভীই ভাববে। ভাববে, একা বিধবা মহিলার মাথায় হাত বুলিয়ে সম্পত্তি গাপ করার মতলব।

আর তা ছাড়া, এত গোলমালে নিজেকে জড়াবেই-বা কেন অনন্ত! মিসেস কর ওকে সম্পত্তি দিয়ে দিলেন, তার পর মিসেস করের শ্বশুরবাড়ির দিকের কোনও ভূঁইফোড় এসে মামলা ঠুকে হরানি করল। সমস্যা তো অনেকই হতে পারে। কপাল যখন খারাপ হয়, কী থেকে কী না হয়! মিসেস কর এ প্রস্তাব দেওয়ার পর মাস খানেক কি তার বেশিই হয়ে গেছে, কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি অনন্তবিষ্ণু। ভাবতে ভাবতে ২০২২ সালের জুলাই পেরিয়ে গেছে। বর্ষা নেমেছে কলকাতায়। ধুয়ে গেছে রাস্তাঘাট। তবু অনন্ত স্থির করতে পারেনি তার কী করণীয়।

সমস্যা কি অনন্তবিষ্ণুর একটা! একটা চিঠি পড়ে তো তার মাথা ঘুরে গেছে। চিঠি বলা যেতে পারে, আবার মেসেজও বলা যেতে পারে। প্রেরক সেই মিসেস বি, মানে বিদিতা। শুভজয় যে বাবা হওয়ার চেষ্টায় ফল না পেয়ে ডাক্তারবদী শুরু করেছে, সে কথা বিদিতার চিঠি থেকে জেনেছিল অনন্ত। নানা রকম টেস্ট ইত্যাদি চলছে, তাও লিখেছিল বিদিতা। তবু যে কিছুতেই মিশন অ্যাকমপ্লিশড হচ্ছে না, তার জন্যই কি অন্য পথের সন্ধান করছে বিদিতা! সে কথাই এই নতুন চিঠিটায় বিস্তারিত ভাবে লিখেছে সে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হওয়ার বদলে বেড়ে যেতেও তো পারে! সন্তান না আসার সমস্যাটা আসলে কার, সে কথা না জানলে... যা-ই হোক, চিঠিটার অংশবিশেষ তুলে ধরলেই ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে। বিদিতা লিখেছে, “...জানো অনন্ত, মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি যদি কোনও দিন আমার ভেতরে প্রবেশ করতে, নিজেকে রেখে আসতে আমার মধ্যে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতাম আমি! আমার মধ্যে দিয়ে ফের পৃথিবীর আলো দেখতে তুমি! তোমার মতো সুন্দর একটা ছেলে হত আমার! তোমার মতো লম্বা, ফর্সা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, পাতলা ঠোঁটে মিষ্টি হাসি! তুমি যদি আমাকে একটু ভালবাসতে, আর কারও কাছে কিছু ছাইতাম না! পারো না, অন্তত একবার হলেও আমায় ভালবাসতে? তোমার সেই চিহ্নটুকু নিয়ে সবাইকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতাম... আর তোমাকে কখনও বিরক্ত করতাম না... একবার, অন্তত একবার আমার কাছে আসতে পারো না? খুব কাছে...”

না। বিদিতার এই আহ্বান যতই আকুল হোক, তাতে সাড়া দেওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু মেসেজটা পড়ে মনটা বড় দ্রব হয় অনন্তবিষ্ণুর। কষ্ট হয় বিদিতার জন্য। শুভজয় কি অত্যাচার করে বিদিতার ওপর? প্রবল মানসিক চাপে বিদিতার মস্তিষ্ক বা মনের কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি তো?

প্রতিকারহীন অপরাধ আর সমাধানহীন সমস্যার জঙ্গলে নিজেকে বড় একা মনে হয় অনন্তবিষ্ণুর। সে বুঝেছিল, যদি শুভজয় টের পায় বিদিতার এই গোপন দিকটি, তা হলে মেয়েটার বেঁচে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। অনন্তবিষ্ণু যত দিন এ শহরে আছে, বিদিতা নিরাপদ নয়। তখনই অনন্তবিষ্ণুর মনে হয়েছিল, যদি নিজেকে চিরতরে বিদিতার চোখেরও বার, মনেরও বার করে দিতে পারে, মেয়েটা হয়তো বেঁচে যাবে। তখন কি আর অনন্তবিষ্ণু বুঝতে পেরেছিল যে, অনন্তবিষ্ণুর দীর্ঘ দিন নিরুত্তর থাকাকে অবজ্ঞা হিসেবে ধরে নিয়ে বিদিতা একদিন চরম সিদ্ধান্তের পথে

হাঁটবে?

ক্ষণেকের তরে ভুল

২০২২ এর অগস্ট। ‘অ্যাডোবল্ড’ কোম্পানির ডেটা অপারেটিংয়ে যে নতুন মেয়েটাকে নেওয়া হয়েছে, তাকে যে উপায়ন চোখে-চোখে রাখে, সে কথা আগে বলা হয়েছে। মাসছয়কে মেয়েটা বেশ সেট করে গেছে তার কাজকর্মে। উপায়ন লক্ষ করে দেখেছে, মেয়েটি বড়ই নির্বাক। ঠিক সময়ের পাঁচ-দশ মিনিট আগেই অফিসে ঢোকে। আবার ছুটির আগে থেকে তৈরি হয়ে বসে থাকে না। বরং বেরোতে তার মিনিট দশেক দেরিই হয়ে যায়। সকলের সঙ্গেই সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলে। কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে ব্যালকনিতে গিয়ে চা খাওয়া, বা সেই সময়ে কোলিগদের সঙ্গে গল্প করে দশ মিনিট সময় বেশি নেওয়া— এ সব মেয়েটার মধ্যে নেই। লাঞ্চ আওয়ারে ক্যান্টিনেও যায় না সে। সিটে বসেই টিফিন বক্স খুলে খায়। তার পর খানিকক্ষণ মোবাইলে চোখ বুলিয়ে ফের কাজে ঢুকে পড়ে।

তার আগে মাসদুয়েক ডেটা অপারেটরের পদে কেউ ছিল না। রোজকার কাজের পাশাপাশি সেই ব্যাকলগও ক্লিয়ার করে মেয়েটি। আজ লাঞ্চ আওয়ারের শুরুতে, ডেটা অপারেটিং দফতরে হানা দিল উপায়ন। তখন মেয়েটি সবে তার টিফিনবক্স খুলেছে এবং আশপাশে আর কেউ নেই।

“আসতে পারি?”

দরজায় উপায়নকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে টিফিনবক্স রেখে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটি। বলে, “প্লিজ, আসুন স্যার।”

উপায়ন ভারী অপ্রস্তুত ভাবে বলে, “আপনি সবে খাওয়া শুরু করতে যাচ্ছিলেন। বাধা দিলাম। আপনি লাঞ্চ করে নিন বরং, আমি পরে আসব।”

মেয়েটি বলে, “না স্যার। কোনও অসুবিধে নেই। আপনি বলুন কী বলবেন। একটু পরে লাঞ্চ করলে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।”

উপায়ন এসে একটা চেয়ারে বসে। বলে, “নাথিং ফর্মাল অর নেসেসারি। আপনি জয়েন করেছেন মাসখানেক হয়ে গেল, আপনার সঙ্গে আলাপ করা হয়নি। তাই আসা। আপনার নামটা কী যেন, ও ইয়েস মনে পড়েছে, হৈমন্তী। রাইট?”

“হ্যাঁ স্যার।”

“তা, ইফ ইউ ডেন্ট মাইন্ড, আপনি খেতে খেতে কথা বলতে পারেন, কী এনেছেন আজ?”

খুবই ইতস্তত করে হৈমন্তী জানায়, সে রুটি আর কুমড়োর তরকারি এনেছে।

“বাঃ! একদিন আপনার কুমড়োর তরকারি খাওয়ার ইচ্ছে রইল...” বলে উপায়ন।

হৈমন্তী অবাক হয়ে বলে, “একদিন কেন স্যার, আপনি আজই...” বলে টিফিনবক্স খুলে বাড়িয়ে ধরে উপায়নের দিকে। ভারী সুন্দর একটা গন্ধ পায় উপায়ন। সুন্দর কমলা রঙের কুমড়া, হলদে হলদে আলুর টুকরোর সঙ্গে মাঝে মাঝে ছোট ছোট ফুলের মতো ফুটে আছে খয়েরি রঙের ছোলাসেদ্ধ। তার খেতে ইচ্ছে করলেও স্বেচ্ছাচ হয়। মেয়েটির খাবারে ভাগ বাসানো কি উচিত হবে?

সে বলে, “এ ভাবে খাওয়াটা কি ঠিক হবে?”

হৈমন্তী নির্বিকার মুখে বলে, “হবে স্যার। নির্দিধায় থান।”

সকলেই জানে উপায়ন এ ভাবেই সকলের সঙ্গে মেশে। কারও সঙ্গে দূরত্ব রাখে না। আবার কাজের সময় সে একশো ভাগ পেশাদার। তখন সে অন্য মানুষ। দরকারে নিজেও রাতদিন অফিসে পড়ে থেকে সবার সঙ্গে কাজে হাত লাগায়। এই ধরনের ব্যক্তিত্বের জন্যই উপায়নকে সকলে পছন্দই করে। উপায়নের মতো বস খুব কমই হয়। তার মত হল, মালিক হল জলপ্রবাহের মতো, কোম্পানির যেখান দিয়ে সে বইবে না, সেখানেই শ্যাওলা জমবে।

একটুকরো রটি ছিঁড়ে কুমড়া নিয়ে মুখে দেয় উপায়ন। খুব ভাল লাগে তার। বলে, “অপূর্ব! মা টিফিন করে দেন নিশ্চয়ই?”

হেমন্তী বলে, “না স্যর! আমিই।”

“আপনি? সকালে উঠে টিফিন করে নিয়ে আসেন?”

হেমন্তী সামান্য হাসে, তার পর বলে, “স্যর, আমার টিফিন, বাকিদের জলখাবার, দুপুরের ভাত, তার সঙ্গে ডাল কিংবা একটা তরকারি সবটাই আমি সকালে উঠে করে আসি। তার পর টুকটাক কিছু দরকার হলে মা করে নেন। আসলে মা-কে বেশির ভাগ সময় বাবার কাছে থাকতে হয়।”

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে উপায়ন।

হেমন্তী বুঝতে পারে উপায়নের প্রশ্ন, সে বলে, “আমার বাবার গত বছরে সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়। বাঁ দিকটা পড়ে গেছে। মা সারা দিন বাবাকেই দেখেন। রান্নার কাজকর্ম যথাসম্ভব আমিই করে আসি। রান্দির বাড়ি ফিরে আবার রান্দির খাবার করি। কলেজে থাকতেই আমি মোটামুটি সব রান্না শিখে নিয়েছি। তখন মাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করতাম।”

এর পর আস্তে আস্তে হেমন্তীর কম্পিউটার সায়েন্সে গ্রাজুয়েট হওয়া, তার পাশাপাশি ফিনানশিয়াল অ্যাকাউন্টিংয়ের কোর্স করার কথা মনে দিয়ে শোনে উপায়ন। শুনে অবাক হয় যে, বাবার আর্থিক সঙ্গতি খুব জোরদার ছিল না বলে ক্লাস টুয়েন্ড থেকে ছোট বাচ্চাদের পড়িয়ে নিজের পড়াশোনার খরচ নিজেই জোগাড় করে নিয়েছে হেমন্তী। উচ্চশিক্ষার ইচ্ছে থাকলেও সে নিজের চেষ্টায় গ্রাজুয়েশনের পাশাপাশি চাকরির কোর্স করেছে। কারণ, তার মাথায় ছিল দ্রুত সংসারের হাল ধরতে হবে।

হেমন্তীর সব কাহিনি শুনে আশ্চর্য এক সপ্তম তৈরি হল উপায়নের মধ্যে। কথায় কথায় যে কখন চল্লিশ মিনিট কেটে গেছে, লাঞ্চ আওয়ার শেষ হয়ে একে একে স্টাফরা ফিরে আসতে শুরু করেছে, খেয়ালই ছিল না উপায়নের। খেয়াল হতেই কেমন একটু লজ্জা বোধ হল। কিন্তু কেনই-বা তা হবে! উপায়ন তো মাঝে মাঝেই নানা দফতরে হাজির হয়ে সময় কাটায়। অফিসে তো সকলেই জানে, নতুন মালিকের সব জায়গায় তীক্ষ্ণ নজর। কাজের অকাজের গল্পে সকলের নাড়ি-নক্ষত্র নিজের নখদর্পণে রাখে। তবু কেমন যেন একটা লাগছিল উপায়নের।

একটা বেফাঁস প্রশ্নও করে ফেলল সে হেমন্তীকে, “আচ্ছা, এখন না হয় আপনি সংসারের হাল ধরছেন। কিন্তু আপনার বিয়ের পর, মানে ইফ ইউ ডেন্ট মাইন্ড...”

প্রশ্নটা করে নিজেরই কেমন একটা অস্বস্তি হল উপায়নের। এত কথা জেনে তার কী হবে?

হেমন্তী হাসে, “সে চিন্তা নেই স্যর।”

আরও অবাক হয় উপায়ন, বলে, “মানে?”

উজ্জ্বল মুখে হাসে হেমন্তী, বলে, “মানে, ফ্র্যাঙ্কলি বলছি স্যর, আমার বিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার বাবার নেই। বাবার চিকিৎসা এবং ওষুধপত্রে গত বছরে মায়ের সব গয়না চলে গেছে। আমি এই চাকরিটা না পেলে শুধু টিউশনি করে কত দিন চলত কে জানে! আর স্যর, আমি চাকরি করে যা পাচ্ছি, সংসার চালাচ্ছি। বাবার জন্য ফিজিয়োথেরাপিস্ট রেখেছি। খুব যে উন্নতি হচ্ছে তা নয়, তবু চেষ্টা চলছে। এর পর আর আমার নিজের জন্য আলাদা করে কিছু সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। বিয়ের অপশনটাকে আমি বাদ দিয়েই রেখেছি। যদি ডিসট্যান্ট এডুকেশনের সুযোগ পাই মাস্টার্স করার কথা ভাবব।”

উপায়ন আর হাসে না। তার ভুরু কুঁচকে গেছে। সে বলে, “আপনার কোনও রিলেশন টিলেশন?”

“সময় পাইনি স্যর। নিজে কবে উপার্জন করতে পারব— এটাই বরাবর আমার পাখির চোখ ছিল।”

মনটা ভারী হয় উপায়নের। বেশ মিষ্টি মুখের একটা মেয়ে, বাঁ দিকে গজদাঁত বলে হাসলে আরও মিষ্টি দেখায়, সবার সঙ্গে সুন্দর করে ভদ্র ভাবে কথা বলে, সেই মেয়েটা এরকম একটা গুরুগম্ভীর পরিস্থিতিতে বৈঁচে আছে। অথচ কারও প্রতি কোনও অভিযোগ নেই।

উপায়নের হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাওয়া লক্ষ করে হেমন্তী বলে, “আপনার মনখারাপ করে দিলাম স্যর? তবে এটা জানবেন, আমার চেয়েও কঠিন

পরিস্থিতিতে অনেকে বৈঁচে আছে। আমি অনেকের চেয়ে ভাল আছি, এটা ভেবেই আমি জোর পাই।”

আশ্চর্য মেয়ে! সামান্য হাসে উপায়ন, তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, “অনেকটা সময় নিয়ে নিলাম আপনার। প্লিজ, খেয়ে নিন। আবার কখনও কথা হবে।”

হেমন্তীও সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে উপায়নকে বিদায় দেয়। তার পর টিফিন বস্তু খুলে ধীরে ধীরে খাবারের সদগতি করে। মন দিতে পারে না। কারণ, অফিসের ডেটাবেসে একটা সমস্যা তার চোখে পড়েছে। সমস্যাটা খুব সহজ নয়। হয়তো খুব শিগগিরই তাকে আবার উপায়ন স্যরের মুখোমুখি হতে হবে।

খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। তার ফিনানশিয়াল অ্যাকাউন্টিংয়ের নলেজ আছে বলে নানা রকম ট্রানজ্যাকশন তাকে চেক করতে দেওয়া হয়েছিল। এবং সেখানে প্রায় বাষট্টি লক্ষ টাকার একটা গরমিল ধরে ফেলে সে। ডেটা অপারেটিংয়ের হেড অনিমেসবাবুকে সে সমস্ত ব্যাপারটা জানায়। সৌভাগ্যক্রমে অনিমেসবাবু ভাল মানুষ। তিনি হেমন্তীর ক্রেডিট আদ্বাসাং করার চেষ্টা করলেন না। সমস্ত ডেটাইটে প্রিন্টআউট এবং হেমন্তীকে নিয়ে সরাসরি উপায়নের কেবিনে নক করলেন।

উপায়ন সবটা মন দিয়ে শুনল এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে বলে কথা দিল। তবে ওরা যখন উপায়নের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে, তখন উপায়ন খুব গম্ভীর গলায় তাদের ফের ডেকে চেয়ারে বসাল। বলল, “একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখবেন অনিমেসবাবু। ভুলটা যে হেমন্তী ধরেছে, সে কথা আপনি আর হেমন্তী জানেন। আর আমি জানলাম। আর কাকে বলেছেন?”

দৃঢ় ভাবে দু’দিকে মাথা নেড়েছিলেন অনিমেসবাবু। এই বিশ বছরেরও বেশি এই সংস্থায় আছেন। কোম্পানির পলিসি জানেন। তিনি কাউকে কিছুই জানাননি।

উপায়ন বলেছিল, “খুব ভাল। আমরা তিন জন জানি, আর আমার বাবা জানবেন। তার বাইরে কেউ যেন এ খবর টের না পায়। মনে রাখবেন আপনার।”

অনিমেসবাবু আর হেমন্তী সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে এলেন।

পরবর্তী সপ্তাহ সকলেরই ভয়ে ভয়ে কাটল। বেশ কিছু মিটিং হল অনেক উঁচু লেভেলে। খবরের টুকটাক লিকেজও যে হল না, তা নয়। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের দু’একটি মেয়ে আছে, যারা হেমন্তীর চেয়ে বয়সে একটু বড়ই হবে, তাদের সঙ্গে হেমন্তীর টুকটাক কথাবার্তা হয়। তারা এসে ফিসফিস করে জানিয়ে গেল, কোম্পানিতে নাকি বিরাট অ্যামাউন্টের টাকার নয়ছয় ধরা পড়েছে। প্রায় নাকি দেড় কোটি টাকা। এর জন্য নাকি জনাদেশকে শোকজ করা হয়েছে। ছ’জনের চাকরি যাওয়া একেবারে পাকা। হেমন্তী অপার বিশ্ময়ে সব শুনল, তার পর ঠোঁট উল্টে বলল, “কিছু শুনতে পাইনি তো! এই প্রথম জানলাম তোমাদের কাছ থেকে।”

হেমন্তী টাকার অ্যামাউন্টে জলের পরিমাণ হিসেব করলেই শোকজ এবং টার্মিনেশনের আসল পরিমাণ আন্দাজ করতে পারত। তবে সে ব্যাপারে আর তার কোনও কৌতূহল নেই। তার কাজটুকু সে করে দিয়েছে, ব্যস।

তবে ঘটনার দিন পনেরো পর একবার উপায়নের কেবিনে হেমন্তীর ডাক পড়েছিল। তার হাতে একটি খাম ধরিয়ে দিয়েছিল উপায়ন। অবাক হয়ে তাকিয়েছিল হেমন্তী।

উপায়ন বলেছিল, “খুলে দেখুন।”

খুলে দেখে চমকে গিয়েছিল হেমন্তী। তার নামে একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক।

উপায়ন বলেছিল, “কোম্পানি আপনার কাজে খুশি হয়ে আপনাকে একটা ইনসেন্টিভ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। জয়েন করার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই এরকম পারফরম্যান্স খুব কমই দেখা যায়। সেটাকেই কোম্পানি এনকারেজ করেছে। কারও কাছে কিছু ডিসক্লোজ করবেন না। আপনার

ডিপার্টমেন্টাল বসের কাছেও নয়। বেস্ট অফ লাক!”

হৈমন্তী বলেছিল, “কিন্তু এটা তো আমার কাজের মধ্যেই পড়ে স্যর, তার জন্য আলাদা করে...”

হাত তুলে ওকে থামিয়েছিল উপায়ন। বলেছিল, “কোম্পানি কিছু দিচ্ছে যখন, প্রয়োজন আছে বলেই দিচ্ছে। নিয়ে নিন। মন দিয়ে কাজ করুন।”

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে “মেনি থ্যাঙ্কস, স্যর,” বলেছিল হৈমন্তী।

বেরোতে যেতেই থামিয়েছিল উপায়ন, “দাঁড়ান। ওরকম এনভেলপ হাতে করে বেরোবেন নাকি! এই ফাইলের মধ্যে করে নিয়ে যান। তার পর সুবিধেমতো নিজের ব্যাগে ভরবেন। আর এর পর থেকে কেউ তার চেয়ারে ডাকলে হাতে করে একটা খাতা বা ডায়েরি আর পেন আনবেন। খালি হাতে আসবেন না। আমি তো কিছু ইমপট্যান্ট নোট দেওয়ার জন্যও ডাকতে পারতাম, তাই না?”

হৈমন্তী বুঝতে পারে উপায়নের কথা। সে মাথা নিচু করে বলে, “বুঝতে পেরেছি। সরি স্যর। ভবিষ্যতে খেয়াল রাখব।”

তার পর ফাইলে এনভেলপটা পুরে দড়ি বেঁধে নিজের সিটে ফিরে আসে। আসতে আসতে তার মনে হয়, উপায়ন খুব আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ। যখন সে অন্যের দফতরে বসে কাজকর্ম বা সুখ-দুঃখের খবর নেয়, তখন সে যেন আর পাঁচ জন কোলিগেরই একজন। কিন্তু নিজের ঘরের চেয়ারে সে মালিক, সেখানে সে একটাও বাড়তি কথা বলতে বা শুনতে রাজি নয়। এ যেন আরব্য রজনীর সেই রাজা যে, ছদ্মবেশে গুপ্তচরের মতো সারা রাত রাজ্যের সকলের সুখস্বাস্থ্যের খবর নেয়, আর দিনের বেলা সিংহাসনে বসে রাজ্যশাসন করে।

উপায়নের কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হেসে ফেলে হৈমন্তী।

ভীমভাবার্ঘ্য তারণহেতু

ভ্রমরা সেনকে মনে আছে নিশ্চয়ই? সেই কনকবাবুর প্রাক্তন প্রেমিকা? তিনি পেশায় জ্যোতিষী। নিজের চেষ্টার আছে। পসার মন্দ নয়। আসলে এই সব ধর্মগুরু, বাবাজি, মাতাজি কিংবা জ্যোতিষী বা ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা যদি রূপবান বা রূপবতী হন, তা হলে পসার জমতে দেরি হয় না। ভ্রমরা সেন যে খুবই রূপসী, সে কথা আগে বলা হয়েছে। তার ওপর তাঁর ভিজিট বেশ চড়া, অর্থাৎ সস্ত্রম উদ্বেককারী। ফলে সব মিলিয়ে ভ্রমরা সেনের প্র্যাকটিস জমজমাট।

ভ্রমরা সেনের ঠাকুরদাদা তারামোহন সেন ছিলেন শোভাবাজার আহিরীটোলা অঞ্চলের বিখ্যাত কবিরাজ এবং জ্যোতিষী। ঠাকুরদার কাছে ছোটবেলা থেকেই কিছু কিছু শিখেছিলেন ভ্রমরা, কিন্তু সিরিয়াস ছিলেন না। ভ্রমরার ঠাকুরদাদা যখন মারা যান, তখন ভ্রমরার বারো বছর বয়স। তিনি গণনা করে নাতনিকে বলে গিয়েছিলেন, “দিদিভাই, তোমার প্রথম প্রেম থাকবে না। প্রথম বিয়েও টিকবে না। যত যা-ই করো। কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ে, যদি হয়, টিকে যাবে।”

ভ্রমরা মনে মনে এক রকম জানতেনই। সে সময় কষ্ট হয়েছিল বটে, তবু মনে হয়েছিল, যাকগে... ফাঁড়া তো কেটে গেল, এবার আর কোনও সমস্যা নেই। কলকাতায় ফিরে তাঁর মনে পড়েছিল পাড়ায় দেখা কনককান্তির কথা। কনককান্তি শ্যামবাজারের ছেলে হলেও, শোভাবাজারে তাঁর কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল। তাঁদের সঙ্গে খেলতে যেতেন। ভ্রমরাকে দেখার জন্যই কিছুটা বেশি বেশি যেতেন। ভ্রমরার পঞ্জাবে বিয়ে হয়ে যেতে কনককান্তির শোভাবাজারে যাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গেছিল। ডিভোর্সের পর কলকাতায় ফিরে এসে পাড়ায় খোঁজখবর নিয়ে তিনি পান্ডা লাগিয়েছিলেন কনককান্তির। মেয়েরা যে ছেলের চোখে লোলুপতা দেখে, তাদের ভুলে যায়। কিন্তু কারও চোখে পুজোর উপচার সাজানো আছে দেখলে, তাকে আমৃত্যু মনে রাখে। কনককান্তির চোখের তারায় দেখা বিমুগ্ধতা বড় বেশি করে মনে পড়ছিল ভ্রমরার।

ভ্রমরা ধরেই নিয়েছিলেন, কনককান্তির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবেই। কিন্তু

কনককান্তি তো এ সব জানতেন না। তিনি তত দিনে বিবাহিত। শুধু বিবাহিত নন, একটি দু'বছরের শিশুপুত্রের বাবা। সে সব দেখে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল ভ্রমরার। ধরে পড়েছিলেন, কনককান্তিকে তাঁর স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে হবে, দিয়ে ভ্রমরাকে বিয়ে করতে হবে। কনককান্তি বারবার বুঝিয়ে ব্যাপারটাকে সমে এনেছেন। ভবী ভোলেনি, তবে পাগলামির তীব্রতা কিছুটা কমেছে। ওঁরা মাঝে মাঝে দেখাও করেন। যতবারই দেখা করেন, কনককান্তির ডান হাতটা টেনে নিয়ে গভীর মনোযোগে কী যেন দেখেন ভ্রমরা। আর মনে মনে হিসেব করেন। কনকবাবুর জন্মের সময় এবং স্থান-তারিখ ওঁর মুখস্থ। মোবাইলে হিসেব করেন আর বলেন, “কানুরায়, তোমার লগ্ন মিথুন। দ্বিতীয়পতি চন্দ্র এবং দ্বাদশপতি শুক্র তৃতীয়ে, সিংহরাশিতে। তৃতীয়ের সপ্তম, মানে নবমে কুন্ড রাশিহিত বৃহস্পতির দৃষ্টি এসে পড়েছে দ্বিতীয়পতি-দ্বাদশপতি সংযোগে। চন্দ্র-বৃহস্পতি জীবযোগও তৈরি হচ্ছে। তোমার দ্বিতীয় বিবাহ দারুণ সাকসেসফুল কানুরায়... তুমি একবার আমার কথা শুনে ডিভোর্সটা করো। আমাকে বিয়ে করো... আমার কথা না মিললে, আমি জ্যোতিষ ছেড়ে দেব কানুরায়...”

আগে কনকবাবু বোঝাতেন। সান্ত্বনা দিতেন। এখন শুধুই হাসেন। ভ্রমরা মাঝে মাঝে একটু সঙ্গী তো চায়। সেটুকু দিলে বোধ হয় বিবাহিতা স্ত্রীকে ঠকানো হয় না। সমস্যা হল, এখনও আশা ছাড়েনি ভ্রমরা। কনকবাবুর বয়স এখন চল্লিশ। ভ্রমরা সাঁইত্রিশ। নতুন করে শুরু করার পক্ষে এমন কী বেশি বয়স তাঁদের? মাঝে মাঝে ভ্রমরাকে নিয়ে মনটা বড্ড উচাটন আর অশান্ত হয় কনকবাবুর। মনে হয়, করবেন ডিভোর্স? কনকবাবুর স্ত্রী নরমসরম মৃদু বাধ্য মানুষ নন। ঝগড়া অশান্তি লাগে। কোনও কোনও ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় কঠোর করতে চেষ্টা করে, সমস্যা করেন ভদ্রমহিলা। মাঝে মাঝে কনকবাবুর মতো শান্ত মানুষও ধৈর্য না রাখতে পেরে চটেচিয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর ছেলেরটার তো কোনও দোষ নেই! তার কী হবে? মাত্র বারো বছর বয়স থেকেই তার আর বাবা-মাকে একসঙ্গে পাওয়া হবে না? ছেলেরটার কথা মনে পড়তেই মনে পড়ে, কনকবাবুর স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে খুবই সতর্ক। ছেলের পড়াশোনা, খাওয়াদাওয়া খেলাধুলো সবতে তীক্ষ্ণ নজর। তা ছাড়াও সাংসারিক পারিবারিক কর্তব্যকর্ম পালনে ভদ্রমহিলার বিশেষ খামতিও নেই। তা হলে?

মনের মধ্যে যখন এই দড়ি-টানাটানির খেলা চলে, তখন কনকবাবুর কালীমন্দিরে প্রণামের সময়টাও বেড়ে যায়। এবং সেই সেই সময়ে মা কনকবাবুর সঙ্গে কথা বলেন। এটা বেশি লোকে জানে না।

আজও তাই হয়েছে।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর। হাওয়ার পুজোর গন্ধ। মা আসছেন। এরকম সময়ে মনটা খুব ভাল থাকে কনকবাবুর। শ্যামবাজার কালীবাড়িতে আজ মা-কে ফুলের মুকুট পরানো হয়েছে। লাল আর সোনালি জরির নকশা দেওয়া একটা শাড়ি পরেছেন মা। উজ্জ্বল আয়ত নয়ন, প্রসন্ন সহাস্য মুখমণ্ডল। দেখলে কান্না পায়। কনককান্তি মনে মনে বলেন, “তোমার চোখেমুখে এত আনন্দ কী করে মা? আমি তো কোথাও কোনও আনন্দ দেখতে পাই না! চার দিকে টেনশন, অভাব, কষ্ট, বিক্ষোভ, অভিযোগ। সব কিছু ছেড়ে তোমার কাছে চলে গেলে কেমন হয় মা? সারা দিন তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে থাকব?”

কনককান্তির স্পষ্ট মনে হয়, মা বলছেন, “সেটা তো এসকেপিঞ্জম হয়ে যাবে। সমুদ্রের ঢেউয়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে এগোনোর পরই তো ডেইহীন শান্ত অঞ্চলটায় পৌঁছোবি। না হলে তার মর্ম বুঝবি কী করে? তুই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এসি মেশিন কিনে ঘরে লাগিয়েছিস, যে লোকটা তুন্দ্রা অঞ্চলে থাকে, সে কি এর মর্ম বুঝবে?”

আগে এমন কথা শুনে বিস্মিত হয়েছেন কনককান্তি। মায়ের ভাষাটা যেন কেমন! মা ইংরেজি শব্দ জানেন! মায়ের কথায় এত ইংরেজি শব্দ!

মাথার ভেতরে উত্তর পেয়েছেন, “আমি যে তোর মা। তুই যা জানিস, আমিও তা জানি। তুই যেমন ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবি, আমিও তেমন ভাবেই তোর সঙ্গে কথা বলব। ওরে বোকা, আমি কি বাইরের কেউ! আমি তো তোর মধ্যেই আছি। তোর জ্ঞান হয়ে, মন হয়ে, মেধা হয়ে, বোধ হয়ে।”

‘কিন্তু মা, তুমি সামনে না থাকলে তো এরকম মনে হয় না!’ জিজ্ঞেস করেছেন কনককান্তি।

‘মনে করে দেখিস, ঠিক হবে। যখনই আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবি, আমার উত্তর পাবি। তোর বলে আদৌ কিছু আছে কি? প্রশ্নও যেমন আমি, উত্তরও তো আমিই। স্কোয়াশ খেলার মতো। সামনে দেওয়ালটা না থাকলে প্রশ্নের বল উত্তর হয়ে ফিরবে কী করে?’

সমস্যার কথায় আসেন কনককান্তি, ‘আমি যে বড্ড দোঁটানায় পড়েছি মা, তুমি তো সব জানো...’

‘জানি তো... কিন্তু আসলে কি এটা দোঁটানা? তুই কি নিজে জানিস না কী করতে হবে? যা অনিশ্চিত, তার পিছু ধাওয়া করে, নিশ্চিত বস্তু ত্যাগ করা কি ভাল? তোর আত্মজ যে পক্ষে বিদ্যমান, সেই পক্ষই কি একমাত্র গ্রহণীয় নয়? তোর মনে হতে পারে, ভালবাসার জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়। কিন্তু তার পর? সেই তো সংসার, দাম্পত্য, অপত্য। সুখ শান্তি আনন্দ, আবার তার উল্টো পিঠে দুঃখ অশান্তি কষ্ট। একই তো ব্যাপার। যা দূরে আছে, তা সব সময়ই বেশি সুন্দর। ফুলে বসা প্রজাপতির মতো। হাতের মুঠোয় চেপে ধরতে গেলেই সব শেষ। তুই তো সংসারী। তোর প্রেম আর এক জন বোহেমিয়ানের প্রেম এক রকম হবে কী করে?’

কনকবাবুর মনটা খানিক শান্ত হয়। বলেন, ‘কিন্তু ভ্রমরাকে ফেরাব কী করে মা?’

‘তুই কাউকে ডেকেছিস, যে ফেরাবি? যা হওয়ার তাই হয়েছে। যা হওয়ার তাই হবেও। তোর হাতে কিছু নেই। তুই শুধু নিজের খুঁটি ধরে থাক। ভেসে যাস না। মায়া বড় কল্যাণময়ী, আবার অনিষ্টকারীও। তোর স্ত্রী শব্দ হাতে তাকে সামলে রাখেন। তোর মতো কোমল ধাতের পুরুষের এমন স্ত্রীই প্রয়োজন। কোথাও কোনও অসুবিধে তো নেই।’

তবুও মন পুরোপুরি শান্ত হয় না কনকবাবুর, তিনি বলেন, ‘আমার যে কিছু ভাল লাগে না মা।’

‘কেন ভাল লাগে না, ভেবে দেখেছিস?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কনককান্তি বলেন, ‘না। আমার সে সব ভাবতেও ভাল লাগে না মা।’

‘নিজেকে ভেঙে নে। একটা অংশ সংসারের দায়িত্ব পালন করবে, আর একটা অংশ সারা দিন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবে। আনন্দ পাবে আর মায়ে-পোয়ে বকবক করবে। তার পর রাত্রিবেলা দু’জন তুই একে অপরের সঙ্গে দেখা করবি। সারা দিনের সংসারের ঝড়ঝাপটা টানাপড়েনে বিধ্বস্ত যে তুই, তাকে সাহুনা দেবে সারা দিন আনন্দে থাকা তুই। যে নিজেকে ভেঙে ফেলতে পারে, তাকে আর অন্য কোনও কিছু ভাঙতে পারে না। সবটাই সারভাইভাল স্ট্র্যাটেজি। আমি তো অবলম্বনমাত্র। বিশ্বাস। ঈশ্বরকে মহাসমুদ্রে হাল হিসেবে বিশ্বাস করবি, ম্যাজিশিয়ান কিংবা মিরাকল মেকার হিসেবে নয়। প্রকৃতি অনেক সূক্ষ্ম যোগবিরোগে ভবিতব্য নির্মাণ করে। তাকে অদলবদল করলে বহু ভারসাম্য নড়ে যাবে। কারও কান্নাকাটি জেদ কিংবা খামখেয়ালিতে তা বদলায় না।’

কথাটা কনককান্তির ভাল লাগে না। তিনি প্রশ্ন করেন, ‘কিন্তু মা, তোমার অদেয় তো কিছুই নেই।’

‘তোর অপ্রাপ্য অথবা অর্জনের অসাধ্যও তো কিছু নেই। তা হলে ভিক্ষে চাইতে হবে কেন? বাইরের আমি নয়, ভেতরের আমার কাছে চাইতে হবে। সে তোমাকে অর্জন করিয়ে নেবে। হাল ছাড়লে চলবে না। প্রকৃতিতে যে সংগ্রাম তোর জন্য প্রোগ্রাম করা আছে, তাকে তো তার মধ্য দিয়ে গিয়ে দেখতে হবে যে, তার পর কী আছে! তা না হলে কী করে হবে?’

চটকা ভাঙে কনকবাবুর। মা কি সত্যিই এত কথা বলছেন তাঁর সঙ্গে? নাকি... কনকবাবু জিজ্ঞেস করেন, ‘সব কথা কি তুমিই বললে মা গো? নাকি পুরোটা আমার অবচেতন?’

‘তুই আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে দেখতে পাস না? তুই আয়নার বাইরে আছিস বলেই তো ভেতরেও আছিস। চৈতন্য যদি আমি হই, অবচেতন হতেই-বা বাধা কোথায়!’

অসহায়ের মতো কনকবাবু বলেন, ‘আমার যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে মা! তোমার কথাগুলো বড় গোলমালে!’

‘এত ভাবিস না। সব ছেড়ে দে। সবই তোর। যেখানেই থাক, তোর। শুধু আঁকড়াতে যাস না। তাতেই কষ্ট। যার সব আছে, তার কিছুই থাকে না। আমার কথাগুলো খুবই সহজ। তুই নিজের মাথায় গোলমাল পাকিয়ে ফেলছিস। আয়না ঝাপসা হলে প্রতিবিম্ব ঝাপসা লাগে, মুখ কখনও অস্পষ্ট হয় না।’

‘বোনটার বয়স ছাব্বিশ পেরিয়ে গেল মা। কাকা-কাকিমারও বয়স বাড়ছে। অনন্তবিষু বড় ভাল ছেলে, ওর সঙ্গে যদি...’

‘সময়ের হাতে ছেড়ে দে। এ বিষয়ে উদ্বেগ বা উদ্যোগ, কোনওটাই করার সময় এখনও আসেনি।’

‘আচ্ছা মা। আজ তা হলে আসি?’

‘আয়। সব ঠিক হয়ে যাবে।’

ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে হাঁটা দেন কনকবাবু। তাঁর মন এখন শান্ত। মা বলে দিয়েছেন, বোনের বিয়ের সময় এখনও আসেনি। কিন্তু অনন্তবিষু? তার মতো ছেলে কি পড়ে থাকবে? সব সময় যেন তাড়া। যেন কোথাও যেতে হবে। ছেলোটর সঙ্গে বোনের আলাপটা হয়ে থাকলে ভাল হত।

যাকগে, তিনি আর এত ভেবে কী করবেন। তার চেয়ে বরং ঢেকুর দাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। কনকবাবু নিজস্ব সোর্স খাটিয়ে জানতে পেরেছেন, ঢেকুর দাসই অনন্তবিষুকে থাকার জায়গা ঠিক করে দিয়েছে। নানা দরকারে অদরকারে ঢেকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনন্ত। সে কথা জানার পর তিনিই যোগাযোগ করেছেন ঢেকুরের সঙ্গে। ঢেকুর প্রথমে অবাক হয়েছিল, বলেছিল, ‘না স্যার, আমি বাড়ি জমি ফ্ল্যাটের খবরাখবর দিই। ইলেকট্রিক বিল দিই। প্যানকার্ড আধার কার্ডেরও ব্যবস্থা করি। ট্রেন আর প্লেনের রিজার্ভেশন বুকিংটুকিও করি। কিন্তু মানুষের খবরাখবর দিই না। আমি কি পুলিশের খোঁচড় নাকি!’

কনকবাবু বলেছিলেন, ‘আহা ঢেকুর, তুমি চটছ কেন! খোঁচড় কেন হবে, তুমি শুধু ছেলোটর ওপর একটু নজর রাখবে। বোনের জন্য ছেলোটাকে আমি দেগে রেখেছি, বুঝলে না... ভাল ছেলে, কখন পটাত করে অন্যে বাগিয়ে নেয়, কিংবা ছেলে কলকাতার বাইরে চাকরিবাকরি পেয়ে ফুঁতুত হয়ে যায়, তখন আমি কি বুড়ো আঙুল চুষব, বলো তো ঢেকুর! তা ছাড়া, তোমাকে তো ওর ডে টু ডে রিপোর্ট দিতে হচ্ছে না। শুধু নজর রেখো, পাখি উড়ে না যায়।’

ঢেকুর গৌঁজ হয়ে বলেছিল, ‘পাখি যদি কোনও দিন আমাকে না জানিয়ে উড়ে যায়? তখন?’

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কনকবাবু বলেছিলেন, ‘এ কথাও আমাকে শুনতে হল ঢেকুর? তোমার মতো চারচৌকো হুঁশিয়ার একটা লোক থাকতে পাখি চুপচাপ উড়ে যাবে, এও কি সম্ভব? কলিযুগ কি তা হলে পূর্ণ হয়ে গেল? যাকগে যাক, তুমি আর কথা বাড়িয়ে না, এই নাও, সামনে পূজো, মিষ্টিটিষ্টি খেয়ো... মাসে মাসে খবর দিয়ে, আমিও তোমায় দিয়ে যাব... না বোলো না ঢেকুর। তুমি পারবে আমি জানি।’

কনকবাবুর দেওয়া পাঁচশো টাকার নোটটা পকেটে পুরে ফেলার পর আর ঢেকুর দাসের আপত্তি করার বিশেষ কিছু থাকে না। তার মনে এখন আনন্দের বুজকুড়ি উঠছে। এক কাজে ডবল পেমেন্ট। মাস খানেক আগেই। অনন্তবিষুর ওপর নজরদারি করতে আরও এক জায়গা থেকে বরাত পেয়েছে সে। তিনি বলেছেন, অনন্তবিষু নাকি ভাল সেজে থাকে, আসলে ওটা মুখোশ। মেয়েদের প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে মোটা টাকা আদায় করে। পুলিশের নজর আছে ওর ওপর। ঢেকুর সেখান থেকেও টাকা পেয়েছে। পাঁচশো।

সেখান থেকে টাকা নেওয়ার পর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘ম্যাডাম, কোনও ঝামেলায় পড়ব না তো?’

ম্যাডাম ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, ‘ঝামেলা কিসের! আমিই তো পুলিশে কাজ করি। লালবাজার, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট।’

এত কমবয়সি মেয়ে, পুলিশে কাজ করে! আজকাল কী যে সব হচ্ছে, অবাক হলেও প্রকাশ করেনি ঢেকুর। তবে সে ঘোড়েল লোক, বলেছিল, ‘নামটা যদি জানাতেন ম্যাডাম, বিপদে আপদে পড়লে...’

ম্যাডাম ফিসফিস করে বলেছিলেন, “আমার নাম পুষ্পিতা রায়। কাউকে বোলো না কিন্তু।”

সেই থেকে ঢেকুর দাস ডাবল এজেন্ট। তার কঠিন নজর এড়িয়ে অনন্তবিষ্ণু যাবে কোথায়!

উড্ডয়ন পর্ব: চতুর্থ ভাগ

আবার আমি। প্রস্থানের পথে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম অনন্তবিষ্ণু ঘোষ। আজ আমার আমার থিম সং-এ বাজছেন কিশোর কুমার— ‘চলেছি একা কোন অজানায়, খুঁজেছি তারে যে অচেনা...’। দিনটা, পাঠককে আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই, মোটেই সুবিধের নয়। বিবেকানন্দ রোডের মোড়ের জ্যামটা কোনও মতে পেরিয়ে কলেজ স্ট্রিটের কাছাকাছি এসে ফের সিগন্যাল। আর একটু এগোলেই ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি। এসেছি এক-আধবার। এক বার কলেজ স্ট্রিটে বই কিনে ফেরার সময় এখানেই দেখা হয়ে গেছিল কনকবাবুর সঙ্গে। নমস্কার করে বেরোচ্ছিলেন। মুখেচোখে অপার আনন্দ। দেখা হতেই বললেন, “আরে অনন্ত যো! এই অনেক দিন পরে মায়ের কাছে এসেছিলাম, বুঝলে না। বিদ্যাসাগর কলেজে যখন পড়তাম, রোজ লাস্ট পিরিয়ডটা থাকত অনাসের। পাঁচটা থেকে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। শেষ হলেই চলে আসতাম এখানে। সন্ধ্যারতি দেখতাম। সে যে কী অপূর্ব ব্যাপার, বুঝলে না...”

কলকাতায় জন্মে, কাটিয়ে দিলাম প্রায় তিরিশটা বছর। কত কথা, কত মুহূর্ত, কত পিছুটান জড়িয়ে-মড়িয়ে ছিলাম, এখন গুটি কেটে উড়ে যাওয়ার সময় বুঝতে পারছি। রেশমের যে-স্মৃতিজাল আমাকে বারবার ঘিরে ধরছে, তেমন কি রেশমকীটের বেলাতেও হয়? তেমনই কি হয়েছে বছর খানেক আগে লকডাউন কেটে বেরিয়ে আসার সময় আমাদের সবার ক্ষেত্রেই? ঘরের চেনা পরিচিত কোণ কি পিছু ডাকে? তারা কি বলে, সব কাজের জায়গায় ওয়ার্ক ফ্রম হোমই চলুক? বাড়ির লোকজন, তোমার অফিস থেকে পাওয়া বেতনে যাদের সংসার চলে, তারা তো তোমাকে পায় না! তাদের একটু সময় দাও! বাড়ি থেকেই কাজ করো না, ঠিক পারবে। স্ত্রী স্বামীকে পায় না, সন্তান বাবাকে পায় না, ভাই-বোন দাদাকে পায় না— জানে, বাড়ির লোকটা অফিসে না গেলে সংসার বসে যাবে। সংসার চলার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে একটা লোক বন্ধক রাখে তার সময়, সংসার মুখ বুজে ছেড়ে থাকতে বাধ্য হয় তাদেরই একজনকে। তার চেয়ে বাড়িতে বসে কাজ করলে ক্ষতি কী!

দীর্ঘ দিন পড়ানো বন্ধ ছিল আমার। লালবাতি অঞ্চলের যৌনকর্মীরা খরিদার পায়নি দীর্ঘ সময়। এক সময় খাবার না জোটার অবস্থা হয়েছিল। আমাদের এনজিওর তরফ থেকে আমরা নানা জায়গায় কমিউনিটি কিচেন করে কাজ চালিয়েছিলাম। সীমিত সামর্থ্যে খুব কিছু উপকার করে উঠতে পারিনি। তুণ্ড মুখের চেয়ে হাহাকারই বেশি দেখেছি, তবু কিছু তো হয়েছে। সেটুকুই সাঙ্ক্য।

দিন চলে যাবে। আমিও চলে যাচ্ছি। শুধু কথাগুলো পড়ে থাকবে।

যানজটের মধ্যে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা লাল সেডান। হঠাৎ দেখলে কুসুমিতার গাড়িটার কথা মনে হয়। ২০২২ সালের অগস্ট মাসের শেষ দিকে এক দিন সকালে হঠাৎ ফোন করে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল কুসুমিতা। অচেনা নাম্বার দেখে অবাক হয়েছিলাম। ফোন ধরতেই কুসুমিতা বিনা ভূমিকায় বলেছিল, “আজ একটু বেরোতে পারবে আমার সঙ্গে?”

কথার টোনে চিনতে পেরেছিলাম। ঠিক কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। ফোন নাম্বার পেল কোথা থেকে! আমার কাছে চায়নি তো! ওদের বাড়িতে চেক আনতে গেলে মাঝে কয়েকবার দেখা হয়েছে। নানা প্রশ্ন করেছে। কখনও কোথাও নিয়ে বেরিয়েছে। ফোন নাম্বার কিন্তু নেয়নি।

কুসুমিতাই বলল, “আমার একটু দরকার হওয়ায় অনিন্দ্যদাকে ফোন করে তোমার নাম্বার নিয়েছি। আজ ইউনিভার্সিটি ছুটি। আমার অন্য দরকারি কাজ আছে। তুমি সঙ্গে থাকলে ভাল হয়। অনিন্দ্যদা বলল, আজ সকালে তোমার অফিস না গেলেও চলবে। একেবারে বিকেলে পড়তে গেলেই হবে।”

বাং! সব খোঁজবর তো নেওয়া হয়েই গেছে। আমি জানি, কোথাওই আমার ইচ্ছের সে রকম কোনও দাম নেই। বললাম, “আচ্ছা ম্যাম। কখন আসতে হবে?”

“দশটায়। কখন বেরোবে বাড়ি থেকে?” জানতে চেয়েছিল কুসুমিতা।

“সওয়া নটা নাগাদ...” কথা শেষ করার আগেই ও প্রান্ত “ওকে...” বলে ফোন কেটে দেয়।

তার পর তৈরি হয়ে নটা কুড়ি নাগাদ আমি যখন বড় রাস্তায় এসে বাস স্টপের দিকে এগোচ্ছি, তখনই শোনা যায়, “এই যে, আমি এ দিকে।”

সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। বাসস্টপের খানিক দূরে ফুটপাথ ঘেঁষে লাল রঙের সেডান গাড়িটা দাঁড়িয়ে। গাড়িটার গায়ে সকালের রোদ পিছলে যাচ্ছে। তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুসুমিতা। ডেনিম, কুর্তি, সানগ্লাস। রাস্তার লোকজন চোখ সরাতে পারছিল না। আর আমি প্রায় ফুট দশেক দূর থেকেও হালকা বেলফুলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। দীর্ঘশ্বাস চেপে গাড়িটার দিকে এগিয়েছিলাম। তখনও আন্দাজ করতে পারিনি যে, সেদিন কুসুমিতা হয় এসপার নয়তো ওসপার মুড়ে ছিল।

আমি উঠে বসার পর গাড়ি চলতে শুরু করল। এক কথা সে কথার পরই হঠাৎ বলে বসেছিল, “আপনার ল্যান্ডলেডি মিসেস কর কিন্তু আপনাকে খুব ভালবাসেন। বিশ্বাস করেন। জানেন সে কথা?”

অনন্ত বলেছিল, “আন্দাজ করতে পারি। ওঁর তো আর কেউ নেই। অনেকটা আমারই মতো বলতে পারেন।”

সানগ্লাস খুলে দাঁতে ডাঁটি কামড়ে গভীর দৃষ্টিতে অনন্তর দিকে তাকিয়েছিল কুসুমিতা, “সত্যি? তোমার কেউ নেই?”

ম্লান হেসে অনন্ত বলে, “আমার ইতিবৃত্ত তো আগের দিনই সব আপনাকে জানালাম ম্যাম...”

“আর যত্ন করে ডার্লিং গোলাপির কথা চেপে গেলে, তাই না? তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে, এ কথা স্বীকার করতে ভয় কিসের? তোমার বাজারদর পড়ে যাবে?” নাকের পাটা ফুলে ওঠে কুসুমিতার।

অবাক হতেও ভুলে গেছিল অনন্ত। হাঁ করে তাকিয়ে ছিল কুসুমিতার দিকে। এ কী অদ্ভুত অভিযোগ কুসুমিতার! গোলাপি, আমার ছাত্রী, আমার ডার্লিং? তার কথা চেপে যাচ্ছি আমি? না হলে আমার বাজারদর পড়ে যাবে? বুঝতে পারিনি কী বলব। শুধু বলেছিলাম, “এ সব কী বলছেন ম্যাম... গোলাপি আমার কাছে পড়ে। তার বেশি কিছু...”

কুসুমিতা আমার কোনও কথা শুনতেই রাজি হল না। বলল, “শোনো ঘোষ, তোমাদের মতো ছেলেদের আমি খুব ভাল করে চিনি। আমাকে কিছু বোঝাতে এসো না। তুমি গোলাপিকে ভালবাস, গোলাপি তোমাকে ভালবাসে— আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু সেটা স্বীকার করার মতো সংসাহস তোমার নেই কেন?”

আমার মনটা বিদ্রোহ করে উঠল। আমাদের মতো ছেলে মানে কী? আমি কেন ওঁর এত প্রশ্নের উত্তর দেব? আমার সম্পর্ক নিয়ে এত কথা বলার অধিকার ওঁকে কে দিল? উনি আমাদের এনজিওর পৃষ্ঠপোষকের মেয়ে হলেই কি ওঁর আমাকে যেমন-তেনন ভাবে অপমান করার অধিকার জন্মায়?

তবু আমি কিছু বলি না। গলার কাছটা ব্যথা করে ওঠে। চোখ জ্বালা করে। আমি চূপ করে থাকি।

কুসুমিতা বলে চলে, “তোমার গল্প তো তুমি আগের দিন শুনিয়েছ। তারই-বা কতটা সত্যি! মা মারা গেলেন, বাবা হাত ধুয়ে ফেললেন, মামা পালন করলেন, মামি খুব একটা পান্ডা দিলেন না— মামির কথাটা অবশ্য তুমি বলোনি, কিন্তু মামি সম্বন্ধে তোমার নীরবতা বলে দেয় যে, মামি ওয়াজ নট সো অ্যাফেকশনেট অ্যাজ ইয়োর মামা— তার পর তুমি রোজগার করে মামাতো বোনদের ভালর জন্য নিজের মাথা গোঁজার জায়গা করে নিলে। কারও প্রতি রাগ নেই, অভিযোগ নেই, বিরক্তি নেই, চাহিদা নেই— এরকম মানুষ হয় নাকি! অ্যাবসার্ড! এ সব তোমার ভণ্ডামি! মানুষের সহানুভূতি কুড়োনের ছল! ট্র্যাজিক হিরো সাজার শখ! তাই না? চূপ করে আছ কেন? বলো?”

আমার শুধু মনে হয়েছিল, সামনের সিটে বসা ড্রাইভার গুপিদা কী

নির্বিকার! বড়লোকরা তাদের ড্রাইভারদের গাড়িরই একটা নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক অংশ বলে ভেবে নেয়। আর বড়লোকদের এই ভাবনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে যারা যত নিরাবেগ এবং রোবটিক ভাবে গাড়ি চালাতে পারে, তারা তত ভাল ড্রাইভার। এরকম মানুষজনই আমার আদর্শ— যাদের মন প্রাণ ভাবনা বোধ বিবেক আছে বলে কেউ ভাববে না— আমি তেমনই হতে চাই।

আমি বুঝতে পারছিলাম, কুসুমিতা ঠিক নিজের বশে নেই। না হলে অযথা একজন মানুষকে ডেকে এনে এরকম করে অপমান করা যায় না। আমার বলার অনেক কিছু থাকতে পারত। কিন্তু আমি কিছু বললাম না। তাতে আরও রেগে গেল কুসুমিতা। আমার ডান হাতের জামা ধরে সজোরে টেনে বলল, “চুপ করে থাকলে পার পাবে ভেবেছ? স্পিক আউট!”

তখনও আমার গলার কাছে ব্যথা, চোখে জ্বালা, গলার আওয়াজ নিজের বশে নেই। সেই অবস্থাতেই যথাসম্ভব ঠান্ডা গলায় বললাম, “আপনি শান্ত হোন ম্যাম। আপনার মাথা ঘামানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ আমার বায়োডেটায় কিছুই নেই। নিজেকে এত কষ্ট দেবেন না।”

আমার ডান হাতের জামা আলগা হয়ে গেল। গাড়ি চলছে। আমি পাথরের মতো সোজা তাকিয়ে আছি সামনের দিকে। ডান দিক থেকে মাঝে মাঝেই নাক টানার আওয়াজ আসছে। কুসুমিতা কি কাঁদছে? কেন কাঁদছে? বুঝতে পারলাম না।

খানিক পরে নির্দেশ গেল ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে, “গুপিদা, সকালে যেখান থেকে এই বাবুকে তোলা হয়েছিল, সেখানে ফিরবা।”

বুঝলাম, আজকের মতো কুসুমিতার বেড়ানো শেষ। শুধু বুঝলাম না, গুঁর কাজটা কী ছিল। সারা দিন তো গাড়ির ঠান্ডায় বসে ঘোরা হল। যত দূর আমি চিনি, সোনারপুর ছাড়িয়ে চলে গেছিল গাড়িটা। সেখান থেকে ব্যাক করার হুকুম হল। এখন দুপুর তিনটে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক, আমার পড়ানোটা মাঠে মারা গেল না। যদিও শোভাবাজারে নামতে পারলে ভাল হত, তবু নিজের সুবিধে-অসুবিধের কথা আর আমার বলতে ইচ্ছে করছে না। যেখানে নামাক নেমে যাব। নামালেই বাঁচি।

বাকি রাস্তাটা আর কেউ কোনও কথা বলিনি।

আমার নামানোর জায়গাটা আসামাত্র গাড়ি থামে। আমি গাড়ির লকে হাত দিই। হুকুম আসে, “দাঁড়াও।”

লক থেকে হাত সরিয়ে নিই।

প্রশ্ন আসে, “সকালে বাড়ি থেকে কী খেয়ে বেরিয়েছিলে?”

বলি, “ব্রেকফাস্ট।”

স্বর তীব্র হয়, “বি স্পেসিফিক।”

উত্তর দিতে ভাল লাগে না। তবু বলি, “জ্যাম-টোস্ট।” উত্তর দিই আর মনে হয়, আমি এ রকমই অপদার্থ। সেই কারণেই তো সকলে যা খুশি তাই করে। সেই কারণেই তো পলায়ন। সেই কারণেই তো সব কিছু নতুন করে শুরু করার উদ্যোগ।

“আর আমি যে সারা দিন না খেয়ে আছি, তার কী হবে?” ডান দিক থেকে প্রশ্ন আসে।

আমার বহু দিন আগে শোনা পরেশ রাওয়ালের একটা ডায়লগ মনে আসে। নিজেকে ইঙ্গিত করে ভগবানকে মনে মনে বলি, “উঠা লে রে বাবা, উঠা লে...”

কোনও মতে বলি, “কিছু খেয়ে নিন তা হলে।”

“আমি একা খাব না। আমার সৌজন্যবোধ তোমার মতো নয়...”

চুপ করে থাকি। এখন কি আবার কোথাও খেতে যেতে হবে নাকি! ঘড়ি দেখতে ইচ্ছে হলেও দেখলাম না, বাঁকা কথা শুনতে ভাল লাগছে না।

আড়চোখে দেখলাম, কাপড়ের একটা বোলা থেকে স্টিলের টিফিন কৌটো বের করছে কুসুমিতা। ভাবলাম, এ আবার কী ঘটনা ঘটতে চলেছে কে জানে!

টিফিন কৌটো খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল কুসুমিতা, “আজ

বাড়িতে লুচি হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম...”

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফেলি। লুচি নিয়ে আবার ভাবার কী আছে! খেলেই তো ঝামেলা শেষ! কুসুমিতাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। কাজল ধেবড়ে গেছে। চোখ দুটো ছলছলে।

“ভেবেছিলাম, তুমি লুচি খেতে ভালবাস। বাস কি না? সত্যি বলবে...” পুলিশি জেরার মতো প্রশ্নের ধরন।

মিথ্যে বলার তো কোনও কারণ নেই। বললাম, “বাসি।”

প্রতিবাদ বলসে ওঠে, “বাসি নয়, আজকের লুচি। আমি বাসি খাবার খাই না। কাউকে খাওয়াইও না। তুমি লুচি ভালবাস কি না বলো?”

ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, “ভালবাসি, ম্যাম।”

কুসুমিতা টিফিন কৌটো থেকে দুটো লুচি আর তরকারি হাতে তুলে নেয়। তার পর টিফিন কৌটোটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, “বাকিটা তোমার। নিয়ে যাও।”

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কী করব বুঝতে পারি না।

“কী হল, নেবে না?” প্রশ্ন ভেসে আসে।

আমি নিই। মনের ভেতরে কেউ বলে ওঠে, ‘গরু মেরে জুতো দান।’ তবু ফিরিয়ে দিতে পারি না।

সোজা চোখে আমার দিকে চেয়ে কুসুমিতা গভীর গলায় বলেছিল, “ভালবাস বললে তো। তা হলে অস্বস্তি কিসের?”

লক্ষ্মণের ফলের মতো কুসুমিতার টিফিন কৌটো নিয়ে নিরুত্তর বসে থাকি। কী বলব বুঝতে পারি না।

“আবার যে দিন ডাকব, আসবে তো?” জিজ্ঞেস করেছিল কুসুমিতা। আবার ডাকবে! আবার আসতে হবে আমায়! আবার কথা শুনতে হবে অত শত?

“কী অত ভাবছ! আমি না হয় একটু পাগল, তা বলে তুমি ভালবাসবে না?”

আমার গলা শুকিয়ে যায়। টিফিন কৌটো ফেলে ছুটে পালাব? ‘বাঁচাও বাঁচাও’ বলে চৌচালে কেমন হয়?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অস্থির হয় কুসুমিতা, “আরে বাবা, তুমি তো নিজেই বললে ভালবাস, মানে লুচি ভালবাস... আমি যা-ই করি না কেন, লুচির তো দোষ নেই। ওগুলো খেয়ো।”

আমি লুচির কৌটো নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম সে দিন। আমার মাথা ভেঁা ভেঁা করে উঠেছিল। তখনই মনে হয়েছিল যঃ পলায়তি, সঃ জীবতি। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ট্যাকা নিয়ে পালানোর প্রতিশ্রুতি দিতে হবে কাউকে, সেটা তখনও বুঝতে পারিনি। এখানে ‘ট্যাকা’ ব্যাপারটা একটা ট্রিগারিং ফোর্স। যে-পালানোর ব্যাপারে আমি নানা আশু-পিছু দৌটানায় ভুগছিলাম, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অনেক সহজ করে দিল ‘ট্যাকা’। কারণ, পালাব এই শর্তেই অর্থপ্রাপ্তি, কাজেই না পালালে যে অনর্থ হবে, সে কথা বুঝে নিতে আমার দেরি হল না।

আর সুতো কাটার জন্য মায়া করলে হবে না। গুটি বোনার দিন শেষ। এবার গুটি কেটে রেশম মথ উড়বে আকাশে। আবার নতুন তুঁতগাছ। নতুন লালান্ধরণ। নতুন করে সূত্র নিঃসরণ। কিন্তু হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনও থানে।

তবে যাওয়ার আগে, ফের আসছি উড্ডয়ন পর্বের অবশেষ ভাগ নিয়ে। সঙ্গে থাকবেন প্লিজ!

আঁধার হল মাদার গাছের তলা

গোলাপি আর তার মা কি শুধু শুধু এত বড় একটা বিপদে পড়ল? উঁহু! তাদের যথেষ্ট দোষও ছিল। বিধবা মহিলা আর তার সোমন্ত মেয়ে নিজেদের মতো করে থাকবে, কারও কাছে একটুও মাথা নোয়াবে না, এত দেমাকই-বা কিসের! সেখানে বড় ভাণ্ডার, যিনি কিনা সম্পর্কে গুরুজন, বাগে পেলোও ছেড়ে দেবেন? সে কি সম্ভব!

সমস্যা ছোটখাটো নয়, গভীর এবং জটিল। গোলাপিদের বাড়িটা তো ছোট নয়। বেশ কাঠা তিনেক জায়গা নিয়ে তৈরি আগেকার দিনের বড়

বাড়ি। খুপরি খুপরি চব্বিশটা ঘর এবং তাতে মোট বারোটি পরিবার। প্রত্যেকের ভাগে দু'টি করে ঘর বরাদ্দ। সে বাড়ি যদি হঠাৎ প্রোমোটিং হয়, তা হলে তো একটু টালমাটাল পরিস্থিতি হবেই। প্রোমোটারের নাম সুজনচন্দ্র ভড়। ক্ষমতাসীন শাসকের খুবই ঘনিষ্ঠ। ফলে স্থানীয় ছলিগান সব তারই চামচে। গোলাপির চার জ্যাঠা মিলে পুরো বাড়ি প্রোমোটারের হাতে তুলে দেবে ঠিক করেছে। তারা দু'বছর ভাড়াবাড়িতে থাকবে। বিল্ডিং উঠে গেলে বারোটা ফ্যামিলি বারোটা ফ্ল্যাট পাবে। সোজা হিসেব। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। গোলাপির কেউ কিছু জানায়নি। নন্দ, জা এদের মুখে কানাঘুষো শুনেছে।

একটি পরিবার হিসেবে গোলাপির মা যখন সব একটা ফ্ল্যাট পাওয়ার আশা করছেন, তাঁর হাতে এল উচ্ছেদের নোটিস। সে সব পড়ে ভাল করে সবটা বুঝতেও পারেনি গোলাপি কিংবা গোলাপির মা। তাঁকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। পাঠিয়েছেন গোলাপির বড়জ্যাঠা। তাঁর সঙ্গে দেখা করেন গোলাপির মা।

বড়জ্যাঠা মুখ বিকৃত করে বলেছিল, “তোমাকে আর কী বলব বৌমা! তুমি হলে স্বনির্ভর মানুষ। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারবে। তেমন হলে বোবো, খালধারে টালির চালের ঘরের ব্যবস্থা না হয় আমিই দেখে দেব। সামনেই পুজো। এর মধ্যে আর চলে যেতে বলব না। পুজোর পরই না হয় মানে মানে...”

গোলাপির মা বলেছিলেন, “কিন্তু আমরা ফ্ল্যাট পাব না কেন? তার বদলে আমাদের উচ্ছেদের নোটিস দেওয়া হল কেন?”

বিরক্ত মুখে বড়জ্যাঠা বলেছেন, “আঃ! এত কেন কেন কোরো না তো! তোমার বর আমার কাছ থেকে বছর দশেক আগে দু'লাখ টাকা ধার নিয়েছিল। আমি এমনি এমনি কাউকে টাকা ধার দিই না। কাগজপত্রে সই করিয়ে ধার দিয়েছিলাম। তোমার বর ভাল করে কাগজপত্র না পড়েই সই করে টাকা নিল। তাতে লেখা ছিল, ও আমার কাছে ওর ঘর দুটো বন্ধক রেখে টাকাটা নিচ্ছে। টাকাটা ফেরত না পেলে আমি ওর ঘর দুটো নিয়ে নেব। তা সেই কারণেই ঘর দুটো আমার। তোমরা ঘর ছেড়ে দেবে। আর আমি ওই ঘর দুটোর বদলে আর একটা ফ্ল্যাট পাব। দু'লাখ টাকার এতদিনকার সুদ বলেও তো একটা কথা হয়, না কি! আমার দয়ার শরীর, এত দিন কিছু বলিনি। কিন্তু এখন তো প্রোমোটিংয়ের ব্যাপার। দ্বিতীয় ফ্ল্যাটটা বেচে টাকা না নিলে শেষ বয়সে খাব কী! বন্ধকীর কাগজের কপি তোমার বরকে নিতে বলেছিলাম নেয়নি। আমাজের সলিসিটার বাঁকা ভৌমিকের কাছে কপি আছে, দেখে নিতে পারো। আমার পাকা কাজ।”

মনে আছে গোলাপির মায়ের। বছর দশেক আগে তাঁরই বাবা মারা গেছেন ক্যানসারে। মানুষটাও বাঁচেননি, খরচও হয়েছে জলের মতো। কয়েকটা ইঞ্জেকশন দিয়ে ডাক্তারবাবু শেষ চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন। বিদেশি ইঞ্জেকশন। টাকা জোগাড় করে এনেছিলেন গোলাপির বাবা। কী ভাবে করেছিলেন, কখনও কাউকে বলার সুযোগ পাননি গোলাপির বাবা। সেটা এখন জানা গেল। গোলাপির মায়ের বাবা সব চেষ্টাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছেন, গোলাপির বাবা চেষ্টা করার সুযোগও দেননি। কিন্তু এখন কী কর্তব্য?

বিপদে পড়লেও বুদ্ধি হারালেন না গোলাপির মা। তিনি আর কিছু না বুঝে, এটুকু বুঝতে পারছেন যে, খালধারে টালির চালের ঘর মানে বস্তি, সেখানে মেয়েকে নিয়ে উঠতে হলে তাঁর সর্বস্ব যাবে। যা যাবে, তার হিসেব টাকাপয়সায় হয় না। তিনি বড় ভাসুরকে জিজ্ঞেস করলেন, “আমি যদি এখন আপনাকে দু'লাখ টাকা ফেরত দিয়ে দিতে পারি?”

কথাটায় আরও অশুশি হলেন বড়জ্যাঠা, বললেন, “দু'লাখ তো দশ বছর আগে ছিল। বছরে শতকরা দশ টাকা সুদ দেওয়ার কথা ছিল। সব লেখাপড়া করা আছে। তা সে বাবদে তো এক পয়সাও ঠেকায়নি তোমার বর। দশ বছরের সুদ হয় পুরো দু'লাখ। সুদে-আসলে, দুয়ে দুয়ে চার লাখ টাকা আমাকে দিয়ে ঘর ছাড়াতে পারো তো দ্যাখো। সে চেষ্টা তো তুমি করবেই! মাস্তর দু'লাখ টাকা দিয়ে আমি একটা বাড়তি ফ্ল্যাটের টাকা পাব, সে তোমাদের সইবে কেন বলো! বুড়ো মানুষটার পাকা ধানে মই না দিলে, মা-মেয়ের মুখে চালের অন্ন রুচবে কেন! তবে এই এক কথা,

হাতেপায়ে ধরে কান্নাকাটি করলেও কিন্তু আমি চার লাখ থেকে এক নয়া পয়সাও কম নেব না।”

সব শুনে সেদিন চলে এসেছিলেন গোলাপির মা। তখন গোলাপি বাড়ি ছিল না। পড়তে গেছিল। পড়ে ফিরলে গোলাপিকে আইনি নোটিস দেখিয়ে সব কথা খুলে বলেছিলেন। ঠিক হয়েছিল, পরের দিন গোলাপি স্কুলে যাবে না। তাঁরা দু'জনে আশুবাবুর কাছে যাবেন, তাঁর পরামর্শ নিতে।

সবটা শুনে আকাশ থেকে পড়েছিল গোলাপি। আর কিছু না থাক, এত দিন মাথার ওপর ছাদ ছিল। এখন সেটাও সরে যাওয়ার উপক্রম! ওদের বাড়ি এক জন কাজের লোক আসত। বহু দিন কাজ করেছিল। বয়স হয়ে যাওয়ায় আর পারত না। কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। তবু মাঝে মাঝে বিকেলের দিকটায় এসে সুখ-দুঃখের কথা বলে যেত। সে-ই একবার কথায় কথায় বলেছিল, “দেখো বাপু, গরিব মানুষের পেটের ভাতের চেয়ে মাথার ছাদ বেশি প্রয়োজন। এ কথা একবারে লাখ কতার এক কতা!” সে কথা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে গোলাপি। সে ভয়ে ভয়ে তার মাকে বলে, “কী করবে মা এবার? কোথায় যাব আমরা?”

চোয়াল শক্ত করে সে কথাই ভাবছিলেন গোলাপির মা। মুখে বললেন, “দেখি, আশুবাবু কী বলেন।”

প্রথমে তারা গিয়েছিল গোলাপির পিতৃবন্ধু আশুতোষ সেনের কাছে। আশুবাবু গম্ভীর মানুষ। সবটা শুনে মনে করতে পারলেন। বললেন, “ও যে ওর দাদার থেকে ধার নিয়েছিল, সে কথা আমাকে বলেছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কী কাগজে সই করে টাকা নিয়েছিল। বলেছিল, ভাল করে পড়িনি। বলেছিল, ‘আমার থেকে আর কী-ই বা নেবে দুটো ঘর ছাড়া। ওই দুটোই মর্টগেজ রেখেছে হয়তো। তা রাখুকগে। মায়ের পেটের দাদা, টাকা না পেলে তো আর রাস্তায় বের করে দেবে না। সময়সুযোগ করে সুদটা দিয়ে যাব বাস।’ কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি, এটার কথা আপনারা জানেন না দেখে। অবশ্য অনেক কিছুই সুযোগ হয়ে ওঠেনি ওর... বেচারি এত আচমকা...” কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে চশমা খুলে দু'চোখের কোণ চেপে ধরলেন আশুবাবু। একটু ক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন, “তা হলে, কী করবেন ঠিক করলেন?”

গোলাপির মা বললেন, “দেখুন দাদা, আমি যা বুঝছি, করণীয় মাত্র দুটো। সুদে-আসলে চার লাখ টাকা ফেরত দেওয়া, না হলে বস্তিতে গিয়ে ওঠা। আমি জানতে এসেছি এ ছাড়া কোনও রাস্তা বের করা যায় কি না।”

খানিক ভেবে দু'দিকে মাথা নাড়লেন আশুবাবু, বললেন, “উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। সে মামলা করার বুদ্ধি দেবে। মামলা চললে উকিলের পকেট ভরবে, আবার আপনি আর-একটু সময়ও পাবেন। কিন্তু শেষমেশ লাভ কিছু হবে না। তার চেয়ে লাখচারেক টাকা দিয়ে দিতে পারলে, প্রোমোটিংয়ের পর আপনি একটা ফ্ল্যাট পেয়ে যাবেন। সেটা সব দিক থেকেই লাভজনক।”

গোলাপির মা বলেন, “অতগুলো টাকা তো খুবই সমস্যার কথা দাদা। তা ছাড়া, ফ্ল্যাটবাড়ি উঠতে তো দু'বছর সময় লাগবে। তত দিন থাকব কোথায়?”

আশুবাবু বললেন, “আমার চেনা লেডিজ হস্টেল আছে। আমি যথাসম্ভব কম টাকায় আপনাদের দু'জনের সিট বুক করে দেব। সেটা আপনাদের একটু ম্যানেজ করে নিতে হবে। এখান থেকে বেশি দূরে নয়, কাছেই। পারবেন না?”

একটু ইতস্তত করে গোলাপির মা বলেন, “সেটা হয়তো হয়ে যাবে। কিন্তু চার লাখ টাকা...”

আশুবাবু এবার সরাসরি বলেন, “আপনার নিজস্ব কিছু জমানো নেই?”

গোলাপির মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, “আছে দাদা। নুন-ভাত, শাক-ভাত খেয়ে সামান্য কিছু করে পোস্টাপিসে ফেলতাম। মনে করেছিলাম, যদি পোড়ারমুখীটার বিয়ে দিতে পারি কোনও দিন... কিন্তু সে তো খুব বেশি নয়। সাকুল্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো হবে। আমার রোজগারই-

বা কতটুকু। তিন বাড়ির রান্না আর সেলাই-ফাঁড়াইটুকুই তো ভরসা।”
আশুবাবু ভুরু কঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তার পর একটু বিষণ্ণ গলায় বললেন, “কোনও রকমে একটা পার্সোনাল লোনের ব্যবস্থা যে হয় না তা নয়। কিন্তু শোধ করবেন কী করে? মেস ভাড়া প্লাস লোন শোধ এক সঙ্গে চললে, গোলাপির পড়াশোনা তো ছেড়েই দিন, আপনাদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে।”

কিছুক্ষণ দু’পক্ষই নীরব। তার পর আশুবাবু বলেন, “আমাকে দুটো দিন সময় দিন। আমি একটু ভেবে দেখি। এর মধ্যে যদি আপনার বড় ভাণ্ডার কিছু বলেন, তখন টাকার কথা বলবেন না। বলবেন, ঘর দুটো ছেড়ে দেবেন। কিন্তু একটু সময় চাই। ভাল কথায় যতটা পারেন সময় আদায় করুন। কিছু সুরাহা হলে আমি জানাব।”

মা-মেয়ে চলে এসেছিল আশুবাবুর বাড়ি থেকে।

আকাশ আর মেঘের রং জানিয়েছিল, পুজো প্রায় কড়া নাড়ছে। গোলাপি ভাবছিল, তার পুজোয় একটা নতুন জামা হয় প্রতিবার। একটাই। সেটা সে পরে অষ্টমীর অঞ্জলি দেয়। তার পর বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরোয়। প্রথমে সোজা কলেজ স্কোয়ার, তার পর বিবেকানন্দ রোড, হাতিবাগান দেখে সন্ধ্যার মুখে বাড়ি ফেরা। এবার কি সে পুজোয় আনন্দ করতে পারবে? পুজোর পরই যে কোথায় থাকবে, তার নেই ঠিক, সে কী করে পুজোয় আনন্দ করবে! চোখ ভেঙে জল আসে গোলাপির।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অনন্তবিষ্ণু মানে বিষ্টস্যারের কাছে একটা পঁচিশ নম্বরের পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল গোলাপির। কিন্তু গোলাপি পড়তে আসে না। খুব অবাক হয় অনন্তবিষ্ণু। মেয়েটা পরীক্ষা দেবে না বলে কামাই করল। মনে মনে খারাপও লেগেছিল তার। তা হলে যে ওর এত দিন ধরে মনে হয়েছিল, মেয়েটা সিরিয়াসলি চেষ্টা করছে, সেটা কি ভুল? আবার মনে হয়েছিল, হঠাৎ শরীর-টারির খারাপ হল কি না কে জানে!

সে দিন আবার অনন্তর অভদ্রীপকে কথা দেওয়া ছিল যে, ওর সঙ্গে গোলাপির আলাপ করিয়ে দেবে। এই সিদ্ধান্ত নিতে অনেকটা সময় নিয়েছে অনন্ত। বারবার দেখা করতে বলেছে অভদ্রীপকে এবং তাকে জানিয়েছে গোলাপি ও তার পরিবার সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য। মন দিয়ে লক্ষ করেছে অভ্রর চোখে-মুখে বিরক্তি বা আপত্তি ফুটে ওঠে কি না। বারবার অভদ্রীপকে বলেছে সময় নিয়ে ভাবতে। অভদ্রীপও তাড়াহুড়ো করেনি। শেষ অবধি অনন্তর যখন মনে হয়েছে অভদ্রীপের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে গোলাপির কোনও ক্ষতি হবে না, তখনই সে ঠিক করেছে, এবার দু’জনের আলাপ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। অভদ্রীপের পরিচয় হবে, সে বিষ্টস্যারের পুরনো ছাত্র। অভদ্রীপ ছুটির সময়ে দূরে অপেক্ষা করবে। অনন্ত ইশারা করলে আসবে। সব প্ল্যান ভেঙল হয়ে গেল।

পড়ানো শেষ করে বাইরে বেরিয়ে অনন্তবিষ্ণু দেখল, গলির মুখে ল্যাম্পপোস্টের নীচটায় আশুবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। এলাকার সম্মাননীয় মানুষ। তাদের এনজিও-কে বহু কাজে বহু হেল্প করেছেন। তাঁর কথাতেই গোলাপিকে পড়ায় অনন্ত। এমন অসময়ে আশুবাবুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অনন্ত এগিয়ে গেল। সে কাছে যেতেই আশুবাবু বললেন, “তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি বিষ্ট। একটা খবর দেওয়ার আছে।”

অনন্ত বলে, “বলুন কাহু।”

আশুবাবু বলেন, “গোলাপি হয়তো আর পড়তে আসবে না। আমার কথায় তুমি টিউশনিটা করতে, তাই তোমাকে আমি নিজেই জানিয়ে দিলাম।”

অবাক হল অনন্ত, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করল না। শুধু বলল, “ঠিক আছে কাহু।”

আশুবাবু নিজে থেকেই ফের বললেন, “মেয়েটা খুব ব্রাইট ছিল। লেখাপড়া চালিয়ে গেলে ঠিক নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু কী আর করবে বলো, কপাল!”

অনন্ত সপ্রাণ চোখে চেয়ে থাকে। কী এমন সমস্যা হতে পারে? কোনও ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেলে? নাকি ওর মা জোর করে বিয়ে দিয়ে

দিল? কিন্তু তা হলে আর পড়াশোনার কী দরকার ছিল! নিশ্চয়ই অন্য সমস্যা। সে বলে, “কোনও সমস্যা হয়েছে কি কাহু? আমাকে দিয়ে কি কোনও সাহায্য হতে পারে?”

আশুবাবু খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখেন অনন্তর মুখের দিকে। তাঁর মনে হয়, একে সমস্যার কথা বলা যেতে পারে। উপকারী মানসিকতার ইয়াং ছেলে, যদি কোনও সুলুকসন্ধান বের করতে পারে! না বের করতে পারুক, নতুন করে কোনও ক্ষতি অন্তত হবে না।

সুন্দর এসে ফিরে যায়

২০২২ সালের পুজোটা তেমন উল্লেখযোগ্য হল না কারও। পুজো এল, চলেও গেল। কিন্তু গোলাপির সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। বরং তার বড়জ্যাঠা এবার ঠারেঠোরে তাড়া দেওয়া শুরু করলেন।

লক্ষ্মীপুজোর পরদিনের কথা। সে দিন রাত প্রায় এগারোটার সময় উপায়ন দত্তর মোবাইল বেজে ওঠে। উপায়ন এই সময় সরোদ শোনে। শুনতে শুনতে সারা দিনের একটা হিসেব কষে, পরের দিন কী কী করবে তার একটা আউটলাইন করে নেয়। পুরোটাই মনে মনে। এই সময় তাকে কেউ খুব একটা ফোন করে না।

মোবাইলটা তুলে দেখল স্ক্রিনে কুসুমিতার নাম। ফোনটা ধরল উপায়ন।

“কী রে! এনি প্রবলেম!”

“না। ঠিক প্রবলেম নয়। তবে আই থিঙ্ক আই অ্যাম ইন লাভ। তোকে যে-ছেলেটার কথা বলেছিলাম, বলেছিলাম আমি যাকে এন্ট্রপোলজ করবই, পারিনি রে। ছেলেটা সত্যিই খুব ভাল। একটুও লোভ নেই। শুধু নিজের কাজটুকু নিয়ে থাকে। ওর ল্যান্ডলেডিং, ছাত্রী, পাড়ার লোক সকলে ওকে ভালবাসে। আমিও ওকে ভালবেসে ফেলেছি। আমাকে ‘ম্যাম’ বলে, জানিস! আপনি করে কথা বলে। ভয় পায়। আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি শুনলে যে কী ভাবে রিঅ্যাক্ট করবে!”

উপায়ন হাসে, বলে, “কী ব্যাপার! একটা মেয়ের কাছে অন্য কোনও মেয়ের প্রশংসা করতে নেই বলে জানতাম। একটা ছেলের কাছে অন্য একটা ছেলের প্রশংসা করার ব্যাপারে সেরকম কিছু বারণ নেই বুঝি! আমার তো জেলাসি হচ্ছে।”

কুসুমিতাও হাসে, “ইয়ার্কি মারিস না। কিন্তু মুশকিলও আছে। ছেলেটা সে রকম কিছু করে না। তাতে আমার প্রবলেম নেই। কিন্তু আমার বাড়িতে যদি প্রবলেম হয়! আমি ছেলেটাকে যত দূর বুঝতে পেরেছি, একটুও সমস্যা বা অনাদর টের পেলে, সেখান থেকেই বহু দূরে সরে যাবে। কী করি বল তো?”

উপায়ন বলে, “ম্যানেজ করতে হবে এনিহাউ। তাড়াহুড়ো করিস না। ধীরেসুস্থে এগোতে হবে। আর ছেলেটাকে খুব ভাল করে অবজার্ভ কর। বেশি ভাল কিন্তু ভাল নয়। একটু-আধটু খারাপ হলে বরং চিন্তা ছিল না।”

শ্বাস ফেলে কুসুমিতা, “কথাটা আমার মাথায়ও অনেকবার এসেছে। ঠিক আছে। সময় নেব। আরও ভাল করে খোঁজখবর চলবে। দেখা যাক কী হয়।”

কথাবার্তা আর এগোল না। তবু খানিকটা অন্যমনস্কতা আর অস্বস্তি তৈরি হল উপায়নের। মনটা খচখচ করছে কেন? কুসুমিতাকে ‘আপনি আক্সে’ করা, ‘ম্যাম’ বলে সম্বোধন করা কিংবা ভয় পাওয়া— সবটাই খুব উঁচুদের অভিনয় নয় তো!

কুসুমিতা তার বন্ধু। তার চেয়েও যে জিনিসটাকে উপায়ন বেশি গুরুত্ব দেয়, তা হল সে অ্যাডোবন্ড কোম্পানির ভবিষ্যৎ লিগাল প্রসিকিউটর। কোনও কোম্পানির আইনি দায়ভার ছুট করে অন্য কারও হাতে দিয়ে দেওয়া যায় না। কুসুমিতা কোনও গোলমালে পড়েছে কি না, সেটা দেখার দায়িত্ব সে এড়াতে পারে না। খুব মন দিয়ে ইতিকর্তব্য ভাবতে বসল উপায়ন। ভাবতে ভাবতে রাত সাড়ে বারোটো বাজল। এত রাত অবধি সাধারণত জাগে না সে।

শুভে যাওয়ার আগে একটা হোয়াটসঅ্যাপ করল কুসুমিতাকে। অনন্তবিশ্ব নামে ছেলেটির ফোন নাম্বার আর ঠিকানা দরকার। কুসুমিতা হয়তো জেগে নেই। কাল সকালে উঠে রিপ্লাই দেবে। কিন্তু অনন্তবিশ্বকে অবাক করে দিয়ে মিনিটখানেকের মধ্যেই রিপ্লাই এল। কুসুমিতা ফোন নাম্বার আর ঠিকানা পাঠিয়েছে।

এত রাত অবধি জেগে কী করছে কুসুমিতা? প্রেমে পড়লে কি সত্যিই ঘুম চলে যায়?

ও দিকে অভদ্রীপ তো অপেক্ষা করতে করতে সঙ্গে থেকে রাত হয়ে গেল, গোলাপি আর এল না। দূর থেকে সে দেখতে পেল, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে আর সি নন্দী লেনের মুখটায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন বিদ্যুস্যার। প্রৌঢ় মানুষটির মুখ গভীর, বিদ্যুস্যারেরও কপালে ভাঁজ।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক খানিকক্ষণ কথা বলে চলে যাওয়ার পর মিনিট খানেক অপেক্ষা করে বিদ্যুদার কাছে পৌঁছোল। জিজ্ঞেস করল, “কী ব্যাপার গো বিদ্যুদা? গোলাপি এল না তো?”

অনন্তবিশ্বের ভুরু সোজা হয়নি। সে বলে, “ও সম্ভবত আর পড়তে আসবে না। ওর লোকাল গার্ডিয়ান আশুবাবু সে কথাই জানিয়ে গেলেন।”

আকাশ থেকে পড়ে অভদ্রীপ, জিজ্ঞেস করে, “সে কী! লেখাপড়া ছেড়ে দেবে কেন?”

“লেখাপড়ার চেয়েও বড় সমস্যা যদি সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন লেখাপড়া গুরুত্ব হারায় বই কি,” গভীর হয়ে বলে অনন্তবিশ্ব।

ধৈর্য রাখতে পারে না অভদ্রীপ। সে আজ সুন্দর একটা আকাশি রঙের টি-শার্ট আর জিনস পরে, দাড়ি ট্রিম করে, চুলে সামান্য জেল দিয়ে এসেছিল গোলাপির সঙ্গে দেখা করবে বলে, সব গোলমাল হয়ে যাওয়াতে তার মুখচোখ আমসি হয়ে গেল। সে উদ্বিগ্ন স্বরে বলে, “এই বিদ্যুদা, তুমি কী সব বলছ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, একটু খোলসা করে বলবে প্লিজ?”

অনন্তবিশ্ব বলে, “তোমাকে বলেছিলাম না, গোলাপির অনেক যুদ্ধ আছে, অনেক প্রতিকূলতা আছে। গোলাপিকে ভালবাসা খুব সোজা নয় কিন্তু। খুব সংক্ষেপে বলতে পারি, আপাতত চার লক্ষ টাকা জোগাড় না হলে গোলাপি আর তার মাকে নিজেদের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। গোলাপির মা’র জমানো টাকার পরিমাণ মাত্র পঞ্চাশ হাজার।”

এবার চুপ করে যায় অভদ্রীপও। খানিকক্ষণ ভাবনাচিন্তা করে সে বলে, “আমি একটা লোনের জন্য ব্যাঙ্কে অ্যাপ্লাই করে দেব?”

অনন্তবিশ্ব দু’দিকে মাথা নাড়ে, বলে, “তোমাদের ভালবাসাটা যদি দু’তরফ থেকেই শুরু হয়ে গিয়ে থাকত, সেক্ষেত্রে তোমাকে বারণ করতাম না। কিন্তু গোলাপি তো তোমাকে চেনে না। এমন অবস্থায় আর্থিক সাহায্য দিয়ে কোনও ভালবাসার সম্পর্ক শুরু হবে, সেটা উচিত নয়। গোলাপি মন খুলে তোমার প্রতি ওর স্বাভাবিক ফিলিং জানাতে পারবে না। একটা কৃতজ্ঞতাবোধ ওর মনকে প্রভাবিত করবে।”

চুপ করে যায় অভদ্রীপ, বলে, “এটা ভেবে দেখিনি।”

অনন্তবিশ্ব বলে, “শোনো অভদ্রীপ, তাড়াহুড়োর সময় এটা নয়। কয়েকটা দিন সময় আমরা পাব। আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারে চার লাখ টাকার সংস্থান রাতারাতি হয় না। আমাদের একটু ভাবনাচিন্তা করতে দাও। ব্যবস্থা কিছু বেরোয় কি না দেখি। তুমি বরং আজ বাড়ি চলে যাও।”

অভদ্রীপ বলে, “আমি গোলাপিকে ভালবাসি। তার বিপদে পাশে থাকতে চাই। কিন্তু তুমি যে ভাবে বলবে, তার বাইরে কিছু করব না। কী হল, না হল, আমাকে জানিয়ো প্লিজ। আমি খুব চিন্তায় থাকব বিদ্যুদা।”

অনন্তবিশ্ব অভদ্রীপের পিঠ চাপড়ে বলে, “নিশ্চয়ই। তোমাকে জানাব। তোমার ফোন নাম্বার তো সে দিনই নিয়ে নিয়েছি। তোমার কাছেও আমার নাম্বার আছে। যোগাযোগ থাকবে। চিন্তা করো না।”

দু’জনে নীরবে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত হেঁটে আসে। তার পর দু’জন দু’দিকে চলে যায়।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয় অনন্তর। ঘুম থেকে উঠে মোবাইলে আননোন নাম্বার থেকে একটা মিসড কল দেখতে পায় ও। তবে সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কারও প্রয়োজন থাকলে আবার করবে। কাল অনেক রাত অবধি সে ভেবেছে। নানা সম্ভাবনার কথা নাড়াচাড়া করেছে মনে মনে। তার নিজের জমানো দেড় লাখ টাকা আছে। সেটা সে দিয়ে দিতে পারে। তার তো এফুনি কিছু কাজে লাগবে না। যার কাজে লাগবে, তাকে দিলে অসুবিধে কী! দেড় লাখ প্লাস পঞ্চাশ হাজার, মানে দু’লাখ। আরও দু’লাখ দরকার। সেটা কে দিতে পারে? অনেকেই দিতে পারে, স্বচ্ছন্দে দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন হল অনন্ত কি তাদের কাছে হাত পাতে পারবে?

প্রথমেই মনে হয়েছিল মিসেস করের কথা। তিনি হয়তো দিয়ে দেবেন, কিন্তু তার বদলে হয়তো প্রত্যাশা তৈরি হবে যে, অনন্ত তাঁর আইনসম্মত উত্তরাধিকারী হতে রাজি হয়ে যাবে। সেটা নিয়ে অনন্ত এখনও নিশ্চিত নয়। সে তো কোনও কিছুর সঙ্গে কিংবা কারও সঙ্গে জড়াতেই চায় না। তা হলে, মিসেস কর মিথ্যে মিথ্যে আশাবিত্ত হন, এমন কাজ করে লাভ কী! আবার মিসেস কর হয়তো উল্টোটাও মনে করতে পারেন। তিনি অনন্তর প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন বলে অনন্ত তার সুযোগ নিতে চাইছে।

না, না... মিসেস কর বাদ। তাঁর কাছে চাওয়া যাবে না।

তা হলে? কুসুমিতা? তাকে কী কারণ দেখাবে সে? সে যদি জিজ্ঞেস করে, গোলাপির জন্য অনন্তর এত দরদ কেন? তখন সে কী বলবে? সে সত্যিটাই বলবে, এক অসহায় মা-মেয়েকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ানো থেকে আটকানো। কিন্তু কুসুমিতা কি বিশ্বাস করবে? তার তো ওয়ান-ট্র্যাক মাইন্ড। সে তো বলবে নিশ্চয়ই অনন্তর কিছু ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে। বন্ধুত্ব হওয়ারও দরকার নেই, কাছাকাছি বয়সের দু’টি ছেলেমেয়ের যে-কোনও ভাবে আলাপ হলেই হল, মানুষ একটাই অপশন ভাবতে পারে। সেই অভদ্রীপ যেমন জিজ্ঞেস করেছিল, গোলাপি এবং অনন্তর পারস্পরিক দুর্বলতা আছে কি না। অভদ্রীপের প্রশ্নে তাও কিছু শালীনতা ছিল, কুসুমিতা তো সরাসরি বলেই দিয়েছিল, গোলাপির সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে। বাজারদর পড়ে যাওয়ার ভয়ে অনন্ত সে কথা স্বীকার করে না! কী বিচ্ছিরি অভিযোগ! একটা বারো-তেরো বছরের ছোট মেয়েকে নিয়ে এরা এরকম ভাবলই-বা কী করে! মন খারাপ হয়ে যায় অনন্তর। গোলাপিকে টাকা দিতে কুসুমিতা হাজারটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলবেই। গোলাপি যদি ছেলে হত, কিংবা অনন্ত যদি কোনও চ্যারিটিতে টাকা দিত, অথবা কোনও বয়স্ক মানুষের পাশে দাঁড়াত, তা হলে এতটা সমস্যা হত না। অভদ্রীপও আলাদা কিছু নয়। অনন্ত যদি মাঝবয়সি অথবা বুড়োমুড়ো মাস্টার কিংবা দিদিমণি হত, অভদ্রীপের ওরকম গোলমালে সন্দেহ করার জায়গা থাকত না। কুসুমিতা এবং অভদ্রীপের মানসিকতায় মিল আছে। মানুষের অধিকারবোধ সেই আদ্যুগ থেকে একই কথা বলে চলেছে। বক্তব্য সেই একই, শুধু চক্রবৎ পরিবর্তন বাক্যানি চ মুখানি চ... মোহন আচায্যির প্রভাবে আজকাল অনন্তরও খুব সংস্কৃত এসে যায়।

নাকি ভালবাসা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই এরকম অধিকারবোধ আসে? কিন্তু অভদ্রীপ না হয় গোলাপিকে ভালবাসে, কিন্তু কুসুমিতা? সে কি অনন্তকে ভালবাসে? কিছুতেই বিশ্বাস হয় না অনন্তর। ওরকম বড়লোকের মেয়েরা কিছুদিন অনন্তর মতো লোকদের নিয়ে পুতুল খেলে, তার পর ভুলে যায়। যাকগে... অন্য কথা ভাবলে এখন চলবে না। আগে টাকার চিন্তা।

আচ্ছা, কনকবাবুর থেকে চাইলে হয় না? কিন্তু এত অল্প আলাপ। স্কুলের বন্ধুর কাকা, মাঝে মাঝে পথেঘাটে দেখা হয়, তার কাছ থেকে এ রকম আচমকা দু’লাখ টাকা চাওয়া যায় নাকি! তা ছাড়া কারও থেকে টাকা চাওয়ার অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। একবার কনকবাবু তাঁর খুড়তুতো বোনের সঙ্গে অনন্তর বিয়ের কথা তুলেছিলেন, অনন্ত ইতিবাচক কিছু বলেনি। কনকবাবু যদি আবার সেই প্রসঙ্গে চাপাচাপি শুরু করেন!

সকালের নাশ্বারটা থেকে ফের ফোনটা এল বেলা বারোটো নাগাদ। বাথরুমে চান করতে করতেই সে শুনতে পেল ফোনটা বাজছে। বেরোতে বেরোতে ফোনটা থেমে গেল। অচেনা নম্বর নিয়ে কোনও কালেই মাথা ঘামায় না অনন্ত। এগুলো বেশির ভাগই স্প্যাম কিংবা ফ্রড কল। তার উপর এখন টাকার চিন্তায় সে এতই ব্যস্ত, সে আরওই গা করল না। তবে নাশ্বারটা একবার দেখলে মনে থাকে। মাঝখানে পরপর চারটে সাত আছে।

চান করে খেয়ে পড়াতে গেল বিকেলে। তবে সবই বেশ অন্যমনস্ক হয়ে। দুপুরে একবার ফোন করেছিল অভদীপ। কিছু ব্যবস্থা হল কি না জানতে। স্বাভাবিক ভাবেই কোনও আশার খবর তাকে শোনানো যায়নি। সন্ধ্যাবেলা পড়িয়ে যখন সে বাড়ি ফিরে আসছে, তখনই দেখল তাদের বাড়ির রাস্তাটার মুখে একটা বেশ বড় ধূসর রঙের এসইউভি দাঁড়িয়ে আছে। এসইউভির পিছনের সিটে একজন তরুণ তাকে জানলা দিয়ে দেখতে পেয়ে মোবাইলে কিছু একটা দেখল। তার পর দরজা খুলে নেমে এল। সটান তার দিকে এগিয়ে এল লম্বা ছিপছিপে ছেলেটি। শার্প মুখ। ফর্মাল দুধসাদা শার্ট আর ব্রাউন ট্রাউজার পরে আছে। পায়ে পালিশ করা কালো জুতো। তার সামনে দু'দিনের না কামানো দাড়ি, গুঁজে না পরা শার্ট আর চটিতে নিজেকে বড় আত্মবিশ্বাসহীন মনে হল অনন্তবিশ্বাস।

নদীর ঘাটের কাছে

দু'দিনের মাথায় অভদীপকে শোভাবাজারে অপেক্ষা করতে বলেছে অনন্ত। ফোনে শুধু বলেছে, টাকার জোগাড় হয়ে গেছে। আজ শুধু সেই টাকাটা আশুবাবুর হাতে তুলে দেওয়ার অপেক্ষা। অভদীপকে সকাল সাড়ে এগারোটোর সময় দাঁড়াতে বলা হয়েছিল। ঠিক এগারোটো পর্যন্ত্রিশে ফুটপাথের গা ঘেঁষে দাঁড়াল একটা অ্যাপক্যাব। ভেতর থেকে অনন্তবিশ্বাস তাকে ডেকে বলল, “উঠে এসো।”

অভদীপের মুখে-চোখে হাজারও প্রশ্ন। বুঝতে পেরে অনন্ত হাত তুলল, “সব বলব। পরে।”

আশুবাবুর বাড়ি পৌঁছে ব্যাকপ্যাক থেকে প্লাস্টিকে মোড়া পাঁচশো টাকার অনেকগুলো বাস্তিল বের করে দিল অনন্ত। বলল, “এতে পুরো সাড়ে তিন লাখ টাকা আছে। দেড় আমার নিজের। বাকি দু'লাখ বন্ধুর থেকে ধার নিয়েছি। সুদটুদ কিছু লাগবে না। যখন পারবেন শোধ দেবেন।”

আশুবাবু অবাক বিশ্বাসে তাকিয়ে রইলেন অনন্তবিশ্বাসের দিকে। বললেন, “মাত্র চার দিনে এতগুলো টাকা, তুমি তো অসাধ্যসাধন করলে বিষ্ণু। কিন্তু নিজের টাকা এ ভাবে দিয়ে দিলে, তোমার যদি কোনও দরকার পড়ে? তখন কী করবে?”

“মনে করব ওই টাকাটা আমার ছিলই না কাকু!” হেসে বলে অনন্ত, তার পর বলে, “আমার ঠিক জুটে যাবে। আবার নতুন করে শুরু করব জমাতে। অন্তত থাকার জায়গা তো একটা আছে। সে ভাড়া তো জোটাতে পারছি। আমার তো টাকাটা লাগছিলই না। গোলাপিদের প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশি। তাই দিচ্ছি। তবে একটা কথা কাকু, আমি যে সবটা ব্যবস্থা করেছি, তা গোলাপিদের বলার দরকার নেই। ওঁদের সন্মোচন হতে পারে। আপনি বলবেন আপনি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।”

“বুড়ো মানুষটাকে দিয়ে মিথ্যে বলাবে বিষ্ণু?” বলেন আশুবাবু, “কাজ করলে তুমি, নাম হবে আমার!”

“নামটাম কিছু ভাববেন না... কাজটা হল, এই অনেক,” বলে উঠে পড়ে অনন্ত। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় ঘুরে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত কথা বলে অনন্ত, “একটা কথা কাকু, ধরুন কোনও কারণে আমাকে বাইরে-টাইরে যেতে হল, টাকাটা শোধ করতে চেয়েও পারলেন না, তখন টেনশন করবেন না। কোনও ভাল কাজে লাগিয়ে দেবেন। অনাথ, আতুর, ভবঘুরে, ভিখিরি, বিপদগ্রস্ত যে কারও কাজে টাকাটা লাগলেই জানবেন শোধ হয়ে গেল। আসি কাকু। ভাল থাকবেন!”

বিভ্রান্ত আশুবাবুকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে অভদীপকে নিয়ে বেরিয়ে আসে অনন্ত।

এবার ফ্ল্যাশব্যাকে দেখে নিতে হবে দু’দিন আগের সেই সন্দের ঘটনা। সেই যে পড়িয়ে বাড়ি ফিরছিল অনন্ত আর এসইউভির পিছনের সিট থেকে লম্বা ছিপছিপে স্মার্ট কেতাদুরস্ত ছেলেটি নেমে এল তার দিকে।

এসেই অনন্তকে বলল, “আপনি ফোন ধরেন না কেন? ফোন বেজে যাচ্ছে বারবার।”

অনন্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটি বলে, “আপনার নাম অনন্তবিষ্ণু ঘোষ তো?”

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে অনন্ত।

“চলুন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। আমার গাড়িতে বসতে পারেন, বা চাইলে কোনও কফিশপ...” বলে ছেলেটি।

“গাড়িতেই ভাল,” বলে অনন্তবিষ্ণু। অন্যত্র বসলে খরচের ব্যাপার আছে। তা ছাড়া কাছাকাছি তেমন কফি শপ বা রেস্টরাঁও নেই।

গাড়িতে বসে বিনা ভূমিকায় কাজের কথায় আসে ছেলেটি, “দেখুন অনন্তবাবু, আপনি আমার জীবনে একটা বিশেষ সমস্যা তৈরি করেছেন। আমি মেনে নিচ্ছি আমার ফিয়সে একটু ছেলেমানুষ, একটু ইমম্যাচিয়ার। কিন্তু তাকে এ ভাবে প্রেমের জালে ফাঁসানো আপনার উচিত হয়নি। সেই পুরনো ছক। বড়লোকের মেয়ে ফাঁসও আর টাকা কামাও। এ ছাড়া আর কোনও কাজ পারেন না আপনারা?”

অনন্ত খুব মৃদু স্বরে বলে, “আপনার ফিয়সে? কী নাম যদি একবার বলেন...”

ছেলেটি বিদ্রূপের স্বরে বলে, “ওহো! এরকম অনেককে ফাঁসানো আছে নাকি! নাম শুনে ডায়েরি দেখে মেলাবেন? তা হলে শুনে নিন, আমার ফিয়সের নাম কুসুমিতা পালিত, ডটার অব এমিনেন্ট লইয়ার অসমঞ্জ পালিত। আর আমার নাম উপায়ন দত্ত।”

অনন্তবিষ্ণু বুঝতে পারে, কিছু একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। সে বিনীত ভাবে বলে, “আমি কাউকে ফাঁসাইনি। আমাকে দেখে কি পাগল মনে হয়? অসমঞ্জবাবু আমাদের একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ পেট্রন। আমি তাঁর মেয়েকে ফাঁসিয়ে কেন নিজের ক্ষতি করব বলুন? কুসুমিতা ম্যাডাম আমার সম্বন্ধে কী বলেছেন আপনাকে আমি জানি না। কিন্তু আমি এমন কিছু করিনি যাতে আমার বিরুদ্ধে ফাঁসানোর অভিযোগ উঠতে পারে। ম্যাডাম আমাকে নিয়ে কয়েকবার বেরিয়েছেন বটে, কিন্তু আমি কখনও সম্মানজনক দূরত্ব অতিক্রম করিনি।”

উপায়ন তবু হিসহিস করে বলে, “এসব ভালমানুষি করে কোনও লাভ হবে না। আমি ভদ্রলোক। তাই কথা বলছি। চাইলে আমি আপনাকে ভ্যানিশ করে দিতে পারতাম। কেউ আপনার টিকিটিংও দেখা পেত না। যা-ই হোক, টাকা খিঁচবেন বলেই তো বড়লোকের মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। আমি দেব আপনাকে টাকা। কত টাকা চাই বলুন। আমি একটা নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছি। কাউকে বঞ্চিত করতে চাই না। বলুন কত টাকা পেলে আপনি কুসুমিতার ত্রিসীমানায় আর ঘেঁষবেন না। বলে ফেলুন...”

অনন্তবিষ্ণুর অগ্রপশ্চাৎ বোধ শূন্য হয়ে যায়। তার মনে শুধু একটাই কথা ভেসে থাকে, আর দু’লাখ টাকা পেলে এক অসহায় বিধবা আর তার মেয়ের থাকার জায়গা হয়। তাদের রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয় না। ফস করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, “দু’লাখ।”

“আহা! পথে আসুন মশাই, এইবার পথে আসুন!” চওড়া হাসি খেলে যায় উপায়নের মুখে। সে ব্যাগ থেকে চেক বুক বের করে দু’লাখ টাকার চেক লেখে। তার পর চেকটা হাতে দেওয়ার আগে বলে...

কিন্তু সেটুকু অনন্তবিষ্ণু শুধু নিজের জন্যই রাখবে। কারণ, শর্তটাই সে রকম।

কুসুমিতার সঙ্গে অনন্তবিষ্ণুর পরিচয় হওয়া, অনন্তবিষ্ণুকে গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার বিশদ বিবরণ শোনে অভদ্রীপ। সবটা শুনে চোখ গোল গোল হয়ে গেল অভদ্রীপের, “এ কী গো বিটুদা! কুসুমিতা তোমাকে ভালবাসে, আর তুমি এটা কী করলো! ওই উপায়ন তো গিয়ে

সাতকাহন করে কুসুমিতাকে তোমার টাকা নেওয়ার কথা লাগাবে। কুসুমিতার মনের অবস্থাটা কী হবে ভাবতে পারছ? না গো বিটুদা। কাজটা তুমি ঠিক করোনি।”

বিরক্ত হয়ে অনন্তবিষ্ণু বলে, “যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না তো! তোমার মনে হয় কুসুমিতা আমাকে ভালবাসে? ওটা বড়লোকের দু’দিনের খেলা। খেলনার দোকানে অন্য রকম একটা খেলনা দেখেছে, দু’বার নেড়েচেড়ে দেখেছে, তার পর রেখে দিয়ে চলে যাবে। ব্যস। কুসুমিতার সঙ্গে আমার মতো চালচলোহীন ভাগ্যবন্দের প্রেম! এ কী সম্ভব! ফিকশনের পক্ষেও খেলো হয়ে যাবে ভাই।”

অভদ্রীপ আর মজা পাচ্ছে না, সে একই রকম গম্ভীর হয়ে বলে, “তুমি নিশ্চিত হচ্ছে কী করে যে, কুসুমিতা তোমাকে ভালবাসে না?”

চূপ করে থাকে অনন্তবিষ্ণু। কোনও উত্তর দেয় না। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

ধৈর্য হারায় অভদ্রীপ। বলে, “কী হল, বলো?”

ধীরে ধীরে মুখ ফেরায় অনন্ত, খুব মৃদু গলায় বলে, “আমার সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনেছে। কই একবারও তো বলেনি সে অন্য কারও ফিয়সে। ঠিকই আছে। বলার প্রয়োজন মনে করেনি। বলেনি। তবে এতে এটাই প্রমাণ হয় যে, ভালবাসেনি। তা হলে এত বড় কথা লুকোত না।”

অভদ্রীপ সামান্য অবাক হয়। বিটুদার গলায় কি অভিমানে? কুসুমিতার ভালবাসার উষ্ণতা কি অনন্তের গলনাক্ষ স্পর্শ করতে পারল তা হলে? কে জানে!

অভদ্রীপ চলে যাওয়ার পর সেদিনকার ঘটনার শেষটুকু মনে পড়ে অনন্তর। দু’লাখ টাকার অঙ্কটা বসিয়ে সেই করেছিল উপায়ন। তার পর চেকটা তার হাতে দেওয়ার আগে বলেছিল, “শর্ত আছে ব্রাদার। দেখুন, আপনি যে টাকা চেয়েছেন সেটাই পেলেন। আমি বারগেনিং করিনি। আপনিও করবেন না। আমার শর্ত পুরোটাই মানতে হবে।”

অনন্ত বলেছিল, “বলুন কী শর্ত।”

একটা শ্বাস ফেলে উপায়ন বলেছিল, “বরাবরের মতো কলকাতা ছাড়তে হবে। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কলকাতায় যেন আর আপনাকে কখনও দেখা না যায়। কোথায় যাচ্ছেন, কবে যাচ্ছেন কেউ যেন জানতে না পারে। রাজি?”

অনন্তর নিজের মনেও কি এরকম একটা ইচ্ছে ঘুরছিল না কয়েক দিন ধরে? শহরটা বড্ড একঘেয়ে হয়ে গেছে। সবাই কাছে ডাকছে, জড়িয়ে নিতে চাইছে। তাকে তার মতো থাকতে দিচ্ছে না। উপায়নের প্রস্তাব বড় ভাল লাগল তার। সে এক কথায় জানাল, সে রাজি। তার পর জিজ্ঞেস করে, “যদি অসুবিধে না থাকে, আর কয়েকটা দিন, কালীপুজো কেটে যাওয়া অবধি সময় পেতে পারি?”

উপায়ন ভুরু কঁচকে কী যেন ভাবে, তার পর বলে, “কালীপুজো আর কা’দিন! বরাবরের জন্য কলকাতার বাস তুলবেন যখন, তখন অত তাড়া দেব না আপনাকে। থাটিফার্স্ট ডিসেম্বর আপনার ডেডলাইন। সেটা যেন ক্রস করবেন না।”

মন থেকে উপায়নকে ধন্যবাদ জানায় অনন্তবিষ্ণু।

উপায়নের কথামতো সে সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে যাওয়ার প্ল্যান মনে মনে শুরু করে দিয়েছে বলেই আশুবাবুকে ওই কথা বলেছে। তাকে না খুঁজে পেলে টাকা যেন গরিব-দুঃখী-অভাবী মানুষের কাজে লাগানো হয়।

বাড়ি ফিরে অনন্ত মেসেঞ্জার থেকে কলেজের বন্ধু সুরেশ শ্রীবাস্তবের ফোন নম্বর বের করে। বহু আগে চেয়ে রেখেছিল। ফোন করে। তিনবার রিং বাজার পর ফোন ধরে সুরেশ। বলে, “হ্যালো? কণ্ডন?”

“আমি কলকাতা থেকে অনন্ত বলছি রে।”

“ও বাবা! এত দিন পরে সুরেশকে মনে পড়ল রে ব্যাটা!”

“সুরেশ, তোদের তো অনেকগুলো কারবার। আমাকে একটা কাজ দিতে পারিস?”

“কেন পারব না? চলে আয় আমার কাছে। কলকাতার কারবারগুলো এখন কাজিনরা দেখে। আমি বেনারসে সেটল করেছি। আমাদের ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ কর। সারা দেশ ঘুরে বেড়াবি। চাইলে আমাদের পাবলিশিং হাউজেও কাজ করতে পারবি। প্রফরডিং, এডিটিং, তোর যা ইচ্ছে। একবার চলে তো আয়। কলকাতা ছেড়ে বেরো রে ব্যাটা! দুনিয়া দেখিয়ে দেব তোকে!”

“ঠিক তো রে! আমি কিন্তু তোর ভরসাতেই কলকাতা ছাড়ব। বরাবরের জন্য,” গলাটা কেমন যেন কেঁপে যায় অনন্তর।

“তুই একবার আয় না রে ভাই। এখানে তুই আমার রেসপনসিবিলিটি। কলকাতা ভুলিয়ে দেব তোকে। আমার একটা শালিও আছে রে। বাইশ বছর বয়স। তার পাত্র খোঁজা হচ্ছে। দেরি করলে তুইই ঠকবি। হা হা হা...”

টাকা নিয়েছে অনন্তবিষ্ণু। সে কি আর কলকাতায় থাকতে পারে! সে বেনারসই যাবে। এর পর ভাল মন্দ যা হবে, সব বাবা বিশ্বনাথের হাতে। রাখলে রাখবেন, মারলে মারবেন। অনন্তবিষ্ণু শুধু জানে, তাকে নদী পার হওয়ার পর পুলটা পুড়িয়ে দিতে হবে।

যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা

সেই অদ্ভুত মেয়েটা আবারও এসেছিল। কোন মেয়েটা বলুন তো? ঠিকই ধরেছেন। সেই যে এক দুপুরে আচমকা উদয় হয়ে অনন্তবিষ্ণুকে রাখি পরিয়ে গেছিল, সে। দ্বিতীয়বার সে এল কালীপূজোর পরের দিন। সেদিন অনন্তবিষ্ণুর নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই।

অনন্তবিষ্ণু যেখানে থাকে, সেই রাস্তাটার মুখে বেশ বড় করে কালীপূজো হয়। পাড়ার পূজো। পূজোর দিন সারা রাত পূজো চলে। তাই পরদিন সকালটা সবাই বিশ্রাম নেয়। তার পর দুপুরে বামুনঠাকুররা আসে। শুরু হয় রান্নাবান্নার তোড়জোড়। প্রায় তিন-চারশো লোকের রান্না হয়। এলাকার সকলে খায়। বসে খাওয়া, বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও আছে। শালপাতায় করে পথচলতি মানুষের মধ্যে বিলিও হয়। পুরোটাই ঠাকুরের ভোগ। পূজোয় আটাশ কেজি গোবিন্দভোগ চালের একটা নৈবেদ্য পড়ে। সেখান থেকে ভাগ হয়ে পায়ের আর খিচুড়ি রান্না হয়। পুরো মেনু হল খিচুড়ি, আলুর দম, চটনি, পায়ের, বোঁদে। এলাহি ব্যাপার।

কনকবাবুর বাড়িতেও কালীপূজো হয়। নেমস্তল্ল করেন অনন্তবিষ্ণুকে। অনন্তবিষ্ণুর পাড়ার পূজোয় থাকে বলে যেতে পারে না। অনন্তবিষ্ণু কালীপূজোর জোগাড়-আয়োজনের কাজ করে শুনে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন মানুষটা। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, “অপূর্ব! অপূর্ব! এত কম বয়সে যে তুমি মায়ের কাজ করো, শুনেও আনন্দ হয়। এর চেয়ে বড় কাজ নেই গো ভাই। ডান হাতে মাকে ধরে রাখতে পারলেই দেখবে, বাকি কাজকর্ম সব বাঁ হাতে উদ্ধার হয়ে যাবে! খুব ভাল। খুব ভাল।”

পূজো উদ্ধার হওয়ার পরের দিন ভোরে বাড়ি ফিরে ঘন্টাতিনেক ঘুমিয়ে আবার প্যাণ্ডেলে গেছিল অনন্তবিষ্ণু। সেখানে তখন রান্নার ঠাকুররা এসে গেছে। সেও তদারকিতে লেগে পড়ল। সঙ্গে সাতটার মধ্যে সব রেডি চাই। বেলা দশটা নাগাদ পাড়ারই একটি ছেলে এসে খবর দিয়েছিল, “অনন্তদা, ইনি তোমাকে খুঁজছেন।”

অনন্ত তখন নিবিস্ত মনে রান্না দেখছিল। চোখ সরালেই ঠাকুরগুলো বিড়ি ফুঁকবে আর ফাঁকি মারবে। ডাক শুনে পিছন ফিরে দেখে সেই মেয়েটি। কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল চিনতে। আজ সেদিনের মতো উল্কাখস্কো নয়। দেখে মনে হয়, চান করে চুল বেঁধে পরিপাটি হয়ে বেরিয়েছে।

হাতজোড় করে নমস্কার করে মেয়েটি বলল, “চিনতে পারছেন? আমি সেই রাখির দিন...”

প্রতিনমস্কার করে অনন্ত বলল, “হ্যাঁ বলুন। ভাল আছেন?”

মেয়েটি বলে, “আমি ঠিক আছি। আসলে একটু দরকার ছিল। আপনার বাড়িতেই গেছিলাম। মাসিমা বললেন আপনি এখানে

থাকবেন। তাই খুঁজে খুঁজে চলে এলাম। কাল সকালে আপনি বাড়ি থাকবেন?”

একটু অবাক হয় অনন্ত, “হ্যাঁ, সকালে মানে কখন?”

“এই ধরুন ন’টা,” একটু ইতস্তত করে মেয়েটা বলে, “আসলে এখান থেকে অফিস যাব তো, তাই...”

অনন্ত বলে, “হ্যাঁ থাকব, কিন্তু কী দরকার যদি একটু...”

মেয়েটি হাসে। বলে, “কাল ভাইফোঁটা। আপনাকে রাখি পরিয়েছিলাম। আবার আপনার কথা মনে পড়ল। আমার তো আর কোনও দাদা বা ভাই নেই। তাই যদি আপনার আপত্তি না থাকে...”

আপত্তির তো কিছু নেই। কাল তো তাকে মামার বাড়ি যেতেই হবে দশটা নাগাদ। রুম আর বুন্দের কাছে ফোঁটা নিতে। দুপুরে সেখানেই খাওয়াদাওয়া। এই মেয়েটির কাছে ফোঁটা নিয়ে সেখানেই চলে যাবে না হয়। শুধু মুশকিল একটাই। রুম-বুন্দের উপহার কেনা হয়ে গেছে। বছর তিনেক হল ওদের দু’জনকেই শাড়ি দেয় অনন্ত। এই মেয়েটিকেও শাড়িই দেবে। আজ বিকেলেই ছুটতে হবে হাতিবাগান।

অনন্তকে চুপ করে থাকতে দেখে মুখে ছায়া পড়ে মেয়েটির। সে বলে, “যদি কোনও অসুবিধে থাকে, তা হলে থাক, আমি জোর করব না...”

অনন্ত বলে ওঠে, “না না, কিছু অসুবিধে নেই। আপনি আসবেন।”

উজ্জ্বল মুখে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যাচ্ছিল মেয়েটা, তখনই মনে পড়ে গেল অনন্তর। এবার আর ভুল হবে না। সে ডাকল, “শুনুন...”

মেয়েটি ঘুরে তাকায়।

অনন্ত বলে, “আপনার নামটা জানা হয়নি...”

মেয়েটি হেসে বলে, “কী কাণ্ড দেখেছেন! আমারও খেয়াল নেই... আমার নাম হৈমন্তী। আচ্ছা, আসি। কাল সকাল ন’টা।”

অনন্তবিষ্ণু অবাক হয়ে ভাবে, হৈমন্তী! ব্যস! আর কিছু নেই। আজকাল হয়তো পদবি বাদ দেওয়াই নিয়ম। বলেনি যখন, বলেনি। অনেকেই পদবি ব্যবহার করে না। সে তো আর কনকবাবু নয় যে, পদবি কী, গোত্র কী, দেশ কোথায়— এই সবের ঠিকুজি নিয়ে পড়ে যাবে! কেউ যদি মনে করে সে তার পদবি ব্যবহার করবে না, তা হলে সে স্বাধীনতা তার আছে।

কনকবাবু আশ্চর্য মানুষ, এ সব স্পেস দেওয়ার ধার ধারেন না। একবার দেশবন্ধু পার্কের কাছে দেখা হয়ে যেতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “তোমার নামটা যেন কী বলেছিলে ভাই? পুরো নামটা?”

অনন্ত বলেছে, “অনন্তবিষ্ণু ঘোষ।”

কনকবাবু বলেছেন, “ঘোষ? বাঃ! তা গোত্র? গোত্র জানা আছে? মৌদগল্য? না...”

অনন্ত বলেছে, “আজ্ঞে, সৌকালীন।”

চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কনকবাবুর, “বাঃ! বাঃ! আমার এক খুড়তুতো বোন, বুঝলে... এম এ পাশ। মট্টেসরি ট্রেনিংও আছে। দেখতে শুনতে বেশ। ঘরের কাজকর্ম জানেটানে। সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে... তোমার সঙ্গে খুব মানায় বুঝলে... যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তোমার মা-বাবার সঙ্গে এক বার বসা গেলে ব্যাপারটা নিয়ে, বুঝলে না...”

অনন্ত স্পষ্ট গলায় জানিয়েছিল, “আমার মা-বাবা নেই। আর এই মুহুর্তে বিয়ে করার উপায় বা ইচ্ছেও নেই। কিছু মনে করবেন না প্লিজ।”

কনকবাবুর সুন্দর মুখটা সামান্য স্নান হয়ে গেছিল। ডান হাত বাড়িয়ে অনন্তর বাঁ হাতের ওপর দিকটা সামান্য স্পর্শ করে কনকবাবু বলেছিলেন, “আমি আসলে একটু আবেগপ্রবণ, বুঝলে... বড্ড তাড়াহুড়ো করে ফেলি, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার দিকটা আমার বিশেষ সুবিধের নয়, তুমিও কিছু মনে করো না ভাই। তবে তোমার সঙ্গে কথা বলে বেশ ভাল লাগল। আমার কথা বলার লোক বিশেষ নেই। তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা হবে, কেমন?”

বলে বিদায় নিয়ে চলে গেছিলেন। সেদিন অনন্তর মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক খুব অদ্ভুত। অনন্ত কী করে, কত দূর পড়াশোনা, এ সব কিছু জানতে চাইলেন না, শুধু সৌকালীন গোত্র শুনে নেচে উঠলেন!

আজকালকার দিনে শুধু গোত্র কি কারও বিয়ে করার যোগ্যতা হতে পারে! খুবই বিস্মিত হয়েছিল অনন্ত। তবে কনকবাবুর ওপর রেগে যেতে বা বিরক্ত হতে পারেনি।

ভোগের রান্নার কাজ শেষ হতে সাড়ে ছটা বাজল। এবার অনন্তবিষ্ণুর ছুটি বাড়ি ঘুরে টাকাপয়সা নিয়ে শাড়ি কিনতে যেতে হবে হাতিবাগান। বাড়িতে ঢুকতেই মিসেস করের কাজের লোক বাতাসির ডাক, “দাদা, একবার ওপরে ঘুরে যাবে? মা ডাকছেন।”

অনন্ত ওপরে গিয়ে দেখে মিসেস করের ভুরুতে ভাঁজ। সরাসরি ছুটে এল বলেট, “মেয়েটি কে, অনন্ত? তোমাকে দুপুরে খুঁজতে এসেছিল।”

অনন্ত বলেছিল কী ভাবে আলাপ, কী বৃত্তান্ত। ভুরুর ভাঁজ সামান্য নরম হয়েছিল। হেসে বলেছিলেন, “তাই বলো, আমি ভাবলাম কী ব্যাপার। ভরদুপুরে একটি ইয়ং মেয়ে এসে ডোরবেল বাজিয়ে জিজ্ঞেস করছে, ‘অনন্তবিষ্ণুবাবু বাড়ি আছেন?’ এ তো ভাবাই যায় না। তুমি তো সাধুসন্ন্যাসী মানুষ। কাল সকালে তা হলে কখন আসছেন তোমার বোন?”

সময়টা জানিয়ে লাজুক মুখে চলে এসেছিল অনন্ত।

পরের দিন ঠিক নটায় এসেছিল হৈমন্তী। লাল-সাদায় কাজ করা সুন্দর একটা শাড়ি পরে। তার কাঁধের ব্যাগ থেকে বেরিয়েছিল একটা থার্মোকলের থালা, প্লাস্টিকের গ্লাস, দুটো মিষ্টির বাস্ক, আর ছোট্ট একটা স্টিলের কৌটো, তাতে ছিল ঘষা চন্দন। ঠিক তখনই বাতাসির গলা, “আমাকে মা পাঠালেন, সব আছে কি না দেখতে। কই, নেই তো! দাঁড়াও আসছি।”

কী নেই! অনন্ত আর হৈমন্তী অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, তার পর হৈমন্তী প্লেটে মিষ্টি সাজাতে শুরু করে। সুন্দর করে সাজায় গোল খাজা, পদ্মনিমকি, ভাইফোঁটা লেখা কড়াপাক সন্দেশ, চিত্রকূট, লালমোহন, ক্ষীরকদম আর শোনপাপড়ি।

চোখ কপালে ওঠে অনন্তবিষ্ণুর। বলে, “করছেন কী! এত মিষ্টি!”

অনুযোগের সুরে মেয়েটি বলে, “ভাইফোঁটা দেবে যে বোন, তাকে তার দাদা আপনি বলে সম্বোধন করে, কোথাও শুনেছেন?”

অনন্ত ভেবে দেখে, না, সত্যিই এরকম কখনও শোনেনি। তাই সে বলে, “ঠিক আছে। তুমিও তা হলে আমাকে আর আপনি বোলো না।”

মেয়েটি হেসে বলে, “আচ্ছা দাদা।”

ততক্ষণে এসে উদয় হয়েছে বাতাসি। তার হাতে একটা থালায় রাখা শাঁখ, ধানদুর্বা আর একটা ছোট্ট জ্বলন্ত প্রদীপ। সে বলে, “বোনকে এই ধানদুবো দিয়ে আশীর্বাদ করতে বললেন মা,” বলে শাঁখটা তুলে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করল।

মেয়েটি জল মিষ্টি সাজিয়ে ফোঁটা দিল। তার পর যথারীতি তাকে প্রণাম করতে গেলে বাধা দিল অনন্তবিষ্ণু, “প্লিজ হৈমন্তী, এটা থাক।” তার পর ধানদুর্বা তুলে মেয়েটির মাথায় রেখে আশীর্বাদ করল। মনে মনে বলল, ‘আমার শুভকামনা তোমায় ঘিরে থাকুক। তোমার সব ইচ্ছে পূরণ হোক।’

হৈমন্তী মাথা নিচু অবস্থা থেকে মুখ তুলতেই ফের চমকাল অনন্তবিষ্ণু। মেয়েটির চোখে জল। নাকের ডগা লাল।

আজ আর নিজেকে আটকাতে পারল না অনন্তবিষ্ণু, জিজ্ঞেস করেই ফেলল, “তুমি কান্দছ কেন হৈমন্তী? সে দিনও রাখির দিন দেখেছিলাম...”

আজ আর কান্না চাপতে পারে না হৈমন্তী। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বাধা দেয় না অনন্তবিষ্ণু। চুপচাপ বসে দেখে।

কান্না সামলে হৈমন্তী বলে, “আমি ছোটবেলা থেকে কখনও কাউকে ফোঁটা দিইনি, রাখি পরাইনি। এই প্রথম। খুব দূর সম্পর্কেও আমার কোনও দাদা বা ভাই নেই। ঠাকুর আমাকে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছেন বলে আমার জীবনে এ সব সম্ভব হল। খুব আনন্দ হচ্ছে, তাই চোখে জল এসে গেল।”

অনন্তবিষ্ণুর মনটা খচখচ করে ওঠে। অনেক মেয়েরই তো সাতকুলে কোনও দাদা বা ভাই থাকে না, তারা এরকম করে? আজকের যুগের

একটা মেয়ের এরকম ইমোশন থাকে কি? কে জানে!

সে হৈমন্তীকে বলে, “সকাল থেকে কিছু খেয়েছ?”

হৈমন্তী লাজুক স্বরে বলে, “না, ছোটবেলা থেকে শুনেছি ভাইফোঁটা না খেয়ে দিতে হয়। ব্যাগে টিফিন আছে, অফিস পৌঁছে খেয়ে নেব।”

আশ্চর্য হয়ে অনন্তবিষ্ণু বলে, “সে কী! আগে আমার প্লেট থেকে একটা মিষ্টি খাও। খেতেই হবে। না বললে হবে না। যেটা পছন্দ তুলে নাও।”

খুবই সঙ্কুচিত হয়ে হৈমন্তী শোনপাপড়িটা তুলে নেয়। অনন্তবিষ্ণুও লালমোহনটা ভেঙে মুখে দেয়। তার পর তার মাথায় ঘুরতে থাকা একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসে, “সে দিন তুমি রমাপতি সরকারের বাড়ি খুঁজে পেয়েছিলে?”

অবাক হয়ে হৈমন্তী বলে, “রমাপতি সরকার আবার কে?”

কোনও উত্তর না দিয়ে সরাসরি তাকিয়ে থাকে অনন্তবিষ্ণু।

পরক্ষণেই জিভ কাটে মেয়েটি, “মনে পড়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিকানা ভুল ছিল। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট নয়, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট, শোভাবাজারের কাছে। বাবা! তোমার স্মৃতিশক্তি তো খুব জোরালো।”

হাসে অনন্তবিষ্ণু। উঠে ময়ূরকণ্ঠী রঙা শাড়িটা বের করে হৈমন্তীর হাতে দেয়। তার চোখমুখ দেখে বোঝা যায় যে, শাড়িটা তার বেশ পছন্দ হয়েছে। সেও ব্যাগ থেকে বের করে একটা শেভিং কিট। অনন্তর হাতে তুলে দেয়। অনন্ত পাড়ার জিনিসে অভ্যস্ত। এটা বেশ দামি ব্র্যান্ডের। সে মৃদু আপত্তি-সহ ধন্যবাদ জানায়।

কথায় কথায় অনন্ত জিজ্ঞেস করে, “তুমি কোথায় চাকরি করো হৈমন্তী?”

হৈমন্তী বলে, “কোম্পানিটার নাম অ্যাডোবন্ড। অ্যাডহেসিভ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। আমি সেখানে ডেটা অপারেটরের চাকরি করি। বেশি দিন হয়নি। এই মার্চ মাসেই চাকরিটা পেয়েছি।”

অনন্ত জিজ্ঞেস করে, “কোথায় অফিস?”

“সেক্টর ফাইভ,” বলে হৈমন্তী।

আরও টুকটাক দু’-একটা কথার পর বিদায় নেয় হৈমন্তী। বলে যায়, “মাঝে মাঝে আসতে পারি কিন্তু। কোনও অকেশন ছাড়া এলে ঢুকতে দেবে তো?”

সম্মতিবাচক হেসে ঘাড় নাড়ে অনন্ত। আর কবে আসবে! তত দিনে আকাশ খুঁজে নেবে রেশম মথ। পড়ে থাকবে শূন্য কোকুন।

হৈমন্তী চলে যাওয়ার পরও তার রেশ থেকে যায়। হঠাৎ-পাওয়া এই ভাইফোঁটা তার খারাপ লাগেনি। শুধু সামান্য দু’-একটা খিঁচ। যে-রমাপতি সরকারের বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে হৈমন্তীর প্রথম এখানে আসা, তার নামটাই ভুলে গেল ও? কথায় কথায় এর চোখে জলই-বা আসে কেন?

সে সব খিঁচ জোর করে মাথা থেকে সরিয়ে তৈরি হয়ে নিল অনন্ত। রুম আর রুমও তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।

কলকাতায় তার এই শেষ ভাইফোঁটা।

স্বপ্নশয়ন করিয়া হেলা!

উপায়ন অবশ্য তার পর দিনই ফোন করেছিল কুসুমিতাকে। বলেছিল, “কেস সলভড। যাকে তুই এক্সপোজ করতে পারিসনি, আমি করে দিয়েছি। তোর ওই অনন্তবিষ্ণু কিছু সাধুপুরুষ নয় রে। টাকার জন্যই তোকে হিপনোটাইজ করে ফেলছিল। আমি চেপে ধরতেই সব পরিষ্কার। তোকে ভালবাসেও না, কিছুই না। টাকা অফার করতেই নিজের মুখে বলল দু’লাখ টাকা চায়। দিয়ে দিয়েছি। কেস ফিনিশড। তবে ধরা যখন পড়ে গেছে, তখন আমিও ছাড়িনি, বলেছি কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে বরাবরের মতো। ব্যস, ঝামেলা শেষ। যদিও তুই বের করতে পারিসনি, তোর সন্দেহ কিন্তু ঠিক। বাস্তবে এত ভাল কেউ হতে পারে নাকি, মনে মনে এই উদ্দেশ্যই ছিল। ক’দিন পর সরাসরি তোর থেকে চাইত। আমি দিয়ে দিয়েছি। তুই আর ওর সঙ্গে দেখা করিস না।”

চুপচাপ সব শোনার পর কুসুমিতা বলল, “আমাকে ভালবাসে না

বলেছে, তাতে কোনও অসুবিধে নেই। ভাল তো আমি ওকে বাসি। কিন্তু দু'লাখ টাকাটাই সব গোলমাল করে দিল রে উপায়ন। যে এতখানি মানিসেট্রিক, কোথাও থেকে তার সেই স্বভাবের ট্রেস পাওয়া গেল না। এটা খুব অদ্ভুত না!”

উপায়ন বলল, “আর এ সব ভাবিস না, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। তুই এ সব ভুলে যা।”

কুসুমিতা চুপ করে থাকে। তার কপালে গভীর ভাঁজ।

কিন্তু প্রশ্ন হল, গরিব ছেলেমেয়েরা কি শুধু টাকাপয়সার জন্য বড়লোকের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে? এই প্রশ্নটা বড্ড তোলপাড় করে উপায়নকে। তার যে হৈমন্তীকে ভাল লাগছে, তার মানে হৈমন্তীও কি তার এই ভাল লাগার সুযোগ নেবে? প্রশ্নটা সারা দিন মাথায় ঘুরল উপায়নের। তার পর ছুটির সময় মনে হল, হৈমন্তীর সঙ্গে তার একটু কথা বলা দরকার। সে ইন্টারকমে ফোন করে বলে রাখল, হৈমন্তীর সব কাজ শেষ হয়ে গেলে সে যেন একবার এসে উপায়নের সঙ্গে দেখা করে। উপায়নের সমস্যা হল, সে যতই গভীর, স্থিতিধী এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হোক না কেন, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা তেমন জোরদার হলে তার কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে যায়। খুব বুদ্ধিমান বলে এ রকম সময় সে কারও সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু হৈমন্তীর সঙ্গে কথা না বলেও যে সে থাকতে পারছে না!

উপায়নের ঘরের দরজায় টোকা দিল হৈমন্তী ঠিক পৌনে সাতটায়।

উপায়ন বলল, “আসুন। বসুন।”

হৈমন্তী এল। বসল। কিন্তু উপায়ন ঠিক কী বলবে মনে করতে পারল না। শুরুর লাইনটা ভাবাই ছিল। কিন্তু হৈমন্তীকে দেখে গুলিয়ে গেল। দিনের শেষেও কেমন সুন্দর পরিপাটি হয়ে আছে মেয়েটা। মুখটা মেক আপে ফ্যাটিফেটেও নয়, তেল চকচকেও নয়। খুব ফরসা নয়, সুদীর্ঘ কমপ্লেকশন, চোখের আরাম হয়। ছোট টিপ। সুন্দর করে বাঁধা চুল। ঠোঁটে লিপস্টিক আছে, কিন্তু খুব মৃদু, মোলায়েম রং। চোখেও সামান্য মেক আপ আছে। তবে সবই খুব মাপসই। উপায়ন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল।

অস্বস্তি কাটাতে হৈমন্তী বলল, “কিছু বলবেন স্যার?”

“হ্যাঁ, মানে না, ধরুন কিছু জেনারেল ডিসকাশন, ধরুন গরিবরা কি বড়লোকদের ঠাকানোর সুযোগ খোঁজে? না মানে গরিবরা কি সবসময়ই নিজেদের এক্সপ্লয়েটেড মনে করে? কিংবা, কিংবা আমি হয়তো ঠিক বোঝাতে পারছি না...” বলে খেই হারিয়ে ফেলল উপায়ন।

হৈমন্তী একটু ভেবে বলল, “সবটা তো জেনারেলাইজড হয় না স্যার। গরিব হলেই যে নিজেকে এক্সপ্লয়েটেড ভাবে, বড়লোককে ঠাকানোর সুযোগ খুঁজবে, তা নাও হতে পারে।”

উপায়ন এবার বলে, “আসলে আমার এক বান্ধবী, ছোটবেলা থেকে পরিচিত, একটি খুব মধ্যবিত্ত ছেলেকে ভালবেসে ফেলে। তার মনে হয়েছিল ছেলেটি অনেস্ট, নিরলোভ, পরোপকারী। অনেক চেষ্টা করেও ছেলেটার আসল চেহারা ধরতে পারেনি। আমি দেখা করলাম। স্ট্রিট বললাম, টাকাই যদি উদ্দেশ্য হয়, টাকা নাও, বিদেশ হও। একটা মেয়েকে আর ডিস্টার্ব করো না। ও মা! কী স্মার্ট অ্যান্ড শেমলেস ভেবে দেখুন, দু'লাখ টাকা চেয়ে নিল।”

অবাক হল হৈমন্তী। সত্যিই অদ্ভুত ঘটনা। কিন্তু কোনও মন্তব্য করল না। বুঝতে পারল, মধ্যবিত্তদের এখানে খুব ভাল চোখে দেখা হচ্ছে না। শুধু বুঝতে পারল না, তাকে এ গল্পটা শোনানো হল কেন।

এবার কথা ঘোরায় উপায়ন, “আচ্ছা ধরুন আপনি, আপনাকে কোনও রিচ ফ্যামিলির ছেলে ভালবাসল, আপনি কী করবেন?”

চোখে চোখ রাখে হৈমন্তী, “মানে আমিও তার টাকাপয়সার জন্যই তাকে ভালবাসব কি না জিজ্ঞেস করছেন? অপমানটা বড্ড সরাসরি হয়ে গেল না স্যার?”

সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে উপায়ন, “সরি সরি... আমি ও কথা বলতে চাইনি। তুমি, সরি আপনি কিছু মনে করো... মানে করবেন না।

আসলে ভুল ভাবে কথাটা বেরিয়ে গেছে... প্লিজ, প্লিজ ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ... প্লিজ। আসলে আজ আমারই একটু মাথার ঠিক নেই।”

আন্দাজ করতে পারে হৈমন্তী। খুব শান্ত গলায় বলে, “বুঝতে পারছি স্যার। তবে আমি তো আপনাকে বলেছি, প্রেম বা বিয়ের অপশনটা আমার জীবনে নেই। আমি সেই কথাই ছেলেটিকে বুঝিয়ে বলব। বড়লোক হলে তো এ সম্পর্ক আরওই সম্ভব নয়। কারণ, তাদের একটা সামাজিক মানমর্যাদা থাকবে। উল্টোদিকে আমার বাবার আমার বিয়ে দেওয়ারই ক্ষমতা নেই। আমি সামাজিক ভাবে কারও লজ্জার কারণ হতে চাই না স্যার।”

ফের চেয়ারে বসে পড়ে রুমাল দিয়ে চেপে চেপে কপালের ঘাম মোছে উপায়ন। জলে ডুবে যাওয়া মানুষের মতো করে বলে, “না, না, আপনি বুঝতে পারছেন না হৈমন্তী। কেউ আপনাকে ভালবাসে, সে যদি বড়লোক হয়, সেটাই কি আর দোষ?”

হৈমন্তী একই রকম ঠান্ডা গলায় বলে, “বড়লোক হওয়া কখনও দোষের নয় স্যার। গরিব হওয়া দোষের। চিরকালই তাই ছিল, আজও আছে। বিয়েটা শুধু দুটো মানুষের আবেগের ব্যাপার নয়। আবেগের জোয়ারের সুরে গেলে সেই বাস্তবের শানবাঁধানো ঘাটেই আমাদের দাঁড়াতে হয়। বিয়েতে, এমনকি প্রেমেও কিছুটা সামাজিক সমতা থাকা ভাল। না হলে সমস্যা হয়। অনেক কথা ওঠে। নানারকম লজ্জায় পড়তে হয়। ভালবাসার চাদরে সবটা ঢাকা পড়ে না স্যার।”

উপায়নের মুখটা কেমন যেন কাঁদো কাঁদো দেখায়। সে বলে, “আমি না, আপনাকে বোঝাতে পারছি না কিছুতেই। ইন ফ্যাক্ট আপনিও বুঝতে চাইছেন না। অথচ না বোঝার মতো বোকা কিন্তু আপনি নন।”

একটু চুপ করে থেকে হৈমন্তী বলে, “জীবন আমাকে বোকা হওয়ার অপশন দেয়নি। বোকা নই বলে বোধহয় এখনই বুঝতে চাইছি না স্যার। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আমার এখন কিছু শোনার বা বোঝার মতো পরিস্থিতি নেই। যদি কেউ অপেক্ষা করে, আমার পায়ের নীচের জমি শক্ত হওয়া পর্যন্ত, আমি তাকে কথা দিতে পারি, শুধু তারই সব কথা আমি শুনব, বুঝব। যদি অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য তার থাকে, তাকে কমিট করতে আমার কোনও আপত্তি নেই...” বলেই মাথা নিচু করে ফেলে হৈমন্তী।

কথাগুলো শুনে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে উপায়নের। তার মুগ্ধতা বাড়ে। এইটুকু মেয়ে, সব চাকরিতে ঢুকেছে, অথচ কী ঠান্ডা মাথা! কী সুন্দর গোছানো পরিপাটি বক্তব্য! সে ভারমুক্ত স্বরে বলে, “কালো মেয়ের পাশ দিয়ে রূপোলি রেখা দেখা যাচ্ছে বলছেন?”

হৈমন্তী মৃদু হেসে বলে, “আকাশে মেঘ নেই স্যার। কিন্তু এখন গভীর রাত। সূর্যের আলো দেখতে গেলে ভোর হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে।”

উপায়ন তার চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে হৈমন্তীর খুব কাছে দাঁড়ায়, গভীর গলায় বলে, “আমি জানি রাত যত গভীর হয়, সকাল তত কাছাকাছি আসে। আমি অপেক্ষা করব। আপনার যে-কোনও দরকারে আপনি আমাকে আপনার পাশে পাবেন। আসলে অনন্তবিষুর ইনসিডেন্টটায় মনের উপর খুব চাপ পড়েছে। মানুষের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তাই শুরুতে গোলমাল করে ফেলেছিলাম।”

অবাক হয়ে মুখ তোলে হৈমন্তী, “অনন্তবিষুর?”

“হ্যাঁ, ওই তো সেই চিট,” বলে উপায়ন, “ওর কথাই তো আপনাকে বললাম, আমার বান্ধবীকে ভালবাসার জালে ফাঁসিয়েছিল। তার পর টাকা অফার করতেই একেবারে দু'লাখ টাকা চেয়ে নিল...”

হৈমন্তীর মুখ রক্তশূন্য দেখায়, সে বলে, “অনন্তবিষুর ঘোষ? রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিটে থাকে?”

এবার আরও অবাক উপায়ন, “হ্যাঁ। আপনি চেনেন?”

হৈমন্তী খুব স্পষ্ট আর দৃঢ় গলায় বলে, “দেখুন স্যার। ও দু'লাখ টাকা নিয়েছে না দশ লাখ টাকা নিয়েছে আমি জানি না, কিন্তু যদি ভগবানও এসে বলেন যে ও চিট, তবু আমি বিশ্বাস করব না।”

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যায় উপায়ন। সে বুঝতে পারে না ঘটনাটা কী। আগে

জানলে সে অনন্তবিশ্বকে শহর ছাড়া হওয়ার শর্ত দিত না। বলত, ‘মশাই, এই যে আপনি লাইন দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মেয়েকে বশীকরণ করে ফেলছেন, এই বিদ্যোট্টা শিখিয়ে দিন শুধু।’

ঠিক সেই সময়ই একটা ফোন পায় ঢেকুর দাস।

“ঢেকুরবাবু, আমি লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি... পুস্পিতা রায়... মনে আছে তো?”

তটস্থ গলায় ঢেকুর দাস বলে, “হ্যাঁ ম্যাডাম। বলুন কী করতে হবে।”

“পাকা খবর আছে। পাখি এবার উড়বে। কাছাকাছি যত ট্রেনের টিকিট কাটার এজেন্ট আছে, নজর রাখবেন। যদি আপনাকেই সরাসরি টিকিট কাটতে বলে, কী করবেন?”

আত্মবিশ্বাসী ঢেকুর দাস বলে, “কিছুতেই কাটব না। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে খবর দিয়ে দেব।”

“নিজের বুদ্ধি খাটাবেন না ঢেকুরবাবু। যা বলছি মন দিয়ে শুনুন...”

আরও পাঁচ মিনিট ধরে ইতিকর্তব্য বুঝে নিয়ে ফোন রাখার অনুমতি পায় ঢেকুর দাস।

উড্ডয়ন পর্ব: অবশেষ ভাগ

শেষ অবধি আমার ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল হাওড়া স্টেশনের বাইরে। মৃদু মোলায়েম রোদে ভেসে যাচ্ছে চার দিক। আজ বড় সুন্দর একটা দিন।

ভাড়া মিটিয়ে, আমার ব্যাকপ্যাক আর কিটব্যাগ নামিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়ার পর বুঝলাম, মানিব্যাগে যেটুকু ওজন নিয়ে এসেছিলাম, তার বেশিটাই হালকা হয়ে গেল। প্রায় চারশো টাকা ভাড়া মিটিয়ে সঙ্গে যা রইল, ট্রেনে ঝালমুড়ির বেশি কিছু হবে বলে মনে হয় না।

আশা করি এতক্ষণে আমার পুরো ইতিবৃত্তান্ত পরিষ্কার করে দিয়েই রওনা হতে পারছি। কনকবাবুর বোনের বিয়ের প্রস্তাব এবং মিসেস করের শেষ বয়সের অবলম্বন হওয়ার প্রস্তাবে মন সায় দিচ্ছিল না। বুঝতে পারছিলাম, দুঃখী এবং সাহসী বিদিতার লেখালিখি যদি শুভজয়ের হাতে পড়ে, তা হলে বেচারির কপালে দুঃখ আছে। সব মিলিয়ে আমার দূরে চলে যাওয়াটাই নিরাপদ। কলকাতা ছাড়ার প্রয়োজন তীব্র হয়ে উঠেছিল। তার ওপর কফিনের শেষ পেরেক, উপায়নবাবুর থেকে টাকা নিলাম। সে টাকায় গোলাপিরা বাঁচল। টাকার ধর্মই এই। এতে কারও নাম লেখা থাকে না। যখন যার কাজে লাগে, তখন তার।

যত দূর খবর পেয়েছি, প্রোমোটোরের সঙ্গে লেখাপড়াও হয়ে গেছে গোলাপির মার। আমিও ‘ট্যাকা’ নিয়েছি বলে কলকাতা ছাড়ব। মরদকা বাত হাতি কা দাঁত। একটা কাজ হয়নি শুধু। অভদ্রীপের সঙ্গে গোলাপির আলাপ করিয়ে দেওয়া। সে আর কী করা যাবে! আমার পরে নাই ভুবনের ভার। নদী ঠিক তার পথ খুঁজে নিয়ে বয়ে যাবে।

শুধু একটা কথা বুঝতে পারি না। কুসুমিতা কি সত্যিই আমার প্রতি দুর্বল হয়েছিল? বড় ছেলেমানুষ, আন্তরিক, স্বতঃস্ফূর্ত। আমার মতো একটা তুচ্ছ এবং অযোগ্য মানুষের সঙ্গে সে অনেকটা সময় কাটিয়েছে, কত কথা বলেছে— সেই স্মৃতিটুকু আমার মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা সুন্দর স্বচ্ছল মেয়ের সঙ্গে আমাকে মানায় না। উপায়নবাবুর সঙ্গে বিয়ে হলে কুসুমিতা ভালই থাকবে। উপায়নবাবু বড় ভাল লোক। দয়ালু। দুটো গুণ দিয়ে চড় খাবড়া মারিয়ে আমাকে বিহারের ট্রেনে ছুড়ে ফেলে দিতে পারতেন। তা না করে কত টাকা দিলেন! আবার পত্রপাঠ বিদ্যে হতে না বলে, গুছিয়ে নেওয়ার সময়ও দিলেন। আমাকে সবাই লোভী, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক যা খুশি ভাবল বটে, কিন্তু একটা অসহায় পরিবার বেঁচে গেল। মোটের ওপর আফসোস নেই। তবু মনটা বড় ভার। চুরি করিনি, তবু চোরের মতো নিঃশব্দে পালিয়ে যেতে হচ্ছে, এটাই ট্রাজেডি। তার চেয়েও বেশি, সাড়ে-ট্রাজেডি হল, ফুলের মালা, বিজয় সংবর্ধনা, অশ্রু জলটল দিয়ে আমার বিদায় রচনা হবে, তেমন কোনও বড় কাজও যে ছাই করে উঠতে পারিনি।

মিসেস কর জানান আমি বেড়াতে যাচ্ছি। কয়েক দিন পর ফোনে

বলে দেব আর ফিরব না। সবার নম্বর আমার কাছে লেখা আছে। কিন্তু পুরনো সিমটা খুলে রেখেছি আমি। সুরেশের সঙ্গে কথা বলা আছে। ওখানে গিয়ে নতুন সিমের ব্যবস্থা করে দেবে আমাকে। তার পর পুরনো সিমটা ফেলে দেব।

সেই সাড়ে ছ’টায় বেরিয়েছিলাম। এখন আটটা বাজতে পাঁচ। কোন প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দিয়েছে দেখে নিতে হবে। ঢেকুর দাস সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, কেন যে বারণ করলাম! এখন কোন দিকে যাব, কোথায় খুঁজব! হাতে আর কুড়ি মিনিট। বুঝতে পারলাম কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হঠাৎ ঘোষণা শুনতে পেলাম পূর্বা এক্সপ্রেস দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। একজন কুলিকে জিজ্ঞেস করতে যাব দশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম কোথায়, পেছন থেকে একটা ভারী গলা বলে উঠল, “চলুন, ওখানেই সবাই আছে।”

পেছন ফিরে উপায়নবাবুকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, “ভালই হল, আমি যে কথার খেলাপ করছি না, আপনি নিজের চোখেই দেখতে পেলেন। কিন্তু ওখানে সবাই আছে, মানে?”

উপায়নবাবু উত্তর দিলেন না। তিনি আবার একা নন। সঙ্গে হৈমন্তী। উপায়নবাবুর সঙ্গে হৈমন্তীর কেমন যোগাযোগ? আমার চোখে প্রশ্ন দেখে উপায়নবাবু বললেন, “হৈমন্তী আর আমি একই অফিসে কাজ করি। অ্যাডোবন্ড, সেক্টর ফাইভ।”

নামটা মনে ছিল। কিন্তু হৈমন্তীর মাথা নিচু কেন? সে আমার দিকে সরাসরি তাকাচ্ছে না। আমার কাছে এসে বলল, “পারলে ক্ষমা করো দাদা। আমি তোমার কাছে আমার পরিচয় গোপন করেছি।”

পরিচয় গোপন? আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি হৈমন্তীর দিকে। সামান্য থেমে খুব জড়তার সঙ্গে হৈমন্তী বলে, “আমার বাবার নাম সুকান্তবিশ্ব ঘোষ।”

পলকে বুকের ভেতরটা কেমন খালি খালি লাগল। মাথাটা ঘুরে গেল কি? সকাল থেকে উত্তেজনায় কিছু খাওয়া হয়নি, বেরোনোর সময় দুটো বিস্কুট মোটে... এই নামটা আমাকে এত দিন পরে আবার শুনতে হল? আমি তো এ নামটা আর শুনতে চাইনি, বলতে চাইনি, ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। ভালবাসতে চাইনি, ঘেন্না করতেও চাইনি, শুধু নিজেকে আলাদা করে নিয়ে সরে যেতে চেয়েছিলাম। যে ভাবে সম্পূর্ণ গুটিভরা রেশম রেখে উড়ে যায় রেশম মথ। আমি কি হঠাৎ একটু টাল খেলাম?

একজোড়া শব্দ হাত আমাকে ধরে ফেলল, “তুই ঠিক আছিস ভাই?” শুভজয়! এ আপদও এখানে। কিন্তু এর চোখমুখ তো অন্য রকম।

কিছু হয়নি আমার। আমি ধাতস্থ আছি। মনে পড়ে যাচ্ছে মামার বাড়ি চলে আসার বছরখানেক পরের সেই অদ্ভুত সন্ধেটা। মামার বন্ধু দেবেনমামা নবপ্রাণ নার্সিং হোমে চাকরি করত। বাড়িতে এসে কথায় কথায় বলেছিল, একটু আগে উনি আমার বাবাকে নার্সিং হোমে দেখেছেন। বাবা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে ভর্তি করতে এসেছিল। ভদ্রমহিলা তখন প্রেগন্যান্ট। শুনে ম্লান হেসেছিল আমার মামা।

আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। পরের দিন জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা ছিল ইশকুলে। হাইড্রার জনন ছিল সিলেবাসে। পদ্ধতিটার নাম পুনরুৎপাদন বা রিজেনারেশন। হাইড্রার দেহ থেকে যে-অংশটাই বিচ্ছিন্ন হোক না কেন, তা থেকেই ফের নতুন এবং সম্পূর্ণ হাইড্রা তৈরি হয়। সেটার কথা মনে পড়ে গেছিল। আমাদের সংসার যেন হাইড্রার মতো। আমি আর মা খসে পড়ে গেলেও বাবা ঠিক আর একটা পূর্ণাঙ্গ সংসার তৈরি করে নিয়েছে। শুধু আমারই আর মা-বাবা পাওয়া হল না। সে দিন মনে হয়েছিল, মনুষ্যোত্তর প্রাণীর কষ্ট সব সময়ই কম, সব কষ্ট দুঃখ যন্ত্রণা মানুষের জন্যই বরাদ্দ। আর কখনও জানতে পারিনি তাদের খবর। প্রথম প্রথম মামাকে জিজ্ঞেস করতাম, “বাবার কোনও খবর পেলে মামা?” কিংবা “বাবা তোমার কাছে আমার খোঁজখবর করে না?” কেন জিজ্ঞেস করতাম, জানি না। রক্তের টান? কে জানে! শুধু বুঝেছিলাম, কোনও টানই একতরফা হয় না। উত্তরে মামা বলত, “সামনে তাকাও অস্ত্র। জীবনে দুঃখকষ্টের অভাব নেই। অযথা হৃদয় খুঁড়ে আরও বেদনা তুলে এনো না।”

বুঝে নিতাম, বাবা আমাকে ভুলে গেছে। আর আমার কোনও

খোঁজখবরই তিনি নেন না। সেই যে আমার সম্ভানসম্ভবা সৎ-মা, তাঁর কী হল, জানতে পারিনি কখনও। কখনও জানতে পারব কি না, সে ধারণাও ছিল না। তাই এক সঙ্গে অনেকটা পুরনো স্মৃতির ঝাঁপটায় মাথার ভেতরটা বেসামাল লাগছে। কারণ, ঘটনাচক্রে অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে, সুকান্তবিশ্ব ঘোষ আমার বাবার নাম।

হৈমন্তী মাথা নিচু করে বলে, “বাবার গত বছর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছিল। বাঁ দিকটা পড়ে গেছে। কোনও রকমে কথা বলতে পারে। শুধু তোমার আর তোমার মায়ের নাম করে কাঁদে। চোখের জল আর লালায় সারা দিন বালিশ বিছানা ভেজায়। আমরা বহুবার তোমাকে ডাকতে চেয়েছি। রাজি হননি। হিংস্র হয়ে উঠেছেন। ভাল হাতটা দিয়ে খাবার থালা জলের গ্লাস ফেলে দিয়েছেন। বলেছেন, ‘আমার ছেলে বাকি জীবনটা আমাকে ঘেঁষা করবে। আমার নামে খুঁত ফেলবে। এটাই আমার প্রায়শ্চিত্ত। আমার ছেলে যদি আমাকে এই অবস্থায় দেখে, যদি তার মনে করুণা হয়, তা হলে আমার নরকেও জায়গা হবে না।’ সেই কারণেই আমরা কখনও তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। বড় হয়ে সবটা শুনে আমার মনে হয়েছিল, যেখান থেকে এক দিন তোমাকে সরে যেতে হয়েছে, যেখানে তোমাকে ধরে রাখার কোনও চেষ্টা হয়নি, সেখানকার কথা জানিয়ে আর তোমাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। শুধু মনে হত, আমার একটা রক্তের সম্পর্কের দাদা আছে। সে এই শহরেই থাকে। তা হলে আমি কেন তার কাছে যেতে পারব না! মনে হয়েছিল, বাবার টাকায় নয়, নিজে উপার্জন করে তোমায় রাখি পরাব, ফোঁটা দেব। আমার মা তোমাদের সম্পর্কে সব জানত। তার কাছে থেকে সম্মান জেনেই তোমাকে খুঁজে বের করি। আমার তো কোনও দোষ নেই, তা হলে আমি কেন বঞ্চিত হব? তাই তোমাকে রাখি পরানোর পর, ভাইফোঁটা দেওয়ার পর মনটা তোলপাড় করে উঠেছিল। কিছুতেই কান্না সামলাতে পারিনি। তুমি ঠিকই ধরেছিলে দাদা, রমাপতি সরকার বলে আসলে কেউ নেই। বানানো নাম। ঠিকানা খোঁজার অছিলা।”

অসহ্য অব্যাহত একটা কষ্ট উঠে আসছে গলা বেয়ে। জল হয়ে নামছে দু’গাল বেয়ে। মায়ী, ভালবাসা কি আসলে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো? কখনও দূরে সরে গিয়ে ফেলে রাখে শুকনো বালি, কখনও আবার বাঁপিয়ে এসে ভাসিয়ে দেয় সবটা! কেন আমার এত কষ্ট হচ্ছে? কেন আমার পা দুটো এত ভারী লাগছে? আমি তো সব পিছুটান কাটিয়ে এসেছিলাম। তা হলে সমস্ত পিছুটান আমার সামনে এসে রাস্তা আটকাচ্ছে কেন?

চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, ‘আমি কিছু জানি না, জানতে চাই না। আমি তোমাদের কাউকে চিনি না... ঈশ্বরের দোহাই আমাকে যেতে দাও।’

অতঃ সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার। নিজেই জোর করে সামলে উঠে আমি বলি, “আমার ট্রেন ছেড়ে দেবে, আমাকে আর দেরি করিয়ে না তোমরা। তা ছাড়া উপায়নবাবকে আমি কথা দিয়েছি যে, এখান থেকে চলে যাব। উপায়নবাব, যা নিয়েছি, বাধ্য হয়ে নিয়েছি। তা না নিলেও আমি সব কিছু ছেড়ে চলে যেতাম। আপনাকে আমি আস্তে আস্তে ফিরিয়ে দেব সবটা, শুধু একটু সময় লাগবে। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।”

হঠাৎ একটা মেয়ের গলা, “আপনি দেবেন না, আমি দেব। আপনি আমাদের জন্যই তো নিয়েছেন টাকাটা, তাই না? শেষ অবধি সত্যিটা চেপে রাখতে পারেননি আশুকা।” উনি আমাদের সবটা বলে দিয়েছেন। উপায়নবাব, বিদ্যুৎসার ফ্রড জালিয়াত টিট চোর কিছুই নন। আমাদের আশ্রয়টুকু নিশ্চিত করতে তিনি নিজে বদনাম কুড়িয়ে আপনার থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা নিয়েছেন।”

তাকিয়ে দেখি গোলাপি! ও এখন এখানে কী করছে! সবাই এখানে কেন। কার্টেন কল হচ্ছে নাকি।

উপায়ন আশ্চর্য হয়ে বলে, “না, সাড়ে তিন লাখ তো নয়, উনি আমার থেকে দু’লাখ টাকা নিয়েছেন।”

গোলাপি বলে, “বাকি দেড় লাখ কোথা থেকে এল স্যর?”

বিরক্ত হয়ে বলি, “এত হিসেব আমি কাউকে দিতে যাব কেন? আমি কি কারও কাছে দাসখত লিখে দিয়েছি!”

গোলাপি বলে, “ওটা আপনার নিজের টাকা নয় তো স্যর?”

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। নিজেই সামলে নিয়ে খুব শান্ত গলায় বলি, “হ্যাঁ গোলাপি, ওটা আমারই টাকা। তিন বছর ধরে জমিয়েছিলাম। এখন আমি নতুন জায়গায় নতুন করে শুরু করতে চাই। শূন্য থেকে শুরু করতে চাই। অনেক টাকা পুঁজি নিয়ে শূন্য থেকে শুরু করা যায় না। সঞ্চিত অর্থ যে নিরাপত্তার অনুভূতি থাকে, তা মানুষের লড়াই করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তাই ওই টাকা তোমার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। তোমার প্রয়োজন না থাকলে অন্য কিছু ভাবতে হত। হয়েছে সবার সব কৈফিয়ত নেওয়া? নাকি এখনও কারও কিছু বলার আছে?” বক্তব্যের শেষ অংশটুকুতে বিরক্তি গোপন থাকে না আমার।

আটটা বেজে পাঁচ!

“হ্যাঁ, আমার একটা কথা ছিল ভাইটি, কৈফিয়ত নয়, সামান্যই কথা...” তাকিয়ে দেখি কনকবাবু, কাঁচুমাচু মুখে বলছেন, “আজ সকালে মন্দিরে গেছিলাম, মা বললেন, ‘ওকে যেতে দিস না। শহরে ভাল লোকের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। আর কমতে দিস না।’ তাই বলছি অনন্তভাই, না গেলেই কি নয়?”

প্রচণ্ড উদ্বেগের মধ্যেও হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। মা কালী ঠুকে এই সব বললেন! আমি বললাম, “তা কোথায় যাচ্ছি, সেটা আপনার মা বললেন না?”

কনকবাবু হাসলেন, “বললেন, ‘এক দিন ওর মা ওকে ফেলে চলে গেছিল। আজ ও আমাকে ফেলে বাপের ধামে ছুটছে।’ আমি অবাক হয়ে মা-কে জিজ্ঞেস করলাম, বাপের ধামটা কোথায়। মা হেসে বলল, ‘খুঁজে বের কর।’ তখনই আমার মনে হল যে-ট্যাক্সিটায় তোমাকে দেখলাম, সেটা হাওড়ার রাস্তায় গেল। তখনই আর-একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লাম। সকালের দিকটা প্যাসেঞ্জার রিফিউজালের ঝামেলা সে রকম থাকে না। ট্যাক্সিতে আসতে আসতে এই সময়কার ট্রেনের টাইমটেবিলটা মোবাইলে চেক করলাম। অনুমান হচ্ছে, তুমি বেনারস যাচ্ছ। পূর্বা এক্সপ্রেসে। তাই কি?”

কনকবাবুকে সাদাসিধে ভালমানুষ ভেবেছিলাম। এখন দেখছি লোকটা ধুরন্ধর! কনকবাবুকে কিছু বলতে যাব, হঠাৎ শুভজয়ের পাশ থেকে উঁকি মারল বিদিতা। স্নান বিষণ্ণ মুখ। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে। সে খুব নিচুস্বরে বলল, “বারবার এ ভাবে চলে যাবেন না। কত লোক কষ্ট পায়, আপনি কি জানেন!”

শুভজয় তার স্বীর হাত ধরে আছে। বলল, “আমি একটা চাকরি পেয়েছি রো। ভিডিও ব্লগিং আর করছি না। বিদিতা সুইসাইড করতে গেছিল। বহু কষ্টে ফিরিয়ে আনা গেছে। আমি ওর কাছে ক্ষমা চেয়েছি। আমরা আবার নতুন করে শুরু করেছি,” শুভজয়ের গলায় অনুতাপ।

কথা হতে হতে আমরা সকলেই এগোচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়ল মাথার উপর লেখা আছে প্ল্যাটফর্ম নম্বর দশ। প্ল্যাটফর্মে যে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, তার গায়ে পূর্বা এক্সপ্রেস লেখা। আমার হাতের ব্যাগটা টেনে ধরে কেউ বলল, “আসুন, আপনার কামরা একটু পিছন দিকে।”

ও বাবা! ঢেকুর দাস। কেউ বাকি নেই তা হলে!

নির্দিষ্ট কামরার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমি সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খেলাম। কামরার ঠিক সামনে... নাঃ! তার নাম গেস করার জন্য কোনও পুরস্কার নেই। ঢেকুর দাস গুনগুন করে বলল, “ইনি পুষ্টিতা ম্যাডাম, পুলিশের লোক। আপনার ওপর নজর ছিল অনেক দিন থেকেই।”

পুষ্টিতা ম্যাডামের সঙ্গে সঙ্গে ঢেকুর যে কনকবাবুকেও খবর দিয়েছে, সেই কারণেই যে আজ তিনি সকালে কালীবাড়ির সামনে পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, সে কথা আর ভাবল না ঢেকুর দাস।

আমি তো অবাক! কুসুমিতার নাম আবার পুষ্টিতা হল কবে থেকে! পেছন থেকে গোলাপি বলল, “হ্যাঁ ঠিক। এই পুষ্টিতাই একদিন কোটিংয়ের সামনে আমার সঙ্গে বিদ্যুৎসারের ব্যাপারে কথা বলেছিল।”

হঠাৎ ঢেকুর কাকে দেখে “আসুন ম্যাডাম, আসুন ম্যাডাম” বলে উঠল। মিসেস রজনী কর। তিনি উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, “কী ব্যাপার অনন্ত? ঢেকুর কী সব বলল! তুমি নাকি বরাবরের জন্য চলে যাচ্ছ?”

একবার জানানোর প্রয়োজনও মনে করলে না?”

এগিয়ে আসে কুসুমিতা। ঢেকুর, গোলাপি এবং মিসেস করকে সে বলে, “আমার নাম পুষ্পিতা রায় নয়। কুসুমিতা পালিত। আমি অনন্তবিষ্ণুর সম্বন্ধে বিশদে খোঁজখবর নেব বলে ছদ্মনাম নিয়ে তথ্যতল্লাশ করছি। অনন্তবিষ্ণুর কানে যাতে আমার নাম না পৌঁছয়, সেই কারণেই এই সাবধানতা।”

তার পর কুসুমিতা আমাকে বলে, “তোমার একটা কাজ কিন্তু আমি সেরে রেখেছি। অভ্রদীপের সঙ্গে গোলাপির আলাপ আমি করিয়ে দিয়েছি। গোলাপি বলেছিল, এখন ও যে সমস্যার মধ্যে আছে তাতে অন্য কোনও দিকে মন দিতে পারবে না। আমি বুঝিয়েছি, জীবন থেমে থাকে না। নদীর এক কূল ভাঙে, অন্য কূল গড়ে। আর কোনও দিকে মন দিতে হবে না ওকে। অভ্রদীপ ওর ভাল বন্ধু হতে চায়। এইটুকুই তো। আর একটা ছোট্ট ইনফর্মেশন। আমার আসল স্পাই ঢেকুর দাস নয়। সেটা এই অভ্রদীপ। কলেজস্ট্রিটের পটুয়াটোলা লেনে থাকে। আমার মামাতো দাদা। ও তোমাকে শ্যাডো করতে এসেই গোলাপির প্রেমে পড়ে যায়।”

গোলাপি লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলে।

কুসুমিতা বলে চলে, “যখন উপায়ন আমাকে বলে তুমি ওর থেকে দু’লাখ টাকা নিয়েছ, আমি খুব চমকে যাই। অভ্রদীপই তার পর আমাকে সবটা জানায়। আমি বুঝতে পারি যে, মানুষ চিনতে আমার ভুল হয়নি। আর আমি উপায়নের ফিয়সে নই। কখনও ছিলাম না। ও তোমাকে ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য ওই সব বলেছে। উপায়নের ভালবাসার মানুষ ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সে সম্পর্কে তোমার বোন হয়। আর-একটা কথা, তোমার ওপর নানা রকম খামখেয়ালি ফলিয়েছি, অনেক জ্বালিয়েছিও, সে কারণে এক্সট্রিমলি স্যরি— তুমি চলে যেয়ো না প্লিজ।”

গোলাপির নাকের পাটা ফোলে, “আপনি চলে গেলে আমরাও সব টাকা ফেরত দিয়ে দেব। দরকার নেই ফ্ল্যাটের।”

আটটা দশ বেজে গেল। আমি পা বাড়াই ট্রেনের দিকে।

উপায়নবাবু এগিয়ে এসে পথ আটকান, “আমি না বুঝে আপনার সঙ্গে প্রথম দিন খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি। পারলে আমায় ক্ষমা করে দেবেন। এখন তো আমরা সবাই জানি আপনি নিজের জন্য টাকা নেননি। তা হলে আর আপনার যাওয়ার কোনও কারণ থাকে না।”

কী করব? যাব না? ফিরে যাব? ট্রেন কি আমাকে ছাড়াই পাড়ি দেবে বেনারস?

পরক্ষণেই মনে হয়, ‘যাব যাব’ বলে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যাব না? সবার সঙ্গে মিলেমিশে যাব? কুসুমিতার হাত ধরে একটা হ্যাপি এন্ডিং হবে? তাতে বেশ একটা টুইস্ট হবে বটে, কিন্তু সেটা ঠিক হবে আদৌ? টুইস্ট গল্প-উপন্যাসে থাকে, পাঠকরা উপভোগও করেন। কিন্তু জীবন? তার তো পাঠক মনোরঞ্জনের কোনও দায় নেই!

তাই সবার সব কথার উত্তরেই আমি মৃদু হাসি। বোঝাই, কারও ওপর

আমার রাগ নেই, তোমরাও আমার ওপর রাগ রেখো না। তার বেশি কথা বলার সময় নেই। কথায় কথা বাড়লে আমার কাজ হবে না যে! বন্ধনসূত্র রেশমের হলেও মানুষকে বেঁধেই রাখে, শিকল সোনার হলেও তার ধর্ম বদলায় না।

আর মাত্র কয়েক মিনিট। আমি ধীর পায়ে ট্রেনের দিকে এগোই। মনে হয় যেন হাটু পর্যন্ত কাদাজল ভেঙে আমার এই এগোনো। তবু নিজেকে টেনে এগোই। সময় চলে যাচ্ছে। বুঝতে পারি, অপেক্ষমাণ মুখগুলোর উদ্বেগ বদলে যাচ্ছে বিস্ময়ে।

শুনতে পাই, গভীর অবিশ্বাসে কুসুমিতা বলে ওঠে, “অনন্ত! তুমি সত্যিই চলে যাবে?”

তার প্রশ্নটা কান্নার মতো শোনায়।

মনে মনে বলি, ‘এক জন উচ্চবিত্ত মহিলার পুণ্যপুত্ৰ কিংবা এক জন ধনী আইনজীবীর একমাত্র মেয়ের প্রেমিক হয়ে আরামে জীবন কাটিয়ে দেওয়া কি কারও লক্ষ্য হওয়া উচিত? আমার নিজের যোগ্যতা কতটুকু, সেটা জেনে নেব না? আমার কি কিছুই প্রমাণ করার নেই আর? কুসুমিতা, তোমাকে কোনও প্রতিশ্রুতি দেব না, তোমার থেকে কোনও প্রতিশ্রুতি নেবও না। আমি নিজেকে কষ্টিপাথরে ঘষে দেখতে বেরোচ্ছি, তার জন্য আর কেউ ধৈর্য, অপেক্ষা, আর অনিশ্চয়তার পরীক্ষায় বসবে কেন! এখনও পর্যন্ত আমি একটা হেরে যাওয়া মানুষ— দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর দোলাচল ছাড়া আমার আছেটাই-বা কী! এই সামান্য পুঁজি নিয়ে কী করে একটা মেয়েকে ভালবাসব? আমাকে যেতে হবে। উপার্জন করতে হবে। ঋণ শোধ করতে হবে। যোগ্য হতে হবে। তা হলেই তো ফিরে আসতে পারব। তখনও যদি তুমি আমার জন্য... যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে...’ আর ভাবতে পারি না আমি। চোখ জ্বালা করে ওঠে। গলার কাছে কী যেন আটকায়। দেখতে পাই ছটফটে, অশান্ত, আমাকে প্রতিমুহূর্তে জন্দ করা কুসুমিতা এই মুহূর্তে কী শান্ত হয়ে দেখছে আমায়। আমি ওর চোখে চোখ রাখতে পারি না। চোখ সরিয়ে নিই। ট্রেনের পাদানিতে পা রেখে ভেতরে রেখে দিই আমার ব্যাকপ্যাক আর কিটব্যাগ। ঘুরে তাকিয়ে হাত নাড়ি সকলকে। জোর করে হাসি ফোটাই মুখে। বলি, “আসছি!”

ট্রেন নড়ে ওঠে। আমি ভেতরে ঢুকে পড়ি। সিট খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না। জানলার ধারেই। হাওয়ার বাপটা আমার চোখ মুছিয়ে দিতে চেষ্টা করে। এখনই পারে না। তবে কখনও না কখনও পেরে যাবে হয়তো। সেখান থেকেই নতুন মোড় নেবে আমার গল্প। কিংবা শেষ হয়ে যাবে।

রেশমকীটের কোকুন-যাপন শেষ। বিলুপ্ত হয়েছে তার সঙ্কোচময় চলনের ক্ষণপদ। সে পেয়েছে দু’জোড়া ডানা। এবার আকাশে উড়ে যাবে সে। হাজার পিছুটানেও আর বাধা মানবে না।

অঙ্কন: কুনাল বর্মণ





রোদ্রাক্ষ/২০



ক্লান্তি আমার

কৌশিক সেন

অ্যাটর্নি সুমনা মিত্র সাধারণত একটু বেলা করে ওঠেন আজকাল। রিটারার করার পর থেকে সকালবেলায় উঠে অফিস যাবার পালা চুকেছে। এখন মনে হয়, এই সকালের ঘুমটুকুর থেকে আরামদায়ক আর কিছু নেই। আগে ওঁর রুটিন ছিল প্রতিদিন সকাল সাড়ে ছ'টায় উঠে সামান্য শরীরচর্চা, ততোধিক সামান্য ব্রেকফাস্ট এবং ঠিক আটটার মধ্যে অফিসে পৌঁছোনো। বস সময়মতো অফিসে না-গেলে সাবঅর্ডিনেটরা ফাঁকি মারবেই, এই আতঙ্কেই উনি ভুগতেন। যদিও ওঁর কর্মক্ষেত্র কলকাতায়, তাও যতদিন তিনি ছিলেন, ওঁর ডিপার্টমেন্ট চলত ঘড়ি ধরে, দস্তুরমতো সাহেবি কেতায়।

লন্ডনে তিন বছর থাকার সময়ে যে-অভ্যাসগুলো রপ্ত করেছিলেন তিনি, সেগুলোর চর্চা চালিয়ে গিয়েছেন আজীবন, তাই সুমনার শরীর-স্বাস্থ্য এখনও চমৎকার। রিটারার করার পর জীবনের বাকি বছরগুলোকে নিয়ে কী করা যায়, প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটাই। সংসার নামক বস্তুটা এতদিন পুরনো ন্যাতাকানির মতো গায়ে একটু-আধটু জড়িয়ে ছিল, কিন্তু ইদানীং সেগুলোও ধীরেসুধে উধাও। সুতরাং, সুমনা বোধহয় অবশেষে স্বাধীন হতে পেরেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা বড়ই অদ্ভুত দ্রব্য, পেটে সময় তো পিঠে সময় না। তা ছাড়া কবিরায়ি বাই বলুন, মেঘ-বাতাস কিংবা নদী-সমুদ্র, কেউ-ই তো সত্যি সত্যি স্বাধীন নয়। এই সংসারে কেউ স্বাধীন হতে পারে না। সবই আসলে অব্যাহা এক পুতুলনাচের ইতিকথা, বাঙালি উপন্যাসিক মানিকবাবু কীভাবে যেন সেটা টের পেয়ে গিয়েছিলেন। না, মানিকবাবু নোবেল পুরস্কার পাননি, জয়েস বা সার্জ-র মতো তাঁর নামে কোনও লিটারারি ক্যানন তৈরি হয়নি, ক্ষুধা ও অবহেলাতেই তাঁর জীবন শেষ হয়েছে। মাঝে-মাঝে সুমনার মনের মধ্যে অকারণেই কুয়াশার মতো সেই সব অ্যাবসার্ড চিন্তার স্রোত ভেসে যায় অথচ বাইরের দিক দিয়ে তিনি সর্বদাই যথাযথ এবং সামাজিক।

কেরিয়ারের শুরু থেকেই প্রথাগত আইন ব্যবসা সুমনার মনে ধরেনি। পাবলিক ডিফেন্ডার থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পাবলিক প্রসিকিউটর হয়ে ওঠার পথটি দীর্ঘ এবং অমসৃণ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সার্থক বলাই যায়। ইনভেস্টিগেটিভ লইয়ার হিসেবে পুলিশ মহলে গুঁর বিরাট সুনাম আছে। রিটারারমেন্ট নেওয়ার পর মাঝে-মাঝে কনসালটেন্টের কাজ এখনও তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে আইনি পরামর্শও দিয়ে থাকেন নিয়মিত। উড়ে যাওয়া বছরগুলোর সঙ্গে-সঙ্গে গুঁর স্মৃতির ঝুলিতেও গল্প জমা হয়েছে অনেক। হ্যাঁ, ওগুলো গল্পই, ওদের ‘অভিজ্ঞতা’ নাম দিয়ে শুধু শুধু ওজন বাড়ানোর প্রয়োজন তিনি খুঁজে পান না। একজনের অভিজ্ঞতা আর-একজনের কাছে পক্ষপাত, তাই এ-নিয়ে চর্চা করা অবাস্তব। তবুও নানা কারণে লোকে গুঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি খুলে দেখতে চায়, হয়তো সেখান থেকে নতুন দিশার খোঁজ মিলে যায় অকারণেই। তাই নানা বিতর্কে বোঝাই এইসব কানুনি তল্লাট থেকে গুঁর মুক্তি নেই। এই যেমন আজকে একটা গোলমেলে ফাইল দেখে দিতে ডেকেছেন ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অনন্যা মুখোপাধ্যায়, আইপিএস, যিনি আবার ঘটনাক্রমে সুমনার কলেজের জুনিয়র এবং বান্ধবী। ঐতিহাসিকভাবে পুরুষ-প্রশাসিত এলাকাগুলোয় মহিলাকর্মী হিসেবে সফল হয়ে ওঠার নানা অনুপস্থিতি নিয়ে ভালই আড্ডা জমে দু’জনের। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজ আসতেই হয়েছে এই পরিচিত অফিসের অলিন্দে।

বেরোবার আগে অভ্যেসমতো আয়নার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন সুমনা এবং সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠলেন যেন। আয়নার ছবিটা কেমন অন্যরকম লাগছে না? এতদিন ওখানে বাস করতেন এক ডিগনিফায়েড বয়স্ক, যাঁর চোখের মধ্যে বুদ্ধি আর আত্মবিশ্বাস, তারই সঙ্গে একটু ক্লান্তি মেশানো। তেকোনা মুখ, সামান্য উঁচু গালের হাড়, চামড়ায় এখনও ভাঁজ পড়েনি, পাতলা চোঁট আর দৃঢ় চোয়ালের মধ্যে ঋদ্ধি তো আছেই, তার আড়ালে উকি মারছে বিষণ্ণতা। আজকে আয়নার ছবিটা যেন অন্য কারওর, সে-সুমনার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে দিয়েছে। চোখের মণিতে একটা ছাই চাপা আঙনের আভাস, পাতলা চোঁটে যেন একটা হাসির ইঙ্গিত, ছোট ছোট করে কাঁটা চুলগুলো দেখে মনে হচ্ছে, একবার ঝাঁকুনি দিলেই অদৃশ্য সেই লম্বা বিনুনিটা এখনই গুঁর বুকোর অপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

একটা ছোট শ্বাস ফেলে গাড়ির চাবিটা থামচে ধরলেন সুমনা, যেন এটাই আপাতত বাস্তবতায় ফিরে আসার একমাত্র উপায়।

“কেমন আছ সুমনাদি? বলো, কেমন কাটছে অবসর? বাই দ্য ওয়ে, ইউ আর লুকিং ফ্যাবুলাস,” হই-হই করে দৌড়ে এসে অনন্যা গুঁকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আর কী।

“ভাল আছি রো। তোর খবর বল, আর হঠাৎ এই জরুরি তলব কেন সেটাও খুলে বল দেখি ঝটপট। আমি তো তাড়াহুড়ো করে এই মুম্বই থেকে

ফিরলাম, ওখানে একটা কনসাল্টেশন ছিল। তোর ফোন না-পেলে হয়তো ওখান থেকেই ক্যালিফোর্নিয়া যাওয়ার টিকিট কেটে ফেলতাম!”

“বাবা, এ দেখি পায়ের তলায় সর্ষে। রিটারার করে তোমার দর আরও বেড়েছে দেখছি। তা একলা একলাই ঘুরছ, নাকি এর মধ্যে কোনও নতুন গল্পো আছে?” অনন্যা যারপরনাই উত্তেজিত।

“আরে ধ্যাং! শখ করে কেউ এই বয়সে দৌড়োদৌড়ি করে নাকি? আসলে আমার ছেলে মণীশ তো ওখানে থাকে। মনে হচ্ছে ইদানীং বাবুর কিছু একটা হৃদযন্ত্রচিৎত দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই, ওই মেস্টাল সাপোর্ট দিতে যাওয়া আর কী।” সুমনা একটা প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন।

“এ তো আনন্দের খবর। তা মেয়েটার নাম কী বলো আর ছবি থাকলে দেখাও শিগগির!” অনন্যা যেন কড়াইতে ফেলা তেলেভাজার মতো ফুটছে।

“আরে ছাড় তো, গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল! মণি তো আমাকে রহস্যের চারমিনারে দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়েছে। সামান্যসামনি না-হলে নাকি কিছুই বলা সম্ভব নয়। তাই যেতেই হচ্ছে,” সুমনা হাসলেন, কিন্তু হাসির পিছনে এক চিলতে নার্ভাসনেস উকি মেরে গেল যেন।

“শোনো সুমনাদি, যাওয়ার আগে এই ফাইলটা একটু স্টাডি করে দেখো। ঘটনাটার সঙ্গে আমেরিকার যোগাযোগ আছে, যদিও এটা ঘটেছে কলকাতায়।

“কী ব্যাপার বল তো? তুই কি চাইছিস যে, আমি আমেরিকায় গিয়ে ক্রাইম ইনভেস্টিগেট করব?”

“আরে না না, ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন আদৌ নয়, তবে ট্রুথ ইনভেস্টিগেশন বলতে পারো। তা ছাড়া কেসটার সঙ্গে তোমার কিছু একটা যোগাযোগ আছে, তাই তোমাকে জ্বালাতন না-করে পারছি না,” অনন্যা রহস্যময় হাসি হাসল।

“আমার সঙ্গে যোগাযোগ!” এবারে সত্যিই অবাক হয়েছেন সুমনা।

“কিছুদিন আগে নিউটাউনের একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে এক বাঙালি ভদ্রলোকের ডেডবডি পাওয়া যায়। ফ্ল্যাটটা গুঁর নিজের নামেই কিন্তু খালি, বেশির ভাগ সময় তালা-মারা অবস্থায় পড়ে থাকে। লোকটির নাম রাজর্ষি সান্যাল। বয়স ষাট, বাঙালি হলেও আমেরিকান সিটিজেন, এয়ারপোর্টের হিসেব অনুযায়ী ঘটনার হুগুখানেক আগে একাই শহরে ল্যান্ড করেছিলেন। আমেরিকায় গুঁর পুরো সংসার আছে, তারা জানে তিনি অসুস্থ কাকিমাকে দেখতে কলকাতায় আসছেন। তুমি নির্ধাত খবরের কাগজ পড়ো না, না-হলে তোমার চোখে পড়ত।”

“আরে আমি তো কলকাতার বাইরে ছিলাম, ভুলে গেলি? তা ছাড়া সত্যি কাগজ খুব একটা পড়ি না,” সুমনা একটু অপ্রস্তুত গলায় বললেন।

“ও, তাও তো বটে। তারপর শোনো, অটপ্পিতে দেখা যায় ভদ্রলোকের পেটে একটা বিরাট টিউমর আছে, কিন্তু মৃত্যুটা তার জন্য হয়নি। মৃত্যুর কারণ, মাল্টিপল ওভারডোজ— ওপিয়েট, লোরাজ্জিপাম আর অ্যালকোহল। ভদ্রলোকের বাবা, মা মারা গিয়েছেন। একমাত্র বোন বেঙ্গলুরু-প্রবাসী, কলকাতায় আপনজন বলতে এক বৃদ্ধি কাকিমা, তারও মোটামুটি মাথার ঠিক নেই। গুঁর যে এরকম একটা সিরিয়াস অসুখ আছে, সেটা ফ্যামিলি বা বন্ধুবান্ধব কেউ ঘূণাঙ্করেও জানে না। সুতরাং, তারা একদম আকাশ থেকে পড়েছে। প্রশ্নটা হল এই যে, ভদ্রলোক সুইসাইড করতে এতদূরে এলেন কেন? ওষুধপত্রের সব সঙ্গেই ছিল, সেগুলো ওখানেই প্রেসক্রাইবড হয়েছে ফর ক্যানসার রিলেটেড পেন। ভদ্রলোকের ফোন আর ল্যাপটপে কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাই নিয়ে আলোচনা করতেই তোমাকে ডাকা, যদিও ভদ্রলোক ওগুলো নষ্ট করার বিলক্ষণ চেষ্টা করেছিলেন। ঘটনাটা যে-রাগ্রে ঘটেছিল, সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনটে ফোনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। প্রথম ফোনটায় তিনি গুঁর মুম্বই-প্রবাসী ভগ্নীপতিকে খুব শান্ত গলায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আত্মহত্যা করতে চলেছেন, বডি রিকভার করার জন্য কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যেন যোগাযোগ করা হয়। দ্বিতীয়টা গেছিল আমেরিকায় এক বান্ধবীর কাছে, যাতে সে গুঁর বাড়িতে খবরটা জানিয়ে দিতে পারে,” অনন্যা থামল।

“আর তৃতীয়টা?”

“শুনলে অবাক হবে। তৃতীয়া তোমাকে। কিন্তু ফোনটা তুমি ধরোনি। ভদ্রলোক কোনও মেসেজ রাখেননি কিংবা আবার ফোন করার চেষ্টাও করেননি।”

সুমনা চশমাটা খুলে টেবিলের ওপরে রাখলেন, এরপর ব্যাগ থেকে ফোনটা টেনে বের করলেন সাবধানে। আর কেউ হলে এইরকম বেমক্কা পরিস্থিতিতে অবশ্যই ঘাবড়ে যেত কিন্তু সুমনা তাঁর লম্বা কেরিয়ারে নানারকম উদ্ভট খবর হজম করে নিতে অভ্যস্ত, তাই খুব সহজে অবাক হবার পাত্রী নন তিনি।

“হ্যাঁ, একটা মিসড কল দেখা যাচ্ছে বটে, তুই যে-টাইমলাইন দিচ্ছিস, তার সঙ্গে মিলেও যায়। আমি হয়তো তখন ফ্লাইটে ছিলাম। কিংবা অচেনা নম্বর দেখে ধরিনি,” বুড়ো আঙুল দিয়ে স্ক্রোল করতে-করতে একজায়গায় এসে থেমে গেলেন সুমনা। বললেন, “দেখ তো এই নম্বরটা কিনা—”

“ইয়েস, এই নম্বরটাই। মিসড কল ফ্রম আ ক্যালিফোর্নিয়া বে এরিয়া নাম্বার,” অনন্যা বলল, “লক্ষ করে দেখো, ভদ্রলোক কিন্তু সরাসরি গুঁর বোন কিংবা বউকে ফোন করেননি। হি অ্যাভয়েডেড দি ইমোশন্যাল টারময়েল। তোমাকে ফোন করেছিলেন কিছু একটা বলার জন্য কিন্তু দেন হি ডিসাইডেড আগেস্ট ইট। মোদা কথা এই যে, অনুভূতির এলাকাগুলো থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চেয়েছিলেন, যাতে গুঁর আত্মহত্যার সিদ্ধান্তটি শেষ মুহূর্তে কঁচে না-যায়,” অনন্যা থামল।

“প্রথমে বল, এটা কি একটা ফর্মাল ইনভেস্টিগেশন? যদি তাই হয় তা হলে আমার স্টেশন লিভ করা উচিত নয়,” সুমনা প্রফেশনাল গলায় বললেন। গুঁর দুই ভ্রুর মাঝখানে একটা অস্বস্তিকর ভাঁজ বাসা বেঁধেছে, কী একটা কথা যেন মনে এসেও আসছে না।

“একেবারেই না, কেসটা সুইসাইড হিসেবেই ক্লোজড হয়েছে, শ্রাদ্ধশাস্তিও চুকে গেছে, কিন্তু আমার কৌতূহল মিটেছে না কিছুতেই। ভদ্রলোকের কাছে একটা পেনড্রাইভ পাওয়া গেছে, সেখানে তিনি নিজের জীবন নিয়ে লিখেছেন। লেখাটাকে ঠিক সুইসাইড নোট বলা যায় না, বরং অটোবায়োগ্রাফি বলা যেতে পারে। তোমাকে একটা সিকিয়ার্ড কপি পাঠিয়েছি। এই নাও পাসওয়ার্ড,” অনন্যা একটু হেসে এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল, “তোমার সঙ্গে কানেকশনটা ইম্পর্ট্যান্ট কিনা জানি না, কিন্তু ইন্টারেস্টিং। তুমি নিজেই পড়ে দেখো, তোমার শার্প মাইন্ড থেকে কোনও ক্লু পয়দা হয় কিনা। বাই দ্য ওয়ে, ভদ্রলোক কিন্তু লেখেন বেশ ভাল। অল ইন থার্ড পার্সন। তোমার ভাল লাগবে। তা ছাড়া এই স্বেচ্ছামৃত্যু ব্যাপারটাতেও তো তোমার ইন্টারেস্ট আছে, তাই না?”

“আমি প্যাসিভ ইউথানেশিয়া সাপোর্ট করি, সেই ব্যাপারে লিগাল অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি, কিন্তু তুই খুব ভাল করে জানিস যে, আমাদের দেশের আইনে অ্যাক্টিভ ইউথানেশিয়া বলে কিছু নেই, আছে শুধু সুইসাইড আর মার্ডার। ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্টেড সুইসাইড পরিষ্কারভাবে বেআইনি, সেক্ষেত্রে ডাক্তারের লাইসেন্স যাবে এবং জেল হবে,” সুমনার গলায় সামান্য বিরক্তির রেশ। ব্যক্তিগত আগ্রহের প্রসঙ্গটা তুলে আনা গুঁর পছন্দ হয়নি, এই নিয়ে মনের মধ্যে অস্বস্তির এলাকাগুলো রয়েছে, তিনি সেসব নিয়ে কথা বলতে চান না। একবার মনে হল, পরিষ্কার বলে দেন যে, এইসব আনঅফিশিয়াল কম্পিউটার ফরেনসিক গুঁর দ্বারা হবে না। কিন্তু গলার স্বরের ওই সামান্য পরিবর্তনটুকু বুঝে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে পিছু হটেছে অনন্যা।

“সুমনাদি, আবার বলছি, এই কেসটা সুইসাইড হিসাবে ক্লোজড হয়েছে। ফাউল প্লে-র কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। তা ছাড়া ডাক্তারের মতে, ভদ্রলোক খুব জোর হলে আর মাস তিনেক বাঁচতেন কেননা টিউমরটা গুঁর লিভার আর লাংস-এ ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ওই লেখাটা ভারী ফ্যাসিনেটিং জানো, অফ কোর্স অ্যাজ্জিমিং যে, ওটা বানিয়ে লেখা গল্প নয়। কনটেন্টটা আমাকে খুব ভাবিয়েছে, তোমাকেও ভাবাবে। নো প্রেশার অর অবলিগেশন, জাস্ট আ রিকোয়েস্ট যে, তুমি ওটা পড়ে দেখো, না-করে দিয়ো না।”

সুমনা বুঝতে পারলেন যে, গুঁর হাতের মধ্যে কাগজের টুকরোটা ঘামে ভিজে উঠছে, মনের মধ্যে শুরু হয়েছে এক বিচিত্র দ্বন্দ্বের খেলা।

বুদ্ধি বলছে, ওটা ফেরত দিয়ে দাও, ইনভলভড হয়ো না। কৌতূহল বলছে, দেখোই না ব্যাপারটা কী। এই সবে মধ্য চূপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর-এক বিচিত্র অনুভূতি যার দিকে তাকাতেও ভয় লাগছে এখন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায়, টাটকা লেবুর গন্ধ-মাখানো একগ্লাস জিন-টনিক নিয়ে বারান্দায় ল্যাপটপ নিয়ে বসে গেলেন সুমনা। সারাদিন গুমোট গরমের পর কোথা থেকে যেন একটা ঠান্ডা বাতাস বইছে। বাইশতলার ওপরে এই ছিমছাম অ্যাপার্টমেন্ট, পায়ের তলায় বিরাট একটা জোনাকির ঝাঁকের মতো ছড়িয়ে আছে শহর। এইখানে গুঁর ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতার রাজধানী। পাসওয়ার্ড টাইপ করার সঙ্গে-সঙ্গে গুঁর চোখের ওপর একটা বই খুলে গেল। টুকরো-টুকরো জানা-অজানা তথ্যেরা পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গেল। সুমনা বুঝতে পারলেন, ভুলে যাওয়া গল্পের স্রোতটা এবার বিস্মৃতির পাথর সরিয়ে উষ্ণ প্রসবণ হয়ে উঠে আসতে চাইছে।

রেললাইনের ধারে, ঘাট-বাঁধানো বিরাট এক নদীর কূলে, খুদে শহর ব্যারাকপুর, কিন্তু তার গায়ে ইতিহাসের দাগ লাগানো। সেই সব বিদ্রোহের শেষে, সেদিন সে এক শান্ত শহরতলি, সেখানে দুটো সামান্য জীবনের ভোরবেলায় প্রথম আলোর তুলি দিয়ে লিখে রাখা হয়েছে অদ্ভুত কিছু গল্প।

ব্যারাকপুরের রাজা

ব্যারাকপুরে, মামাবাড়ির ছাদে, জৈষ্ঠমাসের এক গভীর অমাবস্যার রাত্তিরে, রাজর্ষি গুর জীবনে প্রথমবার ছায়াপথ দেখেছিল। সেই সময়ে, গুমোট গরম থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাড়ির ছেলেরা সবাই একসঙ্গে ছাদের উপরে চাদর আর শতরঞ্চির বিছানা পেতে শোওয়ার ব্যবস্থা করত। সেই ১৯৬৮ সালে ব্যারাকপুর তখনও শান্ত মফসসল, স্টেশন থেকে একটু দূরে দশ নম্বর গেটের কাছে মামাবাড়ি অর্থাৎ, গুর নিজস্ব রূপকথার সেই পুরনো কেল্লা। সময়ের একটানা হামলা সামলাতে-সামলাতে, কেল্লাটা যেন কোনও জাদুকরের মন্ত্রে তখনও পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। সেই দুর্গের এক শয়নকক্ষে, জমাটবাঁধা একলা অন্ধকারের মধ্যে ও একদিন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছিল, পুরুষাঙ্গে এক অজানা অথচ মধুর অনুভূতি নিয়ে। পাশে ঘুমিয়ে থাকা রানিমা টের পাননি, ও একা একা অন্ধকার ঠেলে ছাদে উঠে গিয়েছিল। তখন রাত্রি দুই প্রহর, সব আলো নিভে গিয়েছে, মাথার ওপরে খোলা আকাশ। সেই নিকষ কালো পর্দার ওপরে গ্রহতারাদের অসীম ভুবন যেন একলা শুধু ওরই জেগে ওঠার অপেক্ষায়। সেখানে কালপুরুষ তার ধনুক উচিয়ে, অতিমানবিক এক অরণ্যে শিকার করে, সপ্তর্ষিমণ্ডল নিজেরা এক বিশাল প্রশ্চিহ্ন হয়েও দিশাহারা নাবিকদের জন্য ধ্রুবতারার সন্ধান এনে দেয়। রাজর্ষি দেখেছিল, সেই আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বহমান নদীর মতো এক ধবল কুয়াশার স্রোত, অথচ সে-কুয়াশা জ্যোতির্ময়। ওর জীবনের প্রথম স্মৃতিগুলোর মধ্যে জ্বলজ্বল করছে সেই অমাবস্যার রাত্তিরে একলা আবিষ্কার করা ছায়াপথ এবং সঙ্গে-সঙ্গে প্রথমবার শরীরে অনন্তের হাতছানি।

“বাবা, জানো, কাল রাত্তিরে আমি গ্যালাক্সি দেখেছিলাম। আমাদের গ্যালাক্সি যার নাম মিল্কিওয়ে,” আট বছরের রাজর্ষি গুর বাবার কাছে গিয়ে বলেছিল পরদিন সকালবেলায়।

“জানি। কাল রাত্তিরে খুব ভালভাবে দেখা গেছিল। আর মিল্কিওয়ের বাংলাটাও শিখে রাখো— আকাশগঙ্গা। এই আকাশগঙ্গায় এক ফোঁটা জলের মতো ভেসে আছে আমাদের গ্রহ। তাও, অতি ক্ষুদ্র এই আমরাই ওই বিরাটকে খুঁটিয়ে দেখার সাহস পাই, তাকে নিজের পছন্দমতো নাম দিই। কেমন করে এটা হয় বোলা তো?” কাগজের ওধার থেকে গভীর একটা গলা শোনা গেছিল, “কেননা আমাদের মনটাও আসলে ওই আকাশের মতো বিরাট, শুধু আমরা সেটা বুঝতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইন হয়তো পেরেছিলেন,” বাবা যেন নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

ওর সাহস হয়নি এ-নিয়ে আর কথা বাড়াবার। যে-কোনও সময়ে মানুষটা বলে উঠতে পারে, “এদিকে এসো, এই এডিটোরিয়ালটা আমার সামনে বসে পড়ো তো দেখি।” লাইন ধরে ধরে সংবাদপত্রের

এডিটোরিয়াল পড়া আর ওই গম্ভীর গলার মানুষটাকে বাংলায় তার মানে বুঝিয়ে বলা, এর চেয়ে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সারা জীবনেও আর খুঁজে পাবে না রাজর্ষি। পিএইচডি থিসিস ডিফেন্ড করা তার কাছে নগণ্য।

“অনুবাদ করতে হলে দুটো ভাষাকেই বেশ ভাল করে বুঝতে হয়। তাই আমি ট্রান্সলেশনের ওপরে এত জোর দিই। যদিও সেই যে-কথা আছে না, অনুবাদক মাত্রই প্রতারণক। আসল জিনিসটা সে নিজেই রেখে দেয়। তবু আমার মতে, ভাষা শেখার জন্য ট্রান্সলেশন করাটা জরুরি,” গম্ভীর গলাটা বেজে উঠত আবার।

রাজর্ষি মাথা নেড়ে জানাত যে, পরিষ্কার বুঝেছে। না-বুঝে অবশ্য উপায়ও নেই। বাংলা আর ইংরেজি শব্দগুলো যখন সেই সংবাদপত্র পড়তে-থাকা মানুষটার ভিতর থেকে অনর্গল উঠে আসত, তখন একসময় সব আইডিয়ার ঝাঁক মিলেমিশে ঠিক ছায়াপথের মতো এক উজ্জ্বল কুয়াশা। অনেক বছর বাদে বহু সাফল্য ও যন্ত্রণার সেতু পেরিয়ে আসা ঝানু টেকনোক্র্যাট রাজর্ষি সান্যাল একদিন টের পাবে যে, মহাশূন্যে আর-একটি অদ্ভুত অস্তিত্ব রয়েছে, যার নাম কৃষ্ণগহ্বর, সব আলো সেখানে এসে পথ হারায়। মানুষের মনও কি তেমন ছায়াপথ বেয়ে চলতে-চলতে একদিন না একদিন কৃষ্ণগহ্বরের অমোঘ আকর্ষণে সব কিছু হারিয়ে ফেলে? অবশ্য সেই অস্পষ্ট কৈশোরে এসব চিন্তাভাবনা ওকে বিবর্ত করেনি কেননা তখন সকালবেলায় খবরের কাগজের আড়ালে মোটা ফ্রেমের চশমা লাগানো, গম্ভীর গলার সেই মানুষটি ওর কাছে ছিলেন পুরোপুরি মৌলিক এবং অভ্রান্ত। এমন অলীক বিশ্বাস সঙ্গে করেই ও জীবনের প্রথম পনেরোটি বছর কাটিয়ে দেবে।

সেই পনেরো বছর ধরে ওর রূপকথার দেশের নাম ব্যারাকপুর, অর্থাৎ মামাবাড়ি। শিয়ালদহ থেকে চুপচাপ ব্যারাকপুর লোকালে চড়ে বসা তারপর উল্টোডাঙা, দমদম, বেলঘরিয়া, আগরপাড়া, সোদপুর, খড়দা, টিটাগড় এবং অবশেষে ব্যারাকপুর। স্টেশনের গা ঘেঁষে রাস্তা, রিকশা চাইলেই পাওয়া যায়। দশ নম্বর লেভেল ক্রসিং থেকে বাঁ দিকে গেলেই মামাবাড়ির সদর দরজা, সেই দরজা পেরিয়ে, একচিলতে গলি বেয়ে এগোলেই বিরাট উঠোন, থামওয়ালা বারান্দা আর বাগান। উঠোনের একদিকে কুয়োতলা, তার এপাশে-ওপাশে ছড়ানো পেয়ারাগাছ, শিউলিগাছ, জবাগাছ, আরও কত রকমের গাছ। বাঁ দিকে একটা ভাঙা দরজা পেরোলেই গোয়ালঘর। কিন্তু সেখানে আর গরু থাকে না, তার আশেপাশে তখন কচুন, কটিগাছ এবং নানা জাতের আগাছাদের অবাধ সহাবস্থান। সিঁড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দোতলা থেকে সমবেত উজ্জ্বল আর অভ্যর্থনার এক বিরাট হইচই বৃষ্টিধারার মতো ঝরে পড়বে—রাজা এসেছে, রাজা এসেছে!

রাজা, ছোটবেলায় মামাবাড়িতে ওর আদরের নাম। নামটাকে ও ধরে রাখতে পারেনি, যথাসময়ে সেই অলীক রাজবেশ ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়েছে। জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে এখন ও মোটামুটি নিশ্চিত যে, চতুর্দিকে ওরই মতো উলঙ্গ রাজারা ভ্রাম্যমাণ, তারা সকলেই যে-যার বিশ্বাসের রাজধানী থেকে চিরনির্বাসিত। ওসব নিয়ে মনখারাপ করাও ও বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছে। বরং ইদানীং, জীবনে এই প্রথমবার, ঠিক ষাট বছর বয়সের রাজর্ষি এখন মোটামুটি হালপ করে বলতে পারে যে, ওর কোথাও যাওয়ার নেই, কিছু করার নেই—

Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me
I'm not sleepy and there is no place I'm going to
Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me
In the jingle jangle morning I'll come followin' you
ব্যাক টু রিয়্যালিটি। গানের সুরটা মাথায় ভিতর মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই পকেটস্থ মোবাইলের একঘেয়ে এন্ডেলা এসে হাজির। রাজর্ষি একটু বিরক্ত হয়েই ফোনটা টেনে বার করেছিল কিন্তু পর্দার ওপরে ভেসে ওঠা ছবিটা দেখেই একচিলতে হাসি খেলে গেল ওর মুখের ওপর দিয়ে। বন্টিমোর থেকে আসা আজকের দিনে এক প্রত্যাশিত বার্তা। রথীর ফোন।
“হ্যালো রথী—”

“হ্যাপি বার্থডে, ওল্ড ম্যান। ভাবা যায়, দেখতে-দেখতে ষাট বছর নামিয়ে ফেললাম দু'জনে! মন বলছে, চলো পিছন দিকে হাঁটা লাগাই, এজ ইজ জাস্ট আ নান্সার, কিন্তু হতচ্ছাড়া হাঁটু কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।”

“ও, শুধু হাঁটুই সায় দিচ্ছে না, নাকি দাঁড়াতে গেলেও কষ্ট হচ্ছে আজকাল? ছেলেরা তো শুধু হাঁটুর ওপরেই দাঁড়ায় না,” রাজর্ষির গলায় হাসির বাষ্প।

“ধুর শালা! সকালসকাল দাগা দিচ্ছিস কেন রে? একলা একলা দাঁড়িয়ে থাকার থেকে শুয়ে থাকই ভাল। সবাই কি তোর মতো ভাগ্যবান? সেবার হাওয়াইতে তোরা দ্যাবা-দেবী যা আদিখ্যেতা করছিলি, যেন কলেজেই ফিরে গেছিস দু'জনে!”

ওদের আলোচনার মধ্যে আদিরস খুব নিরীহভাবে আসে কিন্তু ক্রমশই সেটা বিপজ্জনক এলাকায় পৌঁছে যায়। তখন শুনলে মনে হবে যেন দুই টিনএজার ছোকরা মহানন্দে ক্যান্টিন কাঁপাচ্ছে। রথীন গাঙ্গুলি আর রাজর্ষি সান্যাল সেই স্কুলজীবন থেকে সহপাঠী, কলেজে দু'জনেরই বিষয় কম্পিউটার সায়েন্স, দু'জনে কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোর হয়ে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিল প্রায় একসঙ্গেই, দু'জনেরই ঠাই হয়েছিল ওহায়ো প্রদেশের ক্লিভল্যান্ড শহরে। রাজর্ষির স্ত্রী শর্বরী ওদের দু'জনেরই কলেজ জীবনের বান্ধবী, খুব হুঁশিয়ার মেয়ে, সুন্দরী বলেও নামডাক ছিল এবং সেহেতু ওদের দু'জনকেই সে ল্যাজে খেলাত। গ্রিন কার্ড হাতে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই রাজর্ষির সঙ্গে ওর সম্পর্ক পাকা, তার বছর খানেকের মধ্যেই বালিগঞ্জে ওদের বাড়িতে বিয়ের বাদি। যেহেতু তখনও ওরা হরিহর-আত্মা এবং একযাত্রায় পৃথক ফল বরদাস্ত করার প্রশ্নই ওঠে না, তাই রথীনও বাটপট বিয়ে করে ফেলল, পরমাকে। ওদের যোগাযোগ ঠিক কীভাবে হয়েছিল, ভালবেসে নাকি সম্বন্ধ করে, সে-তথ্যটি কারওরই ঠিক জানা নেই। মোটকথা, বিয়ের পরে ওরা একই এলাকায় ডেরা বাঁধল, ছেলেমেয়েরা গেল একই স্কুলে। রথীন আর পরমার একটিই সন্তান, অঞ্জুমান, যার ডাকনাম অস্তু। রাজর্ষি আর শর্বরীর দুই ছেলেমেয়ে— রণদেব অর্থাৎ রুণু আর মন্দিরা ওরফে দিরা। ওদের সাতটিকে তখন হামেশাই একসঙ্গে দেখা যেত। সপ্তাহান্তে পুরনো গাড়ি আর সস্তা মোটেল ভরসা করে এলাকা চষে বেড়াত ওরা। সেই আশির দশকের শেষদিকে আন্তর্জাল যুগের ভোরবেলায়, উত্তর আমেরিকার নীল আকাশ আর সবুজ দিগন্ত ওদের ডাক দিয়েছিল সম্ভাবনার এক নতুন ছায়াপথে। কৃষ্ণগহ্বর তখন ছিল অনেক আলোকবর্ষ দূরে।

আলাপ শেষ হয়ে যাবার পরেও ফোনের পর্দার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রাজর্ষি, ওর মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল, সন্ধ্যার আকাশে লাল আলো যেমন একটু একটু করে মিলিয়ে যায়। ওর স্ক্রিনসেভারে মেরুজ্যোতি কাঁপতে লাগল নীরব বিষণ্ণতায়। ওর মনে পড়ে গেল, আইসল্যান্ডের রেকিয়াভিক শহরে ওরা দুই বন্ধু মিলে অক্টোবর মাসের হাড়কাঁপানো ঠান্ডায়, সশরীরে সেই আশ্চর্য আকাশের তলায় বসেছিল। বিরাট গম্ভীর এক পাইনবনের প্রেক্ষাপটে সেই নীলাভ সবুজ আলোর বন্যা দেখে মনে হয়েছিল, এ যেন ঈশ্বরের বাগানে হোলিখেলা। কিন্তু সে-দেখাও তো টুরিস্টের দেখা, যেমন নাকি তাজমহল, পিরামিড, ল্যুভর, অ্যাক্রোপোলিস, মাচু-পিকচু। পৃথিবী ঘুরে আসা রাজর্ষির অসহ্য ইচ্ছে হল, এফুনি এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ব্যারাকপুরের দিকে রওনা হয়, যদিও ইদানীং ওই চতুরেও সব কিছু বদলে গিয়েছে, আকাশ দখল করে বসেছে অতি পরিচিত এক শহুরে ধোঁয়াশা। সেই ধোঁয়াশার বিপুল অবয়বের অতলে ওর পুরনো ছায়াপথের তারার দল ইতিমধ্যেই বেমানান উধাও হয়েছে, যেমন নাকি অ্যামিবার আলিঙ্গনে হারিয়ে যাওয়া খুদে খুদে সব ব্যাকটেরিয়া। রাজর্ষি ভাবল, অ্যারিজোনার মরুভূমিতে চলে গেলে এখনও হয়তো সেই পরিষ্কার আকাশের হৃদিশ পাওয়া যাবে কিন্তু সেখানে মামাবাড়ির ছাদটা তো মিলবে না।

পরের ফোনটা কে করতে পারে, রুণু না দিরা? শর্বরী তো ঘুম থেকে উঠেই উইশ করেছে, ছোট্ট একটা চুমু দিতেও ভোলেনি। তারপর থেকে সারা সকাল ধরেই টুংটাং করে মেসেজ এসেই চলেছে। এক শেয়াল ডাকলে সব শেয়ালরা যেমন রা তোলে, ঠিক তেমনই একজন মেসেজ

করলেই দেখাদেখি সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এতগুলো রেডিমেড অভিনন্দন এসে হাজির হয় যে, একসঙ্গে ছাপালে সঞ্চয়িতা হয়ে যাবে! রাজর্ষি আর শবরীর ভাটুয়াল বন্ধুবলয় পৃথিবী ছাড়িয়ে হয়তো মঙ্গলগ্রহে পৌঁছে গিয়েছে এতদিনে।

রুণু, দিরা আর অস্ত্র, ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠছিল তিনজনায়। নতুন দেশের নতুন পাঠশালায় ওদেরকে সবার সেরা করে তোলার জন্য লড়াই চালু হয়ে গিয়েছিল পুরোদমে। নাচ, গান, ডিবেট, সায়েন্স প্রজেক্ট ইত্যাদির সঙ্গে যোগ হয়েছিল, টেনিস, সাঁতার, কারাটে এবং সপ্তাহ শেষ হলে রবিবার বাংলা স্কুল। এই সব করতে-করতে কবে যেন একদিন টুক ফুরিয়ে গেল ছেলেমেয়েগুলোর কৈশোর, ওরা পা ফেলল প্রথম যৌবনের নিঃসীম বিপন্নতায়। ওদিকে ওই একই সময় জুড়ে ফাটা তবলা আর বেসুরো হারমোনিয়ামের মতো অযত্নে এক কোণে পড়ে থেকের ছিল ওদের বাবা-মায়ের শেষ যৌবন। একদিন সকালে উঠে বাবা-মায়েরা দেখতে পেল যে, তাদের সন্তানরা দেশের তিন প্রান্তে বসে আছে, এ-বাড়িতে ওদের ঘরগুলো সব পরিত্যক্ত জমি। কে প্রথম দূরে সরেছিল, কার মনে বিধেছিল উপেক্ষার কাটা, কোথায় পুরনো কাগজের গাদার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল জীবনের প্রথম প্রেমপত্র, সেসব গল্প আজ অবাস্তব, অলীক বললেও হয়। মূল কথা, একসময় যা অসম্ভব মনে হয়েছিল তাকে অতি অনায়াসে সম্ভব করে তুলল বাস্তবতার ফাঁদ, উত্তরণের অব্যবহাসনা। ওরা কি ভাবতে পেরেছিল যে, ওদের রাজপুত্র রাজকন্যারা একদিন তাদের শৈশবে শেখানো মহান রূপকথাবাদের উপহাস করে চলে যাবে এ-যুগের অতুল স্বেচ্ছাচারিতার আকর্ষণে? চোখের সামনে একের পরে এক অঘটন ঘটে গেল, ওরা বসে রইল অনিচ্ছুক দর্শকের ভূমিকায়।

দিন গড়াচ্ছে বিকেলের দিকে, এখন ওর ফোন বন্ধ, সবাইকে থ্যাঙ্ক ইউ মেসেজ পাঠানোও শেষ। ঘড়িতে পাঁচটা, এমন সময় বাড়ির দিকে রওনা হবার আগে প্রায় রোজই ও স্টারবাকসের দোকানে একবার থামে, এক কাপ কাপুচিনো তুলে নেয়। তারপর বাড়ি ফেরা, সন্ধ্যায় কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ডিনারে যাওয়া, ইত্যাদি সব প্রোগ্রাম আছে, প্রতি বছর যেরকমটা হয়। ইতিমধ্যে ব্যাখাটাও ফিরে আসছে অসহ্য থেকে অসহ্যতর হয়ে। কেউ যেন একটা ভেঁটা ছুরি পেটের মধ্যে দিয়ে পিঠের দিকে ঠেলে দিচ্ছে একটানা নির্মম উদাসীনতায়। পকেট থেকে ওষুধের কৌটো বার করে একসঙ্গে দুটো ট্যাবলেট গিলে ফেলল রাজর্ষি। অন্ততপক্ষে আজ সন্ধ্যাবেলার জন্য ঠিকঠাক থাকতেই হবে, যে-করে হোক।

প্রান্তন রাজার রাজপাট

“ঠিক বলছিস তো? ও একেবারে কিছু টের পায়নি? চাপা গলায় প্রশ্নটা ভেসে এল শবরীর মোবাইলে। বন্টিমোর থেকে পরমা ফোন করেছে।

“দুপুরবেলা পর্যন্ত মনে তো হল টের পায়নি। বাচ্চাদের পইপই করে বলেছি, জাস্ট উইশ করে ফোন ছেড়ে দিবি, একদম বকবক করবি না,” শবরীও ফিসফিস করে কথা বলছে, যদিও ঘরে কেউ নেই, ভাবখানা যেন দুই বান্ধবীর মধ্যে ষড়যন্ত্র চলছে বেশ একটা।

“আমার তো ভয় ছিল রখীকে নিয়ে। ও যা পেট পাতলা, গল্পে মশগুল হয়ে বন্ধুর কাছে সব উগরে দেবে। ভাগ্য ভাল, এখন অফিস টাইম, দু’জনেই ব্যস্ত। সন্ধ্যায় কয়েক পেগ পেটে পড়ার পর কথা হলেই আমাদের সব প্ল্যান মাটি হত। আচ্ছা, বাকি সবাই কে কোথায় আছে বল?” পরমা উৎসুক।

“দিরা আর রুণু এসে গেছে, ওরা অ্যাজ ইউজুয়াল যে যার পুরনো কামরা দখল করেছে। আর আমাদের জামাই সৃজন যথারীতি কাজে আটকে গেছে, আসতে পারছে না,” বলতে-বলতে শবরীর গলাটা কঁপে গেল একটু।

“ঠিক আছে রাখছি। সব প্ল্যানমতো চলছে তা হলে। গুড লাক।”

সৃজন, অর্থাৎ উস্তর সৃজন চৌধুরী, ওদের জামাই, যার কাজের

জায়গা এখন থেকে কয়েক হাজার মাইল উত্তর পশ্চিমে সিয়াটল শহরে। সৃজন একজন সার্জিক্যাল অস্কেলজিস্ট, মানবদেহের গভীর গোপনে অক্টোপাসের মতো জটিল সব টিউমর কেটে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় ওর সারাদিন কাটে। ওর রোজগার বছরে মিলিয়ন ডলার ঝুঁকুঁই অর্থাৎ মধ্যযুগের কোনও প্রিন্স অথবা ব্যারনের থেকে বহুগুণে বেশি। সমস্যা একটাই যে, ক্রীতদাস, সার্ব কিংবা শূদ্রজাতির কেউ এই তল্লাটে হাজির নেই, তাই প্রত্যেকেরই কমবেশি খেটে খাওয়া আবশ্যিক। এই একটা সামান্য ঝামেলার ফলে দিনের শেষে মধ্যযুগীয়রা ওদের গো-হারান হারিয়ে দিয়েছেন। বাইরে থেকে অবশ্য সবই শোভনসুন্দর, ওদের শোওয়ার ঘরের ব্যালকনি থেকে দেখা যায় প্রশান্ত মহাসাগর, সেখানে সাদা-সবুজ-নীল ঢেউদের অবিরাম মছন, সিঙ্কাসরসদের ডানায় রোদ্দুরের ঝিলিক, তিমি আর ডলফিনদের কদাচিৎ অপূর্ব প্রদর্শনী। দর্শকের আসনে প্রায়ই কেউ থাকে না, কেননা একইসঙ্গে বাবু এবং গোলাম হওয়ার চক্রে ফেঁসে গিয়ে ওদের জীবনে সময় নামক বস্তুটি ক্রমশই দুর্লভ হয়ে উঠেছে। এই সমস্যার ভিতরে প্রবেশ করতে হলে মন্দিরা ওরফে দিরা নামক মেয়েটিকে প্রথমেই ভাল করে চিনে নেওয়া দরকার।

রাজর্ষি আর শবরীর এই দ্বিতীয় সন্তানটি ছোটবেলা থেকেই অন্যরকম। প্রায় পিঠোপিঠি দুই ভাইবোনের ছোটবেলা কেটেছে মাতৃতন্ত্রে, সকলের থেকে ভাল হওয়ার সাধনায়। পড়াশোনার প্রবল চাপ তো বটেই, তার ওপরে একদিকে নাচ, গান, টেনিস, ডিবেট আর অন্যদিকে বিজ্ঞান, অঙ্ক, বানান ইত্যাদি পঁয়তাল্লিশ রকমের প্রতিযোগিতায় সামিল করে দেওয়া হয়েছিল ওদের। এই নিয়েই শবরীর দিনরাত কাটত, সোম থেকে শুক্রবার ওর মেরুন রঙের মিনিভ্যানটাকে দেখা যেত, অধীর ব্যস্ততায় স্কুলের দরজা থেকে ছুটে চলেছে নানা অ্যাক্টিভিটির এলাকায়, পিছনের সিটে আধা ঘুমন্ত ভাইবোনকে নিয়ে। উইকএন্ডেও রেহাই নেই, তখন রয়েছে ভরতনাট্যম কিংবা সেতারের ক্লাস, মন্দির অথবা বেদান্ত সেন্টারের লেকচার, বাংলা স্কুল এবং নানা কিসিমের প্রাইভেট কোচিং। শেষ পাতে সন্ধ্যাবেলায় মাসি-মোসাদের বাড়িতে পাঠ।

প্রবাসী ভারতীয়দের এই আজব কারখানা থেকে অনেক রখী-মহারখী পয়দা হয়েছে, সুতরাং ছেলেমেয়ে মানুষ করার এই পদ্ধতিটি সঠিক কিনা, সেই তর্কে না-যাওয়াই ভাল। আমরা শুধু এইটুকু জানাতে পারি যে, চাপ হজম করার ক্ষমতা সকলের সমান নয়, কেউ ঢেউয়ের মাথায় গা-ভাসিয়ে এগিয়ে যায়, কেউ হাবুডুবু খেয়ে মরে, কিন্তু সচরাচর বাচ্চারা হাইস্কুল পেরোবার আগে বিদ্রোহ ঘোষণা করার সাহস পায় না। সেই কমসংখ্যক বাচ্চাদের মধ্যে একজন হচ্ছে আমাদের দিরা। ক্লাস টেনে উঠেই ও পরিষ্কার বলে দিয়েছিল যে, ওর পছন্দের বিষয় অভিনয় এবং মডেলিং, তার বাইরে পাশ করার জন্য যেটুকু দরকার তার চেয়ে বেশি এক মিনিট সময় নষ্ট করতেও ও রাজি নয়। এ-ব্যাপারে অত্যধিক চাপ দিলে ও স্কুলের কাউন্সেলরকে জানাতে বাধ্য হবে। তারপর থেকেই ও হাতের বাইরে।

এইভাবে, লেখাপড়ার সঙ্গে যথাসম্ভব কম সম্পর্ক রেখেই ও গ্র্যাজুয়েশন করল পারফর্মিং আর্টসে, তারপর পুরোদমে শুরু করে দিল মডেলিং। স্বাভাবিকভাবেই ও সুশীল মেয়ে, তার ওপরে ভরা যৌবন, পেশাদারী রূপচর্চা আর সাহসী পোশাকের গ্রাহস্পর্শ যোগ মিলে বাঙালি সমাজে রীতিমতো ঝড় তুলে ফেলেছিল মেয়েটা। রাজর্ষি মেয়ের সঙ্গে কথা বলা দূরে থাকুক, মেয়ের দিকে তাকানোই বন্ধ করে দিয়েছিল মোটামুটি। একাধিক প্রেমের ফুল ফুটল এবং ঝরে গেল, টিকে থাকল সৃজন। ব্রিলিয়ান্ট, কিন্তু নরম স্বভাবের ছেলেটি ডাক্তারসুলভ নির্লিপ্ততার আড়ালে ওর নার্ভাস ভালবাসা লুকিয়ে রাখত, ওর কাছে সব রকম যুদ্ধজয় এবং তার পড়ে অবধারিত ভগ্নহৃদয়ের গল্প বলত মন্দিরা। একদিন ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল ওদের, সমাজ তখন প্রশংসায় শতমুখ। রাজর্ষিকে সেই সময় বুক খুলে হাসতে দেখা গিয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু দু’বছর কাটতে-না-কাটতে ওরা আবার যে-তিমিরে,



সেই তিমিরেই। কোনও এক অবোধা যুক্তির উপর ভরসা করে রাজর্ষি আর সৃজন দু'জনেই ধরে নিয়েছিল যে, বিয়ের পরে দিয়ার পাগলামি সেরে যাবে, ও মন দিয়ে ঘর-সংসার করবে, ঈশ্বরের বাগান থেকে শিশুদের নিয়ে আসবে এই পরিত্যক্ত পৃথিবীতে, অবুঝ আশার মশাল জ্বালিয়ে। সেসব কিছুই হল না, মন্দিরা বিয়ের পরেও দিনরাত ওর মডেলিং কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল, একটা ছোট সিরিয়ালে কাজ করল কিছুদিনের জন্য। কিন্তু সংসার বলতে আমরা যা বুঝি সেখানে ওর মন বসল না কিছুতেই। কেরিয়ারের এই সময়টায় নাকি কুটো আঁকড়ে নদী পার হতে হয়, টিলে দিলেই সর্বনাশ। দু'জনেই কাজ থেকে ফিরে ফাঁকা বাড়ি দেখতে-দেখতে হাঁপিয়ে উঠল, আজ এ থাকলে ও নেই কাল, ও থাকলে এ উধাও। সৃজন আরও বেশি সময় দিতে শুরু করল হাসপাতালে আর রিসার্চ প্রজেক্টে, ওদিকে দিয়ার কাজে প্রত্যাশিত সাফল্যের দেখা পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত দিরা যখন পেছনে ফেরার চেষ্টা করল, সৃজন ততদিনে পুরোপুরি প্রতিকূল এবং উদাসীন। গোলমাল লাগতে শুরু করল, তারপর একদিন জমাট বাঁধা অভিমান আর হতাশা থেকে উঠে আসা একগাদা সুতীক্ষ্ণ কথার বল্লমে পরস্পরকে গোঁথে ফেলল ওরা। সেই থেকে ওরা আলাদা এবং ঘোরতর অসুখী কিন্তু তাই বলে হার মানতে কেউ রাজি নয়।

মন্দিরার সঙ্গে তুলনা করলে ওদের প্রথম সন্তান রণদেব ওরফে রুণু অনেক দিক থেকেই আদর্শ। স্কুল থেকে কলেজে, একের পরে এক পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতা ও প্রবল দাপটের সঙ্গে উতরে গিয়েছে। এই যুগে ছেলেমেয়ে মানুষ করার পথে প্রধান সমস্যা যে বয়ঃসন্ধির তুমুল স্বেচ্ছাচার, সে ব্যাপারেও অদ্ভুত নির্লিপ্ত ছিল ছেলেটা। হাইস্কুলে ওর কোনও গার্লফ্রেন্ড হয়নি, কলেজে থাকাকালীন ও ডর্মিটরির বদলে বাড়িতে থাকতেই বেশি পছন্দ করত। যথাসময়ে দারুণ রেজাল্ট নিয়ে ও গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেল, মাস্টার্স করল, দারুণ একটা চাকরিও পেয়ে গেল কিন্তু ঠিক সেই সময় থেকেই অন্যরকম এক রহস্য ঘনাতে শুরু করল ওর চারপাশে। সে এমনই রহস্য যে, বাঙালি সমাজের কথোপকথনে তাকে ঝপ করে টেনে আনা অসম্ভব, যদিও তার অস্তিত্ব সকলেরই জানা— রাজর্ষি আর শর্বরীর ছেলে ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র রণদেব সান্যাল গে অর্থাৎ, সমকামী। এবং তার একজন বাঙালি পুরুষবন্ধু আছে।

এই সব মিলিয়ে আজকের এই কিনারায় দাঁড়িয়ে ওদের সাংসারিক জীবন যে বিরাট এক প্রশ্নচিহ্ন, শর্বরী সেটা ভাল করেই জানে এবং জেনেশুনেও সে অসহায়। মানবসমাজের ইতিহাসে অনেকদিন যাবৎ একটা সাধারণ নিয়ম চালু ছিল, যেখানে বিপন্নতার সামনাসামনি হলে পরিবার পরিজন, বন্ধু কিংবা সঙ্গীর কাছে মনের কথা খুলে বলা যেত অনায়াসে। আজকের এই ভূনায়িত, ইন্টারনেটের মন্ত্রজালে বাঁধা সুশীলসমাজে ব্যক্তিমানুষ কেবলমাত্র যে যার থেরাপিস্টের সঙ্গেই নিরাপদে কথা বলতে পারে। থেরাপিস্ট অর্থাৎ নাকি মনোবিদ, সে তোমার মনের খবর রাখে। তার কাছ থেকে নগদের বিনিময়ে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধু আর সহৃদয়তা কিনতে হয় তোমাকে। এই থেরাপিস্ট নামধারী প্রজাতিটির জন্ম কবে হয়েছে, কেন হয়েছে শর্বরী তাই নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ পায়নি কিন্তু গোড়া থেকেই পুরো গল্পটা ওর কাছে অস্বাভাবিক ঠেকেছে। অনেকে অবশ্য এ-ব্যাপারে ওর সঙ্গে একমত নয়, ওদের সম্ভবত যার যার নিজের থেরাপিস্ট আছে। রাজর্ষির সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলার সময় নেই, ইচ্ছেটাও আস্তে-আস্তে মরে গিয়েছে। রুণু তার নিজের জগতে থাকে, তার সঙ্গে হস্তার পর হস্তা সামান্য যোগাযোগটুকুও নেই। এক মন্দিরাই নিয়মিত ফোন করে কিন্তু শর্বরী জানে যে, ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে অনভিপ্রেত চর্চা হলে ও সঙ্গে সঙ্গে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দেবে। নিকট অতীতে এইরকম কাণ্ড বেশ কয়েকবার হয়ে গিয়েছে। এই সমাজে সবাই যে যার ক্ষতস্থান ঢেকে রাখে কিন্তু শর্বরীর চোখ এবং কান দুটোই অতিশয় প্রখর, তাই নিজেদের অজান্তেই ওর কাছে সবাই ধরা পড়ে যায়। রুণু অবশ্যই বিয়ে করেনি, কিন্তু ও যে একলা থাকে না সেটাও শর্বরী জানে। রাজর্ষি কিছুতেই এই বাস্তবটি মেনে নিতে চায় না, ছেলে আর বাবার মধ্যে যেন একটা অদৃশ্য পাঁচিল উঠে গিয়েছে। ওর ধারণা, কঠোর হলেই ছেলেমেয়েরা পথে আসবে, কিন্তু মায়ের দুশ্চিন্তা যে কী জিনিস, তা

ও কী করে বুঝবে? সভ্যতার ইতিহাসে কোনও বাবাই হয়তো কোনওদিন তার পুরোটা বোঝেনি। ইতিমধ্যে শবরীর মনের ভার নামানোর জন্য থেরাপিস্ট ছাড়া উপায় কিছু আছে কি? হয়তো নেই। তাও, নেহাত পরমার মতো দু’একজন বন্ধু আছে বলে ও এখনও পুরো উন্মাদ হয়ে যায়নি।

“তোর কী মনে হয়? অন্তঃশেষ অবশি আসবে তো?” শবরী বলল।

“মনে তো হচ্ছে, না হলে কাজের অজুহাত দেখিয়ে এর মধ্যে কাটিয়ে দিত। ভাবগতিক দেখে তো মনে হচ্ছে বাবুর ভালই উৎসাহ হয়েছে। তোদের সবার জন্য আলাদা আলাদা করে গিফট প্যাক করল দেখলাম।”

“তোর কী মনে হয়, কাগুটা প্ল্যানমাফিক ঠিকঠাক নেমে যাবে তো? ওরা যদি ধরে ফেলতে পারে তখন মাঝখান থেকে আমরা বোকা হয়ে যাব!”

“ধরে ফেলার প্রশ্নই নেই কারণ আমরা লুকাছাপা করে কিছু করছি না। খুব লেজিটিমেট একটা রিইউনিয়ন অ্যারেঞ্জ করা হচ্ছে, তার মধ্যে বোকা হওয়ার প্রশ্নই নেই।” পরমা হাসছে।

“আচ্ছা তুই ঠিক জানিস যে, মানে অন্তঃর ব্যাপারটা কেটে গেছে? শবরী শুধাল।

“একেবারে যেঁটে ঘ, সে মেয়ে এখন নতুন বয়স্ফ্রেন্ড নিয়ে ইউরোপে পাড়ি দিয়েছে। ছেলে আমার অফিশিয়ালি হার্টব্রোকেন,” পরমা নিশ্চিত গলায় বলল।

“তুই কী করে এরকম ক্যাজুয়াল কথাবার্তা বলিস রে। ছেলেমেয়েগুলো চোখের সামনে যে যার জীবন নিয়ে যা খুশি তাই করছে! দিয়ার কথাই ধর, দ্যাখ, এই তো সেদিন এমন আদিখ্যেতা করে বিয়ে করল, আমরা রিসেপশনের জন্য প্রায় একশো হাজার ডলার খরচ করলাম। পাড়ার সবাই এল, সবাই কত সব ভাল ভাল কথাবার্তা বলল, আশীর্বাদ করল। তখন ওদের দেখে মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন এক ম্যারেজ মেড ইন হেভেন। তিন বছর হয়নি এর মধ্যেই নাকি দু’জনের বেডরুম আলাদা। একটা বাচ্চাকাচ্চাও যদি হত! সৃজন ছেলোটা তো একেবারেই খারাপ নয়, দিনরাত্তির হাসপাতালে পড়ে থাকে এই যা। বরং আমার মেয়ের মেজাজটাই—”

শবরী হয়তো বলতে চাইছিল যে, এই নিয়ে গত কয়েকমাস ওর রাত্তিরে ঘুম নেই, দিনের বেলায় স্বস্তি নেই এবং ঘরের মানুষটার সঙ্গে কথাবার্তাও প্রায় বন্ধ। লোকটা আজকাল কোন দুনিয়ায় থাকে কে জানে। গভীর রাতে ওকে ঘুমের মধ্যে ছটফট করতে দেখেছে শবরী। তখন ওর মুখে একটা গোঙানির মতো শব্দ, কপালে ঘাম, ওকে ডেকে তুললে কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো এদিক-ওদিক তাকায়, শবরীকে ভাল করে চিনতেও পারে না। যখন তখন একটা কৌটো থেকে ওষুধ বার করে খায়, কী ওষুধ, কেন ওষুধ— এসব কথা জিজ্ঞেস করলেই খেপে ওঠে। আর মদ খাওয়া, সে তো দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

“আচ্ছা তুই এবার চিন্তা করা ছেড়ে দে দেখি। ভেবে দ্যাখ আমাদের বাচ্চারা আর আমরা, সকলেই তো একসঙ্গেই এগিয়েছি, তাই না? আমরা ইয়ুথ থেকে মাঝবয়সে, ওরা ছোট্ট বেলা থেকে ইয়ুথে, এই যা তফাত। ভুলভ্রান্তি তো কেউই কম করিনি। আমরা একরকম, ওরা আর-এক রকম। কিন্তু সেসব কথা ছাড়, সব মিলিয়ে কী মজার একটা সারগ্রাহীজ হবে সেটা একবার বুঝে দেখ দেখি।” প্রায় জোর করেই গলার মধ্যে একগাধা উচ্ছ্বাস টেনে আনল পরমা। ও জানে ওর বান্ধবী কখন অবসাদের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। ও এও জানে যে, উত্তর না-থাকলেও, শুধু প্রশ্নই অনেক সময় নীরবতার যন্ত্রণা কমিয়ে দেয়।

“ঠিক বলেছিস। আচ্ছা শোন, আমি না বেরোচ্ছি এবার। তিনটে বাজে, রাজা বলেছে ও ছটা নাগাদ বাড়ি ঢুকবে। ও জানে সাতটায় আমরা ডিনারে যাচ্ছি। আমি আবার দেখে নিচ্ছি যে, সব অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিকঠাক আছে কিনা। তুইও চলে আয়, আর বেশি দেরি করিস না,” ফোন রেখে দিল শবরী। একতলায় দুই ভাইবোনের গলা শোনা যাচ্ছে, সাজানো-গোছানো নিয়ে যথারীতি ঝগড়া লেগেছে ওদের।

সঙ্গে থাকা মানুষটার নাকি ষাট বছর বয়স হয়ে গেল দেখতে-দেখতে?

সেই ষাট বছরের মধ্যে পঁয়ত্রিশটা বছর এক ছাদের নীচে, এক বিছানায়, এক ডিনার টেবিলে শোওয়া-বসা করতে-করতে ওরা দু’জনেও একটি সংস্থা হয়ে উঠল। সেই প্রাচীন সংস্থা, যার নাম পরিবার, দুনিয়ার চোখে যা নাকি সাফল্য, সুস্থতা আর সামাজিক অনুমতির এক নিখুঁত নিদর্শন। অথচ শবরী এটাও জানে যে, বছরগুলো যত এগিয়েছে, মানুষটাও যেন ঠিক সেই অনুপাতে অপরিচিত আর অন্যরকম হয়ে উঠেছে ওর কাছে। কোথায় গেল সেই তিরিশ বছর আগের রাজর্ষি সান্যাল, উৎসাহ আর উচ্চাশায় টাইটপুর্ সেই যুবক? শরীর আর মনের প্রতিটি অণু দিয়ে যাকে ও চিনত, সেই চেনার মধ্যে একফোঁটা সংশয় ছিল না। তা হলে কি শবরী বোকা ছিল, অন্ধ ছিল তখন? নাকি, বছরগুলোর সঙ্গে শরীর যেমন দূরে সরেছে, সংসার শুষ্ক নিয়েছে যৌনতাকে, ঠিক তেমনই ওদের একান্ত পরিচিতিও বদলে গেছে, এটাই নিয়ম, এমনটাই হয়? যদি বা শুধু যৌনতার প্রেক্ষিতেই একে অপরকে বুঝতে চায় মানুষ, তা হলে সম্পর্ক নামক এই অলীক হাস্যমাতির কী প্রয়োজন ছিল? তা না হলে বেঁচে থাকার অর্থ একটা বাধ্যতামূলক খেলা ছাড়া কিছু নয়— প্রতিটি সজীব সন্তা, ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষ, একলা অথবা দলবদ্ধ, সকলেই এই খেলায় সামিল। তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্যটিকে থাকা, অতঃপর খেলায় জেতার আশ্রয় চেষ্টা, নিজেদের সংখ্যা, প্রভাব এবং ক্ষমতার মাত্রা বাড়িয়ে যাওয়া। তার জন্য শুধু সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবটাই জরুরি কিন্তু আবেগের খোঁজ নেওয়া অবাস্তব। আবেগের সঙ্গে ঘর করতে হলেই সব বিগড়ে যায়, ভিতরে জমতে থাকে কষ্ট আর অসহায়তা, অকারণে জমাট বাঁধে সংশয় আর ক্রোধ। অসীম সময়ের সঙ্গে সীমাবদ্ধ জীবনের এই অসম যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন ফুটে ওঠে মনের এখানে-ওখানে, বাইরে থেকে তার কিছুই দেখা যায় না।

“আরে, মা, এখনও রেডি হওনি?” সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে মন্দিরা। নীল রঙের লেহেন্ডা-চোলিতে কী দারুণ মানিয়েছে ওকে! চুলে ওরা কী বস্ত্র লাগায় কে জানে, কিন্তু তাদের প্রভাবে বল্লরীরা এখন অতিশয় বাধ্য, নিখুঁত ডেউ তুলে তারা লুটিয়ে পড়েছে ওর কাঁধে আর পিঠে। একটু লম্বাটে, ককেশিয়ান ধাঁচের মুখ ওর। সকলে বলে, বাবার থেকে পাওয়া। ওর চোখের মণিতে সামান্য নীলের ছোঁয়া রয়েছে কিন্তু সেটা খুব কাছে না গেলে বোঝা যায় না। রোগা ছিপছিপে হলেও ওর শরীরের ডেউগুলি আদৌ অস্পষ্ট নয়। মাঝে-মাঝে কিছুটা অবাক হয়েই নিজের মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে শবরী। ওর শুধু মনে হয়, এমন মেয়ের বিবাহিত জীবনে এত সব সমস্যা আসে কোথা থেকে? কেন মোবাইলে উগরে দেওয়া বিষাক্ত কথার স্রোত দেওয়াল উপকে ঘুরপাক খায় রাতের অন্ধকারে? রাজর্ষি নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে থাকে কিন্তু শবরী তো ঠিক শুনতে পায়। বাইরে থেকে দিরা এতটাই হাসিখুশি আর উচ্ছল যে, ওর ভিতরের যন্ত্রণাগুলোর খবর পায় না কেউ। এ-যুগের বাকবাক্যে ছেলেমেয়েরা, যাদের আত্মবিশ্বাস দেখে গর্ব হয়, সাহস দেখে চোখ বলসে যায়, আর্থিক সাফল্য দেখে হতবাক হতে হয়, তাদের মধ্যে কতজন সত্যি সত্যি সুখী ও সার্থক? অথবা ওই সব সুখী জীবনের আইডিয়াগুলোই অলীক, বিজ্ঞাপনের ছবির মতো, যারা নাকি কস্মিনকালেও সত্যি ছিল না, এখনও নেই। শবরী ভাবল, পরমা এলেই ওকে এক কোণে টেনে নিয়ে ওর সঙ্গে একলা একলা কথা বলবে একটুকু। মেসেজে কিংবা ফোনে নয়, চোখে চোখ রেখে কথা, যাতে চোখের দূরবীণ দিয়ে মনের ভিতরটাকে একেবারে পরিষ্কার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

আপাতত, ও আর দিরা মিলে ফুল সাজাতে ব্যস্ত। রেখে-ঢেকে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছে শবরী কিন্তু কিছুতেই দিয়ার কাছ থেকে একটা নতুন কথা বের করতে পারেনি। “দিস ইজ ফ্যামিলি টাইম মা, টুডে ইট’স আবাইট ইউ অ্যান্ড বাবা, নট আস”— এইরকম সব কথা বলে আলোচনাটি শ্রেফ এড়িয়ে গিয়েছে দিরা। ওর মুখের হাসি স্নান হয়নি এতটুকু, টগবগে উৎসাহে ভাটা পড়েনি একচিলতে। দেখতে-দেখতে ঘড়িতে বিকেল চারটে বেজে গেল, রুণুও এয়ারপোর্ট থেকে এসে পড়ল বলে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাড়িটা পরিচিত মানুষদের ভিড়ে গমগম করে উঠবে। ড্রাইভওয়েটা বেমালুম ফাঁকা রেখে দেওয়া

হয়েছে, কাজেই রাজর্ষি বুঝতে পারবে না কিছুই। ও জানে, সাতটার সময় ডিনার, এবং যেহেতু ও পাল্শচুয়াল মানুষ, তাই ছ'টার মধ্যে ফিরবেই ফিরবে। তারপরেই সারপ্রাইজ, হইহই, শ্যাম্পেনের অলীক বৃদ্ধ এবং শুভকামনার স্রোত। সংসার, কেবলই সংসার!

পুরনো কথা এবং রত্নদ্বীপ

“আয় রাজা, আজ আমরা জাহাজ-জাহাজ খেলব।”

আদ্যিকালের পালিশ করা বর্মা টিক দিয়ে বানানো ইয়া একখানা পালঙ্ক। তার মাথার দিকটা প্রায় সিলিং ঝুঁয়েছে, চার কোণায় বিরাট চারটে মশারি খাটানোর ডান্ডা। গদিটা মেঝে থেকে এতখানিই উঁচু যে, ছোটখাটো মানুষের এই দৈত্যাকার বিছানা থেকে নামতে হলে সিঁড়ি লাগাতে হবে! রোদ্দুরে ভেসে যাওয়া মস্তবড় ঘরটা আসলে ওর দাদুন-দিদানের বেডরুম, কিন্তু আপাতত ওরাই এটার দখল নিয়েছে। ঘরের আসল মালিকদের মধ্যে একজন এই মুহূর্তে টিটাগড় কটন মিলের ঘর্মাক্ত অফিসে, অন্যজন সংসারের নানা খুঁটিনাটি কাজে ব্যস্ত। কলকাতা থেকে মেয়ে-জামাই-নাতি, সবাই এসেছে, দিদানের তাই কাজের শেষ নেই। নির্জন দুপুরবেলায় সেই বিরাট ঘরটার মধ্যে শুধু ছোটমাসি আর রাজা এবং অব্যবহৃত দুই জানলা দিয়ে ইচ্ছেমতো যাতায়াত করত রোদ্দুর। সুবিশাল বিছানাটা দুপুরবেলার সেই আলস্যের স্রোতে ভাসতে-ভাসতে কখন যেন হয়ে উঠত পালতোলা এক জাহাজ। ছোটমাসির জলপাই রঙের মুখ, উপরের ঠোঁটের বাদিকে ছোট কালো একটা তিল, গজদাঁত বার করা বকবাকে হাসি, দুই কাঁধের ওপর দিয়ে নেমে আসা একজোড়া বিনুনি আর কালো হরিণ চোখ, সে সবকিছুই তখন সেই জাহাজি রোদ্দুর মেখে বলমল। মাসি ওর নবম শ্রেণির অঙ্ক ক্লাস থেকে রঙিন চকগুলো চুরি করে এনে, রোজ রোজ চুপচাপ রাজর্ষির হাতে গছিয়ে দেয়। সেই সব চোরাই চক হাতে পেলেই বাড়ির উঠানে, দেওয়ালে এবং সদ্য-মোছা মেঝের উপরে ইচ্ছেমতো উদ্ভট সব ম্যাপ আর ছবি ফুটে ওঠে। সংবাদপত্র পড়তে বলা সেই ভয়ঙ্কর মানুষটা তখন দিবানিদ্রায় মগ্ন, তাঁর ঘুম ভাঙা এবং বিকেলের চা খাওয়ার সময়টি পর্যন্ত টিকে থাকে ওদের এই রহস্যময় খেলার ভূবন। খেলাটির নিয়মকানুন অতিশয় সরল, অর্থাৎ কিনা যে-করেই হোক জাহাজডুবি হতেই হবে, তারপরে কে কোথায়, কোন পরিস্থিতিতে ভেসে উঠবে, কোন অজানা দ্বীপে আশ্রয় পাবে, সেই নিয়েই গল্পো। এই গল্পের কোনও প্লট নেই, এর আদি এবং অন্ত, দুটোই মোটামুটি অজানা। বাড়ির বড়রা সকলে দিবানিদ্রা থেকে গা তোলার আগেই দিদানের সতর্ক নির্দেশে মামাবাড়ির পুরাতন ভূতেরা যে-যার কাজে লেগে যাবে। দেখতে-দেখতে, ন্যাতা ও বালতির যুগল আক্রমণে ওর বহু পরিশ্রমের আঁকিঝুঁকি বেমালাম উধাও, তাদের রহস্যও চিরদিনের মতো অধরা। এইভাবে রত্নদ্বীপের মানচিত্র প্রতিদিন হারিয়ে যায় এবং অভিযান মূলতুবি থাকে আর-একটা দুপুরের জন্য।

সন্ধ্যা আর রাত্তিরের মাঝখানে একটা নির্লিপ্ত সময় আছে। সেই সময় ছাদের এক কোণায় খুব মৃদুকণ্ঠে একটা গানের সুর ঘোরাফেরা করত। রাজর্ষি ছাড়া আর কেউ ঠিক ওই সময়টা ছাতে যেত না। দিদান ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা দিচ্ছে, দাদুন কাজ থেকে ফিরে এখন বৈঠকখানায় সমাসীন। সেখানে বড় ছেলে, জামাই এবং ইয়ার দোস্তদের নিয়ে চা এবং সিগারেটের আসর জমজমাট। সেই ঘাটের দশকের বাঙালি পরিবারে তখনও খুলে আম মদ্যপান চালু হয়নি। মুরগির মাংস সদ্য-সদ্য হুঁসেলে ঢুকেছে, এই কিছুদিন আগে অবধি তাও ব্রাতা ছিল। যেসব মামা, মাসিরা এখনও ইস্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি তারা সবাই বিরসবদনে যে যার হোমটাস্ক নিয়ে বসে গিয়েছে। ঠিক সেই সময়ে, বাড়ির সবচেয়ে চুপচাপ এবং প্রায় অদৃশ্য এক যুবতী প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকে ছাদের কোণায় আপনমনে একলাটি, তার নিজস্ব সুরের ভুবনে। রাজর্ষি আর সন্ধ্যার আকাশ বাদে মাত্র আর-একজন সেই ভুবনের খোঁজ রাখে, কিন্তু তাকে দেখা যায় না।

“মা, তুমি রবিঠাকুরকে দেখেছ?”

“না রে, চোখে তো দেখিনি কিন্তু মনে হয় সবসময় দেখতে পাচ্ছি।

যেমন দেখ, ওই যে সন্ধ্যাতারা উঠেছে, আমার মনে হচ্ছে ওই তো রবিঠাকুর আমার দিকে তাকিয়ে আছেন,” কথা বলতে-বলতেই মেয়েটি গুনগুন করে উঠল—“কাজ হয়ে গেছে সারা, উঠেছে সন্ধ্যাতারা/ আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া/ অন্তসাগর পারায়ে।”

ওই বয়সেও রাজর্ষির মনে সন্দেহ। এক তো কিছুদিন আগে বাবার কাছে শুনেছে যে, সন্ধ্যাতারা আদৌ তারাই নয়, ওটা আসলে প্ল্যানেট ভিনাস। বাংলায়, শুক্রগ্রহ। তা ছাড়া এই তারা হয়ে যাওয়ার গল্পটাও বড়রা প্রায়ই বলে থাকে। এই তো সেদিন ওদের পাশের বাড়ির অমিয়জেরু বৃকে ব্যথা হয়ে হাসপাতালে গেল, ফিরল একটা অদ্ভুত কাঁচের গাড়ির মধ্যে ফুলের বিছানায় শুয়ে। যত দূর মনে পড়ে, ওটাই বোধহয় মৃত্যুর সঙ্গে ওর প্রথম মোলাকাত। ক’দিন বাদে জেঠিমা ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিল, “তোমার জেঠু আকাশের তারা হয়ে গেছে।” প্রায় রোজ সন্ধ্যাবেলা আড্ডা মারতে আসত অমিয়জেরু, সেইসঙ্গে চা, জলখাবারটাও খেয়ে যেত। বাবা বলত, জেঠু নাকি হাড় কিপটে, আর পরচর্চায় বেদম ওস্তাদ। মা কিন্তু কিছু বলত না, শুধু মুখ টিপে হাসত আর নিঃশব্দে ছোট টেবিলটার ওপরে কাপ প্লেট, জলের গ্লাস পরিপাটি করে সাজিয়ে দিত। ওইটুকু একচিলতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসত দেশবিদেশের নানা মুখরোচক খাবার। মায়ের মুখ থেকে কারও সম্পর্কে একটাও খারাপ কথা কিংবা কারও বিরুদ্ধে এতটুকু নালিশ কোনওদিন শোনেনি রাজর্ষি। শ্যামলা রঙের ছিপছিপে সেই বাঙালি ম্যাডোনার আঁচলটি ধরে, তার হাসি মাখানো শান্ত চোখের ছায়ায়, রবিঠাকুরের গান শুনতে-শুনতে সেই অকালপক্ব ছেলোটি অনেক সময় কাটিয়েছে তখন। তারপর কখন যেন একটু একটু করে সব কিছু বদলে যেতে শুরু করল। রাজর্ষি বুঝে পায় না যে, সত্যিই কি কিছু অন্যরকম হয়েছে নাকি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখার চোখ আর বোঝার মন, এই দুটোই বদলে গিয়েছে শুধু।

সন্ধ্যা যখন রাত্তিরের দিকে গড়ায়, বৈঠকখানায় জমে ওঠে কোলাহল, মা তখন ওকে ঘুম পাড়ানোর জন্য গুনগুন করে গান ধরেছে—“তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী।” ওদিকে বড়রা ডাকছে, জানতে চাইছে যে, মেয়েটির খেতে আসতে রোজ এত দেরি হয় কেন? সব ডাকাডাকির উত্তরে মেয়েটি চুপচাপ শুধু মুখ টিপে হাসে আর মৃদুস্বরে একটাই উত্তর দেয়, এই যাই। যাই, যাই যাই— অন্ধকারে কোনও অপার্থিব গানের সুর যেমন করে মিলিয়ে যায়। রাজর্ষি যতক্ষণ পারে সেই সুরের সরোবরে ভেসে থাকতে চায়। সেখানে হাওয়ায় ভাসে এক অদ্ভুত গন্ধ, সেটা শুধু সাবান বা পাউডারের নয়, একজন মানুষের নিজস্ব গন্ধ, যা এখনও, এত যুগ বাদে, এখনও স্বপ্নের মধ্যে ওকে তাড়া করে বেড়ায় প্রতিদিন।

“স্যার, ইওর কফি,” কাউন্টারের ওপাশে মেয়েটির গলায় আলগা বিরক্তি মেশানো। বয়স্ক লোকটি কফির আর্ডার দিয়ে ভুলেই গিয়েছে বোধহয়। তার ওপর নিজের মনে কীসব বকছে। নির্ঘাত ডিমেনশিয়া হবে।

“ও, থ্যাঙ্কস।”

যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে কাপটা তুলে নিল রাজর্ষি। ওর কি আর কিছু করার ছিল আজ? আর কোনও জরুরি ফোন, ইমেল বা মেসেজ। না, আর কিছু নেই, বিকেল পাঁচটা বাজে, এবার কফি খেতে-খেতে বাড়ি ফেরা। বাড়ি ফেরা, আবার পরদিন সকালে বেরোনো, বিকেলে বাড়ি ফেরা। টুমরো অ্যান্ড টুমরো অ্যান্ড টুমরো, মধ্যে মধ্যে গুঁজে দেওয়া উইকএন্ড কিংবা এক হপ্তার ভ্যাকেশন কিন্তু তাদের ভিতরে কখনও বৈচিত্র্য নেই— ফুল অফ সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি, সিগনিফাইং নাথিং। এই অর্থহীনতা ওর বাড়ির ওপরে চেপে বসে আছে কিন্তু এও তো ঠিক যে, মানুষ চাইলে তার জন্য নাকি বিকল্প হাজির আছে সর্বদাই। সেই বিকল্পের সন্ধানে গত কয়েক বছর কেটে গিয়েছে ওর। বাস্তবিক সময়ের হিসেব গুলিয়ে দিয়ে আজকাল নাছোড়বান্দা অতীতের হানাদারি চলেছে লাগাতার, সময় গুলিয়ে দেওয়া উৎকট সব ছবি ও শব্দের প্যাভোমেনিয়াম হানা দিয়েছে ওর দুঃস্বপ্নে প্রতিরাত। তবুও প্রতিদিন সকালে এই বাঁধাধরা কাজ, কাজের শেষে এই এক কাপ কফি নিয়ে বাড়ি ফেরা।

“আরে রাজাদা, হ্যাপি বার্থডে! এই দেখো তোমাকেই টেক্সট করতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই দেখা হয়ে গেল,” কাকের দরজাটা খুলতে-না-

খুলতেই উচ্ছল কণ্ঠে কথাগুলো বারের পড়ল। ওর গাড়ির ঠিক পাশে এসে থেমেছে, পরিচিত আর-একটি গাড়ি, তার জানলা দিয়ে উঁকি মারছে পরিচিত একটি হাস্যমুখ। ঠিক সেই সময় পেটের ব্যথাটা অসহ্য হয়ে উঠেছে আবার। কফির সঙ্গে একটা ট্যাবলেট গিলে ফেলে অসহায়ভাবে বাইরে তাকাল রাজর্ষি। ওর একবার মনে হল, শুনতে না-পাওয়ার ভান করে পালায়, যদিও ও জানে যে, সেটা অসম্ভব। ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে নেমেছে ঋতু এবং রমিতা, দু'জনেই এই শহরের নবাগত কিন্তু অত্যাশ্চর্য নগরিক। দুর্গাপূজা থেকে রবীন্দ্রজয়ন্তী, পিকনিক কিংবা নাটক, প্রবাসী বঙ্গজীবনের যে-কোনও এলাকাতেই ওরা তড়িঘড়ি নেতৃত্ব দিতে উৎসুক। আপাতত, এই তল্লাটে তরুণ তুর্কিদের নেতা-নেত্রী বলতে ওরাই। বঙ্গজীবনের সনাতন নিয়ম অনুসারে এখানকার সাবেক মাতব্বরদের সঙ্গে ওদের বেশ জটিল রকমের গন্ডগোল লেগেছে, এমনকি হাঁড়ি আলাদা করার কথাও শোনা গিয়েছে কয়েকবার। এই সব হাস্যময় সালিশি করার দায়িত্ব সদাই শর্বরীর এবং এখনও পর্যন্ত ও সেই দায়িত্বটি নিষ্ঠাভরে পালন করে চলেছে। রাজর্ষি এই বাবদে একটি মূর্তিমান আপদ কেননা ও কখন কী বলে ফেলে, তার হিসেব রাখা অসম্ভব, এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে ওর আচার-আচরণ, প্রায়ই সামাজিক বিপদসঙ্কেতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের তালুকদারি থেকে স্কচ হুইস্কি নামক পানীয়টিকে উচ্ছেদ করতে পারলে সম্ভবত একটা সুরাহা হত কিন্তু সে আশাও দূরাশা। রাজর্ষি তাই পাড়ার ছেলে-বুড়ো, সকলের কাছেই এক অস্বস্তিকর প্রতিষ্ঠান, যার গুণ আছে অথচ আক্কেল নেই।

রমিতা এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরেছে। এদেশের ভাষায় এর নাম হাগ দেওয়া, ধরে নেওয়া হয় যে, এটা বন্ধুত্বের বার্তা, এর মধ্যে এক রত্তি যৌনতা নেই। রাজর্ষি কিন্তু বাড়তি সঙ্কেতটুকু পরিষ্কার ধরতে পারল, ওর শরীর এক মুহূর্তের জন্য স্পন্দিত হয়েও অভ্যস্ত শীতলতার মধ্যে ফিরে গেল আবার। ঋতুর সঙ্গে দু'-একটা খেজুরে কথাবার্তা শেষ করে আজকের দিনে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবার অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়ল ও।

“সি ইউ সুন।”

গাড়ি এখন হাইওয়ে দিয়ে সোজা পশ্চিমদিকে ছুটেছে, আকাশে মেঘ নেই, দিগন্তের রক্তিমভা মিলিয়ে গিয়ে এখন একটা অপার্থিব স্বচ্ছ গোলাপি রং। রাজর্ষির কেমন যেন একটা খটকা লাগছে। ওরা দু'জনে কিছু একটা চেপে গেল মনে হচ্ছে। কফিশপের পাশেই একটা কেক-প্যাস্ট্রির দোকান, দু'জনে ওইখানেই ঢুকল না? একজন আর-একজনকে চোখে চোখে সিগনাল করল, যাতে কেউ বের্ফাস কিছু কথা বলে না-ফেলে। তবে কি শর্বরী বন্ধুবান্ধবদের ডেকে কিছু একটা বিরাট সারপ্রাইজ দেওয়ার মতলবে আছে? এই সব ফ্যানশন তো খুব চালু হয়েছে এখন। রাজর্ষি মনে মনে একটু হাসল। দেখাই যাক, কে কাকে সারপ্রাইজ দেয়।

মন খারাপের জন্মদিন

“বাঃ, কী সুন্দর দেখাচ্ছে রে তোকে দিরা,” শর্বরীর গলায় যতটা না প্রশংসা, তার চেয়ে বেশি বিস্ময়। ছোটবেলা থেকেই ওর কন্যাটি সুদর্শনা কিন্তু তিরিশ পেরিয়ে ও এখন যেন সত্যি-সত্যি ডানা মেলেছে। রূপ জিনিসটা এককালে হয়তো বিধিদত্ত ছিল, কিন্তু এখন কৃত্রিম সংযোজন-বিয়েজনের কাছে সৃষ্টিকর্তা প্রায়ই হার মেনে নেন। এসব কথা শর্বরীর তো ভালই জানা আছে তবুও আজ সন্ধ্যাবেলায় সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা দিয়ার দিকে তাকিয়ে, এমন অবুঝ অকারণ ভয় এসে ভর করছে কেন ওর উপরে? কী চায় ওর এই সুন্দরী কন্যাটি, যে নাকি একদিন ওরই জঠরে বাস করত, যাকে দু'পায়ের ওপর খাড়া করতে একদা প্রাণপাত করেছে শর্বরী? সেই মেয়েকে এক নজরে দেখলেই মনে হয় যে, ওর চতুর্দিকে শুধুই মধুরস, সেখানে সংশয় কিংবা বিপন্নতার লেশমাত্র নেই। কিন্তু সে-গল্পটা যে সত্যি নয়, তা শর্বরীর চেয়ে বেশি আর কে জানে?

“বাবা! মনে হচ্ছে তোরই যেন বিয়ো! ইউ লুক গর্জাস অ্যাজ অলওয়েজ,” পরমা এগিয়ে এসেছেন এবার।

“ওকে, তার মানে বেশি সেজে ফেলেছি, তাই তো? আরে, আজকের দিনে ইটস অল রাইট মা অ্যান্ড পরমা-মাসি, ইটস রিয়্যালি অল রাইট। আচ্ছা শোনো, কেকটার ডেলিভারি এসে গেছে কিনা দেখেছ? ওহ, ফুলগুলো তো এখনও সাজানো হয়নি, এদিকে চারটে বাজে। রুণু, অ্যাঁই রুণু, তুই আবার কোথায় গেলি এই ইলোভেভু আওয়ারে?” মন্দিরা চোখের বিদ্যুৎ এবং এক ঝলক হাসি হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ের ভাইয়ের ঘরের দিকে চলে গেল। এখন ওখান থেকে ওদের দু'জনের অভ্যস্ত খুনসুটির শব্দ ভেসে আসছে। মনের মধ্যে একটা আনন্দের তুফান থেকে থেকে জাগছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে শর্বরীর, অব্যথা ডেউরা যেমন বাঁধের গায়ে ধাক্কা লেগে ফিরে যায়। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, স্বাবলম্বী হয়েছে, যে যার জীবন নিয়ে রয়েছে, এটাই তো স্বাভাবিক। ওরা সুখী হল কিনা, সামাজিকভাবে ঠিকঠাক থাকল কিনা, সে-সব অবাস্তব ভাবনা ছেড়ে দেওয়াই কি বাস্তবিক নয়? বিশেষত, ছেলেমেয়েরা যখন কোনওমতেই তাদের ব্যক্তিগত জীবনে মা-বাবাকে মাথা গলাতে দেবে না।

শুধু কি ছেলেমেয়েরা? যে-মানুষটার সঙ্গে আটত্রিশ বছর এক বিছানায় শুচ্ছে, মানসিকভাবে সে যে আজকাল কোথায় থাকে, কী করে, তার খবরও তো জানা নেই। দিনের বেলা যন্ত্রের মতো কাজ করে যায় রাজর্ষি, তা সে বাইরের কাজই হোক কিংবা ঘরের। সন্ধ্যা হতে না-হতেই স্কচের গ্লাস নিয়ে চুপচাপ সময়টা কাটিয়ে দিতে চায়। তবুও রাত্রে ঘুমের মধ্যে কথা বলে ও, শুধু কথা নয়, ওর সারা শরীরটাই যেন স্বপ্নের সঙ্কেতে চালিত হয় তখন। শর্বরীর প্রায়ই মনে হয় যে, এই মানুষটা আসলে অন্য কোনও জগতের বাসিন্দা, এখানে রয়েছে নেহাত অভ্যাসের বসে। মোট কথা, রাজর্ষি আর শর্বরীর মধ্যে ভালবাসা বলে যদি কিছু বেঁচে থাকে, তার মূলেও সেই নিঃসঙ্গতার ভয় আর অভ্যাসের অমোঘ নিয়ন্ত্রণ। হয়তো এক ধরনের বন্ধুত্ব ওদের মধ্যে তৈরি হয়েছে, একই ঘরে আটকে রাখা কয়েদিদের মধ্যে যেমন হয়। বাকি যা-কিছু এককালে জীবন্ত ছিল, উজ্জ্বল ছিল, একে একে তারা সবাই অনাদরে নির্জীব হয়ে গিয়েছে, টেবিলের একধারে রেখে দেওয়া অর্কিড যেমন খুব আস্তে-আস্তে শুকিয়ে যায়। তাও তো জোড়া-দেওয়া সম্পর্কটা টিকে আছে এবং এই টিকে থাকার খবরটুকুই গোটা সমাজের জন্য এক অপরিহার্য আশ্বাস।

দরজায় আবার টুংটাং, তার মানে ঋতু আর রমিতা এসে গিয়েছে। বাড়ি সাজাতে ওদের হেল্প চেয়েছিল শর্বরী, কেকটাও ওদেরই নিয়ে আসার কথা। হাসিমুখে দরজা খুলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল ও।

“তুমি! তোমার না—”

“না-আসার কথা ছিল জানি। তাও কী মনে হল, চলেই এলাম। ভেতরে আসতে পারি?” দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে থাকা, সুট-পর্যায় সুদর্শন যুবকটি কুণ্ঠিত গলায় বলল। সারারাত এরোপ্লেনে কাটাবার ফলে ওর চেহারাটা এখন ক্লান্ত আর উস্কেখুস্কে দেখাচ্ছে, মুখে একটা নার্ভাস হাসি।

“এসো এসো সৃজন, নিজের বাড়িতে আসার জন্য আবার অনুমতি নিতে হয় নাকি? এই দেখো, একটা খবর দিলেও তো পারতে,” শর্বরী কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না, “দাঁড়াও, রুণু আর দিরাকে ডাকি। তোমাকে দেখলে খুব খুশি হবে ওরা।”

“প্লিজ মামি, তুমি ব্যস্ত হলো না। আমি একটু হাত মুখ ধুয়ে নিই, কেমন?”

“নিশ্চয়ই বাবা, নিশ্চয়ই। ওই তো বাঁ দিকে তোমাদের ঘর, দেখো সব কিছু রেডি করা আছে। আমি দেখি তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি,” শর্বরী আকুল গলায় বলল। দিরা এসে থেকে ওই ঘরে ঢোকেনি, মায়ের কাছেই সময়টা কাটিয়ে দিয়েছে।

“আমার খাওয়া হয়ে গেছে মামি। কিন্তু দিরা কি—” ঘরে ঢোকান আগে একটু যেন থমকে গেল সৃজন।

“দিরা আর রুণু বেসমেন্টে আছে, কী সব সাজাচ্ছে দু'জনে মিলে,” নিজের গলাটা নিজের কানেই কেমন অদ্ভুত শোনাল শর্বরীর। এই মুহূর্তে ওদের দেখা হলে কী কাণ্ড হবে, কে জানে। গতকাল সন্ধ্যাবেলা

জামাইবাবুকে নিয়ে বেশ একটু উত্তেজিত ছিল রুণু। আর দিরা? দিরাকে তো দুর্বোধ্য বললেও কম বলা হয়। দুই ভাই-বোনে মিলে এটা পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে, সৃজন নামক প্রাক্তন প্রিয় মানুষটি ওদের কাছে এখন অপ্রয়োজনীয়, আপদ বললেও হয়। সে এই পরিবার থেকে যত দূরে থাকে ততই মঙ্গল।

“তুমি একটু রেস্ট নিয়ে নাও সৃজন, আমি সবাইকে খবর দিচ্ছি।”

সৃজনকে তড়িঘড়ি ওদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রায় যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল শর্বরী। আধুনিক অস্তিত্বের মূলে রয়েছে এই উদ্ভট ধাঁধা। স্বাভাবিক আর সমর্পণ, এই দুই বিপরীত ধারণার মাঝখানে যে-সমঝোতার জমিটুকু রয়েছে, তাকে কেমন করে টিকিয়ে রাখা যায়? যদি তা অসম্ভব, তা হলে প্রেম-ভালবাসা অথবা সংসার, সবই যে অলীক। সে-ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষকে তাদের আলাদা-আলাদা এলাকায় একলা থাকতে হবে, কারণ তারা প্রত্যেকেই স্বাধীন। নৈকট্য গড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হবে সংঘর্ষ।

আবার ঘন্টি। বেসমেন্ট থেকে রুণু উঠে এসেছে এবার। কয়েকজন লোকের বয়স তো বাড়ে বটেই, কিন্তু চেহারা কিংবা স্বভাব থেকে কৈশোর যেন কিছুতেই বিদায় নিতে চায় না। রুণু নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে একজন। ওর ফর্সা মুখ আর নিখুঁতভাবে কামানো গাল, কোঁকড়া চুল আর ছিপছিপে গড়ন দেখে যে-কেউ ওকে কলেজে জুনিয়র ইয়ারের ছাত্র ছাড়া কিছুই ভাববে না। দরজা খোলার সঙ্গেই বিরাট একটা কোলাহল তুলে ফেলেছে ও।

“আরে রথীকাকু আর আন্টি, কতদিন বাদে আমাদের দেখা হল বলো তো? এসো এসো, লেটস হ্যাভ আ ফ্যান্টাস্টিক গেট টুগেদার। অস্ত্র আয়, তোর জন্য স্পেশাল সারপ্রাইজ আছে,” উৎসাহে প্রায় নাচতে-নাচতে ওদের বেসমেন্টের দিকে নিয়ে গিয়েছে রুণু। ওদের পিছু-পিছু ঋতু আর রমিতাও চলে এসেছে, এবার পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে পার্টির তোড়জোড়। একদিকে কেক, অন্যদিকে বার, মাঝখানে বুফে, দেওয়াল আর ছাত জুড়ে নানা রঙের ফিতে আর বেলুন। দেওয়ালজোড়া বিরাট একটা টেলিভিশন স্ক্রিনে পরিবারের পুরনো সব ছবি আর ভিডিওদের মিছিল চলছে পুরোদমে। ভার্সিয়াল মিটিংয়ে সামিল হবার লিঙ্ক চলে গিয়েছে, দুনিয়ার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে যাওয়া পরিচিত মানুষজন সঙ্কলে এখন যে যার ল্যাপটপ নিয়ে স্ট্যান্ডবাই। শর্বরী সকলের সঙ্গে কথা বলছে, হাসছে, এটা ওটা নিয়ে মন্তব্য করতেও ছাড়ছে না কিন্তু ওর অস্থির চোখ শুধু চারদিকে খুঁজে চলেছে চতুর্দিকে— দিরা কোথায়? দিরা? সৃজন এসেছে, সে-কথাটা ওকে বলতেই হবে, কিন্তু বলার ঠিক সময়টা কখন?

“তাকে যেন কেমন দিশেহারা লাগছে। কেন বল তো?” হটগোলের মধ্যে পরমা কখন নিঃশব্দে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

“তাই? কেমন করে বুঝলি?” বাম্ববীর দিকে তাকিয়ে একটু ফিকে হাসি হাসল শর্বরী, যেন প্রশ্নটা খুবই মজার।

“তাকে হাড়ে-হাড়ে চিনি বলে। শোন, গীতা পড়েছিস তো? ফলের আশা না-করে কাজ করে যা।”

“পরমা, সৃজন এসেছে কিন্তু দিরা এখনও কিছু জানে না,” এক নিশ্বাসে বলে ফেলল শর্বরী। পরমার হাসিটা বদলে গেল কিন্তু ও কিছু বলার আগেই বেসমেন্ট থেকে চিৎকার— “মা, শিগগির এসো, ফ্লোরাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখে যাও।” দরজায় দাঁড়িয়ে মন্দিরা ডাকছে, গলা মিলিয়েছে রুণুও, দু’জনেই যারপরনাই উত্তেজিত। ওদিকে আবার কোথেকে একটা মই এনে খাড়া করে প্রায় সিলিং পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে ঋতু, তলা থেকে তারশ্বরে ওকে নির্দেশ দিয়ে চলেছে রমিতা। ওরা ক’জনে মিলে এমন হইচই বাধিয়েছে যে, ব্যপারটা কারও জন্মদিনের উৎসব নাকি কোনও রাজাগজার করোনেশন, তা-ই ঠাহর করা কঠিন।

“তুই যা। এদিকটা আমাকে সামলাতে দে। এত চিন্তা করিস না, দেখাই যাক না কী হয়। কোথায় আছে ছেলোটা?” পরমা বলল।

আঙুল দিয়ে ওদের ঘরটার দিকে দেখিয়ে দিল শর্বরী। মনের ভিতরে কোথায় যেন আবার একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল ওর। কী করবে, কী বলবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না এতক্ষণ। পরমা থাকা মানে একটা বিরাট

ভরসা, ওর যেমন মাথা ঠান্ডা তেমনই উপস্থিত বুদ্ধি।

“কেমন হয়েছে বলো?” সাজানো বেসমেন্টের বিরাট হলঘরটার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচের ভঙ্গিতে এক পাক ঘুরে নিল দিরা, “রেডি ফর দ্য পার্টি?”

“দারুণ হয়েছে তো রে!” শর্বরী মুগ্ধ না-হয়ে পারল না। ওদের পুরনো বেসমেন্টের ঘরটা সত্যিই যেন জাদুমন্ত্রে এখন এক রাজপ্রাসাদের ভোজসভা বনে গিয়েছে, তার যেদিকে তাকাও, রঙিন ফুল আর সবুজ পাতাদের হিল্লোলা। ছাত থেকে নেমে এসেছে সোনা আর রূপোর সজ্জা, দূর থেকে ভেসে আসছে রাজর্ষির প্রিয় ইমন-কল্যাণ রাগের আলাপ। শর্বরী জানে, ওই ইমন-কল্যাণটিকে বাদ দিলে এই রাজপ্রাসাদের প্রায় পুরোটাই সস্তা এবং মেকি, পার্টি সাল্লাইয়ের দোকান থেকে কেনা চৈনিক মালপত্র। সে যাই হোক না-কেন, এই ছেলেমেয়েগুলোর কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতেই হয়। ঘরে ঢুকে রাজা সত্যিই অবাক হয়ে যাবে, খুশিও হবে নিশ্চয়ই কিন্তু সে-সব কতক্ষণের জন্যই বা? কাল সকালেই তো এই সব সাজসজ্জা খুলে নামিয়ে আশ্চর্যে চালায় করতে হবে, তারপর থেকে আবার সেই পুরনো ছন্দে ফিরে যাবে জীবন। তা হোক গে, আজকের দিনটা তো উপভোগ করে নেওয়া যাক।

“সৃজন ছেলোটা যখন সেই এলই, কদিন আগে আসতে পারত না?” নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল শর্বরী। ঠিক তখনই ও দেখতে পেল, দিরা টেলিফোনটা কান থেকে নামিয়ে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, ওর মুখের ওপর থেকে ছেলেমানুষি ভাবটা উধাও। ওদিকে ওর ঘরের দরজাটা খুলে গিয়েছে, বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সৃজন আর পরমা।

“দিরা শোন। দিরা!” শর্বরী প্রায় হাহাকার করে উঠেছে।

“মা, চুপ করো, আমি ঠিক আছি,” কথাটা মায়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গটগট করে সোজা সৃজনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দিরা। হাওয়ায় এখন বারুন্দের গন্ধ।

“কেন এসেছ? সবার সামনে একটা নাটক করবে বলে?” দিরা হিসহিস করে বলল। এতদূর থেকেও কথাগুলো যেন পরিষ্কার শুনতে পেল শর্বরী। পরমা এসে ওদের দু’জনের মধ্যে দাঁড়িয়েছে।

“দিরা দিস ইজ নট আবাউট দ্য টু অফ ইউ। এটা তোমার বাবার স্পেশাল ডে, তোমরা সেইমতো বিহেভ করো প্লিজ। আমার মনে হয়, সৃজন যে আজ এসেছে, সেটা তোমার বাবাকে সম্মান জানাতেই এসেছে, তোমাকে বিব্রত করতে নয়,” পরমা শক্ত গলায় বলল।

“ঠিক আছে। আজকের জন্য ও ওয়েলকাম। কিন্তু কেউ যেন কোনওরকম ফলস আইডিয়া না-করে বসে, নট ইউ আন্টি, নট ইউ মা, স্পেশালি নট ইউ সৃজন। আমরা যেখানে আছি, সেখানেই আছি। ওকে?

“ওকে দিরা। আই অ্যাম সরি টু বদার ইউ।”

“ঠিক আছে সৃজন। নাউ আন্টি, মে আই গো?”

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে ওরা দু’জন, দিয়ার পিছন-পিছন পরমা। ওপরে সৃজন একলা দাঁড়িয়ে আছে একলা, পাথরের মূর্তির মতো। বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল শর্বরীর।

রাজা যায় বনবাসে

“তোর দিদান আমার নিজের মা নয়। আমার নিজের মা মারা গিয়েছেন, যখন আমার চোন্দো বছর বয়স,” মা যেন মায়ের চেয়েও মৃদু গলায় বলেছিল। সেই ছাদ আর সেই বিকেল-সন্ধ্যার মাঝামাঝি সময়ে, জীবনে সেই প্রথমবার বৌদ্ধিক সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল ওকে। রাজর্ষি কিছুক্ষণ ভাবা গঙ্গারামের মতো মায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল, যেন এটাও ওদের সেই জাহাজ-জাহাজ খেলার মতো একটা গল্পকথা। ভালবাসার যে-দুর্গ ওকে এতদিন ঘিরে রেখেছিল, তার মধ্যে যে-ফাটল আছে, সেখান থেকে স্বার্থের শিকড় গভীরে নামছে ক্রমাগত, সেই অস্পষ্ট কিশোর বয়সে ওর পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। সেটা জেনেই হয়তো অনেক সময় নিয়ে একটু-একটু করে মা ওকে সব কথা বুঝিয়ে বলেছিল সেদিন। তবুও ওর মনের জঠরে বিপন্নতার যে-শিশু সেদিন জন্ম নিয়েছিল, ওর সঙ্গে

সঙ্গে তারও বয়স বেড়েছে, এখনও সিদ্ধবাদের বুড়োর মতো ওর কাঁধে চেপে সে বসে আছে, জীবনের চলাফেরায় তাই স্বস্তি নেই কোনওমতেই। আজকে এই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে বসেও প্রতিদিন সকালে রাজর্ষি টের পায় যে, সময় শুধু সেই ঘাড়ে চেপে বসে নাছোড়বান্দা বৃদ্ধের জেদই বাড়িয়ে দিয়েছে, তাকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি একটুকুও।

আপাতত, সব কাজ শেষ, এখন বাড়ির দিকে না-ফিরলেই নয়। তবুও গলফ কোর্স আর পাইনবনের ছায়ায় কিমিয়ে বসে থাকা এই অভিজাত মহল্লায় ঢুকে পড়ার আগে, একটা পেটল পাশে পাশে গাড়ি পার্ক করে বাইরের দিকে তাকিয়ে, চুপচাপ বসেই রয়েছে রাজর্ষি। আজ বিকেল থেকে বরফ পড়ার পূর্বাভাস, হাওয়ায় একটা অদ্ভুত লুকিয়ে থাকা এনার্জির আনাগোনা এখন। ঝরা পাতাদের মধ্যে অতি উৎসাহী ক'জন এর মধ্যেই নাচানাচি শুরু করেছে, একটু বাদেই হাওয়া জোর হবে, রাশি রাশি শুকনো পাতারা শেষবারের মতো উড়বে, তারপর ঢাকা পড়ে যাবে বরফের চাদরে। আগামী বসন্তে ওরা মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, ওদের মৃতদেহের ওপরে ফুটে উঠবে টিউলিপ আর ড্যাফোডিল।

সেই অস্পষ্ট কৈশোরে, ব্যারাকপুরে ওর সেই ভালবাসার দুর্গে ও যাদের অতি স্নেহশীল এবং সংস্কৃত এক পরিবারের বাসিন্দা ভেবেছিল, অচিরেই তাদের মধ্যে একাধিক দল পেকে উঠে যুদ্ধ লেগে গেল রীতিমতো। সৌম্যকান্তি যে-বয়স্ক মানুষটি এই দুর্গের সম্রাট ছিলেন যিনি নাকি রাজর্ষির অতি আদরের দাদু, একদিন দেখা গেল যে, তিনি শয্যাশায়ী এবং তাঁর রাজ্যে আর্থিক টানাটানি হঠাৎ করেই ঘোরতর বাস্তব। একদিকে আছেন জীবিত দিদান, তাঁর দুই মেয়ে, এক ছেলে, অন্যদিকে মৃত দিদান তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়েটি অল্পবয়স থেকেই ঘরছাড়া, প্রথমে লেডি ব্রোবোর্নের হস্টেলে থাকত, সেখান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানেও হস্টেল, তাই, তাই আগাগোড়াই একলা-একলা থাকে মেয়েটির অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। যদিও সে অসম্ভব রকম চুপচাপ এবং লাজুক তাও শেষ পর্যন্ত প্রেমে তাকে পড়তেই হল, না-হলে রাজর্ষির জীবনের গল্প লেখাই হত না কোনওদিন। মেয়েটি পছন্দ করে বসল, বেহালার এক উদাস্ত পরিবারের ছেলেকে, যে কিনা সুদর্শন, শিক্ষিত এবং স্মার্ট কিন্তু আর্থিক দিক থেকে পরিষ্কার দুর্ভাগ্য। বিয়ে করা অসম্ভব, যতদিন না ছেলেটি কিছু একটা চাকরি পায়, অর্থাৎ সারাদিন কাজের শেষে নাইট কলেজে পড়াশুনো শেষ করে একটা এমএ ডিগ্রি অন্ততপক্ষে হাসিল করতে পারে। সেই ডিগ্রি ধুয়ে কি জল বেরাবে, এবং চাকরি ব্যতীত অন্য কিছু পরখ করে দেখা যায় কিনা, সে-সব কথা অবাস্তব ছিল তখন। ছেলেটি আরও পাঁচটা উদাস্ত পরিবারের মতো নিজের আগে পরিবারের কথা ভাবতে শিখেছিল। সেই পরিবারে ছিল বাবা মা এবং ছোট বোন। বড় বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল দেশভাগের আগেই, জামাইবাবুটি যেমন বুদ্ধিমান তেমনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সে আগেভাবেই ঢুকে পড়ল স্বাধীন ভারতের নতুন কর্পোরেট সেক্টরে। ছেলেটা শেষ পর্যন্ত তার মেধা, বিশ্বাস আর বাইসাইকেল সম্বল করে অসম্ভবকে সম্ভব করেই ফেলল। সেই সময়ে বেসরকারি কলেজের লেকচারার দুশো টাকা মাইনে, টিউশনিতে প্রবল আপত্তি, তাই নিয়েও সেই সংবাদপত্র-পড়া শক্ত-চোয়াল মানুষটি সংসার চালানোর ভার তুলে নিল নিজের মাথায়। অনেক আপত্তির দেওয়াল ডিঙিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়েই গেল বিয়েটা, কেননা সেই মৃদুভাষিণী, অতি শান্ত মেয়েটি তার জেদ এবং সংসারসের মাত্রায় বাকি সকলকে সন্তুষ্ট করে দিল অনায়াসে। সেই থেকে দক্ষিণ কলকাতার বেহালা নামক এক অগোছালো এলাকায়, বেওয়ারিশ মাঠে গজিয়ে ওঠা চ্যাটার্জি কলোনির আড়াই খুপির ঘরটি রাজর্ষির ছেলেবেলার আশ্রয়, এবং মামাবাড়ি ব্যারাকপুরে ওর স্বপ্নে দেখা রাজপ্রাসাদ। বেহালার সেই ঘুপচি ঘর, তিক্ততা ও অনটন এবং তার পাশাপাশি মামাবাড়ির উদার অলিন্দ আর স্বচ্ছলতার মধ্যে কোনওরকমের মৌলিক সংঘাত ওকে বিব্রত করেনি, কেননা সেই চুপচাপ অথচ অতি-সংবেদনশীল মহিলাটি সর্বদাই ওর পাশে ছিল। এরই মধ্যে সময় এগিয়ে চলল, এক-এক করে ওর নিজস্ব অনুভূতিগুলো জন্মাল, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখল। সংসারের অমোঘ

নিয়মে একদিন সেই জন্মভূমির কল্লিত নিরাপত্তা থেকে অকস্মাৎ যুদ্ধে পাঠানো হল তাদের। ও তখন জানত না যে, পৃথিবীর সব রাজপ্রাসাদ আর সাম্রাজ্যের ইতিহাসে ঠিক এমনটাই হয়। ও জানত না কেন মানুষ বসতবাড়ি মটগেজ রেখে টাকা নেয়, ঠিকাদারি ব্যবসা চালাতে গেলে কী কী করতে হয়, মেয়েরা কেন গানের মাস্টারমশাইদের প্রেমে পড়ে, ভদ্রবাড়ির ছেলেরা কেমনভাবে রাজনৈতিক চক্রের পড়ে ক্রিমিনিয়াল বনে যায়। এই সবই ঘটতে থাকল ওর অকালপক চোখের সামনে দিয়ে, তার সঙ্গে-সঙ্গে ওর মনের ভিতরটাও অদৃশ্য সব ক্ষতচিহ্নে ভরে উঠল।

মানুষ যত পরিণত হয় ততই সে দুঃখগুলো লুকিয়ে রাখতে শেখে। এটাই জীবনের আদত পাঠশালা। এই অদ্ভুত পাঠশালায় না-আছে শিক্ষক না-আছে সিলেবাস, তবুও সবাই কী সুন্দর শিখে যায়। আরও গভীরে, আরও দুর্বোধ্যতার মোড়কের মধ্যে দুঃখগুলো জমা হতে থাকে। মানুষের মন যদি আকাশ হয়, দুঃখগুলো যেন সেই আলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকা ছায়াপথ। এর মধ্যে একটা ছোট তারার নাম দেওয়া হয়েছে সূর্য, কিন্তু সে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রহটির এতটাই কাছাকাছি যে, তার দীপ্তি সর্বময়। তার আলো যখন চোখের সামনে থাকে, আকাশ তখন আনন্দে ভেসে যায়, গভীর বিষণ্ণ ছায়াপথ তখন পালিয়ে যাবার পথ খোঁজে। সেই নিরাময়ী আলোর নাম ভালবাসা কিন্তু সত্যি সত্যি কয়জনে তার সন্ধান পায়? সূর্য নিভে গেলে নকল আলো দিয়ে যতক্ষণ পারে অন্ধকারকে ঠেকিয়ে রাখে মানুষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে তাকে থামতেই হয়, তখন আবার নেমে আসে অন্ধকারের শাস্বতসত্তা, বিরাট এক প্রশ্নচিহ্নের মতো ঝুলে থাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথের রহস্য ঘনিয়ে আসে চারিদিকে, সে মানুষের মনকে তার অক্ষম দেহ থেকে মুক্তি দিতে চায়। মানুষ বুঝতে পারে, ব্রহ্মাণ্ডে তার চেতনাটুকু যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন, ওইটুকুর মধ্যেই লুকিয়ে বসে আছে এক আকাশ ভরা দুঃখ।

যেমন এই মুহূর্তে ও বাড়ির সামনে পার্কটায়, বিকেলের রোদ মাথানো একটা বেঞ্চে বসে আছে। চারদিকে পাইন গাছের ছায়ারা লম্বা হচ্ছে, নানা রঙের, নানা ঢঙের এবং নানা বয়সের একটা জনস্রোত বয়ে চলেছে চারদিকে। কেউ কুকুর নিয়ে বেরিয়েছে, কেউ শিশুদের নিয়ে, কেউ একলা, কেউ সঙ্গীর সান্নিধ্যে, তাদের সকলের উপর অকুপণ ভাবে ঝরে পড়ছে দিনশেষের সোনালি রোদুর। একটু বাদে ওরা সবাই যে যার আশ্রয়ে ফিরবে, নিশ্চিত মনে পরদিন নতুন সূর্য ওঠার অপেক্ষায়। সেই ফাঁকে, সেই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে কার মনে যে কখন উঁকি মেরে যাবে বিচ্ছিন্নতার সেই চিরন্তন সংলাপ, কেই বা তার খবর রাখে?

রাজর্ষির মনে একটা প্রশ্ন বলসে উঠল হঠাৎ। তা হলে কি ভালবাসা জিনিসটাও ওই রোদুরের মতো, সে শুধু দুঃখগুলোকে ঢেকে রাখতে পারে, ভুলিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু তাদের লুপ্ত করে দিতে পারে না। রোদুর নিভে গেলে যখন পায়ে-পায়ে অন্ধকার এগিয়ে আসে, তখন প্রদীপ জ্বালিয়ে আর তারস্বরে উৎসবের বাজনা বাজিয়ে হয়তো আরও কিছুক্ষণ তাকে ঠেলে সরিয়ে রাখা যায়, এইটুকু মাত্র। শেষ পর্যন্ত সে তো আসবেই, তখন সেই বিষাদময় একলা অন্ধকারে জেগে থাকতে হবে আমাকে, তোমাকে। রাজর্ষি মনে-মনে ভাবার চেষ্টা করল ওর বহুকালের প্রিয় এক বাক্যমালা, উপনিষদের সেই রাজা এবং ঋষির অনন্য কথোপকথন। রাজা জনক জিজ্ঞেস করছেন, ‘অন্তমিতে আদিত্যে চন্দ্রমস্যন্তমিতে শান্তেহস্ত্রী শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরৈব্যাস পুরুষঃ?’ যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিচ্ছেন, ‘আত্মৈব্যাস জ্যোতির্বভবতি’। যখন সূর্য চন্দ্র তারা হারিয়ে গিয়েছে, প্রদীপ নির্বাপিত, সব কোলাহল শান্ত, তখন কে তোমার দিশারী? রাজা জনকের প্রশ্নটা অসাধারণ কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরটি এমন অসহ্য রকম মৌলিক—তখন আত্মাই তার জ্যোতি হয়, আত্মজ্যোতি সহায়ের সে ওঠে বসে, চলে, কাজ করে এবং গৃহে ফিরে আসে।

এই জায়গাটায় এসে চিরকাল খটকা লাগে রাজর্ষির। অবশ্যই ওর ব্রহ্মজ্ঞান নেই, শুধু এক প্রখর চেতনা আছে, কিন্তু সেই চেতনার মধ্যে জ্যোতির চেয়ে সংশয় বেশি। মানুষ কার কাছে ফিরে আসে? ঈশ্বরের বাণী, যা পবিত্রগ্রন্থে লেখা আছে, যা তাঁর দূতেরা যুগে যুগে প্রচার



করেছেন, তাদের কাছে? সেই সব বাণীর উদ্ভট বিষয়বস্তু, আড়ালে-আড়ালে মতলববাজি এবং স্ববিরোধ, সবই তো ওর কাছে পরিষ্কার। তা সত্ত্বেও প্রায়ই আজকাল ওর মনে হয়, আত্মজ্যোতি নয় বরং অন্ধবিশ্বাস নামক বস্তুটিই মানুষকে বাস্তবিক শান্তি আর সহায়তা দিতে পারে। সেই অন্ধবিশ্বাস মাথায় রেখেই সে ওঠে, বসে, কাজ করে এবং ফিরে আসে। ছোটবড় নানা সুখের সন্ধানে সে ফিরে আসে সংসারের কাছে, সমাজের কাছে, নিজের সীমিত বুদ্ধি নিয়েই সে সংসার করতে শিখে যায়। বিশ্বাস যেন এক জাগ্রত সুষুপ্তি, যার আড়ালে লুকিয়ে থাকলে ছায়াপথের অনন্ত আহ্বান শুনতে পায় না মানুষ। ক্ষুদ্র নিয়ে খুশি থাকে বলেই হয়তো বৃহত্তর ডাক আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নানা অলীক ধাক্কা দিয়ে ব্যস্ত করে রাখতে পারে নিজে। বিশ্বাস যেন সেই ছেলেভুলানো গল্প, আরও একবার ভালবাসার দুর্গে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি। রাজর্ষি এটাও জানে যে, বিশ্বাসের অলীক জগৎ থেকে একবার বেরিয়ে গেলে, সেখানে নতুন করে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। আপাতত, সেই নিরীক্ষায় ওর রুচি নেই, সময়েরও একান্ত অভাব, তাই ফিরে আসার প্রশ্নটাও এখানে অবাস্তব।

আকাশে স্বচ্ছ বেদানার মতো রং মিলিয়ে যাবার আগেই সন্ধ্যাতারা উকি মেরেছে, ঘড়িতে সোয়া ছ'টা, এখন বাড়ি ফেরার সময়। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে নিজের জীবনটার দিকে একবার খুব করে তাকিয়ে দেখল রাজর্ষি। নাঃ, কোনও উপায়েই ওর জীবনটাকে ব্যর্থ বলা সম্ভব নয়, অথচ দিনের শেষে এর মধ্যে সার্থকতা বলতেও কিছু নেই, এ শুধুই এক এলোমেলো নৈরাজ্যের ইতিহাস। একটা নামকরা টেকনোলজি কোম্পানির সিনিয়র এঞ্জিনিয়ার ও, অফিসের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে ওর নিজস্ব একাধিক পেটেন্ট এবং পুরস্কারের স্বীকৃতি। পেশাগত এলাকায় অর্থ এবং সুখ্যাতি, দুটোই থরে থরে এসেছে, কিন্তু তারই হাত ধরে এসেছে একঘেয়েমি আর অবসাদ। উচ্চাশা একদিন মুখ খুবড়ে পড়েছে, কোম্পানির সিইও হওয়ার স্বপ্ন সফল হয়নি। কাঁচের দেওয়ালে ধাক্কা খেতে-খেতে নিজের সীমাবদ্ধতা টের পেতে হয়েছে ঠিক সময়ে। সমাজ নামক সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্কের খাতায় যদিও মোটামুটি উজ্জ্বল হওয়া শুরু হয়েছে, তাও দিনের শেষে ও শুধুই একজন অনামী এবং অপরিচিত মানুষ, ভিড়ের মধ্যে আর-একজন ছাড়া কিছুই নয়। যে-যান্ত্রিক কাজ ও করে চলেছে, যে-যান্ত্রিক জীবন ও বাঁচছে সে শুধুই অস্তিত্বের খাজনা মেটাবার জন্য, তার মধ্যে না-আছে আবিষ্কার, না-আছে সৃষ্টিশীল চেতনার স্পন্দন। জীবন থেকে সব রকমের তীব্রতা উধাও, যা কিছু একদিন প্রিয় ছিল, মূল্যবান ছিল, তার প্রায় সবটাই এখন পানসে। রাজর্ষি বুঝতে পারে যে, আসলে ও নার্সিসিস্ট, ওর বেঁচে থাকার জন্য শংসা এবং স্বীকৃতি দুটোই প্রায় শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো দরকারি। অগ্রগতির সেই সূচকটি যতদিন উর্ধ্বগামী ছিল, ওর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা হয়নি কিছুই। হঠাৎ একদিন আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে, ডিসেম্বরের এক কনকনে ঠান্ডা রাতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল ও। বাইরে এসে দেখেছিল মোহাম্মদ আকাশ, কিন্তু তার মধ্য থেকে এক অদ্ভুত তামাভ উজ্জ্বলতা ফুটে বেরোচ্ছে। তুষারঝড় আসার আগে এইরকম হয়, হাওয়ার মধ্যে যেন এক অশুভ শক্তি ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায়, ভয়ে চূপ করে থাকে গাছপালা। ঠিক সেই সময়ে ওর মনে হয়েছিল, জীবনের সূচক থেমে গিয়েছে, এখন থেকে সব ফ্ল্যাট লাইন, প্রতীক্ষায় আছে শুধু এক শীতল শূন্যতা, ঠিক যেমন আজকের এই অনাগত তুষারপাত। যাই হোক না কেন, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় হয়তো ছিল কিন্তু নিজের থেকে বাইরে তাকাবার একটাও সুযোগ ছিল না ওর। ও হয়তো ভেবেছিল, ছেলেমেয়েরাই হবে ওর উচ্চাশার উত্তরাধিকার, তাদের সাফল্যই হবে ওর শেষ স্বীকৃতি। ইদানীং সে আশাতেও ছাই পড়েছে, দিরা আর রুণু দু'জনেই কবে যেন হারিয়ে গিয়েছে এ-যুগের অখণ্ড স্বেচ্ছাচার আর গর্বিত স্বার্থপরতার খরস্রোতে। রাজর্ষিও জানে যে, ওর পালাবার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই বিগত বছরগুলোর ভুলভ্রান্তির বোঝা নামানোর জন্য মনের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত উঠোন খুঁজতে থাকে ও। আজ সেই উঠানের ধুলোবালির মধ্যে একটা লুকিয়ে থাকা দরজার হদিশ পাওয়া গিয়েছে। এবার কোন চাবি দিয়ে সেই অস্তিম দরজা খোলা হবে, প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে সেটাই।

জন্মদিনের চুপকথা

“চুপ, চুপ, বাবার গাড়ি গ্যারেজে ঢুকেছে,” রুণু ঘোষণা করল, সঙ্গে-সঙ্গে বাকিরাও ব্যস্ত হয়ে উঠল। এমনকি দিরাও ওর অগ্নিদৃষ্টি সামলে একতলায় নেমে এসেছে। সৃজন বোকর মতো দাঁড়িয়ে আছে ওর ঘরের দরজায়। শবরী কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় চারদিকে তাকিয়ে, দরজাটা খুলে দাঁড়াল।

“বাপরে বাপ, কী কাণ্ডটাই না করেছ তোমরা সকলে মিলে! জানতাম কিছু তো একটা হবে কিন্তু এতজন পুরনো পাপী একসঙ্গে এসে হাজির হবে, এ তো জনা ছিল না,” বাড়ির পরিস্থিতি দেখে রাজর্ষি হতবাক, ওদিকে ওর চারদিকে কোলাহল ধাপে ধাপে চরমে উঠেছে তখন।

হ্যাপি বার্থডে বাবা!

হ্যাপি বার্থডে রাজ আঙ্কল!

হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার ফ্রেন্ড!

হ্যাপি বার্থডে ওল্ড ম্যান!

“থ্যাক্স ইউ, থ্যাক্স ইউ, থ্যাক্স ইউ! ওরেবাস, হোয়াট আ প্লেজন্ট সারপ্রাইজ। তা এই যড়যন্ত্রের মাথাটা কে শুনি?” রাজর্ষি বেশ একটু ঘাবড়েই গিয়েছে। এতগুলো মানুষ এখানে উৎসব করতে এসেছে, ওর বিপন্নতার সাক্ষী হতে তো কেউ আসেনি। মুখের ওপর থেকে অন্ধকার ছায়াটা মুছে ফেলতে হবে যে-করে হোক।

“মাথাটা নয়, মাথাদুটো— তোর আর আমার বউ। কিছু কিছু জিনিস বদলায় না,” রথী হাসল।

দেখতে-দেখতে ঠিক যেমনটা হওয়া উচিত, আজ সন্ধ্যার সারপ্রাইজ পাটি ঠিক তেমনটাই জমজমাট হয়ে উঠল। দেদার হইচই, হল্লোড, আলিঙ্গন আর শুভকামনার স্রোতে ভেসে গেল ওরা সবাই। একের পরে এক শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হয়েছে, সুরার বাষ্প ছড়িয়ে পড়ছে সিলিং থেকে কার্পেটে। রোজকার কেজে শব্দভাণ্ডার থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে যাওয়া নানা উদ্ভট প্রলাপ যেন ছত্রাকের মতো শ্যাম্পেন ভেজা মাটি থেকে মাথা তুলছে চারিদিকে। ছোটবেলার সব রূপকথারা এখন ডানা মেলে উড়ছে, বিরাট ঘরটার মধ্যে কোলাহল বেড়েই চলেছে ক্রমাগত। তারই মধ্যে হঠাৎ কানের কাছে সেই পরিচিত ফিসফিসানি আবার।

“রাজা, একটু শোনো। সৃজন এসেছে, আমাদের কথা বলা দরকার,” ওর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল শবরী।

“কেন? কথা বলার দরকার কেন? ওদের জীবন ওরা বুঝে নেবে, আমাদের তাতে কী এসে যায়? ওরা কি আমাদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোনওদিন?” রাজর্ষির গলায় তিক্ততা।

“কী বলছ! তুমি কি চাও না যে, ওদের জীবনটা ঠিক পথে যাক, যা কিছু গোলমাল হয়েছে, সে-সব ওরা নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিক?” শবরীর গলাটা অসহায় শোনা, “এখানে আমাদের কি কিছুই করার নেই রাজা?”

“হয়তো আছে, কিন্তু এই নিয়ে কথা বলতে গেলে তোমার মেয়ে সবার আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। তার চেয়ে অপেক্ষা করে দেখো কী হয়,” রাজর্ষি বলল। ঠিক সেই সময় দরজার দিক থেকে হইচই উঠল আর-একটা। আজকের পাটির শেষ অতিথিটি এসে হাজির হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

“এত দেরি করলি কেন? আয় আয়! বাটা, সেই যবে থেকে ঢপের সিইও হয়েছিস, তোর দর বেড়ে গেছে খুব!”

রুণুর গলা। ও একজনকে হাত ধরে টানতে-টানতে রাজর্ষির সামনে নিয়ে এসেছে। যুবকটি বেশ লম্বা, সুন্দর কাটা কাটা চোখমুখ, তীক্ষ্ণ নাক, চুল পাতলা হতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। ওর গালে বেশ কয়েকদিনের না-কামানো দাড়িগোঁফ, কিন্তু চোখমুখ হাসি-মাখানো। হাসিটা কেমন যেন চেনা-চেনা, ওপরের দাঁতগুলো একটু ভিতরদিকে বাঁকা, ডেন্টিস্টদের ভাষায় ‘আন্ডারবাইট’। রাজর্ষি ওর দিকে তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ, মনে হল কী একটা যেন মিস করে যাচ্ছে, কিন্তু ভাল

করে বোঝার উপায় নেই এই মুহূর্তে।

“আমাদের খুদে কোম্পানির ফাউন্ডিং প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও মণীশ মিত্র, ওরফে মণি।

“হ্যাপি বার্থডে আঙ্কল!”

“এসো এসো, তোমার কথা অনেক শুনেছি। দ্য ম্যাথ জিনিয়াস অ্যান্ড দ্য টেক গুরু!”

“নাইদার। টেক গুরু যদি কেউ থাকে, সে আপনার ছেলে,” রুণুর কাঁধে একটা চাপড় লাগাল মণি, দু’জনেই হেসে উঠল গলা খুলে।

“সত্যি, কী যে কাণ্ড বাধিয়েছ তোমরা সকলে, আমি তো অবাক। আরে বাবা, যাট বছরের জন্মদিন মানে তো শোক দিবস, এখন থেকে সূচক সর্বদাই নিম্নগামী,” নিজের গলাটা নিজের কানেই কেমন যেন অদ্ভুত শোনা রাজর্ষির। এই পরিস্থিতিতে ঠিক কতটা উচ্ছাস দেখানো উচিত? অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ মিলিয়ে এতগুলো মানুষ যে একসঙ্গে সবাই এসে হাজির হবে, এটা ও আদর্শেই আশা করেনি। এরা কি সবাই রাজর্ষিকে ভালবাসে বলেই এসেছে, না এর মধ্যে কিছু একটা যড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যায়? হয়তো কিছুই কিছু নয়, এসব হইচই আসলে এক বস্তাপচা সামাজিক সার্কাস। ওর মনে পড়ল, বছরখানেক আগে রমিতাও এইরকম একটা সারপ্রাইজ পাটি দিয়েছিল ঋতুর জন্য। খুব সেজেছিল রমিতা সেদিন, স্বামীকে পাশে নিয়েই বাকি সব ছেলেদের সঙ্গে চুটিয়ে ফ্লাট করছিল, রাজর্ষিও বাদ যায়নি। মনের আকাশে একটা নির্বাক জ্বলন যেন রূপকথায় পড়া আগুনপাখির মতো পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছিল সারা সন্ধ্যা-রাত্তির জুড়ে। আর এই যে রুণু আর মণীশ, এদের ব্যবহার কেমন যেন অন্যরকম। একটা বাঙালি পাটিতে এসে একটু স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারে না ওরা? এই আর-এক জ্বলন, এরও কোথাও আদি-অন্ত নেই। তা ছাড়া এই মণীশ ছেলেটাকে যতই দেখছে ততই কীরকম যেন চেনা-চেনা লাগছে, এও এক বিদঘুটে ব্যাপার।

একমাত্র বাইরের তরল আগুন ঢেলেই ভিতরের আগুনকে শীতল করা যায়। অতএব কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল যে, পাটি জমজমাট, হইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে দুই বন্ধু মশগুল হয়ে রয়েছে, সেই যেন আগের দিনের রাজা আর রথী। এরই মধ্যে গুটিগুটি পায়ে সৃজন নেমে এসেছে, সকলের সঙ্গে টুকটাক কথা চালিয়ে যাচ্ছে বেশ ভালই, যদিও দিরাওর থেকে শতহস্ত দূরে। রাজর্ষি লক্ষ করল, দিরাওর অদ্ভুত একটা সোফায় বেশ খেঁষাখেনি করে বসে আছে। দিরাওর উচ্ছল হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে এতদূর থেকেও, কথা আর হাসির ফাঁকে ফাঁকে পারলেই অন্তর গায়ে ঢলে পড়ছে ও। কিছু বলার নেই, ছোটবেলার বন্ধু, এক সময় ভাইবোনের মতোই বড় হয়েছে ওরা। ভবুও এই হাসির তীক্ষ্ণতা, এই চোখের বিদ্যুৎ, সবই হয়তো সৃজনের হৃদয় লক্ষ্য করে ছোঁড়া, সেগুলো যথাস্থানে বিঁধছে, হয়তো রক্ত পড়ছে, কিন্তু কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

“দিরাকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে না?” এলোমেলো কথাবার্তার মধ্য থেকে প্রশ্নটা ভেসে এল ঠিক যেমন মেঘের ফাঁক থেকে আলো ঠিকরে আসে।

‘দেখে কী লাভ বল? আর-একটা ডিজাস্টার ইন দ্য মেকিং,’ তিক্ত হাসি হাসল রাজর্ষি।

“কাম অন রাজা, অন্ত প্রুড হোস না। ছোটবেলার বন্ধু ওরা, একটু আলগা ফ্লাটিং করতে দে না বাবা,” রথী বলল।

“আচ্ছা! প্রুড হোস না কিন্তু সোচ সমঝকে, সুযোগ পেলেই আলগা ফ্লাটিং করিস, দুধের সাধ ঝোলেই মেটাস,” হাসি আর উত্তর একই সঙ্গে ফেরত দিল রাজর্ষি, “এখানে সঙ্কলেই কোথাও একটু প্রুড আর কোথাও একটু ফ্লাট হয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, তাই নিয়ে সামাজিক পুলিশের কোনওই মাথাব্যথা নেই। এটাই তো তোরা লাইফ-ফিলসফি, তাই না রে রথী? আই নো ইটস ওয়াকিং ফর ইউ, কিন্তু কিছু কিছু লোক আছে, মাত্রা রাখা যাদের ধাতে নেই। তাই তাদের জন্য এক যাত্রায় পৃথক ফল।”

“বাপ রে, তুই তো সিরিয়াস হয়ে গেলি! যাই বল, ফর সাচ এ গ্র্যান্ড বার্থডে পাটি, তোকে বেশ একটু অফ মুড দেখাচ্ছে কিন্তু। কী ব্যাপার বলো দেখি বন্ধু, পেটে কথা রেখে দিয়েো না, অম্বল হবে,” রথী গ্লাসে

একটা বড় চুমুক দিল।

“আরে না না, ইয়ার্কি মারছিলাম। তোরা এত দূর থেকে সবাই এসেছিস, আমি খুব খুশি হয়েছি রে। এত খুশি হয়ে গেছি যে, কেমন যেন ভয় করছে,” অদ্ভুত গলায় বলল রাজর্ষি। রথী ভাবার মতো তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ। অনেক সময়ে মানুষের কথা শুনে চট করে বোঝা যায় না যে, সে খুশি হয়েছে বা হয়নি, কিংবা হয়তো কঠিন ব্যঙ্গের কুয়াশার আড়ালে লুকিয়ে রাখছে সবকিছু।

“দ্যাখ তোর সঙ্গে আমার আগেই কথা বলা উচিত ছিল। স্বীকার করছি, ইদানীং দিরার সঙ্গে অস্তুর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। আমাদের স্ত্রীরা সব জানে কিন্তু মনে হয় বাগড়া দিতে চায় না, না-হলে অ্যাঙ্গলো কুরুক্ষেত্র হয়ে যেত। তা ছাড়া ওদিকে তোর জামাই তো বেয়াদপি করেই চলেছে, কোনওমতেই বশ মানছে না। আজকালকার গল্পো জানিস তো— ছোকা-ছুকরিরা পয়লা বিয়েটা করে অ্যাঙ্গলো এন্ট্রপরিমেন্ট, ব্যাপারটাকে শুধু একবার বুঝে নেওয়ার জন্য। এই নিয়ে আমাদের বুড়ো ভামদের চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। আগে চলতে-চলতে দ্যাখ কী হয়, আমি বলছি খারাপের বদলে ভালই হবে হয়তো।”

রাজর্ষি হাই তুলল। এটা তা হলে শুধু বুড়ো ভামের জন্মদিন উদ্‌যাপন নয়, এর পিছনে কিছু গোপন পারিবারিক আঁতাত গড়ে তোলার বন্দোবস্তও হয়েছে। এর মাঝখান মূর্তিমান কাবাব-মে-হাড্ডি সৃজন বেচারি এসে হাজির। ব্রিলিয়ান্ট, কিন্তু মুখচোরা, কাজ পাগল এবং কিছুটা অসামাজিক ছেলেটার জন্য মন খারাপ লাগল রাজর্ষির। কেমন এক কোণায় বসে একমনে ফোন দেখে যাচ্ছে, ওর মনের মধ্যে কী চলছে বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

“সৃজন এসেছে। তোর মনে হয় না রুঁদেভুটা বেশ একটু জটিল, এমনকি অসঙ্গত বললেও ভুল হয় না। এককালে এই নিয়ে ডুয়েল হয়ে যেত,” রাজর্ষি বলল। ইতিমধ্যে শবরী আর পরমাও পায়ে-পায়ে ওদের কাছাকাছি এসে হাজির হয়েছে।

“আচ্ছা আমি কী করে জানব? দিরাকে বারবার জিজ্ঞেস করলাম, ওরে, এটা একটা ফ্যামিলি ইভেন্ট, তুই কি শিওর যে, ও আসবে না? সে মেয়ে পরিষ্কার বলে দিল, ওর কনফারেন্স না কী যেন একটা আছে, আসা অসম্ভব,” শবরী উত্তেজনা প্রায় ঢেঁচিয়ে ফেলছে, ওর হাতে চিমটি কেটে থামাল পরমা।

“আন্তে, সবাই শুনতে পাবে। আচ্ছা তুই এত আপসেট হচ্ছিস কেন বল তো, এক সময় তো তোর মুখে জামাইয়ের বদনাম শুনতে-শুনতে কান পচে গেছিল আমার? আর, শোনো রাজাদা, মেয়েদের দখল নেওয়ার জন্য ডুয়েল লড়ার দিন শেষ। দিরা যা-চাইবে তাই হবে, এক্ষেত্রে আমাদের কিছু বক্তব্য থাকা উচিত নয়,” পরমা বলল।

“কিন্তু আমাদের নিজস্ব মতামত বলে কিছুই কি থাকবে না, এক পয়সা দাম হবে না তাদের! এই ছেলেমেয়েগুলোকে তুই আর আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি, তার কোনও মূল্য নেই?”

“তুই যাই বলিস না কেন, ছেলেমেয়েরা যতদিন ছোট থাকে ততদিনই তারা সুন্দর। একটা কুকুর যেমন যতদিন বাঁচে তাকে আনন্দ দেয়, কেননা সে বড় হতে জানে না। মানুষ বড় হতে না-হতেই ব্যক্তিগতসুখ আর স্বার্থের খোঁজ পেয়ে যায়, তখন থেকে পরিবার তার কাছে জাস্ট একটা শব্দ। ইন ফ্যাক্ট, মানুষ লোককে দেখানোর জন্য যেমন গয়না পরে তেমন পারিবারিক পরিচয়টাও গলায় বুলিয়ে রাখে, দ্যাটস ইট,” রথীন একটা অদ্ভুত হাসি হাসল।

“এটা কিন্তু খুবই নেগেটিভ কথা বললে রাজাদা। দেখো, আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রচুর লেখাপড়া শিখেছে, আশা করা যায় বেসিক ভালমন্দের বিচার করার ক্ষমতা হয়েছে ওদের, কিন্তু ওরা যে আলাদা রকমের মানুষ, সেটা মনে রাখা জরুরি। তা ছাড়া ইন্টারনেটের যুগে এক প্রজন্ম অন্য প্রজন্মের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে মাথা ঘামাবে, এ শুধু পাগলের চিন্তা,” পরমা একটু ব্যথিত গলায় বলল। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কুকুর-বেড়ালের তুলনাটা ওর সহ্য হয়নি, কিন্তু আজকে এই মুহূর্তে ঝগড়া করতেও মন চাইছে না।

“আমার ছেলেমেয়ে যদি আমার ফিলিংস না-শেয়ার করে, তা হলে করবেটা কে?”

“যদি তোর বন্ধু থাকে তবে সে করবে, কিন্তু আমার মতে পারিবারিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া একটু মুশকিল, তার জন্য অন্যরকম এনার্জি লাগে। আর যদি ইন্টারনেটে বা ডিজিটাল কমিউনিকেশনের ব্যাপারটা ভেবে দেখিস তা হলে বুঝবি অভিজ্ঞতা আর স্কলারশিপ, দুটোই এই পরিবেশে মোটামুটি বেকার। এই দ্যাখ, তোর মনে যা-আসে জিজ্ঞাসা কর না, যেমন কিনা রবীন্দ্রনাথের দাদু কবে মারা গেছিলেন, মৃচ্ছকটিকম-এর লেখক কে, তার হিরো-হিরোইনের নাম কী, মিএগ তানসেনের গুরু কে ছিল কিংবা বখতিয়ার খিলজি কত সালে বাংলা আক্রমণ করেছিলেন? যে-কোনও বালখিল্য সেসব গুগল করে এক মিনিটে বলে তো দেবেই, তোকে কিছু শিখিয়েও দিতে পারে। ঠিক তেমনই, জীবন বা জীবিকা নিয়ে তোর যা কিছু মতামত, সেসব ওরা ওদের মতো করে যাচাই করে নেবে, তাই নিয়ে হাজার গুণ মতামত হওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। বাবা-মা হিসেবে তোর মতামত এক্সট্রা মাইলেজ কিছু পাবে না, এটা মেনে নে, তা হলে দেখবি কষ্ট কম হচ্ছে,” রথীন দম নিতে থামল কিন্তু ওর মুখেচোখে একটা পুরনো উত্তেজনা, যেমনটা কলেজের ডিবেট সভায় দেখা যেত। শবরীর মুখ দেখলেই বোঝা যায় যে, ওরও প্রচুর বক্তব্য আছে কিন্তু গুছিয়ে বলার মতো এনার্জি নেই।

“তুই ওই সব নিয়ে ভাব। আমার মনে নেওয়ার দিন শেষ,” ঠক করে গ্লাসটা কাউন্টারের উপর নামিয়ে রেখে ঘরের অন্যদিকে চলে গেল রাজর্ষি। ওদিকে রমিতা ইতিমধ্যেই ইমনকল্যাণ বন্ধ করে, তার বদলে কানফাতানো পঞ্জাবি ভাঙা চালু করে দিয়েছে। রাজর্ষিকে দেখেই খপ করে ওর হাতটা ধরে ফেলল রমিতা।

“হে বার্থডে বয়, হোয়াট আবাউট আ ড্যান্স? কী বলো সবাই। শবরীদি, কাম অনা!”

শবরী যদিও এল না কিন্তু অন্য কয়েকজন আসরে নেমে পড়ল ঝপাঝপ, তাদের সকলের আগে দিরা আর অস্ত। দিরা যেহেতু রীতিমতো ট্রেনিং নেওয়া নাচিয়ে এবং এই বাবদে অস্ত নেহাত আনাড়ি, তাই ওদের যুগল প্রচেষ্টা দর্শনীয়। রমিতা প্রায় টানতে-টানতেই রাজর্ষিকে ড্যান্স ফ্লোরে নামিয়ে আনল। সেখানে আনাড়ি পদক্ষেপ ফেলতে-ফেলতে রাজর্ষি লক্ষ করল, ওর উন্মুক্ত কাঁধের ওপরে পিছলে যাওয়া আলো, সযত্নে সাজানো চোখে ছুরির ঝলকানি। এই সবই একদা প্রিয় ছিল, কাম্যা ছিল। আর এখন?

নিজের ছোট অফিসের দরজা বন্ধ করে আধো অন্ধকারে চুপচাপ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল রাজর্ষি। পকেট থেকে ওয়ুথের কৌটো বার করে ট্যাবলেট গিলে ফেলল আরও-একটা। ও সত্যিই আশা করেনি যে, এত লোক এসে হাজির হবে। যাই হোক, আপাতত ওখানে উদ্দাম পার্টি চলছে, কেউ ওর অনুপস্থিতি চট করে ধরতে পারবে না। এই মুহূর্তে হালকা আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওয়ুথের কৌটোগুলো এবং এক গাদা প্রিন্টেড পেপার যা নাকিও ব্যাগ থেকে বার করে টেবিলের ওপর পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখেছে।

পয়লা ডকুমেন্ট একটা হাসপাতালের ডিসচার্জ সামারি, খুবই প্রাঞ্জল ইংরেজিতে লেখা— প্রিয়বর, আপনার জন্মসই হয়েছে, এবং আপনার পিত্তনালী অর্থাৎ বাইল ডাক্টটাই অত্যধিক ফোলা, সুতরাং আমরা আপনারকে গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিতে রেফার করছি। আশা করা যায়, এটা শুধু একটি বৈখাপ্তা পিত্তশিলা বা বাইল স্টোনের দুর্ভিক্ষ, যা কিনা অবিলম্বেই নিজের পথ দেখবে, এবং আপনার খাদ্যনালী আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। অবশ্য যদি এটা না-হয়, তা হলে ভাবতে হবে যে, পাথরের বদলে ওটা টিউমর হতে পারে কিনা এবং সেক্ষেত্রে আপনার বিশেষ প্রযত্নে সদাই উদগ্রীব থাকবেন আমাদের গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট এবং অফ্রোলজি বিভাগের সহকর্মীরা, আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক কুশল যাদের উপস্থিতির একমাত্র উদ্দেশ্য।

মানুষের শরীরে পাথর তৈরি হয়? এটা একেবারেই অজানা নয় কারণ কলেজে চলে যাওয়ার আগে ক্ষণিকের সুযোগে, সেই সেদিনের সদ্য-

যুবতী সুমনাকে এমনই অদ্ভুত কথা বলেছিল ও। বলেছিল, কেননা রাজর্ষি তখন উন্মাদের মতো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভক্ত। ও বিশ্বাস করত, মানুষের হৃদয়ের মধ্যে স্মৃতি নামক পাথরের টুকরো খেলে বেড়ায়— ভিতরে তার পাথর আছে, পাথরখণ্ডগুলি। তারে নাড়ায়, যেমন নাড়ায় পুরনো অঙ্গুলি। পুরনো তার ফুলের মুখে ছড়িয়ে আছে ধুলো। ভিতরে তার পাথর আছে, পাথরখণ্ডগুলো।

এই সব ভাঙারি অনুসন্ধান প্রায় ছয়মাস আগে ঘটে গিয়েছিল। পিকনিকে দেদার তন্দুরি চিকেন খেয়েছিল ও, তারপরে পেটে অসহ্য ব্যথা এবং তড়িঘড়ি ইমার্জেন্সি যাত্রা। শরীরী এই পর্যন্ত জানে, কিন্তু তার পরের গল্পটি ভাঙারদের প্রতি রাজর্ষির কঠোর নির্দেশে অজানা। এন্ডোস্কোপি করে যখন দেখা গেল যে, ওর প্যানক্রিয়াসে একটা টিউমর গজিয়েছে এবং সেটাই যত নষ্টের গোড়া, তখন থেকেই বাকি সব গল্প লুকিয়ে রেখেছে ও। এর মধ্যে নানারকমের ছবি তোলা হয়েছে, বন্ধ হয়ে যাওয়া পিভনালীতে স্টেন্ট বসিয়ে তাকে চালু করার ব্যবস্থা হয়েছে, পাকস্থলীর ভিতর দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে বায়োপ্সি করাও শেষ। এই সব কাণ্ড একে-একে ঘটে গিয়েছে গত দু'মাস ধরে, কিন্তু বাড়িতে ঘুগাঙ্করেও কেউ জানতে পারেনি। ওরা জেনেছে, রাজর্ষির শরীর, মেজাজ কিছুই ভাল নেই। আর তার কারণ অফিসের হাঙ্গামা এবং ওর পেটের গন্ডগোল, যা সম্ভবত স্ট্রেস এবং অত্যধিক মদ্যপান থেকে উৎপন্ন, যেমন নাকি আধুনিক জীবনের বাকি সব কিছু।

আজ থেকে হুগুখানেক আগে পুরো ডায়াগনোসিস হাতে পেয়েছে রাজর্ষি। এটা স্টেজ ফোর প্যানক্রিয়াটিক ক্যানসার, অসুখটা জঘন্য টাইপের এবং ইতিমধ্যেই লিভারে ছড়িয়ে পড়েছে, অতএব সেরে ওঠার আশা শূন্য। নানারকমের পরীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু এটা এমনই বেয়াড়া স্বভাবের টিউমর যে, আধুনিক বিজ্ঞান তার কাছে পুরোপুরি জন্ম। কেমোথেরাপি নিলে নানা কিসিমের সাইড এফেক্টে জেরবার হতে-হতে খুব জোর বছরদেড়েক বেঁচে থাকতে পার, না-নিলে মোটামুটি তিন মাসের মধ্যে গল্পো শেষ।

“আমি ভেবেছিলাম আজ ফ্যামিলির সবাইকে বলব যে, আমি চিকিৎসা নিতে রাজি নই। জীবনের যেটুকু বাকি আছে সেটুকু আমি আমার ইচ্ছেমতো বাঁচতে চাই। আমার পকেটে কলকাতা যাবার জন্য এরোপ্লেনের একটা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট আছে। বাকি সব তোমাদের জন্য রইল, তোমরা বুঝে নিয়ো কিন্তু প্লিজ আমাকে তাড়া করো না। তোমাদের জন্য তো অনেক করেছে, এবার এই সামান্য বাকি সময়টুকু আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। হয়তো আমি তিব্বতের কোনও পাহাড়ি চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে স্থানীয় এক বেসুরো ব্যান্ডের সঙ্গে গলা মেলাব। অথবা ইউরোপের কোনও শহরে, পাথরে বাঁধানো চৌরাস্তার কাফেতে বসে থাকব সারাদিন। এটা যে অবাস্তব, তা আমি জানি। বাস্তব মানেই এক অশ্লীল বিপন্নতা, তার হাত ছাড়িয়ে পালানোর জন্য একটাই দরজা খোলা আছে, যার নাম মৃত্যু, আমি সেই দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছি।” নিজের মনে তৈরি করে রাখা কথাগুলো বলতে-বলতে কেমন যেন হাসি পেল রাজর্ষির। সব গুবলেট হয়ে যাচ্ছে, এটা এখন আর শুধু ওর নিজের পারিবারিক কিসসা নয়। এতগুলো মানুষ এসে হাজির হয়েছে, এদের সকলের সামনে অভিনাটিকীয় কিছু করা অসম্ভব। বিদঘুটে একটা হইচই বেধে যাবে। সেসব সামলানোর থেকে চুপচাপ মারা যাওয়া অনেক সহজ। অন্য কোনওরকম কিছু একটা প্ল্যান করতে হবে যথাসময়ে। মাথার মধ্যে ফয়সালাটা হয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে পালকের মতো হালকা মনে হল, রাজর্ষি গানের তালে-তালে গা দোলাতে শুরু করল আবার। মুখের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া মুখ খুঁজে বের করার চেষ্টায় ওর বাকি রাতটা কাটবে। রমিতার কাঁধ আর পিঠের ওপর আলো-অন্ধকারের খেলা দেখতে বেশ ভালই লাগছে এখন।

প্রেম, মৃত্যু, ভালবাসা

আগেকার দিনে গ্রামেগঞ্জে, বাড়ির কাছাকাছি একটা পুকুর থাকতেই হত।

ছাই দিয়ে বাসন মাজা আর সোড়া দিয়ে কাপড় কাচার মতো দরকারি কাজগুলো হত সেখানে। মামাবাড়ির পুকুরের ধার, সেখানে অযত্নে বেড়ে ওঠা কচুগাছের জঙ্গলে রাজর্ষির দুপুরবেলার অভিযান চলতেই থাকত, বাড়ির অন্যরা প্রায় সবাই যখন স্কুলে, কাজেকর্মে অথবা নিশ্চিন্ত দিবানিদ্রায় মগ্ন। প্রায় সকলেই, কিন্তু একজন বাদে, যে কিনা রাজর্ষির সব অ্যাডভেঞ্চারের সদা সতর্ক গাইড। সে আর কেউ নয়, ওরই স্কুল-পালানো ছোটমামা। অন্যদের চোখে অপদার্থ, লোফার হলেও, ওর কাছে ছোটমামা তখন বিরাট চ্যাম্পিয়ন। তারই প্রযত্নে ওর মার্ক্সবাদের সঙ্গে আধ্যাত্মচর্চা পরিচয়, শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব বোঝার বিফল চেষ্টা এবং চিনের চেয়ারম্যান নামক জনৈক গালফোলা ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ। ছোটমামা ওকে দেখিয়েছিল ভোজালি, দেশি ছ'ঘরা রিভলবার, এবং ক্রুড হাতবোমা অর্থাৎ পেটো বানাবার সাজ-সরঞ্জাম। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে, সব মিলিয়ে বাজার শুধু গরম নয়, একেবারে আগুন।

সেই সময়ে এক-একদিন সন্ধ্যাবেলা কলেজ-ফেরত সেই ক্লাস্ত মানুষটি ওকে ক্ষমতা নামক বস্তুটির স্বভাবচরিত্র বুঝিয়ে বলতেন। ওর খুদে মানসিক জগতে নতুন-নতুন সব আইডিয়ায় মধ্যে প্রচণ্ড এক রায়ট লেগে থাকত সবসময়। যেহেতু কিশোর মননে বিপ্লব এবং প্রেম আসলে একই আবেগের যুগ্মসত্তা, তাই ঠিক সেই সময়েই অন্যতর আকর্ষণের সন্ধান মিলে যেতেও খুব একটা বেশি সময় লাগেনি।

পুকুরের ওধারে মামাবাড়ির একটা আউটহাউস মতো ছিল, যা নাকি কোনও এক অতীতকালে, মুরগিভোজন এবং মদ্যপানের জন্য কর্তারা ব্যবহার করতেন। হাল আমলে ওইসব রাখঢাক নেই, আশ্রিত আত্মীয়স্বজনের সংখ্যাও কমে গিয়েছে, তাই বাড়িটা শেষ পর্যন্ত ভাড়া দিয়ে দেওয়াই ঠিক হয়েছিল। ভাড়াটে হয়ে এলেন টিটাগড় পেপার মিলের জুনিয়র ম্যানেজার মৃত্যুঞ্জয় মিত্র, সঙ্গে এল তাঁর অসুস্থ স্ত্রী এবং দুই কন্যা, বয়স তাদের যোলো আর সাত। দেখতে-দেখতে পুকুরের ওপারে মাটি, জল, হাওয়া কীরকম যেন বদলে গেল। পেপার মিলে তখন পুরোদমে শ্রেণিসংগ্রাম চলছে, ভদ্রলোক সারাদিন ইউনিয়নের সঙ্গে দরাদরি করতে ব্যস্ত এবং ভদ্রমহিলা বিছানায়, অতএব ঘরে এবং বাইরে, বড় কন্যাটির উপস্থিতি আস্তে-আস্তে জীবন্ত হয়ে উঠল। এ-বাড়ি এবং ও-বাড়ি, মালিক এবং ম্যানেজার, একটু-একটু করে পরস্পরকে চিনতে শিখলেন, কেননা বাইরের পরিস্থিতি এতটাই বিপজ্জনক যে, বেঁচে থাকতে গেলে নিজেদের মধ্যে আঁতাত কিছু একটা করতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গে গত শতাব্দির সাতষাট থেকে বাহান্তর সালের মধ্যে সেই হিংস্র অথচ অলৌকিক জমানায় যারা যুবক-যুবতী ছিল তাদের জীবন নিয়ে লেখালেখি ইতিমধ্যেই প্রচুর হয়েছে। সেই অকালপক্ক বিপ্লবের ট্রাজিক পরিণতি নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে, অথবা হয়তো কিছুই হয়নি। রাজর্ষি যখন ওই দিকে ফিরে তাকায়, ওর চোখের সামনে ভাসতে থাকে শুধু এক আদিম, অনন্ত, কৃষ্ণগহ্বর, ছায়াপথের সব উজ্জ্বল তারারা একে একে সেই অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই পর্যন্ত পড়ে ল্যাপটপের ডালা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন সুমনা। অনেক চেষ্টা করেও চোখের সামনে ঝাপসা পর্দাটি সরিয়ে ফেলা অসম্ভব, চশমা অ্যাডজাস্ট করতে-করতে চোখ আর হাত, দুটোই ক্লাস্ত। মরুভূমির মতো শুকনো গলা এক গ্লাস ঠান্ডা জল চাইছে, বুকের মধ্যে চিনচিনে বাথা, রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা হয়তো বা কমে আসছে, তাই জোরে জোরে নিশ্বাস নেওয়া আবশ্যিক। স্মৃতিরাক্ষস এই মুহূর্তে ওঁকে আস্ত চিবিয়ে খেতে উদ্যত হয়েছে, শুধুমাত্র অনেক দিনের পেশাগত তালিমের ফলে সুমনা নিজেকে ঠিকঠাক রেখেছেন এখনও। এক গ্লাস জল খেয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন তিনি। এই সবে শুরু, এখন থেকে মৃত মানুষের হাত ধরে তার সঙ্গে এক রাস্তায় চলতে হবে বেশ কিছুক্ষণ। এখনই এমন উতলা হয়ে পড়লে শেষ পর্যন্ত পৌঁছানোর আশা কম। রাজর্ষি লিখেছে—

সেদিনের সেই সদ্য-যুবতী মেয়েটির জীবনের ওপর দিয়ে নিষ্ঠুর বাস্তবতার কালো টেউ বয়ে গিয়েছিল একের পরে এক। কিছুর মধ্যে কিছু নেই, হঠাৎ একদিন ভর দুপুরবেলায় ও বাড়ি থেকে শোনা গেল কান্নার রোল। পেপার মিলে ভাঙচুর এবং হরতাল, ম্যানেজার মৃত্যুঞ্জয়বাবু খতম।

শোনা গেল মিলের সমস্ত শেয়ার ইতিমধ্যেই কোনও মার্ভোয়ারিকে বেচে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং এই পরিবারের সঙ্গে টিটাগড় পেপার মিলের আর কোনও সম্পর্ক নেই।

সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটে যাবার পরেও প্রত্যেক সকাল এবং বিকেলে ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে গিয়েছিল আদ্যন্ত টাইমটেবল মেনে। অনাথ হয়ে যাওয়া পরিবারটি শেষ পর্যন্ত এই বাড়ির আশ্রয়েই থেকে গেল। ইতিমধ্যে শীতের ছুটি শেষ, রাজর্ষি আবার কলকাতায়। মাস ছয়েক বাদে গরমের ছুটিতে যখন আবার ওর মামাবাড়িতে ফেরত আসার সুযোগ হয়েছে, ততক্ষণে বাড়ির জল হাওয়ায় বিরাট বদল। পরিবারের নতুন ব্যবসা ঠিকাদারি এবং বড়মামা সে-ব্যবসার কর্ণধার। এ-বাড়ির একদা কর্তামশায়, রাজর্ষির অতি প্রিয় দাদু আপাতত নখদস্তহীন এবং মানসিকভাবে ক্রমশই অবসন্ন। দাদানের ঠাকুরঘরে যাওয়া কমে গিয়েছে, এখন সেখানে মাকড়সাদের রাজত্ব। ভোরবেলা দাদুনের সঙ্গে রাসমণি ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে যাওয়া ছিল রাজর্ষির ছেলেবেলার এক ম্যাজিক অভিজ্ঞতা। একদিকে অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে ওঠার কষ্ট, অন্যদিকে সেই চিরন্তন নদীর ঘোলা জল আর শ্যাওলা ধরা পুরনো ঘাটের সিঁড়িতে নানা অদ্ভুত লোকজনের সঙ্গে মোলাকাত এবং ঘুম চোখে সংসারের বিচিত্র প্রবাহের সঙ্গে কিছুটা পরিচিতি। সেই দাদু এখন আর কোথাও যান না, সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকেন। এদিকে বড়মামার প্রতাপ বেড়েই চলেছে, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মধুর এবং নব্য ঠিকাদারির কাঁচা টাকায় বাড়ির চতুর্দিক ঝলমল করছে। নতুন রাজা তাঁর দরবার গড়তে ব্যস্ত আছেন, সেখানে নতুন সঙ্গী-সঙ্গিনীরা হাজির হবেন, এতে আর আশ্চর্য কী? দেখতে-দেখতে বৈঠকখানার চেহারাটিই বদলে গেল, বাড়ির বাকি সকলে নানা অব্যক্ত নালিশ নিয়ে সেরে গেল নিরাপদ দূরত্বে।

সেই বছর পুজোর ছুটিতে সুমনাকে যেন প্রতিদিন নতুন করে চিনেছিল রাজর্ষি। সুমনার মা তখন মৃত্যুশোক, হাঁপানি আর গাঁটে বাতের ধারাবাহিক আক্রমণের ফলে পাকাপাকি ভাবে বিছানায়। পেনশন এবং ক্ষতিপূরণের সামান্য টাকার ওপর নির্ভর করে সংসারের দায়িত্ব নিয়েছে সুমনা, বোনকে পড়াশুনো করতে পাঠিয়ে দিয়েছে কলকাতার সারদা আশ্রমে, কিন্তু নিজে থেকে গিয়েছে সংসার সামাল দিতে, লেখাপড়া চালিয়ে গিয়েছে স্থানীয় কলেজে। রাজর্ষির মামাবাড়িতে সুমনার যাতায়াত ছিল, ঠিক যেন রান্নাঘরের সেই পাটকিলে রঙের বেড়ালটার মতো। কখন আসত, কখন যেত কেউ টের পেত না। দিনে দুটো কথা হত কিনা সন্দেহ, তাও রাজর্ষির সঙ্গে অদ্ভুত একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে উঠেছিল ওর। সে-সম্পর্কের কী নাম দেওয়া যায়, সে-বিষয়ে ও পুরোপুরি বিভ্রান্ত। প্রতিদিন ঠিক রাত্রি নটার সময় পুকুরের ওই পাড়ে ওদের বাড়ির ভাঙা বারান্দায় দাঁড়িয়ে শোবার আগে চুল বাঁধতে আসত সুমনা। এদিকের বারান্দায় একটা বইয়ের আড়ালে মুখ ঢেকে, চুপচাপ ওর চেয়ারে বসে থাকত রাজর্ষি। কোমর পর্যন্ত ঢেউখেলানো চুল, সমান দুইভাগে ভাগ হয়ে কাঁধের দু'পাশ দিয়ে চিরুনির অক্লান্ত আঘাতে জট ছাড়িয়ে সোজা হত প্রথমে। তারপর বোতল থেকে তেল ঢেলে, বেশ অনেকটা সময় নিয়ে, চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে-বুলিয়ে সিঁধিত করতে ও, বারান্দার অল্প আলোতেও ভেসে আসত তার প্রতিফলন। সব শেষ হয়ে গেলে নিখুঁত একটি বিনুনি যেন জীবন্ত প্রাণীর মতো লুটিয়ে পড়ে থাকত ওর কাঁধে বা পিঠে। ওইখানে অল্প আলোয় বসে-বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনো করত সুমনা, কখনও টিমটিমে বালবের আলোয়, কখনও হারিকেনে। রাজর্ষি ঘুমোতে পারত না, পড়ার বইগুলো সব ক্রিপ্টোগ্রাফির মতো দুর্বোধ্য লাগত, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও দেখত কেমন করে শহরতলির আলোরা সবাই নিভে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে ঝুঁটের উনুনের ধোঁয়া, আবছা মহাশূন্যে উঁকি মারার চেষ্টা করছে ছায়াপথ, আর তার তলায় একটি অনাড়ম্বর বারান্দা। সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা অতি সাধারণ এক তরুণীর উপস্থিতি এবং তার চারপাশে অব্যক্তের অসীম আন্দোলন।

ভোর হত, কিন্তু তবুও সেই ভোরের আলোর মধ্যেও এখানে-ওখানে চাপ ধরে বসে থাকত অন্ধকার। খতম অভিযান শেষ, এখন শুরু হয়েছে

প্রতিশোধের পালা। বিপ্লব নামক অশ্বমেধের ঘোড়াটি এখন রাষ্ট্রীয় মহাযজ্ঞের আগুনে পুড়ছে। রাত্রির শেষ হলোই সফ্র গলির ভিতরে, ট্রেনলাইনের আশেপাশে কিংবা নদীর ধারে গাছগাছড়ার ঝোপের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া অল্পবয়সি শরীরগুলোর খোঁজ মিলত, কান্নার শব্দ শোনা যেত এ-বাড়ি ও-বাড়িতে। এরকম একটা দিনেই কান্নার শব্দটা ঠাকুরমায়ের বুলির সেই রাক্ষসীর মতো বিরাট হাঁ করে সোজা মামাবাড়ির উঠানে এসে হাজির হল। রাজর্ষি জানতে পারল যে, ওর সেই কাউবয় হিরো, ছুরি-বন্দুকওয়ালা বেকার যুবক ছোটমামা আর নেই। অপরাধবোধ, অন্ধকার ভবিষ্যৎ আর রাজনৈতিক খুনোখুনির অসহ্য পরিবেশে সে কি নিজেই সব আস্থা হারিয়ে ট্রেনলাইনে গলা দিয়েছিল, নাকি অন্য দলের ছেলেরা ওকে খুন করে ওইভাবে সাজিয়েছিল ঘটনাটা, সেসব প্রশ্ন অবাস্তব। আসল কথাটা এই যে, সেই অবাস্তবিক সময়ে আরও অনেকের সঙ্গে ওর ছোটমামাও হারিয়ে গিয়েছিল, তার জন্য সংসারের কিছুই আসে-যায়নি। দেখতে-দেখতে ব্যারাকপুরের সেই রূপকথার প্রাসাদ হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে শুরু করল, তার জায়গাটা নিয়ে নিল আধুনিক অথচ নিষ্প্রাণ এক নতুন বাড়ির নকশা। দাদু ক্লান্ত হতে-হতে আরও ক্লান্ত হয়ে পাকাপাকিভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন একদিন। শ্রাদ্ধ মিটিতে না-মিটিতেই সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে পরিবারের মধ্যে জোরদার কান্ডল শুরু হয়ে গেল। রাজর্ষির পিতৃদেব অর্থাৎ এ-বাড়ির জামাই, তাঁর রাজতুল্য মেজাজ এবং বাস্তববুদ্ধির একান্ত অভাব নিয়ে সেই কোঁদলে কিছুদিন হাবুডুবু খেলেন। তারপর স্রেফ অভিমান করে, খালি হাতেই বিদায় নিলেন একদিন। যাওয়ার আগে প্রতিজ্ঞা করে গেলেন, জীবনে এই বাড়িতে আর পা দেবেন না। ইতিমধ্যে পয়সাকড়ির অবস্থা একটু ভাল হওয়ার ফলে রাজর্ষিরা বেহালার কলোনি থেকে নিউ আলিপুরের কাছে ছোট এক ভাড়াবাড়িতে উঠে এসেছে, তারপর দেখতে-দেখতে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ইত্যাদি ইত্যাদি। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মিথিকাল ভাল ছেলে হওয়ার জন্য স্থান-কাল-পাত্রহীন এক উৎকট তপস্যা। জীবন তার রথ ছুটিয়ে দিয়েছে, শহরের ফ্যাটফেটে আলো আর ধোঁয়াশার আড়ালে ছায়াপথ তখন ভো-কাট্টা, তার জায়গা নিয়েছে কাঁধের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া, মন্ডা-মিঠাই, চপ-কাটলেট বোলানো আদি ও অন্তহীন সেই খুঁড়ের কল। দেখতে দেখে সেই কলটিকে কাঁধে লটকে কয়েক বছরের মধ্যেই ওর বিদেশ যাত্রা, তারপর আরও অনেকগুলো বছর জুড়ে উচ্চাশা নামক অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারণাটির টানা যড়যন্ত্র, বিশিষ্ট হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমশই বিচ্ছিন্নতার গভীরে নেমে যাওয়ার ইতিবৃত্ত। রাজর্ষি আজও জানে না যে, ওর ছোটবেলার অতি প্রিয় সেই মাসিরা বেঁচে আছে কিনা, এবং থাকলে কে কোথায় আছে? বড়মামার সঙ্গে বাবার মুখ দেখাশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারপর একসময় ওর বাবা, সেই দরাজ গলা, প্রবল মতামত আর শক্ত চেহারার মানুষটি শুধু সিগারেটের মতো আপাত নিরীহ নেশার শিকার হয়ে ক্যানসারের কবলে পড়ে গেলেন। জীবনের শেষ কয়েকটা বছর বেশ কষ্টেই কাটল ওঁর, রাজর্ষি তখন বিদেশে নিজের কেরিয়ার গোছাতে ব্যস্ত। বড়মামার জীবনের গল্পটাই বা কোন দিকে গেল, ইতিমধ্যে তার শেষ পাতায় গিয়ে থামল কিনা, সে-সব তথ্যও ওর কাছে গরহাজির। ওর প্রিয় মামাতো ভাই, দশ বছরের ছোট ছেলেটি, নাম যার সুজয়, যে কিনা পরম প্রত্যয়ে তার রাজাদাদার পিছু পিছু ঘুরত, সে এখন উত্তর আমেরিকার কোনও এক প্রান্তে নিজের ঘরসংসার নিয়ে ব্যস্ত। মেধাবী, সংবেদনশীল এবং অভিমানী ছেলেটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারেনি রাজর্ষি। ছেলেটিও ভুলতে পারেনি যে, পারিবারিক দায়িত্বকে কলা দেখিয়ে এবং মানবিক সম্পর্কগুলোর মুখে ছাই দিয়ে, ঠিক সময়মতো শুধু নিজের স্বার্থটি পকেটে পুরে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল ওর একদা আদর্শ রাজাদাদা self-exiled into an emotionally sterile world, never to find peace again.

ওর জীবনের ফার্স্ট লেডি, সেই চুপচাপ স্বভাবের, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া মহিলাটি ততদিনে কিছুটা থিতু হয়েছিল, তার সাম্প্রতিক আনন্দের ঠিকানা ছোট্ট এতটুকু রান্নাঘরে, যেখান থেকে নানা দেশের রান্নার বই কনসাল্ট করে সামান্য উপকরণেই নানান সুস্বাদু খাবার পৌঁছে যেতে পারে

প্লাস্টিকের চাদরে ঢাকা সস্তা কাঠের ডাইনিং টেবিলে। সে-সবই রাজভোগ্য খাবার, রাজত্ব হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তারাও হারিয়ে গিয়েছে। সেই থেকে বাকি সব কিছুই একটানা হারানোর ইতিহাস। সময় যা দিয়েছিল সময়ই তাদের একে একে উপড়ে নিয়েছে, অনেক পুরনো অত্যাচারের দাগ সারা গায়ে মেখে, বাকি সকলের মতো প্রৌঢ়ের প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছে রাজর্ষি। তবু এতদিন ধরে উত্তর আকাশে ধ্রুবতারার মতো মগ্নচেতনার মধ্যে এখনও জ্বলজ্বল করছে সেই অজুত দিনটা। সেদিন আকাশ জুড়ে মেঘে ঢাকা অন্ধকার, হাওয়ায় নৌকার পালের মতো জানলায় উড়ন্ত পর্দা, পুরনো বাড়ির পাঁজরের মধ্যে বন্দি জীবাত্মাদের উল্লাস, অন্ধকারে মাথা দোলানো উদ্ভ্রান্ত তালগাছদের সারি। সেই দিনে বাস্তব আর স্বপ্ন একসঙ্গে মিশে গিয়েছিল, ঘূর্ণিঝড়ে উড়ন্ত গাধার মতো উদ্ভট সব দৃশ্য আর অসহ্য আবেগের একটানা উৎপীড়ন ওর অস্তিত্বের গলিখুঁজি বেয়ে হানা দিয়ে বেড়িয়েছিল অনেকদিন। পরের দিন ওকে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়েছিল, তারপর থেকে পাকাপাকি ভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওর মামাবাড়ি যাওয়া। সুমনা যে কোথায় গেল, কী করল সেসব প্রশ্ন হারিয়ে গিয়েছিল অন্ধকারে। ও জানতে পারেনি, ঠিক কী যে ছিল সেদিনের সেই অজুত ঘটনার প্রেক্ষিতে। জীবনের কুৎসিত এলাকাটা যেহেতু ওর কাছে একেবারে অজানা ছিল তাই অনেক কিছুই মাথামুগ্ধ ধরতে পারেনি ও। বড়মামার ব্যস্ত বৈঠকখানার সেই সব নতুন অতিথিরা সুমনার জন্য নতুন কোনও এক ভয়ানক বাস্তবের সূচনা করেছিল কি? সেই বাস্তবের মধ্যেই কি লুকিয়ে ছিল ওদের পরিবারটার টিকে থাকার রহস্য। এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেয়ে অন্য দুনিয়ায় পালিয়ে যেতে চেয়েছিল ও। অথচ সেই অসহ্য বাস্তবের বাসিন্দা হয়েও সুমনা রাজর্ষিকে যা দিয়েছিল, এ-জীবনে তার তুলনা মেলেনি আর। বইয়ের পোকা, লাজুক অথচ তীক্ষ্ণবী রাজর্ষিকে কেমন ভাবে চিনে নিয়েছিল মেয়েটা? কেনই বা সেই সব ম্যাজিক সন্ধ্যাবেলার আলো-অন্ধকারের সিম্ফনির মধ্যে দাঁড়িয়ে এক অপূর্ব একক ইরোটসিজমের প্রথম পাঠ দিতে থাকত ও প্রতিদিন। বইয়ের পাতা থেকে সামান্য চোখ তুললেই পরিস্কার দেখা যেত ওর পানপাতার মতো মুখ, তরী অথচ সুডৌল দেহলতা, মাঝে মাঝে হঠাৎ চোখ তুলে তাকানো আর ঠিক সেই সময়ে একচিলতে হাসি। কী ছিল সেই স্প্লিট সেকেন্ড হাসির মধ্যে— কৌতুহল না প্রশ্রয়, বন্ধুত্ব না ছলনা? ও কি জানত যে, একদিন এই ছেলেটাই ঘুরে বেড়াবে সারা পৃথিবী জুড়ে, বিশ্বের প্রতিটি শহরে প্রতিটি আর্ট মিউজিয়মের অলিগলিতে খুঁজে ফিরবে তার ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়া হাসির সন্ধেতে।

সুমনার গলা দিয়ে অজুত একটা শব্দ বেরোল যেটা হাসি না কান্না বলা দুধর। রাত তিনটে বেজে গিয়েছে, শহরের পোষমানা আলো আর নিয়মানুযায়ী দরজারা বন্ধ হয়ে গিয়েছে সব, তবুও এই ঘোলাটে অন্ধকারে ছায়াপথের দেখা পাওয়া অসম্ভব। দূরবর্তী প্রাচীন তারাদের আলো যখন পৃথিবীর দূরবিনে দেখা দেয়, তার অনেক সহস্র বছর আগেই তাদের মৃত্যু হয়ে গিয়েছে, সেখানে এখন বিরাজ করছে নীহারিকা অথবা কৃষ্ণগহ্বর। ঠিক সেই রকম যে-পায়ে একদিন অনুভূতির অমৃত ছিল সে এখন চুরমার, শুধু তার অস্তিত্ব রয়ে গেছে স্মৃতির গোপন মানমন্দিরে। এই মুহুর্তে এক টুকরো অভিমান বৃকের মধ্যে চিনচিন করছে। তুই আমাকে কিছু বললি না কেন রে রাজা? সেই ছোটবেলার হোক, আমি তোরে লেখা প্রতিটি অক্ষর পড়ব, বুঝব, সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজে পাব নিজেকেও।

কুড়ি বছরের পরে

আজকের পৃথিবীতে পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়া খুব শব্দ। ল্যাপটপটা সরিয়ে রেখে নিজের মনেই হেসে উঠলেন সুমনা। আচ্ছা তিনি কি এখন মার্ভার সাসপেন্ডি? গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাগুলো এমনই দ্রুত এবং অস্বাভাবিক যে, অবাক হওয়া তিনি ছেড়েই দিয়েছেন প্রায়। মাসখানেক আগে মুম্বইতে এক এজেন্টের মারফত তিনি জানতে পারেন

যে, অজানা এক আমেরিকান ক্লায়েন্ট গুঁর সঙ্গে কনসাল্ট করতে ইচ্ছুক, এবং এ-বাবদে খরচাপাতি কোনও সমস্যাই নয়। কনসাল্টের বিষয়টি অতীত ইন্টারেস্টিং— মক্কেল জানতে চায় যে, ভারতীয় আইনের চোখে ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্টেন্ট সুইসাইড অর্থাৎ স্বেচ্ছামৃত্যু বা অ্যাক্টিভ ইউথানেশিয়া ঠিক কতখানি ক্রিমিন্যাল এবং ভারতীয় সুশীল সমাজ এই নিয়ে কতটা সচেতন। প্রশ্নটা শুনেই সুমনার মনে পড়ে গিয়েছিল ২০১১ সালের নার্স অরুণা শনবাগের কেসটার কথা। আইনজীবী হিসেবে ওর প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়ে মনে-মনে অনেক ডিবেট লড়েছেন সুমনা।

১৯৭৩ সালে মুম্বই কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালের নার্স অরুণা, পঁচিশ বছরের সুন্দরী যুবতী, ওয়ার্ডে সকলের হার্টথ্রব, ইতিমধ্যেই এক যুবক ডাক্তারের বাগদত্তা। সেই বছর এক ভয়ঙ্কর রাতে কয়েকজন ওয়ার্ড বয়ের যৌন আক্রমণের শিকার হয়ে মেয়েটি এতটাই আহত হয় যে, তার সারা শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ডাক্তারি ভাষায় যার নাম পার্সিস্টেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট। বহু বছর পরে, ২০১১ সালে, মেয়েটির বন্ধুরা মিলে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে প্রথম প্যাসিভ ইউথানেশিয়ার প্রেক্ষাপট রচনা করে যেখানে একজন অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা নিতে অস্বীকার করার অধিকার স্বীকৃত হবে। ২০১৫ সালে ভদ্রমহিলা নিউমেনিয়ায় মারা যান, তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ভারতের আইন এবং আমেরিকার আইনের মধ্যে কোনওই পার্থক্য নেই। রোগী চিকিৎসা নিতে অস্বীকার করতে পারে, সে-ক্ষেত্রে তাকে জোর করে চিকিৎসা করাতে বাধ্য করা বেআইনি। রোগের যন্ত্রণা কমানোর জন্য মাত্রা রেখে মরফিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু রোগীর ইচ্ছেমতো অতিরিক্ত ডোজে ওষুধ প্রয়োগ করলে তা হবে খুন অথবা আত্মহত্যা, আইনের চোখে দুটোই অপরাধ যদিও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া আইনের ক্ষমতার বাইরে। অ্যাক্টিভ ইউথানেশিয়া, যার আর-এক নাম ফিজিশিয়ান-অ্যাসিস্টেড সুইসাইড, সে-বস্তুটি পৃথিবীর মাত্র ছয়টি দেশে সম্ভব— বেলজিয়াম, লুক্সেমবর্গ, কানাডা, নিউ জিল্যান্ড, স্পেন, নেদারল্যান্ডস এবং কলম্বিয়া, যদিও প্রায় সব দেশেই এই নিয়ে ছোটবড় আন্দোলন রয়েছে। সেই সব আন্দোলনের আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মের নাম ‘দ্য ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ রাইট টু ডাই সোসাইটিজ’। ভারতে এই জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের মধ্যে আইনজীবী সুমনা মিত্র অন্যতম।

টিভিটা বন্ড জোরে চলছে। বাজারে এই মুহুর্তে কেলস্কারির কিছু অভাব হয়েছে, তাই নিউজ চ্যানেলগুলোও মোটামুটি হতাশ। আধুনিক রিপোর্টারদের বাংলা বলার ভঙ্গি এবং উৎকট অ্যাকসেন্ট শুনে সুমনার একইসঙ্গে হাসিও পায়, রাগও হয়। তাই রিমোটের চাপে ওটাকে বন্ধই করে দিলেন তিনি। এই ছিমছাম অভিজাত অ্যাপার্টমেন্টে তিনি পুরোপুরি একলা, এবং তাই নিয়ে গুঁর এতটুকুও চিন্তা নেই। এই পৃথিবীতে কেউ-কেউ এখনও টিকে আছে একাকিত্ব যাদের অলঙ্কার।

ফোনটা বাজছে, সেই সঙ্গে ফোনের পর্দায় ফুটে উঠেছে সুট-পরা এক সুদর্শন ভদ্রলোক, তাঁর কোল ঘেঁষে দাঁড়ানো এক কিশোরের ছবি। সিনিয়র ব্যারিস্টার শ্যামল মিত্র ওরফে স্যাম মিটর, সুমনার বস, প্রেমিক এবং স্বামী, যদিও এই তিনটি পর্যায়ের মধ্যে পরিবর্তি খুব একটা সুস্পষ্ট নয়। বনেদি পরিবারের ছেলে, পড়াশোনা ইংল্যান্ডে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে পাক্ষা বাঙালি ভদ্রলোক। আবো-ভেকন থেকে ইলিশ পাড়ুরি, বোদল্যোর থেকে রবীন্দ্রনাথ, বোদান্ত থেকে মাক্সবাদের গুঁর সমান রুচি ছিল। অবাক কাণ্ড এটাই যে, এমন বিদ্বান এবং রসিক মানুষটিও নিজের জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারলেন না। স্বাধীনতার পরে দেশের পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টাতে শুরু করল, মধ্যমেধার সঙ্গে লড়াই করতে-করতে কবে একদিন তিনি অবসাদের অতলে ডুবে গেলেন, মেধার চর্চা হারিয়ে গিয়ে গুঁর মনের দখল নিয়ে নিল অ্যালকোহল। সিরোসিস থেকে লিভার ক্যানসার হয়ে যখন অকালে যখন গুঁর জীবন উপন্যাসের শেষ চ্যাপ্টার লেখা হল, মণির বয়স তখন মাত্র বারো বছর। তারপর কখন একদিন সেই ছেলে বড় হল, আইআইটি-তে পড়াশোনা শেষ করে আমেরিকায় পাড়ি জমাল, সুমনার কাছে সেই ছবি এখন বাপসা। শোক করার খুব একটা সময় পাননি কেননা



তখন তিনি স্বামীর ফেলে যাওয়া এবং ডুবতে-বসা ল-ফর্মটিকে আবার দুই পায়ে ওপরে দাঁড় করানোর আশ্রয় চেষ্টায় ব্যস্ত। তখনকার নানা স্মৃতির কোলাজ রয়ে গিয়েছে টেলিফোনের রিংটোনে আর এই অলীক ভালবাসার ছবিটায়। মনের মধ্যে অনেক কিছু ঘেঁটে দেখেছেন সুমনা, সেখানে অনেক রকম আবেগের আনাগোনা আছে, কিন্তু ভালবাসার ঠিকানা নেই। এই সব মিশ্র অনুভূতির মধ্যে মনে হয় সন্তানম্বেহই সব চাইতে প্রখর, তাই কিছুটা অসহায় ভাবেই ছেলেকে ফোন করলেন তিনি।

“মণি, কেমন আছিস বাবা?”

“ভাল আছি মা, তুমি কেমন আছ, কবে আসছ?”

“মণি, কী হয়েছে রে? তোর গলাটা বড্ড টায়ার্ড শোনাচ্ছে,” একটু চিন্তিত গলায় বললেন সুমনা।

“টায়ার্ড যে লাগছে মামি। আমার ক্লোজ ফ্রেন্ডের বাবা, আমি যাকে রাজ আফেল বলি, সেই লোকটা আউট অফ দ্য ব্লু, দুম করে সুইসাইড করেছে, তাও আবার অ্যাওয়ে ফ্রম হোম। ওর পুরো পরিবারটা এখন ডিভাস্টেটেড। ওঁর নাকি ক্যানসার হয়েছিল, তাই আর বাঁচতে চাননি। আচ্ছা ক্যানসার তো অনেকেরই হয়, তারা তো কেউ এইরকম ফানি বিহেভ করে না,” মণি যেন বাচ্চাদের মতো কমপ্লেন করছে। ছোট থেকেই ও নরম স্বভাবের। ও সেই জাতীয় মানুষ যারা খুব সহজেই আহত হয়, এবং আঘাতের জায়গাটা লুকিয়ে রাখতে পারে না।

“আমি আসছি বাবা, তুই এত উতলা হোস না,” ধরা গলায় বললেন সুমনা।

“মা, তুমি কেন এই সব অদ্ভুত সোসাইটির সঙ্গে আছ? তোমরা যারা ইউথানেশিয়ার প্রোপোনেট, তোমার ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ রাইট টু ডাই সোসাইটিজের মাননীয় মেম্বররা, তারা কি কখনও এই একটা কথা ভেবে দেখেছে— যাদের পিছনে ফেলে রেখে কেটে পড়লে, তাদের মানসিক অবস্থাটা কী দাঁড়াবে, তারা কী করে এর সঙ্গে ডিল করবে?” মণির গলায় প্রায় কান্নার ছোঁয়া। ওর সম্ভবত ভয় ধরেছে যে, রাজ-আফেলের মতো ওর মাও যদি বেমক্স একদিন এই দুনিয়া থেকে ছুটি নেয়।

“পাগল ছেলে, আমাদের ফেডারেশন মানুষকে সুইসাইড করতে বলে না। স্বেচ্ছামৃত্যু আর ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করা টোট্যালি আলাদা। আমরা বিশ্বাস করি যে, জীবন মানে যেনতেনপ্রকারে শরীরটাকে টিকিয়ে রাখা নয়, জীবন মানে আশা ও অভিজ্ঞতার এমন এক সমীকরণ যার শেষ মূল্যটি ঋণাত্মক নয়।

কথাটা তিনি ইংরেজিতেই বলেছিলেন কিন্তু ওদিকে মণি ফ্লেপে আগুন, “মা এই সব ফিলোসফিকাল কথা খুব ভাল, কিন্তু এই সব কাণ্ডের জন্য সাধারণ জ্যান্ত মানুষদের মহা সমস্যা হয়, তারা এগুলো নিতে পারে না, তখন আসে রাগ, অবসাদ, সেলফ হেল্পিং, সেলফ ডেস্ট্রাক্টিভ বিহেভিয়ার। রুগু সারাদিন নেশা করে পড়ে থাকছে। আন্টির কথা তো না-বলাই ভাল। লোকাল বেঙ্গলি সোসাইটিতে অ্যাক্স ইফ একটা ভলক্যানিক ইরাপশন হয়ে গেছে। আই ফিল সো ব্যাড ফর হার।”

সুমনা, এক মিনিটের জন্য, কী বলবেন ভেবে পেলেন না। ছেলে বেশ কিছু নৈতিক প্রশ্ন তুলেছে, যা নিয়ে চাপানউতোরের শেষ নেই। তবুও



উত্তর তো একটা দিতেই হয়।

“মণি, মে বি হিজ ক্যানসার ওয়াজ টার্মিনাল। আনট্রিটেবল। সেক্ষেত্রে ও একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা যে-কারও আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এমন ড্রাম্যাটিক ভাবে হয়তো সেটা নাও করতে পারত,” অনিচ্ছাতেও সুমনা কথাটা না-বলে থাকতে পারলেন না। এটা খুব বিপজ্জনক এলাকা কেননা তিনি যে ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যাপারে জড়িত, সেটা দ্বিতীয় কারও কাছে প্রকাশ না-করতে পারলেই ভাল হয়, বিশেষ করে ছেলের কাছে। ওদিকে একজন কথা বলেই যাচ্ছে—

“মা, এইরকম সব আউট অফ ওয়ে র্যাডিক্যালিজম, এর ফলে একজনের বিগ ইগো হয়তো স্যাটিসফায়েড হতে পারে কিন্তু তার কাছের লোকদের জীবন শুধু-শুধু উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। যেমন ধরো রুণু, আমার বন্ধু, আঙ্কল রাজের ছেলে,” মণি কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক গলায় বলল, “রুণু একেবারে ভেঙে পড়েছে, ও কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারছে না।”

সুমনা একটু থমকে গেলেন। এই বন্ধুকে নিয়ে কথাবার্তা কি তিনিই শুরু করবেন নাকি বলতে দেবেন ওকেই, যখন ও স্বস্তি পায়। এই ঘটনাটার মধ্য দিয়ে কী অভূতভাবে তিনি নিজের ছেলেকে নতুন করে চিনতে পারলেন আবার। এই যে সমাপতন, হারিয়ে খুঁজে পাওয়া এবং আবার হারানো, এসব ইতিহাস কি টেলিফোনে বলা যায়? ব্যারাকপুরের সেই বয়ঃসন্ধির রাজা কবে যে বড় হয়ে উঠল, কবে সাত সমুদ্র, তেরো

নদীর ওপারে তার নতুন রাজপাট কায়েম করল, তিনি তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। সেই রাজার ছেলের সঙ্গে মণির বন্ধুত্ব হয়েছে, ভালবাসা হয়েছে এবং মা হয়েও ছেলের যৌনচেতনার বিন্দুমাত্র খবর রাখেননি কোনওদিন! মণির মুখটায় ঊঁর নিজের মুখ প্রায় কেটে বসানো, হাসিটা তো একেবারে একরকম। রাজা কী করে এটা বুঝতে পারল না? বুঝলে তো আগেই যোগাযোগ করতে পারত। লোকটা এতগুলো বছরের অন্ধকার সরিয়ে, সেদিন মুম্বইয়ে হোটেলের লবিতে সুমনার সঙ্গে দেখা করতে এল, আর চোখের সামনে ঊঁর ছেলেটাকে দেখে চিনতে পারল না। এ কি অন্ধতা না অবিশ্বাস? সুমনার মনে পড়ে গেল কেমনভাবে শুরু হয়েছিল ব্রেকফাস্টের সেই মিটিংটা।

“মণি, সোনা আমার, আমি আসছি, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। রাখছি এখন।”

ফোন ছেড়ে মনের মধ্যে ডুব দিলেন সুমনা। ওই দীনতাকে ভাল করে বুঝতে হবে, না-হলে গোলমাল হয়ে যাবে সবকিছু। ওই তো ব্রেকফাস্ট স্প্রেড, লাউঞ্জের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসা নিখুঁত ফ্যাশনেবল পরিচ্ছদে একজন মধ্যবয়সি মানুষ, চলাফেরার মধ্যেই যার স্বাতন্ত্র্য এবং আভিজাত্য, দুটোই মোটামুটি নিঃসংশয়।

“হ্যালো মিস্টার সান্যাল,” ভদ্রলোকের দিকে ভাল করে না-তাকিয়েই গ্রিটিংসটা ঝুঁড়ে দিয়েছিলেন তিনি।

“হ্যালো মিনুদি। আমি রাজর্ষি। দেখা যাচ্ছে, তুমি আমাকে ভুলে গেছ।”

ঘরের ছাত ফুটো করে একটা বাজ পড়লেও এর থেকে বেশি চমকে উঠতেন না সুমনা।

“রাজা! ও মাই গড, কোথায় ছিলি তুই অ্যাড্মিন?”

মিনুদি, মিনু মা! এই নামে বাবা ঠেকে ডাকতেন, স্কুলের বন্ধুরা এই নামেই চিনত। তারপর কবে যেন একদিন হারিয়ে গিয়েছিল নামটা। এক নিমেষের মধ্যে স্মৃতির দরজারা দমাদম খুলে হাট হয়ে গেল, পরিচিতির রোদদুর ছড়িয়ে পড়ল এক আঙিনা থেকে আর-এক আঙিনায়। সুমনার মনে হল সময়ের সরলরেখাটা কেমন যেন আঁকিঝুঁকি কেটে গুলিয়ে যাচ্ছে, ঘটনাগুলো এ ওর ঘাড় উপকৈ একই সঙ্গে উঁকি মারছে সকলে।

“এতদিন কোথায় ছিলি তুই রাজা? কোথেকে উদয় হলি, তাও এরকম একটা উদ্ভট অছিলায়?”

“ধরে নাও, ছায়াপথ ঘুরে আমরা আবার সেই একই কোঅর্ডিনেটে ফিরে এসেছি, জাস্ট বাই চান্স। কিন্তু অবাক কাণ্ড সেটা নয়। এতখানি রাস্তা পেরিয়ে এসেও আমরা যে এখনও পরস্পরকে এক নিমেষের মধ্যে চিনতে পারলাম, অবাক কাণ্ড এটাই,” সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি হাসিমুখে বলল। সুমনার মনে হল, সেই কিশোর বয়স থেকে খুব একটা পাল্টায়নি তো মানুষটা। চেহারা, বিশেষ করে মুখটা একটু ভরেছে, চুল কাঁচাপাকা, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে সেই বিশ্ময় আর যন্ত্রণার এক অদ্ভুত সংশ্লেষ, হাসির মধ্যে সেই এক চিলতে অপ্রতিভতা। সব মিলিয়ে ওর মুখ থেকে কৈশোর যেন বিদায় নেয়নি, অথচ মাঝবয়সের ক্লান্তি এসে বাকি সবকিছুর দখল নিয়ে ফেলেছে এবং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সেই ক্লান্তির সঙ্গে অ্যালকোহলের গভীর সম্পর্ক। সুমনা বুঝলেন, পুরনো কথাগুলো ফিরিয়ে আনতে এতটুকু অসুবিধে হচ্ছে না, সময় যেন এক পাক্কা ফিল্ম এডিটরের মতো ফ্লাশব্যাকে জানা গল্পের সিকোয়েন্সগুলো একের পরে এক বোলালুম জুড়ে দিয়েছে। এই মুহূর্তে ওঁরা নিশ্চিন্তে নিজেদের পরিচিত উঠানে বসে আছেন, মাঝখান দিয়ে এতগুলো বছর এক পলকে নিশ্চিহ্ন।

“তুমি জানো সুমনাদি, আমি এখনও সুযোগ পেলেই কান চুলকোই। হাতের সামনে যা পাই তাই দিয়ে, যেমন ধরো পেপার ক্লিপ বা ব্যবহার করা টুথপিক। কিছু না-পেলে একটা কাগজের টুকরো খুব সরু করে গুটিয়ে—”

“উফ, জঘন্য! আর যখন তখন নাক খোঁটা, এদিক-ওদিক তাকিয়ে। বলি, সেটাও কি একই রকম আছে?”

“চুপ চুপ, তুমি ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানে না। আসলে কী জানো, জীবনের এমন কিছু কিছু স্বাদ গন্ধ থাকা উচিত যা একান্তই গোপন এবং ব্যক্তিগত, সমাজের নৈয়ায়িক দাদারা যাদের ওপরে ছড়ি ঘোরাতে পারবে না কোনওদিন।”

“রাজা তুই কোথায় ছিলি, কী করলি এতদিন? অফ কোর্স, তোকে দেখেই বুঝতে পারছি যে, তুই একজন রিচ অ্যান্ড সাকসেসফুল এনআরআই, কিন্তু ইউথানেশিয়া নিয়ে তোর কী দরকার? প্লিজ বল যে, ইউ হ্যাভ আ গ্রেট লাইফ অ্যান্ড গ্রেট ফ্যামিলি, আমি সব এখনওই জানতে চাই, আমার আর তর সইছে না,” সুমনা এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যে, চারপাশে কে যে কোনদিকে ফিরে তাকাচ্ছে, সেসব দেখতে বয়েই গেছে ওঁরা।

“গ্রেট লাইফ অ্যান্ড আ গ্রেট ফ্যামিলি। তুমি তো দেখছি বেশ আগের মতোই অপটিমিস্টিক রয়ে গেছ। কিন্তু এগজ্যাক্টলি তুমি কার লাইফের কথা বলছ বলো তো?” রাজর্ষি একটা দুর্য্যোধ্য হাসি হাসল।

“কার আবার? তোর,” সুমনা থমকে গেলেন একটু।

“আজকের আমি লোকটাকে তো তুমি চেনো না মিনুদি। আমিও তোমাকে অর্থাৎ অ্যাটর্নি সুমনা মিত্রকে চিনি না। ইন ফ্যাক্ট তোমাকে খুঁজে পাওয়াটা জাস্ট একটা চান্স, খুবই প্লেজন্ট সারপ্রাইজ কিন্তু তার চেয়ে বেশি তো কিছু নয়।”

সুমনা কী বলবেন ভেবে পেলেন না। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছামৃত্যু সংস্থার ওয়েবসাইটে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা রয়েছে, সেখান থেকেই খবর পেয়েছেন রাজর্ষি। হঠাৎ করেই বৃকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল, অমঙ্গলের

কালো ছায়া ভেসে গেল মনের আকাশে। আচ্ছা, এই যোগাযোগের বিশেষ মুহূর্তটায় তিনিও কি কিশোরী বয়সের সেই অসহ্য রোম্যান্টিকতায় ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, যেখানে এক পথ হারানো নাইট টেম্পলার কবেকার এক অলীক, অসম্ভব হোলি গ্রেলের সন্ধ্যা ঘুরতে-ঘুরতে হৃদ হয়ে একদিন তার কল্প-প্রিয়তমার অঙ্গনে ফিরে এসেছে? কিন্তু সে নাইট সঙ্গে করে কোনও ডাইনির অভিশাপ নিয়ে আসেনি তো? তাই যদি হয় তা হলে ওর কল্প-প্রিয়তমার শয়নগৃহে, দেওয়ালের আংটায় লাগানো জ্বলন্ত মশালের আলো-অন্ধকারে ঠিক যে-মুহূর্তে ও অসাবধান হবে, শরীরের স্পর্শ পাবার জন্য খুলে ফেলবে ওর বর্ম-শিরতপ্পা, ঠিক তখনওই কোথা থেকে এক বিষাক্ত তির ওর বুকে এসে বিঁধবে। বিষে আচ্ছন্ন মানুষটি আন্তে-আন্তে সেই আন-ডেড অর্থাৎ মৃত এবং জীবিত দুনিয়ার মাঝামাঝি এলাকায় ভ্রাম্যমাণ হয়ে থাকবে, কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের মতো দুই হাতের আলিঙ্গনে প্রিয়তমাকে বুকে টেনে নিতে পারবে না আর কোনওদিন।

অথচ এইমুহূর্তে সবই মোটামুটি বাস্তব। সেই বিষাক্ত তিরটি আজকেও ওঁর টেবিলের উপরে রাখা আছে, এগজিবিট নম্বর এক। সুমনার হঠাৎ মনে হল, তিনি যদি সত্যিই ভ্যাম্পায়ার হতে পারতেন, খুঁজে পেতেন কোনও এক গুহার অন্ধকারের মধ্যে অপার্থিব বাদুড়ে বিষণ্ণতা, তা হলে হয়তো এক লহমায় এই সব সমস্যা মিটে যেত, অনন্ত জীবনের আশ্বাদ ইচ্ছেমতো নিতে পারতেন ওঁরা দু’জনে। কিন্তু কেমন করে মানুষ থেকে ভ্যাম্পায়ার হয়ে ওঠা যায় সেসব তত্ত্ব আপাতত অজানা, সুতরাং এই মুহূর্তে ওঁর সামনে রক্তমাংসের যে-অস্তিত্ব হাজির, তাকে অবজ্ঞা করাও অসম্ভব।

সুমনার শেল শক

“মিনুদি, কাল আমাদের ক্রিকেট ম্যাচ, তুমি দেখতে আসবে তো?”

“কেন রে রাজা, আমি তো খেলাধুলোর কিছুই বুঝি না, আমায় ডাকছিস কেন?” সদ্য-যুবতী মেয়েটি সোজা ওর চোখের মধ্যে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত হাসি হাসবে। ওর ডান কাঁধের ওপর দিয়ে যে-বিনুনিটা কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাঝে-মাঝে মনে হয় সেটার মধ্যে যেন আলাদা একটা প্রাণ আছে, ইচ্ছে আছে। এক-একদিন পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ও আজকের জন্য চঞ্চল আর জীবন্ত, আবার অন্যান্য দিনে হয়তো বা প্রাণহীন, শুধু এক অভ্যাসের অনুষ্ক। কিন্তু বিনুনিটা যদি বাঁশি হয় মিনুদির চোখদুটো তা হলে তবলা, সুর উঠলেই তারা জোরসে সঙ্গত দেয়, তখন এক অদৃশ্য নাচের ছন্দে চারদিকটা যেন এক লহমায় জীবন্ত আর জঙ্গম হয়ে ওঠে। রাজর্ষির মনে হয় ও একটা ভূমিকম্পের এপিসেন্টারে বসে আছে, প্রাণপণে নিজেকে পায়ের উপরে খাড়া করে রাখার চেষ্টা করতে থাকে ও।

“আচ্ছা তুই যখন বলছিস আসব। বেশিক্ষণ থাকব না কিন্তু। তোর খেলোয়াড় বন্ধুরা মাঝে মাঝে বড্ড বিরক্ত করে। তুই কত নম্বরে ব্যাট করতে নামবি রে?”

রাজর্ষি থমকে গেল। ওর পেটের মধ্যে একটা যন্ত্রণা গুলিয়ে উঠল হঠাৎ। অনেক চেষ্টা করে কদাচিৎ ভাল খেলতে পারে ও। অন্য পাড়ার ছেলেরা তো বটেই, নিজেদের টিমের বন্ধুরাও ওকে মাঝে মাঝে আওয়াজ দেয়। কলকাতার পাড়ায় কিংবা স্কুলে ওকে তো খেলতেই নেয় না কেউ। ব্যারাকপুরে ও যে-টিমে আছে, সেটা খানিকটা চাপেই, কেননা ব্যাট, বল, উইকেট, সবই হয় দাদুন, নয় বড়খামার উপহার। তাই ফিন্যান্সের খাতিরে মাসখানেকের জন্য ওকে ক্ষমাযোমা করে নেয় সকলে। কিন্তু টিগাগড়ের শত্রুদল সেসব কথা শুনবে কেন, তারা বাছা বাছা স্লেষব্যাকো ওকে বিঁধতে ছাড়ে না। পড়াশোনায় ভাল এই রোগা-পাতলা কলকাতার ছেলে, যার মুখের রেখাগুলো বিষণ্ণ আর কোমল, ইদানীং যার সঙ্গে পাড়ার একজন কলেজে-পড়া তরুণীকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, তার প্রতি এক গুহামানবীয় দ্বিধার মেঘ খেলার মাঠে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না এতটুকুও।

“কলকাতার লালু ছেলে আলু খায়, ভাতে দিলে গলে যায়।”

“খেলতে পারে না খেলতে আসো!”

“এদিকে তো দেখছি মাল তুলেছে।”

“ভাল মাল। তাও যদি ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে ক্যাচটা ধরতে পারত!”

“আসলে ছেলেরা খিঁচে-খিঁচে রোগা হয়ে গেছে। খেলাধুলো ওর হবে না, বরং কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ঝুলিয়ে গান্ধীঘাটে পাঠিয়ে দাও!”

“মালের সঙ্গে? হেঁচি ব্যাপার গুরু!”

এই সব টুকরো-টুকরো কথা ওর কানে আসে, ভিতর থেকে একটা গরম হাওয়া বেরিয়ে আসতে চায় কিন্তু পথ খুঁজে পায় না। বহু বছর বাদে কাঁচে ঢাকা অথচ রোদ্দুরে ভর্তি অফিসে বসে এই মানুষটিই প্রতিদিন সকাল থেকে একের পরে এক মিটিং করবে, দুনিয়ার নানা এলাকায় অনায়াসে ছড়িয়ে দেবে মেধা আর সাফল্যের জয়গান, সেখান থেকে জন্ম নেওয়া সামাজিক স্বীকৃতি, এবং একেবারে মিথ্যে একটা বানিয়ে তোলা আত্মবিশ্বাস। কে জানবে যে, তার মধ্যে এতটাই খামতি রয়ে গিয়েছে, এতগুলো পুরনো ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝুঁয়ে পড়ছে প্রতিদিন।

“মিনুদি, কেন আমি ভাল খেলতে পারি না? ভাল খেলতে পারলে সবাই আমায় ভালবাসত।”

“সবাই এক রকম হয় না রে। তুই যা পারিস, তোর ওই খেলুড়ে বন্ধুরা অনেকেই তা পারে না। তুই কোনওদিন বাঁকে মিশতে পারবি না রে। তোর মধ্যে দুটো বেয়াড়া জিনিস আছে, যেগুলো তোকে জ্বালাবে সারা জীবন। হয়তো ওইগুলোকে ঠিকঠাক বুঝতে পারলে একটা বিরাট কিছু করে ফেলবি তুই, কিন্তু কপাল খারাপ থাকলে উল্টোটাও হতে পারে। তবে নিশ্চিত থাক, তোর বন্ধুবান্ধব, যারা তোকে প্যাঁক দেয় তাদের চেয়ে অনেক বড়মাপের জীবন হবে তোর। মিনুদির এই কথাটা মনে রাখিস।”

একটা আলতো হাতের চাপ, একজনের স্নিগ্ধ সজল চোখের দিখিতে ভেসে যাওয়া এক টুকরো হাসি, আর গঙ্গার দিক থেকে ভেসে আসা এক অদ্ভুত শিরশিরে হাওয়া। অথবা কিছুই নয়, সবটাই দিবানন্দ, ফরাসি কবির পরবর্তীকালে যার সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ওর যথেষ্ট শিক্ষা নেই, উদ্গত চেতনার অনেকটাই ওর কাছে অজানা এবং ভয়ানক, পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়েও ও বাস্তব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন নয়।

“কী আছে মিনুদি? আমি শুধু এইটুকু বুঝি যে, আমার বয়সি ছেলেদের যা ভাল লাগে, আমার সেসব ভাল লাগে না। কিন্তু আমার ঠিক যে কী ভাল লাগে—” রাজর্ষি থেমে গেল, ওর কানের মধ্যে গরম হলকা বয়ে গেল আবার।

“তোর যে কী ভাল লাগে তা তুই এখনও ঠিক বুঝিস না, তাই তো? নাকি বুঝতে গেলে ভয় পাস?” আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি, তোর স্বভাবের মধ্যে রয়েছে দুটো রোয়ার জিনিস— সেনসিটিভিটি অ্যান্ড ইমাজিনেশন। আমরা আজকাল এসব টেকনিকাল কথা ইংরেজিতেই বলি, না-হলে কেউ বুঝবে না। বলা যেতে পারত, সংবেদনশীলতা আর কল্পনাসক্তি, কিন্তু কথাদুটো নিজের কানেই কীরকম অদ্ভুত শোনাচ্ছে না? দ্যাখ, আমরা নিজেদের ভাষাটাকে শুধু চ্যাংড়ামো আর গালিগালাজের পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছি, তাই গভীর কিছু বলতে গেলেই ইংরেজি দরকার হয়। কী মজার কথা বল তো?”

রাজর্ষি আর সুমনা যখন এই সব কথা বলত তখন কুয়োতলায়, পুরনো শিউলিগাছটার নীচে একটা, দুটো করে ফুল ঝরতে শুরু করেছে। পেয়ারাগাছের ডালপাতার ফাঁকে দিনের শেষ কয়েক ফোঁটা রোদ্দুর টুইয়ে পড়ছে, শান্তির ছায়া ঘনিয়ে আসছে চারিদিকে। কিন্তু ওরা দুজনেই জানত যে, এইটুকু শান্তি আর আশ্রয় আর বেশিদিনের জন্য নয়, পরিবেশ দ্রুত পাল্টাচ্ছে। সেই পাল্টে যাওয়ার হাওয়া ও টের পাচ্ছে বাবা-মার কথাবার্তা, মামা-মাসিদের ব্যবহারে। একটা কথা পরিষ্কার যে, দাদু আর বেশিদিন নেই। টিটাগড় মিলের সঙ্গে-সঙ্গে এ-বাড়ির লক্ষ্মীও বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তিটি এখনও বিরাট, ওদিকে ব্যারাকপুরে জমির দাম বেড়েই চলেছে। চারদিকে গজিয়ে উঠছে এলোমেলো কুৎসিত চেহারার ফ্ল্যাটবাড়ি, শহরতলির সেই ছায়াঘন শান্তি এখন উধাও, প্রতিবেশীদের হাসিমুখের বদলে হাটেবাজারে এখন অপরিচিত মুখ, অন্য ভাষায় কথাবার্তা, অকারণ রূঢ়তা আর সন্দেহ। সেই প্রথমবার স্কুল

খোলার আগেই কলকাতায় ফিরে এসেছিল ওরা।

“মিনুদি, মনে আছে কী কষ্ট হয়েছিল, কী কান্নাটাই কেঁদেছিলাম সেদিন,” রাজর্ষি বলল।

“মনে নেই আবার। আমারও কান্না পাচ্ছিল কিন্তু তোকে সামলাতে গিয়ে নিজের কষ্টটা লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল আমাকে। তা ছাড়া আমাদের গোট পরিবারের ওপরে তখন বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। সম্পত্তি হাতবদল হওয়ার সময়ে ভাড়াটে আর ইদুরের মধ্যে তফাত খুব তো একটা নেই, শুধু মানুষগুলোকে বিষ দিয়ে সাবাড় করা যায় না, অন্যভাবে ম্যানেজ করতে হয়।”

কথাটা শেষ করার আগেই কাশতে শুরু করলেন সুমনা, মুখটা লাল হয়ে উঠল, ঘামের ফোঁটা জমে উঠল কপালে। কী অবাক এই স্মৃতিমহন, যে নাকি এতদিনের পোড়াখাওয়া শব্দ মানুষকেও নিমেষে বুঝিয়ে দেয় যে, ক্ষতস্থান যা ছিল, ঠিক তেমনিই আছে, সময় বদলাতে পারেনি কিছুই। “তোমার শরীর খারাপ লাগছে মিনুদি,” রাজর্ষি ব্যস্ত হয়ে বলল।

“আরে না না, কফিটা ভুল রাস্তায় চলে গেল,” সুমনা সামলে নিলেন, “চল বরং আমার ঘরে গিয়ে বসি। রুম সার্ভিসকে বলে দিচ্ছি লাঞ্চ ওখানেই দিয়ে দেবে। তুই কি আগের মতোই মাংসের ভক্ত? মনে আছে মাসিমা কী ভাল মাংস রান্না করতেন?”

“তার চেয়ে আমার ঘরেই চলো। আমিও এই হোটেলের উঠেছি।”

“চল। আশা করি তোর বদ মতলব নেই,” সুমনা শব্দ করে হেসে উঠলেন। সময়ের আরও একটা মরচে-ধরা বন্ধ দরজা এক ধাক্কা খুলে গিয়েছে আবার।

হোটেলের সবচেয়ে দামি সুইটগুলোর মধ্যে একটা নিয়েছে রাজর্ষি, এইখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় এলোমেলো কিউবিস্ট ছবির মতো শহরটা আরব সমুদ্রের কোল ঘেঁষে শুয়ে আছে। ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসে গেলেন সুমনা, কিন্তু রাজর্ষি স্টান শুয়ে পড়ল বিছানায়।

“এক গ্লাস জল দেবে মিনুদি?”

ওষুধের কৌটো থেকে দুটো ট্যাবলেট বার করেই টক করে সেগুলো পকেটে ঢালান করেছে ও। কিন্তু সুমনার চোখ বাজপাখির মতো। চেয়ার ছেড়ে উঠে রাজর্ষির মাথার কাছে বসে পড়লেন তিনি। একটা হাত রাখলেন ওর কপালের ওপর। প্রায় একসঙ্গে শিউরে উঠলেন দুজনেই।

“রাজা, তোর কী হয়েছে, আমাকে সত্যি করে বল। তোর চেহারাটা দেখে ভাল লাগছে না। একটা ঘাট বছর বয়সি লোক যদি সেই ষোলো বছরের ছেলের মতো ছিপছিপে থাকে তার দুটো কারণ হতে পারে। হয় সে প্রচণ্ড সুস্থ অথবা সিরিয়াসলি অসুস্থ। কিন্তু যার কোনও অসুখ নেই সে নারকোটিক ওষুধ খেতে যাবে কেন? কেনই বা একটু হাটাখাট করেই এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়বে?”

“আমার প্যানক্রিয়াটিক ক্যানসার হয়েছে মিনুদি, সেটা ইতিমধ্যেই লাংস আর লিভারে ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি লাঞ্চে এক কাপ চিকেন সুপ অর্ডার করো, তা ছাড়া কিছু আমি খেতে পারি না,” খুব সাধাসিধে ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট গলায় বলল রাজর্ষি। ও বুঝতে পারল, সুমনার হাতটা শব্দ মুঠিতে ওর চুল টেনে ধরেছে কিন্তু ব্যথা লাগছে না একটুও। তার বদলে একটা অদ্ভুত আরাম ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে।

“রাজা তুই ডাক্তার দেখিয়েছিস! তাদের দেশে তো প্রতি হুণ্ডায় কতরকম নতুন ওষুধ বেরাচ্ছে, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলছে, সেসব বাদ দিয়ে তুই কিনা? ও মাই গড, রাজা!”

সুমনা বুঝতে পারলেন, ওর গলার মধ্যে সবকিছু দলা পাকিয়ে যাচ্ছে— রাগ, দুঃখ অভিমান। বুকের ভিতর থেকে ঘাড় আর দুই কানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে একটা অসহ্য পিটুনি, সেই ছোটবেলায় দেখা ছাদ-ভাঙা হাতুড়ির শব্দ। অনেক, অনেকদিন হয়ে গেল অনুভূতিদের এমন বেয়াড়া অত্যাচার তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন, মানসিক জগতের সবকিছু যেন একটা নিয়ম-মানা পোষা কুকুরের মতো ওঁর পায়ে পায়ে ঘুরত। এখন সেই পোষ-মানানো আরেগ যেন বোতল-ভাঙা ভূতের মতো আকাশ ঝুঁয়েছে, তার সামনে সুমনা অসহায়।

“রাজা সোনা, প্লিজ ডোন্ট থিংক আবাউট ডেথ। আমি এতদিন বাদে

তাকে খুঁজে পেয়েছি, মে বি ইন দ্য ওয়ার্স সারকামস্টাপেস, কিন্তু আমি আছি, এই দ্যাখ, আমাকে ধরে দ্যাখ। পাগলা ছেলে, তোর বাড়ির কেউ এসব জানে যে, তুই অ্যাকটিভ ইউথানেশিয়ার খোঁজে বেরিয়েছিস?”

“কেউ জানে না। অবশ্য পারিবারিক ব্যাপারে একটা খবর তোমার জেনে রাখা জরুরি কেননা সেও এক অদ্ভুত সমাপতন। কিন্তু না, ভায়াগেনোসিস হওয়ার পর থেকে সব কিছুই আমি লুকিয়ে রেখেছি। বিশ্বাস করবে না, এর মধ্যে ঘটনা করে আমার ঘট বছরের জন্মদিন পালন করাও হয়ে গেছে,” রাজর্ষি একটা আলগা হাসি হাসল।

সুমনা আরও কাছে ঘেঁষে বসে আছেন, ওঁর গা থেকে সুন্দর একটা গন্ধ হাওয়ায় ভাসছে, আঙুলগুলো চুলের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে, রাজর্ষি চোখ বন্ধ করে আরামের নিঃশ্বাস নিচ্ছে এখন।

“তুমি কবে চুল কেটে ফেললে মিনুদি?”

সুমনা চমকে উঠলেন একটু। ঠিক কবে মনে নেই কিন্তু বছরদিন হয়ে গেল, ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগেই হবে হয়তো। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অনুতাপের কাঁটা বিঁধল এক সেকেন্ডের জন্য।

“ওরে, আমার কথা বাদ দে, নিজের কথা বল বরং! কোথেকে উদয় হলি, তারপর বলছিস কিনা ক্যানসার হয়েছে, কিন্তু বাড়ির লোক কেউ জানে না। বয়স হয়েছে, এত নাটক আর বাবু নিতে পারছি না, খোলসা করে বল না কী ব্যাপার?”

“এর মধ্যে নাটক আসলে খুবই কম মিনুদি। কয়েক মাস আগে জানতে পেরেছি, ডাক্তার কেমোথেরাপি নিতে বলেছিল, আমি রাজি হইনি। ব্যথা কমানোর জন্য নানারকম ঔষধ আছে, তাই বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারেনি। তা ছাড়া ওজন কমে যাওয়া আমেরিকায় কোনও খারাপ খবর নয়, সকলে শুধু জিজ্ঞেস করবে যে, সিক্রেটটা কী?”

“রাজা, তুই তোর নিজের বউয়ের সঙ্গে কথা বলিসনি, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলিসনি! এ সবই যে অস্বাভাবিক, তুই কি সেটা বুঝতে পারছিস?” সুমনা প্রায় হাহাকার করে উঠলেন। রাজর্ষির মাথাটা এই মুহূর্তে ওঁর কোলের মধ্যে, দু’জনের প্রতিটি বিচলন কখন কীভাবে ঘটে চলেছে, তাই নিয়ে কেউই চিন্তিত নন বরং আশ্বস্ত, কেননা দু’জনের মধ্যে এক সংযোগ জীবিত রয়েছে, এত বছরের বিস্মৃতি এবং অবহেলাকে তুচ্ছ করে, সেটাই আশ্বস্ত করছে ওদের দু’জনকে।

“দিস ইজ্জ আ মিরাকল। ইউ নো দিস ইজ্জ আ টু মিরাকল, মিনুদি!” বলতে-বলতে রাজর্ষি বিমিয়ে পড়ছে। সুমনা দেখতে পেলেন, রাজর্ষির বাঁ হাতের ওপরে লাগানো স্বচ্ছ এক টুকরো প্যাচ, যেখানে লেখা আছে ছোট্ট একটা লেবেল— ফেক্টানিল ৫০ মাইক্রোগ্রাম। তার উপরে অক্সিকোডন ট্যাবলেট ওর মগজের মধ্যে আদিম অন্ধকারের ঘুমপাড়ানি গন্ধ বলে চলেছে এখন।

“আমি যে কারও সঙ্গে কানেক্ট করতে পারি না মিনুদি। সেসব অনেক গল্প, সময় পেলে বলব। মোন্দা কথা, আমার অসুখের খবরটা তুমিই প্রথম জানলে, তাও জাস্ট বাই চান্স। সেদিন যদি ইউথানেশিয়া নিয়ে ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি না শুরু করতাম তা হলে তো তোমার খোঁজই পেতাম না। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম যে, আমার ছোটবেলার আরও সব ভালবাসার মানুষরা যে-পথে গেছে, তুমিও তাদের সঙ্গে চলে গেছ সেই অনন্ত অনীহার ব্ল্যাক হোলে। নিজেকে আরও বড়, আরও সার্থক করার নেশায় আমি নিজেরই চারপাশে যে-অ্যান্টিথ্রাভিট ফিল্ড বানিয়ে ফেলেছিলাম, তারই বিকর্ষণে আন্তে-আন্তে দূরে সরে গেছ তোমরা সবাই। কিন্তু বলতে পারব না যে, খুব একটা খারাপ ছিলো জানো, মনে হয়েছিল ভালবাসা জিনিসটাই ওভাররেটেড, প্রচুর সময়ের ইনভেস্টমেন্ট, কিন্তু রিটার্ন খুবই গোলমালে, আনপ্রেক্ষিৎভাবে তো বটেই। তার চেয়ে সাফল্য শিকারের উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ অনেক বেশি রিয়্যাল। তারপর একদিন দুটো ঘটনা সব কিছু বদলে দিল।”

“রাজা, এই রাজা, এরকম করছিস কেন? দাঁড়া কাউকে ডাকি, দেখি যদি একজন ডাক্তারকে খবর দেওয়া যায়,” ব্রন্ত গলায় কথাগুলো বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন সুমনা কিন্তু ফোনের দিকে যাবার আগেই ওঁর কবজিটা ধরে ফেলেছে রাজর্ষি। ওর রোগা রোগা আঙুলগুলোতে এখনও

জোরের অভাব নেই।

“প্লিজ কাউকে ডেকো না মিনুদি। আ সাডন বাউট অফ পেন, ঠিক হয়ে গেছে। সোলার প্লেজাস কথাটা শুনে থাকবে, ওর আসল নাম সিলিয়াক প্লেজাস, প্রকাণ্ড একদলা নার্ভ, যা নাকি ওপরের পেটের সবকিছু কন্ট্রোল করে, আর এই হতচ্ছাড়া প্যানক্রিয়াটিক ক্যানসার মাঝে-মাঝে শালা ওটাকেই ধরে নেয়। আমি খুব শিগগিরই ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা বলে নিই, তা হলে বুকটা একটু হালকা হবে।”

পাশে রাখা ওষুধের বটুয়া খুলে কী একটা গিলে ফেলেছে রাজর্ষি। সুমনা বুঝতে পারলেন যে, তিনি এখন পাশের এই অসুস্থ মানুষটাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন। পিছন থেকে অজস্র ছবির বন্যা বইছে, এক অদ্ভুত সেনসিটিভ অথচ অবুঝ, মেধা আর বুদ্ধির আলোয় উজ্জ্বল এক কিশোরের ছবিগুলো বৃষ্টির মতো বারে বারে পড়ছে এখন।

“আমার ছেলেমেয়েগুলো সব অপদার্থ হয়েছে মিনুদি। মাই চিলড্রেন আর শিট! দেশ ছেড়ে, সংস্কৃতি ছেড়ে ভারতীয় বাবা-মায়েরদেব গর্ব করার, নিজেদের জাস্টিফাই করার একটা বড় জায়গা কী থাকে জানো তুমি?” রাজর্ষি জড়ানো গলায় বলল, “তারা নাকি ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নিজেদের জীবনটা উৎসর্গ করে দিয়েছে। ফাকিং ডিলিউশনাল, সেলফ চিটিং বাধা অফ ল্যাসার্স! কিন্তু বাইরের দিক থেকে অনেকেই এ-ব্যাপারে সফল, তারা লোকের কাছে বড় মুখ করে তাদের সন্তানদের সাফল্যের গল্প বলতে পারে। আমি সেদিক থেকেও হেরে গেছি মিনুদি। দিস ক্যানসার ইজ্জ আ ব্রেসিং ফর মি, এটাই আমার একমাত্র মুক্তি।”

কথা বলতে-বলতে বিমিয়ে পড়ছে রাজর্ষি, ও যেন সব কথা শেষ করে ঘুমিয়ে পড়তে পারলে বাঁচে এখন। কিন্তু সুমনা এই ধরনের দুঃখবিলাস আদর্শেই পছন্দ করেন না, বিশেষ করে বয়স্ক বুদ্ধিমান মানুষদের বেকার আত্মবিলাপ ওঁর একান্তই অসহ্য। রাজর্ষিকে এক ঝাঁকানি দিয়ে খাড়া করে তুললেন তিনি— “বিলাপ করা বন্ধ কর রাজা, তুই আর সেই ছোট ছেলেটি নেই! সোজা কথায় বললে তোর ছেলেমেয়েরা কী এমন করেছে যে, তার জন্য তুই লজ্জিত?”

রাজর্ষি কয়েক সেকেন্ড সুমনার চোখের মধ্যে তাকিয়ে থাকল। সোজা পরিষ্কার দৃষ্টি, তার মধ্যে নেশা বা পাগলামির ছিটেফোঁটাও নেই।

“আমার মেয়ে অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারের দিকে কোনওদিন নজর দেয়নি, শি জাস্ট ওয়াণ্টেড টু বি আ ডিভা। লেখাপড়া করল না, আর এখন তো নিজের পছন্দ করা সংসার নিজেই ভাঙছে। আমার ছেলে রুগু, ব্রিলিয়ান্ট, ভাল চাকরি করে বটে কিন্তু মানুষ হিসেবে ও অস্বাভাবিক। হি ইজ্জ আ হোমোসেকশুয়াল, মণীশ মিত্র নামে কোথাকার একটা হিজড়ে নাকি ওর হাজব্যান্ড! জানোয়ারটাকে হাতের কাছে পেলে আমি খুন করতাম!”

“কী বললি? মণীশ মিত্র? কোথায় থাকে, কীরকম দেখতে?” অবিশ্বাসী কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন সুমনা। কানের মধ্যে দবদব করা শুরু হয়েছে।

“কোথায় আর, আমাদের গড ব্লেসেড বে এরিয়াতেই। ফর্সা, কালো চোখ, পাতলা চুল, শার্প চেহারা, হঠাৎ দেখলে মনেই হবে না যে—”

রাজর্ষি থেমে গেল কেননা সুমনা জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, ঠিক সেই সময় ওষুধের পুরো খাটাকাটাও নেমে এসেছে হাতুড়ির মতো। শূন্যদৃষ্টিতে শেষবার সুমনার দিকে তাকিয়ে, ধপ করে একটা ভারী পাথরের মতো বিছানার উপরে গড়িয়ে পড়ল ও। সুমনা অসংলগ্ন পায়ে খানিকটা পিছু হটে জানালার পাশে সোফাটার উপরে গিয়ে বসে পড়লেন। কয়েক মিনিট ওঁর নড়ার ক্ষমতা থাকল না, কিন্তু যথার্থি নিজেই সামলে নিয়ে পায়ে-পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। এই মুহূর্তে একান্ত নিজের একটুখানি জায়গা, একটা বিছানা আর ল্যাপটপ ছাড়া, বাকি সবকিছুই অলীক অথবা যন্ত্রণাদায়ক।

স্মৃতি সত্তা এয়ারপোর্ট

এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি আসার মধ্যে সময়টা কম নয়, কিন্তু মা আর

ছেলের মধ্যে কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয়নি বললেই চলে। সুমনা ক্লান্তি এবং জেটল্যাগে কিছুটা ঘায়েল হয়ে আছেন এবং মণীশ যেন খানিকটা অপ্রতিভ, ঠিক কথাটা খুঁজে পাচ্ছে না, তাই মাঝে-মাঝেই একটা বোকা হাসি হাসছে। ছোটবেলায় দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার সময় খানিকটা এই রকম মুখ করত ছেলেটা। সেই সময় বকাবকি করতে গিয়ে বেকামা হাসি পেয়ে যেত সুমনারও। সেই সব হাসিকান্নার স্মৃতি জেটল্যাগের ধোঁয়ায় মধ্যে উকি মারতে থাকল, বাইরের উজ্জ্বল রোদ তার ওপর একটা আরামের চাদর বিছিয়ে দিল যেন। গাড়ি যখন তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে, সুমনা তখন গভীর ঘুমে।

“মা ওঠো। মা, বাড়ি এসে গেছি। মা—”

সুমনা বুঝতে পারছেন কেউ ঠুঁকে ডাকছে কিন্তু চোখ খুলতে ইচ্ছে করছে না। চোখ খুললেই নেশাটা কেটে যাবে, হাওয়ায় উবে যাবে সময়ের বাঁধন থেকে মুক্ত এই অলৌকিক অভিজ্ঞতা। কিন্তু একসময় তো চোখ খুলতেই হয়।

সুমনা জমির মতো পায়ে-পায়ে লাগেজ টানা ছেলের সঙ্গে-সঙ্গে চললেন, তারপর একসময়ে চোখ মেলে দেখলেন পাঁচতলার ওপরে কী সুন্দর আর ছিমছাম একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হয়েছেন তিনি। ছবি দেখে কিছুই বোঝা যায় না, আসলে কী জীবন্ত এই কাঁচে ঘেরা এক চিলতে বৈঠকখানা, যেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ডাউনটাউনের উজ্জ্বল সৌধমালা, দুই পাশে অনুচ্চ পাহাড় আর সবকিছুর পিছনে উপসাগরের নীলাভ সঙ্কেত।

“মা একটু কফি খাও তারপরে চান করে এসো, জেটল্যাগ কেটে যাবে,” মণীশ হাসছে। ওর কথাবার্তার মধ্যে রাগ, অভিমান কিংবা অভিযোগের ছিটেফোঁটাও নেই এখন। বরং ওর হাবভাবে জড়িয়ে আছে একটা অদ্ভুত সুইটনেস, যেটাকে বাংলায় মিষ্টি বললে কিছুই বোঝানো যায় না, আদত ইংরেজি শব্দটা ব্যবহার করতেই হয়। এই নিয়ে মাঝে-মাঝে ভারি বিরক্তি লাগে সুমনার। ওঁর মতো যাঁরা দুই ভাষার দুই নৌকায় পা রেখে ব্যাল্যাপ্স সামলে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, একমাত্র তাঁরাই জানেন যে, বিশেষ একটি ভাব বিশেষ একটি ভাষায় যেমন করে বোঝানো যায়, ভাষান্তরে সে হারিয়ে যেতে বাধ্য। শব্দরা যে-যার নিজস্ব গোপনীয়তা নিয়ে লুকিয়ে থাকে, অপরিচিতর কাছে ধরা দিতে তাদের একান্ত অনীহা। হয়তো সম্ভব হতেও পারত যদি সেই দুই ভাষার মধ্যে একটি এমন রুপ্ত এবং অবহেলিত না-হত। কিন্তু আচমকা এই সব চিন্তা মাথায় আসছে কেন, এর চেয়ে অনেক বেশি দরকারি খবরাখবর যে ওঁর জন্য অপেক্ষায় রয়েছে, তিনি কি সেসব বেমালুম ভুলে গেলেন নাকি?

গরম জলের ধারার মধ্যে একটানা দাঁড়িয়ে থাকার একটা অদ্ভুত নেশা আছে, সুমনা প্রায় জোর করে নিজেকে ওখান থেকে টেনে বার করলেন। ফ্রেশ জামাকাপড় পরে লিভিংরুমে পা দিতে না-দিতেই একটা অপরিচিত সুগন্ধ পেলেন তিনি। ছেলেদের কোলনের গন্ধ কিন্তু এটা মণির নয়, মণি অন্য ব্র্যান্ডের কোলন ব্যবহার করে।

“মা তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই— রাজা আঙ্কলের ছেলে, আমার পার্টনার রুণু। আমরা দু’জনে খুব ভাল বন্ধু, সেটাই আমাদের আসল সম্পর্ক।”

রাজার ছেলে রাজপুত্র! সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটির দিকে এক বালক তাকিয়েই কথাটা মনে এল সুমনার। লম্বায় চওড়ায় রাজর্ষির তুলনায় অনেকটাই বেশি, তার ওপরে লম্বা চুল এবং দাড়ি রেখেছে, সুতরাং বাইরের দিক থেকে ওরা অবশ্যই আলাদা। কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টি, হাসি আর দাঁড়ানোর ভঙ্গি অতি পরিচিত, তার মধ্যে রয়েছে এক স্বাভাবিক আভিজাত্য, অথচ চালিয়াতি এক ফোঁটা নয়। আসলে কিছু কিছু মানুষের মনের মধ্যে চেতনার একটা আগুন জ্বলতে থাকে, বিনা চেষ্টাতেই তার আভা ছড়িয়ে পড়ে ওদের মুখের চারপাশে। যাদের চোখ আছে তারা ঠিক দেখতে পায়। যাদের চোখ আছে তারা এও দেখবে যে, ওদের এই ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি গৃহসজ্জার সামগ্রী, দেওয়ালে টাঙানো ছবিরা এবং আসবাবপত্র সবাই একে অপরের সঙ্গে নিখুঁতভাবে

মানানসই, সব মিলিয়ে যেন এক শব্দহীন অর্কেস্ট্রা। রুচি আর সচ্ছলতার এক স্নিগ্ধ সমন্বয়, এই বাড়াবাড়ির যুগে এমনটি খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন।

“বসো রুণু, কী সুন্দর তোমাদের এই অ্যাপার্টমেন্ট,” আর কোনও কথা খুঁজে পেলেন না সুমনা। সংসার সাজানোয় ওঁর নিজের ছেলেটি যে আস্ত অপোগণ্ড, সে-কথা ও নিজেই বারবার বলেছে। সুতরাং এটা রুণুর হাতের কাজ না হয়ে যায় না। স্মৃতি ওঁর মনে কয়েকবার ঘুরপাক খেল, তারপর তিনি হঠাৎ করেই একদম পরিষ্কার দেখতে পেলেন এক অতি শান্ত শ্যামলাবরণ যুবতীর মুখ— রাজার মা, লবঙ্গকাকিমা, যার চারদিকে চেনা গানের সুরগুলো নিত্য অনায়াসে ভেসে বেড়াত সারাদিন। সামান্য উপকরণ দিয়েও নিখুঁতভাবে সাজানো, ছিমছাম একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট, তার প্রতিটি কোণায়, প্রতিটি পলকে থেকে যেত একজনের নীরব ব্যস্ততার প্রতিবিম্ব। বাজারের থলি যতই ছোট আর কমদামি হোক না কেন, তাই দিয়েই তিনবেলা সেই ছোট্ট রান্নাঘরটি থেকে বেরিয়ে আসত একের পরে এক দেশি-বিদেশি সুখান্দের সমাহার। সুমনা জীবনে একবারই তার স্বাদ পেয়েছিলেন, কলেজে চলে যাওয়ার আগে, শুধু একটা দিন ওদের বেহালায় বাড়িতে অতিথি হওয়ার সুবাদে।

আমার ভিতর বসত করে কয়জনা? কোন জিন যে কোথা থেকে মুক্তি পায়, কোষ বিভাজনের অন্ধকার ঠেলে কোন ফেনোটাইপ মাথা তোলে— কে তার হিসেব রাখে! শুধু এই মুহূর্তে অনেকদিনের অন্ধকার পেরিয়ে সুমনা কয়েকজন মানুষের হৃদিশ পেয়েছেন যারা নাকি ইতিমধ্যেই মোটামুটি হারিয়ে গিয়েছিল, মরে গিয়েছিল বললেও হয়। কিন্তু সেই আবিষ্কারের মধ্যে উত্তেজনা নেই, তার বদলে রয়েছে কিছু অনিকেত ক্লান্তি আর ভয়। কিসের ভয় তা সুমনা জানেন না। এরই মধ্যে রুণু নিখুঁতভাবে টেবিল সাজিয়ে ফেলেছে, তিনজনের মধ্যে টুকটাক কথাবার্তাও চলছে, অথচ ভিতরের দিক থেকে সুমনা একেবারেই অনুপস্থিত। ওঁর মনের মধ্যে উৎকট এবং অপরিচিত কয়েকটি বিচার যেন কোনও এক গুহার অন্ধকারে বাদুড়ের মতো কালো ডানা মেলে উড়ছে এখন।

রাজা বলেছিল যে, শ্রৌচত্বের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে নিয়ে যে-পারিবারিক সুখ, তা নাকি ওর কপালে লেখা নেই। সুমনা অনুভব করলেন যে, তাঁর একমাত্র সন্তানটির সঙ্গে-সঙ্গেই নিজের পরিবার বলতে যা বোঝায় তারও শেষ হতে চলেছে। ওর ছোট বোনটি অনেক চেষ্টা করেও সন্তান ধারণ করতে পারেনি, কিন্তু সে আইনগত ভাবে দুটি ছোট্ট মেয়েকে অ্যাডপ্ট করে দিবা শান্তিতে আছে। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা তার ছিঁড়ে গেল, সুমনা বুঝতে পারলেন যে, তিনিও চেয়েছিলেন একমাত্র ছেলের জন্য একটা স্বাভাবিক বিয়ে, বউমা, নাতিনাতনি, একটা সফল পরিবারের চারপাশে সামাজিক আশ্রয়ের উজ্জ্বলতা। তার বদলে তিনি এবং রাজা, একজন জীবিত, অন্যজন মৃতদের রাজ্যে, কিন্তু দু’জনেই এক ব্যক্তিগত ট্রাজেডির দুঃসহ বোঝা ঘাড়ে করে বইছেন। রাজা যদিও রক্তমাংসের দুনিয়ায় নেই কিন্তু তাই বলে ওর বোঝা যে এক ফোঁটা হালকা হয়নি, সুমনা তা বিলক্ষণ জানেন।

ডিনার দেওয়া হয়েছে, রুণু ওর পাশে বসে অনেক কথা বলে চলেছে এখন। ও জানতে চায়, ওর বাবার ছোটবেলা কেমন কেটেছিল, সেই অস্পষ্ট অতীতে, ব্যক্তিগত আবেগের এলাকায় ঠিক কেমন মানুষ ছিল ওর বাবা। এসব জানা অবশ্যই जरুরি, কেননা কয়েক দিনের মধ্যেই এই চত্বরে বেশ বড়রকম একটা অনুষ্ঠান হতে চলেছে। মৃত্যুকে কেমন করে সামাজিক জীবনের অংশ করে ফেলা যায়, তাই নিয়ে চিন্তাভাবনা অনাদিকালের কিন্তু অধুনা এই ছিন্নমূল অথচ ইন্টারনেটের দৌলতে সবজান্তা সমাজ একটা নতুন আইডিয়ার উদ্ভাবন করে ফেলেছে, যার নাম সেলিব্রেশন অফ লাইফ। যে-মানুষটা নেই, তার ফেলে যাওয়া জীবনটাকে কেমন করে তোলাই দেওয়া যায়, সেই নিয়ে অন্ততপক্ষে একটা সন্ধেবেলা কেমন করে কাটানো যায় বেশ একটা আরামদায়ক সামাজিক আয়োজনে। সেই রকম একটা কিছু ঘটতে চলেছে এই



সপ্তাহান্তে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুমনা সেখানে থাকবেন বলে কথা দিয়ে ফেলেছেন। তার আগে যতখানি সম্ভব, তিনি ছেলে আর ছেলের বন্ধুর সঙ্গে এক অন্যরকমের জীবনবোধ এবং মানসিক ভাবে অচেনা এক মহাদেশের সন্ধানে ব্যস্ত থাকতে চান।

“মা আমি জানি যে, নৈতিক গল্পটা যদি ছেড়েও দিই, তবু এইরকম একটা সম্পর্কের ডাইনামিকস তোমার কাছে অবোধ্য ঠেকবে, তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে কনফিউশন, ভয়, রাগ, রিজেকশন, ইত্যাদি। তাই আমরা তোমাকে অনুরোধ করব যে, আমাদের প্রতিদিনের জীবনটা তুমি কিছুদিন জাস্ট দেখো, ধরে নাও তুমি তোমার ছেলের কাছে ছুটি কাটাতে এসেছ। বাকিটা একটু-একটু করে তুমি নিজেই বুঝে নিতে পারবে এটাই আমাদের বিশ্বাস,” মণি গুঁর কোলের মধ্যে মাথা রেখে কথাগুলো বলেছিল সেদিন, রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছিল বিরিয়ানির সুগন্ধ। সুমনাও কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন, হুইস্কির মহিমায় অতীত ভবিষ্যৎ বেশ একটু গুলিয়ে গিয়েছিল সেদিন। লম্বা একটা ঘুম দিয়ে পরের দিন অনুষ্ঠানের জন্য নিজেকে তৈরি করতে চাইছিলেন তিনি। সমস্যা এটাই যে, কিছু কিছু কথা, কিছু চিন্তা এবং ভাবনা কোনওক্রমেই তাদের সাজানো গল্পের মোড়কে ঢুকতে চায় না, তারা অব্যাহত বটেই, তার সঙ্গে রীতিমতো মারকুটে অর্থাৎ কিনা অ্যাগ্রেসিভ, তাদের মতলব শুধু সব কিছু বেবাক গুলবেলট করে দেওয়া।

ফাটাফাটি একটি ডিনার খাবার পরে অবশেষে সেই পুরনো প্রশান্তির ঘুম এসে বাসা বাঁধল সুমনার দু’চোখে। দুই ছেলে মিলে গুঁকে এতটাই আদর-আহ্লাদ দিয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত আরামে চোখ বুজে ফেলতে মোটামুটি বাধ্য হয়েছেন তিনি। অনেকদিন হয়ে গেল কেউ এতটা যত্ন নেয় না, হৃদয়ের দরজায় এমন আগ্রহে কড়া নাড়ে না কেউ। অন্ধকার যখন সদ্য পাতলা হতে শুরু করেছে ঠিক তখনই জেটল্যাগের নিয়ম মেনে ঘুম ভেঙে গেল সুমনার। পরিচিত পৃথিবীর উল্টোদিকে, এই বিশেষ ব্রান্ড মুহূর্তটি যে-কোনও পর্যটকের কাছেই পরিচিত যখন সারা শরীরে লম্বা জেটযাত্রার নিপাট ক্লান্তি, অথচ মস্তিষ্ক তার নিজস্ব ঘড়ির নিয়ম মেনে অকারণেই জাগ্রত এবং প্রায় বিরক্তিকরভাবে সজাগ।

সুমনা একবার বাথরুম থেকে ঘুরে এসে, চূপচাপ দু’চোখ মেলে বিছানায় শুয়ে রইলেন, জানালার ওপাশে যখন উপসাগরীয় আকাশ খুব আন্তঃ-আন্তঃ ফর্সা হচ্ছে, দু’একটা গাঙচিল সময়ের আগেই হইচই তুলেছে অন্ধকার-মাখানো ঢেউদের মাথায় মাথায়।

স্বপ্ন দেখার যদি কোনও দেবতা থেকে থাকেন তা হলে ঠিক এই সময়ে তাঁর কাণ্ডকারখানা বোঝা যায়। টেকনিকাল ভাষায় এর নাম লুসিড ড্রিমিং, অর্থাৎ কিনা আধো ঘুমের মধ্যে নানারকম পরিচিত গল্পের একটানা পুনরাবৃত্তি। সুমনা নিয়মমতো সেই সবার মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলেন খানিকক্ষণ, যদিও সে-অভিজ্ঞতা সুখের নয়, কেননা গুঁর স্বপ্নগুলো সাধারণত ডিসটপিক, বেদনাদায়ক, সেই একই উদ্ভট বিপন্নতার একঘেয়ে ভৌতিক পুনরাবৃত্তি। আজ রাত্রিশেষের বিছানায় শেষবারের মতো যখন গুঁর চোখের পাতায় ঘুমের পালক বুলিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে, আকাশে ফুটে উঠেছে প্রথম আলো, তখন কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটা আনকোরা নতুন স্বপ্ন সুমনার মগ্ন চেতনায় বালসে উঠল। পরিষ্কার বুঝলেন যে, এটা ভোরবেলার স্বপ্ন বই কিছু নয় তবুও উপভোগের এক আত্মত ইন্দ্রজাল গুঁর সারাগায়ে ছড়িয়ে গেল, সূর্য ওঠার মাত্র কয়েক মিনিট আগে। ঘণ্টা তিনেক পরে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসেও সুমনা সেই আবেশ থেকে এখনও পুরোপুরি মুক্ত নন। হয়তো বা সেই জন্মই ছেলেদুটোর সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার আর বন্ধুত্বের মধ্যে আপত্তিজনক কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি একেবারেই। শোবার ঘরে কার কী পরিস্থিতি, এবং তাই নিয়ে দুনিয়ার বাকি লোকদের কেন মাথাব্যথা, সেই চিরকালীন প্রশ্নটির উত্তর আন্তঃ-আন্তঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সুমনার মনে, আর সেই সঙ্গে মনটাও কেমন যেন হালকা লাগছে অনেকদিন পরে।

টুকটাক কথা, একটু টেলিভিশন কিংবা পুরনো গান, এইসব নিয়ে অতি আলস্যে কেটে গেল সকাল থেকে দুপুর। পেট-ভরা সুখাদ্য এবং আর-এক রাউন্ড ঘুমের পরে অবশেষে জেটল্যাগ ঝেড়ে ফেলে পুরোপুরি ফ্রেশ হয়ে উঠলেন সুমনা। ছেলেরা ওদিকে ডিনারের জন্য রেডি হচ্ছে, পোশাক পরিচ্ছদের দিক দিয়ে ওরা দু'জনেই অতিশয় শৌখিন এবং দুর্দান্ত রকমের ফ্যাশন-সচেতন।

সুমনা ওদিকে অনেকক্ষণ হল তৈরি হয়ে নিয়ে বসে আছেন। সাজগোজ, মেকআপ ইত্যাদি কোন বয়সে কখন, কতটা করা যায়, শে-শাক্ত্রে ঠাঁর অনেক দিনের অধিকার। আয়নার দিকে এক বলক তাকিয়ে নিজেকে বেশ ভালই লেগেছে ঠাঁর। যাট পেরিয়েছেন কিন্তু ভিতরে কোথাও কিছু একটা এখনও রয়ে গেছে যা জীবন্ত এবং উৎসুক, তার জন্য বেঁচে থাকার গল্পটা এখনও বোরিং নয়।

রাজার কাছে বেঁচে থাকাটা বোরিং হয়ে গিয়েছিল। সুমনা জানেন যে, রাজার মতো যেসব মানুষরা, যারা কিনা অল্পবয়স থেকেই ভাবজগতের বাসিন্দা তাদের জন্য সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলা, আর মরে যাওয়ার মধ্যে খুব একটা তফাত নেই। কিন্তু যে-প্রশ্ণটা ও তুলে দিয়ে গিয়েছে, সুমনা নতুন করে তার জবাব খুঁজতে বসে গিয়েছেন এখন। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যদি ঠান্ডা এবং সুস্থ মাথায়, যথেষ্ট আলোচনা, কাউন্সেলিং, সাইকোথেরাপি ইত্যাদির বেড়া টপকে, শেষ পর্যন্ত বাঁচতে না-চায়, তা হলে দেশের আইন কি সেখানে তার পক্ষে দাঁড়াবে নাকি বিপক্ষে। যদি বিপক্ষে দাঁড়ায় তবে সেই মানুষটার জন্য রয়ে গেল হয় এক অনিচ্ছার জীবন টেনে নিয়ে চলা, নয়তো ভুলভাল পদ্ধতিতে আত্মহত্যা করতে যাওয়ার যন্ত্রণাদায়ক কিংবা অপমানজনক অভিজ্ঞতা।

“রাজা তুই গ্লিভ আমার মগজ থেকে বেরো, আমারও বয়স হয়েছে, এই ভুলভাল রেটোরিক আমি আর নিতে পারছি না! এখন কয়েক দিন আমাকে অনেক সামাজিক কথাবার্তা বলতে হবে, তুই যদি সেই চতুরেও এসে বসে থাকিস তা হলে ব্যারিস্টার সুমনা মিত্র জীবনে এই প্রথমবার যেঁটে যাবে, তুই কি সত্যিই সেটা চাস? তার চেয়ে আমাদের সেই চুপচাপ ভোররাতের দেখা হওয়াটা ভাল নয়? যেমন করে ব্যারাকপুরের রাসমণি ঘাটের অপর গঙ্গায় প্রতিদিন সূর্য উঠত, মানে বুঝক আর নাই বুঝক, জলে দাঁড়িয়ে বয়স্ক মানুষরা ভুল উচ্চারণে বলেই যেতে থাকত ওই কিছু একটা— জবাকুসুমসঙ্কাসং কিংবা ভূর্ভুঃ সং? কী বলিস, অদ্ভুত একটা শাস্তি ছিল না ওখানে? ওই শাস্তির দেশে তুই ফিরে যা রাজা, আমাকে আর হন্ট করিস না,”—গাড়িতে বসে বিড়বিড় করে কথাগুলো হয়তো বলেই ফেলেছিলেন সুমনা, কিন্তু ছেলেরা ইতিমধ্যেই মিউজিক সিস্টেমে মায়ের পছন্দের বাংলা গান অতি তারস্বরে লাগিয়ে দিয়েছে সুতরাং কথাগুলো শেষ পর্যন্ত ঠাঁর মনেই থেকে গেল।

যেখানে সংলাপ নেই

“আচ্ছা মা, এই ভদ্রমহিলাকে তুমি কি আগে থেকে চিনতে? বাবা কখনও ঠাঁর কথা বলেছিল, কিংবা ইমেল ওদের মধ্যে কনটাক্ট হয়েছিল কখনও কোনও?” এইখানে এসে দিরা একটু হেঁচট খেতে বাধ্য হল। ওর ভালই জানা আছে, এই প্রজন্মের কাছে অন্যের ফোন কিংবা ইমেল যেঁটে দেখা মোটামুটি অমার্জনীয় অপরাধ হলেও শরীরী জন্য ওটা কোনও সমস্যাই নয়।

“একদমই না, আমি ফোন, ল্যাপটপ সব কিছু যেঁটে দেখেছি, এই কাণ্ডটার আগে ওদের মধ্যে কোনওরকম যোগাযোগই ছিল না। তিনিই যে মণীশের মা, সেটা আমাদের কারওরই জানা ছিল না, আর তুই তো জানিস তোর বাবা এই সম্পর্কটা নিয়ে কতখানি উত্সাহ হয়ে ছিল। তুই কি ভাবছিস জানলে ও যোগাযোগ করার চেষ্টা করত না?” শরীরী ক্লান্ত গলায় বলল।

এই এক বছর পরে সব রকম অনুভূতিই যেন ওই রান্নাঘরের ড়য়ারে অতিরিক্ত ব্যবহার করা ছুরিটার মতো ভোঁতা হয়ে গেছে। প্রথমে ছিল রাগ আর দুঃখ, তারপরে একদিন নিজের মনে এক টুকরো অনুতাপের

সঙ্গে কিছুটা বেকার দরাদরি, অজুহাত, ভুলে যাওয়া, পালিয়ে যাবার চেষ্টা। পরিবারে একটা আত্মহত্যার ঘটনা কীরকমের সামাজিক অভিঘাত এনে দেয়, একমাত্র ভুক্তভোগীরাই তার খবর রাখে। সমাজ যে কীরকম নিষ্ঠুরভাবে কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারে, ব্যক্তিগত দুঃখ আর প্রয়োজনীয় মৌনর উপর তার লাগাতার আক্রমণ যে কীরকম অসহ্য হয়ে ওঠে, মৃত ব্যক্তিটি অবশ্যই তার খোঁজ রাখে না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই জুড়িয়ে যায়, পরিচিতদের জিভের মধ্যে কেলেক্সারির স্বাদ মিলিয়ে গিয়ে তার জায়গা নেয় খাঁটি মানবিক করুণা, তখন পরিবেশটা একদম ভিতর থেকে বদলে যায়। প্রায় মাসদুয়েক হয়ে গেল, শরীরী একটা অদ্ভুত মানসিক শান্তির খবর পেয়েছে, যেটা গত দশ বছরে ও প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিল। রাজর্ষির এই অন্তর্ধানের আগে পর্যন্ত জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রতিদিনের এক অর্থহীন সংঘাত এবং সেই সংঘাতের প্রতিটি গল্প বাকি সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য একটানা এক উদ্ভট প্রচেষ্টা। দু'জন মানুষ, যাদের জীবনবোধ আলাদা, তারা পরস্পরের মানসিক বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করতে পারছে না, তাই নিয়ে লড়ে চলেছে দিনরাত। এই লড়াইয়ের মধ্যে সামিল হয়ে গিয়েছে বাকি সবকিছু। সেখানে রয়েছে ব্যক্তিস্বাভাব্য এবং অধিকারবোধের মধ্যে বিতর্ক, যখন-তখন নীতি পুলিশের আনাগোনা আর সেই সবকিছুর মধ্যে প্রাণপণে চেপে রাখা বিরক্তি। রয়েছে সামাজিক জেলখানার মধ্যে যৌনতার নানারকম উদ্ভট সমীক্ষা এবং ঠিক তার পাশাপাশি যেমন করেই হোক, দু'জন মানুষের পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে থাকার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। এখন হঠাৎ করেই সে প্রতিযোগী অনুপস্থিত, সেই জেলখানা উধাও এবং ধরাছোঁয়ার বাইরে, তাই শরীরীও যেন নিজের মতো একটুখানি শ্বাস ফেলতে পারছে আজকাল। এই সব কথা কারও কাছে প্রকাশের জন্য নয়, এরা একান্তই গোপন, পরিবার, পরিজন, বন্ধু-বান্ধবীরা কেউই ঠিক এই অচেনা স্বস্তির এলাকাটিতে স্বাগত হতে পারে না। নিজের এইসব ব্যক্তিগত গহন অনুভূতির কাছে ও নিজেই মোটামুটি জঙ্গ হয়ে থাকে আজকাল।

“মা চলো, দেরি হয়ে যাবে,” দরজা থেকে ডেকে বলল দিরা। ড্রাইভওয়ের উপরে বড় গাড়িটা নিয়ে অপেক্ষা করছিল সৃজন, এবার দিরা এক লাফে ওর পাশে উঠে বসেছে। পিছনের সিটে বসে শরীরী মনে হল, ওদের মধ্যে সব কিছু বোধহয় ঠিক হয়ে গিয়েছে। হয়তো এই ট্রাজিক ঘটনার অভিঘাত ওদের মধ্যে পুরনো সব নালিশ আর অভিমান ধুইয়ে দিয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে তো সেই রকমই মনে হয় কিন্তু ভিতরের কথা কে টের পাবে? গত বছরটার প্রতিটি দিনে আর ঘটনায়, দিয়ার পাশে পাশে ছায়ার মতো লেগে থেকেছে সৃজন, এক নিমেষের জন্যও বোধহয় ওর পাশ ছাড়েনি। বেশ কয়েকবার ওর বুকে মাথা রেখে দিরা কে চোখের জল ফেলতে দেখেছে শরীরী, এত দুঃখের মধ্যেও দৃশ্যটা দেখে মন ভরে গিয়েছে তখন। আজকের এই দুপুরে ওদের সঙ্গে এই সামাজিক অ্যাডভেঞ্চারে যেতে মোটামুটি ভালই লাগছে ওর।

অনুষ্ঠান যেখানে হচ্ছে, সেটাকে এ-তল্লাটের হিন্দু মহাসভা বলা যেতে পারে। ক্যাম্পাসের একদিকে লাল আর সাদা পাথরের মন্দির। তার শিল্প যতই অর্বাচীন হোক, তার মধ্যে একটা চটক এবং পরিচ্ছন্নতা অবশ্যই আছে। গুজরাতি, মরাঠি এবং তেলুগু সমাজ অন্যত্র নিজেদের ঝগড়াঝাঁটি ভুলে গিয়ে একসঙ্গে এই চত্বরের দেখভাল করতে রাজি হয়েছে, তাই স্থানীয় লোকরাও আন্তে-আন্তে এই নতুন হুজুগে উৎসাহিত। উইকএন্ডে যোগ ক্লাস থেকে শুরু করে মেডিটেশন, সংসঙ্গ ইত্যাদি প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার বাজারে সাদা খন্দের বেড়েই চলেছে ক্রমাগত। মন্দিরের উল্টোদিকে পার্কিং এলাকা পেরোলেই কমিউনিটি সেন্টার, সেটা বিবিধ সামাজিক উপলক্ষে ভাড়া দেওয়া হয়। নেহাত মাহের কালিয়া আর পাঁঠার মাংস এখানে চলবে না, নতুবা প্রতি বছর বাঙালিদের দুর্গাপূজোটা এখানেই দিব্যি হয়ে যেতে পারত— গাড়ি থেকে নামার সময় অকারণেই শরীরী মনে হল কথাটা। মনে পরে গেল ফি-বছর দুর্গাপূজোর সময় জায়গা ঠিক করা, নাটকের মহড়া, জলসা আর খাবারের মেনু নিয়ে কীরকম ব্যস্ত হয়ে উঠত রাজর্ষি।

অনেক চেয়ার পাতা প্রশস্ত একটি ঘর, মাঝখানে পোড়িয়ামের

ওপর রাজর্ষির ছবি, তার চারদিকে ফুলের মালার ফ্রেম। চেয়ারগুলো ভর্তি, এলাকার পরিচিতরা সবাই তো এসেছেই, তা ছাড়াও ওর অফিস থেকে একদল অচেনা মুখ হাজির। কাজের জায়গায় রাজর্ষির সুনাম অটুট ছিল, তাই ওর এমন হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়াটা মেনে নিতে পারেনি অনেকেই। তারা সবাই আজ শরীরকে ঘিরে ধরেছে, তাদের একটানা আলাপ-প্রলাপের মধ্যখানে শরীরের চোখ খুঁজে চলেছে কলকাতা থেকে আসা সেই রহস্যময় মহিলাকে, সব ছেড়ে যাবার আগে যার কাছে ছুটে গিয়েছিল লোকটা।

ওই তো সামনের সারির এক কোণায় বসে আছেন তিনি, যেন এক রানির মতো, সাদা কালো পোশাক এবং বব চুল, দু'পাশে বসে দুই সুবেশ নওজোয়ান। শরীরী টের পেল যে, ওর বুকের মধ্যে একটা ছুরির ফলা বিধে যাচ্ছে, কান গরম হয়ে উঠছে অহেতুক ক্রোধে। ওই দু'জনের মধ্যে একজন যে ওরই সন্তান রুণু, রাজর্ষির অনেক সাধের উত্তরাধিকারী, অনেক আশার অন্দরমহল। এখন ও নাকি এক লিঙ্গহীন আজব পৃথিবীর বাসিন্দা, এবং তার মূলে রয়েছে ওই মহিলার অশুভ জরায়ুর অস্বাভাবিক সন্তান, ওই মণীশ। শরীরীর মনে হল, এই মহিলা আসলে ভাইনি, ছোটবেলায় রাজর্ষির মাথাটা খেয়েছে, তারপর ফিরে এসেছে ওর সন্তানদের খেয়ে ফেলতে।

অন্যদিকে ওই যে-কয়েকজন বসে আছে, ওরাও শরীরীর অতি পরিচিত কিন্তু ইদানীং ওদের সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ। রথীন, পরমা, ঋতু আর রমিতা— সকলে কেমন যেন গুটিয়ে গিয়েছে। আর ওই যে অস্ত্র, যে নাকি সকাল বিকেল যে-কোনও ছুতোয় এ-বাড়িতে হানা দিত, সেও যেন জাদুমন্ত্রে মিলিয়ে গিয়েছে, নতুন চাকরি নিয়ে ঘাটি গেড়েছে দেশের উল্টোদিকে, নর্থ ক্যারোলাইনায়। মোদা কথা, পুরনো সভাটি ভেঙে গিয়েছে, এবং তার মধ্যমণি সেই কিঞ্চিৎ ছিটগ্রস্ত মানুষটির অনুপস্থিতির জন্য বিলকুল ঘেঁটে গিয়েছে পুরো গ্রন্থোটাই। এমনকি পরমার সঙ্গে ফোনে কথোপকথন কদাচিৎ হয় আজকাল।

চারদিকে এখন অনেক কথাবার্তা হচ্ছে, অনেক লোকের অযথা স্তুতিবাক্য কিংবা রোমন্থন, অথচ শরীরী খুব একটা কিছু শুনছে না কিছুই। ভিতরে কোথাও একটা ওরক্ত দেখছে, কিন্তু সে-দর্শন একান্তই গোপনীয়।

অনুষ্ঠান শেষ হল। সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয় হয়ে গিয়েছে, সকলেই সুশীল এবং সম্ভ্রান্ত, অনুষ্ঠান শেষে যে যার নিজস্ব ধাক্কায় ফিরে যাবে সবাই। শরীরীর একান্ত অনুরোধে পরিবারের সদস্যরা, বিশিষ্ট বন্ধুজন এবং অবশ্যই সুমনা ওদের বাড়িতে আজ নিমন্ত্রিত।

বিকেলবেলায় কিছুটা ক্লাস্ত অবস্থায় ওরা যখন বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে, ততক্ষণে আকাশ এক অদ্ভুত আধো-তন্দ্রায় গুমোট। আকাশের মন খারাপ হয়েছে অথচ ও ঠিক করতে পারছে না যে, বৃষ্টিটা এখনই কি নামাবে নাকি টাঙিয়ে রাখবে রাতের জন্য। আজ সারাদিনের অনুষ্ঠান পুরোটাই সামাজিক স্রবণামে বাঁধা, কেতাদুরস্ত স্মরণসভার শেষে নিয়মমাফিক এক পারিবারিক ডিনারে মিলিত হতে চলেছেন সকলে। শরীরীকে কিছুই করতে হয়নি, কেননা পরিবার পরিজনের কেউ না-কেউ ওর দায়িত্ব নিয়েছে আগাগোড়াই। দিরা স্নান করতে গিয়েছে, সন্দেহ নেই যে, ডিনারের জন্য একেবারে তৈরি হয়েই ঘর থেকে বেরোবে ও। সৃজন একবার খবর নিয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই ও ফোন নিয়ে ব্যস্ত, কেননা হাজার হোক, জামাই হিসেবে ওর কাঁধেই তো সব ঠিকঠাক রাখার দায়িত্ব। রুণু অনেকক্ষণ ধানাইহাসিই করে অবশেষে ওই মণীশ ছেলেরটা সঙ্গে উধাও। সকলে কেমন যেন অস্বাভাবিক রকমের স্বাভাবিক, এই পুরো ব্যাপারটাই যেন একটা সার্কাসের শো, সময়মতো শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যাবে সকলে।

ঘণ্টা টুং করে বেজে উঠল। শরীরী অভ্যেস-মাফিক দরজা খুলতে এগোল বেশ কিছুটা অবাক হয়েই। এই সময়ে কারও আসার কথা তো নয়। দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে এক বছরের জমিয়ে রাখা প্রশ্নরা সবাই একসঙ্গে ঠিক যেন একঝাঁক পাখির মতো মনের আকাশে উড়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য ও একেবারে ছবি।

“হ্যালো শরীরী, সরি আমি আপনাদের অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম।

আসলে ফোন করেছিলাম কিন্তু কেউ ধরল না। তাই আর কী— মানে একটা কথা আপনাকে আলাদা করে না বললেই নয়।” সুমনা প্রাণপণ চেষ্টায় অপ্রস্তুত ভাবটা ঢেকে রেখেছেন, কিন্তু ওঁর বুকের ভিতর হাতুড়ি পেটানোর বিরাম নেই।

“না, না আমিই বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তা ছাড়া সকাল থেকেই ফোনটা যে কোথায় গেছে, কে জানে? আপনি আসুন না, ভেতরে আসুন,” শরীরী সামলে উঠে ভদ্রতা করল এবার।

“না না, বসব না, তা ছাড়া একটু বাদে তো দেখাই হচ্ছে। আপনি এই প্যাকেটটা প্লিজ রাখুন। এটা আসলে রাজা, মানে রাজর্ষির জার্নাল বলতে পারেন, ওর জীবনের শেষ কয়েক মাসে লেখা। সকালে শুনলাম ওর ল্যাপটপটা খারাপ হয়ে গেছে, কেউ নাকি ওটা খুলতে পারেনি কিন্তু এই লেখাটা আমি কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে পেয়েছি। মনে হল পরিবারের কাছেই ওটা থাকা উচিত।”

“আচ্ছা আপনারা কি আগে থেকে যোগাযোগ করেছিলেন? মানে আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতে তো প্রায়ই পুরনো পরিচিতদের মধ্যে—”

“নাঃ, পুরো ব্যাপারটাই অ্যাবসার্ড, সত্যি কথা বলতে কী, ওর কথা আমি প্রায় ভুলেই গছিলাম। এই যে আমাদের ছেলেদের মধ্যে ব্যাপারটা, এটা তো যাকে বলে হাইট অফ সেরিভিপিটি, বিশ্বাস করাই শক্ত। আচ্ছা, আমি আসছি তা হলে, নমস্কার।”

বাস, অতিথি যেমন এসেছিল তেমনই ঝড়ের মতো উধাও। শরীরী প্যাকেটটা হাতে করে, চলে যাওয়া গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টের পেল যে, সত্যিই এই অ্যাবসার্ড ঘটনাস্রোত ওকে বাস্তব-অবাস্তবের কিনারায় এনে ফেলেছে। রাজর্ষির ল্যাপটপটা মৃত অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল এবং ওর লেখা কোনও সুইসাইড নোট বা জার্নালের কথা কেউ ঘুণাক্ষরেও জানে না। তা হলে সুমনা জানলেন কী করে? কলকাতা পুলিশ এত লোক থাকতে বেছে-বেছে ওঁকেই সে লেখা দিল কেন? শরীরী যে-লোকটাকে নিশ্চিন্তভাবে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করত, সে তার অসুখ লুকিয়ে, পরিবারকে চরম উদ্বেগের এলাকায় ফেলে রেখে, স্বেচ্ছামৃত্যুর সন্ধানে ছুটে গিয়েছিল পৃথিবীর অন্যদিকে এই বিশেষ মহিলাটির সন্ধানে! এখন জানা যাচ্ছে যে, ইতিমধ্যে তাঁরই একমাত্র ছেলে মণীশের সঙ্গে রুণুর এতটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যা নিয়ে রুণুর বাবার প্রবল আপত্তি ছিল। এত সব কিছু নাকি কাকতালীয় অথচ তিনি সেরিভিপিটি কথাটা ব্যবহার করলেন, যার ঠিক বাংলা নেই, বলা যেতে পারে শুভ যোগাযোগ।

“মা, কে এসেছিল?” ওপর থেকে দিরা'র গলা শুনে চটকা ভাঙল শরীরীর। তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে, দ্রুত পায়ে নিজের ঘরের দিকে ফিরল ও।

“কিছু না রে, একটা অনলাইন ডেলিভারি হল। দাঁড়া, চট করে তৈরি হয়ে নিই।”

ডিনারের ব্যবস্থা করেছে রুণু ওর ক্লাবের একটা প্রাইভেট ঘরে। ঘরটা রাজর্ষি আর ওর পরিবারের নানা স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে সাজানো হয়েছে, ঠিক যেন একটা মিউজিয়মের ঘর। মাঝখানে খাবার টেবিল তার একদিকে দেওয়াল জোড়া এক টেলিভিশনের পর্দা বেয়ে ছবির স্রোত বয়ে চলেছে। ঠিক এইরকমটাই হয়েছিল রাজর্ষির ষাট বছরের জন্মদিনে, কিন্তু সেগুলো ছিল জীবন্ত মানুষের ছবি। মৃত মানুষের জন্য আরও এলাহি ব্যবস্থা, যার সবটাই করেছে ছেলেমেয়েরা মিলে। প্রথমে পুরনো অ্যালবাম ঘেঁটে জোগাড় করা ওর জন্ম থেকে কিশোরবেলা'র সাদাকালো সব ফোটোগ্রাফ, সেগুলোকে ডিজিটালি সাফসুতরো করে প্রায় নতুন করে তোলা হয়েছে যেন। তারপর এসেছে কলেজের বন্ধুরা, বিয়ে থেকে হানিমুন, গ্রাজুয়েশন, অ্যাওয়ার্ড, ভেকেশন, দুর্গাপূজো, ক্রিসমাস, বাচ্চাদের কাণ্ডকারখানা এবং অবশেষে সেই ষাট বছরের জন্মদিনে তোলা পরিচিত সবার সঙ্গে সেলফি। এইখানে এসে হারিয়ে গেছে সময়, ছবিরা এবার ইচ্ছেমতো যে-যার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। একদা বাস্তব মুহূর্তগুলো এখন নৃত্যশীল, যে-যার নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া সাবানের বুদবুদ। ঘরটা এমন সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে যে, বেশ খানিকক্ষণ কারও মুখে

বাক্য সরল না। তারপর প্রায় একসঙ্গে প্রশংসায় মুখর হলেন সকলে।

দুই সুদর্শন যুবক, রুণু আর মণি, এই অনুষ্ঠানের জয়েন্ট হোস্ট। এক বলক তাকালেই বোঝা যায় যে, আকর্ষণের এক নীরব সিফনি ওদের চারদিকে বাজছে, ওরা পা ফেলছে তারই ছন্দে। এ-সঙ্গীত হয়তো চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু যতক্ষণ তা বাজে, চারপাশটা যেন উজ্জ্বল হয়ে থাকে এক ম্যাজিক আলোয়। সামনেই বসে আছে মন্দিরা আর সৃজন, ওদের মুখের ওপরেও যেন সেই একই আলোর আলপনা। শর্বরী এ সবটাই পরিষ্কার দেখতে পেল, অদ্ভুত একটা মিশ্র অনুভূতি খেলে গেল ওর মনের ভিতরে। রাজর্ষির উধাও হওয়া, বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো ওর মৃত্যুসংবাদ, কলকাতায় সেই ভয়াবহ কয়েকটা দিন, নিঃসীম বিপন্নতা নিয়ে ফিরে এদেশে ফিরে আসা, এই সবকিছুর মধ্যে ছায়ার মতো ওদের পাশে-পাশে থেকেছে সৃজন। নির্ভরতা হয়তো ভালবাসারই আর-একটা রূপ, অন্তত দিয়ার মনের পরিবর্তন দেখতে দেখতে তো তাই-ই মনে হয়। এই সময়টা কিছুটা প্রায় অবোধ্য কারণে দূরে-দূরে থেকেছে অস্ত, রথীন আর পরমার সঙ্গে কথাবার্তাও ঠিক যেন সেই পুরনো সুরে বাজেনি। আজ ওরা বসে আছে টেবিলের অন্যদিকে, অস্তর পাশে বসে অল্পবয়সি একটি মেয়ে, শর্বরী শুধু জানে যে, ওর নাম রিহানা, মধ্যপ্রাচ্যের মেয়ে কিন্তু আদ্যন্ত আধুনিক। কালো গাউনের সঙ্গে খোঁপায় জড়ানো কালো স্কার্ফে, সংযত মেকআপ আর মার্জিত ব্যবহারের জন্য ও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পরিবারের সবার প্রিয় হয়ে উঠেছে। ওই তো রমিতা, খুব উৎসাহের সঙ্গে ওর সঙ্গে কথা বলছে এখন, একটু আগেই ওকে দেখা গিয়েছিল রুণু আর মণিকে কী নিয়ে যেন কনগ্রাচুলেট করছে, জড়িয়ে ধরছে দিরা আর সৃজনকে। শর্বরী অবাক হয়ে ভাবল, এই এক বছরের মধ্যে অনেকগুলো পুরনো সমস্যার ভার কেমন যেন নিজে থেকেই হালকা হয়ে গিয়েছে, আগের চেয়ে সহজ হয়ে গিয়েছে সবকিছু। সেরিভিপিটি?

“আপনাকে এরকম দুম করে উতাজ করার জন্য আবার মাপ চাইছি, কিন্তু লেখাটা আপনি খুব ভাল করে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখবেন। আপনার সব প্রশ্নের উত্তর ওখানেই পেয়ে যাবেন, এই আমার বিশ্বাস। একটা কাজের জন্য আমাকে কালকেই ফিরে যেতে হচ্ছে, কিন্তু আপনি আমাকে যখন ইচ্ছে ফোন বা ইমেল করতে পারেন,” খুব আন্তে আর গুঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে কথাগুলো বলছেন সুমনা। তিনি বসে আছেন পাশের চেয়ারেই। শর্বরী আরও একবার খুব চমকে উঠল কথাগুলো শুনে। এই রহস্যময়ী মহিলাটি এত তাড়াতাড়ি তল্লাট থেকে উধাও হচ্ছেন কেন? অবশ্যই তিনি চান না যে, মুখোমুখি সংঘাত হোক বা এই নিয়ে পরিবারের নতুন করে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হোক একটা। সময় এবং দূরত্ব অনেক সমস্যার সমাধান আপনা থেকেই করে দেয়।

দিনার শুরু হল, মাইক্রোফোন নিয়ে একের পর এক বক্তা কথা বলছেন। আত্মহত্যার সঙ্গে জড়ানো সামাজিক ট্যাবুর একটা পাথর, যা নাকি সবার মনের উপর চেপে বসেছিল, সেগুলো যেন হালকা হয়ে উঠতে থাকল একটু একটু করে। শর্বরী আর সুমনা যে কিছু বলবেন না, আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাকিরা প্রায় সবাই কিছু না কিছু বললেন, শেষ পর্যন্ত বেশ একটা আড্ডার মেজাজে চলে এলেন সবাই। ঠিক তখনই মণি আর রুণু পাশাপাশি একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

“লেভিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, মে আই হ্যাভ ইয়ার অ্যাটেনশন প্লিজ,” চামচ আর গ্লাসের টুংটাং শব্দ তুলে বলে উঠেছে রুণু। সকলে সজাগ হল। রুণু বেশ আনুষ্ঠানিক, সাধু ইংরেজিতে শুরু করল—

“আজকে এক বছর হয়ে গেল আমাদের এক অতি প্রিয়জন স্বেচ্ছায় আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। পরিসংখ্যান বলে, এই সিদ্ধান্তটি নানিলেও, শুধু অসুস্থতার কারণেই তিনি আজকে আমাদের মধ্যে থাকতেন না। শুধু এই স্মরণসভাটি আরও কয়েক মাস বাদে হতে পারত। আমরা শোকগ্রস্ত এবং আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন আছে, কিন্তু সিদ্ধান্তটি শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী বলেই তার সমালোচনা করা আমাদের উচিত নয়। আজকের দিনটি তাই শোকসভা নয়, এর বিষয় হল প্রয়াত রাজর্ষি সান্যালের ব্যতিক্রমী জীবনচর্চা। অনুষ্ঠানের এই অংশটি আমরা শুরু করতে চলেছি

একটি সামান্য ঘোষণা দিয়ে যা কিনা অনেক দিন আগেই করা উচিত ছিল। বিলম্ব এবং দ্বিধার কারণ সেই একই, অর্থাৎ বিষয়টি ব্যতিক্রমী এবং সে-জন্য সমাজের একটি বড় অংশের কাছে ব্রাত্য। আমার বিশ্বাস যে, ঘোষণাটির জন্য আজকের দিন সবচেয়ে মূল্যবান কেন না আজকের সন্ধ্যার অদৃশ্য নায়ক আমাদের সেই অনুপস্থিত প্রিয়জন, ঠিক সেই মতোই নির্দেশ দিয়ে গেছেন।”

টেলিভিশনের বিরাট পর্দায় ছবির মিছিল বন্ধ হয়ে গেল। তার বদলে ফুটে উঠল পরিচিত এক মানুষের মুখ। সুমনা ছাড়া বাকি সবাই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন, কেননা ছবিটা সত্যি সত্যিই ভূতের। রাজর্ষি সান্যাল একটা কাউচে বসে আছে, বোঝাই যায় জায়গাটা কোনও দামী হোটেলের ঘর। খুব শান্ত অথচ পরিষ্কার গলায় ও কথা বলতে শুরু করল। অতিথিরা ঘরের মধ্যে কেউ শ্বাস ফেলছে বলে মনে হয় না এখন।

“রুণু, আমি জানি তুমি আমার ওপর খুব রেগে আছিস। এখন তাই ব্যবস্থা করছি যেন কিছুদিন বাদে এই রেকর্ডিং তোর কাছে পৌঁছোয়। আমার ইগো, অজ্ঞতা আর কুসংস্কার তোদের সবাইকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু আজ আমি সকলের কাছে খোলা মনে ক্ষমা চাইতে পারি। কেননা আমি খুব ভেবেচিন্তে ঠান্ডা মাথায় এই পৃথিবীর পাছশালা থেকে বিদায় নিচ্ছি। বেশ কিছুদিন ধরেই বেঁচে থাকাটা আমার কাছে অকারণ এবং বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল। চলে যাবার ইচ্ছেটা অনেক দিনের, কিন্তু কিছু কিছু নৈতিক প্রশ্ন আমাকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল বলে সেটা এ যাবৎ হয়ে ওঠেনি। ক্যানসার সত্যিকারের বন্ধুর মতো সেই সুযোগ এনে দিল। আমি জানলাম যে, আমাকে যেতেই হবে এবং অল্প দিনের মধ্যেই, তোদের কাছে আমার প্রয়োজনীয়তা যদি কিছু থেকে থাকে, তা থেকে তোরা বঞ্চিত হবি, এটাই ভবিষ্যৎ। তাই ডায়াগনোসিসটা জানতে পারার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনের মধ্যে জমে থাকা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, অপরাধবোধ ইত্যাদি যাবতীয় জঞ্জাল যেন এক ঝড়ের ঝাপটায় উড়ে গেল, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

তোর আর মণির মধ্যে যে-সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার প্রতি আমার অকুণ্ঠ সমর্থন রইল। মণির মা সুমনা শুধু একজন সফল আইনজীবী নন, তিনি আদ্যন্ত আধুনিক এবং প্রগতিশীল একজন মানুষ। গুঁর সঙ্গে আমার আত্মার যোগাযোগ আছে, তুমি চাইলেই তার হৃদয় পেতে পারিস। গুড বাই মাই সন উইথ অল মাই রেসিংস ফর ইউ টু।”

বার্তা শেষ হল, পর্দা জুড়ে শুধু একটাই ছবি এখন— রাজর্ষির হাসিমুখের ছবি।

“আমি আর মণি, আমরা শুধু বন্ধু নই, অনেকদিন ধরেই পরস্পরের প্রেমিক। ক্যালিফোর্নিয়ার আইন অনুযায়ী আমরা পরস্পরকে আত্মীয় ভালবাসার শপথ নিয়েছি। কাল সকাল থেকে আমরা সকলের আত্মীয় হয়ে নিয়ে প্রকাশ্যে আমাদের বিবাহিত জীবন শুরু করব। আনুষ্ঠানিক বিয়ে যদি সকলের কাঙ্ক্ষিত হয়, তবে কোথায় কীভাবে হবে, তা আমাদের বন্ধুরা এবং পরিবারের সবাই মিলে ঠিক করবেন।”

পকেট থেকে হিরের আংটিটা বের করে মণির আঙুলে পরিয়ে দিল রুণু, এক টুকরো আলো ছিটকে পড়ল শর্বরীর চোখের ওপর। ঠিক সেই মুহুর্তে সারা ঘর ফেটে পড়ল উজ্জ্বল অভিনন্দনে। সবার ওপরে শোনা গেল দিয়ার গলায়।

“সত্যি বাবা, আলমারি থেকে বেরোতে এতদিন লেগে গেল তোদের! ওয়েডিং প্ল্যান আমি করব, এই বলে রাখলাম কিন্তু। কনগ্রাচুলেশন্স ইউ টু, নাই গো অ্যাহেড অ্যান্ড কিস!”

“সরি দিদি, এটা আমাদের এনগেজমেন্ট পার্টি নয়, শুধুমাত্র বাবার স্মরণসভা। দেখতেই তো পেলি, আমি যেটুকু করেছি বাবার ইচ্ছেতেই করেছি তাই আজকের মতো এখানেই আমাদের থামতে হচ্ছে। আজকের অনুষ্ঠানের পরবর্তী বক্তা বাবার বন্ধু, আমাদের সবার প্রিয় রথীনকাকু।”

পরস্পরের হাত ধরে ওরা পায়ে পায়ে পোডিয়াম থেকে নেমে এল। দিরা এসে জড়িয়ে ধরল দু'জনকেই। কলরব একটুখানি ঠান্ডা হলে কথা বলতে শুরু করল রথীন—

“বন্ধুরা এবং ছেলেমেয়েরা, আমি একজন সাধারণ মানুষ, বক্তা অথবা চিন্তাবিদ নই। ওটা আমার বন্ধু রাজর্ষির এলাকা ছিল, কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে আমায় কিছু না-কিছু বলতেই হচ্ছে। আমি আর পরমা শুধু এইটুকুই বলতে চাই, বাইরে থেকে ছিটগল্প এবং উশৃঙ্খল আমাদের এই বন্ধুটির ভিতরমহলে কিছু কিছু অসামান্য গুণ ছিল যাদের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি, যারা আমাদের সামাজিক পরিমণ্ডলের মাঝখানে ব্রাত্য হয়ে থেকেছে চিরদিন। মানুষটির সমগ্র সত্তায় জড়িয়ে ছিল এক অখণ্ড অবুঝ প্রণয়বাসনা, যার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, অতীত ভবিষ্যৎ কিছু নেই। ভালবাসার এবং ভালবাসা পাওয়ার এই অস্বাভাবিক খিদের ওরই ভাষায় অনেকটা ভ্যাম্পায়ারের রক্ততৃষ্ণার মতো, তার উপর ওর নিজের খুব একটা নিয়ন্ত্রণ নেই। সেইজন্য ভুল করা এবং সেই ভুলের জন্য অন্যকে কষ্ট দেওয়া, তারপর কষ্ট দেবার জন্য অনুশোচনায় জ্বলতে থাকা ছিল ওর নিয়তি। এই রক্তাক্ত ত্রিভুজ বৃকের মধ্যে বয়ে চলত মানুষটা। এই ক্ষত সঙ্গ করেই ও দেশ ছেড়েছে, সফলতার সিঁড়ি বেয়ে অতখানি দূর উঠেছে, বিয়ে-সংসার করেছে, বিরাট সম্পত্তি বানিয়েছে, ছেলেমেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছে, অজস্র মানুষের উপকার করেছে, কিন্তু শান্তি জিনিসটাকে ছুঁতে পারেনি কখনও। এক বছর আগে এই দিনটায় অবশেষে সেই শান্তির অক্ষয় অধিকার যে ও অর্জন করেছে, বন্ধু হিসেবে তার জন্য আমরা সুখী ও গর্বিত।

রথীন চূপ করল, পরমাকে দেখা গেল ন্যাপকিন দিয়ে চশমা মোছার ভান করে চোখ মুছে। পর্দার লোকটা কথা বলে উঠল আবার—

“রথী আমি জানি যে, তুই আমায় ভুল বুঝি না কেননা অ্যাডিন যতরকম কেলোর কীর্তি করেছি আর কেউ হলে কবেই কেটে পড়ত! সে-জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মেসেজটা তোর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। তোর ওপরে একটা কাজ দিয়ে গোলাম— তুই দিরা আর সৃজনের ব্যাপারটা একটু দেখিস। আমি জানি দিরা সৃজনকে এখনও ভালবাসে, যদিও ওর ব্যবহার উল্টোরকম। ভাল না-বাসলে এতখানি উৎকট রাগ হতে পারে না, তার জায়গায় শীতলতা আসে। রাগ আসলে অনুরাগের উল্টোপাঠ, কখন যে ছবিটা উল্টে যায়, তার ঠিক নেই। তার তুলনায় শীতলতার কবল থেকে সরে আসা অনেক সহজ। সৃজনকে বল ওকে আরও খানিকটা সময় দিতে। আর কিছু না, শুধু সময়। ভালবাসা যদি একটা গল্প হয়, সময় হচ্ছে তার অক্ষরমালা। কেউ ছোটগল্প পড়তে ভালবাসে এমনকি অগুণগ্ন, কারও পছন্দ উপন্যাস। যদি ধরে নিই যে, সাহিত্যিক মূল্য সমান-সমান তবুও যে উপন্যাস ভালবাসে, সে অগুণগ্ন পড়ে খুশি হতে পারবে না। দিয়ার মন ফেরাতে হলে অন্তত কিছুদিনের জন্য সৃজনের কাজের নেশা কমাতে হবে। বাইরের পৃথিবীকে বেশি ভালবাসলে, ভেতরের পৃথিবীটা অনেক সময় অনাহারে শীর্ণ হয়ে যায়, তথাকথিত ওয়াকোহলিক আর পিপলস পার্সনার প্রায়ই এটা ধরতে পারে না। এনিওয়ে বাড়ি, থ্যাঙ্ক ইউ অ্যান্ড টেক কেয়ার।”

ছবি আবার ছবি হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা চাপা কান্নার শব্দ শোনা গেল। দিরা দুই হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে। সৃজন এসে হাত রাখল দিয়ার কাঁধে। হাতটা টেনে নিজের বৃকের মধ্যে চেপে ধরল দিরা, কয়েক মিনিটের জন্য থেমে রইল সব অনুষ্ঠান।

শব্দরীচ চোখেও জল কিন্তু সেটা দুঃখের না অভিমানের বলা শক্ত। লোকটা সবার কথা ভেবেছে, শুধু নিজের বউকে বাদ দিয়ে। মানুষ ক্যানসারে মারা যেতেই পারে কিন্তু তার মধ্যে যে কোনও নাটক নেই, সুতরাং রাজর্ষিকে অন্যরকম কিছু একটা করতেই হবে। সারাজীবন এই অসামাজিক খামখেয়ালিপনা আর রোম্যান্টিসিজমের দোহাই দিয়ে যা খুশি তাই করে গেছে লোকটা, এখন মরার পরেও নিস্তার নেই।

“আমরা অনুষ্ঠান শেষ করতে চলছি। বাবার রেখে যাওয়া শেষ ভিডিওটা এবারে আমরা দেখব।”

ছবিটা অন্যরকম, এইবার রাজর্ষি বিছানায় আধশোয়া, ওর মুখে যন্ত্রণার ছাপ।

“শেষ বার্তাটি আমার স্ত্রী শব্দরীর জন্য। পৃথিবীর এই একমাত্র একজনের কাছে আমার ক্ষমা চাইবার ও ভজিয়ার নেই। শব্দরী, তুমি শুধু

এইটুকু জেনো, যে-উজ্জ্বল আশাবাদী তরুণটিকে তুমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলে, সে বছরদিন আগেই অন্ধা পেয়েছে। যে-অসামাজিক নাসিসিস্ট লোকটা তার চামড়ার মধ্যে বাস করে তাকে ভালবাসা দূরে থাক, সহ্য করার মধ্যেও ছিটেফোঁটা যুক্তি নেই। তাও শেষদিন পর্যন্ত তুমি আমায় ভালবেসে গেছ, ক্ষমা করেছ, রক্ষা করেছ, আশ্রয় দিয়েছ তার একমাত্র কারণ বোধহয় তোমার বিশ্বাস। সমাজ, সভ্যতা আর পরিবারের এই যে ত্রিনয়নী প্রতিষ্ঠান, যা নাকি আমার কাছে একটা মতলববাজ মিথ্যে গল্প ছাড়া কিছু নয়, তারই প্রতি তোমার পরম বিশ্বস্ততা, আর বন্ধুত্ব নামক আইডিয়াটির প্রতি তোমার অমোঘ আকর্ষণ। একমাত্র এই বন্ধুত্বের এলাকাটিই হয়তো দিনের শেষে আমাদের মধ্যে একমাত্র সংযোগ হয়ে টিকে ছিল। আই উইল মিস ইউ অ্যান্ড আই নো ইউ উইল টু। গুডবাই মাই লাভ, প্লিজ অ্যালাও মি টু বাও আউট উইথ সাম ডিগনিটি।”

শব্দরী বুঝতে পারল, ওর দুই গালের উপর দিয়ে নদীরা নিঃশব্দে বয়ে চলেছে, কিন্তু পেটের ভিতরে এখনও গুলিয়ে উঠছে রাগ— পাজি, পাজি, পাজি লোকটা! খালি নিজের কথাই ভেবে গেল সারা জীবন। অত মদ না-খেলে খোড়াই ক্যানসার হত!

অবশেষে সভাভঙ্গ। ফেরার পথে কারও মুখেই কোনও কথা নেই। এখন অনেক রাত, হাইওয়ায়েতে গাড়ির সংখ্যা কমে এসেছে। সারি সারি বিরাট উঁচু ল্যাম্পপোস্টগুলোর উপরে এক কোণায় ঝুলে রয়েছে পঞ্চদশীর চাঁদ, আকাশের জ্যোৎস্না আর শহরের ঘোলাটে আলোর আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়েছে ছায়াপথ।

তারা, কোন অপরাধে

“তা হলে সুমনাদি, তোমার মিশন তাহলে সাকসেসফুল বোলা,” কফির কাপটা নামিয়ে রেখে অনন্যা ওর সেই রহস্যময় হাসিটা হাসল। সুমনা আমেরিকা থেকে ফেরার পরে ও একদিন একটু আড্ডা মারার জন্য দেখা করতে চেয়েছে, দু’জনেরই ফেভারিট এক কফিশপে। এখানে বসে এক সময় অনেক জটিল কেস নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেছে ওদের।

“মিশন আবার কী? একজন বন্ধুর মৃত্যুদিবস আর একটা ডিসফাংশনাল ফ্যামিলির রিহাবিলিটেশন, এই তো বটে কাজ, ওরকম আমি আগেও অনেক করেছি,” সুমনা অনমনস্কভাবে বললেন। গলাটা যেন একটু কঁপে গেল, সুমনা নিজের নার্ভাসনেস দেখে নিজেরই ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কফির কাপটা নামিয়ে রাখার সময় ঠক করে শব্দ হল একটা।

“কী ব্যাপার সুমনাদি, জেটল্যাগে আছ নাকি? চলা, আর-এক কাপ কফি খাও,” অনন্যা এখনও সেই হাসিটা হাসছে। সুমনার মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল।

“তোমার ছেলের সেম-সেক্স ম্যারেজ হয়েছে, যদিও ওর পার্টনারটি ভারি হ্যান্ডসাম, দেখে আমারই হিংসা হচ্ছিল। এই নিয়ে মনে কোনওরকম অশান্তি নেই তো তোমার?”

“কাম অন, গিভ মে আ ব্রেক অনন্যা। আই অ্যাম সো গ্ল্যাড ফর দেম। তুই কী করে ভাবলি, আমার এতটাই ভীমরতি হয়েছে যে, এই যুগে বসে আমি—” অনন্যার হাসিতে বাকিটা চাপা পড়ে গেল। সুমনার মুখটা রাগে লাল হয়ে গেছে এখন, কিন্তু এতটা রাগ করার সত্যিই কোনও কারণ নেই।

“আরে আরে রাগ করো কেন। আচ্ছা বোলা, এই যে তোমার প্রাক্তন বন্ধু রাজর্ষিবাবু, তিনিও তো উচ্চশিক্ষিত তার উপরে আমেরিকান, তাই বলে হোমোফোবিক হতে তো ওঁর অসুবিধা হয়নি।”

“তার অন্য কারণ আছে। ইমিগ্র্যান্ট ভারতীয় সমাজ একই সঙ্গে রেসিস্ট, সেক্সিস্ট, ক্লাসিস্ট, প্রুড তো বটেই। সামাজিক সুনাম আর স্ট্যাটাস তাদের কাছে ভীষণ জরুরি। ছেলেমেয়েরা সাদা লোককে বিয়ে করলে সকলকে ডেকে দেখাবে কিন্তু কালোকে বিয়ে করলেই অস্বস্তি, মুসলমান হলে তো লক্ষ্যাকাণ্ড! সবাই নয়, এক্সসেপশন অবশ্যই আছে কিন্তু মেজরিটি এইরকম। সেখানে রাজার এই উৎকট মনোভাবের একটা মানে করা যায়। কিন্তু ও যে নিজের ভুল স্বীকার করেছে, ওদের বিয়েতে

আশীর্বাদ করেছে, এটাই কি বড় কথা নয়?”

“কেবলমাত্র মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে। সেদিক দিয়ে দেখলে মৃত্যুটা সুবিধাজনক বলো,” অনন্যা উদাস গলায় বলল। তারপর পাক্সা এক মিনিট দু’জনেই কফির কাপের দিকে তাকিয়ে চুপ, যেন কাপটাই দুনিয়ার পয়লা নম্বর দ্রষ্টব্য বস্তু। তারপরে প্রায় শব্দ করেই হেসে উঠলেন সুমনা।

“তুই সব জানিস তাই তো? সাবাস ডিটেকটিভ!”

“জানি! কী জানি? এটা একটা আত্মহত্যার কেস, ওরকম আমি আগেও অনেক দেখেছি,” অনন্যা বেশ অবাক গলায় বলল।

“ভারতীয় আইনে আত্মহত্যায় সাহায্য করা কিংবা প্ররোচনা দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তোর উচিত ছিল কম্পিউটার ফরেনসিকের রিপোর্টটা পেয়েই আমাকে গ্রেফতার করা,” সুমনার গলা অসম্ভব শান্ত এখন, বৃকের ভিতর থেকে একটা ভার নেমে গিয়েছে, তার বদলে একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করছেন। গ্রেফতার হলে নিজেই নিজেকে ডিফেন্ড করবেন সুমনা। ওঁর সহযোগীরা কেউ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে আবার— রাইট টু ডাই উইথ ডিগনিটি।

“কী ব্যাপার বলো তো সুমনাদি, তুমি তো সকালবেলায় নেশা করতে না কোনওদিন। কী সব ভুলভাল বকছে,” অনন্যা এখনও বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সুমনার দিকে তাকিয়ে আছে।

“ও, তুই কনফেশন চাস? তা হলে শোন, সেই রাতে রাজা আমার পিছু পিছু এসেছিল। আমি বলেই দিয়েছিলাম যে, পুরো ব্যাপারটা থেকে যেন আমাকে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু আস্তে-আস্তে একটা অদ্ভুত সহানুভূতির মেঘ এসে ভিজিয়ে দিল আমাদের। রাজা নিজের ভুল স্বীকার করল, শুধু এই ব্যাপারে নয়, আরও অনেক ব্যাপারে। এই অদ্ভুত কনফেশন যখন শেষ হল, তখন আমার মন পুরোপুরি বদলে গেছে। ওকে জড়িয়ে ধরে অনেকটা কাঁদলাম। তারপর দু’জনে বসে গোলাম গ্ল্যান করতে। ঠিক হল, আমরা কয়েকটা ভিডিও মেসেজ বানাব। সেগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের কাছে পাঠানো হবে। রাজা প্রাণপণে ভুল শুধরানোর চেষ্টা করে যেতে চায়, যদিও ও জানে যে, সবই ভবিতব্য, আল্টিমেটলি ওর হাতের বাইরে কিন্তু ও নিজের মৃত্যু দিয়ে একটা ইমপ্যাক্ট সৃষ্টি করতে চায়। ঘটনাখানেকের মধ্যে কাজটা মিটে গেল। তারপর আমরা বসলাম ফার্মাকোলজি নিয়ে।

রাজার কাছে যথেষ্ট নারকোটিক জাতীয় ওষুধ ছিল কিন্তু ঘুমের ওষুধ খুব বেশি ছিল না। আমেরিকায় প্রেসক্রিপশনের ওপর কড়া নজরদারি আছে। ক্যানসার পেশেন্টদের নারকোটিক যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হয় কিন্তু ঘুমের ওষুধ দিনে একটি করেই, তাও একসঙ্গে মাত্র দু’সপ্তাহের বেশি নয়। ভারতে ওষুধ জোগাড় করা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ।

পরের দিন সকালে আমি গ্লেন ধরে কলকাতায় ফিরে এলাম। টিকিট আগে থেকেই কাটা ছিল। আমার ক্লায়েন্ট তার সময়মতো আমেরিকায় ফিরে যাবে সেরকমই কথা। তার পরের ঘটনা তুই জানিস।”

“শুধু দুটো প্রশ্ন আছে। ওর জার্নালটা তুমি আগে পড়িনি কেন? ও কি তোমায় দেখায়নি? আর ওভারডোজ নেওয়ার আগে ও তোমাকে ফোন করেছিল কেন? আর করেছিলই যদি তুমি ফোনটা ধরলে না কেন?”— অনন্যার আরোপিত অবাক-হওয়াটা কেটে গেছে, তার বদলে একটা চাপা কৌতূহল।

“খুব ভাল প্রশ্ন করেছিস। আসলে ফাইলটা এত লম্বা ছিল যে, ইমেলে পাঠানো সম্ভব হয়নি, ওখানে কোনও প্রিন্টারও ছিল না। ও বলেছিল, সকালবেলায় একটা পেনড্রাইভ কিনে আমাকে কুরিয়ার করে দেবে। কিন্তু কী হল, কেন ও করল না, সেটা পুরোপুরি রহস্য। আন্দাজ করতে পারি, আমার প্রতি ওর যে সেক্সুয়াল ফিলিংস ছিল সেটা ও আমায় জানতে দিতে

চায়নি,” সুমনা অন্যমনস্কভাবে বললেন।

“পেনড্রাইভটা আমরা উদ্ধার করেছিলাম। ল্যাপটপটা ও নষ্ট করে দিয়েছিল, তার সঙ্গে ওয়েবে জমানো সব ডেটা আর মিডিয়া। কিন্তু আজকের যুগে ওটা প্রায় অসম্ভব কাজ। কিন্তু ফোনটা কেন করল?”

“সুইসাইডের ঠিক আগে একটা অদ্ভুত বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায় মানুষ। তখন প্রায় নিজের অজান্তেই সে সাহায্য চায়, চরম সিদ্ধান্তটি থেকে উদ্ধার পেতে চায়। কোনওরকম যুক্তি তর্ক সেই সময়টায় কাজ করে না। তাই বোধহয়—”

“ঠিক বলেছ। তা হলে তুমি এটাও জানো যে, সেই সময় বাধা পড়লে, জীবন্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই সে চরম সিদ্ধান্তটি থেকে সরে আসে। কোটি বছরের ইভলিউশন তার ভেতরে আত্মরক্ষার যে-প্রতিবর্তক্রিয়াটি পয়দা করেছে, তার ধাক্কাতেই সে জীবিত মানুষদের দুনিয়ায় ফিরে আসতে চায়— টু বি অর নট টু বি। তাই না?” অনন্যা সোজা সুমনার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে এখন।

“দাস কনশন্স ডাঙ্ক মেক কাওয়ার্ডস অফ আস অল। ঠিকই বলেছিস তুই,” সুমনার মুখের ওপর দিয়ে আলগা একটা ছায়া খেলে গেল, অপরাধবোধের ছায়া।

“তা হলে তোমার ওই ফোনটা না-ধরার দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, ইউথানেশিয়ার ব্যাপারে তোমার বিশ্বাস আর অ্যাক্টিভিজম এবং দুই নিজের ছেলের জন্য তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থ। কোনটা সুমনাদি?”

“জেনে কী দরকার, তুই আমাকে অ্যারেস্ট কর, কোর্টেই কথাবার্তা হবে,” সুমনা হাসলেন। ওদিকে অনন্যা মোবাইলের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে উঠে পড়েছে হঠাৎ, যেন কী একটা কাজের কথা ভুলে গিয়েছিল এতক্ষণ।

“আরে বাপ রে, এগারোটা বেজে গেল, এখনই ডিজির সঙ্গে মিটিং। ইস, আমি ডেকেছি, কফির দামটা আমারই তো দেওয়ার কথা। যাকগে, তুমি দিয়ে দিয়ে। ভাল থেকে সুমনাদি, আবার দেখা হবে, তবে কোর্টে নয়।”

ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল অনন্যা। যাবার আগে সুমনার হাতে একটা চাপ দিয়ে গেল যার অর্থ পরিষ্কার— অপরাধ ও শাস্তি নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই কিন্তু সত্যের চেহারাটা ও বুঝতে চায়। সেটা বোঝা হয়ে গিয়েছে। সুতরাং, কেস ক্লোজড।

কফিশপ থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে রওনা হলেন সুমনা। ডিসেম্বর মাস, কিন্তু ঠান্ডার ছিটেফোঁটাও নেই কলকাতায়। পাউশের পার্কটায় কিছু একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেখান থেকে আচমকই এক টুকরো গান ভেসে এল—

তারা, কোন অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,

সংসার-গারদে থাকি বল?

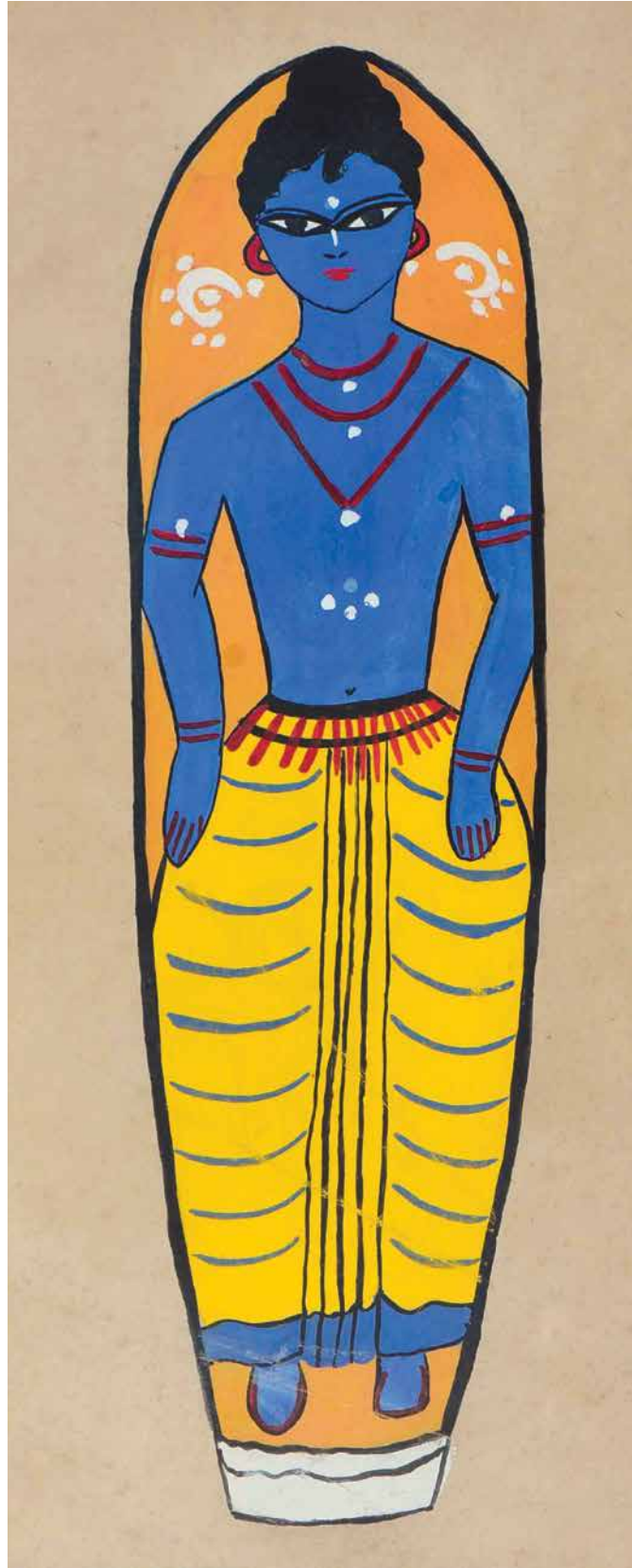
পশিল ছয় ভূত, তশীল করে কত,

দারা-সুত পায়ের শৃঙ্খল॥

সুমনা দাঁড়িয়ে গেলেন। পুরো গানটা শুনে যেতে হবে। এ-পৃথিবীতে নতুন বলে কিছু নেই। শুধু মানুষের লড়াই করার উপায়গুলো বদলে গিয়েছে। যতক্ষণ লড়াই করতে পারে, ততক্ষণই তার বেঁচে থাকা।

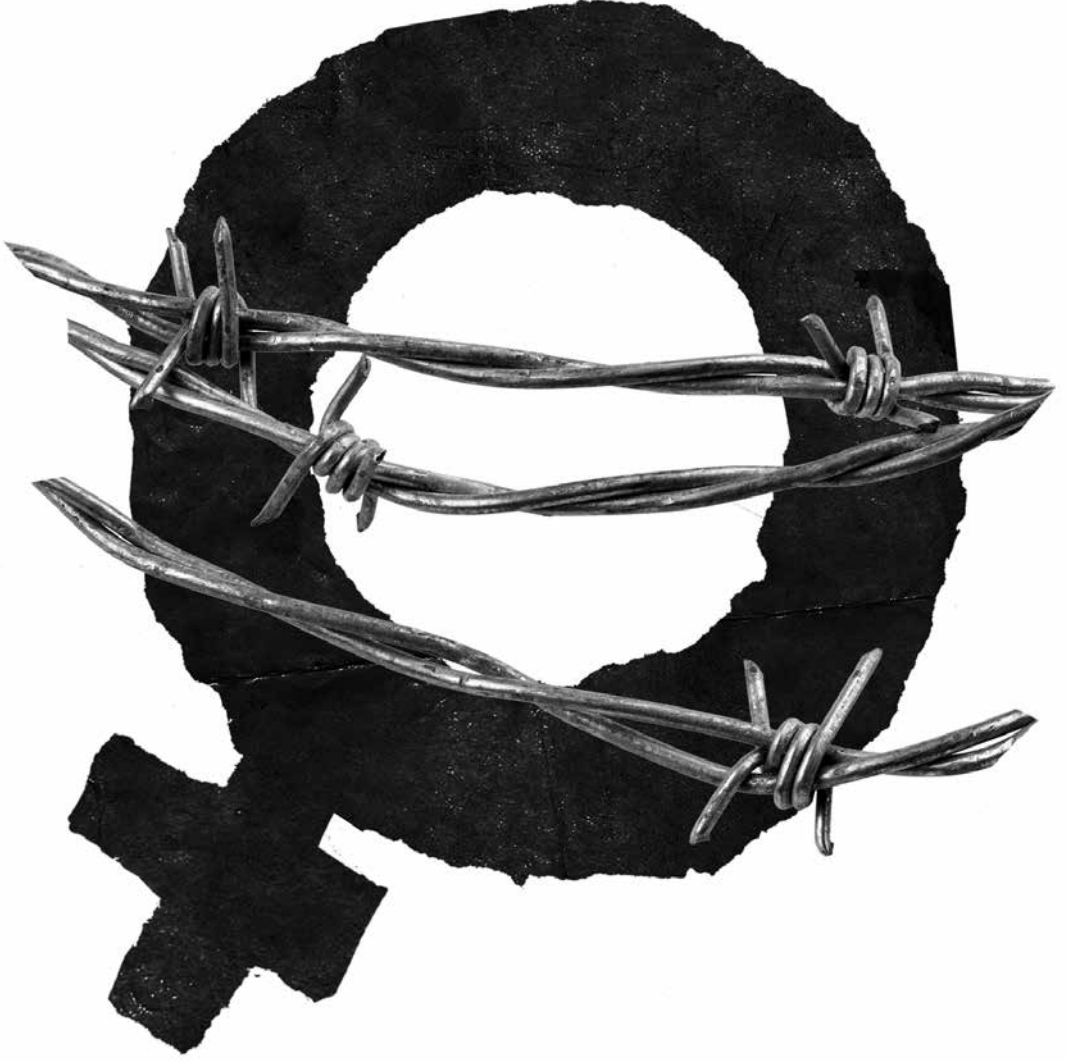
অঙ্কন: রৌদ্র মিত্র





শিল্পী: সুচিত্রা মিত্র

সৌজন্য: সুবীর মিত্র



স্বাধীনতা, দেশভাগ ও বঙ্গনারী

নিখিল সুর

আমৃত কি কখনও গরল হয়ে উঠতে পারে? সেই অসম্ভাব্যতাও মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় আট দশক আগে, যখন বঙ্গ ও পঞ্জাববাসী একই সঙ্গে পেল বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার অমৃতস্বাদ ও দেশভাগের অভিশাপ।

বিয়াল্লিশে ‘ভারত-ছাড়া’ আন্দোলনে ব্যাপক গণ অভ্যুত্থান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

ভারতের পূর্ব সীমান্তে জাপানি ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদের বুটের দাপাদাপি, নৌ-বিদ্রোহ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তে নাজেহাল হয়ে টনক নড়েছিল ব্রিটিশ সরকারের। ব্রিটেন বুঝতে পেরেছিল, হয় সময় থাকতে ব্রিটিশকে ভারত ছাড়তে হবে, নয়তো তাকে ভারত ছাড়া করাবে পরিবর্তিত অভ্যন্তরীণ ও

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি-র লেবার পার্টি ভেবে দেখল, প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করাই শ্রেয়। দ্বিতীয়টি হলে ব্রিটিশসিংহের লজ্জা ও অগৌরবের শেষ থাকবে না। আন্তর্জাতিক মানসম্মান লুটিয়ে পড়বে ধুলোয়।

ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বড়লাট করে ভারতে পাঠাল ক্ষমতা হস্তান্তর

ও দেশভাগের কাজটা একই সঙ্গে সুসম্পন্ন করতে। ভারতে এসে মাউন্টব্যাটেন সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন ১৯৪৭-এর ৩ জুনে। বৈঠকে আলোচনা হল, অবিভক্ত ভারত বিভক্ত হলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পত্তি কী ভাবে ভাগ হবে। কিন্তু দুই রাষ্ট্রের মানুষ কী নিয়মে ভাগাভাগি হবে, ভাগাভাগির প্রক্রিয়াই বা কী হবে, তাদের বিষয়-সম্পত্তির কী হবে, এ সব নিয়ে বৈঠকে কোনও নেতা একটাও প্রশ্ন তুললেন না।

দেশভাগের কথাটা ছিল যেমন দুর্ভাগ্য তেমনই জটিল। এখানে একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে, যেটা ১৯৪৮-এর ১০ মার্চ উল্লেখ করেছিল ‘জয়হিন্দ’ পত্রিকা। পত্রিকাটি লিখেছিল, গোটা দেশকে তো ভাগ করা হয়নি। দেশভাগের ছুরি চালানো হয়েছিল কেবল বাংলা ও পঞ্জাবের বুকের ওপর দিয়ে।^১ মাউন্টব্যাটেন দেশভাগের যে-প্ল্যান দেন, তাতে পঞ্জাব ও বাংলার কোন অঞ্চলের ওপর দিয়ে সীমারেখা টানা হবে তার কোনও নির্দেশ ছিল না। তাই স্থির হল, দুই প্রদেশের জন্য দুটো সীমানা কমিশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে এই ভীষণ জটিল কাজটা। সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান করা হল বিলেতের বিখ্যাত ব্যারিস্টার স্যর সিরিল র্যাডক্লিফকে, যিনি বিলেতে বসে কেবল ‘ভারত’ নামটাই শুনেছিলেন। এ দেশে কখনও আসেননি, সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এ দেশের রাজনীতি, ভূগোল, মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, ভাষা ও আবেগ সম্পর্কে। তথাপি এই ভয়ঙ্কর অযোগ্যতাই বিবেচিত হল তাঁর যোগ্যতারাণে। কারণ, নেহরু-জিন্না দু’জনেই চেয়েছিলেন এমন ব্যক্তিকে সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান করতে, যিনি ভারত সম্পর্কে একেবারে অন্ধকারে। তা হলে তিনি পক্ষপাতশূন্য হয়ে কাজ করতে পারবেন।

সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য র্যাডক্লিফকে সময় দেওয়া হল মাত্র ছ’সপ্তাহ। এমন একটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ, জটিল ও কঠিন কাজ এত কম সময়ের মধ্যে নিখুঁত ভাবে করা সম্ভব নয়। র্যাডক্লিফ সম্ভবত কিছুটা বিশ্রান্ত হয়েই নেহরু ও জিন্নার কাছে জানতে চাইলেন ভুলচুক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কি ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ করা অপরিহার্য? দু’জনেই জানালেন তাঁদের অধৈর্যের কথা। তাঁরা একবারও ভাবলেন না, এর পরিণামে কয়েক কোটি মানুষের জীবনে নেমে আসবে অনিবার্য আনিশ্চয়তা ও ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। ভারত স্বাধীনতা লাভের দুদিন পরে, ১৭ অগস্ট র্যাডক্লিফ প্রকাশ করলেন দেশ বিভাজনের চূড়ান্ত নকশা। স্বাধীনতা ও দেশভাগ হল একই মুদ্রার এ পিঠ আর ও পিঠ।

দেশভাগের আগেই ১৯৪৬-এ নোয়াখালি ও টিপেরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং আতঙ্কের

শিকার হয়ে ভিটে-মাটি ছেড়ে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করতে শুরু করেছিল সংখ্যালঘু হিন্দুরা। দেশভাগের পরিণামে দেখা দিয়েছিল ভয়ঙ্কর হিংসা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, হিন্দুনারীর নিরাপত্তার দুঃখজনক অভাব। ফলে ১৯৪৬ থেকে দফায় দফায় যে গণপ্রব্রাজন ঘটেছিল, তা সম্ভবত ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি বিশ্বের ইতিহাসে। ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা উদ্ভাস্তর সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ দশ হাজার। তার মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ ছিল শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণি, সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং এক লক্ষের মতো কারিগর শ্রেণি। ১৯৫০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্ভাস্তর সংখ্যা ছিল বাইশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিনশো ষোলো জন।^২

দেশভাগের কারণে উদ্ভাস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের দুই প্রান্তে, পশ্চিমে পঞ্জাব ও পূর্বে বাংলায়। কিন্তু উদ্ভাস্ত সমস্যা সমাধান ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় ঢুকে গিয়েছিল সূক্ষ্ম রাজনীতি। ভারত সরকারের দৃষ্টিতে পঞ্জাবের উদ্ভাস্তরা ছিল সুয়োরানি, বাংলায় তারা দুয়োরানি। আসলে, ভারত সরকার প্রথমে স্বীকার করতে চায়নি, পূর্ব পাকিস্তানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যার পরিণামে হিন্দুদের দেশত্যাগ করে চলে আসতে হবে ভারতে। বাস্তবহাদের সরকার উদ্ভাস্ত বলে মনেই করেনি। ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্ভাস্ত ট্রেনে করে এসে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছলে দেখা দেয় চরম দুর্দশা। এত মানুষ, দু’হাত জায়গাও নেই সাকলের জন্য। সবচেয়ে কঠিন সমস্যা পড়ে উদ্ভাস্ত মেয়েরা। তাদের দুর্দশা ফুটে উঠেছিল মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়—

‘এস দেখে যাও কুটি কুটি সংসার।
স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ছড়ানো বে-আত্র
সংসারে
স্বামী নেই, গেল কোথায় তলিয়ে
ভেসে এসে আজ ঠেকেছে কোথায় ও-কে
ছেঁড়া কানিটুকু কোমর জড়ানো আদুরি,
ঘরের
বউ—
আমার বাংলা।’^৩

উদ্ভাস্তদের জন্য সরকার প্রথমে বিভিন্ন স্টেশন ও গুদাম ঘরে অস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে। পরে শিবির তৈরি হয় বিভিন্ন স্থানে। স্বতন্ত্র শিবির তৈরি হয় সেই সব মহিলাদের জন্য, যারা অভিভাবকহীন কুমারী ও বিধবা। উদ্ভাস্ত মহিলাদের যখন-তখন পাঠিয়ে দেওয়া হয় এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে। তারা ডোল পেত না নিয়মিত। এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অনশন ধর্মঘট করে ধুবিলিয়া শিবিরের মহিলারা। ট্রেন অবরোধ করে ১৯৫০-এর ২১ মে।

নদিয়ায় পায়রাডাঙার উদ্ভাস্ত মহিলারা ৬ জুলাই অনশন ধর্মঘট করে নগদ টাকায় ডোল দেওয়ার দাবিতে। মহিলা-সহ ৮৮ জন উদ্ভাস্ত ১৩ জুলাই মিছিল করে পায়রাডাঙা থেকে রানাঘাটে এসে ডি ও-এর কাছে আসে দাবি জানাতে। ১৯৫০-এ স্থাপিত হয় ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রেফিউজি কাউন্সিল, যার সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মহিলা।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত উদ্ভাস্ত শিবিরগুলির দুরবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। সাপের কামড়, অপুষ্টি, ম্যালেরিয়া ইত্যাদির কবলে পড়ে কাশীপুর শিবিরে প্রতিদিন মৃত্যু হত দশ থেকে বারো জনের, প্রবীণ উদ্ভাস্ত গিরিবালো ভট্টাচার্যকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়েছিল ডোলের জন্য। অভুক্ত নাতির কান্না সহ্য করতে না পেরে, তিনি বেলেড় শিবিরের কর্তাদের কাছে যান সাহায্যের জন্য। কেউ কান দেয় না তাঁর প্রার্থনায়। উলটে, তিনি গোলমাল করছেন এই অভিযোগে তাঁকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে।^৪

পূর্ববাংলা থেকে যে সব মধ্যবিত্ত উদ্ভাস্ত এসেছিল, তারা অনেকেই সরকারি ত্রাণ শিবিরে থাকা পছন্দ করেনি। শিয়ালদা স্টেশনের নরককুণ্ডে থাকা সম্ভব ছিল না, যেখানে বে-আত্র অবস্থায় শুয়ে থাকার জন্য তিন হাত জায়গা পাওয়া ছিল দুষ্কর। তাই পুনর্বাসনে সরকারের ব্যর্থতা তাদের ঠেলে দেয় কলকাতা শহরে নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নিতে। তারা দখল করল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং ফাটকাবাজদের ফাঁকা জমি। ঢুকে পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পরিত্যক্ত মিলিটারি ব্যারাকে। অধিকার করে নিল লেক মিলিটারি ব্যারাক, যোধপুর, শাহপুর, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ও ধর্মতলার মিলিটারি ব্যারাক এবং মহীশূর ভবন। ১৯৪৯-এর মধ্যেই গড়ে উঠল সংগঠিতভাবে জমি দখল ও কলোনি গড়ে তোলার আন্দোলন। প্রথম কলোনি গড়ে ওঠে বিজয়গড়ে পরিত্যক্ত মিলিটারি ব্যারাকে। নেতৃত্ব দেন স্বাধীনতা সংগ্রামী সন্তোষ দত্ত ও দীনেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। তবে খুব কম মানুষই জানে সন্তোষ দত্তের নেতৃত্বে এই জমি দখল সরকারি অনুমোদন পেয়েছিল আগেই।^৫ ১৯৫০-এর মধ্যে গড়ে ওঠে এ রকম ১৪৯টি কলোনি, যাতে মাথা গোঁজার ঠাই হয় ২৯৮৫৬টি পরিবারের ১,৪৯,২৮০ জন উদ্ভাস্তরা।^৬

উল্লেখযোগ্য যে, জমি জবরদখল এবং কলোনি রক্ষার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন উদ্ভাস্ত মহিলারা। তাদের জমি দখলের প্রথম প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত হল, আলিপুর টাঁকশালের পেছনে দুর্গাপুরে ভারত সরকারের জমি জবরদখলের ব্যর্থ প্রয়াস।^৭ মহিলারা চারদিন ধরে লড়াই চালিয়েছিলেন পুলিশের বিরুদ্ধে। ১৯৫০-এ উদ্ভাস্তদের

উচ্ছেদ করে সরকারি জমি উদ্ধারের জন্য বিল আনা হল বিধানসভায়। পুলিশ ও জমির মালিকের গুণ্ডাবাহিনী কলোনি উচ্ছেদ করতে এলে কলোনির মহিলারা সম্মুখবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, এই উচ্ছেদ ঠেকাতে হবে যে-কোনও মূল্যে। দেশভাগের আগে ওপার বাংলার যে সব মহিলা ছিলেন নেহাত গ্রাম্য বধু, তেমন প্রয়োজন না পড়লে পা রাখতেন না ঘরের বাইরে, তাঁরাই বেরিয়ে এলেন রাস্তায় মিছিল করতে, সভা-সমিতিতে যোগ দিলেন দলে দলে। আসলে, মানুষ নিজেকে কখনও বদলাতে পারে না, তাকে বদলে দেয় সময় ও পরিস্থিতি। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। পুলিশ ও গুন্ডারা কলোনি উচ্ছেদ করতে এলে মহিলারা বসে পড়লেন কলোনিতে প্রবেশের মুখে রাস্তার ওপর। তাঁরা সরে যেতে অস্বীকার করলে পুলিশ চালাল লাঠি, ছুড়ল গুলি। প্রাণ দিলেন বীণাপাণি নামে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রথম শহিদ।^৮

কলোনি উচ্ছেদ ও তার প্রতিরোধে উদ্বাস্তু মহিলাদের মরণপণ লড়াইয়ের অতি বিশ্বাসযোগ্য ছবি তুলে ধরেছেন সাবিত্রী রায় তাঁর ‘স্বরলিপি’ উপন্যাসে। যে অঞ্চল ক’বছর আগেও ছিল ধু ধু মাঠ, মাঠের বুকে ছিল মিলিটারি ক্যাম্প, ‘চারিদিকে নলবন, ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল’, উদ্বাস্তুরা নিজেদের হাতে ঝোপ-জঙ্গল সাফ করে, ডোবা-খানা বুজিয়ে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলেছিল সেই জায়গা। নিজেদের হাতে মাটি কুপিয়ে সেই মাটি দিয়ে ভিটে তৈরি করেছিল পুরুষ-মহিলা মিলে, রক্ত জলকরা শ্রম দিয়ে। সেই ভিটেটুকু কেড়ে নিতে এসেছিল পুলিশ আর গুন্ডার দল। তারা তুলসীকে গুলি করে হত্যা করে। তুলসীর বউয়ের সামনে তারা আগুন লাগিয়ে দেয় তার ঘরে, যে ঘরখানা সে তুলেছিল স্বামীর সঙ্গে মাটি টেনে টেনে। উদ্বাস্তুরা বাস্তহারা হল দ্বিতীয়বার। প্রথম বার পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচিত কংগ্রেস সরকারের উদ্বাস্তু-বিরোধী আচরণে। পুলিশ ও গুন্ডাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মেয়েরা মিছিল করে প্রতিবাদ জানালে পুলিশ লাঠি চালায় তাদের ওপর। প্রকাশ্য দিনের আলোয় মেয়েদের এ নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশকে সহ্য করতে পারছে না তারা।^৯ বিকেলে সভা হয়। বৃদ্ধা ক্ষেত্রমণিকে প্রমীলা জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনিও যাইবেন?’ ক্ষেত্রমণি উত্তর দেন, ‘যামু না কও কী?’

মহিলা উদ্বাস্তুদের আন্দোলন চলল আরও জোরদার হয়ে। ১৯৫৪-র ২০ অক্টোবর হুগলির ভদ্রকালীর উদ্বাস্তুরা এক বিশাল মিছিল করে হাজির হল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের বাসভবনের সামনে। এই মিছিলে ছিল যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা। উদ্বাস্তু মেয়েরা তাদের

আন্দোলনকে রাজনীতির ছোঁয়া থেকে দূরে রাখতে পারেনি। সমস্যা সমাধানের জন্য বাধ্য হয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে। কলোনির অনেক মেয়ে যোগ দিয়েছিল কমিউনিস্ট কিংবা আরএসপি-তে। এর কারণ, বামপন্থীরা উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়িয়েছিল প্রথম থেকেই। ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেনি কংগ্রেস সরকার। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, এই সময় যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল কমিউনিস্ট পার্টির, উদ্বাস্তুদের সমর্থনের কারণে। বস্তুত, উদ্বাস্তু মহিলারা রাজনৈতিক শক্তির নতুন মুখ হয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গে।

পূর্ববঙ্গের বাস্তহারা মহিলাদের কেবল মাথার ওপর একটু আচ্ছাদনের জন্য লড়াই করতে হয়নি। তাদের যুবাতে হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র সমস্যার সঙ্গে। পূর্ববঙ্গের পুরুষদের কাছে কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ খুব একটা অপরিচিত ছিল না। কারণ, পড়াশোনা কিংবা কাজকর্মের সুবাদে তাদের আসতেই হত কলকাতায়। সেই উনিশ শতকের প্রথম থেকেই। কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে এসে পূর্ববঙ্গের মেয়েরা হঠাৎ সম্মুখীন হল এক ভিন্ন সামাজিক ও কৃষ্টির জগতের। তারা দেখল, তাদের ছেড়ে আসা দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক প্রথা, আচার, ব্রত-পার্বণ, জীবনযাত্রার ধাঁচ, এমনকি বাচনভঙ্গি, উচ্চারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গীয়দের থেকে, যাদের কথ্য বাংলায় বলে ‘ঘটি’। সম্ভবত ঘটি-বাঙালির ধারণার জন্ম হয় এই সময়। এটা ঘটনা যে, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের বন্যা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে সেদিন পুলকিত করেনি। বরং সৃষ্টি করেছিল আকর্ষণ বিরক্তি। যেন একটা আপদ। উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছ থেকে পাওয়া ‘রেফিউজি’ তকমাটা একটা অসম্মান ও অবজ্ঞার চিহ্ন হিসেবে বয়ে বেড়াতে হয়েছিল বেশ কিছুদিন। ‘উদ্বাস্তু’ পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়েছিল বিড়ম্বনা ও বিদ্রূপ, অনেক সময় মাৎসর্যপ্রসূত ছিছিঙ্কার। এ বঙ্গের অনেকেই তাদের বর্জন না করলেও বরণ করে নিতে পারেনি খোলা মনে। তাদের এহেন আচরণ আহত করেছিল পূর্ববঙ্গের মানুষকে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরী ছিলেন বরিশালের মানুষ। লিখেছিলেন ‘বাঙালনামা’। এই নামকরণের পিছনে তাঁর বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা বলা সম্ভব নয়। তবে এমনও হতে পারে, এই নামকরণের পেছনে প্রচ্ছন্ন ছিল ‘বাঙাল’ হিসেবে তাঁর অভিমান কিংবা বাঙালদের তাচ্ছিল্য করার বিরুদ্ধে নীরব ধীদীপ্ত প্রতিবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের কাছে বাস্তহারা মেয়েরা ছিল সন্দেহজনক। তাদের চোখে উদ্বাস্তু মেয়েরা ছিল ‘অথৈ জলের মাছ’।^{১০} দেশভাগের পর বহুদিন পর্যন্ত ‘বাঙাল’

মেয়েদের সম্পর্কে একটা ভিত্তিহীন বিরূপতা গঁথে বসেছিল এ বঙ্গের মানুষের মনে। তাদের নিচু চোখে দেখার প্রবণতা তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এ বঙ্গের মানুষের আশঙ্কা হয়েছিল, উদ্বাস্তু মেয়েদের বেপরোয়া মনোভাব, জঙ্গি আচরণ, চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ওঠা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের জীবনে নিয়ে আসবে অবাঞ্ছিত পরিবর্তন। তারা উদ্বাস্তু মহিলাদের একটা স্বতন্ত্র বঙ্গনারী সমাজ বলে বিবেচনা করেছিল তাদের আচরণ, অদ্ভুত অমার্জিত উচ্চারণে কথা বলা, এমনকি বিচিত্র রন্ধন প্রণালীর জন্য। সম্ভবত এই কারণে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সচেতন ভাবে এড়িয়ে যেত বাঙাল পরিবারের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করার ভাবনাকে। সুলেখা সেনের জন্ম ১৯৩৪-এ। তিনি লিখেছেন, ‘আমার বিয়ে হয় বাঙাল বাড়িতে। নিজেরাই বিয়ে করেছিলাম। ...নইলে এই ঘটি-বাঙাল বিয়ের ব্যাপারটা তখন একদমই ছিল না। সম্বন্ধ করে বাঙাল বাড়িতে বিয়ে করছে ভাবাই যেত না।’^{১১}

‘উদ্বাস্তু মহিলা’— এই নগণ্য পরিচয় নিয়ে কিন্তু পূর্ববঙ্গের মেয়েরা কলকাতা সমাজে বিপ্লব ঘটিয়েছিল বস্তাপচা রীতিনীতি, সংস্কারকে ছিন্নভিন্ন করে এক নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং কৃষ্টির মান তুলে ধরে। কাজটা সহজে হয়নি। অনেক কষ্টে ভাঙতে হয়েছিল অন্দর ও বাহির মহলের মধ্যে দাঁড় করানো অদৃশ্য কিন্তু সুউচ্চ প্রাচীরটাকে। এই প্রাচীর ভাঙা কাজে তাদের প্রেরণার উৎস ছিল অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

বিশ শতকের প্রথম চার দশকের মধ্যেই অনেকটা খুলে গিয়েছিল বাঙালির অন্তঃপুরের আগল। সেই বন্ধ দরজায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি ধাক্কা মারেনি। মেরেছিল দেশভাগের বিষয়ময় পরিণতি। সেই ধাক্কা খুলে যায় শ্রমজীবী নারীর আবির্ভাবের দরজাটা। মণিকুন্তলা সেন দেখেছিলেন দেশভাগের ফলে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ উদ্বাস্তু মেয়েদের মধ্যে একটা অদ্ভুত জাগরণ। তাঁর মনে হয়েছিল, পূর্ববাংলায় থেকে গেলে মেয়েদের মধ্যে এই পরিবর্তন আসত না, ডানা মেলেতে পারত না তারা। তিনি লিখেছেন, ‘মেয়েদের নির্ভীক চলাফেরা এবং রুজির জন্য যা মেরে সমস্ত দুয়ারগুলি খুলে দেওয়া, সম্ভবত এদের প্রয়োজনের চাপ ও সংখ্যার চাপে ছাড়া সহজে হত না। ... দেশে থাকলে এত দ্রুত ও সহজে এরা জীবনের হাল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না।’^{১২}

দেশের কর্মজগতে এক সময় মেয়েদের প্রবেশ ঘটতই, কিন্তু সেই প্রবেশকে ত্বরান্বিত করেছিল দেশভাগ। মধ্যবিত্ত পরিবার দেশভাগের আগে নীতিগত কারণে এবং সামাজিক অনুশাসনের চাপে সমর্থন করত না মেয়েদের উপার্জন বা চাকরি করা। কিন্তু

সব সংস্কার অনেকটা উবে গেল দেশভাগের পরিণতিতে বেঁচে থাকার তাগিদে। উদ্ভাস্তদের মধ্যে মাত্র পঁচিশ শতাংশ ছিল কর্মক্ষম বয়স্ক মানুষ। তাই অনেক পরিবারের মেয়েদের প্রবেশ করতে হয় কর্মজগতে। দেশভাগ তাদের ভৌম পরিসর সঙ্কীর্ণ করে দিলেও সামাজিক পরিসরের বিস্তার ঘটিয়েছিল তাদের সামনে। তথাপি পরিবারের বাধা যে ছিল না তা নয়। ব্যাঙ্কে মেয়েদের চাকরি করাকে অসম্মানের কাজ বলে মনে করা হত। সেই মনোভাবও সরে গেল একটু একটু করে। অফিসের কেরানির পদগুলোতে দেখা দিল বাঙাল মেয়েরা। কোনও পেশাই আর অচ্ছত রইল না তাদের কাছে।

কর্মজগতে ইতিপূর্বে এমন বিপুল সংখ্যায় মেয়েদের প্রবেশ কখনও ঘটেনি। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১-র মধ্যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মেয়েদের নাম নথিভুক্ত করার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল দু'লক্ষ থেকে সাড়ে চার লক্ষ। স্বল্পশিক্ষিত মেয়েদের জন্য নারীসঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছিল মহিলাদের রেলাই, বই বাঁধাই, বাটিক প্রভৃতি হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। অনেক মহিলা ছিলেন অভিজাত ঘরের মেয়ে। পুরনো স্মৃতি মাঝে মাঝে তাঁদের বিষণ্ণ করে তুললেও তাঁরা ক্রমশ কাটিয়ে উঠছিলেন সেই বিষণ্ণতা, সব ভুলে গিয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন নিজের স্বাধীন স্বতন্ত্র পরিচয়ে। প্রবোধকুমার সান্যালের 'হাসুবানু' উপন্যাসে জমিদার-নন্দিনী মীরা কলকাতায় এসে গ্রহণ করেন আড়াইশো টাকার চাকরি। উদ্ভাস্ত মেয়েদের চাকরি করে স্বনির্ভর হওয়ার ব্যাপক প্রচেষ্টা পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের কাছে প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল বিসদৃশ, মেয়েদের নির্লজ্জতার প্রকাশ। কিন্তু ক্রমশ ভেঙে যায় এই ধারণা। মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন, 'এই একটা ব্যাপারে একদিনের সর্বস্বহারী মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের যে কী উপকার করেছে তা হয়তো কেউ টের পায়নি।'^{১৩}

বিয়ের জন্য লেখাপড়া শেখানোর ভাবনা মিলিয়ে গিয়েছিল অনেকটাই। যেখানে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম চাহিদা মেটানো ছিল কষ্টকর, বিয়ের ভাবনা সেখানে বিলাসিতা। উদ্ভাস্ত মেয়েরা স্বপ্ন দেখত একটা ভাল চাকরির, ভাল স্বামী, ভাল বিয়ের নয়। ফলে পশ্চিমবঙ্গের নারীসমাজে দেখা গেল প্রচুর অবিবাহিত মহিলা। দেশভাগের পর বহু উদ্ভাস্ত পরিবারের কত ভাগ্য বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এ দেশে এসে। অনেক পরিবারের মেয়েদের তুলে নিতে হয় পরিবারের মুখে অন্ন জোগানোর দায়িত্ব। ওই সব মেয়েরা ভুলে গিয়েছিল নিজেদের জীবনটা নিয়ে আলাদা করে ভাবতে। বিনোদনহীন, প্রসাধনহীন মেয়েরা দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়ে সেই বোঝার ভারেই নিজের স্বার্থ মেটানোর জন্য

আর মাথা তুলতে পারেনি। মানস রায় তাঁর নিজের দিদির কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'ততদিনে দিদি বি.এ পাশ করেছেন। সরকারি আপিসের কনিষ্ঠ স্টেনোগ্রাফার হিসেবে তার চাকরি সংসারের হাল ধরতে কাজে এল, বিয়ের প্রস্তাব আপাতত মূলতুবি।'^{১৪}

শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নীতার মতো উদ্ভাস্ত মেয়েদের চাকরি করে পরিবারের স্বার্থে অবিবাহিত থেকে জীবন উৎসর্গ করতে হত। 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নীতা তো কাল্পনিক চরিত্র। সেই চরিত্রের মূর্তরূপ অশীতিপর কিংবদন্তি অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। আশ্চর্য্য ভাবে সমীকরণ ঘটে গেছে কল্পনা ও বাস্তবের। সাবিত্রীদেবী আজও স্মৃতিচরণ করতে পারেন পূর্ববঙ্গের মেয়েদের জীবন-যুদ্ধের প্রতীক হিসেবে নিজের জীবন-সংগ্রামের কথা। তিনি অবশ্য উদ্ভাস্ত হয়ে আসেননি। কলকাতায় এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য, আর ফিরে যাননি পূর্ববঙ্গে। পরিবারের স্বার্থে অভিনয় জগতে আসার জন্য তীব্র লড়াই করার সময় ভুলে গিয়েছিলেন নিজের কথা।

একটা উপার্জনের পথ খুঁজে পেতে উদ্ভাস্ত মেয়েরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। অফিস-কাছারিতে কেরানি বা অন্য চাকরিতে যেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন, সেখানে সকলে সুযোগ পেল না। যারা পেল না তাদের লড়াই হল আরও তীব্র। জ্যোৎস্না নামে একটা মেয়েকে যাত্রায় অভিনয় করার অনুমতি দিতে অতি অনিচ্ছায় রাজি হয় তার পরিবার। এই জ্যোৎস্নাই পরে হয়ে ওঠেন যাত্রাসম্রাজ্ঞী। একই ইতিহাস যাত্রা-অভিনেত্রী বীণা দাশগুপ্তর। প্রখ্যাত নর্তকী শেফালি ছিলেন ঢাকা থেকে আসা উদ্ভাস্ত মেয়ে। আশ্রয় নিয়েছিলেন কলকাতায় আইরিটোলায়। তাঁর স্মৃতিচারণ: 'সেখানে মায়ের পরের বাড়িতে বাসন-মাজা, আশ্রয়দাতার ফাইফরমাশ খাটা, বেকার বাবার কাজ জোগাড়ের চেষ্টা, ছোট্ট ভাইটির কান্না, ঠাকুমার অসহায় মুখ—প্রতিটা দিন ছিল বিভীষিকাময়। ...মরিয়া হলাম পরিবারের মুখে অন্ন জোগানোর চিন্তায়।'^{১৫} নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দূরভাষিণী' গল্পে বীণার বাবা গিরীনবাবুকে বলেছেন, 'দু'বছর আগে আমিই কি ভাবতে পারতাম নগেন গুহঠাকুরতার নাতনী গিরীন গুহঠাকুরতার মেয়ে টেলিফোন অফিসে ঢুকবে। ...অবশ্য আজকাল আর সেসব নেই।'

অনেক সময় কোনও কোনও মেয়ে চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়ে পরিবারের অশক্ত, অসুস্থ বয়স্ক সদস্যের চিকিৎসার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে বেশি রোগগারের প্রয়োজনে পেশা নির্বাচনে হারিয়ে ফেলেছিল উচিত-অনুচিত বোধ। ফলে নষ্ট হয়েছিল তাদের নৈতিক স্বাস্থ্য দেহ-ব্যবসায় নেমে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরাও জানতে পারত না পরিবারের

মেয়েটির অর্থোপার্জনের উৎস। এই সব স্বল্পশিক্ষিত মেয়েরা অফিস টাইমে কলোন থেকে বেরিয়ে চলে যেত কলকাতায়। লোকে মনে করত তারা যাচ্ছে চাকরি করতে অথবা কলেজে পড়তে। কিন্তু তাদের দেখা যেত শিয়ালদা চত্বরে খন্দের খুঁজে বেড়াতে।

উদ্ভাস্ত মেয়েদের জীবনে এটা একটা অন্ধকার দিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এটা ঘটনা যে, সেদিন কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল সামাজিক আদর্শ ও কঠিন বাস্তবের মধ্যে সংঘর্ষ। পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হারিয়ে গিয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল মূল্যবোধ, অর্থোপার্জনের পথ খুঁজতে গিয়ে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, সে দিন প্রত্যেক মেয়ের লড়াইয়ের কাহিনি ভিন্ন ভিন্ন হলেও মূল লক্ষ্য অভিন্ন—বাঁচার লড়াই।

অবশ্য বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত উদ্ভাস্ত পরিবার হারিয়ে ফেলেনি পুরনো মূল্যবোধ। মেয়েদের চাকরি করা নিয়ে সংস্কার থেকে অনেকে মুক্তি পায়নি। দেশভাগের পর ১৯৪৯-এ লিখিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা' গল্পের নায়িকা গৃহবধূ আরতিকে লড়াই করতে হয়েছে সংস্কারে মোড়া মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাবনার সঙ্গে। তবে মেয়েরা চাকরি করতে গিয়ে আপস করেনি কর্মস্থলে পুরুষত্বের অন্যায় আচরণের সঙ্গে। তাদের মধ্যে আর্থিক স্বাধীনতাবোধ ছিল তীব্র, মূল্যবোধ ছিল তেমনি নিরেট। যে চাকরির জন্য আরতি একদিন পরিবারের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে অদম্য জেদ দেখিয়েছিল, সেই চাকরি সে স্বেচ্ছায় ছেড়েছে নারীর অপমানের প্রতিবাদ করতে গিয়ে, যদিও সেটা তার ব্যক্তিগত অপমান ছিল না। উদ্ভাস্ত মেয়েদের কাছে ঋজু ভাবনা, শান দেওয়া মেজাজ ছিল স্নায়বিক বিষয়।

দেশভাগের পরিণতিতে মেয়েদের প্রসঙ্গ উঠলেই সাধারণত আমাদের চোখে ভেসে ওঠে হিংসা, নারী ধর্ষণ, নারী অপহরণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাজনিত বিবশতার ছবি। কিন্তু এ সবের আড়ালে ঘটে গিয়েছিল নিঃশব্দ রূপান্তর, পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতিতে। সীমিত জায়গায় বসবাস করতে বাধ্য হওয়ার ফলে বিসর্জিত হয়েছিল প্রচলিত বেশ কিছু আচার-বিচার, প্রথা। মেনে চলা সম্ভব হচ্ছিল না অনেক সামাজিক প্রথা। এমনকি, বিধবাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া নিয়ম-কানুন শিথিল বা বাতিল করতে হয় অনেক ক্ষেত্রে। পরিস্থিতির সঙ্গে আপস করতে গিয়ে ভেঙে যায় অনেক গোঁড়ামি।

এ কথা সত্যি, দেশভাগ বঙ্গনারীর জীবনকে বদলে দিয়েছিল সব দিক থেকে। সেই সঙ্গে বঙ্গসমাজ এতদিন ধরে মেয়েদের যে ভাবে দেখে আসছিল, সেই দেখার

মধ্যেও এল পরিবর্তন। যেহেতু মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে ছাপিয়ে গিয়েছিল পরিবারের পুত্রসন্তানের ভূমিকাকে, তাই বঙ্গসমাজ ক্রমশ কন্যাসন্তানকে দিতে থাকল পুত্রসন্তানের সমান মর্যাদা ও গুরুত্ব। পরিবারকে আর্থিক সঙ্কট থেকে উদ্ধার করে মেয়েরা পালেট দিয়েছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি।

দেশভাগের পর আধুনিকতার সফল বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে বঙ্গনারীর মধ্যে প্রকাশিত হয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায় বাংলার নারীসমাজে। এমন পরিবর্তন যে আসতে পারে, তা দু'দশক আগেও কেউ ভাবতে পারেনি। পাশ্চাত্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কার, নারীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদি যদি বঙ্গনারীকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে যেতে বিশ শতাংশ সাহায্য করে থাকে— তা-ও দীর্ঘসময় ধরে, সেখানে দেশভাগ, বাস্তবচ্যুতি, উদ্বাস্তু জীবনের সংগ্রাম ইত্যাদি বাকি আশি শতাংশ কাজ করেছিল মাত্র এক দশকের মধ্যে। সম্ভবত এই তত্ত্বকে খারিজ করার উপায় নেই।

দেশভাগ অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল বঙ্গনারীর জীবনে। কিন্তু দেশভাগের পরিণামে নারীর অন্তর্বেদনা ও উত্তরণের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব নয়। যে-বিপর্যয় তাদের জীবনে নেমে এসেছিল

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো, তা কাটিয়ে উঠে উত্তরণের সিঁড়িতে উঠতে যে-লড়াই তাদের করতে হয়েছিল, তার প্রচণ্ডতা নথিপত্র ও সাহিত্যের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের রাজ্যে প্রবেশ করে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। পারেন একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন এই লড়াইয়ের সঙ্গে। তাই, দেশভাগের পরিণামে বঙ্গনারীর জীবনে অনেক ইতিবাচক দিক খুলে গিয়েছিল এই প্রথম, এটা ভেবে দেশভাগের নেতিবাচক দিকের ভারী ওজনটা হালকা করা যায় না। সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হয়, দেশভাগের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে ফিনিক্স পক্ষীর মতো বাংলায় আবির্ভাব ঘটল এক নতুন নারীসমাজের। বঙ্গনারীর এই নতুন রূপ ছিল আগামী প্রজন্মের বঙ্গনারীর দিশারি।

সূত্রনির্দেশ

১) The Exodus — Newspaper Cuttings, Home Political File, 1948

২) পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার চতুর্থ বর্ষ, ১৫ অগস্ট, ১৯৫০, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৫৪

৩) সেমন্তী ঘোষ সম্পাদিত দেশভাগ: স্মৃতি আর স্তব্ধতা থেকে উদ্ধৃত, কলকাতা, ২০০৮,

পৃ. ২৬২

৪) Gargi Chakravorty, *Coming out of partition: Refugee women of Bengal*, New Delhi, 2005, P.50.

৫) Prafulla kumar Chakrabarti, *The Marginal Men*, Rahara, 1960, P.37

৬) Udit Sen, 'Spinster, prostitute or Pioneer? Images of Refugee women in post-partition calcutta'. (www.academia.edu)

৭) সুজন চক্রবর্তী (সম্পাদ) সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২০

৮) Gargi Chakravorty, P.55

৯) সাবিত্রী রায়, *স্বরলিপি*, কলকাতা, ১৯৫২, পৃ. ৩৪২

১০) তদেব, পৃ. ৪২৩

১১) সেমন্তী ঘোষ, পৃ. ১০২

১২) মণিকুন্ডলা সেন, *জনজাগরণে নারী* জাগরণে, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১৬৯

১৩) তদেব।

১৪) অশ্বকুমার সিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৬২

১৫) তদেব, পৃ. ৬৪

অঙ্কন : রৌদ্র মিত্র





গ্রানাইট পাথরের দেওয়াল শিয়রে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাজাররাম মন্দির

ধ্বংসনগরের উপাখ্যান

অসীম পাল

দক্ষিণ পশ্চিমের ডেকান প্ল্যাটো। উঁচু-নিচু মালভূমির বুক চিরে বয়ে চলা তুঙ্গ ও ভদ্রার তীরে কিক্ষিদ্ধ্যানগর। সুগ্রীবের সাম্রাজ্য। তারও আগে পম্পা ক্ষেত্র। শিবকে পেতে পার্বতী ওরফে পম্পা এখানে হেমকূট পাহাড়ে তপস্যা করেছিলেন। শেষে কত সাধ্যসাধনায় বিরূপাক্ষ মন্দিরের চাতালে চার হাত এক হল। এ সব পুরাণকথা পুরনো হয়েছে। ছোট পাহাড়ের বৃকে একা পম্পা সরোবর কোনও মতে ঢিকে আছে। চারপাশে বানর সেনার অতন্ত্র পাহারা। বেগড়বাই হলেই দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসে, কেমন মানুষ হে,

আইন জানো না...!

কোনও এক ত্রেতা অন্দে রামচন্দ্র পরিযায়ীর বেশে কিক্ষিদ্ধ্যায় এসেছিলেন। গাছের আড়াল থেকে বালীবধ। নিঝুম দুপুরে আজও আর্ত চিৎকার ওঠে। রাতের অন্ধকারে ফিসফাস। পৃথিবীর বৃহত্তম রহস্যনগরী। তুঙ্গভদ্রার দুই তীরে শনশন হাওয়া বয়। কত শত উপাখ্যান পাক খেয়ে ঘুরে মরে। হাম্পির ধ্বংসনগর রোদে পিঠ দিয়ে ঝিমোতে থাকে।

এ সব ইতিহাস-পুরাণকে পাশে রেখে যদি প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৌঁছোতে হয়, পম্পা সরোবরের পাশ দিয়ে আরও উত্তরে যেতে

হবে। আনেন্ডুভি, গঙ্গাবতী, করাডিবটলু গ্রাম। হাম্পিতে পরিচয় হয় আর্কিওলাজিস্ট ড. শরণাবাসপ্পা কোলকারের সঙ্গে। তিনি পথ বাতলে দেন, একবার নিজের চোখে দেখে আসুন। সবাই তো বিরূপাক্ষ বিট্টল দেখতে আসে। বড়জোর হিপি আইল্যান্ড। আনেন্ডুভি থেকে বেলাড়ি— কম করে পাঁচশো গুহাচিত্র আছে। ভীমবেঠকার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। ডেকানই আদিম মানুষের বাসভূমি। একের পর এক মাইনিং-এ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে বেআইনি পাথর চুরি।

আনেন্ডুভিতে বেডার যুবক বাসবা

চেড়িয়ার আমাদের অপেক্ষায় ছিল। বেডার কর্নটিকের অন্যতম বৃহৎ জনজাতি। সরল উৎসব-মুখর জাতি। এককালে মেয়ে-পুরুষ পাথর খোদাইয়ের কাজ করত; যুবকরা সৈন্যদলে। বাসবা সরকারি মিউজিয়ামের বেসরকারি নাইটগার্ড। ড. কোলকারের নির্দেশে সঙ্গী হতে রাজি হয়েছে। রাত পাহারার আগে সেও পাথর কাটার কাজ করত, এ সব এলাকা তার নখদর্পণে।

আনগুন্ডির রঙ্গনাথ টেম্পল, কমল মহল পার হতে গাছপালায় ঘেরা সবুজ মাঠের ভিতর ছোট-বড় পাহাড়ি টিলা। গ্রানাইটের বড় বড় বোল্ডার দেখে মনে হয় বিরাট কোনও দৈত্যমানব পাথর সাজিয়ে ঢিবি বানিয়েছে। মাঝের উপত্যকায় সবুজ ধানখেত। ডাই করা পাথরের স্তূপে অসংখ্য প্রাকৃতিক শেল্টার। এককালে আদিম মানুষের বসবাস ছিল। কত চিহ্ন রয়ে গেছে। দেওয়াল জুড়ে আঁকিবুকি। মানুষের ছবি, শিকারের ছবি, বিমূর্ত গোলাকার ছবি। গুহার ছাদ থেকে দেওয়াল বেয়ে মস্ত অজগর। কে জানে সাপকে পূজো করত কি না, না হলে এ ভাবে কেন আঁকতে যাবে?

হয়তো ভবিষ্যতের বিজ্ঞান এক দিন নিখুঁত হিসেবে বলে দিতে পারবে, এত হাজার এত পূর্বাব্দে মানুষ এখানে বসতি গড়েছিল। উপত্যকা জুড়ে গভীর বনাঞ্চল। সেখান থেকে শিকার জটত— ফল-মূল-কন্দ। তুঙ্গভদ্রার নীল জলে তৃষ্ণা মিটত। অবসর কাটত ছবি ঐকে গান গেয়ে চিন্তা করে। তত দিনে মানুষ চিন্তা নামের স্বপ্নটাকে আয়ত্ত করে নিয়েছে।

হয়তো বাসবা চেড়িয়ারের পূর্বপুরুষেরা সেই সব মানুষ। ডেকান জুড়ে সেই থেকে বেডার, বোভি, নায়কা, বাল্মীকি, গোন্ড, গারসিয়াদের বাস। উত্তরের সংস্কৃত মানুষ যাদের বানর ডাকত। বালী সুগ্রীব রাজা। বালীকে বধ করে বানর সৈন্যদের কী ভাবে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া হয়, সে সব কাহিনি এককালে সুর করে পড়া হত। তাতে বানর জাতির স্বর্গলাভ ঘটেনি। আজও বেডার, বোভি, বাল্মীকির ডেকানের আধা জঙ্গলে লড়াই করে বেঁচে আছে। কেবল তাদের নেতা পবনন্দন উড়তে জানতেন বলে সামনের অঙ্গনী পাহাড় থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। লোকে সিঁড়ি ভেঙে অঙ্গনী পাহাড়ে তাঁর জন্মভূমি দেখতে যায়।

“সাহাব চলিয়ে, দের হো জায়েগা,” বাসবার ডাকে সশিঁ ফিরে আসে।

কিষ্কিন্দ্যার রাজকুমার এবার অনেক দূরে গঙ্গাবতীতে নিয়ে যায়। চারপাশে ধান আর ভুট্টার খেত। কোথাও বাজরা বুনেছে। গাছপালা-ঘেরা গঙ্গাবতী এক টুকরো শহরের মতো। কলেজ হাসপাতাল সরকারি অফিসকে তাদের নিজের জায়গায় রেখে পাহাড়ি টিলার দিকে হেঁটে যাই। মাথার উপরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ, পাহাড় ডিঙোতে ঘাম চুইয়ে পড়ে। দূরে মানুষের কথা শুনে ভেবেছিলাম পৌছোনো গেছে। কিন্তু আমাদের দেখে মানুষই দুদাড পালিয়ে যায়।

আমরা অবাক!

বাসবা গিয়ে নিজের ভাষায় কী যেন বলতেই দু’জন মানুষের মতো কালো গ্রানাইট

সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখে লাজুক হাসি। ভেবেছিল সরকারি লোক, পাথর খাদ্যানে রেড করতে এসেছে। তাদের আশ্বস্ত করি, ভয় নেই, আমরা নির্ভেজাল চোঁড়াসাপ।

এতক্ষণে স্বাভাবিক হয় তারা— রামচন্দ্র বোভি, রাজাশেখর ভাড্ডা। দু’জনেই বোভি জনজাতির। বংশানুক্রমে পাথরের কারিগর। হাম্পির পাথর-সাম্রাজ্য গড়েছিল। এখন এ শিল্পের দাম নেই। যাও-বা আছে পাথর মেলে না। বড় পাহাড়ে খনিজের মাইনিং চলে। ছোট খাদান শহুরে ঠিকাদারের দখলে। তারা মেশিনে পাথর কাটে। এদের হাতে ছেনি হাতুড়ি। তাই দিয়ে সারা দিনে কয়েক টুকরো জোটে। মহিলা ও বয়স্করা খোদাই করে মূর্তি বানায়। টুরিস্টরা ভাল দামে কেনে বটে, কিন্তু লাভের গুড় পাইকারে চটে খায়।

“এ ভাবে চুরি না করে অন্য কিছু তো করতে পারো?”

রাজাশেখরের মুখে অপরাধীর হাসি। “বেঙ্গালুরুর কারখানায় ঠিকা শ্রমিকের কাজ করতাম, কোভিডে কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরলাম। সেই থেকে পুরনো পেশায়। পূর্বপুরুষের কাজ, ছাড়লে জাতেরও যে অপমান হয়! চোখে অহঙ্কার ঝরে পড়ে।

ছবি দেখতে এসেছি শুনে উৎসাহে ঘুরে দেখায়। বলে, “আমরা কোনও ক্ষতি করি না স্যার। জানি, এ সব দামি জিনিস। কেউ নষ্ট না করে তার খেয়াল রাখি।”

এখানেও ছোট-বড় গুহার অসংখ্য ছবি। অধিকাংশ পশুপাখি, কোথাও সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ, অস্ত্র হাতে শিকারির



বিজয় বিট্টল, মূল মন্দির



থেমে যাওয়া হাম্পির রথ, অতীতের প্রতীক হয়ে রয়ে গেছে

দল, বিমূর্ত আঁকিবুকি। বহু প্রাচীন অস্পষ্ট ছবির পাশে নিওলিথিক যুগের ঘোড়ায় চড়া শিকারি। এরা যাই বলুক, অনেক ছবি মানুষের হাতে নষ্ট হয়েছে। ড. কোলকারের মতে, এগুলোর বয়স দশ থেকে কুড়ি হাজার বছর, বেশিও হতে পারে। কাগজে-কলমে আনুগুণ্য থেকে গঙ্গাবতী ‘হাম্পি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এরিয়া ম্যানেজমেন্ট অথরিটি’-র (HWHAMA) আভারে, অথচ এ সব দিকে কারও খেয়াল নেই। সকলের সমস্ত নজর বিজয়নগরকে ঘিরে।

হরিহর ও বৃষ্টি ১৩৩৬-এ বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সে এক অন্য উপাখ্যান। কাকতিয়ারাজ প্রতাপরুদ্রকে পরাজিত করে মহম্মদ বিন তুঘলক যুদ্ধবন্দি অমাত্যদের বেঁধে নিয়ে চললেন দিল্লির পথে। মাঝরাস্তায় বৃষ্টি ও বন্যার তোড়ে বন্দিদের ফেলে রক্ষীরা পালিয়ে গেল, প্রাণভয়ে পালাল বন্দিরাও। দু’দিন পরে ফিরে এসে রক্ষীরা অবাক, দু’জন বন্দি তাদের অপেক্ষায় বসে আছে, চলো, কোথায় যেতে হবে বলো...”

এঁরা দু’ভাই হরিহর ও বৃষ্টি। সততায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান তাঁদের কনটিক রাজ্য উপহার দিলেন, সঙ্গে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা। কয়েক দিন দিল্লিতে কাটিয়ে তাঁরা মহা ধুমধামে নতুন রাজ্যে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু কুলগুরু মাধবাচার্য খুশি হননি। সততার শিক্ষাও যে

তাঁরই দেওয়া। দু’ভাইকে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নির্দেশ দিলেন, যেখানে খরগোশ হিংস্র কুকুরকে তাড়া করার সাহস দেখায়, সেখানে রাজধানী স্থাপন করো, দীর্ঘস্থায়ী হবে।

তুঙ্গভদ্রার তীরে হাম্পিতে একদিন তাঁরা সেই বিরল দৃশ্য দেখলেন। সেখানেই তৈরি হল বিজয়নগরের রাজধানী। হরিহর সিংহাসনে বসলে মাধবাচার্য হলেন প্রধানমন্ত্রী। রাজাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে শেষ জীবনে শুদ্ধেরী মঠের শঙ্করাচার্য হয়ে চলে গেলেন আর হাম্পির সিংহাসনে বসলেন মহারাজা বৃষ্টি।

এর পর চারটে রাজবংশের উনত্রিশ জন রাজার তিনশো দশ বছরের রাজত্ব। শ্রেষ্ঠ জন অবশ্যই কৃষ্ণদেব রায়। রাজা কেমন হওয়া উচিত, তার প্রকৃত উদাহরণ ছিলেন তিনি। বীরশ্রেষ্ঠ তো বটেই, সেই সঙ্গে প্রেমিক শিল্পী সাহিত্যিক জ্ঞানী ধার্মিক— আরও কত গুণ! বিক্রমাদিত্যের মতো তাঁর সভাতেও অষ্ট দিগ্গজ হাজির থাকত, সঙ্গে রসিক তেনালিরাম। রাজা কখনও মহাকাব্য লিখতে পারেন! তেলুগু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন ‘আমুক্তমাল্যদা’ কৃষ্ণদেবের লেখা। অর্জুনের সব গুণ তাঁর ছিল, কিন্তু অর্জুন রাজনীতিতে ডাहा ফেল, কেবল যোদ্ধা। অথচ মহারাজ কৃষ্ণদেবের রাজনীতির চালে বিজাপুর গোলকুন্ডা বাহমানির সুলতানরা কতবার ঘোল

খেয়েছে, হিসেব নেই। পর্তুগিজ ডোমিঙ্গো পেজ, ফারনাও নুন্জি, টোম পিরেজরা লিখে গেছেন সে সব।

মধ্যযুগের একটা শহর কুড়ি বর্গ কিলোমিটার জুড়ে। এর বাইরে শহরতলি, হাতিশালা, ঘোড়ার আস্তাবল, সেনাঘাঁটি! ভাবলেও অবাক লাগে। তিনশো দশ বছরে তিলে তিলে গড়ে ওঠা। কত প্রাসাদ, কত মহল-মন্দির-স্নানাগার, প্রমোদকানন। শিল্পসংস্কৃতিকে কোন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়া যায়, ভাঙা দেউলের ধ্বংসস্থাপে আজও তার চিহ্ন রয়ে গেছে।

অথচ ধ্বংস করতে সময় লাগেনি। তালিকোটর যুদ্ধ জয় করে সুলতানি শাসকরা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। একমাস ধরে লুণ্ঠন চলে, ঘরে ঘরে ধর্ষিতা। যা পারে নিয়ে যায়; না পারলে ভেঙে চুরমার। আজও ধ্বংসস্থাপের মাঝে দাঁড়িয়ে বিবমিষা জাগে, এমন শিল্পকে কেউ নষ্ট করতে পারে!

একই প্রশ্ন জেগেছিল জাপানি বিজ্ঞানী কাটসু ইকেউচির মনে। ২০০৯ সালে দিল্লি আইআইটি-র গ্যার্কশপে ভারতে এলেন। উদ্দেশ্য, দেশের ঐতিহাসিক প্রত্নসামগ্রীকে সংরক্ষণ করা। ইতিমধ্যে আঙ্কোরভাটের ত্রিমাত্রিক ডিজিটাল প্রতিক্রাপ তৈরি করে ইতিহাস-দুনিয়াকে অবাক করে দিয়েছেন



মুক্তমঞ্চ মহানবমী দিব্য। এখানে হত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দেখানো হত যুদ্ধ-কৌশল

তিনি। অভিনব এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল কনোডিয়ার হিন্দু মন্দিরটিকে বর্তমান অবস্থায় ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে খেম সত্রাট সূর্যবর্মনের তৈরি এ মন্দির বিখ্যাত তার বিশালত্বের কারণে। চারশো একর জোড়া বিরাট স্থাপত্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য জোগাড় করা কম কথা নয়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল নিয়ে তিনি এ কাজে ব্যবহার করলেন লেসার স্ক্যানার। বিভিন্ন ধরনের রোবট ও ড্রোনের মাধ্যমে হাতে এল কোটি কোটি তথ্যমালা। সে সব দিয়ে থ্রিডি প্রিন্টারের সাহায্যে তৈরি হল মন্দিরের ছব্ব ত্রিমাত্রিক রূপ। সারা বিশ্ব অবাক হয়ে ভাবল, এ-ও সম্ভব!

এ দেশেও কি এমনটা করা যায়? অতীতে ফিরে যাওয়ার বৈজ্ঞানিক কৌশলকে কাজে লাগিয়ে দেখে নেওয়া যায় সমৃদ্ধ অতীত? অনেকে এগিয়ে এলেন। ইতিহাস যে অনেকের মনে প্রথম প্রেমের ক্ষতচিহ্নের মতো রয়ে গেছে! প্রেমের স্মৃতিতে আর-একটা তাজমহল হলে ক্ষতি কী? বেছে নেওয়া হল হাম্পিকে। এমন ট্র্যাজিক ধ্বংসস্থল বিশ্বে যে বিরল! অর্থের জোগানে রাজি হল ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। শুরু হল ‘ইন্ডিয়ান ডিজিটাল হেরিটেজ প্রোগ্রাম’। ২০১১-তে মূল দায়িত্ব পেল বেঙ্গালুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ। বিভিন্ন বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ শুরু করলেন। দিল্লি আইআইটি-র বিজ্ঞানী শান্তনু চৌধুরীর নেতৃত্বে দেশের বেশ কিছু নামী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা যোগ দিলেন সেই উদ্যোগে।

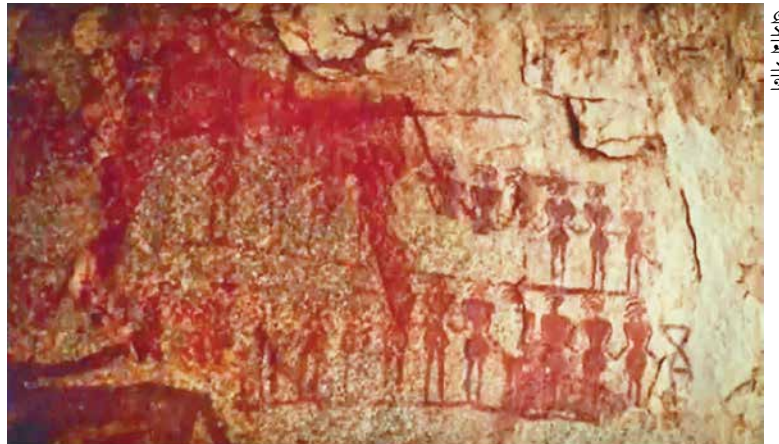
সেই সঙ্গে আর্কিটেক্ট, আর্কিওলজিস্ট, অ্যানথ্রোপলজিস্ট, ইতিহাসবিদ, শিল্প-কলা-সাহিত্যের একদল বিশেষজ্ঞ।

টেরেস্টিয়াল লেসার স্ক্যানিং দিয়ে হাম্পিরও বহু মিলিয়ন তথ্যমালা সংগ্রহ করা হল। ডেটার সঙ্গে প্রাচীন বাস্তু ও আগম শাস্ত্রের সূত্রকে মিলিয়ে তৈরি হল সম্ভাব্য ডায়াগ্রাম। যাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা সংশোধনীর মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ দিতেই তৈরি হয়ে এল থ্রিডি রেন্ডিকা। এতটাই নিখুঁত সে স্থাপত্য যে, মজা করে বলা হয় স্বয়ং অচ্যুত দেবরায়ের আত্মাও এটিকে নিজের তৈরি মন্দির বলে ভুল করবেন। এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মন্দির প্রাসাদের রেন্ডিকা তৈরি সম্ভব হয়েছে। আর ডিজিটাল প্রজেক্ট হাম্পির গণ্ডি

ছাড়িয়ে আরও অনেক ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে।

ড. কোলকারের কাছেই হাম্পির এই সব কর্মকাণ্ডের কথা প্রথম শুনেছিলাম। সেই সঙ্গে স্বগতোক্তি মতো তিনি বলেছিলেন, আর্কিওলজি দিনে দিনে টেকনোলজির দখলে চলে যাচ্ছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিন শেষ। ভবিষ্যৎ আর্কিওলজির হাতিয়ার হবে ডেটা সায়েন্স।

সেই থেকে ড. শান্তনু চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল। আদ্যন্ত বাঙালি বিজ্ঞানী, সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ইতিহাসের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা দুটোই। এই রোমাঞ্চকর শ্রদ্ধাটা না থাকলে এমন জটিল প্রজেক্টে কাজ করা সম্ভব হত না।



গঙ্গাবতীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহচিত্র



বিরূপাক্ষ মন্দিরের ছাতে চিত্রিত পুরাণকথা

কাজের পাশাপাশি হাম্পির মূল্যবান তথ্যকে পরম মমতায় দু'মলাটে বন্দি করে ফেলেছেন, *Digital Hampi: Preserving Indian Cultural Heritage*.

কিন্তু যখন আলাপের সুযোগ হল, তত দিনে তিনি আইআইটি যোধপুরের ডিরেক্টর। ব্যস্ত জীবন। সংশয় ছিল, অতীত ঘটিতে রাজি হবেন কি না। পরিচয়ের পর দেখলাম অন্য মানুষ। এমন প্রতিষ্ঠানের চূড়ায় বসেও হাম্পির আলোচনায় ক্লান্তি নেই। বরং কৈশোরের ফেলে আসা রোমাঞ্চের মতো ইতিহাসের ধূসর জগতে হারিয়ে যেতে পারলে খুশি হন। সেই সঙ্গে প্রেম পূর্ণতা না পাওয়ার আক্ষেপ, আমাদের কাছে এত ডেটা আছে যে, চাইলে আরও একটা হাম্পি গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু যারা ডিসিশন মেকার কিংবা ধনকুবের, তারা যদি এগিয়ে না আসে তবে সে সব কম্পিউটার কারাগারেই বন্দি রয়ে যাবে। সামান্য একটা রেল্লিকা মিউজিয়ামের জন্য যেটুকু জমি প্রয়োজন, সেটা দেওয়ার জন্যও কেউ এগিয়ে এল না।

রেল্লিকা যদি হতে পারে তবে কি রিকনস্ট্রাকশনও সম্ভব? আজকাল কত কিছু রিকনস্ট্রাকশন হচ্ছে। যদিও বেশির ভাগ ভোটের রাজনীতি অথবা বাহুবলের আশ্বাশন। তবে মন্দ কি যদি হাম্পির পাশেই আর-একটা হাম্পি গড়ে ওঠে, ষোড়শ শতকের জীবন্ত শহরের নিখুঁত রেল্লিকা। একই রকম

দেখতে বিটঠল মন্দির, রয়াল এনক্রেন্ড, বিরূপাক্ষ বাজার— আরও শ'পাঁচেক মন্দির প্রাসাদ সৌধ। আস্ত একটা নগর, কিন্তু এক টুকরো মধ্যযুগ যেন। হয়তো প্রাসাদগুলো হোটেল হল, মন্দিরগুলো আর্ট গ্যালারি!

তবে এ সব শৌখিন কল্পনাকে বিজ্ঞানী কৌশলে এড়িয়ে যান।

“ডিজিটাল হাম্পি আমাদের কী শেখাল? ভবিষ্যতের জন্য কী পেলাম?”

“ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার শিক্ষা।”

তাঁর চোখে স্বপ্ন খেলা করে, উপমহাদেশ জুড়ে হাজার হাজার বছরের কত মূল্যবান ঐতিহ্য ছড়িয়ে আছে, অবহেলায় অরক্ষিত পড়ে আছে। সরকার থেকে ইউনেস্কো কারও খেয়াল নেই। শুধু পুরাতত্ত্ব নয়, কত লোকশিল্প, সংস্কৃতি, লোকাচার হারিয়ে যেতে বসেছে; সেগুলোরও ডিজিটাল প্রিজারভেশন দরকার, না হলে নষ্ট হয়ে যাবে। ভাবুন, আজ যদি বামিয়ান বুদ্ধের ডিজিটাল ডেটা থাকত, তা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মূল্যবান দলিল হয়ে থেকে যেত। প্রয়োজনে রেল্লিকা তৈরি করা সম্ভব হত। পাকিস্তানের মরুতীর্থ হিংলাজে ভারতীয়রা পৌঁছোতে পারে না, কিন্তু ডিজিটাল ডেটার মাধ্যমে পৌঁছানো যায়।

“ডিজিটাল টুরিজম?”

“ক্ষতি কী! মানুষ তার ব্যস্ত জীবনে কোনও জায়গাকে ডিজিটালি এক্সপ্লোর

করতেই পারে। হয়তো অ্যাপের মাধ্যমে সহজেই পৌঁছে গেল আন্ধোরভাটের মন্দিরে কিংবা মহেঞ্জোদারোর প্রাচীন নগরে। এ ভ্রমণ ইউটিউবারদের সঙ্গে ভিডিয়ো ভ্রমণ নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে থ্রিডি ভ্রমণ। তবে প্রশ্ন একটাই, সাধারণ মানুষ সত্যিই কি এ সঙ্গে আগ্রহী? যদি থাকে, তা হলেও বড় বাধা হল অর্থ। আমরা অ্যাকাডেমিক কাজ করি, অর্থ জোগাড়ের দায়িত্ব ডিসিশন মেকারদের।

বিরূপাক্ষ মন্দিরের পাশে অসংখ্য হোমস্টে। ধ্বংস-নগরীর এই এলাকাতে কিছু লোকবসতি আছে। মন্দিরে আজও নিত্যপূজা হয়। এখানেই পম্পার সঙ্গে বিরূপাক্ষ শিবের বিয়ে হয়েছিল। গিরিজা কল্যাণম। ভূতপ্রেত ব্রহ্মবিষু, ইন্দ্র-মিত্র-বরুণ, কে আসেননি ভোজ খেতে? আজও প্রতি অম্ব্রানে বিবাহবার্ষিকী হয়। দলে দলে পুণ্যার্থীরা আসেন। মন্দিরের পূর্ব দিকে একশো ষাট ফুটের প্রধান গোপুরমটি রাজা কৃষ্ণদেবের আমলের। মূল মন্দিরটি চালুক্যদের তৈরি। কারও মতে মাধবাচার্যের নির্দেশে হরিহর ও বৃক্কই প্রতিষ্ঠাতা।

মন্দিরের সামনে পনেরো-ষোলার জড়বুদ্ধি ছেলেটি সারা দিন ভিক্ষা করে। চারকোনা কাঠের ঠেলাগাড়িতে ভিক্ষা করে এত বড় হয়েছে। বিধবা মা সকালে বসিয়ে রেখে যায়, সন্ধ্যায় গাড়ি ঠেলে ঘরে ফেরে।

মহিলার কেউ নেই। মন্দিরে বাতুলার কাজ করে। মাঝে একবার ছেলেকে খাইয়ে যায়। সারা দিন গাছের ছায়ায় ও ভাবেই পড়ে থাকে। কার মন্দির, কিসের ভিক্ষা, কিছুতেই যায়- আসে না। সাক্ষাৎ শিব যেন। মুখ দিয়ে লালার বরে বুক ভেসে যায়। মাছির দল ঘিরে থাকে, ক্রক্ষেপ নেই। যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে, বাকি সব এহ বাহা। এ নগরীর সার্থক প্রতীক যেন। মহামান্য মহানাগরিক।

হাম্পি জুড়ে অসংখ্য বাজার ছিল। ট্রেড সিটি। প্রতিটা মন্দিরের সামনে পাথরের সারি সারি দোকান। কত দূরদেশ থেকে পসরা আসত। বিটুল বাজারে হাতি ঘোড়া, বিরূপাক্ষে মণিমুক্তা। কৃষ্ণবাজারে মশলা মিলত, পানসুপারি বাজারে দৈনন্দিন আনাজপাতি। এককালে বোচাকেনা হাঁকডাকে চারপাশ মুখর থাকত। এখন ভাঙা ধ্বংসস্থূপে প্রেতের নিঃশ্বাসের মতো বাতাস বয়ে যায়।

বিরূপাক্ষ বাজার থেকে পাহাড় ডিঙিয়ে উপরে উঠলে অচ্যুত দেবরায়ের মন্দির। ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে উঠতে কষ্ট হয়। পথ জুড়ে পাথর ছড়ানো। দু'পাশে কত অজানা ফুল ফুটে আছে। হঠাৎ বড় একটা ঝোপের আড়ালে মাঝবয়সি লোকটি ক্যামেরা হাতে বসে আছেন। পমপাইয়া মালেমথ। পাসের শহর হসপেটে থাকেন, পেশাদার ফোটোগ্রাফার। এলাকার মানুষ পাখিপাগল বলে ডাকে। হাম্পি ও দারোজি বেয়ার স্যাংচুয়ারিতে সারা দিন কেটে যায় তাঁর। তিনশো প্রজাতির পাখি আছে, তিরিশ রকমের প্রজাপতি— লেপার্ড, হায়না, বুনা শুয়োর, স্লথ বেয়ার। একপাশে ডেকে নিয়ে ব্লু-বটল প্রজাপতি দেখান, তাঁকে বলি বাংলায় এর নাম ‘তুঁতচিল’। দু’-একবার উচ্চারণের চেষ্টা করে হেসে ফেলেন। ঝোপের আড়ালে ইয়েলো-থ্রোটড বুলবুল দেখাতে পেরে শিশুর মতো খুশি হন। লুণ্ডপ্রায় প্রজাতি। এদের বাঁচাতে নিজের উদ্যোগে কয়েক হাজার ফলের গাছ লাগিয়েছেন। স্বপ্ন দেখেন পুরো হাম্পিটা যেন অভয়ারণ্য হয়ে ওঠে। খারাপ কী, জঙ্গলের আড়ালে ইতিহাসের লজ্জা মুখ লুকাবে! ডেকানের জনজাতিরা খুশি হবে।

হোমস্টে-র রুফ টপ রেস্টুরাঁয় চা খেতে গিয়ে কোজাগরীর চাঁদ উঠে আসে। দু'দিনের ঘোরাঘুরির ক্লান্তিটা চা-জ্যোৎস্নায় জুড়িয়ে যায়। তবু এই ধ্বংসস্থূপ থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি, কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

হাম্পি ভাল লাগেনি শুনে হোমস্টে-র মালিক প্রকাশ রেড্ডি অবাক। বছর পঁয়ত্রিশের স্থানীয় যুবক। স্বামী-স্ত্রী মিলে পাঁচটা ঘরের ছোট ব্যবসা। ভিড়ের সময় নিজেদের ঘর ছেড়ে খোলা ছাদে রাত কাটায়। টুরিস্টের খুশিতেই খুশি। মানুষ এত দূর থেকে আসে, তাদের জন্য এ আর এমন কী?

ডিনারের আগে দরজায় মৃদু টোকা, “রাতের হাম্পি দেখতে যাবেন? পুর্ণিমার রাতে বিটুল মন্দিরে নুপুরের শব্দ শোনা যায়।” “সরকারি বাসে ভ্রমণ? হাম্পি বাই নাইট?” “সে তো সন্ধ্যা রাতে! নুপুর বাজে রাত গভীর হলে, নির্জনে।”

রাত দশটায় পথঘাট শুনশান। হলুদ জ্যোৎস্নায় চরাচর ভেসে যাচ্ছে, তিনটে বাইসাইকেলে আমরা তিনজন। প্রকাশও সঙ্গী হয়েছে, এত বছরেও নুপুরের শব্দ শোনা হয়ে ওঠেনি। পুলিশের থেকে পারমিশন ইত্যাদি সে-ই জোগাড় করেছে। হসপেটের ডিএসপি-র দূরসম্পর্কের আত্মীয়। পুরো শহর ইউনেক্সের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। চারপাশে দামি প্রত্নসামগ্রী ছড়ানো, তাই পুলিশের কড়াকড়ি। স্থায়ী বাসিন্দার চেয়ে পুলিশের সংখ্যা বেশি। প্রতিটা ধ্বংসস্থূপের সামনে সশস্ত্র রক্ষীরা পথ আটকায়। কন্নড় ভাষায় গিরিশ পরিচয় দিলেও সন্দেহের চোখে তাকায়। ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলে, তবেই ভিতরে ঢোকান অনুমতি পাওয়া যায়।

ভিতরে সেখানে কৃষ্ণদেব রায়ের শ্রীকৃষ্ণ মন্দির। পাথর ও টেরাকোটার অপূর্ব কারুকাজ। চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট লাগে। সামনে মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণ বাজার। পাথর বাঁধানো রাস্তার দু'পাশে পাথরের দোতলা শপিং মল। অধিকাংশ ভেঙে পড়লেও

কাঠামোটা বোঝা যায়। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। চাঁদের আলো-অন্ধকারে আজও কারা যেন কেনাবেচা করে। যান্ত্রিক রোবটের মতো। কান পাতলে ফিসফাস শোনা যায়। ধাতব অশরীরী স্বর হাতছানি দিয়ে ডাকে। আরও ভিতরে নিয়ে যেতে চায়। গিরিশের পিছু ডাকে সন্ধিৎ ফেরে।

পাকা সড়কে বাঁক নিতে বিরাট শিবলিঙ্গ। একপাশে নরসিংহ মূর্তি, প্রসন্ন বিরূপাক্ষ মন্দির। বড় বিচিত্র এর স্থাপত্যরীতি। মন্দিরের ছাদ মাটি-সমান। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলে গর্ভগৃহ। অধিকাংশ সময় জলে ডুবে থাকে। লোকে বলে তুঙ্গভদ্রার সঙ্গে যোগ আছে, সেখানে জল কমলে মহাদেব জেগে ওঠেন। এখন সাপ আর বাদুড়ের আস্তানা।

একটু দূরে কয়েকশো একর জুড়ে রয়্যাল এনক্লোজার। কত যে মহল কত মন্দির, হাতিশালা, ঘোড়ার আস্তাবল, স্নানাগার। সামান্যই টিকে আছে। তালিকোটার পরেও একশো বছর ধ্বংসলীলা চলে। ইউনেক্সের দৌলতে আজ সবুজ ঘাসের প্রলেপ। মাঝরাতে ঘাসের আগায় হেমন্তের শিশির জমে— ইতিহাসের অশ্রুবিন্দু।

একপাশে পাথরের কারুকাজ করা বিরাট মুক্তমঞ্চ— মহানবমী দিব্য। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। প্রাদেশিক শাসকেরা দল বেঁধে আসত সংস্কৃতি আর যুদ্ধকৌশল দেখাতে। কয়েকদিন রাজধানী জুড়ে বিরাট উৎসব।



মন্দিরচত্বর। ওপরে, বর্তমান রূপ। নীচে, ডিজিটাল পুনর্নির্মাণের পরে (শান্তনু চৌধুরীর সৌজন্যে)



কৃষ্ণমন্দিরের অলিঙ্গ

মঞ্চ সমাসীন রাজা, সামনে দিয়ে শোভাযাত্রা বয়ে যেত। বিদেশি পর্যটকেরা এ সবার খুঁটিনাটি বিস্তারিত লিখে গেছেন।

সামনে বিখ্যাত স্টেপওয়েল। উল্টো পিরামিডের মতো ধাপে ধাপে নেমে গেছে। আসলে স্নানাগার। পূর্বাঙ্গদের বানানো পাথরের নালা বেয়ে তুষভদ্রার জল আসত। এ ভাবেই নগরে পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছিল।

হাজাররাম মন্দিরের সবুজ গালিচায় শুয়ে বিশ্রাম করি। সামনে প্রাচীর ঘেরা লোটাস মহল, হাতিশালা, তেনালিরামের প্রাসাদ। চারপাশের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে পুলিশের হুইসল বাজে। কর্তব্যে অটল। মাছি গলার উপায় নেই। যেন সে সময়ে হাজির থাকলে একটা পাথরেও আঘাত লাগত না। কিন্তু ভেঙেছিল কারা? এদেরই তো পূর্বপুরুষ। ইতিহাস এমনটাই হয়। একদল অর্থের বিনিময়ে শ্রম দিয়ে তৈরি করে, অন্যদল অর্থের বিনিময়ে শ্রম দিয়ে ধ্বংস করে। আর কেউ রাত জেগে মর্গের শব পাহারা দেয়।

সত্যিই যদি রি-কনস্ট্রাকশন হয় খুব কি খারাপ হবে? কয়েকশো মন্দির প্রাসাদের আধুনিক শহর। মহানবমী দিব্যার উঁচু চাতালে প্রতি সন্ধ্যায় আদিবাসী নৃত্যের আসর বসবে। বেডার, বোভি, গারসিয়াদের মেয়েপুরুষেরা টুরিস্টদের নাচ দেখিয়ে মজুরি পাবে। অথবা তারা হয়তো এ সবে বিরক্ত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ডেকানের দুর্গম অঞ্চলে সরে

যাবে। জনজাতিরা লাজুক অভিমাত্রী, নিজেকে গুটিয়ে রাখতে ভালবাসে।

“চলুন, ফেরা যাক।”

“সে কী, এখনই!”

“ভাল লাগছে না।”

“বিট্টল মন্দিরে যাবেন না, ছোট রানি চিম্মার নূপুরের শব্দ?”

“যেতেই হবে? আচ্ছা, পথ দেখান—

অনেক উপরে বয়স্ক চাঁদ, নীচে তিন জন সাইকেল আরোহী। কে কার পথ-প্রদর্শক বুঝে ওঠা দায়।

রাজনর্তকী চিন্নাদেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণদেব তাঁকে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু মা হওয়ার সুযোগ দেননি। সে কি নর্তকীর সৌষ্ঠব নষ্ট হয়ে যাবে বলে, নাকি মহারানি তিরুমালার পুত্র সিংহাসনে বসবে এই শর্তে? রাজা বিট্টল মন্দিরে চিন্নাদেবীর প্রথম সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাই সিংহাসনে বসে দেবরায়ের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটিকে নতুন করে সাজিয়ে তুললেন। মূল মন্দিরের সামনে তৈরি হল মহামণ্ডপ, যা আসলে নৃত্যশালা। রাজরানি চিম্মার জন্যে রাজ-উপহার। পুরন্দর দাসের হাত ধরে বিজয়নগরে তত দিনে বৈষ্ণব প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। বিট্টল-এর সামনে বিভোর হয়ে দাস পুরন্দর ভজন গাইতেন, যা থেকে পরবর্তী কালে কনটিকি সঙ্গীতের জন্ম হয়।

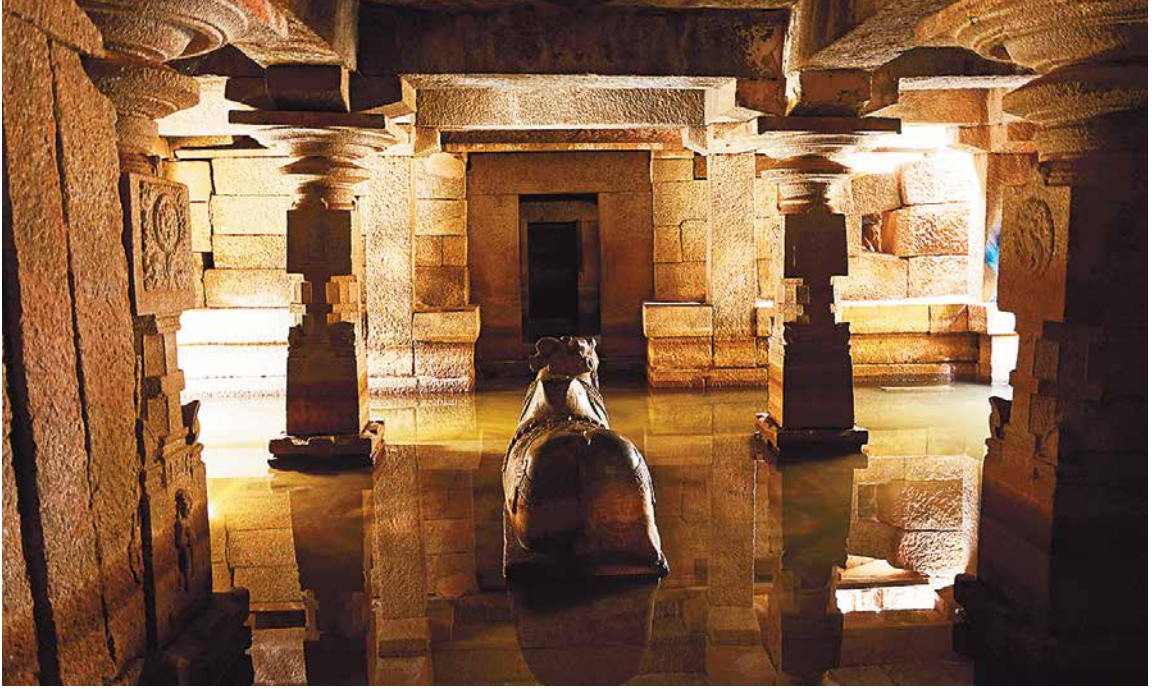
এমন পূর্ণিমার রাতে দেবদাসী চিন্না গ্রানাইট সৌন্দর্যে নেচে উঠত। দর্শক মাত্র

দু’জন— পাথরের বিট্টল মূর্তি, রক্তমাংসের মূর্তিমান রাজা স্বয়ং। সে রাতে আরও তিন জন হাজির ছিলাম, যদি কিছু দেখা মেলে...

যা মিলেছিল বর্ণনার অতীত। প্রকাশ রেড্ডির পরিচিত নাইটগার্ড সব কিছু ঘুরে দেখায়। মহামণ্ডপের চারপাশে সারি সারি মিউজিক্যাল পিলার। কৃষ্ণদেবের জামাতা আলিয়দেব রায়ের তৈরি। গ্রানাইট পিলারের গায়ে কোথাও ঢোল-মৃদঙ্গ-পাখোয়াজের বোল ফোটে, কোথাও ঘণ্টাধ্বনি। সবগুলো একসঙ্গে বেজে উঠলে অপূর্ব আবহসঙ্গীত। এ সব গ্রানাইটে অর্থোকেজ মিনারেল থাকায় সুর ওঠে। বিশ্ব জুড়ে এগুলোকে বলে লিথোফোন। আফ্রিকা ভিয়েতনাম দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা মেলে। শাস্ত্রনু চৌধুরীর বন্ধু, আর-এক বাঙালি বিজ্ঞানী শুভাশিস চৌধুরী এ সব নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন। বর্তমানে ইনি বোম্বে আইআইটি-র ডিরেক্টর। ড. চৌধুরীর সঙ্গে রসিকতার লোভটা সামলাতে পারিনি, বিজয়নগরের সঙ্গে খ্যাতি ও ক্ষমতার অলৌকিক কোনও যোগ আছে কি?

হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, সুলতানি আগ্রাসনের ভয়টাও আছে।

মহামণ্ডপের সামনে ঘোড়ায় টানা পাথরের বিখ্যাত রথ। বিষ্ণু বিট্টলকে নিয়ে যেতে স্বয়ং গুরু মহারাজ রথ নিয়ে হাজির। তবে গুরু ব্যর্থ হলেও প্রধান পুরোহিত নাকি বিট্টলকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। একা রথ



প্রসন্ন বিরূপাক্ষ মন্দির। মন্দিরের ছাদ মাটি-সমান। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলে গর্ভগৃহ। অধিকাংশ সময় জলে ডুবে থাকে

ভগ্নমনোরথে আজও নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। ভারতীয় মুদ্রার দৌলতে এ ছবি মানুষের হাতে হাতে যোরে।

তালিকোটীর যুদ্ধে আলিয়দেব রায়ের মৃত্যু হতেই সুলতানি শাসকেরা ছুটেছিল বিট্টল মন্দিরে। প্রাসাদের চেয়েও বেশি ধনরত্ন ছিল মন্দিরের কোষাগারে। গ্রানাইটের মন্দির ভাঙতে না পেরে গর্ভগৃহে কাঠ মজুত করে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখায় কারুকার্যময় ছাদ পাহাড়ের মতো ধসে পড়ে। স্বয়ং বিট্টল নিজেকে রক্ষা করতে না পারায় নগরবাসীও প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কেউ পালিয়ে প্রাণে বাঁচে, কেউ প্রকাশ্যে খুন হয়ে যায়।

তুঙ্গভদ্রার দিক থেকে একটা দমকা হাওয়া উড়ে আসে, সঙ্গে জুঁইফুলের গন্ধ। চারপাশটা মুহূর্তে কেমন বদলে যায়। কারও মুখে কথা নেই। মাথার উপর কয়েকটা বাদুড় উড়ে যায়। একটানা ঝাঁঝির ডাক। হঠাৎ পাথরের রথের দিকে তাকিয়ে সঙ্গী আভিনব ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

“কী ব্যাপার লাহিড়ি মশাই, কাঁদছ কেন?”
উত্তর নেই।
“ভয় পেয়েছ?”
মাথা নাড়ে, ইশারায় বুঝিয়ে দেয় সব ঠিক আছে।

“তবে?”
কথা বলার অবস্থায় নেই। প্রকাশ বলে,
“ছোড়িয়ে। কভি অ্যায়সা হোতা হ্যায়।”
চাঁদ পশ্চিমে হলে পড়লে তুঙ্গভদ্রার

তীরে গিয়ে দাঁড়াই। অন্ধকার কালো জলে জ্যোৎস্নার লুটেপুটি। চামড়ার গোল ডিঙি-নৌকায় জেলেরা মাছ ধরছে। এরা বলে কোরাকেল।

“নৌকা চাপবেন?” কিছু বলার আগেই প্রকাশ একজনকে ডেকে নেয়।

“এমন পলকা, যদি ডুবে যায়!”

মাঝি নিজের ভাষায় কী একটা বলে হেসে ওঠে। এর পর আপত্তি চলে না। কিন্তু কয়েকশো মিটার যেতেই ভোরের আলো ফোটে। রাতের মোহটা হঠাৎ ভেঙে যায়,
“চলুন, ফেরা যাক।”

“চলুন। প্রজারা জেগে উঠবে।”

গল্প শুনে শান্তনু চৌধুরী বলেছিলেন,
“আমরাও রাতের হাম্পি ঘুরেছি, সত্যি অন্য অভিজ্ঞতা। কেমন গা ছমছম করে! চারপাশে ইতিহাসের ফিসফিসানি। তবে বিজ্ঞান চাইলে এমন অশরীরী ইতিহাসকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে। রাজা-রানি রাজকন্যাদের নিজের চোখে দেখা যাবে। অগমেন্টেড রিয়েলিটি। যাকে কাজে লাগিয়ে পোকেমন গেম তৈরি হয়েছে, এ-ও অনেকটা তাই। হয়তো অগমেন্টেড গ্লাস পরে বিরূপাক্ষ বাজার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আপনার চারপাশে তখন পঞ্চদশ শতকের এক টুকরো ইতিহাস। কোনও পর্ভুগিজ নাবিককে দেখলেন হিরে-মুক্তোর দাম করছে, আরবরা এনেছে তেজি ঘোড়া। মালাবার থেকে সুগন্ধি মশলা, বাংলা থেকে ঢাকাই মসলিন। যেন ইচ্ছে করলে

আপনিও ছুঁয়ে দেখতে পারেন।”

“ইতিহাস তো তা হলে সচল হয়ে উঠবে!”

“শুধু সচলই না, একেবারে ত্রিমাত্রিক।

এটাও কাটসু ইকেউচিই করেছিলেন জাপানের গ্রেট বুদ্ধ প্যালাসে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাসাদকে দর্শকরা জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখেছিল। তেমনটা এখানেও করা যেতে পারে। বিভিন্ন বিভাগের পণ্ডিতদের সাহায্যে বিজ্ঞানীদের কনস্টেন্ট তৈরি করে নিতে হবে। এর পর জিওস্পেসিয়াস ট্যাগিং করে নিলেই কাজ শেষ। দর্শকরা হলো-লেন্স চোখে দিয়ে দেখতে পাবে বিট্টল মন্দিরে সতাই চিন্মাদেবী নেচে চলেছেন। সিংহাসনে বসে আছেন কৃষ্ণদেব স্বয়ং।”

মন্দিরের চারপাশের মিউজিক্যাল পিলার থেকে সুরের মূর্ছনা উঠেছে। আর দূরে মাতঙ্গ পর্বতের ঢালু পথ বেয়ে নেমে আসছে হরিহর ও বুদ্ধের ছায়া।

ফেরার দিন গাড়িতে উঠতে যাব, দেখি বিধবা তার কাঠের রথ ঠেলে মন্দিরে যাচ্ছে। ভিখারি শিব ভিক্ষায় চলেছেন। ভাঙা রাস্তায় রথ ঠেলেতে কষ্ট হচ্ছে দেখে আমিও হাত লাগাই। কিন্তু না, ভিক্ষা দিতে সাহস পাইনি। স্বয়ং ত্রিলোকেশ্বরকে মানুষের কি ভিক্ষা দেওয়া সাজে? আমরা বরং অপেক্ষা করতে পারি, কবে ধ্যান ভেঙে হেমকুট পাহাড় থেকে অন্তর্পূর্ণা নেমে আসেন...

ছবি: সুচেতনা সেন